কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

সুশীল মুখার্জী

কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পাশ ও অনার্স পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তক]

সুশীল মুখার্জী

অধ্যাপক, হেরম্বচন্দ্র কলেজ (সিটি কলেজ, দক্ষিণ কলিকাতা, দিবা শাখা)
ও সিটি কলেজ অফ্ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস এড্মিনিস্ট্রেশন
(সূর্য সেন স্ট্রীট, সান্ধ্যকালীন শাখা)
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অফ্ চার্টার্ড
অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া এবং ইনস্টিটিউট অফ্ কস্ট্
অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া

ছায়া প্রকাশনী
৪, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসুমিত বিশ্বাস
ছায়া প্রকাশনী
৪, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসরোজকুমার দোলুই
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পিতৃদেব ৺ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং কারবারী প্রচেষ্টা ১—২৩

পরিবেশ কাহাকে বলে ৩, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ কিভাবে কারবারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে ৩, কারবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৫, সামাজিক উন্নয়নে কারবারের ভূমিকা ৮, কারবারের ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক দিক ১৩, সামাজিক দায়িত্ব কাহাকে বলে ১৫, কারবারের সামাজিক দায়িত্বসমূহ ১৬, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি কারবারের দায়িত্ব ২১, ভারতীয় কারবার কতখানি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে ২৩

২. কারবারের প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি ২৪—৬৪

কারবারের বিভিন্ন অর্থ ২৪, কারবারের প্রকৃতি ও পরিধি ২৫, কারবারের কাযকলাপ ২৬, কারবারী কাযের সংজ্ঞা ৩১, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ৩৩, কারবার ও পেশার মধ্যে পার্থক্য ৩৪, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতার উপর কারবারের নির্ভরশীলতা ৩৫, কারবার ও অর্থনীতি ৩৫, কারবার ও বিজ্ঞান ৩৭, কারবার ও কারিগরি বিদ্যা ৩৭, কারবার ও অঙ্কশাস্ত্র ৩৭, কারবার ও মনস্তত্ত্ব ৩৭, কারবার ও সমাজতত্ত্ব ৩৮, কারবারী কার্যকলাপের মৌল বৈশিষ্ট্য ৩৯, কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৪০, স্থানীয় কারবার, জাতীয় কারবার, আন্তর্জাতিক কারবার ৪৩, কারবারের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতা ৪৫, কারবারী কার্যের শ্রেণী বিভাগ ৪৬, শিল্প—শিল্পের বিভাগ ৪৭, ব্যবসা ৪৯, ব্যবসায়ের বিভাগ ৫০, বাণিজ্যিক কার্যাবলী ৫২, বাজার ৫৪, ডাকঘর ও উহার কার্যাবলী ৫৫, বিশেষায়ণ ৫৬, কারবারী কার্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ ৫৭, ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সামগ্রিক কারবার পদ্ধতি তৈয়ারী করে ৫৯, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পার্থক্য ৫৯, কারবারী অভিপ্রেরণা ৬০, উত্তম কারবারীর অপরিহার্য গুণাবলী ৬৩

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং কারবার ৬৫—৭৫

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৬৫, সামাজিক ব্যবস্থা ৬৫, ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা ৬৫, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৬৭, মিশ্র অর্থনীতি ৬৮, মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ৭০, ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ৭২

৪. কারবারী কাঠামো ৭৬—১১১

তিন প্রকারের অর্থনীতি ৭৬, কারবার আরম্ভের উদ্যোগ ৭৭, কারবারের কাঠামো নির্বাচন ৭৯, এক-মালিকী কারবার ৮১, যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ৮৬, অংশীদারী কারবার ৮৭, অংশীদারগণের শ্রেণীবিভাগ ৯০, অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্র ৯২, অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্রের নমুনা ৯৪, অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য ৯৬, অংশীদারগণের দায় ৯৭, অংশীদারী কারবারের সুবিধা ৯৮, অংশীদারী কারবারের অসুবিধা ৯৯, অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন ১০০, কারবারের মিয়াদ ১০১, অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন ১০১, অংশীদারীর বিলোপ ও অংশীদারী কারবারের বিলোপ ১০২, পরিমিত বা সসীম দায় অংশীদারী কারবার ১০৩, নাবালকের ভূমিকায় অংশীদার ১০৩, এক-মালিকী কারবার বনাম অংশীদারী কারবার ১০৪, সমবায় সংগঠন ১০৬, সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ ১০৮, সমবায় সমিতির সুবিধা ১১০, সমবায় সমিতির অসুবিধা ১১১

৫. বিধিবদ্ধ সংগঠনের বিভিন্ন দিক—যৌথ-মূলধনী কোম্পানী ১১২—১৯৭

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী—ভূমিকা ১১২, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সংজ্ঞা ১১৪, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ১১৪, সীমিত দায় নীতির তাৎপর্য ১১৫, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ ১১৬, যৌথ-মূলধনী কোম্পানী প্রবর্তনের পদ্ধতি ১২০, পরিমেলবন্ধ বা স্মারকলিপির বিষয়-বস্তু ১২৪, পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয়-বস্তু ১২৫, পরিমেলবন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য ১২৬, বিবরণপত্র বা অনুষ্ঠানপত্র ১২৭, বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু ১২৮, বিবরণপত্রের বদলে বিবৃতি ১২৯, পরিচালকবর্গের যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য শেয়ার ক্রয় ১৩০, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অর্থ-সংস্থান ১৩০, মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ১৩০,

কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন ও ব্যবহৃত মূলধন ১৩২, মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ১৩৫, শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ ১৩৭, স্টক ১৪৩, শেয়ার ও স্টকের তুলনা ১৪৩, ঋণপত্র ১৪৩, শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য ১৪৫, শেয়ারের বিলিমূল্য ১৪৫, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সুবিধাসমূহ ১৪৬, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অসুবিধাসমূহ ১৪৮, অংশীদারী কারবার ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য ১৪৯, ঘরোয়া ও সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য ১৫১, সমবায় সমিতি ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য ১৫২, ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেন ১৫৩, কোম্পানী ব্যবস্থাপনার কাঠামো ১৫৪, কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় গোষ্ঠীতন্ত্র ও তাহার কারণ ১৫৬, গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিয়মের ত্রুটি ও প্রতিকার ১৫৮, কোম্পানী পরিচালনার অঙ্গসমূহ ১৬০, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ১৬০, পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা ১৬১, পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলী ১৬২, পরিচালকমণ্ডলীর ক্রম-অবনতি ১৬৪, পরিচালকমণ্ডলীকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় ১৬৬, পরিচালক নিয়োগ ১৬৭, প্রথম ও পরবর্তী পরিচালকবৃন্দ ১৬৭, পরিচালকগণের অযোগ্যতা ১৬৯, পরিচালক-পদ নাকচ ১৬৯, পরিচালকগণের অপসারণ ১৭০, পরিচালকগণের দায়-দায়িত্ব ১৭৪, পরিচালকগণের স্থান ১৭৫, কর্মচারী ১৭৬, কর্মকর্তা ১৭৭, কার্যনির্বাহী অংশীদার ১৭৭, পরিচালকবর্গের উপর আইনের বাধা-নিষেধ ১৭৮, পরিচালকগণের পারিশ্রমিক ১৭৯, মুখ্য কার্যনির্বাহী ১৭৯, কার্যনির্বাহী পরিচালক ১৮০, ব্যবস্থাপক ১৮১, সর্বক্ষণের পরিচালক ১৮৩, কার্যনির্বাহী পরিচালক, সর্বক্ষণের পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকের তুলনামূলক আলোচনা ১৮৪, ত্রি-স্তর কোম্পানী ব্যবস্থা ১৮৬, কোম্পানী আইন পর্ষদ ১৮৬, কোম্পানী আইন পর্ষদের কার্যাবলী ১৮৭, আঞ্চলিক নির্দেশালয় ১৮৮, কোম্পানী নিবন্ধক ১৮৮, কোম্পানীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা ১৮৯, ব্যবস্থাপকগণের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কোম্পানী-বিষয়ক দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশাবলী ১৯৩, ম্যানেজিং এজেন্সী-প্রথার অবলুপ্তিতে অন্যান্য ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ১৯৪

৬. কারবারী জোট ও সংহতি ১৯৮—২২৫

কারবারী জোট কাহাকে বলে ১৯৮, জোট-গঠনের কারণ ১৯৮, জোটের সুবিধা ২০০, জোটের কুফল ২০১, জোটের শ্রেণীবিভাগ ২০২, পূর্বাপর

জোট ২০৩, সমান্তরাল জোট ২০৫, বৃত্তাকার জোট, পার্শ্বিক জোট, আঞ্চলিক জোট, ব্যবসায়ী সমিতি, বণিকসভা ২০৭, শ্রমিক সংঘ ২০৮, ভদ্রলোকের চুক্তি ২০৮, কার্টেল ২০৮, পুল ২০৯, ট্রাস্ট ২১০, হোল্ডিং কোম্পানী ২১০, জন-স্বার্থ-গোষ্ঠী ২১১, একত্রীকরণ ২১২, অন্তর্ভুক্তি ২১২, অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি ২১২, উৎপাদন-সংঘ ২১২, বাজার সংঘ ২১৩, মুনাফা সংঘ, অর্থ সংঘ, যাত্রী-সম্পর্কীয় সংঘ, পেটেন্ট সংঘ, মিশ্র সংঘ, শর্ত কার্টেল ২১৩, উৎকর্ষ কার্টেল, উৎপাদন কার্টেল, বাজার কার্টেল, ট্রাফিক সিণ্ডিকেট, বিক্রয় সিণ্ডিকেট, কারবারী চক্র ২১৪, পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী ২১৪, পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোটের পার্থক্য ২১৪, ট্রাস্ট ও কার্টেলের পার্থক্য ২১৫, ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর পার্থক্য ২১৬, কার্টেল ও একত্রীকরণের পার্থক্য ২১৬, কার্টেল ও পুলের পার্থক্য ২১৭, একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তির পার্থক্য ২১৮, ভারতীয় শিল্পে কারবারী জোটবন্ধনের প্রসার ২১৮, সংহতি ও বহুজাতিক কোম্পানী ২২০, আন্তর্জাতিক শিল্পদৈত্য বা বহুজাতিক কোম্পানী ২২১, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ ২২২, ভারত ও বহুজাতিক কোম্পানী ২২৩, ভারতে শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া এবং অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা নিয়ন্ত্রণ আইন ২২৩

৭ সংগঠিত বাজার ২২৬—৩০৪

বাজারের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী ২২৬, বাজারের কার্যাবলী ২২৭, কারবারী প্রতিষ্ঠান ২২৭, বিভিন্ন প্রকার বাজার ২২৭, পণ্যের বাজার ও দ্রব্যের বাজার ২২৮, ফটকা বাজার ২৩০, ফটকা কারবার ও জুয়াখেলা ২৩১, জুয়াখেলার কুফল ২৩১, ফটকা কারবারের কুফল ২৩১, ফটকার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ২৩২, অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ২৩২, ভবিষ্যৎ বাজার ২৩৩, রক্ষণ ২৩৩, পরোক্ষ বিনিময় কারবার ২৩৩, টাকার বাজার ২৩৪, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ২৩৫, ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক সংগঠন ২৩৫, ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার পরিকাঠামো ২৩৬, ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা ২৩৬, ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ ২৩৭, তফ্‌সিলী ব্যাঙ্ক ২৩৯, তফ্‌সিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক ২৪০, তফ্‌সিলী ও তফ্‌সিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের পার্থক্য ২৪০, সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক ২৪০, ব্যাঙ্কের নিকাশ-ব্যবস্থা ২৪০, আমানত বীমা কর্পোরেশন ২৪১, সেভিংস ব্যাঙ্ক ২৪১, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ২৪২, ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর গুরুত্ব ২৪৪, আমানত হিসাবের প্রকারভেদ ২৪৫, চলতি আমানত হিসাব ও স্থায়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ২৪৭, চলতি

আমানত হিসাব ও সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ২৪৮, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ২৪৯, মিয়াদী আমানত ও চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানতের মধ্যে পার্থক্য ২৪৯, ব্যাঙ্কের ঋণ-প্রদান ২৫০, অধিবিকর্ষ ও রোক ঋণের মধ্যে পার্থক্য ২৫২, ব্যাঙ্ক ঋণ ও অধিবিকর্ষের মধ্যে পার্থক্য ২৫৩, ব্যাঙ্ক ঋণ ও রোক ঋণের মধ্যে পার্থক্য ২৫৩, বিভিন্ন প্রকারের আমানত ২৫৪, ব্যাঙ্কের ঋণ-সৃষ্টি ২৫৪, জামিনের প্রকারভেদ ২৫৫, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ-সংস্থানের পদ্ধতি ২৫৫, ব্যাঙ্ক ও তাহার গ্রাহকের সম্পর্ক ২৫৬, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫৭, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ ২৬০, ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক ২৬১, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ২৬২, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ২৬৩, হস্তান্তরযোগ্য দলিল ২৬৪, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ২৬৬, আভ্যন্তরীণ হুণ্ডির নমুনা ২৬৮, বৈদেশিক হুণ্ডির নমুনা ২৬৯, বাণিজ্যিক হুণ্ডির নমুনা ২৬৯, দেশী হুণ্ডি ২৬৯, চেক ২৭০, প্রমিসরি নোট ২৭১, স্বত্বান্তরকরণ ২৭২, স্বত্বান্তরকরণের ফল ২৭৩, দলিলপত্রী ২৭৩, দলিল প্রতি-হস্তান্তরকরণ ২৭৩, বিভিন্ন প্রকারের চেক ২৭৪, চেকে রেখাঙ্কনকরণ ২৭৫, চেক ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার পদ্ধতি ২৭৭, সঞ্চয়ী আমানত হইতে আমানতকারীর নিজের টাকা তুলিবার পদ্ধতি ২৭৮, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও চেকের মধ্যে পার্থক্য ২৭৯, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রমিসরি নোটের মধ্যে পার্থক্য ২৮১, চেক প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রসমূহ ২৮১, মূল্য প্রদানের উপায় ২৮২, চেক ২৮৫, ড্রাফট ২৮৬, ট্রেজারি চালান ২৮৭, মূলধনের বাজার ২৮৮, শেয়ার বাজার ২৮৯, শেয়ার বাজারে শেয়ার ও লগ্নিপত্রের দাম ওঠা-নামার কারণ ২৯৩, শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ পদ্ধতি ২৯৪, বিভিন্ন প্রকারের ফটকাবাজ ২৯৫, লগ্নিপত্রের মুখ্য-কারবারী ও দালালের মধ্যে পার্থক্য ২৯৬, লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তিকরণ ২৯৭, কলিকাতা শেয়ার বাজার ২৯৮, শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজারের পার্থক্য ২৯৮, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের পার্থক্য ২৯৯, মূলধনের বাজারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ ৩০০

৮ রাষ্ট্রীয় কারবার ও জনহিতকর সংস্থা ৩০৫—৩২৭

রাষ্ট্রীয় সংস্থা ৩০৫, রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ৩০৫, রাষ্ট্রীয় কারবারের ক্ষেত্র ৩০৭, সরকারী বিভাগীয় পরিচালনা ৩০৮, পর্ষদ ব্যবস্থাপনা ৩০৯, বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন ৩১১, সরকারী

কোম্পানী ৩১৩, সরকারী বিভাগীয় সংস্থা, বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন ও সরকারী কোম্পানীর তুলনামূলক আলোচনা ৩১৪, রাষ্ট্রীয় কারবারের গুণাগুণ ও দোষত্রুটি ৩১৫, সরকারী ও বেসরকারী কারবারের মধ্যে তুলনা ৩১৭, রাষ্ট্রীয় কারবারের সমস্যা ৩১৮, সমস্যার প্রতিকার ৩২০, রাষ্ট্রীয় কারবারের পরিচালনায় পরিচালকমণ্ডলীর শ্রেণীভেদ ৩২১, ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৩২৩, রাষ্ট্রীয় কারবারী সংস্থা দপ্তর ৩২৪, জনহিতকর সংস্থা ৩২৫

৯ সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও কারবারী নীতি ৩২৮—৩৬৩

সংগঠন—সংজ্ঞা ৩২৮, সংগঠন গড়িয়া তুলিবার পদক্ষেপ ৩২৮, সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উপাদান ৩২৯, সংগঠনের নীতিসমূহ ৩৩০, সংগঠনের তাৎপর্য ৩৩২, ব্যবস্থাপনা—সংজ্ঞা ও ধারণা ৩৩৩, ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ৩৩৩, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য ৩৩৪, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য ৩৩৫, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ও স্কুল ৩৩৭, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ৩৩৮, ব্যবস্থাপনা কি বিজ্ঞান ৩৪০, ব্যবস্থাপনা কি কলা ৩৪১, ব্যবস্থাপনা কি একটি পেশা ৩৪২, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ৩৪৩, শিল্প-সংস্থার সামগ্রিক কাজ ৩৪৪, ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ ৩৪৪, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ৩৪৮, ব্যবস্থাপনার স্তর ৩৫৩, সংযোজনা বা সমন্বয় ৩৫৫, ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩৫৬, সহযোগিতা ও সমন্বয় ৩৫৭, সংযোজনার নীতি ৩৫৭, সংযোজনার কৌশল ৩৫৮, নিয়ন্ত্রণ ৩৫৯, নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩৬০, কারবারী নীতি ৩৬১, নীতির প্রয়োজনীয়তা ৩৬১, কারবারী নীতির বৈশিষ্ট্য ৩৬১, বিভিন্ন প্রকার কারবারী নীতি ৩৬২, কারবারী নীতির প্রয়োগ ৩৬২

১০ রাষ্ট্র ও কারবার ৩৬৪—৪১৩

ভূমিকা ৩৬৪, কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৩৬৪, জাতীয়করণ ৩৬৬, কারবারী ক্ষেত্রে সরকার ৩৬৭, জাতীয় পরিকল্পনা ৩৭১, ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও সংস্থা ৩৭২, জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ ৩৭৩, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ৩৭৩, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহ ৩৭৪, আমদানি ও রপ্তানি

দ্বিতীয় খণ্ড

১ বিপণন ব্যবস্থাপনা ১—৯৬

বিপণনের সংজ্ঞা ও ধারণা ১, বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ১, বিপণনের গুরুত্ব ২, বিপণনের কার্যাবলী ২, বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী ৪, বিপণন কার্যকলাপ ৫, বিপণন-গবেষণা ৫, বিপণন-গবেষণার উদ্দেশ্য ৬, বিপণন-গবেষণার প্রকারভেদ ৬, বিপণন-গবেষণার উৎসসমূহ ৭, ক্রয়-বিক্রয় কারবারের সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র ৮, ক্রেতার শ্রেণীভেদ ১০, বিক্রেতার শ্রেণীভেদ ১০, ক্রয়-বিক্রয়ে তিনটি অত্যাবশ্যক দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১১, সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বিষয়ক তথ্যাদি ১৩, দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় ১৬, মূল্যপ্রদান পদ্ধতি ২১, ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর একটি উদাহরণ ২৪, ক্রয় ও বিক্রয় প্রণালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৯, মূল্য নির্ধারণ ৩২, পুনর্বিক্রয় মূল্যরক্ষণ ৩৪, স্তর-বিভাগ ৩৪, বিপণন গতিশীলতা ৩৫, বিপণন মিশ্র ৩৫, প্রমিতকরণ ৩৫, পণ্যের নামকরণ ৩৬, ঝুঁকি গ্রহণ, ধারে বিক্রয় ও আদায় ৩৬, পণ্যবণ্টনের প্রণালীসমূহ ৩৭, পণ্যবণ্টন প্রণালী নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ৩৯, বিভিন্নপ্রকার মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ৪০, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয়তা ৪২, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কুফল ৪৩, পাইকারী ব্যবসা ৪৪, পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন ৪৭, পাইকারী ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ ৪৯, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের তুলনা ৫০, খুচরা ব্যবসা ৫১, খুচরা ব্যবসায়ে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ৫৪, খুচরা ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ ৫৪, বিশিষ্ট খুচরা ব্যবসা ৫৫, বিভাগীয় বিপণি ৫৫, বহু-শাখা বিপণি ৫৯, বিভাগীয় বিপণি ও বহু-শাখা বিপণির তুলনামূলক আলোচনা ৬৩, বিশেষ ধরনের খুচরা ব্যবসা ৬৪, চেন স্টোর্স ৬৪, ভাড়া ক্রয় ৬৭, কিস্তিবন্দী ক্রয় ৬৭, ডাকযোগে কারবার ৬৯, ফেরিওয়ালা ৭০, ক্রেতা-সমবায় সমিতি ৭০, অধিবিপণি ৭১, বিজ্ঞাপনের অর্থ ও ভূমিকা ৭১, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মধ্যে পার্থক্য ৭৩, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ৭৩, বিজ্ঞাপনের সুবিধা ৭৫, বিজ্ঞাপন কি সঙ্গত ব্যয় ৭৬, বিজ্ঞাপনকে অনাবশ্যক ব্যয় ও অপব্যয় বলা যায় ৭৭, বিজ্ঞাপনের সাফল্য ৭৮, বিজ্ঞাপনের নীতি ৭৮, বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন ৮০, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমসমূহ ৮১, বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা ৮৪, বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি ৮৫, বিজ্ঞাপন কর্মসূচী ৮৫, বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব ৮৭, বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন ৮৭, বিজ্ঞাপনের ফলাফল নির্ধারণ ৮৮, সূত্রানুসন্ধান পদ্ধতি ৮৮, অনুসরণ পদ্ধতি ৮৯, বিক্রয়-কুশলতা ৮৯, বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়-কুশলতার পার্থক্য ৯০, বিক্রয়-কুশলতার

প্রয়োজনীয়তা ৯০, বিক্রয়-কুশলতার মৌলিক বিষয়সমূহ ৯১, বিক্রয়-ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার পার্থক্য ৯২, বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণাবলী ৯২, বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী ৯৫, জন-সংযোগ ৯৬

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৯৭—১২৩

সংজ্ঞা ৯৭, আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ৯৭, অর্থ সম্পর্কে পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা ৯৮, আর্থিক পরিকল্পনা ৯৯, মূলধন-কাঠামো ১০১, মূলধন বিন্যাস ১০১, মূলধনীকরণ ১০৩, অর্থব্যবস্থাপকের কার্যাবলী ১০৪, যৌথ কোম্পানীর লগ্নি বিপণন পদ্ধতি ১০৫, পুরাতন চালু লগ্নিপত্র বিপণন ব্যবস্থা ১০৭, মূলধন সংগ্রহের উৎস ১০৮, দীর্ঘ-মিয়াদী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ১১২, ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থের সংস্থান ১১৬, বৈদেশিক মূলধন ১১৯, বৈদেশিক সহযোগীর বিশ্লেষণ ১২২, পরামর্শ ও উপদেশাত্মক সংস্থা ১২৩

৩. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ১২৪—১৬৮

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও কার্যাবলী ১২৪, উৎপাদন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী ১২৪, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন ১২৫, আয়তন অনুসারে কারবারী প্রতিষ্ঠানের সরকারী শ্রেণীবিভাগ ১২৬, কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনের পরিমাপ ১২৭, কারবারের আয়তন ও কার্য পরিমাপের বিষয়সমূহ ১২৮, কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ ১৩১, কারবারের কাম্য আয়তন কি ১৩৪, কারবারের কাম্য আয়তন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ ১৩৪, কাজের পরিবেশ ১৩৬, কাজের পরিমাপ ১৩৭, এরগোনমিক্স ১৩৮, সময়-সমীক্ষা ১৩৯, গতি-সমীক্ষা ১৪০, ক্লান্তি-সমীক্ষা ১৪২, পদ্ধতি-সমীক্ষা ১৪২, স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা ১৪৩, বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক ১৪৫, উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ১৪৫, উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ ১৪৬, উৎপাদিকাশক্তির ধারণা ১৪৮, উৎপাদন ও উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য ১৪৮, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ১৪৯, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উপায়সমূহ ১৫০, ভারতে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির আন্দোলন ১৫০, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ১৫১, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে ১৫৪, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি ১৫৪, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ১৫৭, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনা ও অসুবিধা ১৫৮, শিল্প-সংস্কার ১৫৯, শিল্প-সংস্কারের বৈশিষ্ট্য ১৬০, শিল্প-সংস্কার কাহাকে বলে ১৬১, শিল্প-সংস্কারের সুবিধা

১৬১, অসুবিধা ১৬২, ভারতে শিল্প-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রগতি ১৬২, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্প-সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য ১৬৫, কারখানার বিভিন্ন বিভাগসমূহ ১৬৬

৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ১৬৯—২৬৮

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে ১৬৯, প্রশাসনিক কর্মপর্যায় ১৬৯, পরিকল্পনা ১৭১, পরিকল্পনার সুবিধা ১৭৪, পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা ১৭৪, পরিকল্পনায় উপাদান ১৭৫, পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ ১৭৭, পরিকল্পনায় ধ্যান-ধারণা এবং তার উপাদান ১৭৮, পরিকল্পনার প্রকারভেদ ১৮০, স্বল্প মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনার পার্থক্য ১৮১, পরিকল্পনায় রোগ নির্ণয় ১৮২, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১৮৩, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক ১৮৩, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি ১৮৩, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমিত বিষয় ১৮৫, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ ১৮৬, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ ১৮৮, উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ১৯১, সংগঠন—সামাজিক আচরণমূলক প্রকৃতি ও তাৎপর্য ১৯২, ভারার্পণ ১৯৩, কর্মাধ্যক্ষগণ ভারার্পণে অনিচ্ছুক কেন ১৯৬, বিকেন্দ্রীকরণ ১৯৮, ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সম্পর্ক ২০২, মানবিক প্রয়োজন ও সাংগঠনিক নকশা ২০৩, প্রশাসনিক সংগঠনের রূপ ২০৮, কর্মী-সংগঠন ২১০, কার্য-ভিত্তিক সংগঠন ২১১, রৈখিক ও কর্মী-সংগঠন ২১২, রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের মধ্যে বিরোধ ২১৪, কাজ ও ব্যক্তির মধ্যে মানানসইকরণ ২১৫, নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সংগঠন ২১৬, অনিয়মমাফিক দল সৃষ্টির কারণসমূহ ২১৬, নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সংগঠনের পার্থক্য ২১৮, বিভাগীয়করণ ২১৯, নির্দেশদান ২২৫, নির্দেশদানের নীতিসমূহ ২২৭, নেতৃত্ব ২২৯, নেতৃত্বের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ২৩০, নেতৃত্বের ধরন ২৩১, নিয়ম-শৃঙ্খলা ২৩৩, নিয়ম-শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ ২৩৪, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থাসমূহ ২৩৪, অনুপ্রাণিতকরণ ২৩৬, অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব ২৩৬, অনুপ্রাণিতকরণের তত্ত্বসমূহ ২৩৭, এক্স-তত্ত্ব ২৪০, অনুপ্রাণিতকরণের সহায়ক ২৪১, অর্থ ও অনুপ্রাণিতকরণ ২৪২, মনোবল, মনোবলের তাৎপর্য ২৪৩, মনোবল গঠনকারী উপাদানসমূহ ২৪৪, মনোবল কিভাবে পরিমাপ করা যায় ২৪৫, অনুপ্রাণিতকরণ ও মনোবলের পার্থক্য ২৪৬, মনোবল ও উৎপাদিকাশক্তির সম্পর্ক ২৪৭, প্রেরণা, প্রেরণার প্রকারভেদ ২৪৭, আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতা ২৪৯, আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৪৯, জ্ঞাতকরণ, জ্ঞাতকরণের উপাদানসমূহ ২৫০, জ্ঞাতকরণের ভূমিকা, জ্ঞাতকরণের প্রতিবন্ধকসমূহ

কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং কারবারী প্রচেষ্টা (Economic and Social Environment vis-a-vis Business Enterprises)

পরিবেশ কাহাকে বলে ? (What is Environment ?) :

যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাকে **পরিবেশ** বলে। সুষ্ঠু পরিবেশ কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি করে, সুষ্ঠু চিন্তাধারা গড়িয়া তোলে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

পরিবেশ প্রধানতঃ চার প্রকারের হয়: (১) **প্রাকৃতিক পরিবেশ** যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। (২) **অর্থনৈতিক পরিবেশ** যেমন, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্তর ইত্যাদি। (৩) **সামাজিক পরিবেশ** যেমন, সামাজিক চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। (৪) **রাজনৈতিক পরিবেশ** যেমন, রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা, সরকারের স্থায়িত্ব, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ কিভাবে কারবারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে (How do Economic and Social Environment Influence Business) :

অর্থনৈতিক পরিবেশ ও কারবার: অর্থনৈতিক পরিবেশ একটি অর্থনৈতিক অবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন-ব্যবস্থা, নিয়োগ, আয়, ব্যয়, অভাববোধ ও সম্ভোগকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। যদি অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিকূল হয়, তবে জীবনযাত্রার মান অনুন্নত হয়। অর্থনৈতিক পরিবেশ আবার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা ও মানবিক শক্তি ব্যবহারের স্তরের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র বিশ্বে তিন শ্রেণীর অর্থনৈতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়—ধনতান্ত্রিক, সামাজিক ও মিশ্র অর্থনৈতিক পরিবেশ।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কারবারী প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানায় গড়িয়া উঠে এবং ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণে চালিত হয়। ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, কারবারী উদ্যম বা উৎসাহ জাগে এবং প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকায় কারবারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশে অতিরিক্ত মুনাফার লোভ সামাজিক শোষণ আনে এবং আয় ও সম্পদে বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সামাজিক ন্যায় ব্যাহত করে। ইহা শ্রেণীভিত্তিক

সমাজ গড়িয়া তোলে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশে রাষ্ট্র উৎপাদনের উপাদান-সমূহের যেমন, জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার পায়। ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না; সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় এবং আয় ও ধনবৈষম্যের হ্রাস ঘটে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক পরিবেশে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ সহাবস্থান করে। ক্ষেত্র-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কারবারী প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠে। ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক পরিবেশ যদি উন্নত হয় তবে সেই দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, শিল্প সমৃদ্ধ হয়, কৃষি উন্নত হয় এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কারবারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় বলিয়া কর্মসংস্থানের নূতন সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে আয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। নূতন নূতন শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। অনুন্নত ও অর্ধোন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতি হয় না। মূলধনের অপ্রাচুর্য, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি মাথাপিছু আয় হ্রাস করে এবং জীবনযাত্রার মানকে নিম্নস্তরে ধরিয়া রাখে। এইরূপ অর্থনৈতিক পরিবেশে স্বল্প আয় বিনিয়োগ ও মূলধন গঠনে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে কারবারী পরিবেশ দুর্বল ও অসুস্থ হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক শক্তিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিলে তবেই উন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হইবে এবং উন্নয়নমূলক ও ভিত্তিমূলক শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে।

সামাজিক পরিবেশ ও কারবারঃ পরস্পর-নির্ভরশীল সমাজগোষ্ঠীকে সমাজ বলে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, নিরাপত্তা ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইহা মানুষের জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করে। **জাতিভেদ প্রথা** শ্রমবিভাগ সৃষ্টি করে। আবার ইহার ফলে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দেখা দিতে পারে। ফলে শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) নষ্ট হয়। **একান্নবর্তী পরিবার প্রথা** সমাজতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া তোলে। ইহাতে আনুগত্য, সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নিরাপত্তা, বেকারত্ব দূর হয়; কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিনষ্ট হয় ও পরনির্ভরশীলতা বাড়ে।

ইহা ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তি, বিভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিবাহপ্রথা, ধর্ম, বিত্ত ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ কারবারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ জনগণের চাহিদা ও সম্ভোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক বাধা শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে। ফলে আয় হ্রাস পায় এবং সঞ্চয় কমে। সঞ্চয় কমিলে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং মূলধন গঠন হয় না। এমন এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে কারবারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে। ইহাতে কারবারী কর্মযজ্ঞে গতিশীলতা আসে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, আয়ের বৃদ্ধি ঘটে ও জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান উন্নত হয়।

কারবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Evolution of Business):

কারবার একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি (system)। মানুষের জন্মের যেমন একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময় বলা যায়, কারবারের জন্মের বা উৎপত্তির সেইরকম কোন নির্দিষ্ট সময় বলা যায় না। কারণ কারবার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি একটি সময়কাল (period) ধরিয়া গড়িয়া উঠে। কারবারের উৎপত্তির সময়কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমেরিকার দুইজন প্রখ্যাত অধ্যাপকের মতে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিকামী দেশগুলি যখন নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ছিল এবং একে অপরের উপর ক্রমাগত হানা দিতেছিল তখন কারবার নিজের গতিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কারবার সভ্যতাকে আলো দেখাইয়াছে এবং অন্ধকারে প্রগতির পথ দেখাইয়াছে। বিশ্বশান্তিতে কারবার শান্তির দূত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বের আক্রমণকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ দেশগুলির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের ২০০০ হইতে ৩৮০০ বছর আগে কারবারের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইরাক ও ইরাণের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। মেসোপটেমিয়া উপত্যকার উভয় তীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতে কারবারের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিশ্বের প্রাচীন সভ্য দেশ যেমন, মিশর, গ্রীস, রোম, এথেন্স, এশিয়া মাইনর, ব্যাবিলন, কারথেজ ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানে কারবারের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। মিশরীয়, ফোনেসীয়, গ্রীক, রোমিও ইত্যাদি বণিকগণের মধ্যে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণার সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টির আদিমযুগে মানুষ ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় নিজের আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের অভাব মিটাইত। উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর সরাসরি আদান-প্রদানের মাধ্যমে কারবারের সূত্রপাত ঘটে। প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান বা বিনিময়-ব্যবস্থাকে **Barter পদ্ধতি** বলা হইত। তখন মুদ্রার প্রচলন হয় নাই, সেই কারণে প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যমে কারবারের উৎপত্তি ঘটে। কারবার প্রাচীনযুগে আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হইত। তখনও শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই, কারণ শিল্পের পদ্ধতি মানুষের নিকট অজানা ছিল। কৃষিজাত ও কাঁচামালের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বিনিময়প্রথা চালু ছিল।

কারবারের ক্রমবিকাশের স্তরকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়:

(১) আদিম স্তর: এই স্তরে মানুষ জঙ্গলে শিকার ও ফলমূল আহরণ করিত। একটু উন্নত অবস্থায় সে ভূমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে শিখিল। এই সময় পশুপালনও জীবিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। কালক্রমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস সুরু হইল এবং পরিবারের সকলের অভাব মোচনের প্রচেষ্টা **গৃহস্থালি অর্থনীতির** জন্ম দিল। এই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে নাই।

& Company) আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তোলে। ইউরোপের অন্যান্ত দেশ যেমন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ইত্যাদিও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে (colonial business) লিপ্ত হয়। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে Bank of England গড়িয়া উঠায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নৌপথে যাতায়াত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে।

(৮) **শিল্প-বিপ্লব ও যন্ত্রযুগ :** অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ফরাসী দেশে ও পরে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটে। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রীভস্ (Greaves) তাঁত (Loom) আবিষ্কার করেন এবং কার্টরাইট (Cartwright) শক্তিচালিত তাঁত (Power Loom) আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে "বহুল উৎপাদন-ব্যবস্থা" (Mass production system) সম্ভব হয়। জেমস্ ওয়াট (James Watt)-এর বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam engine) আবিষ্কারে বিশেষ করিয়া জাহাজ ও রেলগাড়ী আবিষ্কারের ফলে "বহুল বণ্টন-ব্যবস্থা" (Mass distribution system) গড়িয়া উঠে। ফলে একদিকে বহুল উৎপাদন ও অন্যদিকে বহুল বণ্টন-ব্যবস্থায় আধুনিক কারবার সামগ্রিক রূপ পায়। এই যুগে শিল্পের পুনর্গঠন, বৃহৎ শিল্পের পত্তন, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, বিশেষীকরণ, শ্রমবিভাগের সম্প্রসারণ, শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা ও ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রভূত অগ্রগতি ঘটে।

(৯) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্তর :** বাণিজ্যিক বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব, পরিবহণের উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার স্তর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। বর্তমানের কারবারী ক্ষেত্র স্থানীয় ও দেশীয় গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার ভিত্তিতে ইহা আন্তর্জাতিক অভাব পূরণে সচেষ্ট।

সামাজিক উন্নয়নে কারবারের ভূমিকা (Role of Business in Social Development) :

অধ্যাপক হুইলার (Wheeler)-এর মতে "কারবারের পরমাণু (Atom of business) উৎপাদনক্ষম অর্থনৈতিক শক্তির মূল উৎস।" সামাজিক উন্নয়ন ও কারবারের ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য ও একই সূত্রে গ্রথিত। কারবারী কার্যকলাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কারণ সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের অপরিসীম অভাববোধ পূরণ করিতে পারে একমাত্র কারবারী প্রচেষ্টা। আবহমান কাল ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে কারবার সামাজিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করিতেছে :

(১) **বহুল ও বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন :** কারবারী কার্যকলাপের প্রসারতা ও ব্যাপকতা বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সম্যক ব্যবহার ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শুধু যে নূতন নূতন পণ্য উৎপাদিত হইতেছে তাহা নহে, ইহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যও আনিয়াছে।

(২) **মুদ্রার প্রচলন :** কারবারের প্রাথমিক স্তরে প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা চালু ছিল। ইহাতে কারবারে নানাপ্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হইত। যেমন, কারবারে প্রসার লাভ হইত না এবং ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যাইত না। টাকাকড়ির প্রচলনে বিনিময়-ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয় ও কারবার দ্রুত প্রসার লাভ করে।

(৩) **মধ্যস্থ কারবারীর আবির্ভাব :** উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে নানাবিধ বাধা দূর করিবার জন্য মধ্যস্থ কারবারীর উদ্ভব ঘটে। ইহাতে উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে সেতু রচিত হয়। ফলে ক্রেতা দ্রুত তাহার নিকটস্থ স্থান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতে পারে। বণ্টন-ব্যবস্থায় মধ্যস্থ কারবারীর আবির্ভাব সমাজের অভাবপূরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৪) **পরিবহণের উন্নতি :** পরিবহণের যুগান্তকারী উন্নতিতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য বণ্টনে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

(৫) **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য ও কারবারী কার্যকলাপের প্রসারতায় ভোগ ও আয় বৃদ্ধি পায়, নূতন কর্মসংস্থান গড়িয়া উঠে ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

(৬) **যান্ত্রিক সুবিধা ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার :** যন্ত্র ব্যবহারে স্বল্প পরিশ্রমে বহুল উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। ইহাতে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং উৎপাদনে উৎকর্ষ আনা সম্ভব হইতেছে। ফলে সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

(৭) **শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ :** শ্রমবিভাগ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ আনয়ন করিয়াছে। শ্রমবিভাগে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও সমাজ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে প্রাপ্ত হয়। বিশেষীকরণের ফলে দ্রব্যের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ; ফলে সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৮) **শহরের উৎপত্তি :** শিল্প-বাণিজ্য যখন ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে তখন শহরের উৎপত্তি হয়। শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ শহরে রূপান্তরিত হয়। কারবার শহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়াছে ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

(৯) **শিল্প-বিপ্লব :** শিল্প-বিপ্লবের ফলে বহুল উৎপাদন ও বহুল বণ্টন-ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা উৎপাদনের কলাকৌশলকে সরল করিয়াছে ও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা (automation) আনিয়াছে। ইহার ফলে সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত সম্ভব হইতেছে।

(১০) **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি :** কারবারের সম্প্রসারণে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে এবং সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতেছে।

(১১) **সরকারী আয় বৃদ্ধি :** কারবারের উন্নতিতে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পায়। সরকার বিভিন্ন প্রকার কর বসাইয়া রাজস্ব আদায় করে ও সেই রাজস্ব জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যবহার করিয়া সামাজিক উন্নয়ন আনে।

(১২) **আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য** ঃ কারবারী কার্যকলাপে এক দেশ অন্য দেশের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হয় ও পরস্পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের সোপান গড়িয়া ওঠে।

কারবারের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব (Impact of Economic and Social changes on Business) ঃ

মানুষ যখন গোষ্ঠী হিসাবে একত্রে একস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে তখনই সমাজের সূত্রপাত হয়। সমাজ পরিবর্তনশীল। কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনে কারবারের ক্রমবিকাশ ঘটে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ সামাজিক পরিবর্তনের ফল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে কারবারী কার্যকলাপের পটভূমিকারও বিবর্তন ঘটে।

মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা স্থির নহে; উহা সদা পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন মানুষের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং রুচির পরিবর্তন ঘটায়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অভাবপূরণের তাগিদে সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন পরিবর্তিত হয়। আর্থিক অবস্থা ও বৈষয়িক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। নূতন অভাব সৃষ্টি হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য নূতন কারবারী প্রচেষ্টার জন্ম হয়। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে কারবারী কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়।

আবার, সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ সকল স্তরের মানুষের ক্ষেত্রে একপ্রকার নহে। একই সমাজে বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ বাস করে। যেমন, ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি। কারবারকে এইসকল ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক স্তরের অভাব পূরণের জন্য দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিলে কারবারী প্রচেষ্টারও পরিবর্তন ঘটিবে।

কারবারী প্রচেষ্টা সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি ঘটায়। কারবার মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার যোগান দেয় এবং জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য আনে। ইহা শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়, উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে, বেকারত্ব দূর করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিশ্ব সৌহার্দ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবের কুফলও আছে; যেমন—

(১) ইহা উৎপাদন-ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি করে;

(২) বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দূষিত হয়;

(৩) ইহাতে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে;

(৪) কারবারী কার্যকলাপের পরিবর্তন উৎপাদন ক্ষেত্রে সংকীর্ণ শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ আনে; ফলে কর্মচ্যুত হইলে শ্রমিক নূতন কাজ খুঁজিয়া পায় না;

(৫) উৎপাদন ও সম্ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবে বাণিজ্য-চক্রের সৃষ্টি হয়;

(৬) শহরের উৎপত্তি যেমন হয়, তেমনি স্বল্প আয়বিশিষ্ট কর্মীরা অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বস্তি গড়িয়া তোলে;

(৭) মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টিতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকট হইয়া উঠে।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও কারখানার স্থান-নির্বাচন (Economic Development and Selection of Site for a Factory):

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ক্রমবিকাশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করিতে হয়। মানুষ যখন জঙ্গলে বাস করিত তখন তাহার কারবারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস আরম্ভ করিল তখন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হইল, শহরের উৎপত্তি হইল এবং শহরাঞ্চলে কারবারের স্থান নির্ধারিত হইল। শিল্প-বিপ্লব ও নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি সম্ভব হইল। সুতরাং কারবার স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন গুরুত্ব পাইল। কারবারের স্থান নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল কারখানার স্থান নির্বাচন। কারখানার স্থান নির্বাচনে মুখ্য (**Primary**) বিষয়গুলি হইল: কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক, পরিবহণ, বাজার ইত্যাদি। কারখানা স্থাপনে গৌণ (**Secondary**) বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল: জলবায়ু, আর্থিক সুবিধা, সরকারী নীতি ইত্যাদি।

মুখ্য বা প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কারখানার স্থান নির্বাচনের পূর্বে যে মুখ্য বিষয়সমূহ বিচার করা হয় এই স্থানে তাহা আলোচনা করা হইল:

কাঁচামালের সহজলভ্যতা (Easy Availability of Raw Materials):

কাঁচামাল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে সহজে কাঁচামাল না পাওয়া গেলে কোনও স্থানে কারখানা স্থাপন সহজ নহে। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার সুযোগ না থাকিলে দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিয়া শিল্প গঠন কষ্টকর। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে এবং বাজারে প্রতিযোগিতার শক্তি কমিয়া যায়। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের লৌহ ও ইস্পাত-কারখানগুলি নিকটবর্তী অঞ্চলের কাঁচামালের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রমিক (Labour): শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের আর একটি উপাদান শ্রম। শ্রমিকের সহজলভ্যতা কারখানা স্থাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিক সহজলভ্য হইলে শ্রমিকের মজুরীর হারও কম হয়। শ্রমিকের সহজলভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে সত্য, কিন্তু সেই শ্রমিককে অবশ্যই কার্যের উপযোগী হইতে হইবে।

শক্তি (Power): শিল্পের যন্ত্রপাতি চালনা করিবার জন্য প্রয়োজন শক্তি। শক্তি খনিজ অথবা জলজ হইতে পারে। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় কয়লা, তৈল অথবা জলবিদ্যুৎ পাওয়া গেলে উৎপাদন সহজ হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে। এইজন্য দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই কারখানাসমূহ শক্তির উৎস-স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়। ভারতে শিল্প-সংস্থাসমূহের অধিকাংশই পূর্ব-ভারতের কয়লা,

দক্ষিণ-ভারত এবং পশ্চিম উপকূলের জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানার নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লা অথবা অনুরূপ শক্তি না থাকিলে অন্যান্য অঞ্চল হইতে শক্তি আমদানি করিতে হয়। ফলে পরিবহণ-ব্যয় অধিক হয় এবং দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে।

সুষ্ঠু পরিবহণ (**Good Transport**) ঃ কারখানা যে স্থানে স্থাপিত হইবে সেই স্থানের সহিত কাঁচামাল সববরাহের স্থানের এবং বাজারেব সহিত সুষ্ঠু যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকিলে কারখানার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই কাবণে যে স্থানে সডক, রেল বা নৌ-পরিবহণের সুবিধা থাকে সেই স্থান কারখানা স্থাপনের পক্ষে খুবই উপযোগী।

বাজার (**Market**) ঃ শিল্পের নিকটবর্তী অঞ্চলেই শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার থাকিলে শিল্পগঠন সহজ হয়। সুতরাং বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কারখানার স্থান নির্বাচন করা উচিত। বাজারের নিকটস্থ অঞ্চলে কারখানা স্থাপিত না হইলে দ্রব্য পরিবহণেব ব্যয় অধিক হয়।

জাতীয় স্বার্থ এবং সামরিক গুরুত্ব (**National Interest and Strategic Importance**) ঃ শিল্প-কারখানা স্থাপন করিতে জাতীয় স্বার্থ ও সামরিক গুরুত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। দেশেব নিরাপত্তার কথা বিচাব করিলে দেখা যায় যে, সামরিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা কখনই একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে না। সামরিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ বিকেন্দ্রীভূত হয়। অন্যান্য শিল্পও জাতির সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়।

গৌণ বিষয়সমূহ ঃ

উপরিলিখিত অবস্থাসমূহ প্রধান হইলেও আবও কতকগুলি গৌণ বিষয় কাবখানার স্থান-নির্বাচনে বিবেচনা করা হয়। এইগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

জলবায়ু (**Climate**) ঃ সকল প্রকার শিল্প একই প্রকার জলবায়ুতে গঠন করা সম্ভব নহে। কার্পাস-শিল্পের জন্য প্রয়োজন আর্দ্র জলবায়ু, পশম-শিল্পের জন্য প্রয়োজন শীতপ্রধান অঞ্চল। এই কারণে কার্পাস শিল্প কারখানা পশ্চিম-ভারতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং পশম-শিল্প কারখানা কাশ্মীর, লুধিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

অর্থের যোগান (**Supply of Capital**) ঃ কারখানা এমন অঞ্চলে গড়িয়া উঠে, যেখানে সহজে মূলধনেব যোগান হইতে পারে। শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের প্রধান উৎস ব্যাঙ্ক এবং অর্থ লগ্নি-সংস্থাসমূহ। সুতবাং যে সকল অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এবং অর্থ লগ্নি ব্যবস্থা উন্নত সেই সকল অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া কারখানা গড়িয়া উঠে। অবশ্য একথাও সত্য যে, শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিলেও সেই অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও অর্থ লগ্নি ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে।

জমি (**Land**) ঃ যে অঞ্চলে জমি দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্য অধিক সেই স্থানে কারখানা স্থাপন করা খুবই অসুবিধাজনক। বর্তমানে জমি পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাব ঘটিতে পারে। সুতরাং এমন স্থান নির্বাচন

করা প্রয়োজন, যে স্থানে সহজে জমি পাওয়া যাইতে পারে এবং প্রয়োজনমত ভবিষ্যতে জমির অভাব না ঘটে।

স্থানগত সুনাম (Locational Goodwill) : কোনও শিল্প একটি বিশেষ অঞ্চলে সুনাম অর্জন করিলে ঐ শিল্প সম্বন্ধে সেই স্থানের একটি সুনাম জন্মায়। পরবর্তী সময়ে অনুরূপ কোন কারখানা ঐ স্থানে স্থাপন করিলে উহা ঐ স্থানের সুনামের অংশ পাইতে পারে। ইহাই পরে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার একটি কারণ। আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প সুনাম অর্জন করিয়াছে বলিয়া পরবর্তী সময়ে ঐ স্থানে সুতীবস্ত্র শিল্প কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প কারখানা গঠন সুবিধাজনক।

পরিপূরক শিল্প (Complementary Industries) : কোনও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য নানা প্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। ঐরূপ সম্ভাবনাযুক্ত স্থানে কারখানা গঠন সহজ হয়। এই প্রকারে যে কারখানা গড়িয়া উঠে উহাই পরিপূরক কারখানা।

সরকারী নীতি (Government Policy) : শিল্প-স্থাপনে শিল্পপতিগণের স্থান-নির্বাচনের স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হইয়াছে। বর্তমানে যে কোনও স্থানে ইচ্ছা করিলেই শিল্প-মালিকগণ কারখানা গঠন করিতে পারেন না। দেশের সুষম আর্থিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার শিল্প-স্থাপনের জন্য বিশেষ স্থানের নির্দেশ দিতে পারেন। সরকারের নির্দেশ না মানিলে সরকার কারখানার অনুমোদন বাতিল করিতে পারেন।

কারবারের ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক দিক (Personal and Impersonal Aspects of Business) :

প্রতিটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের কার্য বিশ্লেষণ করিলে দুইটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়—একটি ব্যক্তিক, অপরটি অব্যক্তিক। আমরা সাধারণতঃ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কারবারী প্রতিষ্ঠান উভয়ের মধ্যে যে পৃথক সত্তা আছে, তাহা উপেক্ষা করি। কারবারের মালিক ও কারবারী প্রতিষ্ঠানের সত্তা এক বলিয়া ধরিয়া লই। বিশদভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, কারবারের মালিক ও কারবারী প্রতিষ্ঠান এক নহে। কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে মালিক এবং কারবারী প্রতিষ্ঠান দুইটি পৃথক সত্তা হয়। কারবারের মালিকের ব্যক্তি-সত্তা আছে, কিন্তু কারবারের সেই ব্যক্তি-সত্তা নাই। কিন্তু কারবারী প্রতিষ্ঠান মনে করিলেই কারবারী প্রতিষ্ঠানটির পিছনে যাঁহারা পরিচালনার জন্য দায়ী এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা মনে আসে। বস্তুত যাঁহারা কারবার পরিচালনার জন্য দায়ী তাঁহাদের বাদ দিয়া কারবারের সত্তা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

কারবার স্থাপন করিবার জন্য যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তি কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করেন। যে দ্রব্যসমূহ উৎপাদন অথবা ক্রয় করিতে হয়,

তাহার ব্যবস্থাও তিনিই করেন। এইজন্যই আমরা আপাতদৃষ্টিতে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তাকে কারবারী প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে চাহি না। কিন্তু যখন কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইল তখন কারবারী প্রতিষ্ঠানটিকে কারবারের মালিক হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ কারবারী প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইবার পর উহার দায়-দায়িত্ব-সম্পদ সকলই প্রতিষ্ঠানের, মালিকের নহে। কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের নিজের নামেই উহা পরিচিত হয়। তখন কে মালিক সেকথা কেহ বিবেচনা করে না।

কারবার অর্থে কতকগুলি সামাজিক কার্যকলাপের সমষ্টিকে বুঝায়। ইহা একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কারবারী হইল কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। সুতরাং কারবার ও কারবারী এক কথা নহে। কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই কারবারের ব্যক্তিক দিক (Personal Aspect) এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কার্যকলাপ কারবারের অব্যক্তিক দিক (Impersonal Aspect)। সুতরাং প্রত্যেক কারবারেরই ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক দিক রহিয়াছে। কারবারের মাধ্যমে একদিকে মালিকের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অন্যদিকে যেহেতু কারবারী প্রতিষ্ঠান একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সেইহেতু কারবারের দ্বারা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মুনাফা অর্জনের প্রেরণাই কারবারের মূল ব্যক্তিক দিক।* সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, উন্নত জীবনযাত্রা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন ইত্যাদি কারবারের ব্যক্তিক দিক বলিয়া বিবেচিত হয়। মুনাফা অর্জন ব্যক্তিগত উৎসাহের উদ্দীপক ও সঞ্জীবনী সুধা—ব্যক্তিগত সাফল্যের মাপকাঠি।

কারবারী সামাজিক জীব। সমাজের অভ্যন্তরেই তাহার কারবার। সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটান এবং সামাজিক কল্যাণ সাধন ও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়াই কারবারের অব্যক্তিক দিক নিরূপিত হয়।

কারবারের ব্যক্তিক দিকগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :

(ক) কারবার মালিকের জীবিকার সংস্থান করে এবং মালিক ও তাহার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটায়।

(খ) কারবার মালিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

(গ) মুনাফা বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে; ফলে মালিকের সৌভাগ্য দেখা দেয়।

(ঘ) কারবারের ফলে মালিকের ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) কারবার মালিককে বিত্তবান বা সম্পদশালী করিয়া তোলে।

(চ) কারবারের ফলে মালিকের সামাজিক মর্যাদা (Social Status) বৃদ্ধি পায়।

(ছ) কারবারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করাও ব্যক্তিক দিক।

কারবারের অব্যক্তিক দিকগুলি হইল :

(ক) কারবারী কার্যকলাপের ফলে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসা তথা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটে।

(খ) কারবারী কার্যকলাপের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

(গ) কারবারী কার্যকলাপে মূলধনের গতি সঞ্চার (Mobility of Capital) হয়।

(ঘ) কারবারী কার্যকলাপের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়।

(ঙ) কারবার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে।

(চ) কারবারী কার্যকলাপে বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

(ছ) বড় বড় কারবার গবেষণা-কার্যের সুযোগ তৈয়ারী করে ; গবেষণার ফলে নূতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-কৌশল আবিষ্কৃত হয় এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

(জ) কারবারের আয়তন বৃদ্ধির ফলে অধিক উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটে ; সুতরাং কারবারের আয়তন বৃদ্ধিতে একদিকে ব্যক্তিক ও অন্যদিকে অব্যক্তিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়।



এই আলোচনা হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, কারবারী এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানের সত্তা পৃথক। কারবারী একজন ব্যক্তি, যে মূলধন বিনিয়োগ, ঝুঁকি বহন, পরিচালনা ও মুনাফা ভোগ করে এবং এই দিক হইতে কারবারী সংস্থাপক ও কর্মচারিগণ হইল কারবারের ব্যক্তিক দিক। কারবারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারবারের কার্যকলাপ চলে। কারবারী প্রতিষ্ঠানটি ও তাহার কার্যকলাপ কারবারের অব্যক্তিক দিক।

সামাজিক দায়িত্ব কাহাকে বলে ? (What is Social Responsibility ?) :

কারবারের "সামাজিক দায়িত্ব" একটি বিতর্কিত ধারণা। ডঃ মিলটন ফ্রীডম্যানের মতে "কারবারের সামাজিক দায়িত্বের কথা একেবারে অর্থহীন"। সামাজিক দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তির থাকে কারণ ব্যক্তির অনুভূতি থাকে। কারবার কোন ব্যক্তি নহে,

তাহার কোন অনুভূতি নাই। সুতরাং তাহার কোন সামাজিক দায়িত্বও নাই। অপরদিকে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, কারবারের শুধু যে সামাজিক দায়িত্ব আছে তাহা নহে, ইহা অত্যন্ত ব্যাপক। কারবারের সামাজিক দায়িত্ব বলিতে কারবারীর সামাজিক দায়িত্বকে বুঝায়। ব্যবস্থাপকগণ কারবারের হইয়া সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। **সমাজে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত রীতি-নীতি ও কার্যকলাপ মানিয়া কারবারী-কার্যকলাপ চালনা করাকে কারবারের সামাজিক দায়িত্ব বলে।** এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে ব্যবস্থাপকগণ যাঁহারা উৎপাদনের উৎস ও ধারক (Custodians) তাঁহাদের সামাজিক দায়িত্ব হইতেছে এমন নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা যাহা সামাজিক উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। কারবার সামাজিক পদ্ধতির একটি অঙ্গ। সুতরাং কারবারের সকল সিদ্ধান্ত বৃহত্তর সামাজিক পদ্ধতির (Social System) অনুকূল হইতে হইবে। ব্যবস্থাপকগণ সামাজিক দায়িত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধকে কারবারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম উপকরণ (Input) হিসাবে গণ্য করিবেন। ইহাই সামাজিক দায়িত্বের প্রকৃত ধারণা। সুতরাং বর্তমানে কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীল উপকরণগুলি হইল সংগঠন, অর্থনীতি, কলাকৌশল এবং সামাজিক দায়িত্ব। সীমিত সম্পদ ও বহুতর উদ্দেশ্যের মধ্যে সুষম ভারসাম্য আনয়ন করাই কারবারের সামাজিক দায়িত্ব।

কারবারের সামাজিক দায়িত্বসমূহ (Social Responsibilities of Business) :

"Business of business is to do business"—ব্যক্তিগতভাবে সকল কারবারীর উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। কারবার করিতে হইলে মূলধন যোগাইতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয়। মূলধন ও পরিশ্রমের বিনিময়ে কারবারী মুনাফা আয় করিতে আগ্রহী। ইহাই স্বাভাবিক। নিজের কারবারে মূলধন না খাটাইয়া অপরকে সেই মূলধন খাটাইবার সুযোগ দিলে সে সুদ আয় করিতে পারে। সে নিজের পরিশ্রম কারবারে ব্যয় না করিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিলে অর্থাৎ চাকুরী গ্রহণ করিলে আয় করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনধারণের জন্য আয় প্রয়োজন। সুতরাং যদি নিজের পরিশ্রম কারবারে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে কারবার হইতে আয় গ্রহণ করা অনুচিত নহে। কারবার যদি মুনাফা না করিতে পারে তাহা হইলে কারবারী নিজে কোথা হইতে আয় করিবে? সুতরাং মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলে কেহ কারবারে লিপ্ত হইত না। পরোপকার অথবা আত্মিক সন্তুষ্টির জন্য কেহ কারবার করে না।

Peter Drucker-এর মতে **প্রধানতঃ চারটি কারণে মুনাফা অর্জন আবশ্যক**, যেমন—

(১) মুনাফার দ্বারা কারবারের কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায় ;

(২) মুনাফা ঝুঁকি বহন করিতে প্রেরণা দেয় :

(৩) **মুনাফা হইলে তবেই মুলধনের পুনর্বিনিয়োগ সম্ভব হয়** এবং
(৪) **মুনাফা অর্জন কারবারী উদ্যোগের উৎসাহ-উদ্দীপক।**

মুনাফা অর্জন কারবারের উদ্দেশ্য হইলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যদি মুনাফা অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কারবারী সৎ অথবা অসৎ, যে কোন উপায়েই মুনাফা অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে এবং যত অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব তাহারই চেষ্টা করিবে। মুনাফা অর্জনকে কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া কোনও সমাজ মানিয়া লইতে পারে না। যদি মুনাফা অর্জনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদারদের সমাজে অপাংক্তেয় বলিয়া ধরা হইত না। তাহাদের কার্য কারবারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ তাহাদের কার্য যে কোন উপায়ে মুনাফা অর্জন করা। জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই তাহারা মুনাফা অর্জন করিতে প্রয়াসী। আইনও ইহাদের কার্যকলাপকে স্বীকার করে না এবং ইহাদের কার্যকে বে-আইনী বলিয়া গণ্য করে।

মুনাফা না হইলে কারবার করা নিরর্থক—ইহা সত্য। যতদিন মুনাফা হইবে ততদিনই কারবার বাঁচিয়া থাকিবে। মানুষের যেমন জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, কারবারকেও টিকিয়া থাকিতে হইলে মুনাফা প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করিলে যেমন শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, তেমনি কোনও কারবার যদি কেবল আর্থিক মুনাফা আয় করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই কারবারও অচিরে অসুস্থ বা পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

কারবারের উদ্দেশ্য যখন কেবল মুনাফা অর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাহা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কবিতে পারে যাহা জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে। এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের গুণাগুণের দিকে নজর থাকে না এবং দ্রব্যের উৎকর্ষ বিধানের দিকেও নজর থাকে না। কোন্ দ্রব্য কোন্ সময়ে সরবরাহের প্রয়োজন সে বিষয়ে লক্ষ্য থাকে না, কি উপায় অবলম্বন করিলে দ্রব্যের মূল্য কমা‍ন যায় সেদিকেও নজর থাকে না। কেবল উদ্দেশ্য দাঁড়ায় মুনাফা অর্জনের।

মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্য যখন প্রবল হয় তখন কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া মুনাফা বাড়ানও এক প্রকার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায়। এমত অবস্থায় শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া মুনাফা-স্ফীতির দিকে নজর দেওয়া হয়। ফলে শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা দেয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় থাকে না।

ক্রমশ কারবারী নিজের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। ধীরে ধীরে কারবারটি সমাজের সকল শ্রেণীর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় কারবার অধিক দিন চলিতে পারে না।

প্রত্যেক কারবারীকে মনে রাখিতে হইবে যে, সে নিজে একজন ভোগকারী (Every businessman is a consumer)। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সে একা উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে অপর উৎপাদকের উপর নির্ভর করিতে হয়।

যদি সে অপরকে ঠকাইতে চায় তাহা হইলে সে নিজেও ঠকিবে (If he cheats others, he will be cheated by others)।

কারবারী সমাজের অঙ্গ। সামাজিক ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে চলে তাহার জন্য প্রত্যেক দেশেই সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেন এবং আইনের দ্বারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। দেশ পরিচালনার জন্য সরকারের ব্যয় হয়। সেই ব্যয় কর (tax) দ্বারা পূরণ করা হয়। কারবারীকে কর দিতে হয়। যদি সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ন না করিতেন তাহা হইলে কাহারও পক্ষে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করা সম্ভব হইত না। কারবারীর পক্ষেও কারবার পরিচালনা করিয়া আয় করা অসম্ভব হইত। সুতরাং দেশ পরিচালনার জন্য সরকারকে কর দেওয়া কারবারের সামাজিক কর্তব্য।

প্রত্যেক কারবারীকে আয়ের অনুপাতে কর দিতে হয়। কিন্তু এমন অনেক কারবারী আছে যাহারা কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে হিসাবপত্রে কারচুপি করে। এই কারবারীর উপর জনসাধারণের সহানুভূতি থাকে না এবং ইহা সামাজিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

কারবারের উদ্দেশ্য ভোগকারীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে সঠিক সময়ে সরবরাহ করা। কিন্তু যখন কারবারীর মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করাই হয়, তখন সে ভোগকারীর স্বার্থের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতে পারে না। তখন সে নিকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করিয়াও মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়াস চালায়। এই সকল কারণেই কারবারী জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এল. এফ. আরউইক (L. F. Urwick)-এর মন্তব্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আরউইক (Urwick) বলিয়াছেন, **"Profit can be no more the objective of a business than eating is the objective of living."** অর্থাৎ জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন একমাত্র ভোজন নহে, সেইরূপ কারবারের উদ্দেশ্যও কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন নহে। অধ্যাপক পিটার ড্রাকারের (**Peter Drucker**) মতে, "মুনাফা অর্জন দ্বারা কারবারের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয় না, কারবারের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়।"

মানুষের শরীর ধারণের জন্য যেমন আহার প্রয়োজন, কারবার অব্যাহত রাখিতে হইলে তেমনি মুনাফা করা প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ যদি লোভের বশবর্তী হইয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে তাহা হইলে সে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহার জীবন বিপন্ন হয়। সেইরূপ কারবারী যদি কেবল মুনাফা অর্জনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে সেও লোভের বশবর্তী হইয়া কাজ করে এবং ফলে সমাজের নানাদিক হইতে আঘাত পায়। শেষ পর্যন্ত তাহাকে কারবার গুটাইয়া লইতে হয়।

সুতরাং কারবারের উদ্দেশ্য কেবল মুনাফা অর্জন করাই হইতে পারে না। কারবারী একজন সামাজিক জীব। তাহাকে সমাজের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সমাজের প্রতি কর্তব্য বলিতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর প্রতি তাহার কর্তব্যকে বুঝায়। কারবার করিতে হইলে মূলধন, শ্রম ইত্যাদির প্রয়োজন। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে, শ্রম সরবরাহ করে তাহাদের প্রতিও কারবারীর কর্তব্য রহিয়াছে।

শ্রমিক যদি তাহার জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরী না পায় তাহা হইলে সে কোনমতেই সুষ্ঠুরূপে জীবনযাপন করিতে পারে না। শ্রমিকের শরীর ও মন যাহাতে সুস্থ থাকে, তাহার প্রতি কারবারীর লক্ষ্য রাখিতে হয়। শরীর ও মন তখনই সুস্থ থাকে, যখন শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান ও মনের স্ফূর্তি বজায় রাখিবার মত প্রয়োজনীয় আয় থাকে। কারবারীর কর্তব্য শ্রমিককে ন্যায্য মজুরী দেওয়া। যদি শ্রমিক ন্যায্য মজুরী না পায় তাহা হইলে সে শীঘ্রই কার্যে অপটু ও অদক্ষ হইবে। দক্ষতা বজায় রাখিতে হইলে শ্রমিকের প্রয়োজন শরীরের সামর্থ্য এবং মনের স্ফূর্তি।

শ্রমিক যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিয়া তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারে সেইদিকে কারবারীর নজর রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ শ্রমিককে তাহার ন্যায্য মজুরী দেওয়া প্রয়োজন। যদি শ্রমিককে ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে শ্রমিক কখনও দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারিবে না। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দেওয়া কারবারীর একটি সামাজিক কর্তব্য।

কারবারে কাঁচামালের প্রয়োজন। শ্রমিককে যেমন ন্যায্য মজুরী দেওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ কাঁচামাল উৎপাদনকারীকেও ন্যায্যমূল্য দেওয়া প্রয়োজন। ন্যায্যমূল্য না পাইলে কাঁচামাল উৎপাদক উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল উৎপাদন করিবে না। ফলে কাঁচামালের অভাব দেখা দিতে পারে, অথবা নিকৃষ্ট মানের কাঁচামাল উৎপাদিত হইতে পারে। কাঁচামালের অভাব হইলে কারবারীর পক্ষে দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন সম্ভব হইবে না। সুতরাং কাঁচামালের উৎপাদককে উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য দিলেই তাহার উপর কারবারীর সামাজিক কর্তব্য পালন করা হয়। ঠিক সময়ে পাওনাদারকে তাহার পাওনা মেটানো সামাজিক দায়িত্ব।

কারবারের জন্য প্রয়োজন মূলধন। মূলধন গঠন সমাজের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি-বিশেষে অধিকাংশ লোকই তাহার আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ই নানাবিধ উপায়ে কারবারে খাটান হয়। সঞ্চয় দ্বারা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যায়। কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া অপরের সঞ্চয় কারবারে খাটায়। আবার কেহ সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। কারবারী প্রয়োজন অনুসারে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কারবারে খাটাইতে পারে।

বড় বড় কোম্পানী যখন শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে তখন শেয়ার-ক্রেতাদের শেয়ারের মূল্য অনুসারে লভ্যাংশ দিতে হয়। যদি লভ্যাংশ আশানুরূপ না হয় তাহা হইলে কেহ শেয়ারপত্র ক্রয় করিবে না। কিংবা শেয়ার ক্রয় করিবার পর যদি লভ্যাংশ আশানুরূপ না হয় তাহা হইলে সে শেয়ারপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। সমাজের সঞ্চয়কে উৎপাদনমুখী করিতে হইলে সঞ্চিত অর্থের উপর ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। যদি সঞ্চয়কারী মুনাফার ন্যায্য অংশ না পায় তাহা হইলে দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে কারবারে মূলধনের অভাব ঘটিবে। সুতরাং দেশে যাহাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং সঞ্চিত অর্থ যাহাতে উৎপাদনে প্রয়োগ করা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থনীতিতে এবং কারবারীশাস্ত্রে সঞ্চিত অর্থ

যখন কারবারে ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে মূলধন বলা হয়। সেই মূলধনের ব্যবহারের জন্য কারবারীকে যে মূল্য দেওয়া হয়, তাহাকে 'মূলধনের আয়' (Return on Capital) বলা হয়। যখন সেই মূল্য ন্যায্য বলিয়া গণ্য হয়, তখন উহাকে 'ন্যায্য মূলধনের আয়' (Fair Return on Capital) বলা হয়।

কারবার সমাজের অঙ্গ। এই কারণেই কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত হারে সরকারকে কর প্রদান করিতে হয়। কর ফাঁকি দিয়া মুনাফার পরিমাণ বাড়াইলে তাহা বেআইনী এবং আইনতঃ দণ্ডনীয়। সরকারকে কর ফাঁকি না দেওয়া এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত কর নিয়মিত শোধ করা কারবারের কর্তব্য।

উপরের আলোচনা হইতে একথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, কারবারীর মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা করা এবং মুনাফা দ্বারা নিজের ও পরিজনদের ভরণ-পোষণ করা। কিন্তু একথাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, মুনাফা অর্জন করাই কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কারবার দ্বারা কারবারী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে পারে। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানও কারবারের দায়িত্ব।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে একীভূত করিতে হইবে। অর্থাৎ কারবারীর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থকে যদি সমন্বিত করা না হয়, তাহা হইলে কারবারী তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যকেও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিবে না। কারবারীকে মনে রাখিতে হইবে যে 'প্রতিবেশীকে ভিক্ষুক করিবার নীতি' ('Rob the Neighbour Policy') গ্রহণ করিলে সে নিজেও ভিক্ষুকে পরিণত হইতে পারে।

কারবারের সামাজিক দায়িত্বগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

১। উপযুক্ত সময়ে এবং নায্যদামে উৎকর্ষ ও মানসম্পন্ন দ্রব্য সম্ভোগকারীকে সরবরাহ করা ;

২। চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করা ;

৩। নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

৪। কারবারের পরিধি বিস্তৃত করিয়া ও পণ্যের প্রাচুর্য ঘটাইয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের পথ সুগম করা ;

৫। শ্রমিক-কর্মচারিগণকে উপযুক্ত ও ন্যায্য বেতন প্রদান করা ;

৬। কারখানা ও কর্মস্থলে উপযুক্ত ও মনোরম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ;

৭। কর্মচারীর চাকুরীর স্থায়িত্ব রক্ষা করা ;

৮। শ্রমিক-কর্মচারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করা ;

৯। শ্রমিক-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ;

১০। শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়া তাহাদের উন্নতির পথ সুগম করা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করা ;

১১। সুলভ ক্যান্টিনের মাধ্যমে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা ;

১২। এমনভাবে কারবারী নীতি প্রণয়ন করা যাহাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় ;

১৩। কারবারের সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তির একটি অংশ। সুতরাং কারবারের সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করাও সামাজিক দায়িত্ব ;

১৪। সরকারকে উপযুক্ত সময়ে সঠিক পরিমাণ কর বা ট্যাক্স প্রদান করা ;

১৫। সরকারী আইন ও নির্দেশ মানিয়া চলা ;

১৬। সম্ভোগকারী ও পাওনাদারগণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া ;

১৭। আবহাওয়া দূষিতকরণ যাহাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ;

১৮। পাওনাদারগণকে সঠিক সময়ে পাওনা অর্থ প্রদান করা ;

১৯। সমাজের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মিউজিয়াম, কারিগরী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থাকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা ;

২০। কারবারী রীতি-নীতি মানিয়া চলা ;

২১। রাস্তাঘাট দখল করিয়া যেখানে সেখানে দোকান বা কারখানা গড়িয়া না তোলা।

বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি কারবারের দায়িত্ব (Responsibilities of Business towards different parties) ঃ

কারবার আর্থিক বনিয়াদের উপাদান এবং আর্থিক বনিয়াদ সমাজের একটি অঙ্গ। সামাজিক দায়িত্ব বাদ দিয়া কারবার করা যায় না। কোম্পানী আইনের প্রধান প্রবর্তক ডি. এম. মজুমদার হইতে আরম্ভ করিয়া সাচার কমিটির সভাপতি রাজিন্দর সাচার পর্যন্ত সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কারবারের সামাজিক দায়িত্ব এখন একটি স্বীকৃত নীতি। সরকারী ও বেসরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম জনস্বার্থের অনুকূল হইতে হইবে।

পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় কারবারের সামাজিক দায়িত্ব বিনিয়োগকারী, কর্মচারী, পাওনাদার, ক্রেতা এবং সরকার ও সমাজের দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। বিবর্তিত পরিস্থিতিতে কারবার বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইয়া সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। কারবারের দায়িত্ব বলিতে আমরা কারবারীর এবং কারবারের ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ব বুঝাইতেছি।

বিনিয়োগকারিগণের প্রতি দায়িত্ব ঃ

(১) মূলধনের উপর ন্যায্যহারে লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা ;

(২) উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া নীট মুনাফা বৃদ্ধি করা ;

(৩) বিভিন্ন কার্যের দক্ষতাপূর্ণ সম্পাদনের মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়া ও কোম্পানীর সুনাম বৃদ্ধি করা ;

(৪) কারবারের সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।

কর্মচারিগণের প্রতি দায়িত্ব ঃ

(১) উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন ও যোগ্য কর্মচারীর কাজের প্রশংসা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা ;

(২) কর্মচারীবৃন্দকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করিয়া তোলা ;

(৩) কর্মচারীকে ন্যায্য মজুরী প্রদান করা ;

(৪) চাকুরীর স্থায়িত্ববিধানের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ;

(৫) উপযুক্ত ও মনোরম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ও কর্মচারীদের মনে কর্মসন্তুষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক তুষ্টি আনয়ন করা ;

(৬) কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ মিটাইবার সৎ প্রচেষ্টা করা এবং সুমধুর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা ;

(৭) শ্রমিক সংঘের সহিত অনুকূল সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া কারবারের সহিত শ্রমিকগণের সৌহাদ্য বজায় রাখা ,

(৮) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

(৯) শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ।

পাওনাদারগণের প্রতি দায়িত্ব ঃ

(১) পাওনাদারগণকে দেয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা ;

(২) পাওনাদারগণের সহিত সমআদর্শের ভিত্তিতে সৌজন্যতা ও সততার সহিত লেনদেন করা ;

(৩) উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাওনাদারগণের সক্রিয় ভূমিকাকে অনুমোদন করা ,

(৪) গবেষণালব্ধ ফলাফল পাওনাদারগণকে বিতরণ করিয়া দেশীয় কাঁচামালের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা ।

ক্রেতার প্রতি দায়িত্ব ঃ

(১) উপযুক্ত মানের দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ে ও ন্যায্য দামে যোগান দেওয়া ;

(২) দ্রব্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা ;

(৩) প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতার বৈচিত্র্যমূলক চাহিদা মিটাইবার জন্য আধুনিক ও বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন করা ;

(৪) গবেষণার মাধ্যমে পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া ক্রেতার কল্যাণসাধন করা ;

(৫) সম্ভোগকারীর অভাব-অভিযোগে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দেওয়া ।

সরকার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ঃ

(১) সরকারকে দেয় কর সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে প্রদান করা ;

(২) জাতীয় সংহতি রক্ষা করা ,

(৩) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়িয়া তোলা অথবা ইহাদের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করা ;

(৪) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক অসাম্য দূর করা ;

(৫) উন্নত কারিগরি জ্ঞান, শিক্ষা ও মেধার ক্রমোন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রসঙ্গত টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা ইত্যাদির কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে ;

(৬) কারবার পরিচালনার উপযুক্ত ব্যবহার-বিধি স্থির করা ;

(৭) সরকার-প্রণীত বিভিন্ন সামাজিক ও শ্রমিক আইনের নির্দেশ মানিয়া চলা ;

(৮) সামাজিক উন্নয়নে নূতন নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

(৯) বড় বড় শহরের, যেমন, শহর কলিকাতার রাস্তা ও ফুটপাথে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ দোকান খুলিয়া জনসাধারণের পথ চলায় অসুবিধা সৃষ্টি করে। পাড়ায় পাড়ায় বাসস্থানের আশেপাশে বেআইনীভাবে ছোট ছোট কারখানা, স্প্রে পেইন্টিং, গমকল স্থাপন, ইত্যাদির মাধ্যমে আবহাওয়া দূষিত করে। ইহা সামাজিক দায়িত্বহীনতার পরিচয়।

ভারতীয় কারবার কতখানি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে? (How far do Indian Businesses discharge Social Responsibilities?) :

সনাতন ব্যবস্থাপনায় কারবারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা এবং এই কারণে ব্যবস্থাপকগণ মুনাফা সর্বাধিকীকরণের (Profit maximisation) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র মুনাফা সর্বাধিকীকরণ করিলেই তার দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করা হয় না। সমাজের প্রতি তাহাকে কর্তব্য পালন করিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপনা এই দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। তাহারা এখনও মালিকের বা বিনিয়োগকারীর প্রতি দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট। মুনাফা সর্বাধিকীকরণ (Profit maximisation) এবং সম্পদ সর্বাধিকীকরণ (Wealth maximisation) এই দুইটি কর্তব্য পালনে ব্যবস্থাপকগণ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার মনোভাবও কিছুটা নমনীয় বটে ; বিভিন্ন শ্রমিক সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিক সংঘ ও যৌথ দরকষাকষি প্রথার উদ্ভবের পর এই দায়িত্ব পালন করিতে ব্যবস্থাপকগণ বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু পাওনাদারদের প্রতি তাঁহাদের যে কর্তব্য সেই কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা পালন করেন না। সম্ভোগকারীদের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক আইন যেমন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (Essential Commodities Act) ইত্যাদি চালু হইবার পর আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে এই দায়িত্ব কিয়দংশে পালিত হইতেছে। সরকার ও সমাজের প্রতি যে বিরাট দায়িত্বভার ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণ করিতে হয় তাহার অধিকাংশই ব্যবস্থাপকগণ পালন করেন না। সামাজিক ব্যয়ের (Social Cost) ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ কর প্রদানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা অনিচ্ছুক।

দ্বিতীয় অধ্যায় | কারবারের প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি (Nature and Scope of Business)

কারবারের বিভিন্ন অর্থ (Various Meaning of Business) :

সাধারণভাবে কারবার ও ব্যবসায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'কারবার' কথাটির অর্থ ব্যাপক। কারবার বলিতে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-সহায়ক সকল প্রকার কার্যকেই বুঝায়। ব্যবসা কারবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ইংরাজী Business শব্দটির বাংলা অর্থ হইল কারবার। কারবারী কর্মে লিপ্ত থাকিবার অবস্থাকে কারবার (Business) বলা যায়। মানুষের চাহিদা অসীম। প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকিয়া অর্থ উপার্জন করে। বর্তমানে অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) এবং বিশেষীকরণ (Specialisation) আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। কোন ব্যক্তি একটি বিশেষ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থের বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়-সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার কার্যাবলী কারবারের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসা বলিতে আমরা ক্রয় ও বিক্রয়কার্যকে বুঝিয়া থাকি। যে ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়কার্যে লিপ্ত থাকিতে দেখি, তাহাকেই আমরা ব্যবসায়ী বলি। কিন্তু কোন ব্যক্তি একখানা গাড়ী কিনিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিবার পর উহা বিক্রয় করিল। ইহাকে ব্যবসা বলা হয় না। যখন কেহ কোনও দ্রব্য অথবা কতিপয় দ্রব্য পৌনঃপুনিক ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন সেই কার্যকে আমরা ব্যবসা বলিয়া থাকি। কারণ পৌনঃপুনিক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই সে ব্যক্তি আয় করে। তাহার এই আয়কে আমরা মুনাফা বলি। যখন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়কার্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাহার কার্যকে ব্যবসায়িক কার্য বলিয়া থাকি এবং সেই ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করে, সেই প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায় সংস্থা বলা হয়।

বিক্রেতা কর্তৃক উৎপাদিত এবং অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করা পণ্য ও সেবার পৌনঃপুনিক বিক্রয়কে কারবার বলা হয় ("Business may be defined as recurring sales of those goods and services which are either produced by the seller or purchased from others in the given form."—Prof. S. S. Chatterjee)। মানুষের যে কার্যকলাপ দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে লিপ্ত থাকে অথবা যে কার্যকলাপ মূল্যের বিনিময়ে সেবা পরিবেশন করে, তাহাকেই কারবার বলে (Prof. Norman Richard Owens)। প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ, শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উহাদের রূপান্তরকরণ, মজুতকরণ, বীমাকরণ এবং ভোক্তার নিকট পণ্যসামগ্রী পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত কার্যাবলীকে কারবার বলা হয় (Prof. Haney)।

এল. এফ. আরউইক (L. F. Urwick)-এর মতে কারবার একটি প্রতিষ্ঠান যাহা দ্রব্য ও সেবা প্রস্তুত ও বণ্টন করে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হয়। অধ্যাপক হাণ্ট (Hunt)-ও এই অভিমত প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক এম. সি. শুক্লা (Prof. M. C. Shukla) অর্থনৈতিক দিক হইতে কারবারের সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে দিয়াছেন : কারবার হইল ধনোৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষের যে কোন কাজ, প্রচেষ্টা ও আচরণ।

তিনি কার্যকারিতা বা ক্রিয়াগতভাবে কারবার বলিতে মানুষের সেই সকল কার্যকলাপকে বুঝাইয়াছেন, যাহা পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত থাকিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যকে সফল করে।

সুতরাং কার্যকারিতার দিক হইতে কারবার বলিতে বুঝায় সেই সকল কার্যকলাপ, যাহা উপযোগিতা সৃষ্টি করে এবং এই সকল উপযোগিতা পুনঃপুনঃ বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের অভাব দূর করে। এককথায় **মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে, ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এবং সেবা পরিবেশন করে, সেই সকল কার্যকলাপকে কারবার বলে।**

শিল্পীয় অথবা উৎপাদন কার্যকলাপ, ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সমষ্টিকে কারবারী কার্যকলাপ বলা যায় এবং এই সকল সৃজনধর্মী সম্পদ সৃষ্টিকারী অথবা সম্পদ বণ্টনকারী কার্যকলাপের যে কোন একটি কার্যে ব্যাপৃত থাকাকে কারবার বলে। সুতরাং **কারবার = উৎপাদন কার্যাবলী এবং/অথবা ক্রয়-বিক্রয় কার্যাবলী এবং/অথবা বাণিজ্যিক কার্যাবলী।** সুতরাং কারবার কথাটি উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-সহায়ক কার্যাবলীর সমষ্টিগত অথবা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে (total approach) ব্যবহৃত হয়।

B (Business) = কারবার ধরিলে,
I (Industry) = শিল্পীয় কার্যকলাপ ধরিলে,
T (Trade) = ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ধরিলে,
C (Commerce) = বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ধরিলে,
এবং Σ = সমষ্টি ধরিলে—

$B = \Sigma I + \Sigma T + \Sigma C.$

কারবারের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Business) :

আর্থিক অভাব মোচনের অভিন্ন উদ্দেশ্যেই মানুষ কারবারী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়। একদিকে পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং অন্যদিকে উহাদের বণ্টন ও বিনিময়ই হইল কারবারের প্রকৃতি। কারবারের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হইল :

(১) শিল্পীয় কার্যকলাপ ;
(২) ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যকলাপ অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময় ;

(৩) সহায়ক কার্যকলাপ যেমন, ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহণ, বিজ্ঞাপন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি। কারবারের প্রকৃতি ও পরিধি হইল :

(ক) **উপযোগিতা সৃষ্টি :** কারবারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বস্তুতঃ, ইহা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার্য। কারবার বিভিন্ন প্রকার উপযোগিতা সৃষ্টি করে। মূলধন, শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামালকে রূপান্তরিত করিয়া ইহা রূপগত উপযোগিতা (form utility) সৃষ্টি করে। আবার উৎপাদিত পণ্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের মাধ্যমে ইহা স্থানগত উপযোগিতা (place utility) সৃষ্টি করে। ক্রেতা ও উৎপাদকের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কারবার ব্যক্তিগত বাধা দূর করে ; যথাসময়ে দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে ইহা সময়গত উপযোগিতা সৃষ্টি করে (time utility)। কারবার বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া মানুষের নানাবিধ অভাব পূরণে সাহায্য করে। ইহা বাসস্থান, আহার, পরিচ্ছদ, কর্মসংস্থান, যাতায়াত ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রায় সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক, অর্থসংস্থান, পরিবহণ, বীমা, বিজ্ঞাপন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বাণিজ্যিক কার্যকলাপও কারবারের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এককথায় উৎপাদন হইতে বণ্টন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যকলাপ কারবারী কার্যকলাপের পরিধি নির্দেশ করে।

(খ) **ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা :** ক্রয়-বিক্রয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার জন্য কারবার পুনঃপুনঃ ক্রয়-বিক্রয় কার্যে লিপ্ত থাকে। বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল ক্রয় করিয়া যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় এবং সেই দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কারবার মুনাফা অর্জন করে।

(গ) **গতিশীলতা :** চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারবারী কার্যকলাপের পরিবর্তন আসে। রুচি ও পছন্দ মানুষের অভাবের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। ফলে কারবারী কার্যকলাপে বৈচিত্র্য আসে।

(ঘ) **মুনাফা :** সকল কারবারের প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষ মুনাফা অর্জনের অভিপ্রায়ে কারবারী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সুতরাং দ্রব্য ও সেবা পরিবেশনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন কারবারের প্রকৃতি ও পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) **বিনিময় :** কারবার উৎপাদনে অথবা বণ্টনকার্যে লিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সুবিধার জন্য কারবার দ্রব্য ও সেবার বিনিময় ঘটায়। বিনিময়ের মাধ্যমেই উপযোগিতা সৃষ্টি হয় ও মুনাফা অর্জিত হয়।

কারবারের কার্যকলাপ (Functions of Business) :

সাধারণভাবে কারবারী কার্যকলাপকে দুইভাগে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন—

(১) **শিল্পীয় কার্যকলাপ বা মুখ্য কার্যাবলী,** যেমন, উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যাবলী।

(২) **বাণিজ্যিক কার্যাবলী বা সহায়ক কার্যাবলী**, যেমন, পণ্য মজুতকরণ, বিজ্ঞাপন, পরিবহণ, বীমা ইত্যাদি।

কারবারের বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) **উৎপাদন কার্য (Production)** : যে সকল কারবার শিল্পে নিযুক্ত, উৎপাদন করা তাহাদের মুখ্য কাজ। কাঁচামালকে বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকারগত উপযোগিতা (form utility) সৃষ্টি করাই উৎপাদনের উদ্দেশ্য। ইহাতে বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হয়। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা যায় এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি সংরক্ষণের জন্য মেরামতিরও প্রয়োজন হয়।

(২) **ক্রয়কার্য (Purchase-Function)** :

কারবার শিল্পই হোক কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যই হোক, ক্রয়কার্য অনিবার্য। কারবার যদি শিল্প হয় তাহা হইলে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়। নতুবা উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ছোট কারবার হইলে মালিক নিজেই ক্রয়কার্য করেন। কিন্তু কারবার যদি বৃহদাকার হয় তাহা হইলে ক্রয়-বিশেষজ্ঞ (Purchase specialist) নিয়োগ করা যাইতে পারে। যাহারা খুচরা ব্যবসায়ী (Retailer) তাহাদের মধ্যে যে যত কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তাহার প্রতিযোগিতার শক্তি ততই বেশী হয়। কারণ বিক্রয়মূল্য প্রতিযোগীর সহিত সমান রাখিলে সে অধিক লাভ করিতে পাবে।

ক্রয়কার্যে সর্বদা কারবারীকে নজর রাখিতে হয়, যাহাতে অযথা অবিক্রীত সম্ভার (Unsold stock) অধিক জমা না হয়। এই অবস্থায় কারবারীকে অধিক দিন দ্রব্য মজুত করার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করিতে হয়। মজুত দ্রব্য অধিক দিন অবিক্রীত থাকিলে দ্রব্যের গুণহানিও হইতে পারে। এমনও সম্ভাবনা থাকে যে, মজুত দ্রব্য বিক্রয় হইবার পূর্বেই ক্রেতার রুচির পরিবর্তন হইল। এক্ষেত্রে কারবারীকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়।

বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানে ক্রয় কেন্দ্রীভূত হয়, সেই কারণে সেইসব কারবারে ক্রয়-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করাই রীতি। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিক নিজেই ক্রয় করে।

ক্রয়-বিভাগ যদি তৎপরতার সহিত দ্রব্য যোগান দিতে না পারে তাহা হইলে বিক্রয়-বিভাগ সুষ্ঠুভাবে বিক্রয়কার্য করিতে পারে না। সুতরাং ক্রয়-বিভাগকে বিক্রয়-বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতে হয়।

(৩) **বিক্রয়কার্য (Sales Function)** :

বিক্রয়কার্য কারবারের একটি প্রধান কার্য এবং উহার সহিত সাধারণের পরিচয় সর্বাধিক। বিক্রয়কার্য দ্বারা কারবারী দ্রব্যের স্বত্ব উপযোগ (Possession utility) তৈয়ারী করে। যখন কোন দ্রব্য বিক্রয় হয় তখন সেই দ্রব্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট

হস্তান্তরিত হয়। বিক্রয় দ্বারাই স্বত্ব উপযোগ হস্তান্তরিত হয়। ব্যবসা ও অর্থনীতিতে কোন দ্রব্য যদি অভাব পূরণ করিতে না পারে সেই দ্রব্য উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয় না। কোনও দ্রব্য যতক্ষণ ভোগকারীর নিকট না পৌছায় ততক্ষণ সেই দ্রব্যের উৎপাদন সার্থকতা লাভ করে না।

উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে যেক্ষেত্রে কোন আনুষঙ্গিক ব্যয় করিতে হয় সে ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের সহিত ব্যবসায়ের পরিচালনারও আনুষঙ্গিক ব্যয় যোগ করিয়া পড়তা অর্থাৎ কত মূল্যে বিক্রয় করিলে আশানুরূপ লাভ হইবে তাহা স্থির করা হয়। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্য অর্থাৎ শিল্পীয় কার্যে নিয়োজিত থাকে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের ক্রয়মূল্য, শ্রমিকের মজুরী, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় যোগ করিয়া উৎপাদন মূল্য স্থির করে। উৎপাদন মূল্যের উপর কত লাভ করিতে হইবে তাহা যোগ করিয়া মোট বিক্রয়মূল্য স্থির করা হয়।

বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়-বিভাগও ক্রয়-বিভাগের মত বিশেষজ্ঞের হস্তে ন্যস্ত থাকে। বিক্রয়ের সহিত প্রচার অভিযানও সংযুক্ত থাকে। **প্রচার ও বিজ্ঞাপন** (Publicity and Advertisement) ব্যতীত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। উভয় বিভাগের মধ্যে কার্যের সমন্বয় প্রয়োজন।

বিক্রয়কার্যের সহিত আরও কতিপয় কার্য সংশ্লিষ্ট থাকে। দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করা হইলে অর্থাৎ ক্রয় করা হইলে অথবা উৎপাদিত হইলে উহাদের গুণাগুণ অনুসারে ভাগ (Grading) করিতে হয়। সকল ভোগকারীর রুচি এক নহে, ক্রয়-ক্ষমতাও সমান নহে। দ্রব্য বিভিন্ন গুণের এবং গুণানুযায়ী বিভিন্ন মূল্যের হইতে পারে। সুতরাং ভোগকারীর একই ক্রয়-ক্ষমতা ও রুচি অনুমান করিয়া দ্রব্যসমূহকে গুণানুসারে এবং মূল্যানুসারে ভাগ করিতে হয়। বিক্রয়-বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে ভোগকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং বিক্রয়-বিভাগকেই গুণানুযায়ী দ্রব্য ভাগ করিতে হয়।

তৎপরতার সহিত যোগান দিতে না পারিলে বিক্রয় সফল হয় না। চাহিদানুযায়ী যদি সরবরাহ না করা যায় তাহা হইলে কারবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। যাহাতে তৎপরতার সহিত ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছান যায় তাহার জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। **যোগাযোগ ও পরিবহণ কার্যও** (Communication and Transportation) বিক্রয়কার্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ ও পরিবহণ কার্যের উপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে। এই কারণে বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠান নিজেই ট্রাক, লরি ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবহণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রায়তন কারবারী প্রতিষ্ঠান পরিবহণ কার্যে নিযুক্ত সংস্থার উপর নির্ভর করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে কারবারের একটি বিরাট অংশ ধারের উপর নির্ভর করে। ধারে বিক্রয় না করিলে বড় বড় কারবারী কারবার চালাইতে পারে না। বিক্রয়-বিভাগকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয় যে, কোন্ কারবারীকে কত পরিমাণে ধারে

বিক্রয় করা যাইতে পারে। সকল কারবারের বাজারে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা (Creditability) সমান নহে। বাজারে কোন্ ব্যবসায়ীর কি পরিমাণ সুনাম, তাহার উপরই তাহাকে ধারে বিক্রয় করিবার পরিমাণ নির্ভর করে। ইহাও দেখিতে হইবে, যাহাতে ধারের অর্থ যত সত্বর সম্ভব আদায় হয়। ধার অনাদায়ী থাকিলে শেষ পর্যন্ত উহা অনাদায়ী ঋণে (Bad Debts) পরিণত হইতে পারে। বিক্রয়-বিভাগে ঋণ উপ-বিভাগ (Credit Section) থাকিতে পারে। সেই উপ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ বাজারে কোন্ কারবারীকে দ্রব্য ধারে দেওয়া যায় তাহা স্থির করেন। এই উপ-বিভাগের সহিত আবার আদায়-বিভাগের (Collection Department) যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। বিক্রয়-বিভাগের অধিকর্তাকে বিভিন্ন কার্যেব সমন্বয় ঘটাইতে হয়। গতিশীল চাহিদার সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য এবং বিক্রয়ের বাজার ব্যাপক করিবার জন্য **বাজার গবেষণার** প্রয়োজন।

(৪) **আর্থিক কার্য (Financial Functions)** :

প্রত্যেক কারবারীকেই মূলধন যোগান দিতে হয়। যে মূলধন যোগান দেওয়া হয় উহা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে ব্যবহৃত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যাঁহারা কারবার পরিচালনা করেন তাঁহারাই মূলধনের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকেন। কারবারের কর্মী ও কর্মচারিগণের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং কারবারের তহবিলে সর্বদা এমন আর্থিক সংস্থান থাকা প্রয়োজন যাহাতে মাসান্তে অথবা সপ্তাহান্তে কর্মী ও কর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতে পারে।

সকল কারবারের আর্থিক প্রয়োজন সমান নহে। কারবারের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোনও শিল্পে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইবে বিভাগীয় বিপণিতে সেই পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইবে না। শিল্পে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় কবিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে সেই অনুপাতে অনেক কম অর্থেরঃ প্রয়োজন হইবে।

বর্তমানে প্রত্যেক কারবারের একটা মোটা অংশই ধারের উপর নির্ভর করে। কারবারী যদি ধারে ক্রয় করিবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে অনেক সময় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। আবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কারবারীকে অনেক সময়েই ক্রেতাকে ধারের সুযোগ দিতে হয়। কারবারী কত পরিমাণে ধারে ক্রয় করিতে পারে বা কত পরিমাণে ধার দিতে পারে তাহা কারবারীর আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বিক্রয়ের আবর্তন (Turnover) যদি অধিক হয় ও ধারে বিক্রয়ের অর্থ আদায় নিয়মিত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও ধারে ক্রয় করা সহজ হয় এবং ধারের অর্থ নিয়মিত পরিশোধ করার সুযোগ হয়। সুতরাং কি পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য ধারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে তাহা একটি ঋণ বাজেট (Credit Budget) তৈয়ারী করিয়া স্থির করা হয়। **'নগদ প্রবাহ'** (Cash flow) কি হইবে এবং নগদ প্রবাহ কিভাবে ব্যাহত হইতে পারে তাহার উপর বাজেট অনেকাংশে নির্ভর করে।

নগদ ও ঋণের অর্থের ব্যবস্থাপনাকে যুক্তভাবে আর্থিক কার্য বলা হয়। কারবারের কার্যের মধ্যে ইহা একটি মুখ্য কার্য।

(৫) কর্মী-বিষয়ক কার্য (**Personnel Function**) ঃ

কারবার ছোট অথবা বড় যাহাই হোক, প্রত্যেক কারবারে কর্মী প্রয়োজন। বর্তমান যুগ বিশেষায়ণের যুগ (Age of Specialisation)। যে কার্যে যাহার দক্ষতা নির্ধারিত হয় সেই কার্যেই তাহাকে নিয়োগ করা হয়। তাহাতে উৎপাদন বাড়ে, সময়-সংক্ষেপ হয় এবং উৎপাদনের ব্যয় কমে।

কর্মী-বিভাগকে উপদেষ্টা-বিভাগ বলা যাইতে পারে। যাহাতে উৎপাদন-ব্যয় কম হয় তাহার জন্য দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়। কর্মী-বিষয়ক ব্যবস্থাপকের হস্তেই এই বিভাগ ন্যস্ত থাকে। তাঁহার কর্তব্য কোন্ বিভাগে কি কাজের জন্য কি প্রকার শ্রমিক প্রয়োজন তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা এবং পরে যে বিভাগের জন্য যে গুণ-বিশিষ্ট কর্মীর প্রয়োজন সেইরূপ শ্রমিক নিয়োগ করা।

বিজ্ঞাপন মারফত আবেদনপত্র সংগ্রহ করিয়া কর্মী বাছাই এবং যোগ্যতা নিরূপণ অর্থাৎ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার পর কর্মী নিয়োগ করা হয়। কর্মী নিয়োজিত হইবার পর তাহাকে যে কার্যের জন্য নিয়োগ করা হয় সেই কার্যের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্মীর এই অবস্থাকে বলা হয় শিক্ষানবিশী।

কেবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই কর্মী-বিভাগের কর্তব্য শেষ হয় না। সকল প্রকার কর্মীর স্বাস্থ্য যাহাতে ঠিকমত বজায় থাকে কারবারী প্রতিষ্ঠানকে সেই বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। কারবারের পরিবেশ কর্মীদের স্বাস্থ্যের অনুকূল কিনা তাহাও কর্মী-বিভাগকে দেখিতে হয়।

কর্মীদের বেতন-হারও এই বিভাগকে স্থির করিতে হয়। কর্মীদের কার্যের প্রকার অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে হয়। প্রত্যেক কর্মীর জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে মজুরী স্থির করা হয়।

শিল্পে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এই বিভাগের মাধ্যমে তাহার যৌথ নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যৌথ আলোচনার (Joint Consultation) ব্যবস্থা করা হয়। কর্মীদের ছুটির হিসাবও এই বিভাগ রাখিয়া থাকে। কর্মীদের কার্যে দক্ষতা অনুসারে পরবর্তী উচ্চপদে উন্নীত করা, কোনও কর্মীর কার্যে অনুপযুক্ততার জন্য পদাবনতি ইত্যাদি বিষয়ে এই বিভাগের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

শ্রমিক যাহাতে মানসিক ও শারীরিক দিক হইতে কার্যের উপযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থাও এই বিভাগকে করিতে হয়। সুতরাং কর্মী-বিষয়ক কার্য কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটপূর্ণ।

বড় কারবার হইলে কর্মী-বিভাগকে পৃথক্ বিভাগ হিসাবে গঠন করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে মালিক নিজেই কর্মী নিয়োগ, কর্মীর প্রশিক্ষণ, কর্মীর স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করেন।

(৬) হিসাবরক্ষণ কার্য (Accounting Function) :

হিসাবরক্ষণ কার্য দ্বারা কারবারের কার্যের আর্থিক ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। কারবারের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত অর্থে নিরূপিত হয়। কারবারে যে লেনদেন হয় তাহা হিসাবরক্ষণ বিভাগ লিপিবদ্ধ করে এবং এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে কারবারের ফলাফল অর্থাৎ লাভ-লোকসান স্থির করে। বর্তমানে হিসাবরক্ষণ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হিসাবরক্ষণ দ্বারা বর্তমানে যে কেবল কারবারের লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা নহে, পরন্তু কারবারের যে বিভিন্ন বিভাগ আছে তাহাদের প্রতিটি কার্যের আর্থিক পরিমাপও করা হয়। কোথায় কিভাবে অপচয় ঘটিতেছে তাহা ব্যবস্থাপকমণ্ডলী উপলব্ধি করিতে পারেন এবং অপচয় বন্ধ করিবার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রত্যেক কারবারকেই একটি আয়-ব্যয় সূচক (Financial Budget) তৈয়ারী করিতে হয়। হিসাবরক্ষণ বিভাগ আয়-ব্যয় সূচক তৈয়ারী করিয়া দেয়। আয়-ব্যয় সূচক দ্বারা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৭) অফিস-সংক্রান্ত কার্য (Office Function) :

অফিস বলিতে সাধারণতঃ যেখানে করণিকবৃন্দ কার্য করে সেই স্থানকে বুঝায় এবং অফিসের কার্য বলিতে করণিকের কার্যকে বুঝায়। সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে হিসাবরক্ষণ কার্যও অফিসের কার্য। কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারকে নানাবিধ তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। সেই তথ্য লিখিত আকারে দিতে হয়। যে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয় উহার প্রতিলিপি রাখিতে হয়। ইহা ব্যতীত বহির্জগতের সহিত কারবারের সম্বন্ধ চিঠিপত্রের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। যে সকল চিঠিপত্র পাওয়া যায় তাহা নথিবদ্ধ করিতে হয়। এই সকল কার্যই অফিসের কার্য।

কারবারী কার্যের সংজ্ঞা (Meaning of Business Activities) :

যে সকল কার্যের ফলে স্বল্প আয়াসে, স্বল্প সময়ে, ন্যায্যমূল্যে এবং বিনা অসুবিধায় উৎপাদন ও বণ্টন হয়, সেই সকল কার্যকে কারবারী কার্য বলে। উৎপাদক উৎপাদন করে। এক শ্রেণীর লোক উৎপাদকের নিকট হইতে সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। এই দুইটি কার্যকে সফল করিবার জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়েও কিছু কার্য সম্পাদিত হয়, যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপাদন ও বণ্টন চলিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কারবারী কার্যসমূহকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—উৎপাদন ও বণ্টন।

কারবারী কার্য

↓

উৎপাদন | বণ্টন

ভোগ্যসামগ্রী নানা প্রকার কাঁচামাল হইতে তৈয়ারী করা হয়। যে ব্যবসা কাঁচামাল হইতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাকে **শিল্প** (**Industry**) বলে। যেমন, কাঁচা তুলা হইতে কাপড় তৈয়ারী হয়। যে শিল্প কাপড় তৈয়ারী করে, তাহাদের **বস্ত্র-শিল্প** (**Cloth Industry or Cotton Industry**) বলে। আবার, প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেও শিল্প বলা হয়। যেমন, কয়লা উত্তোলন। যে প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর গর্ভ হইতে কয়লা উত্তোলন করে, তাহাকে **কয়লা-শিল্প** (**Coal Industry**) বলে।

এইভাবে বিচার করিলে কৃষিকেও শিল্প বলা হয়। কারণ, কাঁচামাল হইতে ভোগ্য-দ্রব্য তৈয়ারী করিতে যেমন শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও মূলধনের প্রয়োজন, তেমনি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতেও শ্রমিক, মূলধন ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সেইজন্য অর্থনীতি ও কারবারশাস্ত্রে ব্যাপক অর্থে শিল্প বলিতে সকল প্রকার উৎপাদনের পদ্ধতিকেই বুঝায়।

উৎপাদিত দ্রব্য ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইবার জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে। তাহাদের কার্য উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করা এবং সেই দ্রব্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করা। ইহাদের **ব্যবসায়ী** (**Trader**) বলা হয় এবং তাহাদের কার্যকে **ব্যবসা** (**Trade**) বলে।

উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় যে সকল বাধা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা দূর করিবার জন্যও বিবিধ কার্যের প্রয়োজন। যেমন—ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি। বস্তুতঃ ইহাদের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বণ্টন-ব্যবস্থাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **ব্যবসা** (**Trade**) এবং **উৎপাদন ও বণ্টনে সাহায্যকারী কার্যাবলী** (**Aids or Auxiliary or Ancillary Services**)। ইহার প্রত্যেকটি কার্যকেই বাণিজ্যিক কার্য (**Commercial Activity**) আখ্যা দেওয়া হয়।

তাহা হইলে সমগ্র কারবারী কার্যকে **উৎপাদন-শিল্প** (**Industry**), **ব্যবসা** (**Trade**) ও **সহায়ক কার্য** (**Aids**) এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

উপরের আলোচনার সারাংশ এই যে, কারবারী কার্য (Business Activities)-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: **শিল্প** (**Industry**), **ব্যবসা** (**Trade**) এবং **বাণিজ্যিক কার্য** (**Commerce**)।

যে সকল কার্যাবলী কাঁচামাল হইতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে কৃষিজাত অথবা খনিজদ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের **শিল্প** (**Industry**) বলে।

শিল্পের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিবার কার্যকে বলা হয় ব্যবসা (**Trade**)।

শিল্প ও কারবারের কার্য অব্যাহত রাখিতে যাহারা সাহায্য করে, তাহাদের কার্যকে বলা হয় বাণিজ্যিক কার্য (**Commerce**)।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনেকের মতে ব্যবসা (Trade) ও বাণিজ্যিক কার্যকে দুইটি পৃথক ভাগে ভাগ করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা ব্যবসা (Trade)-কেও বাণিজ্যিক কার্যের (Commerce) অংশ বলিয়া ধরিয়া লন।

তাঁহাদের মতে কারবারী কার্য বলিতে উৎপাদন-শিল্প (Industry) এবং বাণিজ্যিক কার্য (Commerce)-কে বুঝায়। কিন্তু উৎপাদন-শিল্পকে (Industry) যদি পৃথক করিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে যাহারা উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে এবং যাহারা ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে, তাহারা সকলেই বাণিজ্যিক কার্যের (Commerce) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কারণেই বাণিজ্যিক কার্যকে (Commerce) দুই ভাগে ভাগ করাই সঙ্গত। এই দুইটি ভাগ হইল : ব্যবসা (Trade) এবং ব্যবসায়ের সহায়ক কার্য (Aids to Business Activities or Commerce)।

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter-Relationship among Industry, Trade and Commerce) ঃ

কারবারী কার্যকে শিল্প, ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক কার্যের সহায়ক হিসাবে পৃথক পৃথকভাবে দেখিলেও তাহাদের কোন একটি কার্য অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত চলিতে পারে না। শিল্প উৎপাদন করে, ব্যবসা (Trade) সেই উৎপাদিত দ্রব্য শিল্পের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে এবং ব্যবসা সহায়ক (Commerce) কার্য দ্বারা শিল্পের নিকট হইতে ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌছাইতে সাহায্য করে। শিল্পে উৎপাদন করিতে হইলে কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়, আবার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিবারও প্রয়োজন হয়। কারণ উহা বিক্রয় না করিলে কারবারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুনাফা অর্জন সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদনকারীকে ক্রয়-বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। আবার উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়কার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সাহায্য অপরিহার্য। যেমন, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ লইতে হয়; উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করিতে হয়; উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের ঝুঁকি বহনের জন্য বীমা করিতে হয়, ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সহায়ক কার্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিয়া থাকে।

কারবারিগণ বাণিজ্যিক কার্যকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। দ্রব্য উৎপাদনে, বণ্টনে ও বিনিময়ে যে সকল বাধা উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্য যে সকল কার্য করা হয়, সেই সকল কার্যকে বাণিজ্যিক কার্য বলে।

কারবার ও পেশার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Business and Profession) ঃ

উৎপাদন, বণ্টন অথবা সেবার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা এবং উন্নত জীবিকার সংস্থান করা কারবার ও পেশা উভয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য। কারবার এবং পেশা উভয়েই মানুষের নানাবিধ অভাব পূরণের কার্যে এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যে নিযুক্ত। কিন্তু কারবার ও পেশার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

কারবার	পেশা
১। কারবার অর্থে সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন অথবা বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে বুঝায়।	১। অর্থের বিনিময়ে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ বা সেবা প্রদানকে পেশা বুঝায়।
২। বিশেষ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ না থাকিলেও কারবার করা যায়।	২। পেশার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক।
৩। কারবার উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয় অথবা তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে।	৩। পেশা সমাজ-কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কার্যের দ্বারা কার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে।
৪। কারবার করিতে হইলে স্বাধীনভাবে করিতে হয়—কাহারও অধীনস্থ থাকিয়া বা কাহারও অধীনে কর্মরত থাকিয়া কারবার হয় না।	৪। নিজস্ব পেশা স্বাধীনভাবে করা যায় অথবা কাহারও অধীনে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত থাকিয়া বিশেষ জ্ঞান ও সেবা পরিবেশন করা যায়।
৫। কারবার সমাজের নানাবিধ অভাব পূরণের কার্যে ব্যাপৃত থাকে।	৫। বিশেষ শিক্ষা, কুশলতা, প্রশিক্ষণ, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা পেশা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করে।
৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কারবারে নিযুক্ত : কাঁচামাল হইতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী, ঐ সকল দ্রব্য বিক্রেতা, মুদিখানা দোকানদার, নীলামদার, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনকারী, দালাল, ক্রয়-বিক্রয় কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি, প্রভৃতি।	৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পেশায় নিযুক্ত : ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, নার্স, আইনজীবী, ম্যানেজার, পাইলট, প্রভৃতি।

নিয়োগ (Employment) ঃ বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম ও চুক্তি অনুযায়ী কাহারও অধীনে বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করাকে নিয়োগ বলে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পেশায় শিক্ষিত ব্যক্তি, ইত্যাদি চাকুরী গ্রহণ করিয়া জীবিকা গ্রহণ করিতে পারেন। চাকুরীতে সত্তা বজায় থাকে না। ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের আদেশ, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চাকুরী করিতে হয়। প্রত্যেক নিয়োগ বা চাকুরীর একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে।

অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতার উপর কারবারের নির্ভরশীলতা
(Dependence of Business on other Branches of Knowledge and Skill)

বর্তমান যুগে কারবারী কার্যকলাপে বিশেষায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে কারবার অন্যান্য জ্ঞানশাখা ও পারদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। বিশেষায়িত কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য এবং কার্যকলাপে উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জ্ঞানশাখায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কারবারে নিযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন জ্ঞানশাখার উপর কারবারের নির্ভরশীলতা কিরূপ তাহা আলোচিত হইল :

কারবার ও অর্থনীতি (Business and Economics) :

অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান। অ্যাডাম স্মিথ্-এর মতে—ইহা একটি ধন উৎপাদন ও বণ্টনের বিজ্ঞান। এ্যালফ্রেড মার্শাল-এর মতে—অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান, যাহা মানুষ কিভাবে উপার্জন করে এবং উহা খরচ করে, তাহা দেখায়। লাওনেল রবিনস্-এর মতে, "অসংখ্য উদ্দেশ্য এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির মধ্যে মানুষের কাজকর্ম যে সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থবিদ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী বিজ্ঞান" (Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses)। সম্পদ আহরণ ও সম্পদ উৎপাদনের কার্যকলাপের বিষয় হইল অর্থনীতি।

অপ্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে মানুষ কি প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে তাহার বিবরণ ও মূল্যায়ন করাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু। অর্থনীতি দ্বারা মানুষের সম্পদ আয় এবং সম্পদ ব্যয়ের কার্যকে বুঝায়। অর্থনীতিতে কতিপয় বিশেষ আভিধানিক শব্দ আছে। যেমন, উৎপাদন (Production), বণ্টন (Distribution) ইত্যাদি। উৎপাদন অর্থে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। বণ্টন অর্থে উৎপাদনের ফল উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বণ্টনকে বুঝায়। অর্থাৎ বণ্টন অর্থে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্য বুঝায়—যেমন, খাজনা, মজুরী, সুদ, মুনাফা। কৃতী কারবারীর পক্ষে অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য, কারণ অর্থনীতির জ্ঞান থাকিলে উৎপাদন ও বণ্টনকার্যে জ্ঞান সঞ্চয় হয়। সেই জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন ও বণ্টনে অংশগ্রহণ করিতে পারা যায়।

যদি অর্থনীতির জ্ঞান থাকে তাহা হইলে অর্থনীতির তত্ত্ব কারবারে প্রয়োগ করা সহজ হয়। চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory) দ্বারা কারবারী বিভিন্ন সময়ে চাহিদা ও যোগানের অবস্থাভেদে কিভাবে চলিবে তাহা স্থির করিতে পারে। বাজারে অর্থের যোগান, চাহিদা, ব্যাঙ্ক, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক

ইউনিয়ন এই সকল বিষয়ে কারবারীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাণিজ্য-চক্র (Business Cycle) কিভাবে কাজ করে তাহাও অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। বাণিজ্য-চক্রের দোষসমূহ যাহাতে কারবারের ক্ষতিকারক না হয় তাহার জন্য কারবারী অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে বাণিজ্য-চক্রের গতি অনুধাবন করা সম্ভব নহে।

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সরকারী রীতি-নীতি, আইনসমূহ প্রভৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। এই সকল বিষয়ও অর্থনীতির জ্ঞান দ্বারা সম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবার অর্থনীতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বোধ হয় এই কথাই বলা সঙ্গত যে, **কারবার ফলিত অর্থবিদ্যা** (Business is Applied Economics)।

বিভিন্ন প্রকারের অর্থনীতি (Different Types of Economy) :

অর্থনীতির প্রকারভেদ নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) **প্রত্যক্ষ বিনিময় অর্থনীতি (Barter Economy)**—প্রাচীন যুগে দ্রব্যের পরিবর্তে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় প্রচলিত ছিল। এই প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষ বিনিময় অর্থনীতি বলে।

(২) **অর্থগত অর্থনীতি (Money Economy)**—বর্তমান যুগে অর্থের বিনিময়ে বিনিময় কার্য চলে। অর্থই বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থের মাধ্যমে বিনিময়-ব্যবস্থার নাম আর্থিক বা অর্থগত অর্থনীতি।

(৩) **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি (Capitalist Economy)**—ইতালীতে প্রথম এই প্রকার অর্থনীতির উদ্ভব হয়। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ্ এই প্রকার অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন। এই প্রকার অর্থনীতিতে শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানা অবাধ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রকার অর্থনীতি চালু আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শোষণ ও নিপীড়ন দেখা যায়।

(৪) **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialist Economy)**—যখন উৎপাদনের সমস্ত উপাদান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে, দেশের সম্পদ সমাজের সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়, তখন সেই অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে। কার্ল মার্কস এই অর্থনীতির প্রবর্তক। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অর্থনীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) **মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)**—ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণে মিশ্র অর্থনীতি সৃষ্টি হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই থাকে। দেশের অর্থনীতি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে এইরূপ অর্থনীতির প্রবর্তন করা হইয়াছে।

কারবার ও বিজ্ঞান (Business and Science) :

শিল্প বিজ্ঞান-ভিত্তিক। বিজ্ঞানের উন্নতিতে উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আবিষ্কার করে। ফলে কেবল যে কারবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, কারবারের হিসাবরক্ষণ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদিও উন্নতি লাভ করে। যন্ত্রপাতি উৎপাদনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জ্ঞান, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে রসায়নবিদ্যার (Chemistry) জ্ঞান, উন্নত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় কর্ম গবেষণার (Operation Research) জ্ঞান ইত্যাদি প্রয়োজন। কারবারের বিভিন্ন কাজে টাইপ করিবার যন্ত্র, চেক লিখিবার যন্ত্র, শ্রুতিলিখন যন্ত্র ইত্যাদি বিশেষ সাহায্য করে। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র আবিষ্কারে কারবারী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কারবার ও কারিগরি বিদ্যা (Business and Technology) :

কারবারের সহিত কারিগরি বিদ্যার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। কারিগরি বিদ্যার জ্ঞান না থাকিলে কারবারীর পক্ষে কারিগর পরিচালনা করা কখনই সম্ভব হয় না। পৃথিবীর কোথায় কারিগরি বিদ্যার কি উন্নতি হইতেছে বা হইয়াছে তাহা কারবারীর পক্ষে জানা একান্ত আবশ্যক। কোন্ দেশ কত উন্নত কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ করিতেছে তাহা জানা থাকিলে কারবারী প্রতিযোগিতায় উৎপাদনের কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে পারে। কারিগরি বিদ্যার উন্নতির সহিত উৎপাদন ও বণ্টনের ধারা ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বাধুনিক কারিগরি বিদ্যার প্রসার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা বিশেষ কষ্টকর।

কারবার ও অঙ্কশাস্ত্র (Business and Mathematics) :

কারবারের সহিত অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। কারবারের লেনদেন লিপিবদ্ধ করিতে অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক। কেবলমাত্র অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট মনে হয় না। কারণ বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা বহুল-পরিমাণ উৎপাদন নীতির (Principle of Large-scale Production) উপর ভিত্তি করিয়াই হইতেছে। বহুল-উৎপাদন নীতিতে সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) বর্তমানে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া কারবারী তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে। ভবিষ্যতে কি হারে মুনাফা করিতে হইলে কিভাবে উৎপাদন-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞান থাকিলে তাহা স্থির করা সহজ হয়। সংখ্যাতত্ত্বকে অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। সুতরাং অঙ্কশাস্ত্র ও সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞান কারবারীকে সাহায্য করে। কেবল তাহাই নহে, কারবারের লেনদেন লিপিবদ্ধ করিতে যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাতেও অঙ্কশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কারবার ও মনস্তত্ত্ব (Business and Psychology) :

মনস্তত্ত্ব দ্বারা মানুষের আচরণ পদ্ধতি নিরূপণ করা যায়। কারবারের নীতি ও পদ্ধতি কিভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে তাহা মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকিলে সহজে ধরিতে পারা যায়। কারবারের কোন্ নীতি শ্রমিক

সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, কোন্ নীতি ভোক্তাদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে সে বিষয়ে পূর্বেই সচেতন হওয়া আবশ্যক। কারণ কারবারের কোনও নীতিতে যদি শ্রমিকশ্রেণীর উপর বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে তাহার ফল আদৌ শুভ হইতে পারে না। কোনও নীতি যদি সম্ভোগকারীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহার ফলও কল্যাণকর হইতে পারে না। মনস্তত্ত্ব মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং কারবারের সহিত মনস্তত্ত্বের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

অর্থনীতিও মানুষের মনস্তত্ত্বের সহিত যুক্ত। সুতরাং কারবার যখন অর্থনীতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন মনস্তত্ত্বকেও বাদ দেওয়া সম্ভব নহে। বস্তুত মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকিলে কারবারী তাহার নীতি ও পদ্ধতি সহজেই নিরূপণ করিতে পারে।

কারবারের প্রসারে বিজ্ঞাপন একটি বিশেষ স্থান দখল করে ইহা স্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞাপন দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কারবার-সম্পর্কিত দ্রব্যের সচেতনতা আনা হয়। কোন্ বিজ্ঞাপন কোন্ শ্রেণীর লোকের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহা মনস্তাত্ত্বিকগণ বুঝিতে পারেন। বিজ্ঞাপনকে এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মনে কারবার-সম্পর্কিত দ্রব্যের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকিলে এইরূপ করা সহজ হয়।

কারবার ও সমাজতত্ত্ব (Business and Sociology) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কারবার সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সমাজকে বাদ দিয়া কারবার চলিতে পারে না। সমাজ, সামাজিক সংগঠন এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে সমাজতত্ত্ব তাহা ব্যাখ্যা করে। কারবারের অনেক সমস্যাই সমাজতত্ত্বের, অর্থাৎ পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের জ্ঞান থাকিলে তবে দূর করা যায়। সমাজতত্ত্বে শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের শক্তি জনসমষ্টির শক্তি অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব অনুসারে কোনও বিশেষ নীতির ফলে সমাজের বিশেষ একটি অংশ যদি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার ফল সমাজের সকল শ্রেণীর উপর প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক মর্যাদা প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। কোন বিশেষ সম্প্রদায় যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করিতেছে তাহা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। আবার সামাজিক মর্যাদায় উন্নত হইতে সকলেই চেষ্টা করে। সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাও মানুষের ক্রয়-অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা বিশেষত দেখা যায় আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে। যখন ক্রয়-অভ্যাস সম্প্রদায়ের অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন ব্যবসায়ীর বিক্রয়-প্রচেষ্টা সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। ব্যবসায়ীকে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চাহিদার প্রকৃতি অনুমান করিতে হয়।

কারবারের ব্যবস্থাপনায়ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে প্রতিটি শ্রমিককে পৃথক পৃথক বিচার করিয়া মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক নির্ধারিত হইত। বর্তমান মালিক-শ্রমিক

সম্পর্ক ব্যক্তিগত নহে। ইহা সম্প্রদায়গত। সম্প্রদায় বা শ্রেণীকে বাদ দিলে শ্রমিক পৃথকভাবে মালিকের সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। মালিকও বর্তমানে শ্রেণী হিসাবেই শ্রমিকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। কারবারের সাফল্য বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত সম্পর্কের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মনস্তত্ত্বের জ্ঞান কারবারীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

কারবারী কার্যকলাপের মৌল বৈশিষ্ট্য (Basic Features of Business Activities) :

কোন কার্যকে কারবারী কার্যকলাপের আওতায় আনিতে হইলে উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারবারী কার্যকলাপের রূপ ও অর্থ প্রসারিত হইলেও ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা প্রয়োজন :

(১) **সম্পদ উৎপাদন ও আহরণ (Production and Acquisition of Wealth) :** মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করিবার জন্য সম্পদ উৎপাদন ও অর্জন আবশ্যিক। শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে সম্পদ উৎপাদন করিয়া ভোগকারীর নিকট উহা প্রেরণ করা কারবারী কার্যকলাপের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য।

(২) **বিক্রয়ের ব্যবস্থা (Arrangement for Sale) :** বিক্রয় করা ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য। উৎপাদন অথবা ক্রয় ব্যক্তিগত ভোগের উদ্দেশ্যে করা হইলে উহা ব্যবসা নহে। ব্যবসায়ে উৎপাদন এবং ক্রয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় হইবে উৎপাদিত দ্রব্য বা ক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় করা।

(৩) **ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা (Recurring Purchases and Sales) :** অর্থের প্রয়োজনে অলংকার বিক্রয় করিলে উহাকে ব্যবসা বলা যায় না। কিন্তু কোন অলংকার-নির্মাতা যদি পুনঃপুনঃ অলংকার ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন উহা ব্যবসা পর্যায়ভুক্ত হইবে। সুতরাং, ক্রয়-বিক্রয় বলিতে একই পণ্যের পুনঃপুনঃ ও ধারাবাহিক ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝায়।

(৪) **ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সুবিধা (Mutual Benefits of Buyer and Seller) :** 'বিনিময়' কথাটির অর্থ হইল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সুবিধা পায়। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্য আকারগত উপযোগ (Form utility), সেবা উপযোগ (Service utility), স্থানগত উপযোগ (Place utility) এবং সময়গত উপযোগ (Time utility) সৃষ্টি করে। এই সকল উপযোগ সৃষ্টির পরিবর্তে বিক্রেতা মুনাফা অর্জন করে।

(৫) **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainty) :** কারবারী ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদন বা ক্রয় করে এবং এই কারণেই কারবারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার ভ্রান্ত অনুমানের ফলেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

(৬) **মুনাফালাভের আশা (Expectation of Profit) :** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ কারবারে প্রবেশ করে। মুনাফাই মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়। মুনাফা হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিবার পুরস্কার। কারবারের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যদিও 'ন্যায্য মুনাফা' অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু মুনাফা অর্জনই কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জনগণের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য ন্যায্যমূল্যে উপযুক্ত মানের পণ্য ও সেবা নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করাও কারবারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(৭) **ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক (Individual and Social Aspects) :** কারবারী সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন করে অথবা সেবা পরিবেশন করে বলিয়া একদিকে সে মুনাফা অর্জনের দ্বারা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে এবং অন্যদিকে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করে।

কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Basic Common Features of Business) :

কারবার আকারে বৃহৎ, মাঝারি বা ক্ষুদ্র অথবা এক-মালিকী, অংশীদারী, কোম্পানী, বেসরকারী বা সরকারী যাহাই হোক না কেন, সকল কারবারেরই কতকগুলি মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Economic activities) :** অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সাধনে মানুষ কারবারে উদ্বুদ্ধ হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের অভাবমোচনের জন্য উৎপাদন, বণ্টন ও সেবাকার্যের মধ্য দিয়া মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশ ঘটে। আকারগত, স্থানগত, কালগত ও ব্যক্তিগত বাধা দূর করিয়া উপযোগ সৃষ্টি করাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। সুতরাং উৎপাদন বা মূল্য সৃষ্টি কারবারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

(২) **উদ্যোগ (Entrepreneurship) :** উদ্যোগী ছাড়া কারবার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারবারের গোড়াপত্তন করিতে গেলে উদ্যোক্তার প্রয়োজন। কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন বাজার অনুসন্ধান করা। বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমতা আছে কিনা, কোন্ দ্রব্যের কি পরিমাণ চাহিদা হইতে পারে, সেই দ্রব্যের সুষ্ঠু যোগান সম্ভব কিনা, তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই কার্য যিনি সম্পাদন করেন, তাঁহাকে উদ্যোক্তা (Entreprenour) বলা হয়। উদ্যোক্তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উদ্যোক্তার কার্যকে কারবারী উদ্যোগ (Entrepreneurship) বলে।

(৩) **সংগঠন (Organisation) :** কারবার পরিচালনা করিতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কার্য বণ্টন এবং সকল বিভাগের মধ্যে কার্যের সমন্বয় ঘটান প্রয়োজন। ইহাকে সংগঠন (Organisation) বলা হয়। যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে জমি, শ্রম ও মূলধনের সুষ্ঠু সমন্বয় ও উপযোগ সৃষ্টি হয় তাহাই সংগঠন। সংগঠক হিসাবে ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। কারবারের প্রকৃতি ও আয়তনের উপর

সংগঠন নির্ভর করে। সংগঠক জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে কাম্য অনুপাত নির্ধারণ করে। সংগঠকের কার্যই সংগঠন (Organisation) করা।

(৪) **মূলধন (Capital) :** কারবার চালাইতে প্রয়োজন অর্থ (Finance)। কারবারী কারবারে যে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাকে কারবারের **মূলধন (Capital)** বলা হয়। প্রত্যেক কারবারেই মূলধনের প্রয়োজন। মূলধন সাধারণতঃ দুই প্রকারের, যেমন, (ক) **স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)** এবং (খ) **চল্‌তি মূলধন (Floating or Working or Circulating Capital)**।

ভারী ও মূল শিল্পে অধিক স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয় কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে কারখানার যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বাড়ী, জমি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য অধিক স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয়। কারবারে ক্রয়-বিক্রয় ব্যয়, পরিবহণ-ব্যয়, শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি মিটাইবার জন্য চল্‌তি মূলধনের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী মূলধন দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন এবং ইহা সাধারণতঃ নিজস্ব মূলধন (Owned Capital) বিনিয়োগের দ্বারা গঠিত হয়। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের সাহায্যে চল্‌তি মূলধনের প্রয়োজন মিটান হয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ এই প্রকার মূলধন যোগান দিয়া থাকে। এক-মালিকী কারবারে মালিক নিজে, অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ যৌথভাবে ; সমবায় সমিতিতে সদস্যগণ মিলিতভাবে, যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ার-গ্রহীতাগণ এবং রাষ্ট্রীয় কারবারে সরকার মূলধনের সংস্থান করেন।

(৫) **অনুমান (Forecasting) :** ভবিষ্যতে দ্রব্যের কি পরিমাণ যোগান পাওয়া যাইবে, কি মূল্যে বিক্রয় করিলে মুনাফা হইবে এই সকলই অনুমানসাপেক্ষ। যে যত সঠিকভাবে অনুমান করিতে পারে সে কারবারে তত সাফল্য অর্জন করিতে পারে। অনুমান ভুল হইলে কারবারে অকৃতকার্য হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে শুরু করিয়া বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলেই অনুমান করিয়া পণ্য উৎপাদন বা মজুত করে। দুইটি কারণে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করিতে হয়— (ক) উৎপাদন-পদ্ধতি জটিল ও সময়-সাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব হইতে অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদন করিতে হয় এবং (খ) বৃহদায়তন উৎপাদনে একসঙ্গে অনেক পণ্য উৎপাদন করিতে হয়। ভবিষ্যতের চাহিদা, ক্রেতার রুচি, পরিবর্ত-দ্রব্যের (Substitutes) আবির্ভাবের সম্ভাবনা ইত্যাদি অনুমান করিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হয়। বড় কারবারী ছোট কারবারী অপেক্ষা অনুমানের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

(৬) **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainties) :** কারবার করিতে গেলে ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিয়া কারবার স্থাপন করিতে হয়। যে অর্থ এবং শ্রম বিনিয়োগ করা হয় উহা দ্বারা যাহাতে আশানুরূপ মুনাফা হয় (Return on Investment বা ROI) তৎপ্রতি কারবারী দৃষ্টি দিয়া থাকেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কারবারী যে আয় আশা করিয়াছেন সেরূপ আয় হইতেছে না। ইহাও হইতে পারে যে, কারবারের মোটেই আয় হইতেছে না। ভবিষ্যতে কারবার হইতে আয় হইবে কি হইবে না তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

সুতরাং কারবারের মালিককে মুনাফা আয় না হওয়ার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উভয়ই বহন করিতে হয়।

"No risk, no gain" কথাটি কারবারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে ভ্রান্ত অনুমানের সম্ভাবনার ফলেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ঝুঁকি নানা প্রকারের হইতে পারে; যেমন—চাহিদার পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকি, দাম পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকি, বিনিময়-হারের পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি, রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তনের ঝুঁকি ইত্যাদি। বড় কারবারীর ঝুঁকি ছোট কারবারী অপেক্ষা কম। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমস্ত কারবার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবস্থাপিত হয় বলিয়া ইহাতে ঝুঁকির কোন প্রশ্ন থাকে না। আমাদেব দেশে মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থায় আংশিক ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(৭) উদ্বৃত্ত গঠন (Surplus Creation): উদ্বৃত্ত বলিতে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়া অবস্থাকে বুঝায়। ব্যয় অপেক্ষা আয় যতটুকু অধিক ততটুকু উদ্বৃত্ত গঠন। অর্থাৎ মুনাফাই উদ্বৃত্ত। কারবার পরিচালনায় এবং সম্প্রসারণে উদ্বৃত্ত অংশ ব্যবহার করা হয়। উদ্বৃত্ত না থাকিলে কোন কারবাব অধিক দিন চালু থাকিতে পারে না।

মুনাফা অর্জনেব উদ্দেশ্যে মানুষ কারবারে নিযুক্ত হয়। মুনাফার আশা মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়। আত্মার সন্তুষ্টির জন্য কেহ কারবার করে না। মুনাফা হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন কবিবার পুবস্কার। তিনটি কারণে মুনাফার প্রয়োজন—(ক) কারবারের কার্যকারিতা পরিমাপ করিবার জন্য; (খ) মূলধনের ঝুঁকি বহন করিবার জন্য এবং (গ) নূতন মূলধন সৃষ্টির জন্য। কারবারের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যদিও "ন্যায্য মুনাফা" অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু মুনাফা অর্জনই কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সামাজিক দায়িত্ব পালন করাও কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৮) সেবার উদ্দেশ্য (Service Motive): জনগণের চাহিদা পুবণ করিবার জন্য ন্যায্যমূল্যে উপযুক্ত মানের পণ্য ও সেবা নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ কবা কারবারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সেবার দ্বারা ক্রেতা-সাধারণের সন্তুষ্টি সাধনও কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য।

(৯) জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ (Public Welfare Activities): প্রত্যেক কারবারেরই জনকল্যাণমূলক (Public Welfare) মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন; কোনও কারবারীই জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহায়তা ব্যতীত উন্নতি করিতে পারে না। জনকল্যাণের মনোবৃত্তি না থাকিলে কারবার তঞ্চকতায় পরিণত হয়। জনকল্যাণ বলিতে ন্যায্যমূল্যে দ্রব্য সরবরাহ, উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য সরবরাহ, চাহিদা অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি বুঝায়। জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কারবার যদি কেবল নিজের মুনাফা বাড়াইবার দিকেই নজর দেয় তাহা হইলে সে কারবার দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না। নিজের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কারবার নানাপ্রকার দুর্নীতি গ্রহণ করিতে পারে, যাহা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। নিজের মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কারবারী

কালোবাজারী, মজুতদারী ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু এই সকল কারবার বহুদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সমাজের অকল্যাণকর কার্যের ফলে জনসাধারণ তাহাদের কোন প্রকার সাহায্য অথবা সহযোগিতা করে না। সকল কারবারের পক্ষেই জনকল্যাণ নীতি বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহাও কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া জনকল্যাণমূলক কার্য করা যায়।

(১০) **ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা (Recurring Purchases and Sales) ঃ** একই পণ্যের পুনঃপুনঃ ও ধারাবাহিক উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১১) **পরিবর্তনশীলতা অথবা গতিশীলতা (Flexibility or Dynamism) ঃ** বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। চাহিদা ও পছন্দ নিত্য পরিবর্তনশীল। কারবারের এই ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ইহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

স্থানীয় কারবার (Local Business) ঃ

যে কারবারের কার্য একটি বিশেষ স্থান বা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহাকে স্থানীয় কারবার বলা হয়। যেমন, কোনও গ্রামে অথবা কোনও শহরে অথবা কোন জেলার মধ্যেই যদি কারবারের কার্য নিবদ্ধ থাকে, তাহাকে স্থানীয় কারবার বলিতে পারা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে, কোনও একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কোনও বিশেষ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ঐ কারবারই প্রাধান্য লাভ করে। যেমন, মেদিনীপুর জিলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পান উৎপাদন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পানের কারবারকে মেদিনীপুরের স্থানীয় কারবার বলা যায়। অনুরূপভাবে, যে জায়গায় যে দ্রব্যের উৎপাদনের প্রাধান্য দেখা যায় সেই স্থানে সেই দ্রব্যের স্থানীয় কারবার গড়িয়া উঠে। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাই অন্যত্র চালান যায়।

জাতীয় কারবার (National Business) ঃ

যে কারবারের লেনদেন কোন দেশের সর্বত্রই প্রসারিত থাকে, তাহাকে জাতীয় কারবার বলা যায়। যে কার্পাসজাত দ্রব্য আমেদাবাদে উৎপন্ন হয় ভারতের সর্বত্রই তাহার চাহিদা আছে এবং ভারতের সর্বত্রই সেই দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। এই কারবারকে জাতীয় কারবার বলা হয়। আবার যদি কোনও দেশের বিশেষ কোনও কারবার থাকে যাহাতে অন্য কোনও দেশের স্থান নাই, তাহাকেও জাতীয় কারবার বলা যায়। ভারত এককালে পাটজাত দ্রব্যে একক স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিদেশে রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যই সর্বাধিক পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আয় করিত। ইহাকে ভারতের জাতীয় কারবার বলা হইত।

আন্তর্জাতিক কারবার (International Business) ঃ

কারবারের কার্য যখন দেশের গণ্ডীর বাহিরে অন্যান্য দেশে প্রসারিত হয়, তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক কারবার বলা হয়। যে প্রতিষ্ঠান বিদেশের সহিত ব্যবসায়িক কার্য

[illegible] ক্রয়-বিক্রয় করে, সেই ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক কারবার বলা হয়। বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি ও বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানিকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বা কারবার বলা হয়।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারবারের মধ্যে পার্থক্য :

স্থানীয় কারবার	জাতীয় কারবার	আন্তর্জাতিক কারবার
(১) এইরূপ কারবারের গণ্ডী নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ।	(১) ইহার পরিধি দেশব্যাপী বিস্তৃত।	(১) ইহার পরিধি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত।
(২) কারবারের মোট পরিমাণ ও মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।	(২) কারবারের পরিমাণ ও মূল্য স্থানীয় কারবার অপেক্ষা বেশী, কিন্তু আন্তর্জাতিক কারবার অপেক্ষা কম।	(২) এইরূপ কারবারের মোট পরিমাণ ও মূল্য সর্বোচ্চ।
(৩) স্থানীয় কারবারের দ্বারা আঞ্চলিক অভাব পূরণ নাও হইতে পারে, তাই ইহা জাতীয় কারবারের উপর নির্ভরশীল।	(৩) ইহা অনেক সময় আন্তর্জাতিক কারবারের উপর নির্ভরশীল।	(৩) আন্তর্জাতিক কারবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারবার লইযা পরিপুষ্ট।
(৪) ইহাতে মূলধন কম লাগে।	(৪) ইহাতে অধিকতর মূলধনের প্রয়োজন।	(৪) ইহাতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।
(৫) ইহাতে দেশীয মুদ্রায় লেনদেন সংঘটিত হয়।	(৫) দেশীয় মুদ্রায় লেনদেন হয়।	(৫) বিদেশী মুদ্রায লেনদেন হয।
(৬) ইহা আয়তনে ছোট হয়।	(৬) ইহা আযতনে বৃহৎ হয।	(৬) ইহা আকারে খুবই বড় হয়।
(৭) ইহাতে ঝুঁকি কম।	(৭) ইহাতে ঝুঁকি বেশী।	(৭) ইহাতে ঝুঁকি খুব বেশী।
(৮) এইরূপ কারবারে আনুপাতিক উৎপাদন ব্যয়-নীতি মোটেই প্রযোজ্য নহে।	(৮) আনুপাতিক ব্যয়-নীতি প্রযোজ্য নহে।	(৮) আনুপাতিক ব্যয়নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।
(৯) ক্রেতা-বিক্রেতার প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকিতে পারে।	(৯) ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সম্ভাবনা কম।	(৯) ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের নিকট অপরিচিত।
(১০) লেনদেনে দেশীয় আইন প্রযোজ্য।	(১০) লেনদেনে দেশীয় আইন প্রযোজ্য।	(১০) লেনদেনে বিভিন্ন দেশের আইন প্রযোজ্য হয়।
(১১) একই মুদ্রায় লেনদেন হয় বলিয়া মুদ্রামূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত অসুবিধা হয় না।	(১১) মুদ্রামূল্যের হ্রাস বৃদ্ধিজনিত অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।	(১১) ভিন্ন মুদ্রায় লেনদেন সম্পন্ন হয় বলিয়া মুদ্রামূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।
(১২) পণ্য প্রেরণে বহুপ্রকার দলিলাদির প্রয়োজন হয না।	(১২) পণ্য প্রেরণে বহুপ্রকার দলিল পাঠানোর প্রয়োজন হয় না।	(১২) পণ্য প্রেরণে বীমাপত্র, বহনপত্র, চালান, চার্টার পার্টি ইত্যাদি বহুপ্রকার জাহাজী দলিলাদির প্রয়োজন হয়।
(১৩) ইহা স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।	(১৩) ইহা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।	(১৩) ইহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন।

কারবারের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতা
(Interdependence and Co-operation through Business)

এমন কোনও দেশ নাই যে দেশ দাবী করিতে পারে যে, তাহার দেশের সকল নাগরিকের যাবতীয় চাহিদা ঐ দেশে প্রস্তুত দ্রব্য দ্বারাই পূরণ করা সম্ভব। যে দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর, তাহাকে দেখা যায় শিল্পজাত দ্রব্যে পরনির্ভরশীল। যে দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত, তাহাকে দেখা যায় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়। কিন্তু কতকগুলি শিল্পীয় দ্রব্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন, চা, পাটজাত ও কার্পাসজাত দ্রব্য। ভারতে প্রচুর পরিমাণে খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়; শিল্পে অনুন্নত বলিয়া সেই খনিজদ্রব্য পুরাপুরি-ভাবে ব্যবহার করা যায় না। সেই উদ্বৃত্ত খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ শিল্পে খুবই উন্নত, কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামাল নিজ নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না।

সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি অলিখিত চুক্তির মতই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনে সর্বাধিক সুযোগ রহিয়াছে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ (Specialisation) অর্জন করিবে। তাই দেখা যাইতেছে যে, ভারত পাট উৎপাদনে সচেষ্ট রহিয়াছে এবং ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য আমদানি করিতেছে। বিনিময়ে ঐ সকল দেশ হইতে সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্য ভারত ক্রয় করিতেছে, যাহা ভারতের পক্ষে উৎপাদন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ভারত যে দ্রব্য উৎপাদন-ব্যয় কম সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কম এবং যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে বেশী সুযোগ আছে সেই দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। ইহাতে উভয় দেশেরই উপকার হইতেছে। ভারত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না সেই দ্রব্য অন্য দেশসমূহ হইতে আমদানি করিয়া তাহার অভাব পূরণ করিতেছে, আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না সেই দ্রব্য ভারত হইতে আমদানি করিয়া তাহাদের অভাব পূরণ করিতেছে।

যদি উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বা ব্যবসায়-সম্পর্ক না থাকিত তাহা হইলে কেহই তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিত না। অন্যথায় যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়া এবং অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া উৎপাদন করিতে হইত।

বৈদেশিক বাণিজ্য পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে। পারস্পরিক সহযোগিতা আছে বলিয়াই যে দেশ নিজে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে অসুবিধা ভোগ করে সেই দেশ অন্য দেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করে। বর্তমান জগতে কোন দেশই সকলপ্রকার দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর নহে। স্বয়ম্ভরতা না থাকিবার কারণে প্রত্যেক দেশই কোনও না কোনও দ্রব্যের জন্য অন্য কোনও দেশের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা আছে বলিয়াই বৈদেশিক ব্যবসা সম্ভব হইতেছে। আবার বৈদেশিক ব্যবসা আছে বলিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা দেখা যাইতেছে।

কারবারের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা দেখা যায় ইহার মাধ্যমেই আবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং সামাজিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান যুগে কোনও দেশই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে প্রতিটি দেশই নিজে লাভবান হইতেছে। কারবারই প্রতিটি দেশকে অন্য দেশের নিকটবর্তী করিয়াছে। কারবারের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখা দিয়াছে।

বৈদেশিক সহযোগিতা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কারবারের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা না থাকিলে কোনও দেশই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। কৃষক ও শিল্প-মালিকের মধ্যে যদি সহযোগিতা না থাকে তবে কৃষক কি পরিমাণ কাঁচামাল উৎপাদন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না। আবার শিল্প-মালিক যদি নিশ্চিত থাকিতে না পারে যে, কৃষক তাহাকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগাইবে তাহা হইলে সেও অব্যাহতভাবে উৎপাদন করিতে পারে না। কৃষক তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবহারের (বিক্রয়ের) জন্য শিল্প-মালিকের উপর নির্ভরশীল। আবার শিল্প-মালিকও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য কৃষকের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে উভয়েরই আর্থিক কার্য ব্যাহত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য (International harmony) এবং সার্বভৌমিক দৃষ্টিভঙ্গীর (Cosmopolitan outlook) প্রসার ঘটে। নির্ভরশীলতা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে।

কারবারী কার্যের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Business Activities)

যে সকল কার্য দ্বারা মানুষের অভাব মিটান হয় এবং অভাব দূর করিয়া মুনাফা উপার্জন করা হয়, তাহাকেই কারবারী কার্য বলে। কাঁচামালের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত দ্রব্য ভোগকারীর নিকট পৌছাইতে পরিবহণ, অর্থ-সংস্থান, বীমাকরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি কার্যকলাপ কারবারী কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

কারবারী কার্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

কারবারী কার্য (**Business Activities**)

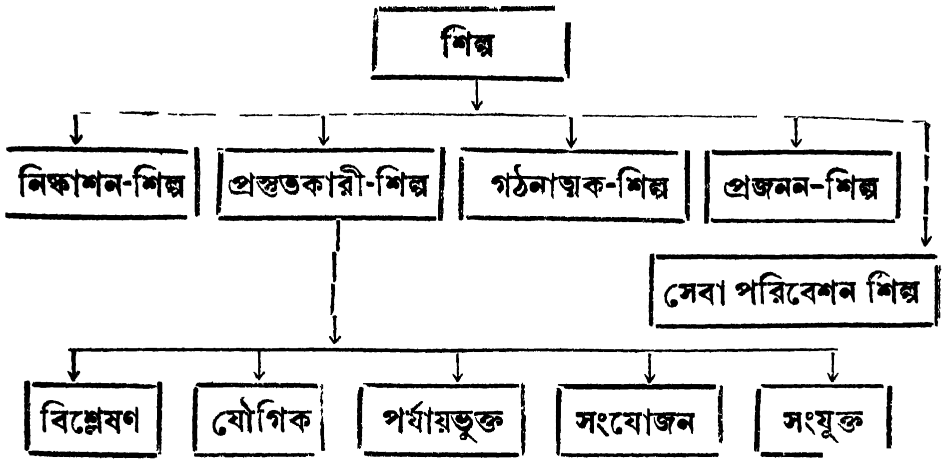
- শিল্প (**Industry**)
- ব্যবসা (**Trade**)
- ব্যবসা-সহায়ক কার্যাবলী বা বাণিজ্য (**Commerce**)

[১] শিল্প (Industry)

দ্রব্য উৎপাদনের কার্য বুঝাইতে 'শিল্প' কথাটি ব্যবহার করা হয়। যে কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে এবং উহাদের রূপান্তর ঘটাইয়া মানুষের ব্যবহারোপযোগী নূতন সম্পদ সৃষ্টি করে, তাহাকেই **শিল্প** বলে। সম্পদ উৎপাদনের কার্যকেই শিল্প বলা হয়। শিল্প রূপগত বা আকারগত উপযোগিতা (Form utility) সৃষ্টি করে। উৎপাদনের কার্য অনুসারে শিল্পকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, **নিষ্কাশন-শিল্প** (**Extractive Industry**)—যেমন, কৃষি, খনি ইত্যাদি ; দ্বিতীয়তঃ, **প্রস্তুতকারী-শিল্প** (**Manufacturing Industry**)—যেমন, লৌহ-শিল্প, কাগজ-শিল্প ইত্যাদি ; তৃতীয়তঃ **গঠনাত্মক-শিল্প** (**Constructive Industry**)—যেমন, রাস্তা-ঘাট, অট্টালিকা মোটরগাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি ; চতুর্থতঃ, **প্রজনন-শিল্প** (**Genetic Industry**)—যেমন, শস্যের বীজ উৎপাদন এবং পঞ্চমতঃ, **সেবা পরিবেশন শিল্প** (**Service Industry**)—যেমন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন শিল্প, ব্যাঙ্কিং-শিল্প ইত্যাদি। 'শিল্প' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি প্রধানতঃ দ্রব্য উৎপাদন বুঝাইতে প্রয়োগ করা হয়। দ্রব্য উৎপাদন ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কার্য আছে, যাহা দ্বারা কোনও পার্থিব দ্রব্য (**Material Goods**) উৎপাদিত হয় না বটে, অথচ সেই কার্যসমূহ মানুষের অভাব দূর করে। যেমন—ডাক্তারের কার্য, শিক্ষকের কার্য ইত্যাদি। এই কার্যসমূহকে পেশা বলা হয়। ইহা বর্তমানে আমাদের আলোচনার বস্তু নহে। তবে কতকগুলি কার্য আছে যাহার সহায়তায় দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন বা বিনিময় অব্যাহত থাকে। যেমন—পরিবহণ, অর্থ-সংস্থান ইত্যাদি। ইহাদের সহায়তায় উৎপাদন ও বণ্টনের পথের বাধাসমূহ দূরীভূত হয়। সুতরাং ইহাদের কার্যকে সেবাকার্য (Services) বলা হয়। উৎপাদন শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ধরিলে এই সেবাকার্যসমূহকেও উৎপাদনের আওতায় আনিতে হয় ; কারণ ইহাদের সেবাকার্য দ্বারা উৎপাদন ও বণ্টনকারীর অভাব পূরণ হয়। যেমন—ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহণ ইত্যাদি। ইহাদের কার্য ব্যবসায়িক কার্যের সহায়ক। ইহাদের বাণিজ্যিক কার্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পের বিভাগ (Division of Industry) ঃ

উপরে বলা হইয়াছে যে, শিল্পকে **নিষ্কাশন** (**Extractive**), **প্রস্তুতকারী** (**Manufacturing**), **গঠনাত্মক** (**Constructive**), **প্রজনন** (**Genetic**) এবং **সেবা পরিবেশন** (**Service**)—এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।



(ক) নিষ্কাশন-শিল্প (Extractive Industry) ঃ

মানুষের নানাবিধ চাহিদা ও অভাব মিটাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশই প্রকৃতির দান হিসাবে পাওয়া যায়। উৎপাদনের জন্য চাষোপযোগী জমি, শক্তির উৎস কয়লা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জল ইত্যাদি প্রকৃতির দান। কিন্তু প্রাকৃতিক দান যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় মানুষের অভাব দূর হয় না। যখন শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন বা নিষ্কাশন করা হয়, তখন তাহাকে নিষ্কাশন-শিল্প বলে। যেমন—কয়লা-শিল্প, কৃষি-শিল্প, মৎস্য-শিল্প, তৈল উত্তোলন শিল্প ইত্যাদি। নিষ্কাশন-শিল্প হইতে যে দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই প্রস্তুতকারী-শিল্পে ও গঠনাত্মক-শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) প্রস্তুতকারী-শিল্প (Manufacturing Industry) ঃ

যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিষ্কাশন-শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে রূপান্তর ঘটায় এবং রূপান্তরিত দ্রব্যের নূতন উপযোগিতা (Utility) সৃষ্টি করে, তাহাকে প্রস্তুতকারী-শিল্প বলে। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রস্তুতকারী-শিল্পে যখন দ্রব্যটি উৎপাদিত হয়, তখন দ্রব্যটি একটি নূতন রূপ ধারণ করে এবং ইহার ভোগ দ্বারা নূতন অভাববোধ পূরণ হয় ; যেমন—বস্ত্র-বয়ন। বস্ত্র-বয়ন করিতে কাঁচা তুলার প্রয়োজন। কিন্তু যখন বস্ত্র-বয়ন করা হয়, তখন ইহা একটি নূতন দ্রব্যে পরিণত হয় এবং কাপড়ের অভাববোধ পূরণ করে।

উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুতকারী-শিল্প বিশ্লেষণ, যৌগিক, পর্যায়ভুক্ত, সংযোজন এবং সংযুক্ত এই সকল প্রকারের হইতে পারে।

বিশ্লেষণ-শিল্প (Analytical Industry) ঃ একই দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য তৈয়ারী করাকে বিশ্লেষণ-শিল্প বলে। যেমন, খনিজ তৈল হইতে কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি।

যৌগিক-শিল্প (Synthetic Industry)—কতকগুলি দ্রব্যের সংমিশ্রণে কোন দ্রব্য উৎপাদন করাকে যৌগিক-শিল্প বলে। যেমন, সাবান।

পর্যায়ভুক্ত-শিল্প (Processing Industry)—বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঁচামাল হইতে ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য তৈয়ারী করাকে পর্যায়ভুক্ত-শিল্প বলে। যেমন, তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারী।

সংযোজন-শিল্প (Assembling Industry)—অনেকগুলি অংশ একত্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য তৈয়ারী করাকে সংযোজন-শিল্প বলে। যেমন, মোটরগাড়ী।

সংযুক্ত-শিল্প (Integrated Industry)—বিশ্লেষণ, যৌগিক, পর্যায়ভুক্ত, সংযোজন ইত্যাদি সমস্ত প্রকার প্রক্রিয়া যখন একটি শিল্পে দেখা যায়, তখন উহাকে সংযুক্ত-শিল্প বলে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প।

(গ) গঠনাত্মক-শিল্প (Constructive Industry) ঃ

প্রস্তুতকারী-শিল্প প্রধানতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আহৃত দ্রব্যই কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু এমন অনেক শিল্প রহিয়াছে যাহারা প্রস্তুতকারী-শিল্পে যে দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তাহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই কাঁচামালকে নূতন দ্রব্যে পরিণত করে। ইহাদের বলা হয় গঠনাত্মক-শিল্প। যেমন—এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, জাহাজ, সেলাইকল, সাইকেল, অট্টালিকা ইত্যাদি শিল্প। ইহাদের সংযোজন-শিল্পও (Assembling Industry) বলা যাইতে পারে।

(ঘ) প্রজনন-শিল্প (Genetic Industry) ঃ

যে শিল্প-প্রচেষ্টার দ্বারা এমন দ্রব্য সৃষ্টি করা হয় যাহা পুনরায় সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয় এবং মানুষের ভোগের উপযুক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করে, তাহাকে প্রজনন-শিল্প বলে। যেমন, শস্যের বীজ উৎপাদন। শস্যের বীজ শস্য উৎপাদন করে এবং উহা মানুষের ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) সেবা পরিবেশন-শিল্প (Service Industry) ঃ

'শিল্প' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সকল সেবাকার্য শিল্পে উৎপাদন ও বণ্টন অব্যাহত রাখে এবং মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে, তাহাদিগকে সেবা পরিবেশন-শিল্প বলা হয়। যেমন, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্যাস উৎপাদন ইত্যাদি।

[২] ব্যবসা (Trade)

'ব্যবসা' কথাটি 'কারবার' কার্যের অপর একটি অংশকে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। আবার 'ব্যবসা' শব্দটি বাণিজ্যিক কার্যের অংশ বুঝাইতেও প্রয়োগ করা হয়। যেভাবেই ব্যবহার করা হোক, কাঁচামাল এবং পরিণত দ্রব্যের (Finished Goods) পৌনঃপুনিক (Recurring) ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝাইতে ব্যবসা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। বিক্রয়

করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করাকে ব্যবসা বলা হয়। ক্রয়মূল্য হইতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ সকল অঞ্চলে একই প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় না, সকল অঞ্চলের জলবায়ুও এক প্রকার নহে। এই সকল কারণেই এক-এক অঞ্চল এক-এক প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা ও বিশেষায়ণ অর্জন করে। আঞ্চলিক বিশেষায়ণের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সহিত অন্যান্য অঞ্চলের কারবার চলিয়া থাকে। অন্যথায় যে অঞ্চল খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে অসমর্থ, সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ খাদ্যদ্রব্য ভোগ করিতে পারিত না।

উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে কোনও তৃতীয় পক্ষ না থাকিলে উৎপাদনের উদ্দেশ্য ফলবতী হয় না এবং ভোগকারীর অভাব পূরণ করা যায় না। তৃতীয় পক্ষ নিজে কোনও দ্রব্য উৎপাদন করে না। সে উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে এবং ভোগকারীর নিকট সেই দ্রব্য বিক্রয় করে। সর্বদা যে ভোগকারীর নিকটেই বিক্রয় করে তাহা নহে, অপর কারবারীর নিকটেও বিক্রয় করিতে পারে। যেমন, পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে। সেই দ্রব্য সে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—পৌনঃপুনিক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসায়ী উৎপাদনকারী এবং ভোগকারীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য ফলবতী করিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ভোগকারীর তৃপ্তি সাধনে সহায়তা করে।

ব্যবসায়ের বিভাগ (Division of Trade) ঃ

ব্যবসায়ের লেনদেনের পরিমাণ, ব্যবসা কোন্ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্যবসায়ের প্রকৃতি, এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) আভ্যন্তরীণ ব্যবসা (Internal or Home Trade) :

একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হইলে, তাহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বলে। যেমন—বোম্বাইয়ের কাপড়কলে তৈয়ারী কাপড় বোম্বাইয়ের কাপড়কলের মালিকের নিকট হইতে কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ক্রয় করিল এবং উহা ভোক্তাকে বিক্রয় করিল। এই ক্রয়-বিক্রয় দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যবসাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) পাইকারী ব্যবসা এবং (খ) খুচরা ব্যবসা।

(ক) পাইকারী ব্যবসা (Wholesale Trade) :

যে ব্যবসায়ের এককালীন ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বেশী, তাহাকে পাইকারী ব্যবসা বলে। ইহারা সাধারণতঃ উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে ও খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট তাহা বিক্রয় করে।

(খ) খুচরা ব্যবসা (**Retail Trade**) :

ব্যবসায়ী যখন স্বল্প পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে এবং সাধারণ ভোগকারীদের নিকট স্বল্প পরিমাণে বিক্রয় করে, তখন তাহাকে খুচরা ব্যবসা বলে। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারের নিকট হইতে অল্প অল্প পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে এবং সরাসরি ভোগকারীদের নিকট তাহা বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে। পণ্য উৎপাদন ও পণ্যভোগ উভয়ের মধ্যে সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী গ্রন্থি (**Link**)-রূপে কাজ করে।

(২) বৈদেশিক ব্যবসা (**Foreign Trade**) :

যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তখন তাহাকে বৈদেশিক ব্যবসা বা বহির্বাণিজ্য বলে।

ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের আর্থিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। সেই কারণে আমেরিকায় গম উৎপাদনে যে প্রাকৃতিক সুযোগ রহিয়াছে, ভারতে গম উৎপাদনে সেই সুযোগ নাই। বৈদেশিক কারবার আছে বলিয়াই আমেরিকা গম উৎপাদন করিয়া যাইতেছে। ভারত ও অনুরূপ রাষ্ট্রসমূহ, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি আছে, তাহারা আমেরিকা হইতে গম ক্রয় করিতেছে। আবার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুবিধা আছে বলিয়াই ভারত পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিদেশে উহা রপ্তানি করে।

বৈদেশিক ব্যবসাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (ক) আমদানি ব্যবসা (**Import Trade**), (খ) রপ্তানি ব্যবসা (**Export Trade**) এবং (গ) পুনঃ-রপ্তানি ব্যবসা (**Re-Export Trade or Entrepot Trade**)।

(ক) আমদানি ব্যবসা (**Import Trade**) :

দেশের নাগরিকদের অভাব মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যখন নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না, তখন বিদেশ হইতে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। এই প্রকার ক্রয়কে আমদানি ব্যবসা বলে।

(খ) রপ্তানি ব্যবসা (**Export Trade**) :

নিজ দেশের নাগরিকদের অভাব মিটাইবার পরও যদি দ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকে, সেই দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করা হয়। এই প্রকার ব্যবসাকে রপ্তানি ব্যবসা বলে।

(গ) পুনঃ-রপ্তানি ব্যবসা (**Re-Export Trade or Entrepot Trade**) :

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে কোনও দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই দ্রব্যই আবার অন্য কোনও দেশে বিক্রয় করে। এই প্রকার ব্যবসাকে পুনঃ-রপ্তানি ব্যবসা বলে। যেমন, ইংলণ্ড ভারত হইতে চা আমদানি করে এবং সেই আমদানিকৃত চা অন্যান্য দেশের নিকট বিক্রয় করে। চা ইংলণ্ডের একটি পুনঃ-রপ্তানি ব্যবসা।

[৩] বাণিজ্যিক কার্যাবলী (Commercial Activities)

শিল্প কাঁচামাল হইতে শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে। ব্যবসা সেই ভোগ্যপণ্য ভোগকারীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টন এই দুই প্রকার কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রয়োজন দেখা যায়। যে কার্যসমূহ দ্রব্য উৎপাদন ও উৎপাদনের পর দ্রব্য ভোগকারীদের নিকট পৌঁছাইতে সহায়তা করে, সেই কার্যসমূহকে বাণিজ্যিক কার্যাবলী (Commercial Activities) বলা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদনকারীর নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেয় বলিয়া বাণিজ্য স্থানগত উপযোগ (Place Utility) সৃষ্টি করে। ইহারা দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনে সাহায্য করে। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন ও বণ্টন সফল হয় না। এই কারণে এই সকল কার্যকে ব্যবসায়ের সহায়ক কার্যও বলা হয়। বাণিজ্যিক অথবা ব্যবসায়ের সহায়ক কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) ব্যাঙ্ক (Bank) ও লগ্নি-প্রতিষ্ঠান (Finance House) :

বহুল-উৎপাদন (Large-scale Production) ও বহুল-বণ্টন (Large-scale Distribution) উভয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। যে অর্থ কারবারে নিয়োগ করা হয়, তাহাকে মূলধন বলা হয়। কারবারের উৎপাদন যত বেশী হয় এবং কারবার যত ব্যাপক আকার ধারণ করে, তাহার মূলধনের প্রয়োজনও তত অধিক হয়। জনসাধারণের সঞ্চয় দ্বারাই দেশের মূলধন গঠিত হয়। জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক সেই গচ্ছিত অর্থ ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়। লগ্নি-প্রতিষ্ঠানও সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে এবং সেই অর্থ কারবারীদের ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক অথবা লগ্নি-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে গচ্ছিত অর্থের উপর সুদ দিয়া থাকে। আর সেই অর্থ কারবারীদের ঋণ দিয়া সুদ নেয়। ব্যাঙ্ক অথবা লগ্নি-প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ নেয় তখন সুদ দেয় অল্প হারে। কিন্তু যখন কারবারীদের ঋণ দেয় তখন সুদ নেয় অধিক হারে। এইভাবে ব্যাঙ্ক ও লগ্নি-প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফা অর্জন করে। ব্যাঙ্ক ও লগ্নি-প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়াই জনসাধারণ সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনমত ইহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদান-প্রদানে ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নহে।

(খ) পরিবহণ (Transport) :

যে জায়গায় পণ্য উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই জায়গায়ই উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিক্রিত হয় না। বর্তমানকালে উৎপাদন সর্বদাই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হইয়া থাকে (Production in anticipation of demand)। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সুযোগ সকল দেশে সমান নহে বলিয়া এক-এক দেশ এক-এক প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ লাভ করে। ফলে,

যে দেশ বা অঞ্চল কোনও পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ লাভ করে, সেই দেশ বা অঞ্চল হইতে অন্য দেশ বা অঞ্চলসমূহ সেই পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে পণ্য আদান-প্রদান যানবাহন ব্যতীত সম্ভব নহে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা—উভয় ক্ষেত্রেই যানবাহনের সাহায্য ব্যতীত পণ্য আদান-প্রদান হইতে পারে না। পরিবহণ-ব্যবস্থা আছে বলিয়াই পশ্চিমবাংলায় পাঞ্জাবের গম আনা সম্ভব হইতেছে। তেমনি পরিবহণের সুব্যবস্থা আছে বলিয়াই ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে পাঠান সম্ভব হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে পরিবহণ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। বোম্বাইয়ের সহিত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের এবং বিদেশের সুষ্ঠু পরিবহণের ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোম্বাই ব্যবসা-বাণিজ্যে এত উন্নত হইয়াছে। নৌপথ, সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ইত্যাদি পরিবহণের সাহায্যে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে পণ্য আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

(গ) বীমা (**Insurance**):

কারবার করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে ঝুঁকি লইতে হয়। ঝুঁকির অর্থ হইতেছে 'অসাফল্যের সম্ভাবনা'। নানা কারণে ব্যবসায়ী সফলকাম নাও হইতে পারে। আবার অনেক কারণে ব্যবসায়ীকে হঠাৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেক কারবারীই ব্যবসায়ের ক্ষতির ঝুঁকি অন্যের উপর অপসারণ করতে চাহে। বীমার মাধ্যমে আকস্মিক কারণে ক্ষতির ঝুঁকি অপসারণ করা যায়। কারবারী যে গুদামে পণ্য সঞ্চিত রাখে সেই গুদামে আগুন লাগিয়া পণ্যের ক্ষতি হইতে পারে এবং পণ্যাগার (Warehouse) হইতে পণ্য চুরি যাইতে পারে। এক জায়গা হইতে অন্য কোনও জায়গায় পণ্য পরিবহণকালে জাহাজ ডুবিয়া যাইতে পারে বা রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া পণ্যের ক্ষতি হইতে পারে। ভূমিকম্পে শিল্পক্ষেত্র ধ্বংস হইতে পারে। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক আহত হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইতে পারে। এইভাবে নানা কারণেই কারবারীকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতে পারে। এই প্রকার ক্ষতির ঝুঁকি কারবারীকে লইতে হয়। কারবারিগণ এই প্রকার ঝুঁকির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বীমা করিয়া থাকে। ইহাতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (Premium) দিলে বীমাকারী বীমায় উল্লিখিত কারণে ক্ষতি পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। যেমন, অগ্নিবীমা গ্রহণ করিলে আগুনে পণ্যের ক্ষতি হইলে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা হয়। তেমনি জলপথে কোন দুর্ঘটনায় পণ্যের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা হয় নৌ-বীমাপত্র দ্বারা। সুতরাং বীমাদ্বারা ব্যবসায়ী বীমাকারীর উপর আকস্মিক ক্ষতির ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করে। ইহাতে কারবার প্রসার লাভ করিতে পারে। কারবারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বীমা-ব্যবসায়ও গড়িয়া উঠে।

(ঘ) গুদামজাতকরণ (**Warehousing**):

কিছু কিছু পণ্য আছে যাহাদের উৎপাদন বৎসরের এক একটি বিশেষ ঋতুতে সীমাবদ্ধ। যেমন, কৃষিজাত দ্রব্য ধান, গম, পাট ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের ভোগ সম্বৎসর

চলিতে থাকে। পণ্য গুদামজাতকরণের সুবিধা আছে বলিয়াই এক ঋতুতে উৎপাদিত পণ্য সম্বৎসর ভোগ করা সম্ভব হয়। এক ঋতুতে উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য সম্বৎসর ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। আবার বহুল উৎপাদন-প্রথায় উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে দ্রব্য বণ্টন করা হয়। সেক্ষেত্রেও উৎপাদিত দ্রব্য যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকে, তবে ভোগকারীর চাহিদা অনুসারে দ্রব্য বণ্টন করা সম্ভব হয় না। কারবারী তাহার নিজের কারখানা অথবা কারবারস্থলের সঙ্গেই পণ্য গুদামজাত করিতে পারে, অথবা সরকারী বা বেসরকারী গুদামঘরে মাশুল দিয়া পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করিতে পারে। পণ্য মজুতকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুদামঘরের কারবারও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

(ঙ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার (Advertisement and Publicity) :

যে পণ্য উৎপন্ন হয় তাহার সংবাদ ভোগকারীদের নিকট না পৌঁছাইলে তাহারা উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পাবে না। পণ্য উৎপাদনের সংবাদ ও উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে ভোগকারীদের অবহিত করাইবার জন্য উৎপাদিত পণ্যের প্রচার করা হয়। এই উৎপাদিত পণ্যের প্রচারেরই অপর নাম বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর কোথায় কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার উপযোগিতা, মূল্য, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। প্রচারকার্যের দ্বারা উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগসাধন করা হয়। উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগসাধন করা না গেলে উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রচার ও বিজ্ঞাপন ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে ; সুতরাং উহাও কারবারী কার্যের অন্তর্ভুক্ত। বহুল উৎপাদনের অনিবার্য ফলস্বরূপ দিন দিনই বিজ্ঞাপনের প্রসার ঘটিতেছে।

বাজার (Market) :

'বাজার' কথাটি ব্যাপক ও সংকুচিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাজার বলিতে সাধারণতঃ আমরা যে-স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাবেশ হয়, সেই স্থানকে বুঝিয়া থাকি। যেমন, গড়িয়াহাট বাজার। কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে বাজার বলিতে দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা বুঝায়। যেমন, গমের বাজার, অর্থাৎ গমের সরবরাহ ও চাহিদার অবস্থাকে বুঝায়। পণ্যের উপর ভিত্তি করিয়াও বাজারকে ভাগ করা হয়। যেমন শেয়ার বাজার, অর্থাৎ যে স্থানে কেবলমাত্র শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

যখন আমরা ব্যবসা ক্ষেত্রে বাজার কথাটি ব্যবহার করি তখন বুঝি যে, সেখানে একটি মাত্র দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয় ; যেমন, পাটের বাজার (Jute Exchange)। বাজারকে পাইকারী বাজার ও খুচরা বাজার—এইভাবেও ভাগ করা হয়। পাইকারী বাজারে সর্বদাই পাইকারী হারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সেখানে সাধারণতঃ উৎপাদক পণ্য বিক্রয় করে এবং শিল্প-মালিক ও পাইকারগণ সেই দ্রব্য ক্রয় করে।

খুচরা বাজারে ছোট ছোট ব্যবসায়িগণ জনসাধারণের নিকট অল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করে। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খুচরা বাজার হইতে পাইয়া থাকি।

ডাকঘর ও উহার কার্যাবলী (Post Office and its Services) :

ডাক-বিভাগের মাধ্যমে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হয়। কারবারে ডাক-বিভাগের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ডাক-বিভাগের মাধ্যমে যেমন কারবারের সংবাদ আদান-প্রদান হয়, তেমনি ডাক-বিভাগের মাধ্যমে পণ্য আদান-প্রদানও হয়। রেজিষ্ট্রি পার্শেল অথবা প্যাকেটে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পণ্য সরবরাহ করা যাইতে পারে। অবশ্য ডাক-বিভাগের মাধ্যমে খুব ভারী অথবা পরিমাণে খুব বেশী এমন পণ্য আদান-প্রদান সম্ভব নহে।

ডাক-বিভাগের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য আদান-প্রদানও হয়। ক্রেতা দূরবর্তী কোনও স্থানের ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিলে অনেক সময়েই সেই পণ্য ডাক-বিভাগের মারফতে **মূল্য দেয় পার্শেল (Value Payable Parcel)**-যোগে পাঠান হয়। ডাক-বিভাগ ক্রেতার নিকট দ্রব্য বিলি করিয়া দ্রব্যের মূল্য আদায় করে এবং বিক্রেতাকে পাঠাইয়া দেয়। ডাক-বিভাগের মারফতে **মনিঅর্ডার**-যোগেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া যেমন পণ্যের মূল্য দেওয়া চলে, তেমনি ডাকঘর হইতেও চেক-জাতীয় একপ্রকার পত্র ক্রয় করিয়া উহা দ্বারা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা চলে। উহাকে বলে **পোস্টাল অর্ডার (Postal Order)**। যেমন, ১০ টাকার পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়া উহাতে প্রাপক হিসাবে বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলে সে উহা ডাকঘরে জমা দিলে ১০ টাকা পাইতে পারে।

জরুরী সংবাদ আদান-প্রদানে চিঠিপত্র ব্যবহার করা হয় না। সেক্ষেত্রে টেলিগ্রাম-যোগে সংবাদের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। টেলিগ্রামযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সত্বর অর্থও পাঠান হয়। ইহাকে বলে **টেলিগ্রামযোগে মনিঅর্ডার (Telegraphic Money Order)**।

কেবল যে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়েই ডাক-বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহা নহে। বৈদেশিক ব্যবসায়ের জন্যও ডাক-বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। বিদেশের কারবারীর সহিত চিঠিপত্র মারফত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আবার অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের মত বৈদেশিক বাণিজ্যে ডাক-বিভাগের মারফত অর্থ প্রেরণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **কেব্‌লগ্রাম প্রেরণ (Cable Transfer)**। অন্তর্দেশীয় বা আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে যাহা টেলিগ্রামযোগে অর্থপ্রেরণ বুঝায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায় কেব্‌লগ্রাম প্রেরণ (Cable Transfer) দ্বারা টেলিগ্রামযোগে অর্থপ্রেরণকে বুঝায়।

প্রত্যক্ষ সেবাকর্ম (Direct Services) :

কারবারী ও বাণিজ্যিক কার্যাবলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—শিল্প, ব্যবসা ও ব্যবসায়িক সহায়ক কার্য। ইহা ব্যতীত সমাজে এক শ্রেণীর কারবারী আছে যাহারা

ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুরূপে চালাইতে সাহায্য করে। ইহারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা কোনও পণ্য তৈয়ারী করে না, উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে না অথবা ব্যবসায়িক সহায়ক কার্যেও লিপ্ত থাকে না। ইহারা প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন-কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকে। উকীল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, সেক্রেটারী প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়েন। ইঁহারা পেশায় নিযুক্ত।

বিশেষায়ণ (Specialisation) :

শ্রমবিভাগের ফলেই অর্থনৈতিক কার্যে বিশেষায়ণ দেখা দেয়। বিশেষায়ণের অর্থ হইল, বিশেষ কোনও কার্যে বিশিষ্টতা অর্জন করা। বিশেষায়ণের ফলে যেমন শ্রমিক বিশেষ কার্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে, তেমনি বিশেষ কোনও স্থান বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে। যেমন, বোম্বাই ও আমেদাবাদ বস্ত্র-বয়নশিল্পে বিশেষায়ণ লাভ করিয়াছে। এই প্রকার বিশেষায়ণকে **স্থানগত বিশেষায়ণ** বলা হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে শিল্প ঐ দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই শিল্প এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাকে অর্থনীতি-শাস্ত্রে **শিল্পের** অথবা **উৎপাদনের কেন্দ্রীভূত হওয়া** (**Centralisation** অথবা **Localisation of Industries**) বলে। স্থানগত বিশেষায়ণ প্রধানতঃ প্রাকৃতিক কারণেই হয়। আর্দ্র আবহাওয়া, প্রচুর কাঁচামাল উৎপাদন ইত্যাদি কারণেই বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত অর্থনৈতিক কারণও শিল্প-কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে। পরিবহণ, মূলধনের যোগান, সুলভ শ্রমিক, বন্দর ইত্যাদিও শিল্প-কেন্দ্রীকরণের কারণ।

অনেকের মতে শ্রমিকের বিশেষায়ণ ও স্থানগত বিশেষায়ণ ব্যতীত দ্রব্যেরও বিশেষায়ণ আছে। কোন দ্রব্য যখন কেবলমাত্র একটি বিশেষ অভাব মিটাইতে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে দ্রব্যগত বিশেষায়ণ বলা হয়। ইহা প্রধানতঃ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, যে যন্ত্র দ্বারা চট তৈয়ারী করা হয় সেই যন্ত্র দ্বারা কখনও রেশমদ্রব্য তৈয়ারী করা যায় না।

বিশেষায়ণের সুবিধা (Advantages of Specialisation) :

বিশেষায়ণের অনেকগুলি সুবিধা আছে। সেইগুলি হইল :

(১) **দক্ষতা বৃদ্ধি :** শ্রমিক কিংবা কারিগর কোন কার্যে বিশেষায়ণ অর্জন করিলে সেই কার্য অতি দ্রুততা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে ; ইহাতে প্রতিটি শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে।

(২) **উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস :** বিশেষায়ণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া গড়-পড়তা উৎপাদন-ব্যয় কম হয়।

(৩) **স্বল্প সময়ে উৎপাদন :** বিশেষায়ণের ফলে উৎপাদনে সময় কম লাগে বলিয়া শ্রমিকের অবসর বাড়ে এবং শ্রমিক অবসরকালীন আমোদ-প্রমোদের সুযোগ লইতে পারে।

(৪) **উৎকর্ষ বৃদ্ধি :** বিশেষায়ণের ফলে উৎপাদন সুরুচিসম্পন্ন ও উৎকর্ষপূর্ণ হইতে পারে।

(৫) **আয় বৃদ্ধি :** বিশেষায়ণের ফলে শ্রমিকের গড় আয় বৃদ্ধি পায়।

(৬) **স্থানগত আর্থিক উন্নতি :** স্থানগত বিশেষায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে স্থান কোন দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ লাভ করে, সেই স্থানে একটি দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ আর্থিক কার্যের উদ্ভব হয়। ইহাতে সেই স্থানের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হয়।

(৭) **গবেষণার সুবিধা :** বিশেষায়ণের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে গবেষণা করিবার সুবিধা হয় এবং গবেষণাকার্য দ্বারা উৎপাদনে উৎকর্ষ লাভ করা যায়।

(৮) **সহযোগিতা বৃদ্ধি :** বিশেষায়ণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

বিশেষায়ণের অসুবিধা (Disadvantages of Specialisation) :

নিম্নে বিশেষায়ণের অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইল :

(১) **সংকীর্ণতা :** বিশেষায়ণের ফলে শ্রমিকের মনে সংকীর্ণতা এবং শ্রেণী-সচেতনতা বিশেষভাবে প্রকট হয়।

(২) **সংকীর্ণ জ্ঞান :** কোনও কারণে কার্য হারাইলে শ্রমিকের পক্ষে নূতন কার্য সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। নূতন কার্য সংগ্রহ হইলেও সেই কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে যথেষ্ট সময় লাগে।

(৩) **সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের অভাব :** প্রাকৃতিক সুযোগ লইয়া কোনও স্থান বিশেষ শিল্প অথবা দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ অর্জন করিলে, সেই সুযোগের অভাব ঘটিলে সেই স্থান আর্থিক দিক হইতে দুর্বল হইয়া পড়ে। যেমন, অধুনা কলিকাতা বন্দরের অসুবিধার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই শিল্পকার্যে অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

(৪) **উৎপাদনে পর্যায়ভিত্তিক বাধা :** বিশেষায়ণের জন্য কোনও দ্রব্যের উৎপাদনকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। ফলে, কোন একটি পর্যায়ে কোন দ্রব্যের অথবা শ্রমের অভাব দেখা দিলে উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কারবারী কার্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Inter-relationship among Business Activities) :

প্রাকৃতিক উপকরণ হইতে কোন পণ্যের বা সম্পদের উৎপাদনকে **শিল্প** বলে। শিল্প আকারগত বা রূপগত উপযোগ (form utility) সৃষ্টি করে, কারণ শিল্পের দ্বারা কাঁচামাল হইতে ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কাঁচামালের রূপ পরিবর্তিত হইয়া ব্যবহারের উপযোগী রূপ সৃষ্টি হয়।

শিল্পীয় কার্যকলাপ ছাড়া অন্য সমস্ত কারবারী কার্যকলাপই বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পণ্য উৎপাদিত হইবার পর ইহার ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন প্রয়োজন। ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টনের কার্যকে বাণিজ্যিক কার্য-কলাপ বলা হয়। পণ্যকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে উহাকে

উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দিতে হয়। ইহা বাণিজ্যের কাজ। বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌছায়। এই কারণে বলা হয় যে, বাণিজ্য স্থানগত উপযোগ (Place utility) সৃষ্টি করে। শিল্প রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে এবং বাণিজ্য স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে। বাণিজ্য হইল একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা, যাহার দ্বারা ব্যক্তিগত বাধা, স্থানগত বাধা, সময়গত বাধা, ঝুঁকির বাধা এবং অর্থ-সংক্রান্ত বাধা দূরীভূত হয়। **(Commerce is the sumtotal of all processes which are engaged in the removal of hindrances due to person, place, time, risk and finance.)**

ব্যক্তিগত অভাব দূর করিবার জন্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় প্রয়োজন হয়। উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রয় এবং ক্রেতার নিকট বিক্রয়কার্যকে **ব্যবসা** (**Trade**) বলা হয়। ব্যবসায়ী মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে ক্রয়-বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া উৎপাদক ও ভোগকারীব মধ্যে সেতু রচনা করে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণস্বরূপ, কারণ ক্রয়-বিক্রয়ই কারবারের মূল উপাদান।

কারবারী কার্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—**শিল্প** (**Industry**), **ব্যবসা** (**Trade**) এবং **বাণিজ্যিক কার্য** (**Commerce**)। কারবারকে শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসা—এই তিনভাগে ভাগ করিবার উদ্দেশ্য হইল (ক) দক্ষতা-বৃদ্ধি করা, (খ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উৎপাদনে উৎকর্ষ আনা, (গ) উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা এবং (ঘ) পণ্যের সুষ্ঠু বণ্টন করা। কারবারের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের সম্পর্ক ও সমন্বয় প্রয়োজন। কারবারের বিভিন্ন কার্য একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পাবে না। শিল্পে যে দ্রব্য উৎপাদিত হয় উহা ভোগকারীর নিকট পৌছাইতে পরিবহণ প্রয়োজন। কৃষক যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে উহা শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার না করিলে, কৃষকের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের কোন সার্থকতা থাকে না। আবার কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন না করিলে শিল্প-মালিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাইতে পারে না। ব্যাঙ্ক ঋণদ্বারা মূলধন যোগান না দিলে শিল্প-মালিক শিল্পীয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। গুদামের মালিক গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা না করিলে শিল্প-মালিকগণ পণ্য গুদামজাত করিতে পারে না। বীমা ব্যবসায়ী বীমার সুযোগ না দিলে শিল্প-মালিক যে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করে তাহা গুদামজাত করিতে সাহস পায় না। বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় এবং দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কারবারী কার্যের প্রত্যেকটি অপর কার্যের পরিপূরক। কোন কার্যই বিচ্ছিন্নভাবে সাফল্যলাভ করিতে পারে না। কারবারী কার্যসমূহকে একটি সূত্রে গ্রথিত করা হয়। কোন দেশের কারবারের অবস্থা বুঝাইতে কারবারী কার্যের সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝান হয়। এককথায় শিল্প **আকারগত বা রূপগত উপযোগিতা** সৃষ্টি করে; বাণিজ্য সৃষ্টি করে **স্থানগত উপযোগিতা** এবং ব্যবসা **ব্যক্তিগত বাধা** দূর করে।

ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সামগ্রিক কারবার পদ্ধতি বা ব্যবস্থা তৈয়ারী করে (Inter-relationship of Trade, Industry and Commerce Makes a Total System) :

কারবার একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। ইহার তিনটি স্বতন্ত্র দিক আছে ; যেমন, শিল্প (industry), ব্যবসা (trade) ও বাণিজ্য (commerce)। ইহারা কারবারী কর্মক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করে এবং ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের কাজ হইল উৎপাদন করা। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের রূপান্তর ঘটাইয়া মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য উৎপাদন করিয়া শিল্প মানুষের চাহিদা পূরণ করে। ব্যবসায়ী উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে ও উপযোগিতা সৃষ্টি করে। যদি উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ব্যবসায়ীর সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় না হইত তাহা হইলে উৎপাদনের সার্থকতা থাকিত না। আবার বণ্টনকার্যে নানাবিধ ব্যক্তিগত, স্থানগত ও সময়গত বাধা আছে। এইগুলি দূর করিয়া সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা স্থাপনে অর্থলগ্নি বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ— যেমন, ব্যাঙ্ক, শেয়ার বাজার, আর্থিক সংস্থা ইত্যাদি, সেবামূলক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ—যেমন, যানবাহন, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি এবং সহায়ক কার্যকলাপ—যেমন, বীমা, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহায়তা প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবারী কার্যকলাপ শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। এই সকল কার্যকলাপ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি (a total system) সৃষ্টি হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের পার্থক্য (Distinction between Trade and Commerce) :

ব্যবসা ও বাণিজ্য উভয়েই পণ্য-বণ্টন ও বিনিময়ের কার্য করে। ইহাদের পার্থক্য নিম্নে আলোচিত হইল :

ব্যবসা	বাণিজ্য
(১) ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যকে ব্যবসা বলে।	(১) ব্যবসা-সহায়ক কার্যাবলী বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
(২) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রয়-বিক্রয়-জনিত ব্যক্তিগত বাধা দূর করে।	(২) বাণিজ্য স্থানগত ও সময়গত বাধা দূর করে।
(৩) ব্যবসা বাণিজ্যের একটি শাখা।	(৩) বাণিজ্য ব্যবসা ও ব্যবসা-সহায়ক কার্যাবলীর সমষ্টি।
(৪) উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে ব্যবসা সেতু বন্ধন করে।	(৪) বাণিজ্য উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সম্ভোগকারীর নিকট পণ্য পৌঁছাইতে যে সকল বাধা সৃষ্টি হয় উহাদের দূর করে। যেমন, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন, ঝুঁকিবহন ইত্যাদি বাণিজ্যের কার্য।

ব্যবসা	বাণিজ্য
(৫) পণ্য-বিনিময়ই ব্যবসায়ের একমাত্র কার্য।	(৫) দৃশ্য ও অদৃশ্য বিনিময়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
(৬) ব্যবসায়ের পরিধি সীমিত।	(৬) বাণিজ্যের পরিধি বিস্তৃত।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Industry, Trade and Commerce) :

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচিত হইল :

শিল্প	ব্যবসা-বাণিজ্য
(১) যে কোন প্রকার সম্পদ উৎপাদনের কার্যকে শিল্প বলে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা মূলধন জাতীয় উৎপাদনকার্যকে বলে শিল্প।	(১) উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টন ও ব্যবসা-সহায়ক কার্যকে ব্যবসা-বাণিজ্য বলে।
(২) শিল্প বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, যেমন, নিষ্কাশন-শিল্প, প্রস্তুতকারী-শিল্প, গঠনাত্মক-শিল্প, প্রজনন-শিল্প, সেবা পরিবেশন-শিল্প ইত্যাদি।	(২) ব্যবসা-বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক হইতে পারে। ইহা ছাড়া, পাইকারী ব্যবসা, খুচরা ব্যবসা ইত্যাদি হইতে পারে। ব্যাঙ্কিং, পরিবহণ, বীমা, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার ইত্যাদি ব্যবসা-সহায়ক কার্যাবলী।
(৩) শিল্প আকারগত বা রূপগত উপযোগিতা সৃষ্টি করে।	(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত, স্থানগত ও সময়গত উপযোগিতা সৃষ্টি করে।

কারবারী অনুপ্রেরণা (Business Motivation) :

স্প্রিগেল (Spriegel)-এর মতে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কারবারে অনুপ্রবেশকে কারবারী অনুপ্রেরণা (Business Motivation) বলে। অর্থ উপার্জন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ যে আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া কারবারে লিপ্ত হয়, তাহাকে **কারবারী অনুপ্রেরণা** বলা হয়।

কারবারী অনুপ্রেরণার তাৎপর্য ও কারণ (Significance and Causes of Business Motivation) :

কারবারী অনুপ্রেরণার তাৎপর্য ও কারণগুলি নিম্নে আলোচিত হইল—

(১) **জীবিকা অর্জন (Livelihood) :** বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—কারবারের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করা সম্ভব হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এই কারণে মানুষ কারবারে আগ্রহী হয়। কারবার জীবিকা অর্জনের বৃত্তি বলিয়া মানুষ কারবারে অনুপ্রাণিত হয়।

(২) **মুনাফা লাভ (Profit Earning) :** কারবারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা। ইহা কারবারের ব্যক্তিগত দিক। মুনাফা লাভ কারবারের দক্ষতা নিরূপণ করে, ঝুঁকি বহনে সাহায্য করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

(৩) **ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি (Increase of Wealth) :** কারবারে মুনাফা হইলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং ধন-সম্পত্তি বাড়িয়া যায়।

(৪) **মান-মর্যাদা বৃদ্ধি (Enhancement of Honour and Prestige) :** ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তি বিত্তবান হয় এবং সমাজে তাহার মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব বিস্তারিত হয়।

(৫) **স্বাধীন প্রচেষ্টা (Independent Effort) :** অনেক ব্যক্তির চাকুরীতে অনীহা আছে। তাহাদের পক্ষে কারবারে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে তাহার স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ আসে।

(৬) **সেবার মনোবৃত্তি (Service Attitude) :** যাহারা শুধু মুনাফা লাভের জন্যই কারবারে অনুপ্রাণিত হয় না তাহাদের কারবারী অনুপ্রেরণার উৎস হইল সেবার মনোভাব। শিল্পোন্নতি ও সামাজিক উন্নতিকল্পে অনেক ব্যক্তি কারবারে প্রবেশ করে।

(৭) **আর্থিক নিরাপত্তা (Economic Security) :** ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য অধিক আয় ও সঞ্চয়ের আশায় মানুষ কারবারে অনুপ্রাণিত হয়।

(৮) **পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Planning and Decision-making) :** প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা রচনা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিকল্পনা হইল বিচক্ষণতার সহিত ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের ছক তৈয়ারী করা ও সেই অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়া। প্রত্যেক কারবারীকে উপযুক্ত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়।

(৯) **প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (Administration and Management) :** ব্যবস্থাপনার কার্য কারবারের সামগ্রিক রূপ। বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে কারবারের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়। কারবারের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যাবলীর সমন্বয় সাধিত হয়। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপক অর্থে একই; কিন্তু বাস্তবে প্রশাসনের কাজ হইল পরিকল্পনা ও সংগঠন করা এবং ব্যবস্থাপনার কাজ হইল অনুপ্রাণিতকরণ, নির্দেশনা, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। প্রশাসন লক্ষ্য, কর্মনীতি ও কর্মপন্থা নির্দেশ করে এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা উহা রূপায়িত হয়।

(১০) **উত্তরাধিকার সূত্র (Inheritence) :** অনেক ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কারবার বংশধরগণকে কারবারে অনুপ্রাণিত করে। এক্ষেত্রে পারিবারিক স্বার্থ রক্ষা করা কারবারে অনুপ্রবেশের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

(১১) **সামাজিক কারণ (Social Causes) :** কল্যাণমূলক সরকার কারবারে প্রবেশের অনুপ্রেরণা পায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার পরিবেশনের জন্য। সরকার উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

ত্বরান্বিত করিতে আগ্রহী। নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবার জন্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার জন্য, বেকারত্ব দূর করিবার জন্য এবং বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইবার জন্য সরকার কারবারে অনুপ্রাণিত হয়।

সার্থক কারবারের অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ (Requisites of a Successful Business) :

কারবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। কারবারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। একটি সার্থক কারবারের অপরিহার্য বিষয়গুলি হইল :

(১) **সঠিক উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ (Establishment of Objectives and Policies) :** পিটার ড্রাকারের মতে যেখানে কারবারের কার্য সম্পাদন ও ফলাফলের উপর উহার অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে, সেখানে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং সার্থক কারবারে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(২) **সঠিক পরিকল্পনা (Proper Planning) :** উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছক প্রস্তুত করে।

(৩) **সঠিক অবস্থান, বিন্যাস ও আয়তন (Proper Location, Layout and Size) :** একটি সফল কারবারের জন্য প্রয়োজন সঠিক স্থান নির্বাচন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সঠিক বিন্যাস এবং উপযুক্ত আয়তন। কারবারের আয়তন নির্ধারণে অন্যতম প্রধান বিষয় হইল মূলধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

(৪) **সুদৃঢ় সংগঠন (Sound Organisation) :** সংগঠন বলিতে একটি পদ্ধতিকে বুঝায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান, কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদিত হয়। সঠিক কর্মবিভাজন, কর্তৃত্বের ভারার্পণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সংগঠন সুদৃঢ় করা যায়। পিটার ড্রাকারের মতে, কারবারের ভিত্তি হইল সঠিক সংগঠন। ত্রুটিপূর্ণ সংগঠন সমন্বয়ের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং কারবারের সাফল্য বিঘ্নিত করে।

(৫) **সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা (Efficient Management) :** উত্তম ব্যবস্থাপনা কর্ম ও কর্মীকে সঠিক পথে চালিত করিয়া সংগঠনের উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করে। হেনরি ফেয়লের মতে, পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলা যায়।

(৬) **পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান (Adequate Financing) :** কারবারের প্রকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজন হয়। কারবারের সাফল্য নির্ভর করে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের উপর।

(৭) **ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা (Risk-bearing Capacity) :** কারবারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের ক্ষমতা সফল কারবারের অন্যতম অপরিহার্য বিষয়।

(৮) **সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা (Smooth Distribution system)** : উৎপাদিত পণ্য অথবা ক্রীত পণ্য উপযুক্ত পরিমাণ ও মূল্যে ক্রেতার নিকট সঠিক সময়ে পৌছাইলে কারবারে সাফল্য আসে। সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহা সম্ভব।

(৯) **সুমধুর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক (Sweet Labour-Management Relations)** : শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা কারবারের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ইহার ফলে অবাঞ্ছিত ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ রোধ করা যায় এবং কাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কর্মীরাই কারবারের স্তম্ভ। তাহাদের কর্মকুশলতা ও কারবারের সাফল্য অনেকাংশে সুমধুর শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

(১০) **গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ (Scope for Research and Development)** : পরিবর্তনশীল জগতে কারবারের সাফল্য নির্ভর করে নূতন পণ্য ও নূতন বাজার সৃষ্টির উপর। গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া কারবারের অস্তিত্ব বজায় এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব।

উত্তম কারবারীর অপরিহার্য গুণাবলী (Essential Qualities of a Successful Businessman) :

কারবারের সাফল্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(ক) আর্থিক সম্বল (খ) কারবারীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতা। কারবারীকে কারবারের ক্যাপ্টেন বা অধিনায়ক (Captain) বলা যায়। একজন উত্তম কারবারীর নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন :

(১) **শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational Qualification)** : একজন কারবারীর অন্ততঃ সাধারণমানের শিক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে কারবার গঠন ও পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(২) **মেধা (Intelligence)** : কারবারীকে একজন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে। উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা কারবারে সাফল্য আনে।

(৩) **নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা (Leadership Qualities)** : নেতৃত্ব কারবারে নির্দেশপ্রদান ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ইহাতে অনুগামীদের মনে আস্থার সৃষ্টি হয় এবং কর্মীদের সহযোগিতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ড্রাকারের মতে সৃজনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে কারবারী কারবারে সাফল্য আনিতে পারে।

(৪) **ব্যবস্থাপনাগত ও সাংগঠনিক যোগ্যতা (Managerial and Organisational Abilities)** : কারবারীর কাজ হইল দ্রুত সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করা। স্বল্প সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। কারবারীর উপযুক্ত সাংগঠনিক দক্ষতা কারবারের জমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সৃষ্টি করিয়া উৎপাদনে দক্ষতা আনে।

(৫) **সেবার মনোভাব (Service Motive)** : সেবার মনোভাব না থাকিলে মানুষের অভাব দূর করা যায় না। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঠিক সময়ে যোগান দিয়া কারবারীকে ভোক্তার সন্তুষ্টি আনিতে হয় এবং ইহাতে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(৬) ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা (Risk-bearing Capacity) : প্রত্যেক কারবারে ঝুঁকি থাকে। বড় কারবারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অনেক বেশী। কারবারীকে ঝুঁকি বহনের ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে।

(৭) দূরদর্শিতা ও উৎসাহ (Foresightedness and Initiative) : কারবারীকে ভবিষ্যৎ অনুমান করিবার মত কল্পনাশক্তি থাকিতে হইবে এবং উত্তম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সফল কারবারীর অপরিহার্য বিষয়।

(৮) সততা (Honesty) : সততা কারবারে সুনাম বৃদ্ধি করে এবং খরিদ্দারের মনে আস্থা সৃষ্টি করে। অসৎ উপায়ে স্বল্পকালীন লাভ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু কারবারে স্থায়ী সাফল্য নির্ভর করে কারবারীর সততার উপর। এই প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কন-এর প্রখ্যাত উক্তিটি স্মরণযোগ্য : "সবলোককে কিছু সময়ের জন্য, কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা করিয়া রাখা যায় ; কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানান যায় না।" (You can befool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time.)

(৯) সজাগ দৃষ্টি, সুযোগের সদ্ব্যবহার ও পরিশ্রমী (Alertness, Use of Opportunities and Industrious) : কারবারীকে পরিবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়, সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করিতে হয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কারবারে সাফল্য আনিতে হয়।

(১০) গণতান্ত্রিক মনোভাব (Democratic Attitude) : কর্মচারীদেব অভাব-অভিযোগের প্রতি গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়িতে হয়। ইহাতে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

(১১) উদ্ভাবন (Innovation) : উত্তম কারবারীর উদ্ভাবনী শক্তি থাকা প্রয়োজন। ইহাতে নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান যায়। সুম্পিটার (Schumpeter)-এর মতে উদ্ভাবন মুনাফা বৃদ্ধি করে।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং কারবার
(Economic and Social Systems and Business)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বণ্টন, বাণিজ্যিক কার্যকলাপ, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পৃথিবীতে তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে ; যেমন, (১) ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা (Capitalistic Economy) (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা (Socialistic Economy) এবং (গ) মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)।

সামাজিক ব্যবস্থা ঃ সমাজ বলিতে পরস্পর নির্ভরশীল মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। সমাজে মানবগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ আছে ; যেমন, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, দরিদ্র-শ্রেণী ইত্যাদি। দেশের আর্থিক বনিয়াদ সমাজের বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে। সুতরাং সমাজ ও অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। প্রত্যেক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন আচার, রীতি-নীতি, নিয়ম, নিষ্ঠা, আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। আর্থিক বনিয়াদ কারবারের ক্রমবিকাশ ঘটায়। সুতরাং সমাজ, অর্থনীতি ও কারবার পরস্পর-সম্পর্কিত।

বিশ্বে যে তিন প্রকারের **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** বিদ্যমান তাহাদের আলোচনা করা হইতেছে :

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা (Capitalistic System or Capitalism) ঃ

যে অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বজায় থাকে তাহাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে। ইহা পুঁজিবাদী অর্থনীতি। অ্যাডাম স্মিথ ইহার সমর্থক ছিলেন। ১৭৬০ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটে উহার পটভূমিকায় ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। কার্ল মার্কসের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরীর জন্য দাসত্ব, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও মুনাফার জন্য উৎপাদন হইয়া থাকে। জাপান, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা চালু আছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ** এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়িয়া উঠে।

(খ) **ক্রেতার সার্বভৌমত্ব ঃ** ইহাতে ক্রেতার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে অর্থাৎ ভোগকারীর নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে। ধনতন্ত্রবাদের মতে "ক্রেতাই হইল রাজা"।

(গ) মূল্য ও মুনাফা-ব্যবস্থা ঃ এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফার প্রত্যাশা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। মুনাফা নির্ভর করে মূল্যের উপর আর মূল্য নির্ভর করে ক্রেতার চাহিদা ও পছন্দের উপর।

(ঘ) **প্রতিযোগিতা :** ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় অবাধ উদ্যোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতা থাকে।

(ঙ) **উদ্যোগের স্বাধীনতা :** ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা "ছাড়িয়া দেওয়ার" নীতির (Laissez Faire) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে এবং শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা বজায় থাকে।

(চ) **শ্রেণীভেদ :** এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় বিত্তবান, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী গড়িয়া উঠে।

(ছ) **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ :** ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পূজারী।

সুবিধা :

(১) **প্রতিযোগিতা :** উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকার জন্য উৎপাদকগণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ফলে দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়।

(২) **উৎকর্ষ বৃদ্ধি :** ইহাতে দ্রব্যের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

(৩) **পছন্দসই দ্রব্য :** ইহাতে উৎপাদক ক্রেতার পছন্দমত দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ক্রেতা পরিতৃপ্ত হয়।

(৪) **স্বয়ংক্রিয় কার্য :** ধনতন্ত্র মূল্য ও মুনাফার মধ্য দিয়া স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করে।

(৫) **অর্থনৈতিক বিকাশ :** ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক অনিয়ন্ত্রিত ক্রমোন্নতির হার বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা :

(১) **একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি :** অবাধ প্রতিযোগিতা ও অর্থ-ব্যবস্থায় একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয়।

(২) **ধনবৈষম্য বৃদ্ধি :** এই অর্থ-ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(৩) **শোষণ :** ইহাতে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি হয় বলিয়া ধনীরা দরিদ্রগণকে শোষণ করিতে পারে।

(৪) **ক্রেতার বিভ্রান্তি :** ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন, প্রচার ও বিক্রয়-কৌশলের দরুন ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়।

(৫) **মুনাফাবাজী :** অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারবার চালনা করা হয় বলিয়া ইহাতে ক্রেতা ও সমাজ শোষিত হয়।

(৬) **অপচয় :** ইহাতে প্রচারের জন্য বহু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হয়।

(৭) **অভাব বৃদ্ধি :** এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ধনীরাই অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। দরিদ্ররা কোন সুবিধা পায় না।

(৮) **বেকারত্ব :** বাণিজ্যচক্র ও বেকারত্ব এবং শ্রমিকশোষণ এই ব্যবস্থায় প্রকট হয়। ইহার কারণ হইল "কার্যকরী চাহিদার" অপার্যপ্ততা।

(৯) **সম্পদের অসম বণ্টন :** ইহাতে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় না।

(১০) **সামাজিক দুর্নীতি :** ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় কর্মহীনতা, মজুতদারী, দাসত্ব, কালোবাজারী, মুদ্রাস্ফীতি ও উৎকোচগ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীর সৃষ্টি হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Socialistic System or Socialism) :

যখন উৎপাদনের সমস্ত উপাদান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে এবং দেশের সম্পদ সমাজের সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়, তখন সেই অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে। কার্ল মার্কস এই অর্থনীতির প্রবর্তক। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অর্থনীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য :

(১) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার পরিপন্থী।

(২) ইহাতে উৎপাদনের উপাদানসমূহ যেমন, জমি, মূলধন ও কারবার সংগঠন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে থাকে।

(৩) ইহাতে অবাধ উদ্যোগের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিকল্পনা থাকে। রাষ্ট্র সমষ্টিগতভাবে স্থির করে কি উৎপাদন করা হইবে, কতখানি উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহাদের জন্য উৎপাদন করা হইবে।

(৪) ইহাতে জাতীয় আয় ন্যায়সঙ্গতভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টিত হয়।

(৫) ইহার উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

সুবিধা :

(১) **আয় ও সম্পদ-বৈষম্য দূরীকরণ :** ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় যে আয় ও সম্পদের প্রভূত বৈষম্য দেখা যায় এবং ধনী ও দরিদ্র এই দুই যুযুধান সমাজ শিবির গড়িয়া উঠে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় তাহা উৎখাত করা সম্ভব হয়।

(২) **সরকার দক্ষ হয় :** ইহাতে সরকারী পরিচালন-ব্যবস্থা দক্ষ হয়।

(৩) **নৈতিক মান উন্নত হয় :** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মানুষের অর্থ উপার্জনের স্বার্থপর প্রয়াস না থাকিবার ফলে নৈতিক মান উন্নত হয়।

(৪) **উৎপাদনে প্রাচুর্য :** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলিয়া ক্রেতা লাভবান হয়।

(৫) **মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন :** শিক্ষা, প্রচার ও যোগ্যতার পুরস্কারের মাধ্যমে জনগণের মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করা যায়।

(৬) **বৈজ্ঞানিক বণ্টন সম্ভব :** অধ্যাপক ল্যাংগারের মতে এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদের বৈজ্ঞানিক বণ্টন সম্ভব হয়। ইহাতে মুনাফার পরিবর্তে ব্যবহারের ভিত্তিতে বণ্টন হয়।

(৭) **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে :** ইহাতে কর্মের অধিকার ও জীবনযাত্রার সর্বনিম্ন মানের নিশ্চয়তা থাকে ; ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে।

(৮) **একচেটিয়া বিলোপ :** এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত একচেটিয়ার বিলোপ হয়।

(৯) **বাণিজ্য-চক্রের বিলোপ :** অধ্যাপক স্যুম্পিটারের মতে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের অবসান ঘটে।

(১০) **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান :** ইহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান ঘটে ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়।

অসুবিধা :

(১) **সম্পদের কাম্য বণ্টন সম্ভব নয় :** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হইল কিরূপে সম্পদের কাম্য বণ্টন করা যায়। এই ব্যবস্থায় 'মূল্য-মুনাফা নাই' বলিয়া 'পরীক্ষা ও ভুল' (trial and error) পদ্ধতিতে সম্পদ বণ্টন হয় এবং ইহা যুক্তিযুক্ত নাও হইতে পারে।

(২) **উদ্দেশ্য ও পূর্বিতা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় উদ্দেশ্য পূর্ব হইতেই স্থির হয় ও পূর্বিতা (priority) স্থির করিয়া সম্পদ বণ্টন করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইলে উদ্দেশ্য ও পূর্বিতা পরিবর্তন করা সহজ হয় না।

(৩) **কাজে প্রেরণার অভাব :** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদ সঞ্চয়ে বাধা আছে বলিয়া ইহা কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায় না। ইহাতে ব্যক্তিগত প্রতিভা নষ্ট হয়।

(৪) **শাসন-সংক্রান্ত দক্ষতার অভাব :** এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার সমস্যা হইল শাসন-সংক্রান্ত দক্ষতার অভাব।

(৫) **আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ :** ইহাতে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অসুবিধা দেখা যায়।

(৬) **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া :** এইপ্রকার অর্থ-ব্যবস্থায় সরকার একচেটিয়া ক্ষমতায় বলীয়ান হয়। রাষ্ট্র ইচ্ছামত দ্রব্যমূল্য স্থির করে।

মিশ্র অর্থনীতি
(Mixed Economy)

ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন : আধুনিক ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যথেষ্ট ত্রুটি আছে এবং দিন দিন ইহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত যাহাই হোক না কেন, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্য আজ দেশের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আর এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের কার্য একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থান (co-existence) ঘটে, তাহাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমষ্টির কল্যাণের উপরেই সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রসঙ্গতঃ, কতকগুলি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের (Public Utility Concerns)

কথা ধরা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রেল পরিবহণ, ডাক ও তার, পানীয় জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, জীবনবীমা, বিমান পরিবহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য জনসেবা; মুনাফা ইহাদের গৌণ উদ্দেশ্য। এই সকল ক্ষেত্রে জনসেবার দায়িত্বের দিক কতটা পালন করা হয় এবং মুনাফা অর্জনের উপরেই বা কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সে বিষয়ে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জনস্বার্থের দিক কোন ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (State Control) বিশেষ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় কারবার **রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও মালিকানায় (State Ownership)** স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাকেই আমরা সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) বলিয়া অভিহিত করি।

শ্রমিক কল্যাণের (Labour welfare) দিক বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্র বহুকাল হইতেই শিল্প ও বাণিজ্যে **শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানা আইন-কানুন** রচনা করিয়া আসিতেছে। ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থে **পণ্যের গুণগত মান (Qualitative Standard)** বজায় রাখিবার জন্য বহু শিল্পে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইভাবে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন, সমাজে উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক-ব্যবস্থায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে ইহার উচ্ছেদ করিয়া উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং পরিচালনা প্রবর্তিত হইয়াছে। দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা যেন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার শীর্ষে রহিয়াছে রাষ্ট্র বা জাতীয় সত্তা, তাই সমগ্র দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশও ধনতন্ত্রের কিছুটা রদবদল করিয়া এইরূপ **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের** পক্ষপাতী হইয়াছে।

একটি কারবারের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কাজের মধ্যে যেরূপ সমন্বয় ও ভারসাম্য (Co-ordination and Balance) প্রয়োজন, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যেও সেইরূপ **সমন্বয় ও ভারসাম্য** প্রয়োজন। কেননা, দেশের সকল কারবারের উদ্দেশ্যই এক, অর্থাৎ বাঞ্ছিত পণ্য ও সেবার সাহায্যে মানব-সমাজের বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তি করা। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এত জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মূল ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তার উপর আর নির্ভর করা চলে না। তাই জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য বর্তমানে এক মিশ্র অর্থ নৈতিক (Mixed Economy) ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে। **এইরূপ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা (Private Ownership) ও স্বাধীন উদ্যোগের (Free Enterprise) পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পরিলক্ষিত হয়।** ব্যক্তিগত মালিকানা ও

পরিচালনায় যে সকল শিল্প ও বাণিজ্য রহিয়াছে, তাহাকেই আমরা **বেসরকারী ক্ষেত্রের** (**Private Sector**) শিল্প-বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করি। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনে সর্বজাতীয় কারবারের কার্য সমন্বয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও রচিত হয়। এই জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান ঘটান হয় নাই, কারণ জাতীয় কল্যাণে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে (Socialistic Pattern) গঠিত। অতএব ভারতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রভাবই অধিক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বাধীন উদ্যোগের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। তাই **সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মিশ্রণে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটি গড়িয়া উঠিয়াছে।** প্রথমতঃ, **সরকারী ও বেসরকারী কারবার-সমূহের জন্য একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি** বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের পক্ষে যে-কোন শিল্প-বাণিজ্যে অবাধে প্রবেশের অধিকার আর নাই। দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী কারবারসমূহকে **আপন গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়।** শ্রমিক, ক্রেতা বা পণ্যমূল্য প্রভৃতি বিভিন্ন জনস্বার্থ-সম্পর্কীয় নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনার অধিকারও সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া **ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প-স্থাপন বা বাণিজ্য পরিচালনা বর্তমানে বহুল পরিমাণে সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ।** এইভাবে ভারতে মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত কারবারের স্বাধীনতা ও উদ্যম বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক কাঠামো কালের গতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Features or Characteristics of Mixed Economy) :

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুই পরস্পর-বিরোধী ব্যবস্থার সংমিশ্রণ। ইহাতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গুণসমূহ গ্রহণ করা হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই থাকে। **যে অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহ-অবস্থান থাকে, সেই অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।** ইহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাগ করিয়া লয়। মিশ্র অর্থনীতিকে "নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি" বলিয়াও অভিহিত করা হয়। সমষ্টিগত অর্থনীতির (Macro-economics) নীতিগুলি ও ব্যষ্টিগত অর্থনীতির (Micro-economics) প্রণালী দ্বারা এইরূপ অর্থনীতি চালিত হয়। ভারতে এইরূপ অর্থনীতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নীতিতে মিশ্র অর্থনীতির আদর্শ ক্রমবর্ধমানহারে প্রতিফলিত হইতেছে। নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে মিশ্র অর্থনীতির আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হইল :

(১) **সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহ-অবস্থান**ঃ অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। ইহাদের পরস্পরের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব সরকারের শিল্পনীতিতে ঠিক করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র পরস্পর পরস্পরের **পরিপূরক** হিসাবে কাজ করিবে।

(২) **সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ**ঃ কোন্ কোন্ শিল্প সরকারী ও কোন্ কোন্ শিল্প বেসরকারী আওতায় থাকিবে সরকারী শিল্পনীতিতে তাহা ঘোষিত হইয়াছে। ভারতে শিল্পগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগে দেশরক্ষা, সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যোগাযোগ ইত্যাদি শিল্প, যেমন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি **১৭টি** শিল্প সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইবে। দ্বিতীয় বিভাগে **১২টি** শিল্প, যেমন, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার ইত্যাদি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপন ও সম্প্রসারিত হইবে। **অবশিষ্ট শিল্পসমূহকে** তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সরকার এই ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে পারে।

(৩) **বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ**ঃ বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজন হইলে সরকার বেসরকারী উদ্যোগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে অথবা উহা জাতীয়করণ করিতে পারে। প্রয়োজনে যৌথ-মূলধনী কারবারের পরিচালনায় সরকার হস্তক্ষেপ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের **শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন** অনুসারে বৃহৎ শিল্প আরম্ভ করিবার জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহা ছাড়া সরকার উৎপাদন ও উৎপাদনে উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য **উন্নয়ন পরিষদ** এবং **কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ** গঠন করিতে পারে।

(৪) **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের ভারসাম্য রক্ষা**ঃ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, যথাযথ বণ্টন ও সর্বাত্মক কল্যাণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সমন্বয় প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হয়। সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা তৈয়ারী করে এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যাবলী নির্দেশ করিয়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়ন করে। উভয় ক্ষেত্র একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে।

(৫) **সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত স্থিরীকরণ**ঃ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময়ে মূলধনের বিনিয়োগের অনুপাত কি হইবে ইহা পূর্বেই স্থিরীকৃত থাকে। সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান।

পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার

	সরকারী ক্ষেত্র	বেসরকারী ক্ষেত্র
প্রথম পরিকল্পনা	৫০%	৫০'
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৬১%	৩৯%
তৃতীয় পরিকল্পনা	৬১%	৩৯%
চতুর্থ পরিকল্পনা	৬৪%	৩৬%
পঞ্চম পরিকল্পনা	৭০%	৩০%
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	৫৩%	৪৭%
সপ্তম পরিকল্পনা	৫৬%	৪৪%

(৬) **প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা :** আয়বণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য প্রগতিশীল কব-ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। আয়কর, সম্পত্তিকর, দানকর, মূলধনী লাভ ইত্যাদি করকে প্রগতিশীল কর বলা হয়।

(৭) **অবাধ বাণিজ্য-নীতির অবসান :** বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতিতে বাধা দিবার জন্য লাইসেন্স দিবার কড়াকড়ি কবা হইয়াছে এবং বহির্বাণিজ্য সরকাবী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে।

(৮) **সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রসার :** সামাজিক নিরাপত্তা আইন-প্রণয়ন ও প্রবর্তনের দ্বারা শ্রমিক-কর্মচাবীর সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা মিশ্র অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। কারখানা আইন, শিল্প বিরোধ আইন, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বীমা আইন, শ্রমিকের ক্ষতিপূবণ আইন, নিম্নতম মজুরী আইন, ভবিষ্যনিধি আইন, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা।

(৯) **যৌথ উদ্যোগ :** ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালনায় যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিভা ও মূলধনের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া উন্নত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

(১০) **যৌথ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় সরকারী হস্তক্ষেপ :** ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে কোম্পানীর গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন, সংখ্যালঘু শেয়ারগ্রহীতাগণেব স্বার্থরক্ষা, পরিচালকমণ্ডলীতে সরকারী মনোনয়ন, মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্প্রসারিত হইয়াছে।)

ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের যৌক্তিকতা (Rationale behind the adoption of Mixed Economy) :

ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের যৌক্তিকতা হইল :

(১) সম্পদ ও আয় বৈষম্য দূর করা। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। ইহাতে একচেটিয়া কারবারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় ও

জনগণ শোষিত হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য, বেকারী দূর করিবার জন্য, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়িবার জন্য মিশ্র

(২) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা থাকে বলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়। মিশ্র অর্থনীতি ব্যষ্টির কল্যাণের সহিত সমষ্টির কল্যাণের সামঞ্জস্য আনে বলিয়া ইহা যুক্তিযুক্ত।

(৩) রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া জনসেবার পথ সুগম করিতে পারে।

(৪) দেশরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারী কারবার গড়িয়া তুলিতে হয়।

(৫) শ্রমিক কল্যাণের জন্য সরকারকে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিকশোষণের পথে বাধা পায়।

(৬) সম্ভোগকারী যাহাতে ন্যায্য দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে পায় সেজন্য মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োজন। ইহাতে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা হয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফাবাজী নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় দেশের অর্থনৈতিক দায়িত্বের সমন্বয় ঘটে।

(৮) ইহাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর সরকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতে পারে। ফলে শ্রমিকশোষণ ও ক্রেতাশোষণ বন্ধ হয়।

(৯) বেসরকারী ক্ষেত্র মুনাফার সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারবার গড়িয়া তোলে। ফলে আঞ্চলিক অর্থনীতি উন্নত হয়। কিন্তু শরীরের সমস্ত রক্ত যদি মুখে জমা হয় আপাতদৃষ্টিতে ইহা সুন্দর মনে হইলেও উহা যেমন সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে তেমনি কয়েকটি মুষ্টিমেয় অঞ্চল যেমন, কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, কানপুর ইত্যাদি অঞ্চলের উন্নত অর্থনীতি নিশ্চয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষণ নহে। সরকারী ক্ষেত্রকে অনুন্নত অঞ্চলে অর্থনীতির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়া আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

(১০) বেসরকারী ক্ষেত্র মূলধন বেশী লাগে বলিয়া ভারী ও মূল শিল্পে বিনিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু, ভারী ও মূল শিল্প দেশের শিল্প-বনিয়াদ গড়িয়া তোলে। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রকে মূল ও ভারী শিল্পের দায়িত্ব নিতে হয় বলিয়া মিশ্র অর্থনীতি যুক্তিযুক্ত।

(১১) যে সকল শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের দ্রুত ফল বা লভ্যাংশ পাওয়া যায়, বেসরকারী ক্ষেত্র সেই সকল শিল্পে বিনিয়োগে প্রেরণা পায়; যেমন, ভোগ্যদ্রব্য শিল্প। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের প্রসারের জন্য সরকারী ক্ষেত্রকে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োজন আছে।

(১২) পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইলে, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করিতে হইলে ও বণ্টন-ব্যবস্থায় সাম্য আনিতে মিশ্র অর্থনীতি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

মিশ্র অর্থনীতির সুবিধা (Advantages of Mixed Economy) ঃ

(১) মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান হয়।

(২) ইহাতে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার গুণগুলি বজায় থাকে, যেমন—

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ;

(খ) শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ;

(গ) বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি হয়।

(৩) মিশ্র অর্থনীতিতে সীমিতভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে।

(৪) এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয় না বলিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আয় বৃদ্ধি পায় ; ফলে কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

(৫) ইহাতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু হয় বলিয়া শ্রমিক ও ভোক্তা শোষণ অবাধে চলিতে পারে না।

(৬) অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র দ্রুত উন্নত হয় এবং আয় ও ধন-সম্পদ উপযুক্তভাবে বণ্টন করা সম্ভব হয়।

(৭) ইহাতে আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস পায়।

(৮) ইহাতে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যায়।

(৯) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য আনা সম্ভব হয়।

(১০) প্রয়োগ কৌশল, প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ও পরিচালনায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিভার সমন্বয় ঘটে।

মিশ্র অর্থনীতির সমালোচনা ও ত্রুটি ঃ

মিশ্র অর্থনীতির বিরুদ্ধে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকেরা জেহাদ ঘোষণা করেন। ধনতন্ত্রের সমর্থকদের মতে মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের কোন গুণই বর্তমান নাই। আবার, সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, মিশ্র অর্থনীতি একটি অবাস্তব কল্পনা। ইহা শ্রমিকদের সাময়িক কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়া তাহাদের ধনতন্ত্রের জালে আবদ্ধ করিবার একটি কৌশল মাত্র। অধ্যাপক পারকিনসন (Parkinson)-এর মতে, ইহা একটি "গোলমেলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা"। স্যুম্পিটারের মতে মিশ্র অর্থনীতি "মুমূর্ষু ধনতন্ত্র"। স্যুম্পিটারের ভাষায় মিশ্র অর্থনীতি হইতেছে : 'মুমূর্ষু ধনতন্ত্র অক্সিজেন শিবিরে' (Capitalism in the Oxygen tent)।

ভারতে মিশ্র অর্থনীতির **ত্রুটিসমূহ** নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তনে ভারতে ধনবৈষম্য ও আয়বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

(২) ইহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বজায় থাকায় অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৩) ইহাতে জাতীয় আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। জাতীয় আয়ের অধিকাংশই এখনও ধনিকশ্রেণীর কুক্ষিভূত।

(৪) বণ্টন-ব্যবস্থায় বেসরকারী ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকায় সুষম বণ্টন ব্যাহত হইতেছে, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইতেছে।

(৫) শিল্পোন্নতির হার আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায় নাই।

(৬) মুদ্রাস্ফীতির হার প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রতিনিয়ত বানচাল করিতেছে।

(৭) মুনাফাবাজীর মনোভাব ক্রেতা ও শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিতেছে।

(৮) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি পরিচালনায় দক্ষতার অভাবে লোকসানে চলিতেছে।

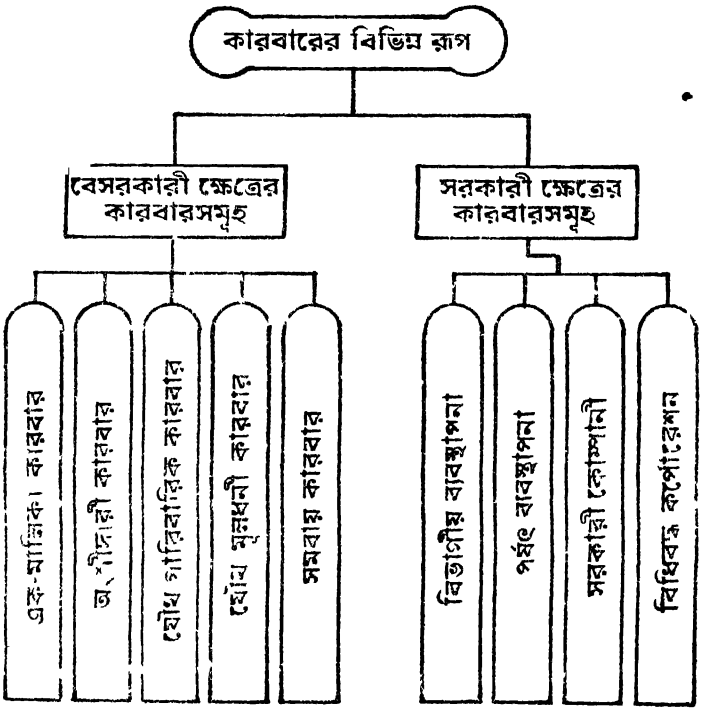
(৯) সরকারী বিভাগীয় ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ফলে জাতীয় চরিত্রে দুর্নীতি বাসা বাঁধিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়	কারবারী কাঠামো (Business Structure)

সমগ্র পৃথিবীতে তিন প্রকার অর্থনীতি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি** (Capitalist Economy)—এই ব্যবস্থায় সমস্ত কারবার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই প্রকার অর্থনীতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি** (Socialist Economy)—এই ব্যবস্থায় সমস্ত কারবারের মালিকানা ও পরিচালনা সরকারের অধীন। ইহা সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।



(গ) **মিশ্র অর্থনীতি** (Mixed Economy)—এই ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার মালিকানা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজ করে। ভারত এই ব্যবস্থার প্রবর্তক।

মালিকানার ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে কারবারী প্রতিষ্ঠানের রূপ নির্ধারণ করা হয়। কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা **ব্যক্তিগতভাবে** (Individual) অথবা

জাতিগতভাবে (National) থাকিতে পারে। কোন কারবারী প্রতি একাধিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং কোন কারবারী প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগতভাবে এক বা একাধিক ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, তাহাকে **বেসরকারী কারবার** (Private Enterprise) বলে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিকে লইয়া যে সম্প্রদায় গঠিত হয়, তাহাকে **বেসরকারী কারবারী ক্ষেত্র** (Private Sector) বলে। ইহা **ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের** জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। আবার কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক অথবা রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক অধিকৃত ও পরিচালিত হইতে পারে। ইহাকে **রাষ্ট্রীয় কারবার** (Public Enterprise) আখ্যা দেওয়া হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টি লইয়া যে কারবারী ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে, উহাকে **সরকারী কারবারী ক্ষেত্র** (Public Sector) বলে। ইহা জাতীয় সমষ্টিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়।

সংগঠনের ভিত্তিতে **বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ** বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। মালিকানার দিক হইতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অথবা এজমালী অধিকারভুক্ত হইতে পারে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়-দায়িত্ব, কারবারে মূলধনের যোগান, মুনাফার অংশ বণ্টন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপ স্থির করা হয়।

বেসরকারী ক্ষেত্রের কারবারী সংস্থাগুলির কাঠামো নিম্নরূপ হইতে পারে :

(১) এক-মালিকী কারবার (Sole-Proprietorship Business)
(২) অংশীদারী কারবার (Partnership Business)
(৩) হিন্দু একান্নবর্তী পারিবারিক কারবার (Hindu Joint Family Business)
(৪) সমবায় সমিতি (Co-operative Society)
(৫) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর (Joint Stock Company)।

কারবার আরম্ভের উদ্যোগ (Launching an Enterprise) :

যে ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিগণ কারবার গঠনের উদ্যোগ নেন তাঁহাকে বা তাঁহাদের উদ্যোগী (Entrepreneur or Promoter) বলে। উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক কারবার সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অসংযুক্ত উপাদানের ও অসংযুক্ত কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উদ্যোগী কারবার স্থাপন করেন। কারবার স্থাপনের উদ্যোগে উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয় :

(১) উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ (Determination of Objectives) : কারবার স্থাপন করিতে হইলে উহার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিতে হয়। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করিয়া উদ্দেশ্য স্থির করা হয়।

(২) **উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা** (**Discovery and Planning**)ঃ কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা, মূলধন, বাজারে মুনাফার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কারবারের সম্ভাবনা বিবেচনা করিতে হয় এবং এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হয়।

(৩) **পণ্য নির্বাচন** (**Choice of Product**)ঃ যে পণ্যের বাজারে চাহিদা বেশী এবং যে পণ্যের কারবারে মুনাফার সম্ভাবনা অধিক, সেইরূপ পণ্য নির্বাচন করিতে হয়।

(৪) **বাজার গবেষণা** (**Marketing Research**)ঃ দ্রব্যের চাহিদা, বাজার প্রতিযোগিতা, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, দ্রব্যের মোড়ক ইত্যাদি বিষয় বাজার গবেষণার সাহায্যে জানা যায়। বাজার গবেষণায় নূতন ক্রেতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

(৫) **মালিকানা নির্বাচন** (**Choice of Ownership**)ঃ কারবারের কাঠামো কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে মালিকানা নির্বাচনের দ্বারা। যেমন, কারবারের একজন উদ্যোগী থাকিলে উহা এক-মালিকী কারবার, একাধিক মালিক থাকিলে অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী কারবার গড়িয়া উঠে। উদ্যোক্তাকে মালিকানা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারবারের প্রকৃতি, আকার, মূলধন, ঝুঁকি, দায়-দায়িত্ব, নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া মালিকানা নির্বাচন করিতে হয়।

(৬) **কারবারের আয়তন ও পরিসর** (**Size and Scale of Business**)ঃ উদ্যোক্তাকে স্থির করিতে হইবে যে, কারবারের আয়তন ও পরিধি বৃহৎ হইবে, না মাঝারী হইবে, না ক্ষুদ্র হইবে। এই প্রসঙ্গে তাহাকে পণ্যের প্রকৃতি, বাজারের বিস্তৃতি ও গড় উৎপাদন-ব্যয় বিবেচনা করিতে হয়।

(৭) **মূলধন** (**Capital**)ঃ মূলধন কারবারের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারবারের জন্য স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন। এই দুই প্রকার মূলধন সংগ্রহের উপায় ও তাহাদের অনুপাত স্থির করা উদ্যোক্তার কাজ।

(৮) **অবস্থান** (**Location**)ঃ কারবারের প্রকৃতি অনুসারে কারবারের স্থান নির্বাচন করিতে হয়। কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন, বাজার, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কারবারের স্থান নির্বাচন করিতে হয়।

(৯) **আইনগত আনুষ্ঠানিকতা** (**Legal Formalities**)ঃ এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবার গঠনে আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হয় না। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবার গঠনে নানাবিধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, মেমোরাণ্ডাম, আর্টিকেলস্ এবং নানাবিধ দলিল প্রণয়ন করিয়া কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট পাঠাইতে হয় এবং কোম্পানীকে বিধিবদ্ধ করাইতে হয়।

(১০) **কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ** (**Appointment of Employees and Managers**)ঃ কারবার স্থাপনে বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে হয়।

উদ্যোক্তা নিজেও ব্যবস্থাপকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণের বেতন, সুযোগ-সুবিধা, কর্তব্য ও দায় স্থির করাও উদ্যোগীর অন্যতম কার্য।

(১১) **সরকারী আইন ও নিয়ন্ত্রণ** (**Government Regulations and Control**) ঃ কারবার বর্তমানে অবাধে চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা নিয়ন্ত্রিত। কারবার সম্পর্কিত নানাবিধ আইন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ কি তাহা বিবেচনা করিয়া উদ্যোগীকে কারবার আরম্ভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। সরকারের কর-ব্যবস্থা এবং শিল্পনীতি কারবার স্থাপনে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

কারবারের কাঠামো নির্বাচন (Choice of Form of Business) ঃ

কারবারের প্রকৃতি, আয়তনের পরিসর, মূলধনের পরিমাণ, মালিকানার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, আভ্যন্তরীণ সংগঠন, করের চাপ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন্ কারবারে কিরূপ মালিকানা উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে হয়।

মালিকানার ভিত্তিতে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ কারবারী কাঠামো উপযুক্ত হইবে তাহা নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে :

(১) **গঠনের সুবিধা** (**Facility of Formation**) ঃ যে কারবার গঠনে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা কম, কর-মাশুল ইত্যাদির চাপ স্বল্প এবং অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ কারবার গঠনের সুবিধা থাকে। এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবার গঠনে এইরূপ সুবিধা পাওয়া যায়। যৌথ-মূলধনী কারবারে নানাবিধ গঠন-সংক্রান্ত আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হয় বলিয়া এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবার গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দেখা যায়।

(২) **মূলধন** (**Capital**) **:** স্বল্প মূলধনে কারবার করা সম্ভব হইলে এক-মালিকী কারবারই শ্রেয়। একাধিক ব্যক্তির স্বল্প মূলধন একত্রিত করিয়া অংশীদারী কারবার গঠিত হইতে পারে। কিন্তু যে কারবারে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয়, সেখানে যৌথ কোম্পানী গঠন করা যুক্তিযুক্ত। ইহাতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা যায় এবং বহু ব্যক্তির মধ্যে মূলধনের ঝুঁকি ছড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয়।

(৩) **দায়-দায়িত্ব** (**Liability**) **:** কারবারীর দায়-দায়িত্ব সসীম অথবা অসীম হইতে পারে। এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবারের দায়-দায়িত্ব অসীম ; অর্থাৎ মালিক ও অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে কারবারে ঋণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকেন। কারবারের সম্পত্তি ঋণ পরিশোধে অপর্যাপ্ত হইলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকে। অংশীদারের দায়-দায়িত্ব আরও বেশী। কারণ অংশীদারগণ একক এবং যৌথভাবে কারবারের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকে। পক্ষান্তরে যৌথ-মূলধনী কারবারের দায়-দায়িত্ব শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং কারবারের কাঠামো নির্বাচনে দায়-দায়িত্ব সসীম না অসীম থাকা সমীচীন হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হয়।

(৪) **স্থায়িত্ব (Stability)**ঃ এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব স্বল্প হইতে পারে। কারণ, মালিকের মৃত্যু হইলে অথবা মালিক অক্ষম হইলে, অবসর গ্রহণ করিলে, দেউলিয়া হইলে কারবার উঠিয়া যাইতে পারে। অংশীদারী কারবার খুবই ক্ষণভঙ্গুর। শুধু যে কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর, অক্ষমতা অথবা দেউলিয়া হইলে অংশীদারী কারবার উঠিয়া যাইতে পারে তাহা নহে, কোন অংশীদার খেয়াল-খুশীমত কারবার হইতে চলিয়া গেলে এবং অংশীদারী চুক্তিনামায় অন্যথা না থাকিলে তৎক্ষণাৎ কারবার উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু, যৌথ-মূলধনী কারবার আইনসৃষ্ট বিধিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আইনই কোম্পানী গঠন করে এবং একমাত্র আইনের দ্বারাই কোম্পানীর অস্তিত্বের অবসায়ন ঘটিতে পারে। সুতরাং স্থায়িত্বের দিক হইতে কোম্পানী কাঠামো শ্রেয়। দীর্ঘস্থায়ী কারবার গঠন করিতে হইলে কোম্পানীর আকারে উহা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

(৫) **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইনের বাধ্য-বাধকতা (Government Regulation and Legal Formalities)**ঃ যে কারবার গঠন করা হইবে তাহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতখানি এবং আইনের কড়াকড়ি কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া কারবারী কাঠামো নির্বাচন করিতে হয়। কোম্পানী গণতান্ত্রিক সংস্থা বলিয়া ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইনের বাধ্য-বাধকতা এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী।

(৬) **সদস্যসংখ্যা (Number of Members)**ঃ যদি এককভাবে কারবার গঠনের ইচ্ছা থাকে তবে এক-মালিকী, স্বল্প সংখ্যক সদস্য লইয়া কারবারের জন্য অংশীদারী এবং বহু লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় যৌথ-মূলধনী কারবার গঠন করা হয়।

(৭) **আইনগত মর্যাদা ও সত্তা (Legal Status and Entity)**ঃ এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবারের কোন পৃথক সত্তা ও আইনগত মর্যাদা থাকে না। মালিক ও কারবারী সত্তাকে পৃথক করা যায় না; কিন্তু যৌথ কারবারের আইনগত পৃথক সত্তা আছে। কোম্পানী একটি কৃত্রিম বিধিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব। ইহার চিরন্তন অস্তিত্ব আছে।

(৮) **পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ (Management, Control and Decision-making)**ঃ যিনি কারবার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিজ হাতে রাখিতে ইচ্ছুক তিনি এক-মালিকী কারবার স্থাপন করেন। অংশীদারী কারবারেও পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব হয়। কারণ অংশীদারগণ নিজেরাই পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব। যৌথ কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন না; কর্মাধ্যক্ষগণ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হয়। পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বটে, তবে সদস্যগণ পরিচালনায় পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন না।

(৯) **নমনীয়তা ও গোপনীয়তা রক্ষা (Flexibility and Maintenance of Secrecy)**ঃ পরিবর্তনের সঙ্গে কারবারী নীতি দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব

এক-মালিকী কারবারে। ইহাতে নমনীয়তা সবচেয়ে বেশী। মালিক ব্যতীত অন্য কেহই নীতি ও সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারে না বলিয়া ইহাতে গোপনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা যায়। কিন্তু অংশীদারী ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানী তেমন নমনীয় নহে। গোপনীয়তা রক্ষাও সততার উপর নির্ভর করে।

(১০) **করভার** (**Burden of tax**): কারবারের কাঠামো নির্বাচনে বিভিন্ন করভার বিবেচনা করিতে হয়, কারণ মালিকানাভেদে করের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

(১১) **সম্প্রসারণের সম্ভাবনা** (**Possibility of Expansion**): প্রয়োজনে কারবারকে সম্প্রসারণ করা যাইবে কিনা তাহাও বিবেচ্য। যৌথ-মূলধনী কোম্পানী সহজেই সম্প্রসারণযোগ্য। কিন্তু এক-মালিকী ও অংশীদারী কারবারের সম্প্রসারণে মূলধন বাধা হইতে পারে।

এক-মালিকী কারবার
(Sole-Proprietorship Business)

ঐতিহাসিক সভ্যতার আদিম যুগ হইতে এক-মালিকী কারবারের গতি অব্যাহত রহিয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে ইহা প্রাচীনতম কারবার। সভ্যতার আদিমযুগে মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশে সংগঠিত কারবার হিসাবে এক-মালিকী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। নাম হইতেই বোঝা যায় যে, এই কারবার একজনের অধিকারভুক্ত। আইনের দৃষ্টিতে ইহার নিজস্ব অস্তিত্ব নাই, ইহা মালিকের একটি সম্পত্তি। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কারবারী কারবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক এবং মুনাফার একমাত্র শরিক। আবার কারবারেব সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব (liabilities) একা মালিককেই বহন করিতে হয়। তাহার দায়-দায়িত্ব সীমাহীন (unlimited liabilities)। গেস্টেনবার্গ (Gestenberg) এক-মালিকের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "কারবারীই সর্বস্বের মালিক, কারবারীই সমগ্র ঝুঁকির বাহক" (He owns all, risks all)। আজও পৃথিবীর সর্বদেশে এক-মালিকী কারবার প্রচলিত। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেই এই কারবারের প্রচলন সর্বাধিক।

এক-মালিকী কারবারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics or Features of a Sole-Proprietorship form of Business):

এক-মালিকী কারবারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা অন্যান্য কারবার হইতে এক-মালিকী কারবারকে পৃথক করা যায়:

(১) **মালিকানা** (Ownership): এক-মালিকী কারবারের মালিক একজন।

(২) **গঠন** (Formation): যে কোনও ব্যক্তিই এই প্রকার কারবার পত্তন করিতে পারে। এইরূপ কারবার পত্তন করিতে কোনও বাঁধাধরা আইন-কানুন নাই।

(৩) **মূলধন** (Capital): এই প্রকার কারবারের সমস্ত মূলধন একজন মালিকই যোগায়। সে নিজ সঞ্চয় হইতে মূলধনের সংস্থান করিতে পারে, অথবা নিজ সঞ্চয় পর্যাপ্ত না হইলে ঋণ করিয়াও মূলধনের সংস্থান করিতে পারে।

(৪) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Management): পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মালিকের একারই। তবে মালিক নিজে ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ পরিচালনার দায়িত্ব কর্মচারীর উপর ছাড়িয়া দিতে পারে।

(৫) দায়-দায়িত্ব (Liabilities): কারবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মালিককেই বহন করিতে হয়। কারবারের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্বের জন্য মালিক একাই দায়ী।

(৬) মুনাফা ও ক্ষতি (Profit and Loss): কারবারের মুনাফা মালিক একাই ভোগ করে। কারবারে লোকসান হইলে, লোকসানও মালিক একাই বহন করে।

(৭) সত্তা (Entity): এই প্রকারের কারবার হইতে মালিককে পৃথক করিয়া দেখা হয় না। মালিক ও কারবার একই সত্তা বলিয়া ধরা হয়। যতদিন মালিক ইচ্ছা করিয়া কারবার না গুটায় ততদিনই ইহা চলিতে পারে।

উপরের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এক-মালিকী কারবারে মালিক একজন, সেই একজনই কারবারের দায়-দায়িত্ব বহন করে, সে একাই কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার লইয়া থাকে, কারবারের মুনাফায় কাহারও অংশ থাকে না, অথবা কারবারের ক্ষতিও অপর কেহ বহন করে না।

এক-মালিকী কারবারের সুবিধা (Advantages of a Sole-Proprietorship Business):

(১) গঠনের সুবিধা (Facility of Formation): এক-মালিকী কারবার গঠন অতি সহজ। যৌথ-মূলধনী কোম্পানী অথবা অংশীদারী কারবার পত্তন করিতে যেমন আইন-কানুনের বহু ধারা মানিতে হয়, এক-মালিকী কারবার গঠন করিতে সেইরূপ আইন-কানুন মানিতে হয় না।

(২) ব্যবস্থাপনায় কর্মপ্রেরণা (Motivation in Management): মালিক নিজেই কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করে বলিয়া কারবার অনেক বেশী দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। ইহাতে কারবারের অপচয়ও খুব কম হয়। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণ হওয়ায় মালিকের কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়।

(৩) কর্মচারী ও ক্রেতার সহিত মালিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (Direct relations with Employees and Customers): মালিক নিজেই কারবার পরিচালনা করে বলিয়া কর্মচারী ও কারবারের ক্রেতার সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। ক্রেতার অভাব-অভিযোগের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়। ক্রেতা-সাধারণের সহিত মালিকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে বলিয়া তাহাদের রুচি, পছন্দের গতি ও পরিবর্তন মালিক সহজেই ধরিতে পারিয়া তদনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

(৪) চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা (Absolute Control): একক মালিকানাস্বত্ব থাকায় মালিকের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও চূড়ান্ত। অপরের সহিত পরামর্শ করিবার বাধ্যবাধকতা নাই বলিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

(৫) **কারবারের পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তা** (Flexibility of Business) : অবস্থা অনুসারে কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নীতি সহজেই পরিবর্তন করা যায়। ইহাতে 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হইবার সম্ভাবনা কম।

(৬) **মুনাফা বৃদ্ধি** (Increase in Profit) : কারবারের সম্পূর্ণ মুনাফা একাই ভোগ করিতে পারে বলিয়া কারবারী পরিশ্রম করিয়া কারবারের সাফল্য আনিতে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করিতে উৎসাহ পায়।

(৭) **বিরোধ মীমাংসা** (Settlement of Disputes) : মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে বলিয়া কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ খুব সহজেই মিটান সম্ভব হয়। ইহাতে মালিক-শ্রমিক বিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(৮) **অধিক ঋণসংগ্রহ** (Greater Credit Facility) : এই প্রকার কারবারের দায় সীমাবদ্ধ নহে বলিয়া ইহা বাজার হইতে প্রয়োজনমত সহজে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। কারণ ঋণদাতা ব্যবসায়ীর সততার উপর নির্ভর করিয়া ঋণ দিতে দ্বিধা করে না। প্রয়োজনবোধে সে মালিকের নিজস্ব সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া ঋণ আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৯) **গোপনীয়তা রক্ষা** (Maintenance of Secrecy) : প্রত্যেক কারবার-সংক্রান্ত কার্যকলাপ ও নীতির গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করিতে হয়। এক-মালিকী কারবারে গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভব।

(১০) **সামাজিক দিক হইতে সুবিধা** (Social Advantages) :

(ক) ইহা স্বাধীন জীবিকা অর্জনের সুযোগ দান করে।

(খ) ইহা কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি করিয়া বেকারত্ব দূর করিতে সাহায্য করে।

(গ) ইহা স্বল্পবিত্ত ও অনভিজ্ঞ স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিকে কারবারী সুযোগ দান করিয়া তাহার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটায়।

(ঘ) ইহা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে কারবারে বিনিয়োগের প্রেরণা যোগায় ও মূলধন সৃষ্টি করে।

এক-মালিকী কারবারের অসুবিধা (**Disadvantages of a Sole-Proprietorship Business**) :

এক-মালিকী কারবারের যেমন যথেষ্ট সুবিধা আছে, তেমনি ইহার যথেষ্ট অসুবিধাও রহিয়াছে। উন্নত দেশে বা উন্নত অর্থনীতিতে ইহার প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা পুরাতন বা 'সেকেলে' (Back dated) বা 'অর্থনীতি-বিরুদ্ধ' (Anti-economic) কারবার বলিয়া অভিহিত। ইহার অসুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **মূলধনের অভাব** (Scarcity of Capital) : মালিক একজন বলিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন কারবার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কারণ মালিক বিত্তবান হইলেও তাহার একার

মূলধন যোগাইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কারবার সম্প্রসারণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কারবার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় না।

(২) **সীমাহীন দায়** (Unlimited Liability) : এই জাতীয় কারবারের দায় সীমাহীন বলিয়া কারবারের দায়ের জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও পাওনাদার হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

(৩) **সম্প্রসারণে বাধা** (Obstacles to Expansion) : এক-মালিকী কারবারের মালিকের একার পক্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে মূলধন যোগান অসম্ভব, তেমনি কারবারী খুব দক্ষ হইলেও তাহার কর্মদক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। এই কারণেও কারবার সম্প্রসারণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। কারণ একজন মালিকের পক্ষে হয়তো একটি বড় মনোহারী দোকান দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব, কিন্তু তাহার একার পক্ষে একটি বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা অসম্ভব। সকলেই টাটা বা ফোর্ডের মত দক্ষতাসম্পন্ন কারবারী নহে।

(৪) **স্থায়িত্বের অভাব** (Instability of Business) : এই প্রকার কারবারের স্থায়িত্ব অনেক কম। কারণ আজ কারবারের যে মালিক আছে সে হয়ত খুবই দক্ষ ও পরিশ্রমশীল, কিন্তু তাহার যদি আকস্মিক মৃত্যু ঘটে অথবা কোন কারণে কারবার পরিচালনায় যদি সে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীও যে তাহার মত সমদক্ষতাসম্পন্ন অথবা সমান পরিশ্রমী হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। ফলে উত্তরাধিকারীর হাতে পড়িয়া কারবারটি উঠিয়া যাইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে, বর্তমান মালিক স্বাধীন পেশা হিসাবে কারবারকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী হয়তো ব্যবসা-বৃত্তির পরিবর্তে চাকুরী-বৃত্তি পছন্দ করিবে, ফলে মালিকের মৃত্যুতে কারবারের অবসান ঘটিতে পারে।

(৫) **উত্তরাধিকারীর দক্ষতার অভাব** (Inefficiency of Heir) : কারবারীর একক পরিশ্রমে ও চেষ্টায় কারবার গড়িয়া উঠে। তাহার উত্তরাধিকারী যদি কম যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থাপনায় কারবারের দক্ষতা কমিয়া যাইতে পারে।

(৬) **বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া** (Impact of Danger) : একই মালিকের একাধিক কারবার থাকিলে একটির বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া অন্যগুলির উপর পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক-মালিকী কারবারের যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও রহিয়াছে। কারবারী উদ্যোগী হইলে, কারবারের কর্মচারী ও ক্রেতা-সাধারণের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে পারিলে, বাজারের অবস্থা অনুসারে কর্মপন্থা ও নীতির সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিলে, ক্রেতার রুচি ও পছন্দমত দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিলে এবং নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কার্য করিলে এক-মালিকী কারবার সাফল্য লাভ করিতে পারে। কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি সমস্ত অসুবিধা দক্ষতার সহিত মোকাবিলা করিতে পারে তবে এক-মালিকী কারবারই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ (One man's control is

the best in the world if that one man is big enough to manage everything)।

প্রযোজ্যতা (Suitability) ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এক-মালিকী কারবার প্রযোজ্য :

(ক) যে কারবারে ব্যক্তিগত রুচি ও কলা-কৌশল অনুযায়ী উৎপাদন ও সেবা প্রদান করিতে হয় যেমন, অলংকার ব্যবসা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট ও উকিলের ব্যবসা ইত্যাদি। (খ) ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন, মোমবাতি তৈয়ারীর কারখানা। (গ) যে ব্যবসা স্বল্প মূলধনে হয় যেমন, মুদির দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদি।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
(Joint Hindu Family Business)

একান্নবর্তী হিন্দুদের মধ্যে একপ্রকার পারিবারিক কারবারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার বলিয়া পরিচিত। যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পরিবারের পুরুষ-সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। ভারতে দুই প্রকার উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত—**মিতাক্ষরা** ও **দায়ভাগ**। দায়ভাগ বিধি পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে প্রচলিত এবং মিতাক্ষরা আইন পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যে প্রচলিত।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের মালিকানা স্বত্ব ও সম্বন্ধ, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সংজ্ঞা (Definition of a Joint Hindu Family Business) ঃ

মিতাক্ষরা প্রথা অনুযায়ী পরিচালিত যৌথ হিন্দু পরিবারের কারবার থাকিলে উহাকে যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার বলা হয়। ইহাতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণও কারবারের অংশীদার হইয়া থাকে। তবে অংশীদারী কারবারে যে চুক্তির প্রয়োজন হয় ইহাদের ক্ষেত্রে সেইরূপ চুক্তির প্রয়োজন হয় না। কারণ এখানে পরিবারের সকল পুরুষ-সদস্যই জন্মাধিকারসূত্রে অংশীদার বা শরিক বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু দায়ভাগ প্রথা অনুসারে পরিচালিত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবারের পিতা যদি তাহার পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কারবারের অংশীদার বলিয়া গ্রহণ করে তবেই তাহারা কারবারের মালিক বা শরিক হইতে পারে। ইহারা পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই (অর্থাৎ, পরিবারে জন্মাধিকারসূত্রেই) কারবারের অংশ পায় না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of a Joint Hindu Family Business) ঃ

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) এই প্রকার কারবার পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সভ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহাকে কর্তা বলা হয়। কর্তা কর্মাধ্যক্ষ (Manager) হিসাবে কাজ করে।

(২) কর্তাই কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করে। তবে কারবারের অন্যান্য শরিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তুলিতে পারে, অথবা আলোচনা করিবার দাবি করিতে পারে।

(৩) কারবারের আয়-ব্যয়ের হিসাবও সে-ই তদারক করে।

(৪) শরিকগণ কারবার পরিচালনায় কর্তার সহিত একমত না হইলে, অথবা কর্তার সহিত মতবিরোধ দেখা দিলে কারবারের সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইবার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারে।

(৫) কারবার পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে কর্তা একাই ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কর্তা একা ঋণ গ্রহণ করিলেও কারবারের শরিকগণ প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী ঐ ঋণ শোধ করিবার জন্য দায়ী থাকে।

(৬) এই প্রকার কারবারের কর্তা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। কারবার পরিচালনার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ, কারবারের সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি সে করিতে পারে। ইহা ছাড়া কারবার বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তো কর্তার আছেই ; অধিকন্তু কর্তা মনে করিলে কারবার তুলিয়া দিতেও পারে।

(৭) কারবার-সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা, ঋণ আদায়, মামলা-মোকদ্দমা, আপস-নিষ্পত্তি ইত্যাদি করিবার অধিকার সমস্তই কর্তার উপর ন্যস্ত। কিন্তু কর্তা কারবারের কোন পাওনা মকুব করিতে পারে না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সুবিধা (Advantages of a Joint Hindu Family Business) :

(১) পরিবারের সদস্যদের কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে হয় না, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই কারবার হইতে এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ আয় পাইয়া থাকে।

(২) কারবার পরিচালনার ভার কর্তার উপর ছাড়িয়া দিয়া পরিবারের অন্যান্য পুরুষ-সদস্যগণ চাকুরি অথবা অন্য প্রকার কাজ করিয়া প্রত্যেকেই পৃথকভাবে আয় করিতে পারে। ইহাতে পরিবারের মোট আয় বাড়ে।

(৩) পরিবারের সকল সদস্যই পরিবারের উন্নতিকল্পে কাজ করিতে শিখে।

(৪) পরিবারের পুরুষ শরিকগণ শৈশব হইতেই বয়স্কদের নিকট হইতে কারবার পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিতে পারে।

(৫) পরিবারের সকলেই পরিবারের উন্নতির জন্য কাজ করে বলিয়া প্রত্যেকে তাহাদের পছন্দমত কাজ বাছিয়া লইবার সুযোগ পায়। ইহাতে কারবার শ্রমবিভাগের সম্পূর্ণ সুযোগ ভোগ করিতে পারে।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of a Joint Hindu Family Business) :

(১) কাজ না করিয়াও যখন এক স্থির আয়ের ব্যবস্থা থাকে, তখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কর্মবিমুখতা দেখা যায় এবং তাহারা অলস হইয়া পড়ে।

(২) কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা কেবল কর্তার উপর থাকে বলিয়া অন্যান্য শরিকের মনে অনেক সময় সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে মতবিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৩) এই প্রকার কারবারের সকল সদস্যই কাজ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু কাজ অনুসারে তাহার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে কাজে উৎসাহের অভাব দেখা দিতে পারে।

(৪) কর্তার উপর কারবারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকায় কর্তার কর্তৃত্বের সহিত সদস্যদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দিতে পারে। ইহাতে কাজে উদ্যমহীনতা দেখা দেয়।

(৫) অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক কলহ হইয়া থাকে এবং কলহ হইতে কারবার বিনষ্ট হইয়া যায় এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

অংশীদারী কারবার
(Partnership Business)

অংশীদারী কারবারের সংজ্ঞা (Definition of a Partnership Business) :

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জন করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া কোনও কারবার স্থাপন করিলে, সেই কারবারকে অংশীদারী কারবার বলে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অংশীদারী আইনের (Indian Partnership Act) ৪নং ধারামতে অংশীদারী কারবারের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—অংশীদারী কারবার দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কযুক্ত হইয়া মুনাফা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রত্যেকে অথবা সকলের হইয়া একজন কারবার চালাইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া গঠিত হয়। (Partnership is the relationship which subsists between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all.)

অংশীদারী কারবারে অন্ততঃ ২ জন অংশীদার থাকা প্রয়োজন। অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া একখানি চুক্তিপত্র সম্পাদন হওয়া আবশ্যক। কারবার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কারবার গঠিত হয়। কারবারের মুনাফায় সকল অংশীদারই অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। অংশীদারী কারবারের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অংশীদারগণ সকলে একত্র হইয়া অথবা সকল অংশীদারের পক্ষে একজন বা একাধিক অংশীদার কারবার পরিচালনা করিতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদারই অন্যান্য অংশীদারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে পারে। কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান অংশীদারী কারবার কিনা তাহা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিচার করা হয়।

ব্যাঙ্কিং কারবারে নিযুক্ত অংশীদারী কারবারে ১০ জনের অধিক অংশীদার থাকিতে পারে না, আর ব্যাঙ্কিং কারবার ব্যতীত অন্যান্য কারবারে নিযুক্ত অংশীদারী কারবারে সর্বাধিক ২০ জন অংশীদার থাকিতে পারে।

যে সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া অংশীদারী কারবার পত্তন করে, তাহাদের **ব্যক্তিগতভাবে অংশীদার (Partner)** বলে এবং **কারবারী প্রতিষ্ঠানটিকে অংশীদারী কারবার (Firm)** বলে।

অংশীদারী **কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of a Partnership Business) :**

(১) মালিকানা (Ownership) **:** অংশীদারী কারবার গঠনে সর্বনিম্ন ২ জন অংশীদার থাকিবে। কারবারের সর্বোচ্চ অংশীদারের সংখ্যা ব্যাঙ্কিং কারবারের ক্ষেত্রে ১০ এবং অন্যান্য কারবারের ক্ষেত্রে ২০ জন।

(২) গঠন (Formation) **:** এইরূপ কারবার স্থাপন করিতে হইলে অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি থাকা প্রয়োজন। চুক্তি লিখিত অথবা মৌখিক হইতে পারে। চুক্তিপত্র হইলে উহা রেজিস্ট্রেশন বা বিধিবদ্ধ করা কিংবা না করা অংশীদারগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নহে।

(৩) মূলধন (Capital) **:** অংশীদারী কারবারের মূলধন অংশীদারগণই যোগায়। তবে প্রয়োজনে কোনও অংশীদারকে মূলধন যোগানের দায়িত্ব হইতে রেহাই দেওয়া যায়।

(৪) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Management) **:** অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারই প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার ভার দুই-একজন অংশীদারের উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে, কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নীতি নির্ধারণের ভার সকল অংশীদারের উপরই ন্যস্ত থাকে।

(৫) মুনাফা ও ক্ষতি (Profit and Loss) **:** অংশীদারী কারবারের লাভ-ক্ষতি বণ্টন সম্বন্ধে অংশীদারগণের মধ্যে সাধারণতঃ একটি চুক্তি থাকে। চুক্তি অনুসারে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়। যদি চুক্তি না থাকে তবে সমহারে লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হয়।

(৬) দায়-দায়িত্ব (Liabilities) **:** অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণের দায় অসীম (Unlimited)। ইহার **অর্থ** এই যে, অংশীদারী কারবারের দায়-দেনার জন্য অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী। যদি এমন অবস্থা আসে যে, কারবারের দেনা উহার সম্পত্তি দ্বারা মিটান না যায়, তাহা হইলে অংশীদারগণকে ব্যক্তিগতভাবে কারবারের দেনা পরিশোধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কোন তৃতীয় ব্যক্তি কারবারের নিকট পাওনা আদায়ের জন্য কোন একজন অংশীদার অথবা সমবেতভাবে সমস্ত অংশীদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

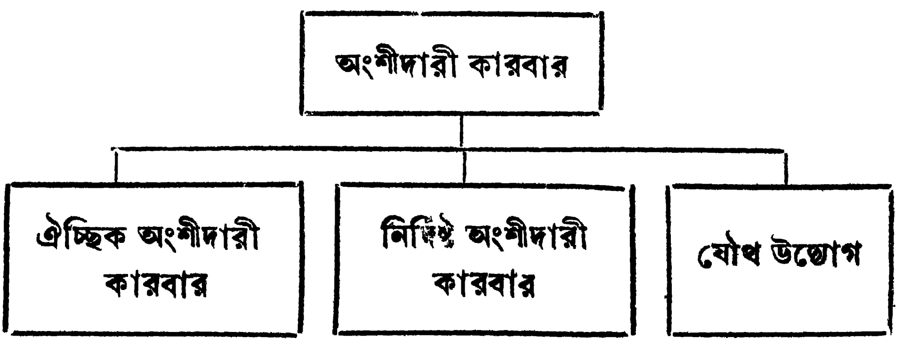
(৭) পারস্পরিক সম্পর্ক (Mutual Relationship) **:** অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের সম্পর্ক চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক **চুক্তি-ভিত্তিক** (Contractual relationship)। অংশীদারী কারবার পত্তন করিতে হইলে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন। কি কি শর্তে তাহারা কারবার করিতে

স্বীকৃত হইল তাহা চুক্তি দ্বারা স্থির করা হয়। অনেক সময় মনে হইতে পারে যে, কারবারের মুনাফায় অংশ গ্রহণ করে বলিয়াই হয়ত কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই অংশীদার, ইহা ঠিক নহে। ধরা যাক একটি অংশীদারী কারবারের প্রধান কর্মচারীকে (Manager) তাহার পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক ২০০ টাকা ও নীট মুনাফার ১০ শতাংশ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কর্মচারী মুনাফায় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সে কারবারের অংশীদার নহে। কারণ অংশীদারী কারবারের অন্য শর্তসমূহ তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। আবার হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের কারবার থাকিলে পরিবারের সকল ব্যক্তিই কারবারের মুনাফায় অংশ নেয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনও চুক্তির সম্পর্ক নাই। সেক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারসূত্রেই সদস্যগণ কারবারের মুনাফায় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা অংশীদার নহে।

(৮) স্থায়িত্ব (Stability): অংশীদারী কারবারের ভিত্তি সর্বোচ্চ সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith)। অংশীদারী কারবারের প্রত্যেক অংশীদারকে অন্যান্য অংশীদারের সাধারণ প্রতিনিধি (General Agent)-রূপে গণ্য করা হয়। সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে কোন অংশীদার কারবারের স্বার্থে সর্বোচ্চ সদ্বিশ্বাসে কোন কাজ করিলে তাহা অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে অবশ্য-পালনীয়। তবে সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবার অধিকার থাকিলেও কোন অংশীদার নিজে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিবে না। সে যদি সেইরূপ কোন কাজ করে তবে তাহার কার্য দ্বারা সে অন্য অংশীদারগণকে দায়বদ্ধ করিতে পারে না। ইহাই সর্বোচ্চ সদ্বিশ্বাস কথাটির তাৎপর্য। কারবারের স্থায়িত্ব পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

(৯) সত্তা (Entity): এক-মালিকী কারবারের মতই অংশীদারী কারবারের কোন পৃথক সত্তা নাই।

অংশীদারী কারবারের শ্রেণীবিভাগ (**Types of Partnership**):



অংশীদারী কারবার (**Partnership At Will**): এই প্রকার অংশীদারী কারবার অংশীদারগণের ইচ্ছানুসারে অবলুপ্ত হয়।

নির্দিষ্ট অংশীদারী কারবার (**Particular Partnership**): এই প্রকার অংশীদারী কারবার চুক্তিনামায় লিখিত কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে অবলুপ্ত হয়।

যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) ঃ ইহা একপ্রকার অংশীদারী কারবার, যাহা কোন একটি লেনদেন সমাপ্তির পর অবলুপ্ত হয়।

অংশীদারগণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Partners)

(১) **সক্রিয় অংশীদার** (Active Partner) ঃ যে অংশীদার কারবারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় (Management) অংশ গ্রহণ করে, তাহাকে সক্রিয় অংশীদার বলে।

(২) **নিষ্ক্রিয় অংশীদার** (Sleeping or Dormant Partner) ঃ যে অংশীদার কেবল মূলধন যোগায় ও কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না, তাহাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলা হয়।

(৩) **প্রকারান্তর বা অর্ধ বা আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার** (Quasi-Partner) ঃ পূর্বে অংশীদার ছিল, বর্তমানে অংশীদার নহে, কারবারের মুনাফারও অংশ পায় না, কিন্তু কারবারে প্রদত্ত মূলধন তুলিয়া লয় নাই এবং সেই মূলধনের উপর সুদ পায়, কারবারের সহিত এইরূপ সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার বলে। এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কারবারের ঋণদাতা।

(৪) **গোপন অংশীদার** (Secret Partner) ঃ যে অংশীদার সরাসরি কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, আবার নিষ্ক্রিয়ও নহে, তাহাকে গোপন অংশীদার বলে। এইরূপ অংশীদার সক্রিয় অংশীদারকে কারবারের ব্যবস্থাপনায় নেপথ্যে থাকিয়া সাহায্য করে।

(৫) **কর্মী অংশীদার** (Working Partner) ঃ যে অংশীদারের কারবারে কোন মূলধন থাকে না কিন্তু তাহার পরিশ্রমের পরিবর্তে তাহাকে অংশীদার করা হইয়াছে, তাহাকেই কর্মী অংশীদার বলে। বিশেষ কর্মকুশলতার জন্য এইরূপ অংশীদার গ্রহণ করা হয়।

(৬) **নামিক অংশীদার** (Nominal Partner) ঃ যখন অংশীদার ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে অংশীদার বলিয়া বিবেচিত হয় এবং অংশীদারী কারবারের দায় বহন করে, তখন তাহাকে নামিক অংশীদার বলে। এই প্রকার অংশীদার মুনাফার অংশ পায় না। দুইটি বিশেষ অবস্থায় নামিক অংশীদারের উদ্ভব হইতে পারে—

(ক) **রূপক বা আচরণ-অনুমিত অংশীদার** (Partner by Holding Out) ঃ কোন ব্যক্তি অংশীদারী কারবারের অংশীদার না হইয়াও তাহার আচরণ দ্বারা অন্যের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারে যে, সেও অংশীদার এবং তৃতীয়পক্ষের সহিত কোনও রূপ চুক্তি করিতে অথবা কারবার-সম্পর্কিত কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি কথাবার্তা ও চালচলনে নিজেকে অংশীদার বলিয়া প্রচার করে এবং অপর তৃতীয় কোন ব্যক্তি ইহাতে প্রভাবিত হইয়া কারবারে ঋণ দেয় বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে সে আচরণ-অনুমিত অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে কারবারের সহিত

অ-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি কারবারের পক্ষে কোন কার্য সম্পন্ন করিলে, তাহাকে আচরণ-অনুমিত অংশীদার বলে। আচরণ-অনুমিত অংশীদারের কার্যের দ্বারা সে কারবারের প্রকৃত অংশীদারদের দায়বদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সে নিজে তৃতীয়পক্ষের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। সে তাহার প্রচারিত রূপ অস্বীকার করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে রূপক অংশীদার বলে।

সুতরাং, যখন অংশীদার নয় এইরূপ কোন বহিরাগত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি বা জনগণের নিকট অংশীদারী কারবার অথবা অংশীদারগণ কর্তৃক অংশীদারী কারবারের অংশীদাররূপে পরিচিত হয় বা তাহাকে অংশীদাররূপে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই বহিরাগত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হইবার পর অংশীদারী কারবারের সহিত তাহার সত্য সম্পর্ক কি তাহা প্রকাশ করে না, তখনই তাহাকে রূপক অংশীদার বলে। এইরূপ পরিচিত হইবার পরিণামে যে সকল দায় সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য সে এককভাবে দায়ী। এক্ষেত্রে নীরবতাই তাহার স্বীকৃতি। অর্থাৎ তাহার নীরব প্রতিনিধিত্বের ফলে যে-সকল দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হইতেছে তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না।

(খ) **অনস্বীকার্য অংশীদার** (Partner by Estoppel): যখন কোন বহিরাগত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি অথবা জনগণের নিকট নিজেকে কোন অংশীদারী কারবারের অংশীদার বলিয়া মিথ্যা বা ভুয়া পরিচয় দেয়, তখন সে নিজের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। আইনের দ্বারা সে তাহার কার্য-উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়। মৌখিক অথবা আচার-আচরণ অথবা কথাবার্তায় অপরকে মিথ্যা পরিচয় দিবার ফলে যে-সকল দায় সৃষ্টি হয় তাহার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবে। অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ তাহার কার্য-উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব বহন করিবে না। যেমন—ক ও খ একটি অংশীদারী কারবারের অংশীদার। গ উভয়েরই বন্ধু। গ বিত্তশালী বলিয়া বাজারে খুব পরিচিত। ক ও খ বিক্রেতাদের নিকট প্রচার করিয়াছে যে, গ-ও কারবারের একজন অংশীদার। গ কারবারের অংশীদার আছে এইরূপ জানিয়া বিক্রেতাগণ অংশীদারী কারবারটিকে ধারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ দিয়াছে। গ নিজেও একথা জানে যে, সে অংশীদারী কারবারের অংশীদার আছে এইরূপ প্রচার করিয়া ক ও খ বাজার হইতে ধারে দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, কিন্তু সে কোনদিন ইহার প্রতিবাদ করে নাই। এক্ষেত্রে গ কারবারের অংশীদার না হইয়াও কারবারের দায়ের জন্য দায়ী; কারণ গ, ক ও খ-এর কার্যের প্রতিবাদ না করিয়া অন্যান্য কারবারীর মনে এই ধারণা জন্মাইয়াছে যে, সেও একজন অংশীদার। তাহার মৌনতাই এক্ষেত্রে তাহার সম্মতি।

(৭) **কেবল মুনাফায় অংশীদার** (Partner in Profit only): চুক্তির বলে কোন নিষ্ক্রিয় অংশীদার কেবল কারবারের মুনাফার অংশগ্রহীতা হইতে পারে। সে কারবারের ক্ষতি বহন করিবে না। কিন্তু সে কারবারের দায়-দায়িত্বের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট অন্যান্য অংশীদারগণের মতই দায়ী থাকিবে।

(৮) **অগ্রবর্তী ও কনিষ্ঠ অংশীদার** (Senior and Junior Partners): কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারগণকে অগ্রবর্তী ও কনিষ্ঠ অংশীদার হিসাবে গণ্য করা হয়।

বয়সের ভিত্তিতে এইরূপ ভাগ করা হয় না—আর্থিক স্বার্থের ভিত্তিতে করা হয়। যাহার আর্থিক স্বার্থ অধিক, তাহাকে অগ্রবর্তী অংশীদার এবং যাহার আর্থিক স্বার্থ কম, তাহাকে কনিষ্ঠ অংশীদার বলা হয়। অনেক সময় অংশীদারী চুক্তিতে অগ্রবর্তী অংশীদারকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যাহা কনিষ্ঠ অংশীদারকে দেওয়া হয় না।

(৯) **নবাগত অংশীদার** (Incoming Partner) : কারবারের অবলুপ্তি না ঘটাইয়া যদি কোন নূতন অংশীদার অংশীদারী কারবারে যোগদান করে, তখন তাহাকে নবাগত অংশীদার বলে। অংশীদারগণের সম্মতি থাকিলে তবেই তাহাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ নবাগত অংশীদারকে মূলধন ও সুনামের দাম (Premium for Goodwill) দিতে হয়। তাহার আগমনের পূর্বে কারবারে যে সকল দায় ছিল তাহার জন্য সে দায়ী নহে। তাহার আগমনের পর হইতে যে-সকল দায় সৃষ্টি হইবে, নবাগত অংশীদার তাহার জন্য আনুপাতিকভাবে দায়ী থাকিবে।

(১০) **বিদায়ী অংশীদার** (Outgoing Partner) : কারবারের অবলুপ্তি না ঘটাইয়া কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ অথবা অংশীদারী কারবার হইতে বিদায় লইলে, তাহাকে বিদায়ী অংশীদার বলে। বিদায়ী অংশীদার বিদায়ের সময় তাহার মূলধন, সুনামের (Goodwill) অংশ, সংরক্ষিত তহবিলের (Reserve Fund) অংশ, যৌথ জীবন-বীমার টাকার অংশ ইত্যাদি লইয়া যায়। বিদায়ের পরবর্তীকালের দেনার জন্য সে দায়ী থাকিবে না।

(১১) ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও দুই শ্রেণীর অংশীদার দেখিতে পাওয়া যায় (তবে এই প্রকার অংশীদার কেবলমাত্র দায়-সীমিত অংশীদারী কারবারেই দেখা যায়)। যেমন—

(ক) **দায়-সীমিত অংশীদার** (Limited Partner) : ইংলণ্ডে অংশীদারী কারবারে এক শ্রেণীর অংশীদার আছে যাহার দায় সীমাবদ্ধ। এই প্রকার অংশীদারের দায় তাহার নিয়োজিত মূলধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ যে যত পরিমিত অর্থ মূলধন যোগাইতে স্বীকৃত থাকে, তাহার দায়ও সেই পরিমাণ। স্বীকৃত মূলধন সম্পূর্ণ প্রদান করা হইলে কারবারে দেনার জন্য সে দায়ী থাকে না।

(খ) **সাধারণ অংশীদার** (General Partner) : দায়-সীমিত অংশীদারী কারবারের যে অংশীদার দৈনন্দিন কারবার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তাহাকে সাধারণ অংশীদার বলে। সাধারণ অংশীদারের দায় অসীম। অর্থাৎ, অংশীদারী কারবারের সম্পূর্ণ দায়-দেনার জন্য সে দায়ী থাকে।

অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্র (Partnership Deed) :

সর্বোচ্চ সদ্বিশ্বাসের (Utmost Good Faith) উপর ভিত্তি করিয়াই অংশীদারী কারবার গঠিত হয়। তথাপি যে পারস্পরিক সদ্বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া কারবার স্থাপিত হইল তাহা যে বরাবর অক্ষুন্ন থাকিবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সদ্বিশ্বাসের অভাবে অংশীদারগণের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে। এই কারণে অংশীদারী কারবার গঠন

করিবার সময় অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি স্থির করিয়া একটি চুক্তিপত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারবারের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কার্য-নির্বাহের পদ্ধতি, লাভ-ক্ষতির অংশ ভাগ, অংশীদারগণের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে অংশীদারগণের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাকে অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্র বা চুক্তিনামা (Partnership Deed) বলে। এই চুক্তি রেজিস্ট্রিকৃত বা বিধিবদ্ধ হইতে পারে, আবার অ-রেজিস্ট্রিকৃতও হইতে পারে।

অংশীদারী চুক্তিপত্র লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অলিখিত চুক্তি আইনতঃ চুক্তির মর্যাদা পায় না। ভবিষ্যতে অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-লোকসানের ভাগ, দায়-দায়িত্বের পরিমাণ, কর্তব্য ও অধিকারের পরিধি ইত্যাদি বিষয় লইয়া কোনও বিবাদ অথবা মতানৈক্য দেখা দিলে তাহার মীমাংসা লিখিত চুক্তি থাকিলে সহজেই হইতে পারে। মৌখিক চুক্তির বলে এইরূপ বিরোধের মীমাংসা কঠিন হয়। লিখিত চুক্তি অ-রেজিস্ট্রিকৃত হইলে অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারগণের পক্ষে আইনের সাহায্য লওয়া যায় না। রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তির বলে অংশীদারগণের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য আইনের সাহায্য গ্রহণ সহজ হয়। বৈধ সকল বিষয়ই চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বা চুক্তিনামার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তু (Important Clauses of a Partnership Deed) :

অংশীদারী চুক্তিপত্রে প্রধানতঃ যে সকল বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) কারবারের **নাম**।

(২) অংশীদারগণের **নাম, ঠিকানা ও পেশা**।

(৩) কারবারের **বিষয়-বস্তু ও উদ্দেশ্য**।

(৪) কারবারের **মিয়াদ**।

(৫) **মূলধনের সংস্থান**, ইহার **পরিমাণ** এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন্ অংশীদার কত পরিমাণ **মূলধন** যোগাইবে তাহার বিবরণ।

(৬) অংশীদারগণ কে কি হারে **লাভ-লোকসানে** অংশগ্রহণ করিবে।

(৭) **পরিচালন-ব্যবস্থা কিরূপ**—সকল অংশীদারের পক্ষে একজন কারবার পরিচালনা করিবে কিংবা সকল অংশীদারই কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবে।

(৮) কারবারের **হিসাব-নিকাশ রক্ষা** ও উহার **নিরীক্ষার** পদ্ধতি।

(৯) অংশীদারগণের মধ্যে কেহ কোন **বেতন পাইবে কিনা**, পাইলে উহার **পরিমাণ** কত।

(১০) অংশীদারগণ **মূলধনের উপর কোন সুদ পাইবে কিনা**, পাইলে কি **হারে** পাইবে।

(১১) অংশীদারগণ কারবারের তহবিল হইতে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ সাপেক্ষ অগ্রিম **কোনও অর্থ লইতে পারিবে কিনা**।

(১২) যদি হিসাব-নিকাশ সাপেক্ষ অগ্রিম অর্থ লওয়া হয় তাহা হইলে উহার উপর সুদ দিতে হইবে কিনা, হইলে সুদের হার কি হইবে।

(১৩) অংশীদারগণের মধ্যে কে বা কাহারা চেকে স্বাক্ষর করিলে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিতে পারা যাইবে।

(১৪) অংশীদারগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধ মিটাইবার পদ্ধতি।

(১৫) কারবারে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিবার নিয়ম।

(১৬) কারবার হইতে অংশীদার বহিষ্কার করিবার নিয়ম।

(১৭) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে কারবারের করণীয় বিষয়।

(১৮) কারবার অবসায়ন ও বিলোপসাধনের পদ্ধতি।

(১৯) কারবারের সুনাম ও প্রতিষ্ঠাধিকারের (Goodwill) মূল্য নিরূপণ করিবার পদ্ধতি অংশীদারী চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে।

এই সকল বিষয় ব্যতীতও অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে অন্যান্য শর্তও যোগ করিতে পারে।

অংশীদারী কারবারে চুক্তিপত্র না থাকিলে অথবা চুক্তিপত্র আছে কিন্তু লাভ-লোকসান বণ্টনের অনুপাত বলা না থাকিলে, মূলধনের উপর সুদের হার বলা না থাকিলে, কোন অংশীদারের প্রদত্ত ঋণের (Loan) উপর সুদের হার বলা না থাকিলে, অথবা উত্তোলনের (Drawing) উপর সুদের হার বলা না থাকিলে, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় অংশীদারী কারবারের আইনের ১৩নং ধারা অনুসারে উপরোক্ত বিষয়সমূহ নিম্নলিখিত-ভাবে নির্ধারিত হইবে :

(১) অংশীদারগণ লাভ-ক্ষতি সমানভাবে ভোগ করিবে।

(২) অংশীদারগণ মূলধনের উপর কোন সুদ পাইবে না।

(৩) অংশীদারগণ প্রদত্ত ঋণের (Loan) উপর ৬ শতাংশ হারে সুদ পাইবে।

(৪) অংশীদারগণকে উত্তোলনের (Drawing) উপর কোন সুদ দিতে হইবে না।

নিম্নে অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্রের একটি নমুনা (কাল্পনিক) দেওয়া হইল (Specimen of a Partnership Deed) :

শ্রীঅমর ঘোষ ও শ্রীসুহৃদ বসু নিম্নলিখিত শর্ত অনুসারে একটি অংশীদারী কারবার গঠনের চুক্তি করিল :

(১) অংশীদারী কারবারটির নাম 'ঘোষ ও বসু স্টোর্স' হইবে।

(২) ইহা ১০১নং রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১২ এই ঠিকানায় অবস্থিত হইবে।

(৩) শ্রীঅমর ঘোষ, পিতা শ্রীরজতশুভ্র ঘোষ ১১নং যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৪০, পেশা চাকুরী ও শ্রীসুহৃদ বসু, পিতা ৺শশীকান্ত বসু ৩নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০১৩, পেশা বার্তাজীবী, এই কারবারের অংশীদার হইবে।

(৪) শ্রীঅমর ঘোষ ১০,০০০ টাকা এবং শ্রীসুহৃদ বসু ১৫,০০০ টাকা মূলধন যোগাইবে।

(৫) অংশীদারগণ সমান হারে মুনাফা বণ্টন করিয়া লইবে এবং লোকসান হইলে উহা সমান হারে বহন করিবে।

(৬) অংশীদারগণ উভয়েই কারবার পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে এবং সে বাবদ কেহ কোন পারিশ্রমিক পাইবে না কিংবা দাবি করিতে পারিবে না।

(৭) অংশীদারগণ মূলধনের উপর কোনও সুদ পাইবে না অথবা সুদ দাবি করিতে পারিবে না।

(৮) বাৎসরিক চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ সাপেক্ষ প্রত্যেক অংশীদার কারবার হইতে অনূর্ধ্ব ২,০০০ টাকা লইতে পারিবে এবং উহার উপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিবে।

(৯) ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্ম উভয়েই যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষর করিবে।

(১০) কারবারের আর্থিক বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইবে। বাৎসরিক চূড়ান্ত হিসাব পরবর্তী বৎসরের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে তৈয়ারী করিতে হইবে এবং ঐ হিসাব একজন উপযুক্ত হিসাব-নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে হইবে।

(১১) কোন আইন অনুসারে এই অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া দিতে না হইলে, এই অংশীদারী কার· র ১০ বৎসর কাল যাবৎ চলিতে থাকিবে। উহার পর অংশীদারগণ কারবার চালান স্থির করিলে, পুনরায় নূতন করিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।

(১২) অংশীদারী কারবারের অবসায়ন ঘটিলে হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষা করাইয়া, পাওনা আদায় করিয়া সর্বাগ্রে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্থ হইতে অংশীদারদের নিকট কারবারের দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। সর্বশেষে যে সম্পদ থাকিবে উহা অংশীদারদের মধ্যে কারবার অবসায়নের তারিখে মূলধনের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

অদ্য ইংরেজী ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট তারিখে শ্রীঅমর ঘোষ ও শ্রীসুহৃদ বসুর মধ্যে উপরি-উক্ত শর্তে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইল।

সাক্ষী	স্বাক্ষর
শ্রীগোপাল অধিকারী	শ্রীঅমর ঘোষ
৮ই আগস্ট, ১৯৮৮	শ্রীসুহৃদ বসু
৭/২, বলরাম বসু স্ট্রীট	
কলিকাতা-৭০০ ০০৭	

অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Partners) :

প্রত্যেক অংশীদারেরই কিছু অধিকার থাকে। অধিকার যেমন থাকে, তেমনি তাহাকে কিছু কর্তব্যও সম্পন্ন করিতে হয়। কর্তব্য সম্পন্ন না করিলে অধিকার প্রয়োগ করা যায় না। অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য চুক্তিপত্রেই লিখিত থাকে। তবে অংশীদারগণের মধ্যে কোন চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হইলে কিংবা চুক্তিপত্রে অংশীদারগণের কর্তব্য ও অধিকারের উল্লেখ না থাকিলে ভারতীয় অংশীদারী আইনে অংশীদারগণের কর্তব্য ও অধিকারের যে নির্দেশ আছে তাহাই তাহাদের কর্তব্য ও অধিকার বলিয়া ধরিতে হইবে।

অংশীদারগণের কর্তব্য	অংশীদারগণের অধিকার
(১) প্রত্যেক অংশীদারকে সততার সহিত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।	(১) প্রত্যেক অংশীদারেরই কারবার পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।
(২) প্রত্যেক অংশীদারকে দেখিতে হইবে যে, তাহার কার্য যেন সর্বদাই কারবারের স্বার্থে করা হয় এবং তাহার কার্যের ফলে কারবারের অথবা অংশীদারদের স্বার্থ যেন ক্ষুন্ন না হয়।	(২) প্রত্যেক অংশীদারেরই কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণে মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত দ্বারাই সাধারণ বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, কিন্তু নূতন অংশীদার গ্রহণ অথবা অংশীদার বহিষ্করণের ব্যাপারে তাহারা সকলে একমত না হইলে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায় না।
(৩) যে সদ্বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া অংশীদারী কারবার স্থাপিত হইল সেই সদ্বিশ্বাস বজায় রাখিতে প্রত্যেক অংশীদারকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।	(৩) প্রত্যেক অংশীদারেরই কারবারের দলিল ও কাগজ-পত্রাদি দেখিবার এবং প্রয়োজনবোধে উহার প্রতিলিপি (নকল) পাইবার অধিকার আছে।
(৪) কোনও অংশীদার কারবারের নামে কোনও কার্য সম্পন্ন করিয়া নিজে লাভবান হইতে পারিবে না। কারবারের নামে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া নিজে কোনরূপ দস্তুরী গ্রহণ করিতে পারিবে না।	(৪) প্রত্যেক অংশীদারই কারবারের লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে। যদি চুক্তিপত্রে লাভ-লোকসান বণ্টনের হারের উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে অংশীদারগণ সমান হারে মুনাফা পাইবে অথবা সমান হারে লোকসান বহন করিবে।
(৫) কোন অংশীদার কারবারের সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে না।	(৫) কোন অংশীদার কারবারের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থাৎ অংশীদারগণের স্বার্থ রক্ষার্থে কোন ব্যয় বহন করিলে অথবা

অংশীদারগণের কর্তব্য	অংশীদারগণের অধিকার
	ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কারবার হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবে।
(৬) কারবারের সকল কার্যের জন্য প্রত্যেক অংশীদার পৃথকভাবে ও যৌথভাবে দায়ী থাকিবে।	(৬) কোন অংশীদার চুক্তিপত্রে লিখিত অংশমত মূলধন যোগাইবার পর যদি কারবারকে ঋণ দিয়া থাকে তবে ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ পাইবে এবং কারবারের অবসায়ন ঘটিলে অংশীদারগণের মূলধন ফেরত দিবার পূর্বে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।
(৭) দৈনন্দিন কারবার পরিচালনার ব্যাপারে প্রত্যেক অংশীদারকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়া লইতে হইবে।	(৭) কোন অংশীদার প্রয়োজন বোধ করিলে অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া আদালতে আবেদন করিতে পারে।
	(৮) কারবারের অবসায়ন ঘটিলে দায়ের অতিরিক্ত যে সম্পদ থাকিবে তাহা চুক্তিপত্রে উল্লিখিত অনুপাতে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কোন চুক্তিপত্র না থাকিলে অংশীদারগণ দায়-অতিরিক্ত সম্পদ সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইবে।

অংশীদারগণের দায় (Liabilities of Partners) :

অংশীদারী কারবারের দায় অসীম (Unlimited)। কারবারের সম্পূর্ণ দায়-দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদার পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী। এই কারণে পাওনাদারগণ ইচ্ছা করিলে কারবারের দেনার জন্য কোন একজন অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা আনিতে পারে এবং তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তি হইতেও কারবারের দায়-দেনা আদায় করিতে পারে।

তবে কোনও ব্যক্তি অংশীদারী কারবারে যোগদান করিবার পূর্ববর্তী সময়ের দায়-দেনার জন্য দায়ী হইবে না। অবশ্য অংশীদারী কারবারে যোগদান করিবার শর্ত হিসাবে সে পূর্ববর্তী দায়-দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। অংশীদারী কারবারের প্রত্যেক অংশীদার সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। অতএব তাহার কার্যের ফলে কারবার (অর্থাৎ সকল অংশীদারই) দায়বদ্ধ হয়।

কোন অংশীদার কারবার হইতে অবসরগ্রহণ করিলে অবসরগ্রহণের পর অংশীদারী কারবারের দেনার জন্য তাহার আর কোন দায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে পাওনাদারগণ অবসরগ্রহণকারী অংশীদারকে অবসরগ্রহণের পূর্ববর্তী দায় হইতে রেহাই দিয়া থাকে।

অংশীদারী কারবারের সুবিধা (Advantages of Partnership Business) :

অংশীদারী কারবারে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) **গঠনের সুবিধা** (Facility in formation) : অংশীদারী কারবার গঠন আইনের বাধা-নিষেধ হইতে মুক্ত। ইহা নিবন্ধন (Registration) করা বাধ্যতামূলক নহে। স্বল্প সময়ে ও পরিমিত অর্থব্যয়ে ইহা গঠন করা যায়। অংশীদারী কারবার গঠন করিতে হইলে অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটি লিখিত বা মৌখিক চুক্তি থাকিতে হইবে।

(২) **অধিক মূলধন ও ঋণ সংগ্রহের সম্ভাবনা** (Greater capital and credit resources) : অংশীদারী কারবারে একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে মূলধন সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহার মূলধন এক-মালিকী কারবারের তুলনায় অনেক বেশী। ইহা ছাড়া অংশীদারদের দায় সীমাহীন, স্বতন্ত্র ও যৌথ হওয়ায় ঋণদাতার নিকট হইতে এইরূপ কারবার প্রচুর পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। এই ঋণের পরিমাণ অনেক সময় মূলধনকেও ছাড়াইয়া যায়। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীও এত ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না।

(৩) **যৌথ সামর্থ্য ও বিচার-বুদ্ধির সুবিধা** (Facility of combined abilities and judgement) : অংশীদারী কারবারে প্রয়োজন হইলে একাধিক অংশীদার বা সকল অংশীদার মিলিতভাবে কারবার পরিচালনা করে। ফলে পরিচালনায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, ইহাতে **শ্রমবিভাগ** এবং **বিশেষায়ণের** সকল প্রকার সুবিধা পাওয়া যায়। কারণ, বিশেষজ্ঞ অংশীদারগণের মধ্যে কার্যভার বণ্টন করিয়া কারবার পরিচালনা করা যায়।

(৪) **পরিবর্তনশীলতা** (Flexibility) : পরিবর্তনশীলতার দিক হইতে ইহা এক-মালিকী কারবার হইতে নিকৃষ্ট ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হইতে উৎকৃষ্ট। এই কারবারে ব্যবস্থাপনার নীতি, অর্থ-সংস্থান, কার্যধারার পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন, মূলধনের পরিবর্তন ইত্যাদি সহজেই করা যায়।

(৫) **মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়** (Matching of ownership with control) : অংশীদারী কারবারের মালিকানা, অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার মধ্যে ব্যবধান থাকে না। মালিক সরাসরি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করায় নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা কারবারের সমৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রযুক্ত হয়।

(৬) **ছোট ছোট অংশীদারদের স্বার্থ বজায় রাখা** (Protection of minority interest) : অংশীদারী কারবারের আইনই ছোট ছোট অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী। বড় অংশীদারগণ যদি ছোট অংশীদারদের মতামত সর্বদা উপেক্ষা

করে, তাহা হইলে ছোট অংশীদার অংশীদারী কারবারের পতন ঘটাইতে পারে বা ইহার ব্যবস্থাপনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে।

(৭) **কারবারের সমৃদ্ধি** (Prosperity in business) : দায় সীমাহীন বলিয়া প্রত্যেক অংশীদার কারবারের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট হয়। ইহাতে অপচয় হ্রাস পায়।

(৮) **কারবারের সম্প্রসারণ** (Expansion of business) : প্রয়োজনবোধে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া কারবারের সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

অংশীদারী কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Partnership Business) :

(১) **ব্যবস্থাপনায় একমতের অভাব** (Lack of unity in management) : কারবার পরিচালনায় সকলের সমান অধিকার থাকে বলিয়া প্রত্যেক অংশীদারের একমত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি অংশীদারগণের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায় তাহা হইলে যুক্ত সামর্থ্য ও বিচারবুদ্ধি অভিশাপ হইয়া দেখা দিতে পারে। 'নানা মুনির নানা মতে' কারবারে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) **সক্রিয় অংশীদারকৃত দায়ভার** (Liabilities from active partner's activities) : সক্রিয় অংশীদার তাহার কার্যের জন্য অন্যান্য অংশীদারকেও দায়ী করিতে পারে। কারণ অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ একদিকে মালিক ও অন্যদিকে প্রতিনিধি। কোন অযোগ্য অথবা অসাধু অংশীদারের কার্যের পরিণামে অন্য অংশীদারকে আর্থিক ক্ষতি বহন করিতে হইতে পারে।

(৩) **অসীম দায়** (Unlimited liability) : প্রত্যেক অংশীদারের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন। কেবল তাহাই নহে, অংশীদারগণ ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে কারবারের সমস্ত দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকে।

(৪) **কারবারের স্থায়িত্বের অভাব** (Instability in business) : কোন অংশীদারের মৃত্যু, দেউলিয়া অথবা অবসরগ্রহণের পরিণামে কারবার উঠিয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নয়, খেয়াল-খুশী বা মত-বিরোধের পরিণামেও কারবার উঠিয়া যাইতে পারে। ইহার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। যে কোন অনিশ্চিত অবস্থা ভবিষ্যতে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটাইতে পারে।

(৫) **স্বত্ব-হস্তান্তরে বাধা** (Restriction of transfer of interest) : সকল অংশীদার একমত না হইলে কোন অংশীদার কারবারে তাহার স্বত্ব অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিতে পারে না।

(৬) **মূলধনে প্রাচুর্যের অভাব** (Lack of sufficiency in capital) : যদিও ইহার সংগৃহীত মূলধন এক-মালিকী কারবারের তুলনায় অধিক, কিন্তু ইহা বৃহদাকার উৎপাদনের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

(৭) **আস্থার অভাব** (Lack of confidence) : এই প্রকার কারবার গঠনে আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় ইহা জনগণের আস্থাভাজন নহে।

প্রযোজ্যতা (Suitability) **:** অংশীদারী কারবার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

(১) ছোট অথবা মাঝারি কারবারের ক্ষেত্রে ;

(২) যে-সকল কারবার উৎপাদন করে না, কিন্তু সেবা (service) প্রদান করে ; যেমন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্-এর কারবার ; এবং

(৩) যে কারবারের বাজারের পরিধি সীমাবদ্ধ।

অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন (Registration of Partnership Business) :

অংশীদারী কারবার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মত নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক নহে। অংশীদারী কারবার নিবন্ধন করা হইলে কারবারকে একটি পৃথক স্বাধীন সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। নিবন্ধিত না হইলে কারবারকে কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অংশীদারী কারবার গঠনের পরও উহা নিবন্ধন করা যায়। নিবন্ধন করা না হইলে নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ দেখা যায় :

(১) যে অংশীদারী কারবার রেজিস্ট্রিকৃত নহে সেই কারবারের তৃতীয়পক্ষের নিকট হইতে পাওনা ১০০ টাকার বেশী হইলে উহা আদায় করিবার জন্য কারবার আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারে না।

(২) অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী কারবারের কোন অংশীদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য সে অংশীদারগণের বিরুদ্ধে অথবা কারবারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারে না।

তবে অংশীদারী কারবার রেজিস্ট্রিকৃত না হইলেও কারবার ভাঙ্গিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া যে কোনও অংশীদার আদালতে আবেদন করিতে পারে এবং কারবার ভাঙ্গিয়া গেলেও কারবারের দায়-অতিরিক্ত সম্পদের অংশ পাইবার অধিকার হইতে অংশীদার বঞ্চিত হয় না। কারবার রেজিস্ট্রিকৃত না হইলেও যে কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনিতে পারে।

অংশীদারী কারবারের নিবন্ধনের পদ্ধতি (Method of Registration of a Partnership Business) :

প্রত্যেক রাজ্যেই একজন করিয়া অংশীদারী কারবার নিবন্ধক (Registrar of Firm & Association) থাকেন। এই কর্মচারী রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ঐ নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের দরখাস্ত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাশুল বা ফি-সহ দাখিল করিতে হয়। নিবন্ধনের দরখাস্তের মাশুল বা ফি প্রতি বৎসর রাজ্য সরকার বাজেট (Budget) করিবার সময় স্থির করিয়া থাকেন। নিবন্ধনের দরখাস্ত বা আবেদনপত্রে সকল অংশীদারকে স্বাক্ষর করিতে এবং নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হয় :

(১) কারবারের নাম।

(২) কারবারের প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা।

(৩) কারবারের শাখা থাকিলে যে যে স্থানে শাখা আছে তাহার উল্লেখ।

(৪) প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে যোগদান করিবার তারিখ।

(৫) প্রত্যেক অংশীদারের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও পেশা।

(৬) কারবারের মিয়াদ।

এই বিষয়সমূহের মধ্যে কোন বিষয়ের কোন রূপ পরিবর্তন হইলে নিবন্ধককে জানাইতে হয়। তদনুসারে নিবন্ধনপত্র সংশোধন করা হয়।

কারবারের মিয়াদ (Duration of the Partnership Business) :

বিভিন্ন অংশীদারী কারবারে কারবারের মিয়াদ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। মিয়াদ অনুযায়ী অংশীদারী কারবার তিন প্রকারের হইতে পারে :

(১) **নির্দিষ্ট মিয়াদের অংশীদারী কারবার** (Limited Partnership) : কোন অংশীদারী কারবার নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য গঠিত হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট মিয়াদের অংশীদারী কারবার বলে। যেমন, ৫ বৎসরের মিয়াদ, ১০ বৎসরের মিয়াদ ইত্যাদি।

(২) **বিশেষ উদ্দেশ্যে অংশীদারী কারবার** (Particular Partnership) : কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য অংশীদারী কারবার স্থাপিত হইলে তাহাকে 'বিশেষ উদ্দেশ্যে অংশীদারী কারবার' বলা হয়। নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন হইলে এই প্রকার কারবারের বিলোপ ঘটে। উদাহরণ—যৌথ উদ্যোগ (Joint venture)।

(৩) **ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবার** (Partnership at Will) : অংশীদারী কারবারের মিয়াদ নির্দিষ্ট না থাকিলে সেই কারবারকে ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবার বলে। অংশীদারগণ ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া না দিলে অথবা আইনতঃ ইহার বিলোপ না ঘটিলে এই প্রকার অংশীদারী কারবার চলিতে থাকে

অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন (Dissolution of Partnership Firm) :

নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটিতে পারে :

(১) অংশীদারগণ একমত হইয়া কারবারের বিলোপ ঘটাইতে পারে।

(২) যদি কোন অংশীদারী কারবার নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য গঠন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে কারবারের বিলোপ ঘটে। তবে নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে কোন অংশীদার দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই কারবারের বিলোপ সাধিত হয়। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলেও কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটান হয়। পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত কারণে বাধ্যতামূলকভাবে কারবারের বিলুপ্তি ঘটে :

(ক) একজন ব্যতীত অপর অংশীদারগণ অথবা সকল অংশীদারই যদি দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে কারবার বাধ্যতামূলকভাবে ভাঙ্গিয়া যায়।

(খ) কারবারের কার্যাবলী যদি আইনতঃ অবৈধ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও কারবারের বিলুপ্তি বাধ্যতামূলক।

(গ) ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবারের (Partnership at Will) ক্ষেত্রে যদি কোন একজন অংশীদারের উপর অপর অংশীদার নোটিশ দেয় যে, কারবারের বিলুপ্তি ঘটান হোক, তাহা হইলেও কারবারের বিলুপ্তি বাধ্যতামূলক হয়

(৪) অনেক সময় আদালতের নির্দেশে অংশীদারী কারবারের বিলোপ ঘটে। নিম্নলিখিত কারণে আদালতের নির্দেশে কারবারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে :

(ক) কোন অংশীদার স্থায়িভাবে অংশীদারের কার্য সম্পন্ন করিতে অপারগ হইলে,

(খ) আদালতের মতে কোন অংশীদার বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া প্রমাণিত হইলে,

(গ) কোন অংশীদার ভারতীয় ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত হইলে,

(ঘ) কোন অংশীদার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া কারবারের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে,

(ঙ) কোন অংশীদার কারবারে তাহার যে স্বার্থ আছে তাহা অন্যের নিকট হস্তান্তর করিলে,

(চ) কোন অংশীদারের ঋণের জন্য কারবারে তাহার যে স্বার্থ আছে তাহা আদালত কর্তৃক আটক হইলে,

(ছ) আদালতের মতে কারবারের বিলোপসাধন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হইলে,

(জ) আদালত যদি মনে করে যে, কারবারটি লোকসান ব্যতীত চলিতে পারে না।

অংশীদারীর বিলোপ ও অংশীদারী কারবারের বিলোপ (Dissolution of Partnership and Dissolution of a Partnership Firm) :

আইনজ্ঞগণ অংশীদারীর বিলোপকে অংশীদারী কারবারের বিলোপ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অংশীদারগণের মধ্যে একজন অংশীদারের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে, অথবা একজন অংশীদার দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, অথবা কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে কারবার গঠনের সময় যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেই চুক্তি বলবৎ থাকে না। এই অবস্থায় যদি কারবারটির বিলোপ ঘটান হয়, তাহা হইলে তাহাকে অংশীদারী কারবারের বিলোপ (Dissolution of Firm) বলা হয়। কিন্তু কারবারের বিলুপ্তি না ঘটাইয়া অবশিষ্ট অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে নূতন করিয়া চুক্তি করিয়া কারবার চালাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কারবারের বিলুপ্তি ঘটে নাই, কিন্তু মূল অংশীদারী সম্পর্কের বিলোপ ঘটিয়াছে। ইহাকে বলে অংশীদারীর বিলুপ্তি (Dissolution of Partnership)।

পরিমিত দায় বা সসীম দায় অংশীদারী কারবার (Limited Partnership Firm) ঃ

অংশীদারী কারবারের দায় সীমাহীন। ইহাতে অনেক সময় অংশীদারী কারবার গঠনে অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে, অংশীদারগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে সসীম দায় অংশীদারী কারবারের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা এই প্রকার কারবারকে আইনসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অংশীদারী কারবারে ন্যূনপক্ষে একজন অংশীদার অসীম দায়যুক্ত (Unlimited Liability) থাকিবে, অন্য অংশীদারগণ সসীম দায়যুক্ত (Limited Liability) থাকিতে পারিবে। ভারতে সসীম দায় বা পরিমিত দায় অংশীদারী কারবার গঠন আইনসিদ্ধ নহে।

নাবালকের ভুমিকায় অংশীদার (Minor as a Partner) ঃ

আইনতঃ কোন নাবালক অংশীদারী কারবারের অংশীদার হইতে পারে না। ইহার কারণ, অংশীদারী কারবারের ভিত্তি হইল চুক্তি। কিন্তু নাবালকের চুক্তি করিবার কোন অধিকার নাই। এতৎসত্ত্বেও নাবালক অংশীদারী কারবারে গৃহীত হইতে পারে এবং তাহাকে কারবারের মুনাফায় অংশ গ্রহণ করিতে দিতে পারা যায়। মুনাফার সুযোগ দেওয়া হয় বলিয়াই সে অংশীদার নহে। কারণ, অন্যান্য অংশীদারের মত সে অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারে না এবং সাবালক অংশীদারের মত অংশীদারী কারবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

নাবালককে অংশীদারী কারবারের মুনাফার সুযোগ গ্রহণ করিতে দিলেও নাবালকের দায় সীমিত। কিন্তু অন্যান্য অংশীদারের দায় সীমাহীন। কারবারে তাহার মূলধন ও মুনাফার অংশ কারবারের দেনা পরিশোধ করিবার জন্য ব্যবহার করা চলে, কিন্তু সাধারণ অংশীদারের মত তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কারবারের দেনার জন্য ব্যবহার করা যায় না। সাবালক অংশীদার দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, কিন্তু নাবালক অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হইতে পারে না।

নাবালক অংশীদার সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কারবারের অংশীদার হিসাবে যোগ দিতে পারে, অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কারবারে অংশীদার হিসাবে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিংবা কারবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক, তাহা জানাইতে হয়। এ সম্পর্কে ঘোষণা না করিলে সাবালকত্ব প্রাপ্তির ৬ মাস পর হইতে তাহাকে কারবারের অংশীদার ধরিয়া লওয়া হইবে এবং অন্যান্য অংশীদারের মতই তাহার দায় বর্তাইবে।

সাবালক হইবার পর কারবারের অংশীদার হিসাবে যোগ দিলে নাবালক থাকাকালীন যে তারিখ হইতে তাহাকে কারবারের মুনাফা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে কারবারের সম্পূর্ণ দায় ও কার্যের জন্য অন্যান্য অংশীদারের মত সেও দায়ী থাকিবে।

এক-মালিকী কারবার বনাম অং কারবার (Sole Trader Vs. Partnership Firm) ঃ

এক-মালিকী কারবার	অংশীদারী কারবার
(১) **গঠন ঃ** এক-মালিকী কারবার গঠনে আনুষ্ঠানিক জটিলতা নাই। মাত্র একজন মালিক দ্বারাই এই প্রকার কারবার গঠিত হয়।	(১) এই প্রকার কারবার গঠনেও আইনের জটিলতা নাই। তবে অন্যূন ২ জন এবং উর্ধ্বে সাধারণ কারবারে ২০ জন এবং ব্যাঙ্কিং কারবারে ১০ জন সদস্য থাকিতে পারে। কারবার গঠন সম্পর্কে মালিকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়।
(২) **মূলধন ঃ** এই প্রকার কারবারে মূলধনের পরিমাণ খুব কম, কারণ একজন মালিকই মূলধন সরবরাহ করে।	(২) এক-মালিকী কারবার অপেক্ষা ইহার মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা অধিক।
(৩) **পরিচালনা ঃ** সম্পূর্ণভাবে মালিকের নিজ কর্মদক্ষতার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে। কারবারের পরিচালনায় কোন প্রকার শ্রমবিভাগ চলে না।	(৩) একাধিক মালিক থাকে বলিয়া অংশীদারদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবিভাগ সম্ভব। ইহাতে কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
(৪) **পরিবর্তনশীলতা ঃ** পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, কারণ, মালিকই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।	(৪) এক-মালিকী কারবারের তুলনায় পরিবর্তিত অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা কম। কারণ, একাধিক মালিকের দ্বারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে কালক্ষেপ হয়।
(৫) **মূলধন সংগ্রহ ঃ** কারবারের সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা দেখা দেয়।	(৫) এক-মালিকী কারবারের তুলনায় অংশীদারী কারবারের সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা কম।
(৬) **স্থায়িত্ব ঃ** এক-মালিকী কারবারের স্থায়িত্ব অধিক।	(৬) অংশীদারী কারবারের সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্য, অংশীদারগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ইত্যাদি ঘটিলে অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ইহার স্থায়িত্ব কম।
(৭) **দায় ঃ** এক-মালিকী কারবারের মালিকের দায় সীমাহীন।	(৭) অংশীদারী কারবারের মালিকগণের দায় সীমাহীন।

অংশীদারী কারবার ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
(Partnership Firm and Joint Hindu Family Business)

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
(১) **চুক্তি** ঃ অংশীদারী কারবার অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি দ্বারা গঠিত হয়।	(১) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিধি অনুসারে গঠিত হয়।
(২) **নাবালক** ঃ নাবালক অংশীদার হিসাবে কারবারে অংশগ্রহণ করিতে পারে না, তবে মুনাফা পাইতে পারে। ইহার মালিকানা চুক্তি দ্বারা স্বিরীকৃত হয়।	(২) যৌথ হিন্দু পরিবারের নাবালক কারবারের শরিক বলিয়া গণ্য হয়। মালিকানা জন্মাধিকার বলিয়া গণ্য হয়।
(৩) **নারীর অংশগ্রহণ** ঃ নারীও অংশীদারী কারবারের অংশীদার হইতে পারে।	(৩) ইহাতে মিতাক্ষরা পরিবারের নারীগণ শরিক নহে। দায়ভাগবিধি অনুসারে পরিচালিত পরিবারের নারীগণ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল স্থাবর সম্পত্তির শরিক হইতে পারে।
(৪) **নিবন্ধন** ঃ এই প্রকার কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হইলেও নিবন্ধিত কারবার কতকগুলি সুযোগ পায় বলিয়া কারবার নিবন্ধিত হইতে পারে।	(৪) এই প্রকার কারবারের নিবন্ধনের কোনই প্রয়োজন নাই।
(৫) **দায়** ঃ অংশীদারী কারবারের মালিকগণ কারবারের সম্পূর্ণ দায়ের জন্য যৌথভাবে এবং এককভাবে দায়ী থাকে। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের দায় সীমাহীন।	(৫) যৌথ হিন্দু পরিবারের শরিকগণের দায় তাহাদের প্রত্যেকের শরিকানা বা অংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।
(৬) **দায়বদ্ধ** ঃ অংশীদারী কারবারের কোন অংশীদার তাহার কার্য দ্বারা অপর অংশীদারগণকে দায়বদ্ধ করিতে পারে।	(৬) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার একমাত্র পরিবারের কর্তার কার্যদ্বারা সকল শরিককে দায়বদ্ধ করিতে পারে, কারণ, কর্তাই কারবার পরিচালনা করে।
(৭) **পরিচালনা** ঃ অংশীদারী কারবারের সকল মালিকই কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে একজন মালিকের উপরও পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারা যায়।	(৭) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে পরিবারের কর্তার উপর কারবার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে।

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
(৮) **লভ্যাংশ** ঃ অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের লাভ-লোকসানের অংশ চুক্তি দ্বারা স্থির হয়। চুক্তি পরিবর্তন না হইলে লাভ বা লোকসানের অংশ পরিবর্তিত হয় না।	(৮) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের শরিকগণের লাভ-লোকসানের অংশ, পরিবারের নূতন পুরুষ-শিশুর জন্ম হইলেই পরিবর্তিত হয়।
(৯) **আইন** ঃ অংশীদারী কারবার ভারতীয় অংশীদারী আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।	(৯) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
(১০) **বিলোপ** ঃ অংশীদারী কারবারের কোনও অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অথবা কোনও অংশীদার কারবার গুটাইবার ইচ্ছা জানাইয়া নোটিশ দিলে কারবারের বিলোপ ঘটে।	(১০) যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের কোনও শরিকের মৃত্যুতে কারবারের বিলোপ ঘটে না, অথবা কোনও শরিকের কারবার গুটাইবার ইচ্ছা জানাইয়া নোটিশ দিবার অধিকার নাই।

সমবায় সংগঠন
(Co-operative Organisation)

ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী কারবারীদের কার্যের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প এবং সাধারণ ভোগকারীদের উপর যথেষ্ট আর্থিক চাপ পড়ে। যাহাতে স্বল্প-বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আর্থিক কার্য-কলাপে নিযুক্ত থাকিয়া এবং জনসাধারণ নিজেদের প্রচেষ্টায় আর্থিক কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর আর্থিক চাপের ভার কমাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জার্মানীতে একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠে। উহাই সমবায় আন্দোলন নামে পরিচিত।

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আর্থিক উন্নতি ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্বল্প-বিত্তসম্পন্ন এবং বিত্তহীন ব্যক্তিগণ ঐচ্ছিকভাবে (voluntarily) যে আর্থিক ও সরকারী সংগঠন তৈয়ারী করে, তাহাই সমবায় সংগঠন এবং উহার কার্য-কলাপ সমবায় কার্য-কলাপ বলিয়া অভিহিত। কোন অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত অধিবাসিগণ নিজেদের অর্থ নৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐচ্ছিকভাবে এইরূপ সংগঠন সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়।

সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of Co-operative Organisation) ঃ

সমবায় সংগঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবনযোগ্য :

(১) **গঠন** (Formation) ঃ একই স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। ইহা

আত্মনির্ভরতা, পারস্পরিক সাহায্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা এবং সামাজিক সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

(২) **মূলধন** (Capital) : যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মতই সমবায় প্রতিষ্ঠান-সমূহ শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। তবে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারের মূল্য খুব কম হয়। শেয়ার ক্রয় করিলে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যায়। সাধারণতঃ ১,০০০ টাকার অধিক শেয়ার ক্রয় করা যায় না। প্রতিষ্ঠানের পরিমেল নিয়মাবলীতে একজন সদস্য সর্বোচ্চ কত সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে পারে তাহা লিখিত থাকে। ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তরযোগ্য নহে। পরিমেল নিয়মাবলী অনুসারে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারাইলে, অথবা কোন সদস্যের মৃত্যু হইলে সদস্য কর্তৃক নিয়োজিত মূলধন ফেরত দেওয়া হয়।

(৩) **ব্যবস্থাপনা** (Administration) : সমবায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণতঃ ইহার কর্মসচিব (Secretary) এবং ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর সভাপতির (Chairman) উপর ন্যস্ত থাকে।

(৪) **পরিচালনা** (Management) : যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মত সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনার ভার একটি ব্যবস্থাপক পর্ষদের (Management Committee) উপর ন্যস্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের কার্য-কলাপ সম্বন্ধীয় যাবতীয় নীতি নির্ধারণের ভার ব্যবস্থাপক পর্ষদের উপর অর্পণ করা হয়। একজন সদস্য যত-সংখ্যক শেয়ারই ক্রয় করুক না কেন সে একটি মাত্র ভোট দিবার অধিকারী। ব্যবস্থাপক পর্ষদের সদস্যগণ সাধারণ সদস্যগণের (শেয়ার-গ্রহীতাগণের) দ্বারা নির্বাচিত। ব্যবস্থাপক পর্ষদের মধ্যে একজন সচিব (Secretary) এবং একজন সভাপতি (Chairman) থাকে।

(৫) **সদস্যগণের দায়** (Liability of Shareholders) : সমবায় সমিতির সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন, দুই প্রকারেরই হইতে পারে। দায়-সীমাবদ্ধের যথেষ্ট সুবিধা আছে বলিয়া দায়-সীমাবদ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব অধিক। শহরাঞ্চলে দায়-সীমাবদ্ধ ও গ্রামাঞ্চলে দায়-সীমাহীন সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা দেখা যায়।

(৬) **উদ্বৃত্ত বণ্টন** (Distribution of Surplus) : সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক কার্য দ্বারা মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না। সদস্যগণের সেবা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হয়। সুতরাং সদস্যগণের নিকট প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় অংশগ্রহণের কথা গৌণ। তথাপি সে-সকল সমবায় প্রতিষ্ঠান আর্থিক কার্য-কলাপে ব্যাপৃত থাকে তাহাদের উদ্বৃত্ত আয় সদস্যগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয়ের সম্পূর্ণ অর্থই লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হয় না। সমবায় সমিতি আইন অনুসারে প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে একটি সঞ্চয় তহবিল (Reserve Fund) গঠন করিতে হয়। যতদিন পর্যন্ত উক্ত তহবিলের সঞ্চিত অর্থ আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণের সমান না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রতি বৎসর উদ্বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ ঐ সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখিতে

হয়। উদ্বৃত্তের অবশিষ্ট অংশ সদস্যগণের মধ্যে প্রত্যেকের ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

(৭) **সত্তা** (Entity) : যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মতই সদস্যগণ হইতে ইহার পৃথক স্বাধীন সত্তা আছে।

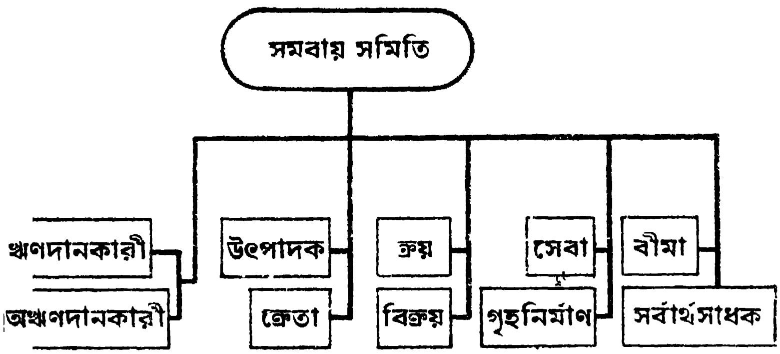
(৮) **চিরন্তন অস্তিত্ব** (Perpetual Succession) : সমবায় প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রিকৃত বা নিবন্ধিত হইলে যতদিন বিলোপ না ঘটে ততদিনই প্রতিষ্ঠানের নামে কার্য সম্পাদন করা যায়। মালিক পরিবর্তন হইলে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হয় না।

(৯) **ভোটাধিকার** (Voting Right) : যাহার যত শেয়ারই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সদস্য একটি মাত্র ভোটের অধিকারী।

(১০) **হস্তান্তরযোগ্যতা** (Transferability) : ইহার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নহে। সমিতির নিকট বিক্রয়যোগ্য।

(১১) **সদস্য-সংখ্যা** (Number of Members) : ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সমবায় সমিতি আইন অনুসারে সমবায় সমিতিতে অন্ততঃ ১০ জন সদস্য থাকিতে হইবে। ইহা সমবায় সমিতির নিবন্ধকের দ্বারা নিবন্ধিত হইতে হইবে। আবাসন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৮ জন সদস্য থাকা প্রয়োজন।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Different Kinds of Co-operative Societies) :



(১) **ঋণদানকারী সমবায় সমিতি** (Co-operative Credit Society) : স্বল্প-বিত্তসম্পন্ন ও স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বল্প সুদে এবং সুবিধাজনক পরিশোধের শর্তে ঋণ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিবার জন্যই ঋণদানকারী সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

(২) **অ-ঋণদানকারী সমবায় সমিতি** (Non-credit Co-operative Society) : অ-ঋণদানকারী সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যগণের সেবা করিবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। অ-ঋণদানকারী সমবায় সমিতিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) **উৎপাদক সমবায় সমিতি** (Producers' Co-operative Society) : ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ, কৃষক, কুটির-শিল্পের কারিগরগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায়

সমিতি গঠন করিয়া 'উৎপাদনের উপায়ে' (Means of production) মালিক হইয়া উৎপাদন পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকার সমবায় সমিতিকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলা হয়।

(খ) ক্রেতা সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Society) : উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া পাইকারী ও খুচরা কারবারিগণ মুনাফা অর্জন করে। ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতাকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়। মধ্যবর্তী কারবারিগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সাধারণ ক্রেতাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। এই জাতীয় সমবায় সমিতি সাধারণতঃ উৎপাদকের নিকট হইতে সরাসরি অথবা পাইকারী কারবারিগণের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট ন্যায্যদামে বিক্রয় করে।

সুবিধা : (১) সমাজের দরিদ্র সম্ভোগকারিগণ একতাবদ্ধ হওয়ায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে শোষণমুক্ত হয়।

(২) সমিতি উৎপাদক ও পাইকারগণের নিকট হইতে সরাসরি দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে বলিয়া সম্ভোগকারিগণ অপেক্ষাকৃত সুলভ ও ন্যায্যমূল্যে জিনিস পায়।

(৩) মূল্য সুলভ বলিয়া সভ্যগণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের প্রতি সভ্যগণের মন আকৃষ্ট হয়।

(৫) সভ্যগণের আর্থিক ও সামাজিক মঙ্গল সাধিত হয়।

(৬) সভ্যগণ নিকটবর্তী স্থান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

(৭) সভ্যগণ খাঁটি দ্রব্যের সরবরাহ পায়।

অসুবিধা : (১) সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সর্বদা পাওয়া যায় না।

(২) মূলধন কম থাকায় দ্রব্য মজুত করা সম্ভব নহে।

(৩) ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কারণ সভ্যগণ দক্ষ ব্যবসায়ী নহে।

(৪) একতা ও সহযোগিতার অভাবে উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইতে পারে।

(গ) বিক্রয় সমবায় সমিতি (Co-operative Selling Society) : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকগণের পক্ষে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। উৎপাদিত পণ্য সদ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে উহা গুদামজাত করিতে হয়। গুদামের ভাড়া বহন করিতে হইলে দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়া যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ লইয়া পাইকারগণ অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের ন্যায্য মূল্য দেয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকের নিজেদের দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে বিভিন্ন বাজারে যাতায়াতের খরচও বহন করিতে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পের দ্রব্য উৎপাদনকারী, কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী কৃষক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পৃথকভাবে উৎপাদন করিলেও যৌথভাবে বিক্রয় করিবার জন্য বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করিয়া থাকে।

(ঘ) ক্রেতা সমবায় সমিতি (Co-operative Purchasing Society) : ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মালিক, কৃষক, কুটির-শিল্পের মালিক প্রভৃতি তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি সুবিধা দরে ক্রয় করিতে পারিলে উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম

হয়। সুবিধা দরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত শ্রেণীর উৎপাদকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিয়া থাকে। ইহাদের ক্রেতা সমবায় সমিতি বলে।

(৫) **সমবায় সেবা সমিতি** (Co-operative Service Society): এই প্রকার সমিতি কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা উৎপাদন করে না। সমিতির সদস্যগণের বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা বিভিন্ন প্রকারের সেবা দ্বারা দূর করা হয়। এই প্রকার সমিতি সদস্যগণকে যে-সকল সেবা দিয়া থাকে, তাহার মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল সমবায় গৃহ-নির্মাণ সমিতি।

সমবায় গৃহ-নির্মাণ সমিতি (Co-operative Housing Society): অনেক সমিতি দরিদ্র ও স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে এবং কিস্তিতে মূল্য শোধ করিবার শর্তে সমিতির সদস্যগণের নিকট গৃহ বিক্রয় করে। ইহাদের সমবায় গৃহ-নির্মাণ সমিতি বলে। অনেক সময় নিজেরা জমি ক্রয় করিয়া সেই জমি ন্যায্যমূল্যে সদস্যগণের নিকট বিক্রয় করে। সদস্যগণ নিজেরাই বাড়ী তৈয়ারী করিয়া লয়। সমবায় গৃহ-নির্মাণ সমিতি জমি ক্রয় বা বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য সদস্যদের অল্প সুদে ঋণ দানও করে। এই সমিতি গঠনে ন্যূনতম ৮ জন সদস্যের প্রয়োজন।

(৬) **সমবায় বীমা সমিতি** (Co-operative Insurance Society*): বীমা ব্যবসা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেও সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। সমিতির সদস্যগণ বীমার গ্রহীতা (Policy-holders) হয়। সমিতির মুনাফা সদস্যগণের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

(৭) **সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি** (Multipurpose Co-operative Society): সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি একটি মাত্র কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না। ইহারা একাধারে ঋণদান সমবায় সমিতি, বিক্রয় সমবায় সমিতি, ক্রেতা সমবায় সমিতি ইত্যাদি হিসাবে কার্য করে।

সমবায় সমিতির সুবিধা (Advantages of Co-operative Society):

সমবায় সমিতিতে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ দেখা যায়:

(১) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পের শ্রমিক ও মালিকগণ একত্রিত হইয়া উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে বলিয়া উৎপাদনের জন্য পারিশ্রমিক দিয়া কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয় না। সদস্যগণ অবৈতনিক সেবা দিয়া থাকে। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ হয়।

(২) সমবায় সমিতি মধ্যবর্তী কারবারিগণের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহারা সরাসরি উৎপাদকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ইহাতে ক্রেতা কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

(৩) মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় না। সুতরাং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুনাফা বাড়াইবার যে নানাবিধ অপচেষ্টা দেখা যায়, সমবায় সমিতিসমূহ সেই সকল দোষে দুষ্ট হয় না। ক্রেতাগণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে পাইয়া থাকে। ইহাতে সমিতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

(৪) দরিদ্র কৃষক, কুটির-শিল্পী প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে এবং **জীবনযাত্রার মান উন্নত** করিতে পারে।

(৫) সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টনের ভিত্তিতে সদস্যগণের মধ্যে দেখা দেয় **পারস্পরিক বিশ্বাস, সততা ও সহযোগিতা**। এই সকল সদ্‌গুণের শিক্ষা পাওয়া যায় সমবায় সমিতিসমূহ হইতে। ইহাতে সমবায় সমিতির সদস্যগণের নৈতিক মান উন্নত হয়।

(৬) সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যগণের মনে **আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস** সৃষ্টি করে। সমবায় সমিতিসমূহ স্বায়ত্ত-শাসন নীতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও অধিকার জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

(৭) অল্প মূলধনে সমবায় সমিতিসমূহ পরিচালিত হয়। সুতরাং সমবায় সমিতির মাধ্যমে কুটির-শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করিয়া **অধিকতর কর্মসংস্থান** করা সম্ভব হয়। ইহাতে বেকার-সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

(৮) সমবায় সমিতিসমূহ সহযোগিতার (Co-operation) ভিত্তিতে গঠিত হয় বলিয়া **"প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য"** (Each for all and all for each) কাজ করে।

(৯) ইহারা ধনতান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং **সামাজিক দুর্দশা লাঘব করিতে সাহায্য করে।**

(১০) ইহা সাধারণতঃ আয়কর, বিক্রয়কর ও রেজিস্ট্রেশন ফি রেহাই পাইয়া থাকে।

সমবায় সমিতির অসুবিধা (Disadvantages of Co-operative Society) :

(১) সমবায় সমিতির **মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ**। ফলে ইহারা কোনও বৃহদায়তন শিল্প বা কারবারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে পারে না। কারবার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূলধনের অভাবে সেই সম্ভাবনাকে কার্যে রূপায়িত করিতে সমর্থ হয় না। যে সকল শিল্প-ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন সেই সকল শিল্প ইহাদের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(২) সাধারণতঃ এই সমিতিসমূহের **আর্থিক সামর্থ্য খুব কম**। উদ্যোগী ও কর্মদক্ষ ব্যক্তিগণ এই প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহী হয় না। আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান **অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারে না।**

(৩) এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যথেষ্ট সুনাম থাকিবার দরুন ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে কার্যে **শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা** দেখা দেয়।

(৪) সমবায় সমিতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সেবার মনোবৃত্তি ও পারস্পরিক আস্থা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সদস্যগণের মধ্যে দেখা যায় **সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা**। ফলে সদস্যগণের মধ্যে **মতবিরোধ ও কলহের সৃষ্টি** হয়।

(৫) অধিকাংশ সদস্যই **স্বায়ত্ত-শাসনের নীতি কার্য-পরিচালনায়** প্রয়োগ করিতে অজ্ঞ। ফলে সমিতির ব্যবস্থাপনা **দুষ্ট ও কুচক্রী সদস্যদের হাতে পড়ে।**

পঞ্চম অধ্যায়

বিধিবদ্ধ সংগঠনের বিভিন্ন দিক—যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(Different aspects of Corporate form of Organisation—Joint Stock Companies)

যে সংগঠন আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ ও আইনের ধারা অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহাকে বিধিবদ্ধ সংগঠন বলে। যৌথ মূলধনী কোম্পানী আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ ও পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা বিধিবদ্ধ সংগঠন। পাবলিক কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি সংগঠনও বিধিবদ্ধ সংগঠন।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(Joint Stock Company)

ভূমিকা (Introduction) ঃ

এক-মালিকী কারবার অথবা অংশীদারী কারবারের যে-সকল অসুবিধা দেখা যায় তাহাদের মধ্যে তিনটি অসুবিধা প্রধান : (১) এক-মালিকী অথবা অংশীদারী কারবারের পক্ষে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। এই প্রকার কারবারের আকার সাধারণতঃ ছোট হয়। (২) এক-মালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবার পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষতার অভাব দেখা যায়। মালিক একা অথবা কয়েকজন মালিক, যাহাদের মূলধন যোগাইবার ক্ষমতা আছে তাহারা কারবার স্থাপন করে, কিন্তু অনেক সময়ে মালিকদের কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা থাকে না। ফলে কারবার লাভজনক উপায়ে পরিচালিত হয় না। (৩) এক-মালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবারের অর্থাৎ উহার মালিকদের দায় সীমাহীন। ফলে কারবারের দায়ের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মালিকদের নিজস্ব সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়।

এই অসুবিধাসমূহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর প্রবর্তন করা হইয়াছে। যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠন করিয়া (১) প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। (২) প্রভূত মূলধন সংগৃহীত হইবার ফলে কারবারের আকার বড় হয় এবং বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় ও বণ্টন-ব্যয় কম পড়ে। (৩) প্রচুর পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিবার ফলে এই প্রকার কারবার পেশাদারী ব্যবস্থাপক (Professional Manager) নিয়োগ করিয়া দক্ষতার সহিত কারবারের কার্য পরিচালনা করিতে পারে। (৪) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে দায়-সীমাবদ্ধ হিসাবে গঠিত করা যায় এবং উহার সদস্যদের ব্যক্তিগত দায় সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

উপরোক্ত কারণে বর্তমানে যৌথ-মূলধনী কোম্পানী যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ভূমিকা (Introduction to Joint Stock Companies) ঃ

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীতে "বিধিবদ্ধ সংস্থা" গঠন করিবার ধারণা জন্মলাভ করে। ইংলণ্ডেও এই ধারণা প্রসারিত হয় এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কোম্পানী আইন প্রবর্তিত হয়। যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠনের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য : (১) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ এবং (২) সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্বের সুবিধা গ্রহণ। কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে কোম্পানী আইন তৈয়ারী হয় উহাতে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকিলেও শেয়ার-গ্রহীতাদের সীমিত দায়-দায়িত্বের (Liabilities) কোন সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তাই ইংলণ্ডে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় এবং সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্বের সুবিধা প্রদান করা হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও ইংলণ্ডে কোম্পানী গড়িয়া উঠে, তবে সেই সকল কোম্পানী বিধিবদ্ধ (Registered) কোম্পানী নহে। হাডসন বে এণ্ড্ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইত্যাদি হয় ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর আদেশে, নতুবা ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী চার্টার্ড কোম্পানীরূপে গড়িয়া উঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষে প্রথম কোম্পানী আইন গড়িয়া উঠে। তখন ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সর্বপ্রথম কোম্পানী আইন গঠন করে। ইহার নাম সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট। কিন্তু সেই আইনে সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্বের সুবিধা না থাকায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় ও সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্বের সুযোগ প্রদান করা হয়। ইহার পূর্বেও ভারতে কোম্পানী ব্যবসা ছিল। ইংলণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে কোম্পানীরূপে ব্যবসা করিত এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাহাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ প্রসারিত করিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধিত হয়। এই সংশোধনীতে দুইটি প্রস্তাব করা হয় : (১) ঘরোয়া ও সর্বজনীন কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য আনয়ন গৃহীত হয়; (২) পরিচালকমণ্ডলী গঠন আবশ্যিক করা হয়। পরিচালকমণ্ডলীকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের উপর নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোহেন কমিটির (Cohen Committee) সুপারিশ অনুসারে ইংলণ্ডের কোম্পানী আইন সংশোধিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড তাহার সর্ববৃহৎ উপনিবেশ ভারতবর্ষকে হারায়। তাহা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী দেশসমূহ একে একে ইংলণ্ডের কবলমুক্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় ও ইংলণ্ড তাহার কোম্পানী আইন পরিবর্তন করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভাবা কমিটির (Bhaba Committee) সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ভারতে কোম্পানী আইন পুনর্লিখিত হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিভিয়ান বোস কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ইহা পুনরায় সংশোধিত হয়। ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কোম্পানী আইনের পুনরায় উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা হয়।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সংজ্ঞা (**Definition of a Joint Stock Company**) :

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বহু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সংজ্ঞাসমূহের মধ্য হইতে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্র করিলে ইহার সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়ায় :

যৌথ মূলধনী কোম্পানী একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যাহার আইনসিদ্ধ কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব আছে, চিরন্তন অস্তিত্ব আছে, নিজস্ব সাধারণ সীলমোহর আছে, যাহার স্বত্ব শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক অধিকৃত, যাহার মূলধন স্বত্বান্তরযোগ্য নির্দিষ্টমানের শেয়ারে বিভক্ত এবং যাহা পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

(A Joint Stock Company is a body corporate which has a separate legal entity, a perpetual succession and a common seal owned by a number of shareholders with the right to transfer shares and managed by a Board of Directors)

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য (**Salient Features of a Joint Stock Company**) :

উপরের সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করিলে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায় :

(১) ইহা কতিপয় ব্যক্তির **ঐচ্ছিক মিলনের** (Voluntary Association উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়।

(২) ইহার প্রতিষ্ঠা **আইন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত** হয় (Created by Law)। সুতরাং ইহা একটি **বিধিবদ্ধ সংস্থা** (**Corporate body**) এবং **আইনসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব** (**Corporate personality**)।

(৩) ইহা **মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে** (For Profits) **গঠিত** হয়।

(৪) ইহার মূলধন সদস্যদের নিকট **শেয়ার বিক্রয় করিয়া** সংগৃহীত হয়। ইহার **শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য** (Capital divided into transferable shares)।

(৫) প্রতিটি শেয়ারের একটি **নির্দিষ্ট মান বা আঙ্কিক মূল্য থাকে** (Fixed face value)।

(৬) **ইহা নিজস্ব সীলমোহর** ব্যবহার করিয়া কারবার করে (Having a common seal)। **সীলমোহরের দ্বারাই ইহার পৃথক কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।**

(৭) ইহার **অস্তিত্ব চিরন্তন** (Perpetual succession) আছে অর্থাৎ কোম্পানী আইনতঃ গঠিত হইবার পর যতদিন পর্যন্ত আইনতঃ ইহার অবসান না ঘটে ততদিন পর্যন্ত ইহা যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হিসাবে কার্য করে। চিরন্তন অস্তিত্বের অপর একটি তাৎপর্য এই যে, শেয়ার হস্তান্তরিত হইবার ফলে মালিক পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু কোম্পানীর অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে না।

(৮) আইনের চক্ষে ইহার পৃথক **কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্তা** থাকে (Artificial person অর্থাৎ কোম্পানী গঠিত হইবার পর কারবারের সকল কাজ কোম্পানীর নামেই করিতে হয়—কোম্পানীর সদস্যদের (শেয়ার-মালিকদের) নামে নহে। এমন কি তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইলে অথবা তৃতীয় পক্ষ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করিলে তাহা কোম্পানীর নামেই করিতে হয়। সদস্যদের (শেয়ার-মালিকগণের নামে নহে।

(৯) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যগণ কোম্পানীর **দৈনন্দিন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না।** কোম্পানী পরিচালনার ভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে, কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচালনায় বিচ্ছেদ দেখা যায় (Separation between Capital and Management)।

(১০) **কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিয়ন্ত্রণের ভার সদস্যগণের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত থাকে।** এই কারণে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনাকে **পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা** (Indirect Democratic Administration) বলা হয়। মনোনীত সদস্যকে বলা হয় **পরিচালক** (Director). সদস্যগণকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় **পরিচালকমণ্ডলী** (Board of Directors). ইহারা যে নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি স্থির করেন তাহাই কর্মচারীবৃন্দ কার্যে রূপায়িত করে।

(১১) সদস্যদের ক্রীত শেয়ার দ্বারা অথবা তাহাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সদস্যদের **দায় সীমাবদ্ধ** হইতে পারে। আবার সদস্যদের দায় সীমাহীনও হইতে পারে। ইহা যেভাবে কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করে। তবে দায়-সীমাহীন যৌথ-মূলধনী কোম্পানী খুবই বিরল।

সীমাবদ্ধ দায় বা সীমিত দায় নীতির তাৎপর্য (Meaning of Limited Liability) :

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহের মধ্যে যাহারা 'সীমাবদ্ধ দায়' হিসাবে গঠিত হয়, তাহাদের সদস্যদের (শেয়ার-মালিকদের) দায় সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার অর্থ এই যে, কোম্পানীর দেনার জন্য একজন সদস্য (শেয়ার-মালিক) যতগুলি শেয়ার ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, ততগুলি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য পর্যন্তই সে দায়ী থাকিবে। যৌথ-মূলধনী কোম্পানী সাধারণতঃ শেয়ারের মূল্য একবারেই আদায় করিয়া লয় না। কোম্পানী গঠিত হইবার সময় শেয়ারের মূল্যের এক অংশ লইয়া কাজ আরম্ভ করে। পরে মূলধনের প্রয়োজন অনুসারে কিস্তিতে কিস্তিতে বকেয়া অংশ আদায়

করিবার তলব দেয়। যদি শেয়ার-মালিক ক্রীত শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার আর কোন দায় থাকে না। কিন্তু শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ দেওয়া না হইলে কোন সদস্য শেয়ারের অনাদায়ী অংশের জন্যই মাত্র দায়ী থাকে। কোম্পানী কারবার গুটাইতে বাধ্য হইলে উহার সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারগণের দেনা শোধ করিবার মত অর্থ সংগৃহীত না হইলে সদস্যদের নিকট হইতে শেয়ারপত্র বাবদ পাওনা অর্থ দাবী করে। যাহার নিকট হইতে শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে তাহার নিকট হইতে আর কিছু দাবী করা যায় না; শেয়ার-মালিক বা সদস্য আইনতঃ যতগুলি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে তাহার উপর অনাদায়ী মূল্য দিতে বাধ্য থাকে। ইহাই সীমাবদ্ধ দায় নীতির তাৎপর্য। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

পাইলট কোম্পানী একটি দায় সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Limited Liability Company)। কোম্পানীর প্রতি শেয়ারের মূল্য ৫০০ টাকা। রমেন ৫ খানি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং রমেনের নিকট হইতে কোম্পানী শেয়ারের মূল্য বাবদ ২৫০০ টাকা পাইবে। কোম্পানী ৩ কিস্তিতে শেয়ার-প্রতি ৪০০ টাকা আদায় করিয়াছে। তাহা হইলে কোম্পানী রমেনের নিকট হইতে শেয়ার বাবদ ১০০ টাকা হিসাবে মোট ৫০০ টাকা পাইবে। কমল ৫০০ টাকা মূল্যের ৩খানি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। সে ৩ খানি শেয়ারের মূল্য ১,৫০০ টাকা সম্পূর্ণই পরিশোধ করিয়াছে।

এমত অবস্থায় কোম্পানী কারবার গুটাইল। সুতরাং কোম্পানীর দেনার জন্য রমেনের দায় ৫০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিল। কারণ, তাহার নিকট হইতে ৫ খানি শেয়ারের মূল্য বাবদ কোম্পানী ৫০০ টাকা পাইবে। কিন্তু কমলের কোন দায় রহিল না, কারণ সে যে ৩ খানি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে তাহার মূল্য সম্পূর্ণই পরিশোধ করিয়া দিয়াছে।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Joint Stock Companies)

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) **চার্টার্ড কোম্পানী** (Chartered Company): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর গঠন পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার গঠন ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই একটি সুনির্দিষ্ট আইন আছে। কিন্তু কোম্পানী গঠনের প্রথমদিকে এইরূপ কোন আইন ছিল না। তখন ইংলণ্ডে কোন কোম্পানী গঠন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের মারফত রাজা বা রাণীর নিকট আবেদনক্রমে বিশেষ সনদ বা অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রকার সনদ লইয়া গঠিত হয় সাউথ সি কোম্পানী, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড চায়না,

হাডসন বে কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড (South Sea Company, East India Company, Chartered Bank of India, Australia and China, Hudson Bay Company, Bank of England) ইত্যাদি। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশেষ সনদবলে গঠিত কোম্পানীকেই চার্টার্ড কোম্পানী বলা হইত।

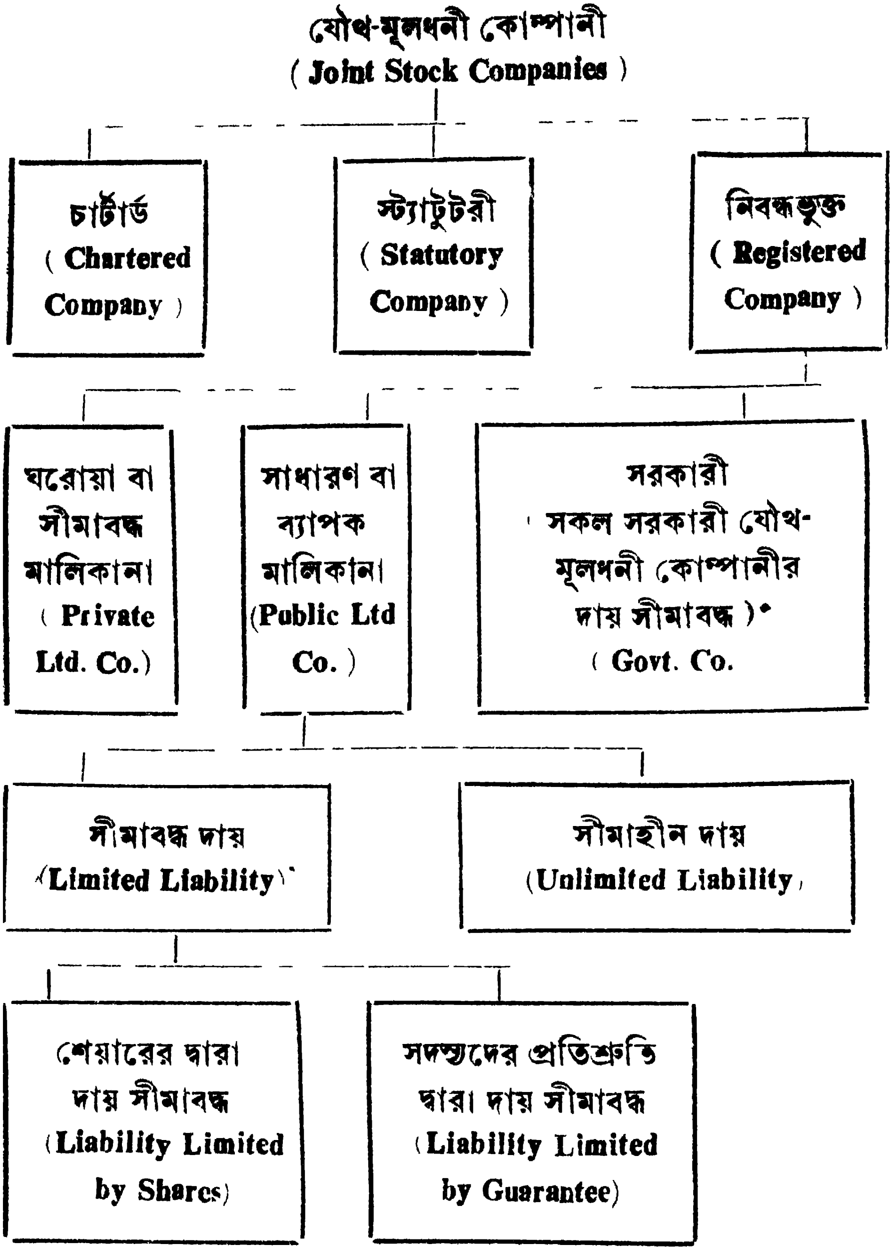
(২) **সংবিধিবদ্ধ বা স্ট্যাটুটরী কোম্পানী** (Statutory Company)ঃ কোনও স্বতন্ত্র ও বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে সংবিধিবদ্ধ বা স্ট্যাটুটরী কোম্পানী বলা হয়। এই প্রকার কোম্পানীসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অথবা বাণিজ্যিক কার্য সম্পাদন করিবার জন্য গঠিত হয়। ইহাদের অনেক সময়ে একটি বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যের একচেটিয়া অধিকারও দেওয়া হয়। কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

(৩) **রেজিস্টার্ড বা নিবন্ধভুক্ত যৌথ-মূলধনী কোম্পানী** (Registered Company)ঃ প্রত্যেক দেশেই কোম্পানীসমূহের গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি আইন থাকে। উহাকে কোম্পানী আইন (Companies Act) বলে। কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত ও নিবন্ধভুক্ত যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে নিবন্ধভুক্ত যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বা রেজিস্টার্ড কোম্পানী বলা হয়। ভারতে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইন (Companies Act of India, 1956) অনুসারে গঠিত হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ঐ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১১নং ধারা অনুসারে কোনও কারবারে ২০ জনের অধিক মালিক অথবা সদস্য (ব্যাঙ্কিং কারবারের ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক) থাকিলে তাহাকে যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং উহাকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধভুক্ত হইতে হইবে। এইরূপ কারবার নিবন্ধভুক্ত না হইলে বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহকে **মালিকানা অনুসারে ভাগ** করিলে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) **ঘরোয়া** (Private) অথবা **সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী**; (খ) **সাধারণ** (Public) অথবা **ব্যাপক মালিকানায় সার্বজনিক যৌথ-মূলধনী কোম্পানী** এবং (গ) **সরকারী যৌথ-মূলধনী কোম্পানী**।

কোম্পানীর দায় সীমাহীন কিংবা সীমাবদ্ধ—সেই দিক হইতে বিচার করিলে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী** এবং (খ) **সীমাহীন দায়-সম্পন্ন যৌথ-মূলধনী কোম্পানী**। কিন্তু **দায়-সীমাবদ্ধ** যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) **শেয়ারের দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী** এবং (২) **সদস্য বা মালিকদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী**।

রেখাচিত্রের সাহায্যে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেখান হইল :



(ক) ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (**Private Company**) ঃ কোন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মালিকানা যদি কারবারের উদ্যোক্তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং মালিকসংখ্যা ৫০-এর ঊর্ধ্বে না হয়,

তাহা হইলে উহাকে ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানা যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বলে। ইহা গঠন করিতে অন্যূন ২ জন সদস্য প্রয়োজন। ইহারা নিবন্ধভুক্ত (Registered) হইলেই কারবার আরম্ভ করিতে পারে। ইহাদের অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। কারবারের পরিচালকমণ্ডলী শেয়ার হস্তান্তরে অনুমতি দিলেই শেয়ার হস্তান্তর হইতে পারে, নচেৎ নহে।

(খ) **সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানার যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Public Company)**ঃ যে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার জনসাধারণের সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকে, তাহাকে সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানার যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বলে। ইহার উর্ধ্বতন সদস্যসংখ্যা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, ইহার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। ন্যূনপক্ষে ইহার সদস্যসংখ্যা ৭, কিন্তু উপরের সংখ্যা সীমাহীন।

(গ) **সরকারী যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Government Company)**ঃ যে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ারের শতকরা অন্ততঃ ৫১ ভাগ শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে অধিকার করে অথবা সরকারী কোম্পানী বা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অধিকৃত তাহাকে সরকারী যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বলা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইন পাশ হইবার পূর্বে ভারতে এই প্রকার সরকারী যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অস্তিত্ব ছিল না।

(ঘ) **সীমাহীন দায়-সম্পন্ন যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Unlimited Liability Company)**ঃ যে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যদের ব্যক্তিগত দায় সীমাহীন, তাহাকে সীমাহীন দায়-সম্পন্ন যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বলে। এই প্রকার কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যই কোম্পানীর সম্পূর্ণ দেনার জন্য দায়ী থাকে।

(ঙ) **দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Limited Liability Company)**ঃ যে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যদের ব্যক্তিগত দায় সীমাবদ্ধ, তাহাকে দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বলে। ইহাতে প্রত্যেক সদস্যের দায়, সে যতগুলি শেয়ার ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহার আঙ্কিক মূল্য পর্যন্ত থাকে। অথবা প্রত্যেক সদস্য কোম্পানীর অবসায়নকালে উহার দেনার যত অংশ পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, সদস্যের দায় সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

(চ) **শেয়ারের দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Company Limited by Shares)**ঃ এই প্রকার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যের ব্যক্তিগত দায়, সে যতগুলি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে উহার আঙ্কিক মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। শেয়ারের মূল্য পরিশোধ হইলে কোম্পানীর দেনার জন্য তাহার কোন দায় থাকে না। যেমন,—রমেন প্রতিখানি ৫০০ টাকা মূল্যের ৫ খানি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। সে যদি কোম্পানীকে শেয়ারের মূল্য বাবদ ২,৫০০ টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা হইলে কোম্পানীর অবসায়নকালে কারবারের দেনার জন্য তাহার কোন দায় থাকে না।

(ছ) **সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানী Company Limited by Guarantee)**ঃ এই প্রকার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর

গঠনকালে সদস্যগণ প্রত্যেকে কোম্পানীর অবসায়ন ঘটিলে কোম্পানীর দেনার জন্য তাহার দায় কত থাকিবে তাহার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। কোম্পানীর অবসায়ন ঘটিলে এবং কোম্পানীর সম্পদ উহার দেনা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রতিশ্রুত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: কমল কোন কোম্পানীর একজন সদস্য। কারবার গঠনকালে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, কোম্পানীর অবসায়ন ঘটিলে উহার ১০ শতাংশ দায় পরিশোধ করিবার জন্য সে দায়ী থাকিবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তাহার প্রতিশ্রুত দায়ের কোন আঙ্কিক মূল্য স্থির হয় নাই। কোম্পানীর দেনা যাহাই হোক, তাহার ১০ শতাংশ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব সে স্বীকার করিয়াছে। কোম্পানীর অবসায়নকালে কোম্পানীর দেনা ১০,০০০ টাকা হইলে সে ১,০০০ টাকা (১০%) দিতে বাধ্য থাকিবে।

যৌথ মূলধনী কোম্পানী প্রবর্তনের (গঠনের) পদ্ধতি
(Procedure of Formation of a Company)

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর প্রবর্তন-পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(১) **প্রবর্তন** (**Promotion**):

কোনও কোম্পানী গঠন করিতে হইলে কোম্পানীকে উদ্যোগী হইতে হয়। এইজন্য কারবারীকে যে-সকল কার্য করিতে হয় তাহার মধ্যে **উদ্যোগকে প্রধান** বলিয়া গণ্য করা হয়। কারবারীকে এক্ষেত্রে **উদ্যোক্তা** (Promoter) বলা হয়। তাহাকে **প্রবর্তক**ও বলে। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহারা কোম্পানী গঠনে (প্রবর্তনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের **উদ্যোক্তা** বলা হয়। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও প্রতিষ্ঠান (Firm) উদ্যোক্তা হিসাবে কার্য করিতে পারে।

প্রবর্তক প্রথমে **কারবারের সম্ভাবনা** অনুমান করিয়া থাকে। সম্ভাবনাকে রূপায়িত করিবার জন্য সে **ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা** করে। যখন কারবারের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত করিলে লাভ হইবে বলিয়া সে নিঃসন্দেহ হয়, তখন কোম্পানী পরিচালনার জন্য **প্রয়োজনীয় মূলধন, পণ্যদ্রব্য, শ্রম ইত্যাদি একত্রিত করিয়া কারবার গঠন করে।**

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠন সম্পর্কে আইনে কিছু নিয়ম-কানুনের উল্লেখ আছে। ইহার গঠন সর্বদাই ঐ নিয়ম-কানুনসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠনে অনেক জটিলতা দেখা যায়। এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছে যাহারা যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠনে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। ইহারাই এই প্রকার কোম্পানীর প্রবর্তক হিসাবে কার্য করে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর প্রবর্তনই পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পেশাদারী প্রবর্তক (Professional Promoter) বলা হয়। ভারতে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিলে

দেখা যাইবে যে, ম্যানেজিং এজেন্টসমূহ (Managing Agents) পেশাদারী প্রবর্তক হিসাবে কার্য করিত। পেশাদারী প্রবর্তকগণের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক কোম্পানী গঠনের পর ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু কারবারিগণ নিজেরাই যখন প্রবর্তক তখন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার এবং দায়িত্ব ইহারাই গ্রহণ করে।

(২) **নিবন্ধন (Registration or Incorporation) ঃ**

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন না হইলে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে না।

ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী ২ জন সদস্য (শেয়ার-হোল্ডার) লইয়া গঠিত হইতে পারে। সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠন করিতে হইলে ন্যূনতম ৭ জন সদস্য বা শেয়ার-হোল্ডারের প্রয়োজন।

কোম্পানীর নিবন্ধনের পূর্বেই প্রবর্তকগণ কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট কোম্পানীর প্রস্তাবিত একটি নাম পাঠাইবেন এবং আরও দু-একটি বিকল্প নাম উল্লেখ করিয়া নিবন্ধকের নিকট হইতে কোম্পানীর নাম অনুমোদন করাইয়া লইবেন।

ইহার পর কোম্পানীর নিবন্ধনের জন্য প্রবর্তকগণকে দুইটি দলিল তৈয়ারী করিতে হয় —একটি **পরিমেল বা স্মারকলিপি** (Memorandum of Association) এবং অপরটি **পরিমেল নিয়মাবলী** (Articles of Association)। ইহার পর যে রাজ্যে কোম্পানী স্থাপিত হইবে সেই রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত যৌথ-মূলধনী কোম্পানী নিবন্ধকের (Registrar of Joint Stock Companies) নিকটে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ দাখিল করিতে হয়। দলিলসমূহ দাখিল করিবার সময় নির্ধারিত মাশুল বা স্ট্যাম্প জমা দিতে হয়।

(ক) **পরিমেল বা স্মারকলিপি (Memorandum of Association) ঃ** পরিমেলবন্ধের বিষয়-বস্তু কয়েকটি অংশে বিভক্ত। ইহা মুদ্রিত আকারে টাইপ করিয়া দাখিল করা যায়। সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বেলায় পরিমেলবন্ধে ন্যূনতম ৭ জন সদস্যের স্বাক্ষর প্রয়োজন, আর ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ মূলধনী কোম্পানীর পরিমেলবন্ধে ন্যূনতম ২ জন সদস্যের স্বাক্ষর আবশ্যক। পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষরকারীদেরই কোম্পানীর প্রবর্তক বলা হয়। অন্ততঃ একখানি শেয়ার গ্রহণ করিয়াছে এমন ব্যক্তিই পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষর করিতে পারে।

(খ) **পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) ঃ** কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের কর্মবিভাগ, দায়িত্ব ইত্যাদি পরিমেল নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় শেয়ারের দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ (Public Company Limited by Shares) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর প্রবর্তকগণ নিজেরা পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ারী করিতে পারে অথবা ভারতীয় কোম্পানী আইনের প্রথম সিডিউলে (Table A) যে 'আদর্শ পরিমেল

নিয়মাবলী' (Model Articles of Association) দেওয়া হইয়াছে উহাও গ্রহণ করিয়া বিবৃতি দিতে পারে। সুতরাং সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় শেয়ারের দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে পরিমেল নিয়মাবলী গঠন বাধ্যতামূলক নহে। তবে ঘরোয়া দায়-সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে (Private Limited Company) এবং সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা দায়-সীমাবদ্ধ সাধারণ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর (Public Limited Company limited by Guarantee) পক্ষে পরিমেল নিয়মাবলী গঠন বাধ্যতামূলক।

(গ) পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা, পেশা এবং শেয়ারের পূর্ণ বিবরণ-সম্বলিত বিবৃতি।

(ঘ) পরিচালকগণের পরিচালক হিসাবে কার্য করিবার লিখিত সম্মতি।

(ঙ) কারবারের অনুমোদিত মূলধন তিন কোটি টাকার বেশী হইলে মূলধন বিলির অনুমতিপত্র—এই অনুমতিপত্র মূলধন বিলির নিয়ামকের (Controller of Capital Issue) নিকট হইতে লইতে হয়। এই নিয়ামক কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(চ) যদি কার্যনির্বাহী পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই চুক্তিপত্র।

(ছ) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীটির গঠনকার্যে সংশ্লিষ্ট এ্যাডভোকেট অথবা সলিসিটর অথবা এ্যাটর্নি অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা একজন পরিচালক অথবা ম্যানেজার এই মর্মে একটি ঘোষণা দিবেন যে, কারবার গঠন ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানী আইনে লিখিত সকল শর্ত পূরণ করা হইয়াছে।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর নিবন্ধক উপরি-উক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোম্পানী আইনের শর্তাবলী মানিয়া কোম্পানীর গঠন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি কোম্পানীটিকে নিবন্ধিত করিবেন। কোম্পানীটিকে নিবন্ধিত করা হইলে একখানি নিবন্ধনপত্র (Certificate of Registration or Incorporation) দেওয়া হয়। নিবন্ধনপত্র পাইলে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পত্তন হয়।

(৩) **কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র** (Certificate of Commencement): সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Public Company) নিবন্ধনপত্র পাইলেই কোম্পানী কার্য আরম্ভ করিতে পারে না, তবে চুক্তি, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য করিতে পারে। ইহারা কোম্পানী আইনের ১৪৯ ধারা অনুসারে নিবন্ধকের নিকট হইতে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) পাইলে তবেই কার্যারম্ভ করিতে পারে। ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Private Company) নিবন্ধনপত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিতে পারে। ইহাদের কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় না।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করিতে হয়ঃ

(ক) শেয়ারপত্র বিক্রয় করিবার জন্য সাধারণের নিকট আবেদন করিয়া একখানি **বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্র** (Prospectus) প্রকাশ করিতে হয়। যে বিবরণপত্র প্রকাশ করা হইবে উহার একখানি প্রতিলিপি (Copy) নিবন্ধকের দপ্তরে প্রকাশের অন্ততঃ ৩ দিন আগে পেশ করিতে হয়। তবে কোম্পানী যদি শেয়ার বিক্রয়ের অবলেখকদের (Underwriters) সহিত চুক্তি করিয়া থাকে অথবা ঘরোয়াভাবে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবরণপত্রের প্রতিলিপি দাখিল না করিয়া **বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি** (Statement in lieu of Prospectus) দাখিল করিবে।

(খ) যে কোনও পরিচালক অথবা কোম্পানীর কর্মসচিব নিবন্ধকের নিকট নিম্নলিখিত শর্তাবলী পালিত হইয়াছে—উহার প্রত্যয়িত ঘোষণা (Certified Statement) দাখিল করিবে :

(১) বিবরণপত্রে অথবা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতিতে লিখিত **ন্যূনতম আদায়ী অর্থ** (Minimum subscription) সংগৃহীত হইয়াছে ,

(২) পরিচালকগণের প্রত্যেকে তাঁহার **যোগ্যতাসূচক শেয়ার** (Qualification Share) ক্রয় করিয়াছেন এবং উহার মূল্য নগদে পরিশোধ করিয়াছেন ;

(৩) কোম্পানীর শেয়ার কোন **অনুমোদিত শেয়ার বাজারে** (Stock Exchange) তালিকাভুক্ত হইবার আবেদন করিতে অক্ষম হইলে অথবা আবেদন করিয়া তালিকাভুক্ত হইতে অক্ষম হইলে উহার জন্য শেয়ার-হোল্ডারগণ শেয়ার-মূল্য ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে।

নিবন্ধক উক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করিয়া কার্যারম্ভের অনুমতি (Certificate of Commencement) দিলে সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী কার্য আরম্ভ করিতে পারে।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাইলে সার্বজনিক বা সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর গঠন পূর্ণ হয়।

(৪) **মূলধনের সংস্থান (Provision of Capital)**ঃ কোম্পানী নিবন্ধনের পর কোম্পানী প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সার্বজনিক কোম্পানী বিজ্ঞাপনী (Prospectus)-এর মাধ্যমে জনগণের নিকট শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে এবং ঘরোয়া কোম্পানী নিজেদের মধ্যে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ-মূলধনও সংগ্রহ করিতে হয়।

(৫) **সংগঠন (Organisation)**ঃ একটি উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে কার্য বিভাগ করিয়া ও শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া কোম্পানী তাহার কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

পরিমেলবন্ধের অথবা স্মারকলিপির বিষয়-বস্তু
(Contents of a Memorandum of Association)

পরিমেলবন্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহার ভিত্তিতেই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। **ইহাতে কোম্পানীর কার্যের পরিধি ও সীমা নির্দেশ করা থাকে।** ইহাকে কোম্পানীর **সনদ** (Charter of Rights) বলে। ইহা কোম্পানীর **সংবিধান**। ইহাতে উল্লেখ নাই এমন কোন কার্য করা হইলে উহা বে-আইনী হইবে এবং কোম্পানী ইহার জন্য দায়ী হইবে।

পরিমেলবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হয় :

(১) **নাম** (Name) : এই ধারায় কোম্পানীর নাম উল্লিখিত হয়। সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় দায়-সীমাবদ্ধ কোম্পানী হইলে নামের শেষে 'পাবলিক লিমিটেড' বা 'লিমিটেড' শব্দটি ব্যবহার করিতে হয়; আর কোম্পানী যদি ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় গঠিত হয় তাহা হইলে 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথাটি ব্যবহার করিতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোম্পানী যে নাম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহা কোন চলতি কোম্পানীর নাম অথবা চলতি কোম্পানীর নামের অনুরূপ হইতে পারিবে না। আবার কোম্পানীর কোনও নাম কেন্দ্রীয় সরকার অবাঞ্ছিত (Undesirable) মনে করিলেও সেই নাম গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে নামের শেষে 'লিমিটেড' কথাটি বাদ দেওয়া চলে। নামের সহিত ন্যাশনাল, স্টেট, রিজার্ভ প্রভৃতি শব্দ যুক্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।

(২) **অবস্থিতি** (Situation) : এই ধারায় কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় কোথায় এবং কোন্ রাজ্যে অবস্থিত হইবে তাহা উল্লেখ করিতে হয়। কোম্পানীর সহিত যাবতীয় পত্রালাপ এই ঠিকানায় হইয়া থাকে।

(৩) **উদ্দেশ্য** (Objects) : এই ধারায় কোম্পানী কি প্রকার ব্যবসায়িক কার্যে লিপ্ত থাকিবে তাহা উল্লেখ করিতে হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, বর্তমানে যে কার্যসমূহ লইয়া কোম্পানী ব্যাপৃত থাকিবে কেবল তাহাই উল্লেখ থাকে না, ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে কোম্পানী যে-সকল কার্য গ্রহণ করিতে পারে তাহারও উল্লেখ থাকে। ইহার কারণ এই যে, পরিমেলবন্ধের কোন ধারার পরিবর্তন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। পরিমেলবন্ধে উল্লিখিত নাই এইরূপ কার্য করিলে তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী আইন সংশোধিত হইবার পর যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হয়।

(৪) **মূলধন** (Capital) : কোম্পানী কত মূলধন সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক এবং সেই মূলধন কি প্রকারের শেয়ার এবং কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত হইবে তাহার উল্লেখ থাকে এই মূলধন ধারায়।

(৫) **দায়** (Liability) : এই ধারায় কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাগণের দায়-সীমাবদ্ধ থাকিবে কিনা তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

(৬) **সম্মতি** (Association) **:** এই ধারায় প্রবর্তকগণের নাম, ঠিকানা, পেশা এবং কোন্ প্রবর্তক কতগুলি শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা লিখিত থাকে এবং প্রত্যেক প্রবর্তককে তাহার নামের পাশে স্বাক্ষর করিতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) :

পরিমেল নিয়মাবলী যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহা কোম্পানী আইনে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পরিচালনার জন্য নির্দেশিত ধারা অনুসারে তৈয়ারী করিতে হয়। **ইহাতে কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে।** ইহাতে কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে পরিচালকবর্গের ও অন্যান্য কর্মচারীদের কার্যের সীমা নির্ধারিত থাকে। শেয়ার-মালিকগণের অধিকার, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি ইহাতে লিখিত থাকে। কোম্পানীর পক্ষে পরিচালকবর্গের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা, অনাদায়ী শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষমতা, হিসাবপত্রাদি যথাযথভাবে রক্ষার ব্যবস্থা, হিসাবপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, সভা-সমিতি আহ্বান ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় পরিমেল নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকে। কোম্পানীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই পরিমেল নিয়মাবলীতে এই সকল বিষয় যোজনা করা হয়। ইহা কোম্পানীর **আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা** (**Indoor Management**)-রূপে পরিচিত।

পরিমেলবন্ধের সঙ্গে পরিমেল নিয়মাবলীও নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী ইচ্ছা করিলে পরিমেল নিয়মাবলী পৃথকভাবে তৈয়ারী নাও করিতে পারে। সেক্ষেত্রে কোম্পানী আইনে সন্নিবেশিত 'টেব্‌ল এ' (Table A) অংশে প্রকাশিত আদর্শ পরিমেল নিয়মাবলী সম্পূর্ণ গৃহীত হইল, এই মর্মে একটি ঘোষণা দিতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয়-বস্তু
(Contents of Articles of Association)

পরিমেল নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে :

(১) অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এবং উহা কি প্রকারের কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত। এই সঙ্গে প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের অধিকার।

(২) শেয়ারের মূল্য এককালীন আদায়ী না হইয়া কিস্তিতে আদায় করিতে হইলে, আবেদন (application), আবণ্টন (allotment), তলব (call) প্রভৃতি কিস্তিতে দেয় অর্থের পরিমাণ।

(৩) কিস্তির টাকা এবং শেয়ারের অর্থ-তলবের নিয়মাবলী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিবার নিয়ম, বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনরায় বণ্টন করা হইলে, উহার পদ্ধতি ইত্যাদি।

(৪) শেয়ার হস্তান্তর-সম্পর্কিত নিয়ম এবং শেয়ার হস্তান্তরের নিমিত্ত ফি দেয় হইলে তাহার পরিমাণ।

(৫) ন্যূনতম মূলধন কি হইবে তাহার ঘোষণা।

(৬) শেয়ার আবণ্টনের পর ৩ মাস পর্যন্ত বিনা ফি-তে শেয়ার সার্টিফিকেট বিলি করিবার নিয়ম ও কি পদ্ধতিতে বিনা ফি-তে শেয়ার সার্টিফিকেট বিলি করা হইবে তাহার নির্দেশ।

(৭) অবলেখকের অথবা শেয়ার-বিক্রেতার কমিশনের হার। (আইনতঃ অবলেখন অথবা শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন শেয়ারের বিক্রয়মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের বেশী হইতে পারে না।)

(৮) মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তনের নিয়মাবলী।

(৯) শেয়ারের পূর্বস্বত্ব (Lien) রক্ষার নিয়মাবলী।

(১০) পরিচালকগণের সংখ্যা, তাহাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি। তাহাদের পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতাসূচক শেয়ারের মূল্য।

(১১) কোম্পানীর কর্মপরিচালক বা ব্যবস্থাপক (Manager) এবং কর্মসচিব (Secretary) নিয়োগের নিয়মাবলী।

(১২) পরিচালক পর্ষদের (Board of Directors) সভা আহ্বান এবং সভা পরিচালনার নিয়ম।

(১৩) কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting) এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান ও পরিচালনার নিয়ম।

(১৪) পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক কোম্পানীর পক্ষে ঋণগ্রহণের অধিকার।

(১৫) শেয়ার-গ্রহীতাগণের ভোটাধিকার এবং সভায় ভোট গ্রহণের পদ্ধতি।

(১৬) হিসাবরক্ষা ও হিসাব নিরীক্ষার নিয়ম।

(১৭) হিসাব-নিকাশ অন্তে লভ্যাংশ ঘোষণা এবং প্রয়োজনবোধে লভ্যাংশ মূলধনীকরণের (Capitalisation of Profits) নিয়ম।

(১৮) কোম্পানীর সীলমোহর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা।

(১৯) পরিমেলবন্ধের কোনও ধারা পরিবর্তনের পদ্ধতি।

(২০) কোম্পানীর বিলোপকরণের বা অবসায়নের (Winding up) পদ্ধতি।

পরিমেলবন্ধ অথবা স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য
(Distinction between a Memorandum of Association and Articles of Association)

পরিমেলবন্ধ অথবা স্মারকলিপি	পরিমেল নিয়মাবলী
(১) বাধ্যবাধকতা: পরিমেলবন্ধ প্রণয়ন প্রত্যেক যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক।	(১) পরিমেল নিয়মাবলী প্রণয়ন সাধারণ অথবা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। ইচ্ছা করিলে ইহা কোম্পানী আইনে সন্নিবেশিত বিকল্প আদর্শ

পরিমেলবন্ধ অথবা স্মারকলিপি	পরিমেল নিয়মাবলী
	পরিমেল নিয়মাবলী 'টেবিল এ' গ্রহণ করিতে পারে। তবে ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে পরিমেল নিয়মাবলী প্রণয়ন বাধ্যতামূলক।
(২) **উদ্দেশ্য**ঃ ইহা দ্বারা তৃতীয়-পক্ষের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। ইহাতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য এবং কার্যের পরিধি বর্ণিত থাকে। ইহা কোম্পানীর **সনদ** (**Charter of Rights**)।	(২) ইহাতে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ পরিচালনা-সম্পর্কিত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। ইহা দ্বারা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। ইহা কোম্পানীর **আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা** (**Indoor Management**)।
(৩) **দলিল**ঃ ইহা কোম্পানীর **মুখ্য দলিল**।	(৩) ইহা কোম্পানীর একটি **গৌণ দলিল**।
(৪) **পরিবর্তন**ঃ পরিমেলবন্ধের কোন ধারার পরিবর্তন করিতে হইলে কোম্পানীর বিশেষ সভায় প্রস্তাব পাশ করাইতে হয় এবং উহা কার্যকর করিতে হইলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।	(৪) পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন করিতে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয় না, সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করিয়াই পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন সম্ভব।
(৫) **বিষয়-বস্তু**ঃ ইহাতে বিষয়-বস্তুসমূহ সাধারণভাবে লিখিত থাকে।	(৫) ইহাতে বিষয়-বস্তুসমূহের খুটিনাটি বর্ণনা করা হয়।

বিজ্ঞাপনী বা অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র বা বিবরণী (Prospectus)ঃ

মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী যে **দলিল মারফত** জনসাধারণের নিকট শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করিতে আহ্বান জানায়, তাহাকে কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র (Prospectus) বলা হয়। এই দলিলখানিতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন পদ্ধতি, কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সভ্যদের বিবরণ ইত্যাদি কোম্পানী-সংক্রান্ত তথ্যাদি থাকে। নোটিশ, বিজ্ঞাপন অথবা যে কোনও দলিল মারফত জনসাধারণের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করা হইলে তাহাকে বিবরণপত্র বলা হয়। বিবরণপত্রের সহিত শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্রের একখানি নমুনা সংযোজিত থাকে।

বিবরণপত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে নিবন্ধকের নিকট ইহার প্রতিলিপি দাখিল করিতে হয়। নিবন্ধকের নিকট বিবরণপত্র দাখিল করা হইয়াছে ইহা বিবরণপত্রে

উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখ করিতে হয়।

পরিচালকবর্গ অথবা তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত কোনও উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা বিবরণপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক। ইহা তারিখযুক্ত (dated) হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবরণপত্রে কোনও প্রকার সত্য গোপন করা হইয়াছে অথবা কোনও বিষয় গোপন করা হইয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলে বিবরণপত্রে স্বাক্ষরকারিগণকে আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতে হয়।

অনেক সময় সংবাদপত্রে বিবরণপত্র সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় না. কেবল আবশ্যকীয় তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাতে উল্লেখ করিতে হয় যে, ইহা বিবরণপত্র নহে (It is not a Prospectus), বিবরণপত্রের জন্য আহ্বান করিবার নির্দেশ মাত্র।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বিবরণপত্র প্রকাশ করিতে পারে না।

বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্রের উদ্দেশ্য (**Objects of a Prospectus**):

বিবরণপত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে কোম্পানীর শেয়ার অথবা ঋণপত্র (Debenture) ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিতে আহ্বান জানান হয়। সুতরাং ইহা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাহাতে জনসাধারণ কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় করিতে আগ্রহী হয়।

বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্রের বিষয়-বস্তু (**Contents of a Prospectus**):

(১) বিবরণপত্রে পরিমেলবন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয়-বস্তুসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়।

(২) কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও প্রবর্তকগণের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি এবং প্রবর্তকগণের মধ্যে কে কতগুলি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে।

(৩) অনুমোদিত মূলধনকে কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(৪) কোম্পানীর মুনাফায় ও সম্পত্তিতে শেয়ার-হোল্ডারগণের অধিকার।

(৫) শেয়ার-মূল্য কতগুলি কিস্তিতে এবং কি উপায়ে দেয়।

(৬) অবলেখক বা দায়-গ্রাহক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি, অবলেখনের দস্তুরি বা কমিশন এবং অবলেখকগণের দায় মিটাইবার ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কে পরিচালকবর্গের বিবৃতি।

(৭) পরিচালক পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি ও তাহাদের যোগ্যতাসূচক শেয়ারের মূল্য এবং পারিতোষিক।

(৮) কোম্পানী যদি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা ম্যানেজারের সহিত কোনও চুক্তি করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি এবং পারিশ্রমিকের

পরিমাণ, চুক্তির মিয়াদ এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে চুক্তি নাকচ করিলে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়।

(৯) কোম্পানী গঠনের প্রারম্ভিক ব্যয়ের (Preliminary Expenses) পরিমাণ।

(১০) শেয়ার আবণ্টনের পূর্বে ন্যূনতম মূলধন আদায় সম্পর্কে ঘোষণা।

(১১) শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য আবেদনের শেষ তারিখ।

(১২) কোম্পানী গঠন করিবার জন্য প্রবর্তকগণ বা পরিচালকগণকে কোনও পারিশ্রমিক অথবা সুযোগ দেওয়া হইলে তাহা।

(১৩) প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারগণের ক্ষমতা, লভ্যাংশ ও অধিকার।

(১৪) কোম্পানীর ব্যাঙ্কার, সলিসিটার ও হিসাব-নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা।

(১৫) কোম্পানী গঠনকালে কাহারও নিকট হইতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে তাহার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য। ক্রীত সম্পত্তির মূল্য নগদ দেওয়া হইয়াছে কিংবা শেয়ার দ্বারা দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হয়।

(১৬) শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিবার পদ্ধতি এবং বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বণ্টনের নিয়মাবলী ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি (Statement in lieu of Prospectus):

অনেক সময় কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ঘরোয়াভাবে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, অথবা শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট অথবা অবলেখক (Underwriter) নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবরণপত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিতে আহ্বান জানান হয় না। কিন্তু নিবন্ধকের নিকট বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করিতে হয়। এই বিবৃতিতে বিবরণপত্রের সকল বিষয়-বস্তুই উল্লেখ করিতে হয়। বিবরণপত্র প্রকাশ না করিলে 'বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি' দাখিল না করিয়া শেয়ার বা ঋণপত্র আবণ্টন (Allotment) করা যায় না।

ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কোম্পানী আইনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। কিন্তু কোম্পানীর কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যয় বহনের জন্য যে ন্যূনতম মূলধন প্রথম পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিবেন বলিয়া পরিমেল নিয়মাবলী এবং বিবরণপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ন্যূনতম বলিয়া পরিগণিত হয়। ন্যূনতম মূলধন সংগৃহীত না হইলে কোম্পানী শেয়ার আবণ্টন আরম্ভ করিতে পারে না।

বিবরণপত্র প্রকাশের ১২০ দিনের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন আদায় না হইলে শেয়ার-ক্রয়েচ্ছু আবেদনকারিগণের নিকট হইতে শেয়ার বাবদ যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা ফেরত দিতে হয়। ঐ নির্দিষ্ট ১২০ দিন সময়ের পর ১০ দিনের মধ্যে আবেদনকারিগণের অর্থ ফেরত না দিলে ১৩০তম দিন হইতে যতদিন পর্যন্ত ঐ অর্থ ফেরত দেওয়া না হয় ততদিনের জন্য আবেদনকারীকে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হয়।

পরিচালকবর্গের যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য শেয়ার ক্রয় (Qualification Shares) ঃ

কোম্পানীর স্বার্থে উপযুক্তভাবে জড়িত না থাকিলে কোন পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন না, ইহা অনুমান করা খুবই সঙ্গত। এই কারণেই কোম্পানী আইনে পরিচালক হইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করা বাধ্যতামূলক। কোম্পানী আইন অনুসারে যোগ্যতামূলক শেয়ারের মূল্য কখনই ৫,০০০ টাকার বেশী হইবে না। কিন্তু প্রতি শেয়ারের মূল্য ৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ একখানি শেয়ার ক্রয় করিতে হয় (ইহা বাহক শেয়ার ছাড়া)। কত মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিলে পরিচালক হইবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাহা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা থাকে। যদি পরিচালক নিযুক্ত হইবার দিন যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করা না থাকে তবে ঐ পরিচালককে পরিচালক নিযুক্ত হইবার দিন হইতে দুইমাসের মধ্যে উহা অধিকার করিতে হয়। অন্যথায় তাঁহাকে পরিচালক পদে ইস্তফা দিতে হয়।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অর্থ-সংস্থান (Corporate Finance) ঃ

মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Need for Capital) ঃ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীতে যে অর্থ (মূলধন) বিনিয়োগ করা হয়, প্রয়োগ অনুসারে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **স্থায়ী মূলধন** (Fixed or Block Capital); (২) **কার্যকরী বা চলতি মূলধন** (Working Capital)। স্থায়ী মূলধনকে **দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন** (Long-term Capital) এবং **কার্যকরা বা চলতি মূলধনকে স্বল্প-মিয়াদী মূলধন** (Short-term Capital) বলা হয়।

স্থায়ী মূলধন নিম্নলিখিত কার্যে ব্যয় করা হয় :

(১) কোম্পানীর জন্য জমি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় অথবা নির্মাণ করা।

(২) কোম্পানীর যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করা।

(৩) কোম্পানীর সম্প্রসারণ অথবা পুনর্গঠন-ব্যয় বহন করা।

চলতি অথবা কার্যকরী মূলধন (Working Capital) ঃ কারবারিগণের মতে কারবারে যত টাকা খাটিতেছে উহা হইতে স্থির মূলধন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কার্যকরী মূলধন। ইহাদের মতে কোম্পানীর চলতি সম্পদ (Current or Floating Assets) হইতে চলতি দেনা (Current Liabilities) বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই কার্যকরী মূলধন। কোম্পানীর নগদ তহবিল, ব্যাঙ্কে জমা টাকা, মজুত দ্রব্যের মূল্য এবং কোম্পানীর দেনাদারদের নিকট হইতে পাওনা, এই চারটির সমষ্টিই চলতি সম্পদ। কোম্পানীর পাওনাদারদের নিকট দেনা ও ব্যাঙ্ক হইতে অধিবিকর্ষ (Overdraft) দেনার সমষ্টি চলতি দেনা (Current Liabilities)। চলতি সম্পদ হইতে দেনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কার্যকরী মূলধন। এই স্থানে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

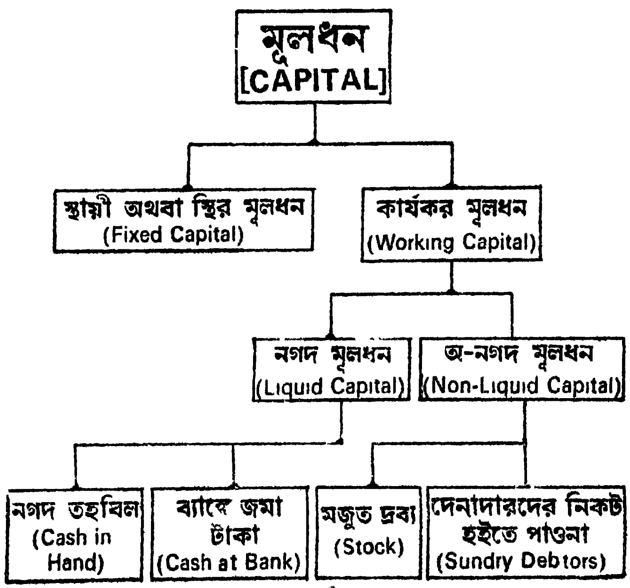
কোম্পানীর নগদ তহবিল—৫,০০০	টাকা
ব্যাঙ্কে জমা তহবিল—১০,০০০	,,
হাতে মজুত দ্রব্যের মূল্য—২৫,০০০	,,
কোম্পানীর দেনাদারদের নিকট হইতে পাওনা— ৭,০০০	,,
৪৭,০০০	,,
বাদ কোম্পানীর পাওনাদারদের নিকট দেনা—১৫,০০০	,,
কার্যকরী মূলধন—৩২,০০০	,,

কার্যকরী মূলধন বা সম্পদের যে অংশ প্রয়োজনমত এবং বিনা আয়াসে নগদ অর্থে পরিণত করা যায়, তাহাকে **নগদ মূলধন** (Liquid Capital) বলে। নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কে জমা অর্থ নগদ মূলধনের প্রধান উদাহরণ।

কার্যকরী মূলধন নিম্নলিখিত কারণে ব্যয় করা হয় :

(১) কাঁচামালের মূল্য প্রদান।
(২) শ্রমিকের মজুরী, কর্মচারিগণের পারিশ্রমিক, ইত্যাদি প্রদান।
(৩) উৎপাদিত দ্রব্যের মজুতের ব্যবস্থাকরণের ব্যয়।
(৪) কোম্পানী পরিচালনার জন্য অন্যান্য নিয়মিত ব্যয়, ইত্যাদি।

সুতরাং, কারবারিগণ মূলধনকে যেভাবে ভাগ করে তাহা রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখান হইল :



কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন ও ব্যবহৃত মূলধন (Capital owned by a Company and Capital used by a Company) ঃ

অনেক সময় কোম্পানী তাহার নিজস্ব মূলধন কারবারে ব্যবহৃত মূলধন হইতে পৃথক করিয়া দেখে। এইরূপ পার্থক্য বাহির করিবার কারণ এই যে, কোম্পানী দেখিতে চাহে যে, নিজস্ব মূলধন যাহাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীতে কত টাকা মূলধন খাটিতেছে। কোনও কোম্পানীতে মোট মূলধনের মধ্যে ১০,০০০ টাকা কার্যকরী মূলধন হিসাবে খাটিতেছে। কিন্তু কার্যকরী মূলধনের মধ্যে যাহা দেনাদারদের নিকট হইতে পাওনা, যাহা বাস্তবিকপক্ষে কোম্পানীতে খাটিতেছে না, তাহা দেনাদারদের নিকট আটক রহিয়াছে। ধরা যাক, ইহার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। সুতরাং কোম্পানীতে নিজস্ব মূলধন খাটিতেছে ১০,০০০ টাকা −৩,০০০ টাকা=৭,০০০ টাকা। কিন্তু কোম্পানীর নিকট হইতে পাওনাদারগণ দ্রব্য সরবরাহ বাবদ ৪,০০০ টাকা পাইবে। যদি কোম্পানী অন্য কারবারীদের নিকট হইতে ধারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ না পাইত তাহা হইলে কোম্পানীর নিজেকেই আরও ৪,০০০ টাকা খাটাইতে হইত। সুতরাং অন্য কারবারীদের নিকট ঋণের সুযোগ পাইবার জন্য কোম্পানীতে প্রকৃতপক্ষে খাটিতেছে—নিজস্ব ৭,০০০ টাকা+পাওনাদারদের নিকট ঋণ ৪,০০০ টাকা=১১,০০০ টাকা। নিম্নের একটি অঙ্কের সাহায্যে কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন ও কোম্পানীর ব্যবহৃত মূলধনের উদাহরণ দেওয়া হইল :

কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন—	১০,০০০ টাকা
বাদ দেনাদারদের নিকট হইতে পাওনা—	৩,০০০ ,,
	৭,০০০ ,,
যোগ পাওনাদারদের নিকট দেনা—	৪,০০০ ,,
কোম্পানীর ব্যবহৃত মূলধন—	১১,০০০ ,,

মূলধন সংগ্রহের উৎস (Sources of Capital) ঃ সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী নিম্নলিখিত উপায়ে দীর্ঘ-মিয়াদী ও স্বল্প-মিয়াদী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে ঃ

(১) **শেয়ার মূলধন (Share Capital)** ঃ

নব-গঠিত কোম্পানীর পক্ষে শেয়ারের মূল্যই মূলধনের প্রধান উৎস। ইহাকে প্রথম অবস্থায় শেয়ার বিক্রয় করিয়াই অর্থ-সংস্থান করিতে হয়।

সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া শেয়ার বিক্রয় করে, কিন্তু ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদন গ্রহণ করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ কোম্পানীর প্রবর্তকগণ নিজেদের মধ্যে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করেন।

শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের কতকগুলি সুবিধা আছে। তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) শেয়ার-ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করে।

(খ) কারবারী ঝুঁকি (Business Risk) বহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শেয়ার ক্রয় করিতে উৎসাহিত হয়।

(গ) শেয়ার হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীর স্থায়ী মূলধন। কোম্পানীর বিলুপ্তি না ঘটিলে শেয়ারের মূল্য-বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হয় না। তবে একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে। পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার শেয়ারপত্রের (Redeemable Preference Share) মূল্য এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়।

(ঘ) শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থদ্বারা কোম্পানীতে যে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় তাহা জামিন রাখিয়া স্বল্প-মিয়াদী ঋণের প্রয়োজন মিটান যায়।

(ঙ) শেয়ারের মূল্য অল্প বলিয়া স্বল্প-সঞ্চয়কারীও লাভজনকভাবে তাহার সঞ্চয় খাটাইবার সুযোগ পায়।

(চ) বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকিবাহক হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে।

(২) ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ (Debenture Capital) ঃ

পুরাতন কোম্পানী বাজারে সুনাম ও প্রতিষ্ঠাধিকার লাভ করিলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের সুযোগ পায়। নূতন কোম্পানীর পক্ষে প্রথমেই ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয় না। ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হইলে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। কোম্পানীতে মুনাফা হোক কিংবা না হোক ঋণপত্রের উপর চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতেই হয়।

শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমনি ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহের কিছু সুবিধা রহিয়াছে। যেমন—

(ক) কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঋণদাতাগণ হস্তক্ষেপ করিতে পাবে না। তাই ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগৃহীত হইলে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ মূলধনের সংস্থান হয়।

(খ) কোম্পানী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া যে মূলধন পায় তাহা লাভজনকভাবে খাটাইতে পারিলে সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের অধিক হারে মুনাফা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, কোম্পানীর আয় বাড়িলেও ঋণের উপর দেয় সুদের হার একই থাকে।

(গ) ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে কোম্পানীর কোন সম্পদ বা সম্পত্তি জামিন রাখিতে হয়। জামিন রাখিয়া ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অনায়াসে মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

(৩) জন-আমানত (Public Deposits ঃ

ভারতের শিল্প-গঠনের গোড়ার দিকে শিল্পে মূলধন সংস্থানে জন-আমানত এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রবর্তকগণের বন্ধু-বান্ধব, ম্যানেজিং এজেন্টগণের বন্ধু-বান্ধব এবং অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা হইত।

বর্তমানে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রসার লাভ করায় জন-আমানতের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। অতীতে বস্ত্র, কাগজ, শর্করা (চিনি) প্রভৃতি শিল্পে জন-আমানতের পরিমাণ খুবই অধিক ছিল। আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর অধিকাংশ কাপড়ের কলের কোম্পানীগুলি এইভাবে মূলধন সংগ্রহ করিত।

(৪) ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নিকট হইতে সংগৃহীত মূলধন (Capital Supplied by Managing Agents) ঃ

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার গোড়ার দিকে যখন মূলধনের বাজার (Capital Market) সংগঠিত হয় নাই, যখন ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা অনুন্নত ও অনগ্রসর ছিল, জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের স্পৃহা জন্মায় নাই, তখন ম্যানেজিং এজেন্টদের উপরই যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মূলধন যোগাইবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইত। ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাদের ব্যবস্থাপনাধীন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিত। পরবর্তীকালে নানা কারণে কোম্পানীর মূলধন সংস্থানে তাহাদের ভূমিকার গুরুত্ব কমিয়া যায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল এই প্রথা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৫) ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ (Financing by Bank) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের (Commercial Bank) পক্ষে কোম্পানীর শেয়ার অথবা ঋণপত্র (Debenture) ক্রয় করিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন যোগান সম্ভব নহে। কারণ, তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে যে আমানত গ্রহণ করে তাহা দাবিমাত্র পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। তবে সকল আমানতকারী একই সময়ে আমানত ফেরত দাবি করে না। এইজন্য আমানতের অর্থ ব্যাঙ্ক স্বল্প-মিয়াদী ঋণে খাটাইতে পারে। কোম্পানীসমূহের স্বল্প-মিয়াদী মূলধন যোগাইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিল্পীয় ব্যাঙ্কও (Industrial Banks) যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। শিল্পীয় ব্যাঙ্কসমূহ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করে।

(৬) সরকারী অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions set-up by the Government) ঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে শিল্পীয় ব্যাঙ্ক ও মিয়াদী মূলধন সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বৃহদায়তন কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ভারতে স্বাধীনতালাভের পর শিল্প ও বৃহদায়তন কোম্পানীর দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংস্থানে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী উদ্যোগে এবং মালিকানায় অনেকগুলি অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Institution) স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা শিল্পের এবং বৃহদায়তন কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করিয়া, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিয়া (অবলেখন) এবং কোম্পানীর সম্পদ ও সম্পত্তি জামানত রাখিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী ও মধ্য-মিয়াদী মূলধন যোগাইয়া থাকে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক (Industrial Finance Corporation, State Finance Corporation, National Industrial Development Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation, Industrial Development Bank) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৭) **মুনাফা পুনর্বিনিয়োগকরণ (Ploughing back of Profits) ঃ**

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী যে মুনাফা অর্জন করে উহা শেয়ার-হোল্ডারগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু নীতিগতভাবে মুনাফার সবটাই শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। ভবিষ্যতে কোম্পানীর প্রয়োজন অনুসারে যাহাতে অর্থের সংস্থান হয় সেই উদ্দেশ্যে অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং উহা কোম্পানীর মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রকার অর্থ-সংস্থানের পদ্ধতিকে স্বয়ংক্রিয় অর্থ-সংস্থান (Auto-financing or self-financing), আভ্যন্তরীণ অর্থ-সংস্থান (Internal financing), মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ (Ploughing back of Profit) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অর্থ-সংস্থানে এই পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং সরকারও এই পদ্ধতিতে অর্থ-সংস্থানের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন।

(৮) **আন্তর্জাতিক ঋণ (International Loans) ঃ**

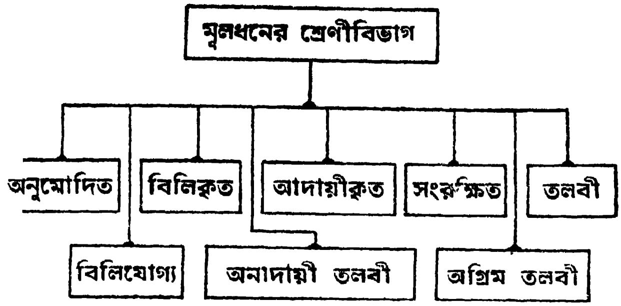
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠনের জন্য এবং আর্থিক দিক হইতে অনুন্নত দেশসমূহের শিল্প সম্প্রসারণের জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থ-সংস্থান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের (United Nations) সদস্য-দেশের কোনও শিল্প অথবা বৃহদায়তন কোম্পানী প্রয়োজনবোধে এই সংস্থা হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে রাষ্ট্রে শিল্প-কারবারটি অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের সরকারকে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সম্প্রতি 'টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' বিশ্ব ব্যাঙ্ক (International Bank for Development and Reconstruction or World Bank) হইতে ইহার সম্প্রসারণের জন্য কয়েক কোটি টাকার আর্থিক ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital) ঃ

আইনতঃ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মূলধনকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) **অনুমোদিত, নিবন্ধকৃত বা রেজিস্ট্রিকৃত অথবা অভিহিত মূলধন (Authorised, Registered or Nominal Capital) ঃ** যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর নিবন্ধক কর্তৃক কোম্পানীটিকে যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হয়, তাহাকে অনুমোদিত মূলধন বলে। অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ পরিমেলবন্ধে উল্লেখ থাকে। অনুমোদিত মূলধনকে নিবন্ধকৃত বা রেজিষ্ট্রিকৃত বা স্মারকলিপিতে মূলধন অথবা অভিহিত মূলধনও বলা হয়।

(২) **বিলিযোগ্য মূলধন** (Issued Capital) ঃ অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে যে অংশ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহাকে বিলিযোগ্য মূলধন (Issued Capital) বলে।



(৩) **প্রতিশ্রুত বা বিলিকৃত মূলধন** (Subscribed Capital) ঃ বিলিযোগ্য মূলধনের যে অংশ জনসাধারণ ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছে, তাহাই প্রতিশ্রুত বা বিলিকৃত মূলধন।

(৪) **তলবী মূলধন** (Called-up Capital) ঃ বিলিকৃত শেয়ারের মূল্যের যে অংশ পরিশোধ করিবার জন্য শেয়ার-হোল্ডারদের আহ্বান জানান হয়, তাহাকে তলবী মূলধন বলা হয়।

(৫) **আদায়ীকৃত মূলধন** (Paid-up Capital) ঃ তলবী মূলধনের মধ্যে যে অংশ প্রকৃতপক্ষে আদায় করা হইয়াছে, তাহাই আদায়ীকৃত মূলধন।

(৬) **অনাদায়ী তলবী মূলধন** (Calls-in-Arrear Capital) ঃ তলবী মূলধনের যে অংশ অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহাকে অনাদায়ী তলবী মূলধন বলে। উহা তলবী মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধনের ব্যবধানের সমান।

(৭) **সংরক্ষিত মূলধন** (Reserve Capital) ঃ অ-তলবী মূলধনের কোনও অংশ কোম্পানীর বিলোপসাধনের সময় ব্যতীত আদায় করিবার তলব দেওয়া হইবে না বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে, অ-তলবী মূলধনের সেই অংশকে সংরক্ষিত মূলধন (Reserve Capital) বলা হয়। ইহা পরিমেল নিয়মাবলী বা আর্টিকেলস্-এ উল্লেখ থাকে।

(৮) **অগ্রিম তলবী মূলধন** (Calls-in-Advance Capital) ঃ বিলিকৃত শেয়ারের মূলধন প্রদানের তলব দিবার পূর্বেই শেয়ার-হোল্ডারগণ শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিলে সেই মূলধনকে অগ্রিম তলবী মূলধন (Calls-in-Advance Capital) বলা হয়।

নীচে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার মূলধনের একটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

মনে করা যাক, একটি সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়। পরিমেলবন্ধে উল্লিখিত মোট ১০ টাকার

৫,০০০ খানি শেয়ার আছে; ৪,০০০ খানি শেয়ার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণ ৩,৫০০ খানি শেয়ারের জন্য আবেদন করিয়াছে; এবং উহা বিলি হইয়াছে। প্রতিটি শেয়ারের টাকা সমান চারটি কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে; কোম্পানী দুইটি কিস্তি পরিশোধ করিতে আহ্বান জানাইয়াছে; ৩,২০০ খানি শেয়ারের উপর দুইটি কিস্তি পাওয়া গিয়াছে এবং ৩০০ খানি শেয়ারের উপর দ্বিতীয় কিস্তিতে অর্থ পাওয়া যায় নাই; ১০০ খানি শেয়ারের উপর তৃতীয় কিস্তির অর্থ অগ্রিম পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানীটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, কোম্পানী বিলোপের পূর্বে চতুর্থ কিস্তিটি চাওয়া হইবে না। অতএব এক্ষেত্রে—

1. **অনুমোদিত মূলধন** (Authorised Capital)
=টা. ১০×৫,০০০ =টা. ৫০,০০০

2. **বিলিযোগ্য মূলধন** (Issued Capital)
=টা. ১০×৪,০০০ = ,, ৪০,০০০

3. **বিলিকৃত মূলধন** (Subscribed Capital)
=টা. ১০×৩,৫০০ = ,, ৩৫,০০০

4. **তলবী মূলধন** (Called-up Capital)
=টা. ২·৫০×২×৩,৫০০ = ,, ১৭,৫০০

5. **আদায়ীকৃত মূলধন** (Paid-up Capital)
= { টা. ২·৫০×৩,৫০০ + টা ২·৫০ ×৩,২০০ } = ,, ১৬,৭৫০

6. **অনাদায়ী তলবী মূলধন** (Calls-in-Arrear Capital)
=টা. ২·৫০×৩০০ = ,, ৭৫০

7. **সংরক্ষিত মূলধন** (Reserve Capital)
=টা. ২·৫০×৩,৫০০ = ,, ৮,৭৫০

8. **অগ্রিম তলবী মূলধন** (Calls-in-Advance Capital)
=টা ২·৫০×১০০ = ,, ২৫০

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Shares) ঃ

ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে বর্তমানে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহ দুই প্রকার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে: (১) **সাধারণ** (Equity or Ordinary) ও (২) **অগ্রাধিকারযুক্ত** (Preference)। **উদ্যোক্তাগণের শেয়ার** বা **বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার** (Founders' Shares or Deferred Shares) ভারতীয় আইনে বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং **বোনাস শেয়ার** (Bonus Shares) কতকগুলি শর্তানুসারে বিলি করা যায়। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত, অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত,

অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত, অনংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত, প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারযুক্ত অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার, ইত্যাদি।

(১) সাধারণ শেয়ার (**Ordinary or Equity Shares**) ঃ

সাধারণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে মূলধন সংগৃহীত হয়, উহাই প্রকৃতপক্ষে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ঝুঁকিসহ মূলধন (Risk Capital)। যাহারা সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করে, তাহাদের ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডার বা সাধারণ শেয়ার-হোল্ডার বলা হয়। এই শ্রেণীর মালিকগণ অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণকে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা হইতে লভ্যাংশ বণ্টন করিবার পর অবশিষ্ট মুনাফা হইতে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। আবার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অবসায়ন বা বিলোপ ঘটিলে কোম্পানীর দেনা মিটাইয়া যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মূলধন প্রত্যর্পণ করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দ্বারা ইকুইটি বা সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের মূলধন প্রত্যর্পণ করা হয়। ইকুইটি শেয়ারের উপর মুনাফার হার অনির্দিষ্ট। সুতরাং কোম্পানীর মুনাফা বেশী হইলে ইহারাও অধিক হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। কারণ, কোম্পানীর মুনাফা যতই বাড়ুক না কেন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ এক নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। তাহাদের লভ্যাংশ বণ্টন করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা লভ্যাংশ হিসাবে ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কোম্পানীর মুনাফা কম হইলে ইহাদের লভ্যাংশের হার খুব অল্প হয়, কিংবা মুনাফা কম হইলে লভ্যাংশ নাও হইতে পারে। দেখা যায় যে, কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, এই অবস্থায় বাজারে সাধারণ শেয়ারের বা ইকুইটি শেয়ারের মূল্য বাড়িয়া যায়। কোন কারণে কোম্পানী আশানুরূপ লভ্যাংশ দিতে না পারিলে সাধারণ শেয়ারের মূল্য পড়িয়া যায়। সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণই কোম্পানীর প্রকৃত ঝুঁকি-বাহক (Risk bearers)। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মত ইহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ নহে।

(২) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (**Preference Shares**) ঃ

মূলধনের যে অংশ কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টনে এবং কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটিলে মূলধন ফেরত পাইবার জন্য অগ্রাধিকার পায়, তাহাই অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Preference Share)। প্রথমতঃ, এই প্রকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোম্পানীর বণ্টনযোগ্য মুনাফা হইলে তাহা হইতে সর্বাগ্রে এই শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হয়। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বণ্টনের পর সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের উপর মুনাফার হার নির্দিষ্ট থাকে। তৃতীয়তঃ, কারবারের বিলুপ্তি ঘটিলে কোম্পানীর দায়-দেনা মিটাইবার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে উহা দ্বারা সর্বাগ্রে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মূলধন ফেরত দেওয়া হয়।

অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের বিভিন্ন রূপ (Types of Preference Shares) ঃ

(ক) সঞ্চয়ী বা ক্রম-যৌগিক অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Cumulative Preference Shares) ঃ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের প্রাপ্য নির্দিষ্ট লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকে। যে বৎসর কোম্পানী মুনাফা অর্জন করিতে অক্ষম হয় সেই বৎসরের প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ বঞ্চিত হয় না। পরবর্তী বৎসরে যখন কোম্পানীর মুনাফা হইবে তখন সর্বাগ্রে অতীতের বকেয়া এবং চলতি বৎসরের জন্য প্রাপ্য লভ্যাংশ দেওয়া হয়। যদি একাদিক্রমে কয়েক বৎসর মুনাফা অর্জন করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে সেই কয়েক বৎসরের প্রাপ্য লভ্যাংশ যখন কোম্পানী মুনাফা অর্জন করে তখন সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

(খ) অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Non-Cumulative Preference Shares) ঃ অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ চলতি বৎসরের লভ্যাংশ বণ্টন বিষয়েও অগ্রাধিকার পায়। অর্থাৎ ইহাদের চলতি বৎসরের মুনাফা হইতে লভ্যাংশ পাইবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যদি কোনও বৎসর কোম্পানী মুনাফা অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে সেই বৎসরের লভ্যাংশ পরবর্তী বৎসরের মুনাফা হইতে দেওয়া হয় না।

(গ) অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Participating Preference Shares) ঃ অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইবার পরও অতিরিক্ত মুনাফা পাইবার অধিকারী। এই প্রকার শেয়ার-হোল্ডারগণকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিবার পরও কি পরিমাণ মুনাফা দেওয়া হইবে তাহা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়। অগ্রাধিকারযুক্ত সকল প্রকার শেয়ার-হোল্ডারগণের নির্দিষ্ট হারে মুনাফা বণ্টনের পর, সাধারণতঃ ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণের মুনাফা দেওয়া হয়। তাহার পরও মুনাফার যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের অতিরিক্ত মুনাফা দেওয়া হয়। সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণকে সমান হারে অথবা তদপেক্ষা কম হারে এই অতিরিক্ত মুনাফা দেওয়া হয়।

(ঘ) অনংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Non-participating Preference Shares) ঃ যে শ্রেণীর অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে নির্দিষ্ট মুনাফার পর অতিরিক্ত মুনাফা দেওয়া হয় না, তাহাদের অনংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলা হয়।

(ঙ) প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Redeemable Preference Shares) ঃ কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকিলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্ত পূরণ করিলে এই প্রকার শেয়ারের মূল্য এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে ফেরত দেওয়া হয়। শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয় বলিয়া ইহাদের প্রত্যর্পণ-যোগ্য শেয়ার বলা হয়। যতদিন শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া না হয় ততদিন ইহার মালিকগণ মুনাফায় অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে।

(চ) **অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার** (Non-redeemable Preference Shares) **:** অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য কখনই ফেরত দেওয়া হয় না।

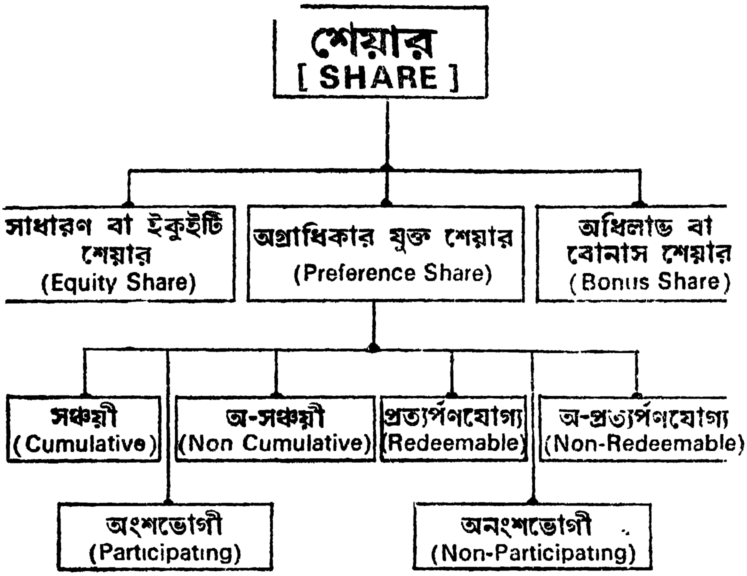
(৩) **উদ্যোক্তাগণের শেয়ার বা বিলম্বিত দায়যুক্ত শেয়ার** (**Founders' Shares or Deferred Shares**) **:**

কোম্পানীতে মুনাফায় অংশগ্রহণ (অর্থাৎ লভ্যাংশ বন্টনের ব্যাপারে) এবং শেয়ারের মূল্য ফেরত দিবার ব্যাপারে এই প্রকার শেয়ার-হোল্ডারগণের দাবি সবশেষে বিচার করা হয়। কোম্পানীর মুনাফা হইতে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের ও সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণের লভ্যাংশ বণ্টনের পর এই শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। কোম্পানীর অবসায়ন ঘটিলে কোম্পানীর সম্পদ হইতে অগ্রাধিকারযুক্ত ও সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের নিয়োজিত মূলধন ফেরত দিবার পর ইহাদের মূলধন ফেরত দেওয়া হয়। এই প্রকার শেয়ার সাধারণতঃ কোম্পানীর পরিচালক-গোষ্ঠী ও তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই বিলি করা হইত। অনেক সময় শেয়ারের দায়-গ্রাহক বা অবলেখকদের (Underwriters) অথবা কোনও কোম্পানীর নিকট হইতে কারবার ক্রয় করা হইলে সেই বিক্রেতা কোম্পানীকে (Vendor) এই প্রকার শেয়ার বিলি করিত। ইহার মূল্য অগ্রাধিকারযুক্ত অথবা সাধারণ শেয়ার হইতে অনেক কম হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকার শেয়ারের মূল্য নামমাত্র হয়। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রদানের জন্যই প্রবর্তক অথবা উদ্যোক্তাগণ এবং তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই এই প্রকার শেয়ার বিক্রয় করা হইত। এই প্রকার শেয়ারের মাধ্যমে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কোম্পানীতে তাহাদের স্বার্থ কায়েম করিতে পারে; সেইজন্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইনে উহার বিলি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(৪) **অধিলাভ বা বোনাস শেয়ার** (**Bonus Shares**) **:**

কোম্পানীর সঞ্চয় তহবিলে (Reserve Fund) প্রভূত অর্থ সঞ্চয় হইলে অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চিত তহবিলের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ মূলধনে পরিণত করা হয়। সঞ্চিত তহবিলের যে অংশ মূলধনে পরিণত (Capitalise) করা হয় সেই অর্থ পরিমিত মূল্যের শেয়ার পুরাতন সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে বিলি করা হয়। এইরূপ শেয়ারকে অধিলাভ বা বোনাস শেয়ার বলে। কখনও কখনও শেয়ার অধিমূল্যে (Premium) বিলি করা হইলে অধিমূল্য বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ দ্বারাও অধিলাভ বা বোনাস শেয়ার বিলি করা হয়। বিলিকৃত মূলধন অনুমোদিত মূলধন অপেক্ষা কম হইলে কোম্পানীর সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বোনাস শেয়ার বিলি করা চলে।

নিম্নলিখিত রেখাচিত্র দ্বারা শেয়ারের বিভিন্ন ভাগ দেখান হইল



অগ্রাধিকারযুক্ত ও সাধারণ শেয়ারের সুবিধা ও অসুবিধা (**Advantages and Disadvantages of Preference and Equity Shares**) ঃ

সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারের সুবিধা (**Advantages of Equity Shares**) ঃ

(১) কোম্পানীর মুনাফা বেশী হইলে ইহারা উচ্চহারে লভ্যাংশ পায়।

(২) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়। সুতরাং কোম্পানীর মুনাফার বাকী অংশ সম্পূর্ণই সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণ পাইতে পারে। ইহাতে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার উচ্চ হয়।

(৩) চড়া বাজারে এই প্রকার শেয়ারের মূল্য বাড়িয়া যায়। কারণ, চড়া বাজারে সাধারণ শেয়ারের উপর মুনাফার হার উচ্চ হয়। সুতরাং শেয়ারের মূলধনী লাভ (Capital Gain) হয়।

(৪) সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের কোম্পানীর সাধারণ সভায় ভোট দানের অধিকার থাকে।

সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারের অসুবিধা (**Disadvantages of Equity Shares**) ঃ

(১) ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণের খুব বেশী ঝুঁকি লইতে হয়। কারণ, কোম্পানীর মুনাফা পর্যাপ্ত না হইলে ইহারা মুনাফা পায় না। মন্দার বাজারে মুনাফার হার কমিয়া যায়। সুতরাং ইকুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ আয় অনির্দিষ্ট তো বটেই, অনিশ্চিতও।

(২) কোম্পানীর বিলোপ ঘটিলে ইহার দায়-দেনা মিটাইয়া অবশিষ্ট সম্পদ হইতে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূলধন ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন সর্বাগ্রে গণ্য করা হয়।

(৩) মন্দার বাজারে অনেক সময়ে এই প্রকার শেয়ার উনমূল্যে (Below par) অর্থাৎ অবহারে (Discount) বিক্রয় করিতে হয়। ইহাতে বিক্রেতার মূলধনী লোকসান (Capital Loss) হয়।

অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের সুবিধা (Advantages of Preference Shares) ঃ

(১) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে ক্রেতা কি হারে লভ্যাংশ পাইবে তাহা শেয়ার ক্রয় করিবার সময়ই জানিতে পারে।

(২) এই প্রকার শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার কিছু কম হইলেও লভ্যাংশ বাবদ আয় সম্বন্ধে প্রায় সুনিশ্চিত হওয়া যায়। এই কারণে যাহারা বেশী ঝুঁকি লইতে চাহে না তাহারা এই প্রকার শেয়ারে বিনিয়োগ পছন্দ করে।

(৩) মন্দার বাজারে এই প্রকার শেয়ারের মূল্য বেশী হয়। এই কারণে মন্দার বাজারে এই প্রকার শেয়ার বিক্রয় সহজ।

(৪) কোম্পানী উঠিয়া গেলে কোম্পানীর দায়-দেনা বাদে যে সম্পদ থাকে তাহা দ্বারা প্রথমে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মূলধন ফেরত দেওয়া হয়।

(৫) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে যাহারা সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ক্রয় করে, তাহাদের কোন ঝুঁকি লইতে হয় না। কারণ কোনও এক বৎসর বা কয়েক বৎসর লভ্যাংশ না পাইলেও তাহারা সেই সময়ের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হয় না।

(৬) অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাইবার পরও অতিরিক্ত মুনাফা পায়।

অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের অসুবিধা (Disadvantages of Preference Shares) ঃ

(১) কোম্পানী খুব বেশী মুনাফা করিলেও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশের অতিরিক্ত কিছু পায় না।

(২) চড়া বাজারে মুনাফা বেশী হয় বলিয়া সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারের মূল্য বাড়ে। কিন্তু অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য কমে।

(৩) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার পায়। কোম্পানীর সভায় এই প্রকার শেয়ার-হোল্ডারগণ কেবল তাহাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ভোট দিতে পারে; সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের মত সভার সকল বিষয়ে ভোট দিতে পারে না। তবে যদি সঞ্চয়ী অর্থাৎ পুঞ্জীভূত অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের উপর পর পর অন্ততঃ দুই বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহারা সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের মত সকল বিষয়ে ভোট দিতে পারে। অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরপর দুই বৎসর অথবা ছয় বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া না হইলে উহারা ভোটাধিকার পায়।

স্টক (Stock) ঃ

কোম্পানীর মোট মূলধন আদায় হইলে এবং পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকিলে কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ নিবন্ধককে এক মাসের নোটিশ দিয়া শেয়ারকে স্টকে পরিণত করিতে পারে। সুতরাং কোম্পানীর মূলধন সম্পূর্ণ আদায় না হইলে শেয়ারকে স্টকে পরিণত করা যায় না। শেয়ারকে স্টকে পরিণত করিলে শেয়ার-হোল্ডারগণের কোনরূপ স্বার্থহানি ঘটে না।

মোট মূলধনকে কতকগুলি নিম্নতম মূল্যের অভগ্ন এককে ভাগ করা হইলে প্রতিটি একককে শেয়ার বলা হয়। কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে কোম্পানীর মোট মূলধনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি একককে টাকায় প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ—একটি কোম্পানীর মোট মূলধন ৫০,০০০ টাকা। উহা ১,০০০টি অভগ্ন এককে ভাগ করা হইল। প্রতিটি একককে একটি শেয়ার বলা হয় এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হইবে ৫০ টাকা। ঐ কোম্পানীটির মোট মূলধন সম্পূর্ণ আদায় হইবার পর স্টকে (যেমন, ১০০ টাকার ৫০০ খানি শেয়ারে) পরিণত করা হইল। অর্থাৎ কোম্পানীর মোট মূলধন ১০০ টাকার ৫০০ খানি শেয়ার স্টকে পরিণত হইল।

শেয়ার ও স্টকের তুলনা (Comparison between Share and Stock) ঃ

শেয়ার	স্টক
(১) শেয়ারের মূল্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইতে পারে।	(১) স্টকের মূল্য সর্বদাই সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত হইতে হয়।
(২) প্রতিটি শেয়ারের একটি নম্বর থাকে।	(২) স্টকের কোনও নম্বর থাকে না।
(৩) শেয়ার অভগ্ন অংশে ক্রয়-বিক্রয় হয়.	(৩) স্টক বিভাজ্য এবং স্টকের ভগ্নাংশ হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় চলে।
(৪) শেয়ারের নির্দিষ্ট আঙ্কিক মূল্য থাকে।	(৪) স্টকের কোন নির্দিষ্ট আঙ্কিক মূল্য থাকে না।

ঋণপত্র (Debenture) ঃ

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ঋণ গ্রহণ অন্যতম। কোম্পানীর মূলধন পর্যাপ্ত না হইলে ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা যায়। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি উহার পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকে। পরিচালক পর্ষদ সেই নিয়ম অনুসারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ঋণ গ্রহণ করিলে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে ঋণপত্র বিলি করিতে হয়।

ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণের দলিল। ডিবেঞ্চার কথাটি ল্যাটিন 'ডেবার' (Debere) শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ 'ঋণ করা' (to owe)।

ঋণ পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, ঋণের উপর প্রদেয় সুদ সম্পর্কিত শর্তাবলী উল্লেখ করিয়া যে দলিলের পরিবর্তে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার

(Debenture) বলা হয়। ইহাকে বণ্ড (Bond)-ও বলে। ডিবেঞ্চারে কারবারের নাম ও সীলমোহর থাকে।

ব্যাপক মালিকানায় বা সাধারণ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে ঋণপত্র বিলি করিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণী বা বিজ্ঞাপনী (Prospectus) প্রকাশ করিতে হয়।

ঋণপত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Debentures) ঃ

ঋণপত্রকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) **সাধারণ ঋণপত্র** (Ordinary or Naked Debenture) ঃ

যে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চারের জন্য কোম্পানীর কোন সম্পদ বা সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হয় নাই, তাহাই সাধারণ ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার। প্রয়োজনবোধে ঋণদাতাগণ কোম্পানীর কোনও বিশেষ সম্পদ বা সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঋণ আদায় করিতে পারে না বলিয়া এই প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ কষ্টকর।

(২) **বন্ধকী বা রেহণী ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার** (Mortgage Debenture) ঃ

কোম্পানীর কোনও বিশেষ সম্পদ বা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া যে ঋণপত্র বিলি করা হয়, তাহাকে বন্ধকী বা রেহণী ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করা সহজ ; কারণ, কোম্পানী উঠিয়া গেলে বন্ধকী সম্পদ বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ঋণদাতাগণের পাওনা শোধ করা হয়।

বন্ধকী ঋণপত্র দুই প্রকারের হইতে পারে—(ক) **স্থির দাবি ঋণপত্র** (Fixed Charge Debenture) ও (খ) **অ-স্থির দাবি ঋণপত্র** (Floating Charge Debenture)। স্থির দাবি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়, ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত সেই সম্পদ হস্তান্তর করা যায় না। অ-স্থির দাবি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে যে সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণপত্র বিলি করা হইয়াছে, ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীতই সেই সম্পদ হস্তান্তর করা যায়।

ঋণ জমানতী কিংবা অ-জমানতী—সেই হিসাবে ঋণপত্রকে উপরোক্ত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

(৩) **পরিশোধ্য ঋণপত্র** (Redeemable Debenture) ঃ

যে ঋণপত্র দ্বারা সংগৃহীত ঋণ এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে পরিশোধ করা হয়, তাহাকে পরিশোধ্য ঋণপত্র বলে। ঋণ পরিশোধে সুবিধার জন্য কারবার একটি ঋণপত্র পরিশোধ তহবিল (Debenture Redemption Fund) গঠন করিতে পারে। ঋণপত্র পরিশোধ তহবিল গঠন না করিলে অনেক সময়েই কোম্পানীকে নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

(৪) **অ-পরিশোধ্য ঋণপত্র** (Non-redeemable Debenture) ঃ

যে ঋণপত্র দ্বারা সংগৃহীত ঋণ কোম্পানী উঠিয়া না গেলে পরিশোধ করা হয় না, তাহাকে অ-পরিশোধ্য ঋণপত্র বলে। তবে কোম্পানী ঋণের উপর সুদ দিতে অপারগ

হইলে এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। ইহাকে চিরস্থায়ী ঋণপত্রও (Perpetual Debenture) বলা হয়।

(৫) **রেজিস্ট্রিকৃত বা নিবন্ধকৃত ঋণপত্র** (Registered Debenture) ঃ

ঋণপত্রে যদি ক্রমিক-নম্বর বসান থাকে, ঋণদাতার নাম লেখা থাকে এবং কোম্পানীর ঋণদাতাগণের বইতে (Debenture-holders' Register) যদি ঋণদাতাদের নাম নিবন্ধন করা হয়, তাহা হইলে সেই ঋণপত্রকে রেজিস্ট্রিকৃত বা নিবন্ধকৃত ঋণপত্র বলে।

রেজিস্ট্রিকৃত ঋণপত্র হস্তান্তর করিতে হইলে কোম্পানীকে জানাইতে হয়, হস্তান্তর দলিল (Transfer Deed) তৈয়ারী করিতে হয় এবং কোম্পানীর বইতে স্বত্ব-গ্রহীতার নাম নিবন্ধন করাইতে হয়।

(৬) **অ-রেজিস্ট্রিকৃত বা অ-নিবন্ধকৃত ঋণপত্র** (Unregistered Debenture) ঃ

যে ঋণপত্রে কোন ক্রমিক-নম্বর দেওয়া থাকে না এবং যাহা হস্তান্তর করিতে কোন হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিতে হয় না, তাহাকে অ-রেজিস্ট্রিকৃত বা অ-নিবন্ধকৃত ঋণপত্র বলে।

শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Share and Debenture) ঃ

শেয়ার	ঋণপত্র
(১) শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীর মূলধন।	(১) ঋণপত্র-বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীর ঋণ কিন্তু মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
(২) শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানীর মালিক।	(২) ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানীর উত্তমর্ণ বা পাওনাদার।
(৩) শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।	(৩) ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না।
(৪) শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানীর লাভ ও ক্ষতিতে অংশ গ্রহণ করে।	(৪) ঋণপত্রের মালিকগণ ঋণের উপর সুদ পায়। কিন্তু মুনাফার অংশ পায় না।
(৫) কোম্পানী উঠিয়া গেলে সকল প্রকার দেনা শোধ করিবার পর যদি কোম্পানীর কিছু সম্পদ থাকে, তাহা শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।	(৫) কোম্পানী উঠিয়া গেলে ঋণপত্রের মালিকগণের পাওনা শেয়ার-হোল্ডারগণের শেয়া— — ফেরত দিবার পূর্বে পরিশোধ করিতে হয়।
(৬) কেবল পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার কোম্পানীর কার্যকালে পরিশোধ করা হয়। অন্য সকল প্রকার শেয়ারের অর্থ কোম্পানীর অবলুপ্তি না ঘটিলে ফেরত দেওয়া হয় না।	(৬) অ-পরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ঋণপত্র ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ঋণপ— — —

শেয়ারের বিলিমূল্য (Issue Price of Share) ঃ

শেয়ার কি মূল্যে বিলি করা হইবে তাহা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকে। পরিমেল নিয়মাবলীতে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই পরিচালক পর্ষদকে শেয়ার

বিলি করিতে হয়। শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য বা নির্ধারিত মূল্য (Face Value) হইতে বেশী মূল্যে অথবা কম মূল্যে শেয়ার বিলি করা যাইতে পারে। যদি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য বা নির্ধারিত মূল্য হইতে কম মূল্যে শেয়ার বিলি করা হয়, তবে তাহাকে **অবহারে বা ঊনমূল্যে বিলি** (Issue at a Discount) বলে; আর যদি শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে শেয়ার বিলি করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে **অধিমূল্যে বিলি** (Issue at a Premium) বলে।

অধিমূল্যে শেয়ার বিলি করিতে আইনতঃ কোন বাধা-নিষেধ নাই। কিন্তু অবহারে শেয়ার বিলি করিতে হইলে ভারতীয় কোম্পানী আইনে নির্দেশিত কিছু শর্ত পূরণ করিতে হয়।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সুবিধাসমূহ (Advantages of Joint Stock Companies):

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল:

(১) **প্রচুর মূলধন সংগ্রহ** (Enormous Capital): এই প্রকার কোম্পানীর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য অল্প থাকে। অল্প মূল্যে অধিক-সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হয়। ইহাতে স্বল্প-সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহেও সুবিধা হয় এবং মূলধনের পরিমাণও অধিক হয়।

(২) **শেয়ার হস্তান্তর** (Transferability of Share): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে যে-সকল কোম্পানী ব্যাপক মালিকানায় গঠিত হয় (Public Companies) তাহাদের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করা সম্ভব। শেয়ার-হোল্ডারগণ প্রয়োজনমত শেয়ার হস্তান্তর করিয়া নগদ অর্থ পাইতে পারে।

(৩) **সীমাবদ্ধ দায়** (Limited Liability): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে এক প্রকার কোম্পানী আছে যাহার শেয়ার-হোল্ডারগণের দায় সীমাবদ্ধ। ফলে সঞ্চয়কারিগণের বিনিয়োগে ঝুঁকি কমিয়া যায়। অসীম দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিরল।

(৪) **সুদক্ষ পরিচালনা** (Efficient Management): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী পরিচালনার ভার পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। পরিচালক পর্ষদ সুদক্ষ পরিচালকগণ লইয়া গঠিত হয়। পরিচালকমণ্ডলী পরিবর্তনযোগ্য। প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরিচালকগণকে পরিবর্তন করিয়া আরও দক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা যায়। ইহাতে অদক্ষ পরিচালকের হাতে পড়িয়া কারবার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(৫) **জনগণের আস্থা** (Public Confidence): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী স্থিরীকৃত বলিয়া ইহাকে আইনের বাধ্যবাধকতায় থাকিতে হয়। ইহাতে কারবারের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে। আস্থা থাকে বলিয়া বিনিয়োগকারিগণ নির্ভয়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে।

(৬) **ব্যয়-সংকোচ** (Economy in Cost): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টনের সুবিধা ভোগ করে। প্রচুর মূলধন সংগৃহীত হয় বলিয়া আধুনিক

যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ হয় এবং গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয় কম হয়।

(৭) **প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয়** (Integration of Business Aptitude and Capital): বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের কারবারী প্রতিভা আছে, কিন্তু অর্থের অভাবে সেই প্রতিভা কার্যকর হয় না। আবার বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের অর্থ আছে, কিন্তু কারবার পরিচালনার প্রতিভা নাই। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সুষ্ঠু শ্রম-বিভাগের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া করা হয় বলিয়া যাহারা কারবার পরিচালনায় দক্ষ তাহাদের উপর কোম্পানীর পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া সাধারণ বিনিয়োগকারিগণ তাহাদের সঞ্চয় নির্ভয়ে বিনিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে।

(৮) **চিরন্তন অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা** (Perpetual Succession and Separate Entity): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী আইনতঃ পৃথক ব্যক্তিসত্তা লাভ করে। ফলে, কোম্পানীর মালিকানার (অর্থাৎ সদস্যদের) পরিবর্তন ঘটিলেও কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। আইনতঃ ব্যক্তিসত্তা লাভ করে বলিয়া যতদিন কোম্পানীর বিলোপ সাধন না হয় ততদিনই ইহা কার্য চালাইতে থাকে। সুতরাং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সম্প্রসারণের সুযোগ পাওয়া যায়।

(৯) **ঝুঁকি সংকোচন** (Reduction in Risk): সঞ্চয়কারিগণ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহাদের বিনিয়োগের ঝুঁকি ছড়াইয়া দিতে পারে। একই কোম্পানীতে প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ না করিয়া বহু-সংখ্যক কোম্পানীতে অল্প অল্প অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়কারীদের ঝুঁকি কমিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার ক্রয় করিয়াও ঝুঁকির পরিমাণ কমান যায়। বিনিয়োগযোগ্য অর্থের কিছু অংশ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে, কিছু অংশ অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে, কিছু অংশ সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে একদিকে যেমন আয়ের স্থিরতা ও অধিক আয়ের সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে তেমনি ঝুঁকি সংকোচ হয়। ইহাতেও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ অথচ মূলধন যোগাইতে সমর্থ ব্যক্তিগণ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হয়।

(১০) **গণতান্ত্রিক পরিচালনা** (Democratic Management): কোম্পানী গণতান্ত্রিক সংস্থা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক।

(১১) **সামাজিক দায়িত্ব পূরণ** (Fulfilment of Social Responsibilities): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বহুল পণ্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটায়, শিল্প-উন্নয়নে সাহায্য করে এবং কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

(১২) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ** (Social Control): এই জাতীয় কারবারে সমাজের বহু-সংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত বলিয়া ইহা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

(১৩) **সহযোগিতা** (Collaboration): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী মূলধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য, ব্যবস্থাপনা অথবা কারিগরি জ্ঞান (technical know-how)

লাভের উদ্দেশ্যে কোন জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে নূতন কোম্পানী অথবা নূতন কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে।

(১৪) **পরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ** (Facility of Investigation and Research): নূতন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কোম্পানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাকার্যে অর্থব্যয় করিতে পারে।

(১৫) **সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্য** (Expansion and Diversification): পরিচালনায় দক্ষতা ও প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় ইহার সম্প্রসারণে প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কোম্পানী বহুবিধ উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হইয়া কারবারে বৈচিত্র্য আনিতে পারে।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Joint Stock Companies):

এইরূপ কোম্পানীর অসুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল:

(১) **ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব** (Absence of direct relationship with Customers): যে-সকল কারবার ক্রেতাসাধারণের চাহিদা, রুচি ও পছন্দ অনুসারে পরিবর্তনীয়, সেই সকল কারবারে যৌথ-মালিকানায় সাফল্য লাভ করা কঠিন। কারণ, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পরিচালনা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া ভোক্তার সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।

(২) **অসাধু পরিচালনা** (Dishonest Management): অসাধু এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণ সাধারণ বিনিয়োগকারীকে প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত করিয়া অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী করে এবং অসাধু উপায়ে বিনিয়োগকারিগণের অর্থ আত্মসাৎ করে।

(৩) **পরোক্ষ পরিচালনা** (Indirect Management): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক মনে হইলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কয়েকজন প্রভাবশালী শেয়ার-হোল্ডার পরিচালনার অধিকার অর্জন করে। ইহাতে পরিচালকবর্গের স্বার্থ কায়েমী হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) **বেতনভুক্ কর্মচারী কর্তৃক পরিচালনা** (Management by Paid Servants): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার পরিচালক পর্ষদের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু তাহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ফলে, কোম্পানীর পরিচালনার ভার বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত হয়। ইহার যথেষ্ট ত্রুটি আছে। বেতনভুক্ কর্মচারিগণের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ ও কোম্পানীর স্বার্থ যে এক—এই মনোভাবের অভাব দেখা যায়। ফলে, কার্যে গাফিলতি, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, অপচয় বৃদ্ধি ইত্যাদি ত্রুটি দেখা দেয়।

(৫) **স্বজন-পোষণ** (Nepotism): পরিচালকগণের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আত্মীয় ও স্বজন-পোষণ প্রবণতা দেখা যায়।

(৬) **মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছেদ** (Divorce between Ownership and Management): যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারগণ সরাসরি

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে না। ফলে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ব্যবধান দেখা যায়।

(৭) **শ্রমিক ও মালিক বিরোধ** (Dispute between Labour and Management): যৌথ-মূলধনী কোম্পানী পরিচালনার ভার প্রকৃতপক্ষে পেশাদারী পরিচালকগণের হাতে থাকায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(৮) **অতি বৃহৎ আকার** (Gigantic Size): কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানীর আয়তন এত বৃহৎ আকার ধারণ করে যে, ইহার কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়-সাধন কষ্টকর হয়।

(৯) **গোষ্ঠীতান্ত্রিক পরিচালনা** (Oligarchic Rule): তাত্ত্বিক দিক হইতে ইহার পরিচালনা গণতান্ত্রিক হইলেও বস্তুতঃ ইহা মুষ্টিমেয় সংখ্যাগুরু শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং সংখ্যালঘু সদস্যগণের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ চালায়।

(১০) **শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ** (Forfeiture of Shares): শেয়ারের তলবী অর্থ অনাদায়ী থাকিলে পরিচালক পর্ষদ পরিমেল নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালক-মণ্ডলীর সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। যে শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয় উহার প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হয় না। ফলে শেয়ার-হোল্ডার বঞ্চিত হয়।

অংশীদারী কারবার ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Partnership and Joint Stock Company)

অংশীদারী কারবার	যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(১) **গঠন**: অংশীদারী কারবার গঠনে আইনের জটিলতা নাই।	(১) আইনানুগ অনুষ্ঠান পালন করিয়া যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠন করিতে হয়।
(২) **মূলধন**: অংশীদারী কারবারে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর তুলনায় মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা কম। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ।	(২) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্য-সংখ্যা অধিক বলিয়া মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা অধিক। প্রচুর সম্পত্তির মালিক বলিয়া ইহারা অতি সহজে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।
(৩) **পরিচালনা**: অংশীদারী কারবারের সকল অংশীদারই কারবারের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে।	(৩) মালিকগণ কর্তৃক পরিচালক নির্বাচন বাধ্যতামূলক এবং পরিচালকগণই কোম্পানী পরিচালনা করে। সদস্যগণের সরাসরি কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার নাই।
(৪) **ব্যবস্থাপনা**: যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর তুলনায় অংশীদারী কারবারের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা কম।	(৪) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সংগঠকগণ দক্ষ এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে দক্ষতার অভাব হয় না।

অংশীদারী কারবার	যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(৫) **শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ঃ** অংশীদারী কারবার মালিকগণ কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত হয় বলিয়া শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সুমধুর থাকে ; সম্পর্কের অবনতি ঘটিবার কারণ দেখা দিলে সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	(৫) এই প্রকার কারবারের পরিচালনার ভার কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে ; ফলে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনা খুবই অধিক।
(৬) **পরিবর্তনশীলতা ঃ** এই প্রকার কারবার অতি সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।	(৬) এই প্রকার কারবারের কার্যাবলী পরিমেলবন্ধ দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নূতন কর্মপদ্ধতি সহজে গ্রহণ করা যায় না।
(৭) **সত্তা ঃ** আইনের দৃষ্টিতে অংশীদার ও অংশীদারী কারবার অভিন্ন সত্তা।	(৭) যৌথ-মূলধনী কোম্পানী আইনের সৃষ্টি। কোম্পানী গঠনের পর কারবারের স্বতন্ত্র সত্তা জন্মায়। শেয়ার-হোল্ডার ও কোম্পানী পৃথক সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়।
(৮) **স্থায়িত্ব ঃ** অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্বের স্থিরতা নাই। অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলেই কারবারের বিলোপ ঘটাইতে পারে।	(৮) স্থায়িত্বের দিক হইতে যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সহিত অন্য কোনও প্রকার কারবারের তুলনা চলে না। ইহাদের স্থায়ী স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সদস্যগণের ইচ্ছা অনুসারে এই প্রকার কোম্পানীর বিলোপ ঘটে না।
(৯) **সম্প্রসারণ ক্ষমতা ঃ** আর্থিক সামর্থ্য সীমিত বলিয়া ইহাদের সম্প্রসারণের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।	(৯) আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশী থাকায় ইহাদের সম্প্রসারণের ক্ষমতা খুবই অধিক।
(১০) **দায় ঃ** অংশীদারী কারবারে সদস্যদের দায় সীমাহীন।	(১০) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর দায় সীমাবদ্ধ। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারগণের (সদস্য) দায় প্রত্যেকের ক্রীত শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য সীমাহীন-দায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যগণের দায় অংশীদারী কারবারের সদস্যদের মতই সীমাহীন। সীমাহীন-দায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী ভারতে দেখা যায় না।

ঘরোয়া বা প্রাইভেট ও সার্বজনিক বা পাবলিক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Private Limited Company and Public Limited Company)

ঘরোয়া বা প্রাইভেট কোম্পানী	সার্বজনিক বা পাবলিক কোম্পানী
(১) **সদস্য-সংখ্যা:** অন্যূন দুইজন সদস্য এই প্রকার কোম্পানী গঠন করিতে পারে।	(১) এই প্রকার কোম্পানীর গঠনের জন্য অন্যূন সাতজন সদস্যের প্রয়োজন।
(২) **কার্যারম্ভ:** ইহারা নিবন্ধনের পরই কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিতে পারে।	(২) ইহারা কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র না পাইলে কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিতে পারে না।
(৩) **পরিমেল নিয়মাবলী:** পরিমেল নিয়মাবলী প্রণয়ন বাধ্যতামূলক।	(৩) পরিমেল নিয়মাবলী প্রণয়ন বাধ্যতামূলক নহে।
(৪) **অনুষ্ঠানপত্র:** মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবন্ধকের নিকট অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণী দাখিল করিতে হয় না, অথবা বিবরণী প্রকাশ করিয়া মূলধন সংগ্রহের অধিকারও নাই।	(৪) মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবন্ধকের নিকট বিবরণী অথবা বিবরণীর পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করা বাধ্যতামূলক।
(৫) **ন্যূনতম মূলধন:** ইহাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূলধন আদায়ের শর্ত প্রযোজ্য নহে।	(৫) ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ না হইলে মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না।
(৬) **পরিচালক সংখ্যা:** পরিচালক পর্ষদে অন্যূন দুইজন সদস্য থাকিলেই চলে।	(৬) পরিচালক পর্ষদে অন্যূন তিন-জন সদস্য থাকিতে হয়।
(৭) **শেয়ার বিক্রয়:** এই প্রকার কোম্পানী জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না। ইহার দরুন এই কোম্পানী সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানায় গঠিত কোম্পানী অপেক্ষা কম মূলধন সংগ্রহ করিতে সক্ষম।	(৭) ইহারা জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে বলিয়া প্রভূত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।
(৮) **পরিবর্তনশীলতা:** ইহারা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সহজে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।	(৮) ইহাদের পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নহে।
(৯) **হস্তান্তরযোগ্যতা:** এই প্রকার কোম্পানীর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য	(৯) এই প্রকার কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ার হস্তান্তরে

ঘরোয়া বা প্রাইভেট কোম্পানী	সার্বজনিক বা পাবলিক কোম্পানী
নহে। এই প্রকার কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর করিতে হইলে পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতি প্রয়োজন।	পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না।
(১০) **পরিধিঃ** এই প্রকার কোম্পানীর মালিকানা সাধারণতঃ নিকটবর্তী স্থান ও পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (closely-owned)।	(১০) ইহার মালিকানা সাধারণতঃ ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ (widely-owned)।

সমবায় সমিতি ও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Co-operative Society and Joint Stock Company)

সমবায় সমিতি	যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(১) **গঠনঃ** সমবায় সমিতির গঠন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ।	(১) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর গঠন পদ্ধতিতে যথেষ্ট জটিলতা আছে।
(২) **মূলধন সংগ্রহঃ** ইহারা সাধারণতঃ দরিদ্র ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং ইহার মূলধনের সংস্থান প্রচুর নহে।	(২) যৌথ-মূলধনী কোম্পানীতে পেশাদারী ঝুঁকিদার ও বিত্তশালিগণ মূলধন জোগায়। সুতরাং ইহারা প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।
(৩) **আয়তনঃ** এই প্রকার সমিতির আয়তন ক্ষুদ্র হয়।	(৩) ইহা আয়তনে বড় হয়।
(৪) **ব্যবস্থাপনাঃ** ইহাতে উদ্যোগী ও দক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	(৪) ইহাতে লাভের সম্ভাবনা অধিক থাকে বলিয়া উদ্যোগী, দক্ষ ও ঝুঁকি-গ্রহণে স্বচ্ছ বহু ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। ইহার ফলে দক্ষ পরিচালক পাওয়াও সহজ হয়।
(৫) **শ্রমিক-মালিক সম্পর্কঃ** সমবায় সমিতির মালিকগণই কর্মী। সুতরাং শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা যায় না।	(৫) ইহাতে পরিচালনার ভার কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া মালিক ও শ্রমিকগণের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। ফলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রায়ই লাগিয়া থাকে।
(৬) **সম্প্রসারণঃ** আর্থিক কারণেই অর্থাৎ মূলধনের স্বল্পতার জন্যই ইহাদের সম্প্রসারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।	(৬) ইহাদের কারবার সম্প্রসারণের ক্ষমতা অনেক বেশী।

সমবায় সমিতি	যৌথ-মূলধনী কোম্পানী
(৭) **উদ্দেশ্য ঃ** মধ্যবর্তী কারবারী-গণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়।	(৭) ইহারা মধ্যবর্তী কারবারিগণের সহায়তায় কারবার করে।
(৮) **কর রেহাই ঃ** সরকার আয়কর, বিক্রয়কর, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি রেহাই দিতে পারে।	(৮) আয়কর, বিক্রয়কর, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি রেহাই দেওয়া হয় না।

ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেন (Why Private Limited Companies are popular than Public Limited Companies) ঃ

ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, গঠন-প্রণালী, দায়, মূলধন সরবরাহ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দিক হইতে ঘরোয়া কোম্পানী অধিকতর শ্রেয়।

(১) **গঠন-প্রণালী (Formation)** ঃ ঘরোয়া কোম্পানীর গঠন-প্রণালী সার্বজনিক কোম্পানীর গঠন-প্রণালীর মত জটিল নহে। ইহাতে সর্বনিম্ন দুইজন সদস্যের প্রয়োজন এবং কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র লইতে হয় না। পরিচালকগণের নামের তালিকা সম্মতিজ্ঞাপক পত্রাদি ও যোগ্যতাসূচক শেয়ার গ্রহণের বিবৃতি কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয় না। ইহাতে সর্বনিম্ন চাঁদা তুলিতে হয় না, বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করিতে হয় না এবং বিজ্ঞাপনী বা বিবরণী (Prospectus) বিলি করিতে হয় না।

(২) **দায়-দায়িত্ব (Liabilities)** ঃ ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানী—উভয়েরই দায়-দায়িত্ব সীমিত, কিন্তু ঘরোয়া কোম্পানী সাধারণতঃ ছোট হয় বলিয়া ইহার দায় অপেক্ষাকৃত অল্প।

(৩) **মূলধন (Capital)** ঃ ঘরোয়া কোম্পানীকে বিজ্ঞাপনী বা বিবরণী প্রকাশ করিতে হয় না এবং নিজেদের মধ্যে মূলধন সংগ্রহ সীমিত থাকে বলিয়া মূলধনের অধিকতর নিরাপত্তা ও উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়। ইহাতে সদস্যদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনও সুদৃঢ় হয়।

(৪) **পরিচালনা (Management)** ঃ ঘরোয়া কোম্পানীর পরিচালনায় ব্যবধান সৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কারণ সভ্যসংখ্যা সীমিত ও সভ্যগণ পরস্পর পরিচিত। ইহাতে গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রকট হয় না।

(৫) **নিয়ন্ত্রণ (Control)** ঃ মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে ব্যবধান সংকীর্ণ হওয়ায় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। ইহাতে সদস্যগণ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন কার্যকরী নীতি ও কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে পারেন।

(৬) **অংশীদারী কারবারের সুবিধা (Benefits of Partnership)** ঃ ইহাতে অংশীদারী কারবারের গুণাগুণ বজায় থাকে অথচ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিকতর মূলধন সংগৃহীত হয় এবং সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সীমিত থাকে।

(৭) পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ১১%-এর বেশী হইতে পারে না। কিন্তু পারিশ্রমিক-সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

কোম্পানী ব্যবস্থাপনার কাঠামো
(Structure of Company Management)

কোম্পানী ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি (Nature or Pattern of Company Management) ঃ

কোম্পানী একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক কোম্পানী আইন-সৃষ্ট পৃথক সত্তা। আইনের দৃষ্টিতে ইহা একটি বিধিবদ্ধ ব্যক্তি। শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর মালিক, কিন্তু প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। কারণ—

(১) শেয়ার হোল্ডারগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে। ইহা বিশেষ করিয়া বৃহদাকার কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) শেয়ার-হোল্ডারগণের সংখ্যা খুব বেশি হইতে পারে। যদি প্রত্যেকে পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে ব্যবস্থাপনার কার্য ব্যাহত হইবে। কারণ মতপার্থক্যের জন্য একমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হইবে।

উপরোক্ত কারণে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা অপ্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে হইয়া থাকে শেয়ার-হোল্ডারগণ বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালক নির্বাচন করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি পাঠায়। একক পরিচালকের কোন ক্ষমতা নাই। সেই কারণে পরিচালক নির্বাচিত হইবার পরেই পরিচালকগণ একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। এই পরিচালকমণ্ডলী বিভিন্ন পরিচালকের সমষ্টি। কিন্তু আঙ্গিকের দিক হইতে ইহা একক মণ্ডলী হিসাবে কার্য করে। কোম্পানী আইনে পরিচালকমণ্ডলীকে কোম্পানী ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ শিখরে রাখা হইয়াছে। ইহাতে পরিচালকমণ্ডলী স্বাধীনভাবে কোম্পানীর প্রশাসন দক্ষতা, সজীবতা ও মসৃণতার সহিত চালাইতে পারে। কোম্পানী আইন পরিচালকমণ্ডলীকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে।

কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করেন না। পরিচালকগণ পরিচালকমণ্ডলীর সভার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করেন। প্রতি বৎসর অন্ততঃ চারটি পরিচালকমণ্ডলীর সভা করিতে হয় এবং প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার পরিচালকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিতে হইবে। পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকরণক্ষম বা ক্রিয়াগত এবং আইনানুগ এই দুই প্রকারের কার্য-কলাপ আছে। ক্রিয়াগত কার্যগুলি হইল : কোম্পানীর বৃহত্তর উদ্দেশ্য পরিসংখ্যানগতভাবে প্রকাশ করা, মূল পরিকল্পনা, নীতি, কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি, পরিকল্পনা কৌশল, উদ্ভাবন এবং পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা। আইনানুগ কার্যকলাপ হইল : বিজ্ঞাপনী বা বিবরণী প্রকাশ করা, শেয়ার বণ্টন করা, শেয়ারের অর্থ তলব করা, শেয়ার

বাজেয়াপ্ত করা, শেয়ার পুনর্বিক্রি করা, কোম্পানীর সভা আহ্বান করা এবং কোম্পানীর হইয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

পরিচালকমণ্ডলী প্রাথমিকভাবে নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য দ্বিতীয় স্তরের ব্যবস্থাপকগণ দায়ী। এই দ্বিতীয় স্তর বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ, যেমন—উৎপাদন ব্যবস্থাপক, বিপনন ব্যবস্থাপক, ক্রয় ব্যবস্থাপক, অর্থ ব্যবস্থাপক ইত্যাদি কর্তৃক পরিচালিত। দ্বিতীয় স্তরের ব্যবস্থাপনার শিখরে থাকেন কার্য নির্বাহী পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইনি একদিকে পরিচালকমণ্ডলীর সভা, অন্যদিকে কার্যকরী ব্যবস্থাপনার কর্ণধার। বস্তুতঃ, কোম্পানী ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ ক্ষমতা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের হাতে থাকে। তিনি নীতি-নির্ধারণ এবং নীতি কার্যকরী করিবার সংযোগকারী। পরিচালকবৃন্দকে নীতি-নির্ধারক বলা যাইতে পারে এবং ব্যবস্থাপকবৃন্দকে কার্যনির্বাহক বলা যাইতে পারে। বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব বিভাগ সংগঠন ও প্রশাসনের মাধ্যমে কোম্পানীর বিভাগীয় উদ্দেশ্য সম্পাদন করেন। ইহারা সাংগঠনিক নীতি এবং পদ্ধতি অনুসারে বিভাগীয় সংগঠন ও নীতি তৈয়ারী করেন এবং নীতি অনুসারে বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যবস্থাপককে সহায়তা করেন আবেক্ষক বা সুপারভাইজার। ইহারা নিম্নতর ব্যবস্থাপনার স্তর সৃষ্টি করেন এবং করণিক ও সহকর্মিগণের সহায়তা পান ইহারা অর্ধ বা প্রায় ব্যবস্থাপক (Quasi-managers)। প্রকৃতপক্ষে আবেক্ষক-ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আবেক্ষকগণ কোম্পানীর উদ্দেশ্য পূরণে প্রত্যক্ষভাবে কার্য করেন। তাহা ছাড়া, কোম্পানীর কর্মীবৃন্দের সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক এবং সাধারণ কর্মীদের (Rank and File) সহিত আবেক্ষকগণ সমন্বয় বা সংযোজনা সৃষ্টি করেন। অধঃস্তন কর্মচারীর মানসিক ইচ্ছা, প্রতিক্রিয়া ব্যবহার, পরিবর্তন ইত্যাদি আবেক্ষকগণ অনুধাবন করেন এবং উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করেন ও তাহার প্রতিফলন ঘটান।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি হইল এই যে, নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকগণ মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপকগণকে তাঁহাদের কার্যের হিসাব পেশ করেন এবং বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ বিভাগীয় কার্যকলাপের বিবরণী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট পেশ করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোম্পানীর কার্যকলাপের মূল্যায়ন করিয়া তাহার বিবরণী পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করেন। পরিচালকমণ্ডলী বৎসরান্তে বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ অথবা পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোম্পানীর প্রকৃত মালিক শেয়ার-হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যকলাপের এবং ভবিষ্যতের একটি চিত্র তুলিয়া ধরেন।

সুতরাং, কোম্পানী ব্যবস্থাপনার প্রকৃতিকে আমরা তিনভাগে আলোচনা করিতে পারি :

(১) পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন ;

(২) বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতি কার্যকরী করা, এবং

(৩) প্রতিবেদন ও হিসাব পেশ করা।

আপাতদৃষ্টিতে কোম্পানী ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক হইলেও বাস্তবে ইহা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে না। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। শেয়ার-হোল্ডারগণ মানসিক দিক হইতে পরিচালনায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক এবং এই কারণে পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ তৎপর।

কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় গোষ্ঠীতন্ত্র ও তাহার কারণ (Oligarchic Rule and its causes in Company Mansgement) ঃ

কোম্পানী ব্যবস্থাপনা আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক হইলেও বস্তুতঃ ইহা গোষ্ঠীতান্ত্রিক। পরিচালকগণ শেয়ার-হোল্ডারগণের দ্বারা নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পছন্দমত ব্যক্তি নাও হইতে পারেন। কোন ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে নির্বাচনে প্রাংযোগিতা করিবেন তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক ভোটাধিকারী শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং পরিচালক নির্বাচিত হইবার পর ইঁহারা সংখ্যাগুরু শেয়ার-গ্রহীতাদের পক্ষে কার্য করেন এবং তাহার ফলে সংখ্যালঘু শেয়ার-গ্রহীতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বলা হয় যে, "একটি মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা সহজ, কিন্তু একটি পরিচালকমণ্ডলীকে খারিজ করা সহজ নহে।" (It is easier to unseat a ministry than to dislodge a Board oi Directors)। পুরাতন পরিচালকগণকে বাদ দিয়া নূতন পরিচালক নির্বাচিত করা হইলেও তাঁহারা সংখ্যাগুরুর স্বার্থেই কার্য করেন এবং সংখ্যালঘু শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়।

শেয়ার-হোল্ডারগণ 'নিদ্রা-বিশারদ' (Sleeping Masters)। তাহারা মানসিক দিক হইতে যে কোন ধরনের পরিবর্তনে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তাহার ফলে চিরাচরিত প্রথায় পরিচালকমণ্ডলী তাহাদের নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় কার্যকলাপ চালায়। কোম্পানী ব্যবস্থাপনার ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কারণে গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়িয়া উঠে :

(১) শেয়ার-হোল্ডারগণের ইতস্ততঃ অবস্থান (Dispersal of shareholdings) ঃ বৃহৎ মালিকানা-ভিত্তিক কোম্পানীতে শেয়ার বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিক্রয় করা হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে অথবা পৃথিবীর যে কোন স্থানে শেয়ার-হোল্ডারগণ অবস্থান করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে কোম্পানীর বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। ইহারা কোন সংঘ বা সমিতি স্থাপন করিতে পারে না এবং এই সুযোগে পরিচালকমণ্ডলী গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা চালায়।

(২) শেয়ার-হোল্ডারের পরিবর্তন (Change of Shareholders) ঃ সার্বজনিক বা পাবলিক কোম্পানীতে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া প্রতি বৎসর শেয়ার-হোল্ডারের পরিবর্তন হয় এবং এই নূতন শেয়ার-হোল্ডারগণ পুরাতন শেয়ার-হোল্ডারগণের অপরিচিত

বলিয়া পরিচালকমণ্ডলীর অপকার্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না।

(৩) **কোম্পানী সভার অসারতা (Ineffectiveness of Company Meetings)**ঃ বস্তুতঃপক্ষে শেয়ার-হোল্ডারদের সভা কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করিতে পারে না। কারণ ইহা বৎসরে মাত্র একবার অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ শেয়ার-হোল্ডার এই সভায় অনুপস্থিত থাকে। শেয়ার হোল্ডারগণ তাহাদের ঈপ্সিতহারে লভ্যাংশ পাইলেই খুশি থাকে এবং মনে করে যে, পরিচালকমণ্ডলী দক্ষতার সহিত কোম্পানীর পরিচালনা চালাইতেছে। ইহা ছাড়া অজ্ঞতার কারণেও শেয়ার-হোল্ডারগণ সভায় অংশ গ্রহণ করিতে চাহে না। যদি অংশগ্রহণ করে, তবে তাহারা আলোচনায় বিরত থাকে। ফলে পরিচালনার গণতান্ত্রিক রূপ ব্যাহত হয়।

(৪) **অজ্ঞানতা ও দক্ষতার অভাব (Lack of Knowledge and Efficiency)**ঃ অধিকাংশ শেয়ার-হোল্ডার লাভ ক্ষতির হিসাব, উদ্বর্তপত্র, পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করিতে অক্ষম। কোম্পানীর আর্থিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা বুঝিতে হইলে যে স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন অধিকাংশ শেয়ার-হোল্ডারের সেই স্তরের জ্ঞান থাকে না।

(৫) **একতা ও সংগঠনের অভাব (Lack in Unity and Organisation)**ঃ বাস্তবে শেয়ার-গ্রহীতাগণ একটি সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে কোম্পানীর সিদ্ধান্ত ও পরিচালক-বৃন্দের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার ফলে পরিচালক-মণ্ডলী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা অবাধে গৃহীত হয়।

(৬) **ত্রুটিপূর্ণ পরিচালক-নির্বাচন পদ্ধতি (Defective System of Election of Directors)**ঃ পরিচালকগণ শেয়ার-হোল্ডারগণের দ্বারা নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের নাম স্থির করেন বিশেষ বিশেষ শেয়ার-হোল্ডারগণ এবং যাহাদের ভোটাধিকার বেশি তাহাদের মধ্য হইতে পরিচালক নির্বাচিত হন। বাস্তবে দেখা যায় যে, যৌথভাবে একদল শেয়ার-হোল্ডারের ২৫% ভোটাধিকার থাকিলেই সেই দল তাহাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে পারে। কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালক-মণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ পরিচালক সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ (Retire by rotation) করিবেন। কিন্তু সেই পরিচালক আবার বছরের পর বছর পুনঃনির্বাচিত হইতে পারেন।

(৭) **প্রতিনিধি ভোট বা প্রক্সি ভোট পদ্ধতি (Proxy-Voting System)**ঃ কোম্পানী আইন অনুসারে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরিমেল নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকিলে প্রক্সি-পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া যায়। যে শেয়ার-হোল্ডার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক সে প্রক্সি ফরম পূরণ করিয়া তাহার নিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রক্সি ফরম অনুসারে ভোটদান হইয়াছে কিনা তাহা শেয়ার-হোল্ডারগণ যাচাই করে না, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রক্সি ফরমের অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে।

(৮) অগ্রিম শেয়ার-হস্তান্তর বই বন্ধ (**Closure of Share Transfer Book in Advance**) : বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে যাহারা শেয়ার-হস্তান্তরগ্রহীতা তাহাদের নাম শেয়ার-হস্তান্তর বইতে উঠে না। ফলে তাহারা ভোটাধিকার পায় না।

(৯) পূর্ণ ও প্রচ্ছন্ন বিবরণীর অভাব (**Lack of Complete and Clear Statement**) : ব্যবস্থাপকগণ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা প্রতিবেদনের সাহায্যে এমনভাবে প্রকাশ করেন যে, সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না। বিভাগীয় কার্যবিবরণীর পূর্ণ প্রকাশ না ঘটায় কোম্পানীর কার্যাবলীর সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় না। ফলে, শেয়ার-হোল্ডারগণ পরিচালকগণের কার্যাবলীর সমালোচনা করিতে পারে না।

(১০) কর্মচারী শেয়ার-গ্রহীতা (**Employee-Shareholders**) : আধুনিক প্রগতিশীল কোম্পানীতে কর্মচারীদের বোনাস হিসাবে শেয়ার প্রদানের মাধ্যমে শেয়ার-হোল্ডার করা হয়। এইরূপ শেয়ার-হোল্ডারগণ কৃতজ্ঞতার কারণে পরিচালকবৃন্দের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে না। ফলে, কিছু সংখ্যক শেয়ার-হোল্ডারকে নীরব করিয়া রাখা যায়।

(১১) সংহত শিল্পগোষ্ঠী (**Organised Industrial Group**) : অধিকাংশ বৃহৎ কোম্পানী এক-একটি শিল্পগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতে গোষ্ঠীতন্ত্র সুবিধা পায় এবং শিল্পগোষ্ঠীর কাছে সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানী ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না চলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়; ফলে প্রকৃত মালিকানার সহিত ব্যবস্থাপনার ব্যবধান ঘটে।

গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিয়মের ত্রুটি ও প্রতিকার (**Evils of Oligarchic Rule and Remedies**) :

ভারতে কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় গোষ্ঠীতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকটভাবে দেখা যায় এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় :

(১) গোষ্ঠীতন্ত্রে অলিখিতভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সমাধি রচিত হয়।

(২) পরিচালকগণ নিজেদের স্বার্থ এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি আনেন এবং প্রশাসনকে অকার্যকরী করিয়া তোলেন।

(৩) পরিচালকগণ সংগঠনকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করেন এবং ব্যবস্থাপনায় চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন।

(৪) গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বজন-পোষণতা ও বিভেদগামী মনোভাব গড়িয়া উঠে, যাহা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। এইরূপ ব্যবস্থাপনায় আর্থিক প্রতারণ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের অর্থ তছরূপের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

(৫) গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কয়েকজন মুষ্টিমেয় শেয়ার-হোল্ডারের হাতে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে।

প্রতিকার ঃ

(১) গোষ্ঠীতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবধান সৃষ্টি হয়, কারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ যাহারা কোম্পানীর প্রকৃত মালিক তাহাদের অধিকাংশই ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। সুতরাং গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রতিকার করিতে হইলে শেয়ার-হোল্ডারগণকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কোম্পানী আইনে "শেয়ার-হোল্ডার সমিতি" (Shareholders' Association) গঠন করিবার ধারা নিযুক্ত হইয়াছে। যৌথভাবে গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ শেয়ার-হোল্ডার সমিতি গঠন করিতে হইবে। শেয়ার-হোল্ডারগণ মাঝে মাঝে এই সমিতিতে উপস্থিত হইয়া কোম্পানী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিবে এবং বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালকবৃন্দের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহার পরিকল্পনা রচনা করিবে।

(৩) শেয়ার-হোল্ডারগণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দূর করিতে পারে।

(৪) শেয়ার-হোল্ডারগণকে অবশ্যই সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে হইবে এবং আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে সক্রিয় ভূমিকা লইতে হইবে।

(৫) শেয়ার-হোল্ডারগণকে প্রকৃত অর্থে বিনিয়োগকারী হইতে হইবে অর্থাৎ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন বুঝিবার ও পরীক্ষা করিবার মত ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও কারবারী জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে।

(৬) শেয়ার হস্তান্তর বই সাধারণ অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন আগে বন্ধ হওয়া উচিত। তাহা না হইলে অনেক শেয়ার-হোল্ডার ন্যায্য ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

(৭) শেয়ার-হোল্ডারগণের উপযুক্ত কারবারী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে সভাপতির বক্তব্য, প্রতিবেদন এবং বার্ষিক হিসাব-নিকাশ বোঝা সম্ভব হইবে না।

(৮) শেয়ার-হোল্ডারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'নিদ্রা-বিশারদের' (Sleeping Masters) ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহাদের অন্ততঃ বিনিয়োগের উপযুক্ত ফল পাইতেছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

(৯) পরিচালকমণ্ডলী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিলে শেয়ার-হোল্ডারগণকে নিজেদের মনোমালিন্য এবং দলগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যৌথ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১০) পরিচালক পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে কোম্পানী আইন সংশোধন করিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহাতে একই পরিচালক বারবার পুনর্নির্বাচিত হইতে না পারেন।

(১১) কর্মচারী শেয়ার-হোল্ডারগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত। কারণ তাহারা আনুগত্যবশতঃ পূর্বতন পরিচালককে নির্বাচিত করিতে চায়।

(১২) বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে, বৃহৎ শিল্পপতিকে এবং কোন একজন ব্যক্তিকে খুব বেশী শেয়ার বিক্রয় করা উচিত নহে। ইহাতে ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির কুক্ষিগত হইতে পারে।

কোম্পানী আইনে যতই অনুকূল ধারা নিযুক্ত হোক না কেন, যদি শেয়ার-হোল্ডারগণ আক্ষরিক অর্থে প্রকৃত বিনিয়োগকারী না হয় এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করে, তবে কখনই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কুফলকে দূর করিয়া কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা যাইবে না।

কোম্পানী পরিচালনার অঙ্গসমূহ (Organs of Company Management)

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Administration and Management of Joint Stock Companies) ঃ

শেয়ার-হোল্ডারগণই যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মালিক। কোম্পানীর কার্য-পরিচালনার দায়িত্বও তাহাদেরই। কিন্তু কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনার ভার শেয়ার-হোল্ডারগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালক পর্ষদের (Board of Directors) সদস্যগণের উপর ন্যস্ত থাকে। ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে প্রত্যেক ঘরোয়া বা প্রাইভেট যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে অন্ততঃপক্ষে দুইজন সদস্য লইয়া এবং প্রত্যেক সাধারণ বা ব্যাপক মালিকানার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে অন্ততঃ তিনজন সদস্য লইয়া পরিচালক পর্ষদ গঠন করা বাধ্যতামূলক। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিলেও ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নলিখিত চার প্রকার প্রাধিকারের বা মুখ্য কার্যনির্বাহীর মধ্যে যে কোনও একজন প্রাধিকারের বা মুখ্য কার্যনির্বাহীর হস্তে পরিচালনার ভার অর্পণ করা যাইত : (১) ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা পরিচালন প্রতিনিধি (Managing Agents) ; (২) সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স বা সচিব ও কোষাধ্যক্ষ (Secretaries and Treasurers) , (৩) কার্যনির্বাহী পরিচালক (Managing Director) এবং (৪) ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার (Manager)। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল হইতে ম্যানেজিং এজেন্টস্ এবং সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স পদ্ধতি বিলোপের পর মাত্র ম্যানেজার অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টরই মুখ্য কার্যনির্বাহী হিসাবে নিয়োগ করা যায়।

পরিচালক পর্ষদ (Board of Directors) **ঃ পরিচালক পর্ষদ শেয়ার-হোল্ডারগণের পক্ষে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে ব্যবসায়কার্যে দক্ষ**

এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পরিচালক হিসাবে নির্বাচন করে। পরিচালক পর্ষদের ক্ষমতা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা (Powers of the Board of Directors) :

কোম্পানী আইনের ২(১৩) ধারা অনুসারে পরিচালক বলিতে বুঝায় কোন ব্যক্তি, যিনি পরিচালক হিসাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন। ২(৫৩) ধারা অনুসারে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি পরিচালক হইতে পারেন। নির্বাচিত হইবার পর পরিচালকগণ যৌথভাবে পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। এককভাবে কোন পরিচালকের কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু যদি পরিচালকমণ্ডলী কোন একজন পরিচালকের উপর ভারার্পণ (delegation) করে, তবে সেই পরিচালক একক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

কোম্পানী আইন এবং পরিমেল নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালকবৃন্দ ক্ষমতার ব্যবহার করেন। পরিমেল নিয়মাবলীতে পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা থাকে। যে সকল ক্ষমতা পরিচালকমণ্ডলী স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, সেইগুলি পরিচালকমণ্ডলীর সভায় ২৯২ ধারা অনুসারে প্রস্তাব পাশ করিয়া ব্যবহার করা যায়। এই ক্ষমতাগুলি হইল :

(১) বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ;

(২) শেয়ার আবণ্টন করা ,

(৩) শেয়ারের তলবী অর্থ আদায় করা ;

(৪) যদি কোন শেয়ার-হোল্ডার শেয়ারের অর্থ প্রদান না করিয়া থাকে, তবে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া তাহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা ;

(৫) বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলি করা ;

(৬) বিভিন্ন প্রকারের সভা আহ্বান করা ,

(৭) অতিরিক্ত, বিকল্প এবং সাময়িক পরিচালক (Additional, Alternate and Casual Directors) নিযুক্ত করা ;

(৮) সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই যদি নিরীক্ষকের পদ শূন্য হয়, তবে সেই শূন্য পদে সাময়িকভাবে নিরীক্ষক নিযুক্ত করা ·

(৯) কোম্পানীর হইয়া ঋণগ্রহণ করা ও কারবারের তহবিল হইতে ঋণ প্রদান করা ;

(১০) কোম্পানীর তহবিল উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করা ;

(১১) কোম্পানীর কোন পরিচালককে ঋণপ্রদানের সুপারিশ করা ;

(১২) কোম্পানীর হইয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি করা ;

(১৩) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করা ও কালান্তিক লভ্যাংশের হারের সুপারিশ করা।

২৯৩ ধারা অনুসারে কোন সার্বজনিক বা পাবলিক কোম্পানী অথবা পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী সাধারণ অধিবেশনের অনুমোদন লইয়া নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিতে পারে :

(১) কোম্পানীর কোন সম্পত্তি অথবা অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ বিক্রয় অথবা ইজারা দেওয়া অথবা বন্ধক দেওয়া।

(২) পরিচালকগণের নিকট হইতে প্রাপ্য ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা।

(৩) কোম্পানীর সম্পত্তির কোন অধিকৃত অংশ হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ বিশ্বাসযোগ্য ঋণপত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা।

(৪) কোম্পানীর হইয়া এমন পরিমাণ অর্থ ঋণ করা যাহা কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ও মুক্ত সংরক্ষিত তহবিলের মোট পরিমাণ হইতে অধিক।

(৫) কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ২৫,০০০ টাকা অথবা পূর্বতন তিন বছরের গড় নীট মুনাফার ৫%-এর বেশী অর্থ দান করা। এইক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা অথবা ৫%-এর মধ্যে যাহা অধিকতর তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একক প্রতিনিধি (Sole Agent) নিযুক্ত করা।

উপরোক্ত আইনানুগ ক্ষমতা ছাড়াও পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে :

(১) পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর মূল পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার অধিকারী।

(২) পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করে।

(৩) কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মাধ্যক্ষ, মুখ্য কার্যনির্বাহী, সচিব, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ইত্যাদির নিয়োগ পরিচালকমণ্ডলী করিয়া থাকে।

(৪) পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করে।

পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলী (Functions of the Board of Directors) :

পরিচালকমণ্ডলীর গঠন একটি কমিটির মত। ইহা একক সংগঠন হইলেও কার্যকারিতার দিক হইতে 'বহুবচনাত্মক কার্যনির্বাহী' (Plural Executive)। কারণ পরিচালকমণ্ডলী যৌথ দায়িত্বের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে। পরিচালকমণ্ডলী প্রায়শঃই পরিচালকগণকে ভারার্পণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দপ্তরের ভার প্রদান করে। পরিচালকমণ্ডলীর নীতি ও উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিবার জন্য একজন কার্যনির্বাহী পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। নিম্নে পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপের বিস্তারিত আলোচনা করা হইল :

(১) অছির কাজ—কুন্‌জ এবং ও' ডোনেল (Koontz and O' Donnell) পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপকে অছির (Trustee) সহিত তুলনা করিয়াছেন। অছির ভূমিকায় পরিচালকগণ শুধু যে শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য দায়ী, তাহা নহে। এই ভূমিকায় তাঁহারা ক্রেতা, শ্রমিক, সরবরাহকারী এবং সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য

দায়ী থাকেন। চাহিদা অনুসারে যোগান নির্ধারণ করিয়া এবং কোম্পানীর সহিত জনসাধারণের সংযোজনা ঘটাইয়া তাঁহারা এই ভূমিকা পালন করেন। পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বেকার, জে. সি. (Backer, J. C.) পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপকে চারভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; যেমন—

(ক) মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ;

(খ) ব্যবস্থাপকগণের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা ;

(গ) মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ এবং তাঁহার অধীনস্থ ব্যবস্থাপকগণকে উপযুক্ত পরামর্শ ও আদেশ প্রদান করা ;

(ঘ) কোম্পানীর কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা এবং ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণ করা।

(২) **মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের নিয়োগ**—যে সকল কার্যকলাপ পরিচালকমণ্ডলীকে স্বয়ং করিতে হয় সেইগুলি ছাড়া কোম্পানীর পরিচালনার দৈনন্দিন কার্যের ভার অর্পণ করিবার জন্য পরিচালকমণ্ডলী একজন মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে। এই মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কার্যনির্বাহী পরিচালক অথবা ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক হইতে পারে। পরবর্তীকালে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ অন্যান্য ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং পরিচালকমণ্ডলী ইহাদের নিয়োগ অনুমোদন করে।

(৩) **কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ**—কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত হয়। উদ্দেশ্যকে 'নিউক্লিয়াস' বা 'শাঁস' বলা যায়। এইদিক হইতে বিচার করিয়া পরিচালকমণ্ডলীকে কোম্পানীর পরিকল্পনার স্থপতি (Architect) বলা হয়।

(৪) **কোম্পানীর বাজেট ও কার্যসূচী অনুমোদন করা**—বাজেট এবং কার্যসূচীকে মূল পরিকল্পনা বলে। বস্তুতঃ ইহা প্রস্তুত করেন মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ। মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ আবার বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত করেন। পরিচালকমণ্ডলীর সভায় বাজেট ও কর্মসূচীর সারাংশ পেশ করা হয় এবং পরিচালকমণ্ডলী উহা অনুমোদন করে।

(৫) **ব্যবস্থাপকগণের কার্যকলাপের মূল্যায়ন**—পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান কাজ হইল বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের দক্ষতা এবং কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা। বাজেটের মাধ্যমে কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা হয়। কারণ বাজেট নিয়ন্ত্রণের একটি উপযুক্ত হাতিয়ার।

(৬) **মুনাফার বণ্টন**—পরিচালকমণ্ডলী স্থির করে যে, মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ হিসাবে সুপারিশ করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীট মুনাফার একটি অংশ (সাধারণতঃ ১০%-এর বেশী নয়) রিজার্ভ ফাণ্ডে বা সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়। যদিও পরিচালকমণ্ডলী লভ্যাংশের হার সুপারিশ করিতে পারে, কিন্তু ইহা কেবল সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে সক্ষম। প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভা সুপারিশকৃত লভ্যাংশের হার কমাইতে পারে, কিন্তু বাড়াইতে পারে না।

(৭) সাধারণ সভায় প্রশ্ন এবং মত-বিনিময়ের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি—পরিচালকগণ প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন না। সেই কারণে তাঁহারা কোম্পানী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যবস্থাপকগণকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং কলাকৌশল ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কোম্পানীকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা ও সংগঠনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনিতে পারেন।

(৮) কোম্পানীর স্থায়িত্ব রক্ষা—কোম্পানী একটি আইন-সৃষ্ট ব্যক্তিত্ব। পরিবর্তিত পরিবেশে ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য এবং ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য পরিচালকমণ্ডলীকে সর্বদা গৃহীত উদ্দেশ্য, নীতি, কলাকৌশল ইত্যাদির পরিবর্তন করিতে হয়।

(৯) **আইনানুগ কার্যকলাপ**—পরিচালকমণ্ডলীকে নিম্নলিখিত আইনানুগ কার্যকলাপ সম্পাদন করিতে হয় :

(ক বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা,

(খ) শেয়ার আবণ্টন করা,

(গ) শেয়ারের তলবী অর্থ আদায় করা,

(ঘ) যদি কোন শেয়ার-হোল্ডার শেয়ারের অর্থ প্রদান না করে তবে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাশ করিয়া তাহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা,

(ঙ) বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলি করা,

(চ) বিভিন্ন প্রকারের সভা আহ্বান করা,

(ছ) অতিরিক্ত পরিচালক (Additional Director), বিকল্প পরিচালক (Alternate Director) এবং সাময়িক পরিচালক (Casual Director) নিযুক্ত করা,

(জ) সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই নিরীক্ষকের পদ শূন্য হইলে শূন্য পদে সাময়িকভাবে নিরীক্ষক নিযুক্ত করা,

(ঝ) কোম্পানীর পরিচালককে ঋণ দিবার সুপারিশ করা,

(ঞ) কোম্পানীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা,

(ট) কোম্পানীর তহবিল (Fund) উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করা।

পরিচালকমণ্ডলীর ক্রম অবনতি বা ক্রম-ক্ষয় (Gradual Erosion of the Board) :

কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধি এবং কারবারের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করা যায়। কার্য-ভিত্তিক দিক হইতে পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের কার্যকারিতা এবং ক্ষমতা বহুলাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণগুলি হইল :

(১) পরিচালকমণ্ডলীর আয়তন যখন এত বৃহৎ হয় যে, পরিচালকমণ্ডলী যে কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে অথবা অধিক সংখ্যক পরিচালক থাকায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

(২) কিছু কিছু পরিচালকের কোম্পানী পরিচালনায় উপযুক্ত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান না থাকায় অন্য পরিচালকদের দ্বারা তাঁহারা কোণঠাসা হন এবং মুষ্টিমেয় পরিচালক কোম্পানীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেন।

(৩) পরিচালকবৃন্দের সভার সময়কাল এবং সংখ্যা এত কম যে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

(৪) পরিচালকমণ্ডলীর সংগঠন দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে; কারণ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একদিকে বিলম্ব ঘটে, অন্যদিকে দায়িত্ব এড়াইবার প্রবণতা দেখা যায়।

(৫) কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার ফলে প্রায়ই দেখা যায় যে, একজন পরিচালক সর্বোচ্চ ২০টি কোম্পানীতে একই সঙ্গে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। ফলে কোন একটি কোম্পানীর পরিচালনায় তিনি বিশেষ নজর এবং দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন না।

(৬) মালিকানা ও প্রশাসনের মধ্যে ব্যবধান থাকায় পরিচালকবৃন্দের কার্যাবলীর উপর শেয়ার-হোল্ডারগণ উৎসাহ দেখায় না। ফলে পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলীর পূর্ণ মূল্যায়ন হয় না।

(৭) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পরিচালকগণ কোম্পানীর উন্নতির জন্য বিশেষ দায়িত্বশীল নহেন। ইহা ঘটে তাঁহাদের ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষার কারণে, অথবা ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানের অভাবে।

(৮) কয়েকটি ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের পরিচালক (Wholetime Director) তাঁহাদের কাজের মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করিতে চাহেন না।

(৯) আভ্যন্তরীণ পরিচালকগণ ও বহিরাগত পরিচালকগণের মধ্যে প্রায়ই সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকে না। ফলে যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব হাস্যকর হইয়া উঠে।

(১০) অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী গতানুগতিক পদ্ধতিতে নীতি-নির্ধারণকারী হিসাবে কাজ করেন।

পরিচালকগণকে অনেক সময় 'কাঠের পুতুল', 'তোতাপাখী' এবং 'রবার স্ট্যাম্প' (Rubber Stamp) আখ্যা দেওয়া হয়; কারণ তাঁহারা বাস্তবে অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। যৌথ-ভূমিকায় পরিচালকমণ্ডলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে অক্ষম। এই কারণে তাঁহাদের 'কায়াহীন রাজা' বা 'অন্ধকারের রাজা' (Shadow King) আখ্যা দেওয়া হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে মুখ্য কার্যনির্বাহী অথবা শক্তিশালী

কোন পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালকগণ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 'অনুগামী ব্যক্তি' (Yes-man) হিসাবে তাঁহাদের ভূমিকা পালন করেন।

পরিচালকমণ্ডলীকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় (How to make the Board effective) ঃ

পিটার ড্রাকার (Peter Drucker)-এর মতে, পরিচালকমণ্ডলীকে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইলে তাহাদের কেবলমাত্র নীতি-নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেই চলিবে না। পরিচালকমণ্ডলী অবশ্যই পর্যবেক্ষক এবং নিরীক্ষক হিসাবে কাজ করিবে। ড্রাকার (Drucker)-এর মতে, পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর সংগঠনের চাবিকাঠি। পরিচালকমণ্ডলীকে কার্যকরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

(১) পরিচালকমণ্ডলীর সংগঠন ও আকার উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃহৎ আকারের পরিচালকমণ্ডলী ভঙ্গুর হয়।

(২) প্রত্যেক পরিচালক নির্বাচনের সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা, সুনাম এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা।

(৩) কার্যভারযুক্ত পরিচালক বা সর্বক্ষণের পরিচালককে কোন একটি বিশেষ দপ্তরের বা বিভাগের ভার দেওয়া উচিত। কেবলমাত্র প্রভাব বা আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া কোন পরিচালককে কোন বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নহে।

(৪) যাঁহারা নামমাত্র পরিচালক (Dummy Director), তাঁহাদের কোন দপ্তরের ভার দেওয়া উচিত নহে।

(৫) পরিচালকের বয়স বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত, কারণ বয়সের ভারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালক শারীরিক ও মানসিক দিক হইতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন না।

(৬) কিছু তরুণ পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীতে থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ তরুণ পরিচালকের উৎসাহ ও প্রবীণ পরিচালকের অভিজ্ঞতা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা আনিতে সাহায্য করে।

(৭) পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা খুব বেশী বা কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। খুব ছোট পরিচালকমণ্ডলী হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফলপ্রসূ হয় না, আবার পরিচালকমণ্ডলী বৃহৎ হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব দেখা যায় এবং "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়"। সুতরাং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা ৬ হইতে ১২-র মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৮) পরিচালকমণ্ডলীকে কার্যকরী করিতে হইলে নিয়মিতভাবে পরিচালকগণের নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং শেয়ার-হোল্ডারগণকে পরিচালক নির্বাচনের সময় উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা করিতে হইবে।

পরিচালক নিয়োগ (Appointment of Directors) :

পরিচালকগণ শেয়ার-হোল্ডারগণের প্রতিনিধি এবং তাঁহারা কোম্পানীর সম্পত্তির অছি। কোম্পানীর সাধারণ সভায় পরিমেল নিয়মাবলী অনুসারে তাঁহারা নির্বাচিত হন। পরিচালকমণ্ডলীতে সর্বোচ্চ কতজন পরিচালক থাকিবেন তাহা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকে।

কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালকগণেব সর্বোচ্চ সংখ্যা ১২ জন হইতে পারে। এই সর্বোচ্চ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

প্রথম পরিচালকবৃন্দ (First Directors) :

কোম্পানীব পরিমেল নিয়মাবলীতে (Articles of Association) প্রথম পরিচালকগণের নাম দেওয়া থাকে। যদি আর্টিকেলস্ বিধিবদ্ধ না হয় অথবা আর্টিকেলস্-এ পরিচালকগণের নাম দেওয়া না থাকে, তবে স্মারকলিপি বা মেমোরাণ্ডাম-এ স্বাক্ষরকারিগণ লিখিতভাবে প্রথম পরিচালকগণের নাম ঘোষণা করিতে পারেন। তাহা না হইলে মেমোরাণ্ডাম-এ স্বাক্ষরকারিগণকে প্রথম পরিচালক ধরা হইবে। কোম্পানী আইনের ২৫৪ ধারা অনুসারে প্রথম পরিচালকগণ পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন পর্যন্ত পরিচালক হিসাবে বহাল থাকিবেন।

পরবর্তী পরিচালকগণ (Subsequent Directors) :

(১) **কোম্পানী দ্বারা নিযুক্ত পরিচালক**—২৫৫ ধারা অনুসারে কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে শেয়ার-হোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। পাবলিক বা সার্বজনিক কোম্পানীতে অথবা প্রাইভেট কোম্পানী, যাহা পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ (Subsidiary), সেইরূপ ক্ষেত্রে মোট পরিচালকের অন্ততঃ ⅔ অংশ শেয়ার-হোল্ডারদের দ্বারা সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে নিযুক্ত হইবেন এবং এই ⅔ অংশ পরিচালক "পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণ" (Retirement by Rotation) করিবেন। বাকি ⅓ অংশ পরিচালক হয় সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন, অথবা বিশেষ কোন নিয়মাবলীর দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

(২) **পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক পরিচালক নিযুক্তি (Appointment of Directors by Directors) :**

(ক) **অতিরিক্ত পরিচালক (Additional Director) :** পরিচালকগণ কোম্পানী আইনের ২৬০ ধারা অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাশ করিয়া অতিরিক্ত পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারেন। বর্তমান ও অতিরিক্ত পরিচালকের মোট সংখ্যা যেন আর্টিকেলস্-এ লিখিত মোট পরিচালকের সংখ্যা হইতে অধিক না হয়। অতিরিক্ত পরিচালক পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

(খ) **সাময়িক পরিচালক (Casual Director)**ঃ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাশ করিয়া সাময়িক শূন্য পদে সাময়িক পরিচালক নিযুক্ত করা যায়। সাময়িকভাবে শূন্য পদ বলিতে অনিশ্চিত কারণে শূন্যতা অথবা ইচ্ছাকৃত শূন্যতা বুঝায় না। সাময়িক পরিচালক যে পরিচালকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন তাহার মেয়াদ যতদিন পর্যন্ত না ফুরাইতেছে ততদিন পর্যন্ত পরিচালক হিসাবে বহাল থাকিবেন। পরিচালকের মৃত্যু হইলে বা ঐচ্ছিক অবসর গ্রহণে সাময়িক শূন্যতা ঘটিয়া থাকে। কোম্পানী আইনের ২৬২ ধারা অনুসারে পরিচালকমণ্ডলী সাময়িক পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারেন।

(গ) **বিকল্প পরিচালক (Alternate Director)**ঃ কোম্পানী আইনের ৩১৩ ধারা অনুসারে পরিচালকমণ্ডলী মূল পরিচালকের স্থলে বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি মূল পরিচালক যে রাজ্যে এবং যেখানে সাধারণতঃ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই রাজ্য হইতে কমপক্ষে ৩ মাসের জন্য অন্যত্র চলিয়া যান, তবে তাঁহার স্থলে বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বিকল্প পরিচালক মূল পরিচালকের মেয়াদকাল পর্যন্ত অথবা মূল পরিচালকের প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত পরিচালক হিসাবে বহাল থাকিবেন।

(৩) **তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালক নিযুক্তি (Appointment by Third Parties)**ঃ যদি আর্টিকেলস-এ ক্ষমতা দেওয়া থাকে তবে ডিবেঞ্চার-হোল্ডারগণকে অথবা ব্যাঙ্ক অথবা কোন আর্থিক সংস্থা, যাহারা কোম্পানীকে ঋণ প্রদান করিয়াছে তাহারা কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারে। ঋণদাতাগণ যে সংখ্যক পরিচালক নিযুক্ত করিবে তাহাদের সংখ্যা কোম্পানীর মোট পরিচালক সংখ্যার ⅓ অংশের মধ্যে থাকিবে। কোম্পানী আইনের ২৫৫ ধারা অনুসারে এইরূপ পরিচালকগণকে পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৪) **আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নিযুক্তি (Appointment by proportional representation)**ঃ কোম্পানীর আর্টিকেলস্-এ বলা থাকিতে পারে যে, একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে অথবা ক্রমযৌগিক বা সঞ্চিত (Cumulative) ভোটাধিকার পদ্ধতিতে কোম্পানীর মোট পরিচালকবৃন্দের ⅔ অংশ পরিচালক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে নিযুক্ত হইবেন। এইরূপ পদ্ধতিতে নিযুক্তি অন্ততঃ ৩ বৎসরে একবার হইবে। কোম্পানী আইনের ২৬৫ ধারা অনুসারে এইভাবে নিযুক্তি ঘটিতে পারে।

(৫) **কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালক নিযুক্তি (Appointment by Central Government)**ঃ কোম্পানী আইনের ৪০৮ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংখ্যক পরিচালক নিযুক্তি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, সেই সংখ্যক পরিচালক সর্বোচ্চ এককালীন ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত পরিচালকগণ কোম্পানীর অ-ব্যবস্থাপনা (mismanagement) ও সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারগণের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাইবেন।

কোম্পানীর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, জনস্বার্থ রক্ষা ও শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ পরিচালকের কোন যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Qualification shares) থাকিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ পরিচালকগণ কোম্পানী ব্যবস্থাপনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদা কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিবেন। মনোনীত পরিচালকবৃন্দের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

যাঁহারা পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারেন (Persons who can be appointed Directors) ঃ যাঁহারা ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন এবং পরিচালক হইবার শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিচালক হইতে পারেন: (১) যিনি কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার হইয়াছেন, (২) যিনি পরিচালক নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন, (৩) যিনি পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে সম্মত আছেন।

পরিচালকগণের অযোগ্যতা (Disqualifications of Directors) ঃ

কোম্পানী আইনের ২৭৪ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারেন না :

(১) আদালত যে ব্যক্তিকে বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ঐ আদেশ বলবৎ আছে,

(২) আদালত হইতে মুক্তি পান নাই এইরূপ শোধাক্ষম (unable to repay) দেউলিয়া ব্যক্তি,

(৩) যে ব্যক্তি আদালতের নিকট তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার আবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহার আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি হয় নাই,

(৪) যে ব্যক্তি আদালত কর্তৃক নৈতিক অপরাধজনিত কারণে অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং কমপক্ষে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন এবং কারাদণ্ড ভোগ সমাপ্তির দিন হইতে ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই,

(৫) যে ব্যক্তির শেয়ার বাবদ দেয় তলবী অর্থ ছয় মাস বাকী পড়িয়া আছে;

(৬) যে ব্যক্তি কোম্পানী আইনের ২০৩ ধারা অনুসারে প্রতারণাজনিত অথবা ইচ্ছাকৃত অবহেলাজনিত কারণে আদালত কর্তৃক পরিচালক পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

পরিচালকপদ নাকচ বা শূন্য বা খালি (Vacation of Directors) :

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একজন পরিচালককে পরিচালকপদ খালি করিতে হয়:

(১) যদি কোন পরিচালক তাঁহার নিযুক্তির দু-মাসের মধ্যে যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Qualification Share) ক্রয় করিতে না পারেন।

(২) যদি আইনের দ্বারা তিনি অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হন।

(৩) যদি তিনি আদালতের নিকট দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করিবার আবেদন করিয়া থাকেন।

(৪) যদি তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন।

(৫) যদি তিনি আদালত কর্তৃক নৈতিক অপরাধজনিত (moral turpitude) কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং উহাতে তাঁহার অন্ততঃ ছ-মাসের জন্য কারাদণ্ড হইয়া থাকে।

(৬) যদি তিনি তলবী অর্থ প্রদানের শেষ দিন হইতে ছ-মাসের মধ্যে তলবী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন।

(৭) পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতি না লইয়া যদি তিনি পরপর তিনটি পরিচালক-মণ্ডলীর সভায় অনুপস্থিত হন, অথবা ধারাবাহিকভাবে তিনমাস পরিচালকমণ্ডলীর সভায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়া অনুপস্থিত থাকেন। এইক্ষেত্রে উপরের দুইটি শর্তের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর তাহা গ্রাহ্য হইবে।

(৮) যদি কোন পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোম্পানী হইতে কোন ঋণ বা জামিন বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।

(৯) যদি কোন পরিচালক কোম্পানীর সহিত চুক্তিকৃত ঘটনায় নিজের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ স্বার্থ প্রকাশ না করেন।

(১০) যদি আদালত কোন পরিচালককে প্রবর্তন-জনিত অথবা ব্যবস্থাপনা-জনিত কারণে কোম্পানীর অবসায়নের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া মনে করেন।

(১১) যদি সাধারণ সভায় কোম্পানী সাধারণ প্রস্তাব পাশ করিয়া পরিচালককে বরখাস্ত বা অপসারণ করে।

(১২) যদি কোন পরিচালক একসঙ্গে ২০টির বেশী কোম্পানীতে পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন।

দেউলিয়া হইলে বা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইলে আদালতের আদেশ দানের ৩০ দিনের মধ্যে পরিচালককে পদত্যাগ করিতে হইবে।

পরিচালকগণের বরখাস্ত বা অপসারণ (Removal of Directors) :

কোন একজন পরিচালক (ক) শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক, (খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এবং (গ) আদালত কর্তৃক বরখাস্ত হইতে পারেন।

(ক) শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক বরখাস্ত :

কোম্পানী আইনের ২৮৪ ধারা অনুসারে শেয়ার-হোল্ডারগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালক ছাড়া অন্যান্য পরিচালকগণকে কোম্পানীর সাধারণ সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাশ করিয়া বরখাস্ত করিতে পারে।

এইক্ষেত্রে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাবসহ কোম্পানীর নিকট একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (Special notice) পেশ করিতে হয়। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি পাইবার পর কোম্পানী সমস্ত সদস্যের নিকট বিশেষ প্রস্তাবের বিষয় জ্ঞাত করিবে এবং যে পরিচালককে বরখাস্ত করা হইবে তাঁহার নিকটও উহার একটি প্রতিলিপি পাঠাইবে। সংশ্লিষ্ট পরিচালক লিখিতভাবে কোম্পানীর নিকট তাঁহার বক্তব্য রাখিতে পারেন।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরখাস্ত ঃ

কোম্পানী আইনের ৩৮৮(বি) হইতে ৩৮৮(ই) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে পারেন। এইরূপ নালিশ কেবলমাত্র হাইকোর্টে বা উচ্চ আদালতে করা যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কোন পরিচালককে পরিচালকপদে রাখা যাইবে কিনা তাহা জানিতে চাহিয়া হাইকোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারেন। হাইকোর্ট অনুসন্ধান সমাপ্তির পূর্বেও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে কোন পরিচালককে পরিচালকের কর্তব্য সম্পাদন না করিবার আদেশ দিতে পারেন। চূড়ান্ত অনুসন্ধানের পর আদালত যদি মনে করেন যে, ঐ পরিচালককে পরিচালকপদে রাখা সমীচীন নয়, তবে সেই মর্মে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চূড়ান্ত আদেশের প্রতিলিপি প্রেরণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে পরিচালক পদ হইতে বরখাস্ত করেন।

(গ) আদালত কর্তৃক বরখাস্ত ঃ

কোম্পানী আইনের ৪০২ ধারা ব্যবস্থাপনা ও সংখ্যালঘু শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার-হোল্ডার আদালতের নিকট আবেদন জানায় তবে আদালত তাহার উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা যে কোন পরিচালকের সহিত কোম্পানীর সম্পর্কজনিত কোন বিষয় আদালত নাকচ করিতে পারেন অথবা পরিবর্তন করিতে পারেন।

(ঘ) পরিচালকগণের কর্তব্য (**Duties of Directors**) ঃ

সিটি ইকুইটেবল্ ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী (City Equitable Fire Insurance Company) মামলায় বিচারক রোমার, এল. জে. (Romer, L. J. পরিচালকগণের নিম্নলিখিত কর্তব্য আছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

(১) প্রত্যেক পরিচালক সততার সহিত কার্য করিবেন।

(২) অনুরূপ অবস্থায় নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যেভাবে কার্য করে, একজন পরিচালককেও সেই পরিমাণ দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে হইবে।

(৩) পরিচালকের সমকক্ষ কোন ব্যক্তির যেরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে সেইরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্যসহকারে পরিচালককে কার্য করিতে হইবে। উহার অধিক নৈপুণ্য পরিচালকের দেখাইবার প্রয়োজন নাই। কোন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেই তিনি দায়ী হইবেন এমন কোন নিয়ম নাই।

(৪) পরিচালকের কার্য সবিরাম, অবিরাম নহে, কোম্পানীর কার্যে অবিরাম মনোযোগ দিতে তিনি বাধ্য নন। সকল সভায় উপস্থিত থাকাও বাধ্যতামূলক নহে।

(৫) যদি কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তবে কোম্পানীর কোন কর্মচারীর উপর যে সকল কার্যভার যুক্তিযুক্তভাবে দেওয়া আছে তাহা ঐ কর্মচারী সততার সহিত পালন করিতেছে ইহা তিনি ধরিয়া লইতে পারেন।

পরিচালকগণের কর্তব্যের সীমা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে স্থির করিয়া দেওয়া হয়। পরিচালকগণের সহিত কারবারের সম্পর্ক দ্বিবিধ। একদিকে তাঁহারা কোম্পানীর সকল সম্পদ ও সম্পত্তির অছি (Trustee), অপরদিকে তাঁহারা শেয়ার-হোল্ডারগণের প্রতিনিধি (Agent)।

কোম্পানীর সম্পত্তির অছি হিসাবে তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোম্পানীর অর্থ শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থে ব্যবহার করা। প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকগণের কর্তব্য সর্বদা শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের জ্ঞান বুদ্ধি, সদ্বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া সততার সহিত কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করা।

ভারতীয় কোম্পানী আইনে পরিচালকগণের কতকগুলি কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—

(১) কোন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পরিচালক অপর কোনও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হইলে, অথবা অপর কোনও যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিলে, যে কোম্পানীর তিনি পরিচালক আছেন সেই কোম্পানীতে ২০ দিনের মধ্যে সেই সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিবেন।

(২) কোম্পানীর নিকট হইতে পরিচালক হিসাবে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা ফেরত দেওয়াও তাঁহার কর্তব্য।

(৩) পরিচালক অপর কোন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকিলে তিনি যে কোম্পানীর পরিচালক আছেন সেই কোম্পানীকে তাহা অবশ্যই জানাইবেন।

(৪) কোম্পানী আইন অনুসারে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীকে যে-সকল বই রাখিতে হয় তাহা সঠিকভাবে রাখা হইয়াছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও পরিচালকের কর্তব্য।

(৫) কোম্পানী আইন অনুসারে নিবন্ধকের নিকট যে-সকল তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি দাখিল করিতে হয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোষণা দাখিল করাও পরিচালকের কর্তব্য।

(৬) কোম্পানীর নামে বিনিয়োগপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা (৪৯ ধারা)।

(৭) যখন বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমে শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হইতেছে তখন পরিচালকগণকে অবলেখকগণের আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা তাহা ঘোষণা করিতে হয় (৫৬ ধারা)।

(৮) পরিচালকগণকে প্রকাশ করিতে হয় যে, সর্বনিম্ন চাঁদার (Minimum subscription) পরিমাণ, সম্পত্তি ক্রয়, প্রাথমিক খরচ, ঋণ পরিশোধ এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মিটাইতে পর্যাপ্ত হইবে কিনা (৬৯ ধারা)।

(৯) **অন্ততঃ একজন পরিচালককে কোম্পানীর বাৎসরিক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিতে হয় এবং তাহা নিবন্ধকের নিকট পাঠাইতে হয় (১৬১ ধারা)।**

(১০) **পরিচালকগণের কর্তব্য হইল বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের (Statutory Report) নকল কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করা (১৬৫ ধারা)।**

(১১) কোম্পানীর আইনতঃ কার্যারম্ভের ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা (১৬৬ ধারা) এবং পরবর্তী ১৫ মাসের মধ্যে পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা, ১৬৯ ধারা অনুসারে পরিচালকগণকে তলবী সভা অথবা রিকুইজিসন মিটিং বা অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting) ডাকিতে হয়। তিন মাসে অন্ততঃ একবার পরিচালকমণ্ডলীর সভা ডাকা পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য।

(১২) ২১০ ধারা অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীকে সাধারণ অধিবেশনে উদ্বর্তপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব পেশ করিতে হয়।

(১৩) ২১৭ ধারা অনুসারে কোম্পানীর সমগ্র বিষয় জানাইয়া এবং সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও লভ্যাংশের বিষয় অবগত করাইয়া পরিচালকগণকে একটি প্রতিবেদন পেশ করিতে হয়।

(১৪) কোম্পানীর কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসন্ধানের কাজে সাহায্য করা পরিচালকগণের অন্যতম কর্তব্য (২৪২ ধারা)।

(১৫) কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসন্ধানকারীকে (Investigator) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়া সাহায্য করা পরিচালকগণের অবশ্য কর্তব্য (২৪০ ধারা)।

(১৬) যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Qualification Share) ক্রয় করা এবং তাহা অধিকার করা পরিচালকগণের অন্যতম কর্তব্য।

(১৭) যদি কোন পরিচালক কোম্পানীর সহিত কোন চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট থাকেন তবে সেই চুক্তিতে তাঁহার স্বার্থ কোম্পানীর নিকট প্রকাশ করা (২৯৯ ধারা)।

(১৮) পরিচালকগণের বই (Register) প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন, নাম, ঠিকানা, জাতি, পেশা ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিযুক্তির ২০ দিনের মধ্যে তাঁহাকে কোম্পানীর নিকট পেশ করিতে হইবে (৩০৩ ধারা)।

(১৯) কোম্পানীর সহিত চুক্তিতে তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইবে (৩০১ ধারা)।

(২০) যখন কোম্পানীর অবসায়ন হয় তখন অবসায়ক (Liquidator)-এর নিকট কোম্পানীর বিভিন্ন বিষয় জানাইয়া একটি প্রতিবেদন পেশ করা পরিচালকগণের কর্তব্য।

(২১) পরিচালক পর্ষদের সভায় উপস্থিত থাকিলে সভার হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করা তাঁহার কর্তব্য।

(২২) প্রত্যেক পরিচালক তাঁহার নিযুক্তির সম্মতি নিবন্ধকের নিকট পেশ করিবেন (২৬৬ ধারা)।

(২৩) **যখন পরিচালকমণ্ডলী কোন পরিচালকের সহিত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর কোন চুক্তি স্থির করেন তখন সংশ্লিষ্ট পরিচালক ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন না।**

পরিচালকগণের দায়-দায়িত্ব (Liabilities of Directors) ঃ

পরিচালকবৃন্দের দায়-দায়িত্বকে তিনভাগে আলোচনা করা যায়—

(১) দেওয়ানী দায়-দায়িত্ব

(২) ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব

(৩) অসীম দায়-দায়িত্ব।

(১) **দেওয়ানী দায়-দায়িত্ব** (Civil Liabilities) ঃ

(ক) পরিচালকগণ বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্রে (Prospectus) মিথ্যা বিবরণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(খ) যদি কোন পরিচালক তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজ করেন এবং তাহার জন্য যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে কর্তব্যভঙ্গের জন্য সেই পরিচালককে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

(গ) কোম্পানীর স্মারকলিপি বা মেমোরাণ্ডাম-বহির্ভূত কার্যের জন্য পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। যেমন, মূলধন হইতে লভ্যাংশ প্রদান করিলে পরিচালকগণের ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয়।

(ঘ) যদি কোন পরিচালক কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং তাহার জন্য কোম্পানীর ক্ষতি হয়, তবে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি দায়ী থাকেন।

(ঙ) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ঘটনায় কোন পরিচালক যদি গোপন মুনাফা (secret profit) করেন, তবে তাহার জন্য তিনি কোম্পানীর নিকট দায়ী থাকিবেন।

(চ) কোম্পানীর সম্পত্তি ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে পরিচালক দায়ী থাকেন।

(ছ) ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্যে অবহেলা ও বিশ্বাসভঙ্গের জন্য পরিচালকগণ দায়ী থাকেন।

(২) **ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব** (Criminal Liabilities) ঃ

(ক) বিশ্বাসভঙ্গের কারণে এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরিচালককে জরিমানা (Fine) দিতে হয়।

(খ) বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য দায়ী পরিচালকগণের কারাবাস পর্যন্ত হইতে পারে।

(গ) কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার বইতে (Register), হিসাবের বইতে ও প্রতিবেদনে মিথ্যা বিবরণ দিলে এবং বিষয়ের পরিবর্তন ঘটাইলে দায়ী পরিচালকগণের কারাবাস পর্যন্ত হইতে পারে।

(ঘ) ৬৩৩ ধারা অনুসারে আদালত যদি মনে করেন যে, পরিচালক সততা ও সৌহার্দ্যতার সহিত তাঁহার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তবে সেই পরিচালক শাস্তি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

(৩) **অসীম দায়-দায়িত্ব** (Unlimited Liabilities) :

কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে কোম্পানী আইনের ৩২২ ধারা অনুসারে অসীম দায়-দায়িত্বের উল্লেখ থাকিতে পারে। যদি কোন দায়-সীমাবদ্ধ কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে দায়-দায়িত্বের ধারা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা দেওয়া থাকে, তবে বিশেষ প্রস্তাব পাশ করিয়া কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারগণ পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তন করিয়া পরিচালকগণের অসীম দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারেন।

পরিচালকগণের স্থান (**Position of Directors**) :

(১) **অছি** (**Agent**) : পরিচালকগণের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O' Donnell) পরিচালকমণ্ডলীকে অছির সহিত তুলনা করিয়াছেন। পরিচালকগণকে কোন কোন সময় অছি হিসাবে গণ্য করা হয়। পরিচালকগণের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক অনেকাংশে অছির মত। অছি সুবিধাভোগীর প্রতিনিধি হিসাবে তাহার সম্পত্তি দেখাশুনা করে। পরিচালকগণ **কোম্পানীর অর্থ ও সম্পত্তির অছি**। কোম্পানীর কোন শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা না থাকায় পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর হইয়া কাজ করেন। সুতরাং কোম্পানী সুবিধাভোগী এবং পরিচালকবৃন্দ অছি। অন্যান্য অছির মত পরিচালকগণকেও কোম্পানীর নিকট হিসাব পেশ করিতে হয়। যদি পরিচালকগণ কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন, তবে কোম্পানীকে সেই অর্থ তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত দিতে হয়। কোম্পানীর অর্থ ও সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত কোন গোপন মুনাফা (Secret Profit) করা তাঁহার কর্তব্যের হানির অনুরূপ। পরিচালকগণ কোম্পানীর অছি হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কাজ করেন :

(ক) শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদন করা,
(খ) শেয়ার বিলি ও আবণ্টন করা;
(গ) তলবী অর্থ আদায় করা;
(ঘ) শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা;
(ঙ) লভ্যাংশের সুপারিশ করা।

এই সকল কার্যাবলী সম্পাদনে পরিচালকগণ সততার সহিত কোম্পানী ও শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিবেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিচালকগণ অছির কাজ করেন না। তাঁহাদের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক পূর্ণ প্রত্যয়ের (Fiduciary Relation)। কোম্পানীর তহবিল ও সম্পত্তির ব্যাপারে বিশ্বাসভঙ্গ করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোম্পানী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

সমালোচনা : আইনের দিক হইতে বিচার করিলে পরিচালকগণকে সঠিকভাবে অছি বলা যায় না। কারণ তাঁহারা কোম্পানীর সম্পত্তি বিক্রয় বা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া পরিচালকগণ কোন একক শেয়ার-হোল্ডারের অছি নহেন বা পরিচালকগণেরও অছি নহেন।

(২) **প্রতিনিধি (Agent)**ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালকগণকে কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা হয়। পরিচালকমণ্ডলী একটি কমিটি বা কার্যনির্বাহক সমিতি। এই কমিটির উপর কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দায়িত্ব থাকে। পরিচালকমণ্ডলী শেয়ার-হোল্ডারগণের অনুকূলে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেয়। পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানী আইন এবং পরিমেল নিয়মাবলীর (Articles of Association) দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। আইনের দৃষ্টিতে যদিও কোম্পানী একটি পৃথক সত্তা, কিন্তু এই সত্তাটি বাস্তবে সক্রিয় নহে। এই কারণে কোম্পানীর কার্যকলাপ পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা চালিত হয়। পরিচালকবৃন্দ যৌথভাবে কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিনিধি হিসাবে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামোয় তাঁহাদের স্থান ব্যবস্থাপনার শীর্ষে থাকে।

প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকগণ কোম্পানীর হইয়া তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি করেন। যদি পরিচালকগণ তাঁহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজ না করেন তবে পরিচালকগণের কার্যাবলীর জন্য কোম্পানী দায়ী থাকে। কিন্তু যদি কোন পরিচালক ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ করেন তবে সেই ক্ষেত্রে পরিচালক কোম্পানীর প্রতিনিধি নহেন। বিশ্বাসভঙ্গের কারণে এই কার্য হইতে উদ্ভূত সমস্ত দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে পরিচালকের উপর ন্যস্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আইনানুগ কার্যাবলী সম্পাদনে পরিচালকগণ তাঁহাদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কার্য করিলে তাঁহারা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হন।

ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্য (Ultravires act) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে পরিচালকগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য কোম্পানীকে দায়ী করিতে পারেন। আইনানুগ সমস্ত ব্যয় নিবাহ অথবা ক্ষতির জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, কোম্পানীর কার্য পরিচালনার বিষয়ে কোন পরিচালককে বিজ্ঞপ্তি দিলে সেই বিজ্ঞপ্তি ২২৯ ধারা অনুসারে কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সমালোচনাঃ কিন্তু সঠিকভাবে পরিচালকগণকে প্রতিনিধি বলা যায় না, কারণ—

(১) প্রতিনিধিকে মালিক নিযুক্ত করে এবং নিযুক্তির একটি চুক্তি থাকে। কিন্তু পরিচালকগণকে চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয় না।

(২) প্রতিনিধি মালিকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে, কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর নিকট হইতে এইরূপ কোন নির্দেশ পান না।

(৩) প্রতিনিধির ক্ষেত্রে মালিক নীতি নিধারণ করিয়া দেন, কিন্তু পরিচালকগণ নিজেরাই কোম্পানী ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহণ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সঠিক অর্থে পরিচালকগণ কোম্পানীর অছি বা প্রতিনিধি নহেন। তাঁহাদের সহিত কোম্পানীর "পূর্ণ প্রত্যয়ের সম্পর্ক" (**Fiduciary relationship**) আছে। এককথায় তাঁহাদের স্থান বর্ণনা করা যায় না।

কর্মচারী (Employees)ঃ যদিও পরিচালকগণ কোম্পানীর কার্য সম্পাদনের জন্য কোম্পানী হইতে পারিশ্রমিক পান, তবুও পরিচালকগণকে কোম্পানীর কর্মচারী বলা

যায় না। কারণ কর্মচারিগণের নিয়োগে তাহাদের সহিত কোম্পানীর একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিবলে কর্মচারিগণ কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীর প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী, যেমন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি। কিন্তু পরিচালকগণ এইসকল সুযোগ-সুবিধা কোম্পানীর নিকট হইতে পাইবার অধিকারী নন। পরিচালকগণ কোম্পানীর প্রতিনিধি, কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারী বা বেতনভুক্ সেবক (paid servant) নহেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনের ৫৩০ ধারা অনুসারে কর্মচারিগণ কোম্পানীর অবসায়নকালে অগ্রাধিকারযুক্ত পাওনাদারগণের মত তাহাদের বেতন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাইবার অধিকারী। কিন্তু পরিচালকগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত; ইহা নরমানডি বনাম ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ কোম্পানী (Normandy V. Indian Co-operative Company) মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে।

সমালোচনা: কিন্তু বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া কোন পরিচালক কোম্পানীর চাকুরী করিতে পারেন। যেমন, আইনের উপদেষ্টা। কে. আর. কোথানডারামন বনাম কমিশনার অফ্ ইনকাম ট্যাক্স (K. R. Kothandaraman V. Commissioner of Income Tax) মামলায় ইহা স্থির হইয়াছে। সাইক্লিস্ট টুরিং কোম্পানী বনাম হপকিনসন (Cyclist Touring Co. V. Hopkinson) মোকদ্দমায় বলা হইয়াছে যে, ১৯১৬ সালের কোম্পানী আইনের ৩১৪ ধারা অনুসারে যদি কোন পরিচালক কোম্পানীতে কোন বেতনভুক্ চাকুরী গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইবে। কিন্তু এইক্ষেত্রেও পরিচালক কোম্পানীর কর্মচারী হইলেও কোম্পানীর একক সদস্যের সেবক নহেন।

আধিকারিক বা কর্মকর্তা (Officer): ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী পরিচালক কোম্পানীর একজন আধিকারিক। কোম্পানী আইনের ৫(৩১) ধারায় বলা হইয়াছে যে, 'অবহেলা দোষে দুষ্ট আধিকারিক' দণ্ড পাইতে পারেন। যদি তিনি কোম্পানী আধিনিয়মের অনুশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অবহেলা, কর্তব্য পালনে বিমুখতা বা অপারগতা অথবা কর্তব্য পালনে অনিচ্ছা ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী হন।

সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালকগণকে কোম্পানীর আধিকারিক হিসাবে গণ্য করা যায়, এবং সেই কারণে যদি তাঁহারা কোম্পানী আইনের অনুশাসন অমান্য করেন তবে তাঁহারা শাস্তি বা দণ্ড ভোগ করিবেন।

কার্যনির্বাহী অংশীদার (Managing Partner): যে ব্যক্তি কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং ইহার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে তাহাকে কার্যনির্বাহী অংশীদার বলে। পরিচালকগণকে অনেক সময় কোম্পানীর কার্যনির্বাহী অংশীদার বলা হয়, কারণ অংশীদারগণের মত পরিচালকগণ কোম্পানীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এবং যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Qualification shares) ক্রয় করিয়া কোম্পানীর মূলধনে অর্থ বিনিয়োগ করেন।

সমালোচনা: কিন্তু প্রকৃত অর্থে পরিচালকগণকে কোম্পানীর কার্যনির্বাহী অংশীদার বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব কার্যনির্বাহী

অংশীদারগণের কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব হইতে ভিন্ন। যেমন, কোন একজন কার্যনির্বাহী অংশীদার 'বিবক্ষিত প্রাধিকার' (Implied authority) ভোগ করেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যে প্রকার কারবারে লিপ্ত সেই প্রকার কারবারের প্রচলিত রীতি অনুসারে অংশীদার যে কার্য করিবে, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীদারগণ তাহা দ্বারা আবদ্ধ হইবে। ইহাছাড়া কার্যনির্বাহী অংশীদারগণ 'পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের' (Mutual agency) ভিত্তিতে কাজ করে। কিন্তু পরিচালকগণের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নহে। কোন একজন পরিচালক সর্বদা আবশ্যকীয়ভাবে পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য পরিচালকগণকে তাঁহার কাজের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর থাকিতে পারে। ভিন্ন-মতাবলম্বী পরিচালক (Dissenting Partner) তাঁহার সহ-পরিচালকের কাজের জন্য দায়ী থাকেন না।

উপসংহার (Conclusion) ঃ জেসেল এম. আর (Jessel M. R)-এর মতে পরিচালকগণের হাতে অছি, প্রতিনিধি ও কার্যনির্বাহী অংশীদারের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্বের কিছু কিছু অংশ ন্যস্ত হইলেও পরিচালকগণের একটি স্বকীয়তা আছে। পরিচালকগণকে অছি, প্রতিনিধি অথবা কার্যনির্বাহী অংশীদার হিসাবে বর্ণনা করা হইলেও ঐ বর্ণনার দ্বারা পরিচালকগণের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব শেষ হয় না, ইহা উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশ করে মাত্র। তাঁহাদের প্রকৃত পদমর্যাদা যাহাই হোক না কেন, নিজেদের এবং শেয়ার-হোল্ডারগণের সুবিধার জন্য তাঁহারা কারবার পরিচালনা করেন। ফরেস্ট অফ্ ডিন কোল মাইনিং কোম্পানীর (Forest of Dean Coal Mining Co.) মামলার রায় প্রদান করিবার সময় বিচারক জেসেল এম. আর. উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পরিচালকবর্গের উপর আইনের বাধা-নিষেধ (Legal Restrictions upon Directors) ঃ

ভারতীয় কোম্পানী আইনে পরিচালকবর্গের উপর নিম্নলিখিত বাধা-নিষেধসমূহ আরোপ করা হইয়াছে :

(১) কোন পরিচালক ২০টির অধিক যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারেন না।

(২) কোম্পানীর কোন প্রস্তাবিত চুক্তিতে কোন পরিচালকের স্বার্থ জড়িত থাকিলে ঐ পরিচালক পর্ষদের সভায় সেই চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা সেই চুক্তির বিষয়-বস্তুর উপর ভোট গ্রহণ করা হইলে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

(৩) কোন পরিচালক কোম্পানীর তহবিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনা অনুমতিতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন না, কিংবা, কোম্পানী কর্তৃক কাহাকেও ঋণ দান করা হইলে সেই ঋণের জামিন হইতে পারেন না।

(৪) কোন পরিচালক তাঁহার উপর অর্পিত কর্মভার অন্য কাহাকেও অর্পণ করিতে পারেন না, করিলেও তাহা আইনতঃ অগ্রাহ্য হয়।

(৫) কোন পরিচালক কোম্পানীর কোনও লাভজনক পদ গ্রহণ কিন্তু শেয়ার-হোল্ডারগণ যদি বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা সাধারণ অধিবেশনে তাহা হইলে কোন পরিচালক কোম্পানীর লাভজনক পদ গ্রহণ করিতে

পরিচালকগণের পারিশ্রমিক (Remuneration of Dire

সরকারের অনুমতি লইয়া পরিচালকগণকে মাসিক বেতন হিসাবে কিংবা নীট মুনাফার শতকরা হারে কমিশন দেওয়ার ভিত্তিতে, অথবা উভয় প্রকারেই কোম্পানী হইতে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। যেভাবেই হোক, কোম্পানীর যদি অন্য কোনও ব্যবস্থাপক প্রাধিকার থাকে তাহা হইলে পরিচালকমণ্ডলীর পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার ১ শতাংশের অধিক হইবে না এবং যদি বিকল্প ব্যবস্থাপক প্রাধিকার না থাকে তাহা হইলে কোম্পানীর নীট মুনাফার ৩ শতাংশের অধিক হইবে না। কোন পরিচালক কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পারিশ্রমিক দাবী করিলে, যে বিশেষ যোগ্যতার জন্য তিনি পারিশ্রমিক দাবী করেন তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। পরিচালক পর্ষদের সভায় উপস্থিতির জন্য প্রতি পরিচালক প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য অনূর্ধ্ব ২৫০ টাকা পাইতে পারেন।

মুখ্য কার্যনির্বাহী (Chief Executive) :

কার্যনির্বাহী পরিচালক (Managing Director) অথবা ব্যবস্থাপক (Manager) অথবা পরিচালকগণের কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee of Directors) মুখ্য কার্যনির্বাহী হিসাবে কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন। মুখ্য কার্যনির্বাহী কোম্পানীর কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য এবং পরিচালকমণ্ডলীর নীতি ও নির্দেশ পালনের জন্য দায়ী থাকেন।

কার্যাবলী (Functions) :

(১) কোম্পানীর স্থায়ী নীতিগুলিকে কার্যকরী করা,

(২) মূল নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য আনুষঙ্গিক নীতি নির্ধারণ করা ;

(৩) কোম্পানীর মূল সংগঠন স্থির করা ;

(৪) নিয়োগ-সংক্রান্ত এবং কর্মচারীদের দেয় ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করা ;

(৫) কোম্পানীর অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রশাসন করা ;

(৬) কোম্পানীর বাজেট প্রস্তুত করা এবং পরিচালকমণ্ডলীর নিকট উহা পেশ ও অনুমোদন লাভ করা,

(৭) কোম্পানীর উৎপাদন পরিকল্পনা এবং বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলীর অবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা ;

(৮) কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি ক্রয় করা এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা ;

(৯) কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের মূল্য স্থির করা এবং মূল্য-তালিকা প্রকাশ করা ;

(১০) কোম্পানীর সম্পত্তি ক্রয় করিবার, পরিবর্তন করিবার, রক্ষণাবেক্ষণ করিবার এবং বিক্রয় করিবার অনুমোদন প্রদান করা,

(১১) কোম্পানীর কারবারের শ্রীবৃদ্ধি এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে কার্যকলাপ বিস্তার করা

(১২) কোম্পানীর হইয়া সরকারী বিভাগের সহিত, বিভিন্ন কারবারী সংস্থার সহিত শ্রমিক সংঘের সহিত এবং বণিক সংঘের (Chamber of Commerce) সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কার্যনির্বাহী পরিচালক Managing Director :

কার্যনির্বাহী পরিচালক কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর একজন সদস্য। কোম্পানী আইনের ২(২৬ ধারা অনুসারে কোম্পানীর কোন একজন পরিচালক কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির বলে অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে অথবা মেমোরাণ্ডাম বা আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর বলে যদি কোম্পানী পরিচালনার [illegible] substantial [illegible] ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তবে তাঁহাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কার্যনির্বাহী পরিচালক বলে।

সাবজনিক কোম্পানীর কার্যনির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করিতে হইলে কোম্পানী আইনের ২৬৯ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা কার্যনির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। তিনি অবশ্যই একক ব্যক্তি হইবেন এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হইবেন। তিনি সাধারণতঃ দুইটির বেশী কোম্পানীতে একসাথে নিযুক্ত হইতে পারেন না। দুই এর অধিক কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। তিনি একবারে পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন না (৩১৭ ধারা)। যদি পরিচালক থাকেন তবে পুনরায় আরও [illegible] বৎসরের জন্য পুনর্বহাল হইতে পারেন। তাঁহার পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫% এর বেশী হইতে পারে না। ৩০৯ ধারা অনুসারে তাঁহার পারিশ্রমিক মাসিক বেতন অথবা নির্দিষ্ট [illegible] হারে নীট মুনাফার অংশ অথবা আংশিকভাবে উভয়ই হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিলে তাঁহার বেতন নীট মুনাফার [illegible] এর বেশী হইতে পারে।

কার্যনির্বাহী পরিচালকের কার্যাবলী (Functions of Managing Director) :

(১) পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা এবং কার্যে রূপায়িত করা,

(২) কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান করিয়া পরিচালকমণ্ডলীর নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা,

(৩) কোম্পানীর প্রতিদিনের কার্যাবলী স্থির করা, নির্দেশ প্রদান করা এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগস্থাপন করা,

(৪) কোম্পানীর কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ করা,

(৫) সকল স্তরের কর্মচারীর উপর নেতৃত্ব করা ও তাহাদের কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা,

(৬) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে হিসাব ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা,

(৭) ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

(৮) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা,

(৯) সংগঠনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা.

(১০) ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের মতামত গ্রহণ করা,

(১১) পরিচালকমণ্ডলীর নিকট কোম্পানীর নীতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধন করিবার সুপারিশ করা.

(১২) ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধান করিবার জন্য পণ্য সরবরাহ বজায় রাখা ও মূল্য স্থির করা,

(১৩) ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের মতবিরোধের মীমাংসা করা,

(১৪) নীতি ও সিদ্ধান্ত-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া,

(১৫) বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা ও প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা.

(১৬) সরকারী বিভাগ ও শ্রমিকসংঘের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা.

(১৭) বাজেট প্রস্তুত করা ও পরিচালকমণ্ডলীর সভায় উহা অনুমোদনের জন্য পেশ করা,

(১৮) পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতিকে কোম্পানী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা।

ব্যবস্থাপক Manager

ব্যবস্থাপক একজন একক কর্মাধ্যক্ষ, যিনি কোম্পানীর সারবান Substantial ব্যবস্থাপনা অথবা অধিকাংশ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহাকে পরিচালকমণ্ডলীর পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার মধ্যে কাজ করিতে হয়। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক বলা হয়। কর্মচুক্তি অনুযায়ী অথবা অন্য পন্থায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একই ব্যক্তি একসঙ্গে দুইটি কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হইতে পারেন। তিনি একসঙ্গে ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৫%-এর বেশী হইতে পারে না।

ক্ষমতা (Powers): (১) ব্যবস্থাপক কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সারবান (Substantial) অথবা প্রায় সারবান কার্যাবলীর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

(২) কোম্পানীর পক্ষ হইয়া লেনদেনের কার্যাবলী ব্যবস্থাপক করিতে পারেন।

(৩) ব্যবস্থাপকের সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা নাই। তিনি কোম্পানী পরিচালনা করেন পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে। পরিচালকমণ্ডলী ব্যবস্থাপকের ক্ষমতার উপর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

কর্তব্য (Duties) ঃ (১) কোম্পানীর কার্যাবলীর সামগ্রিক তথ্য পরিচালকমণ্ডলীকে অবগত করা ব্যবস্থাপকের কর্তব্য।

(২) পরিচালকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করা তাঁহার কর্তব্য।

(৩) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাবলীর অগ্রগতি সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন পেশ করা তাঁহার কর্তব্য।

(৪) কোম্পানীর সংগঠন ও উদ্দেশ্যকে কর্মোপযুক্ত করিয়া স্থির করা।

(৫) অধস্তন কর্মাধ্যক্ষগণের সহায়তায় কোম্পানীর বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করা।

(৬) কোম্পানীর দীর্ঘকালীন ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল প্রস্তুত করা।

(৭) কোম্পানীর আর্থিক সম্পদসমূহকে উপযুক্তভাবে বিভিন্ন খাতে বণ্টন করা।

(৮) কোম্পানীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মাধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করা, পদোন্নতি করা, উপস্থাপন করা, বদলী করা এবং বরখাস্ত করা। উপরোক্ত কার্যাবলী পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষ।

(৯) কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগ অথবা উপবিভাগের কার্যাবলীর পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(১০) কোম্পানীর সম্পদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা।

(১১) কোম্পানীর সহিত অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকার এবং ক্রেতাগণের সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন করা।

অধিকার (Rights) ঃ (১) ব্যবস্থাপক কোম্পানীর আর্থিক সম্পদসমূহকে দক্ষতার সহিত উপযুক্তভাবে বণ্টন করিতে পারেন।

(২) পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে তিনি কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারেন।

(৩) বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

(৪) চুক্তি অনুযায়ী ও কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীর নিকট হইতে বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা আদায় করিতে পারেন।

পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ কোম্পানীর ব্যবস্থাপক বেতন হিসাবে—

(ক) মাসিক বেতন পাইতে পারেন।

অথবা, (খ) নীট মুনাফার উপর নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পাইতে পারেন।

অথবা, (গ) মাসিক বেতন ও নীট মুনাফার উপর পারিশ্রমিক উভয়ই পাইতে পারেন।

কিন্তু মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৫%-এর বেশী হইবে না। যদি ৫%-এর অধিক পারিশ্রমিক দিতে হয় তবে কোম্পানী আইনের ৩৮৭ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপককে তাঁহার মিয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বরখাস্ত করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইবে বাকী সময় কাজ করিলে ব্যবস্থাপক যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেন সেই পরিমাণ অর্থ অথবা তিন বৎসরের মোট পারিশ্রমিকের অর্থ—এই দুইটির মধ্যে যেটি স্বল্পতর।

কার্যাবলী (Functions) ঃ

(১) ব্যবস্থাপক পরিচালকমণ্ডলীর নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া কার্যনির্বাহের জন্য বিভাগগুলিকে নির্দেশ দেন।

(২) ইনি বিভাগীয় কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় আনিবার ব্যবস্থা করেন।

(৩) তিনি বিভাগীয় কাজের বণ্টন করেন।

(৪) তিনি বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দেশ করেন।

(৫) তিনি কর্মীদের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন।

(৬) ব্যবস্থাপক কার্য পর্যালোচনা করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৭) তিনি কোম্পানীর কাজের তদারক করেন।

(৮) সরকার ও শ্রমিক সংঘের সহিত ব্যবস্থাপক সুসম্পর্ক গড়িয়া তোলেন।

(৯) তিনি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

(১০) কোম্পানীর কার্যাবলীর তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রদান করাই ব্যবস্থাপকের মূল কাজ।

(১১) তিনি বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

(১২) চুক্তি অনুযায়ী ও কোম্পানী আইন অনুসারে তিনি কোম্পানীর পক্ষে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণকে বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করেন।

সর্বক্ষণের পরিচালক (Wholetime Director) ঃ

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী প্রয়োজন বোধ করিলে কার্যনির্বাহী পরিচালক এবং সর্বক্ষণের পরিচালক নিয়োগ করিতে পারে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সর্বক্ষণের পরিচালক নিয়োগ করা যায়।

সর্বক্ষণের পরিচালক ও কার্যনির্বাহী-পরিচালক—এই দুইয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। কার্যনির্বাহী পরিচালক সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কোম্পানীর পরিচালনার সম্পূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করেন। সর্বক্ষণের পরিচালক কিন্তু কোম্পানীর সম্পূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করেন না। তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্যভার দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার জন্য পরিমেল নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। শেয়ার-হোল্ডারগণের সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সর্বক্ষণের পরিচালক নিয়োগ করিতে হয়।

কার্যনির্বাহী পরিচালক, সর্বক্ষণের পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকের তুলনামূলক আলোচনা
Comparative Study of Managing Director, Wholetime Director and Manager

বিষয়	কার্যনির্বাহী পরিচালক Managing Director	সর্বক্ষণের পরিচালক Wholetime Director	ব্যবস্থাপক (Manager)
১। নিযুক্তি	কার্যনির্বাহী পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। তাহার নিযুক্তি হয় চুক্তি অনুসারে অথবা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া অথবা সাধারণ সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া অথবা স্মারকলিপি (Memorandum) বা পরিমেল নিয়মাবলীর (Articles) দ্বারা অনুসারে	সর্বক্ষণের পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীর একজন সদস্য। তিনি সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করিয়া নিযুক্ত হন। যখন কোন পরিচালক সর্বক্ষণের জন্য উৎপাদন অথবা আইন অথবা বিক্রয় অথবা উপদেশাত্মক কার্যে নিযুক্ত হন তখন তাহাকে সর্বক্ষণের পরিচালক বলে	ব্যবস্থাপক পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা নিযুক্ত হন। তিনি পরিচালক নাও হইতে পারেন।
২। নিযুক্তির কার্যকাল	কার্যনির্বাহী পরিচালক সর্বোচ্চ এককালীন পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু নিযুক্তির দুই বৎসরের পর যে কোন সময় তাঁহার কার্যকাল আরও সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর বর্ধিত করা হইতে পারে	তাঁহার কার্যকালের নির্দিষ্ট কোন সময় নাই	এককালীন ৫ বৎসরের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা যায়। কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে পুনরায় নিয়োগ করা হইতে পারে
৩। একসঙ্গে কত সংখ্যক কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন	সাধারণতঃ একজন কার্যনির্বাহী পরিচালক একটি মাত্র কোম্পানীতে থাকিতে পারেন, কিন্তু কোম্পানী আইনের ৩১৬ ধারা অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে একজন কার্যনির্বাহী পরিচালক একসঙ্গে দুইটি কোম্পানীর কার্যনির্বাহী পরিচালক হইতে পারেন। উপরোক্ত ক্ষেত্রে সেই সভার [illegible] সকল পরিচালকগণকে নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি (Specific Notice) দ্বারা [illegible]। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিলে তিনি দুইয়ের অধিক কোম্পানীতে কার্যনির্বাহী পরিচালক হিসাবে থাকিতে পারেন।	একজন সর্বক্ষণের পরিচালক একসঙ্গে একটিমাত্র কোম্পানীতে থাকিতে পারেন	একসঙ্গে একটিমাত্র কোম্পানীর ব্যবস্থাপক হইতে পারেন।

বিষয়	কার্যনির্বাহী পরিচালক (Managing Director)	সর্বক্ষণের পরিচালক Wholetime Director	ব্যবস্থাপক Manager
ক্ষমতা	কোম্পানী ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক অথবা সারবত্ত ক্ষমতার অধিকারী পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে কাজ করিবার জন্য তিনি এরূপ ক্ষমতার অধিকারী	নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতার অধিকারী	পরিচালকমণ্ডলী ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া দেন যে উহা তাঁহার কর্ম নিযুক্তি চুক্তিতে লিখিত থাকে
কত সংখ্যক কোম্পানিতে নিযুক্তি	যদি কোন কোম্পানি কার্যনির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করে তবে সেই কোম্পানী ব্যক্তি কার্যনির্বাহ হিসাবে ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে পারিবে না কারণ একটি কোম্পানীতে একই সময়ে দুইজন কার্যনির্বাহী থাকিতে পারেন না	সর্বক্ষণের পরিচালক থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী উক্ত কার্যনির্বাহী হিসাবে ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে পারে	
৬ পারিশ্রমিক	কার্যনির্বাহী পরিচালক নীট মুনাফার উপর পারিশ্রমিক পাইতে পারেন ... নীট মুনাফার ৫% বেশী হইতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকারের ... অথবা ১০% ... পারেন	যখনে অন্য ব্যবস্থাপক থাকে সেখানে একজন সর্বক্ষণের পরিচালক ... পারিশ্রমিক ... অনুযায়ী ... নির্ধারণ করা হয়	ব্যবস্থাপক মাসিক বেতন অথবা নীট মুনাফার অংশ অথবা আংশিক ভাবে উভয় পারিশ্রমিক হিসাবে পাইতে পারেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৫%-এর বেশী হইবে না অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে তাঁহার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা যায়
৭ কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে বরখাস্ত করিলে ক্ষতিপূরণ	কোন কার্যনির্বাহী পরিচালককে ... কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে বরখাস্ত করিলে তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন। ঐ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তাঁহার কার্যকালের বাকী সময়ের মোট পারিশ্রমিক অথবা তিন বৎসরের মোট পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহা স্বল্পতর	সর্বক্ষণের ... ক্ষতিপূরণ পাইবার যোগ্য	ক্ষতিপূরণ পাইবার যোগ্য, বাকী সময়ের মোট পারিশ্রমিক অথবা তিন বৎসরের মোট পারিশ্রমিকের মধ্যে যেটি স্বল্পতর সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন

ত্রি-সারি বা ত্রি-স্তর কোম্পানী ব্যবস্থাপনা
(Three-Tier Management)

ভারতে কোম্পানী আইন প্রশাসন ব্যবস্থাকে ত্রি-সারি বা ত্রি-স্তর প্রশাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। কারণ ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তিনটি স্তরে প্রশাসনিক যন্ত্র নিযুক্ত করিয়াছেন। কোম্পানী আইন কমিটি (Company Law Committee) নিযুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহার সুপারিশ অনুসারে প্রশাসন যন্ত্রের কাঠামো স্থির করিয়াছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কোম্পানীর নিবন্ধক এবং তাহার কর্মচারীদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিয়াছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আইন কমিটির (Law Committee)-র সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোম্পানী আইন প্রশাসন (Company Law Administration) নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। আইন কমিটি (Law Committee) মন্তব্য করেন, 'কেন্দ্রীয় আইনগুলির মধ্যে প্রশাসনের দিক হইতে সম্ভবতঃ ভারতীয় কোম্পানী আইন সর্বাপেক্ষা ন্যূনতর"। 'The Indian Companies Act was perhaps the most under administered of the Central Acts"।

ত্রি-সারি বা ত্রি-স্তর কোম্পানী প্রশাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত তিনটি প্রশাসন যন্ত্র কাজ করে :

১ কোম্পানী আইন পর্ষদ্ Company Law Board :

সর্বোচ্চ সারিতে বা স্তরে অবস্থিত কোম্পানী-সংক্রান্ত বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোম্পানী আইন প্রশাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয় এবং অর্থ-সংস্থানকারী কর্পোরেশন ও শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। কোম্পানী আইন-সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি এই বিভাগকে স্থিরীকৃত বিষয়ে উপদেশ দেয়। এই বিভাগ কোম্পানী আইন, ন্যায় এবং কোম্পানী-সংক্রান্ত মন্ত্রকের অধীন।

কোম্পানী আইন প্রশাসন বিভাগের (Department of Company Law Administration) পরিবর্তে কোম্পানী আইন পর্ষদ্ গঠিত হয়। এই পর্ষদ কোম্পানী বিভাগের (Department of Company Affairs)-এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই পর্ষদ্ গঠিত হয়। এই পর্ষদ কোম্পানী আইন-বিভাগ এবং কোম্পানী-সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের প্রশাসনের জন্য দায়ী। যদিও কোম্পানী আইন পর্ষদ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "সিকিউরিটিস অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" ("Securities and Exchange Commission")-এর মত স্বাধীন বা স্বনির্ভর নহে, তথাপি ইহা কোম্পানী বিষয়ক কার্যাবলীর প্রশাসনে একটি উন্নত ব্যবস্থা। ইহা কোম্পানী আইন প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত।

কোম্পানীর আইন পর্ষদ্ ১৬টি বিভাগ লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে অভিযুক্তকরণ বিভাগ (Prosecution Division) এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান বেঞ্চ (Research and Statistical Bench) অন্যতম।

কোম্পানী আইন পর্ষদের কার্যাবলী (Functions of Company Law Board) :

(ক) এই পর্ষদ্ কোম্পানীর প্রশাসন এবং কার্যাবলীর সংহতি রক্ষা করে। কোম্পানীর কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য আইন এবং কোম্পানী আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও ইহার অন্যতম কাজ।

(খ) বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কোম্পানীর সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব এই পর্ষদের ওপর ন্যস্ত। কোম্পানী আইনের উপযুক্ত প্রশাসন করাও এই পর্ষদের উল্লেখযোগ্য কাজ।

(গ) পেশাগত শিক্ষাদানের জন্য গঠিত ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ইনস্টিটিউট অফ্ কস্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইণ্ডিয়া এবং ইনস্টিটিউট অফ্ কোম্পানী সেক্রেটারিস্ অফ্ ইণ্ডিয়া (Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost & Works Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর পরিদর্শন ও ইহাদের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কোম্পানী আইন পর্ষদের কাজ।

(ঘ) কোম্পানী আইন পর্ষদের অধীনস্থ গবেষণা ও পরিসংখ্যান বেঞ্চ (Research & Statistical Bench) কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে। পরিসংখ্যানসমূহ প্রকাশ করিয়া এই বিভাগ ভারতে এবং বহির্ভারতে কোম্পানীর তথ্যভিত্তিক উন্নতির নির্দেশ করে। ইহা কোম্পানীর অর্থসংস্থান পদ্ধতি এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে গবেষণা করে। এই বিভাগ সার্বজনিক কোম্পানীর কার্যনির্বাহী পরিচালকের নিযুক্তির বিষয় বিবেচনা করে এবং কোন কোম্পানীর সাধারণ সভায় স্মারকলিপির (Memorandum) ধারা পরিবর্তনের জন্য বিশেষ প্রস্তাব পাশ করিয়া এই বিভাগের অনুমোদন প্রার্থনা করিলে উহা বিবেচনা করে। বস্তুতঃপক্ষে পূর্বে যে সকল ক্ষমতা আদালতের অধীনে ছিল সেইগুলি কোম্পানী আইন পর্ষদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

(ঙ) কোম্পানী আইনের ১০(ই) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানী আইন পর্ষদকে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং যে সকল কর্তব্য পালন করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন সেই সকল কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোম্পানী আইন পর্ষদ্ দায়ী থাকে।

কোম্পানী আইন পর্ষদে অনধিক ৭ জন সদস্য থাকিবেন। এইসকল সদস্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পর্ষদ্ এক বা একাধিক বেঞ্চ তৈয়ারী করিবে এবং বেঞ্চের সদস্যগণ সকলেই পর্ষদের সদস্য হইবেন। প্রত্যেকটি বেঞ্চ দেওয়ানী আদালতের মত ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

২ আঞ্চলিক নির্দেশালয় বা অধিকরণ (Regional Directorate) :

কোম্পানী ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় সারিতে বা স্তরে চারিটি আঞ্চলিক নির্দেশালয় আছে। এই নির্দেশালয়ের প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া আঞ্চলিক অধিকর্তা (Regional Director), কোম্পানী হিসাবরক্ষক এবং কোম্পানী ব্যবহারজীবী বা সলিসিটর আছেন। এই চারটি নির্দেশালয় বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং কানপুরে অবস্থিত।

কার্যাবলী (Functions) :

আঞ্চলিক নির্দেশালয়গুলির প্রধান কার্যাবলী হইল—

(ক) রাজ্যসরকারগুলির সহিত সুনিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

(খ) কোম্পানী নিবন্ধক (Registrar)-এর কার্যাবলীর উপর প্রত্যক্ষ অবেক্ষণ (Supervision), সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) কোন কোম্পানীতে পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত হইলে, পরিদর্শকের অনুসন্ধানের কাজের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি রাখা।

(ঘ) প্রত্যেকটি রাজ্যে বাণিজ্যিক এবং শিল্পীয় কার্যাবলীর উন্নয়নের সহিত সংযোগ রক্ষা করা এবং ঐ উন্নয়নের ধারা অনুসারে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার গতি প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঙ) আঞ্চলিক নির্দেশালয় যে কোন সময়ে কোন কোম্পানীর প্রশাসনে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হইলে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, যাহাতে উহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

(চ) ঐরূপ সংস্থা রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সংযোগকারী (Liaison) হিসাবে কাজ করে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ছ) সার্বজনিক কোম্পানী বিশেষ করিয়া ছোট ছোট সার্বজনিক কোম্পানীকে এইরূপ প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া নির্দেশদান করে।

৩ কোম্পানী নিবন্ধক (Registrar of Companies) :

কোম্পানী প্রশাসন ব্যবস্থার তৃতীয় সারির বা স্তরের প্রশাসনিক যন্ত্রটি হইল কোম্পানী নিবন্ধক। প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজধানীতে একজন করিয়া কোম্পানী নিবন্ধক নিযুক্ত হন।

কার্যাবলী (Functions) :

কোম্পানী নিবন্ধক-এর কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল—

(ক) রাজ্যের নূতন স্থাপিত কোম্পানীগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং কোম্পানী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি যেমন, স্মারকলিপি (Memorandum), পরিমেল নিয়মাবলী (Articles) ইত্যাদি এবং বিবরণাদি যেমন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।

এই সকল দলিলাদি, বিবরণাদি ও প্রতিবেদন সদস্যগণ কতৃক পরিদর্শিত হইতে পারে। সদস্য ছাড়াও যাঁহারা কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তিগণ এই সকল দলিলাদি দেখিতে পারেন।

(খ) কোম্পানীর নিবন্ধক তাঁহার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহকে সঠিক সময়ে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন।

(গ) রাজ্যের প্রত্যেকটি কোম্পানীর কার্যকলাপ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা তাঁহার কাজ।

(ঘ) তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিবরণ (Return) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া কোম্পানী আইন মানা হইয়াছে কিনা তাহা দেখেন। যদি কোম্পানী নিবন্ধক কোন বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে তিনি আঞ্চলিক পরিচালকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারেন।

(ঙ) প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর নিবন্ধক কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিদর্শক (Inspector) দ্বারা কোম্পানীর কার্যাবলীর অনুসন্ধানের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন।

এই সকল প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি সংস্থা যেমন কোম্পানী আইন পর্ষদ, আঞ্চলিক নির্দেশালয় এবং কোম্পানীর নিবন্ধক আইন মন্ত্রকের অধীন। কিন্তু কিছু কিছু কোম্পানী ব্যবস্থাপনার বিষয় অর্থমন্ত্রকের অধীন। এই কারণে কোম্পানীর উপযুক্ত প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে নির্দেশের একতা (Unity of Direction) ব্যাহত হইতেছে। কোম্পানী প্রশাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে আইন মন্ত্রকের অধীনে রাখা উচিত। আইন মন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রকের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় গড়িয়া তোলা সুষ্ঠু কোম্পানী প্রশাসন-ব্যবস্থার অপরিহার্য বিষয়।

কোম্পানীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ (Control over Companies by the Central Government)

এবং

সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা (Measures to Safeguard the interest of Minority Shareholders) :

যৌথ মূলধনী কোম্পানী একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এইরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। কোন কোম্পানীতে বিশেষ করিয়া সার্বজনিক কোম্পানীতে জনসাধারণের অর্থ লগ্নি করা থাকে। সুতরাং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সহিত জনস্বার্থ জড়িত। যাহাদের লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ অল্প অথচ যাহারা সংখ্যায় অধিক বা যাহারা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনের মাধ্যমে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে সক্ষম হয় না, তাহাদের সংখ্যালঘু শেয়ার-হোল্ডার বলা যায়। এই সংখ্যালঘু শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে বিভিন্ন

ধারা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া আর্থিক দিক হইতে দুর্বল ব্যাঙের ছাতার মত আবির্ভূত কোম্পানীর (Mushroom Company) গঠনে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে নিয়ন্ত্রণমূলক কতকগুলি ধারাও প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ধারাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **বিবরণপত্র বা বিজ্ঞাপনী (Prospectus)**—প্রত্যেক সার্বজনিক কোম্পানীতে বিবরণপত্র একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলিল। অবশ্য ৭০ ধারা অনুসারে বিবরণপত্রের পরিবর্তে কোম্পানী একটি সাধারণ বিবরণও প্রকাশ করিতে পারে। বিবরণপত্রে কোম্পানীর শেয়ার এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থাকে। কোম্পানী আইন অনুসারে "Prospectus must always tell the truth, nothing but the truth and must not conceal anything which ought to have been told" অর্থাৎ বিবরণীতে সর্বদা সত্য তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে। সত্য ছাড়া কিছু প্রকাশ করা হইবে না এবং যাহা প্রকাশ করা উচিত তাহা গোপন করা চলিবে না।

যে কোম্পানী শেয়ার বাজারের মাধ্যমে তাহার শেয়ার বিক্রয় করিতে চাহে সেই কোম্পানীকে শেয়ার বাজারের নিয়ম অনুসারে বিবরণপত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবরণ দিলে পরিচালকগণ, প্রবর্তকগণ এবং বিশেষজ্ঞগণের আর্থিক এবং ফৌজদারী দায় দায়িত্বের উদ্ভব হয়। বিবরণপত্রে নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে :

(ক) বিশেষজ্ঞদের লিখিত অভিমত ও অনুমতি,

(খ) সমস্ত চুক্তির নকল,

(গ) কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ।

ইহা ছাড়া সর্বনিম্ন চাঁদা (Minimum Subscription) কত হইবে তাহার উল্লেখ বিবরণপত্রে থাকিবে। স্বল্প মূলধনের ফলে কোম্পানী যাহাতে উঠিয়া না যায় তাহা রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ধারা নিযুক্ত হইয়াছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে বিবরণপত্র অনুধাবন করিয়া বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। বিবরণপত্র বা বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন শেয়ার বিলি করা যাইবে না।

(২) **ফলপ্রসূ কোম্পানী ব্যবস্থাপনা**—পূর্বের কোম্পানী আইনে কোম্পানী ব্যবস্থাপনাকে ফলপ্রসূ করিবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে ত্রি-সারি বা ত্রি-স্তর কোম্পানী ব্যবস্থাপনা সংযোজিত হইয়াছে। এই সারিগুলি হইল :

(ক) কোম্পানী আইন পর্ষদ্ (Company Law Board)

(খ) আঞ্চলিক নির্দেশালয় বা অধিকরণ (Regional Directorate)

(গ) কোম্পানী নিবন্ধক (Company Registrar)

প্রত্যেক রাজ্যে আবশ্যিকভাবে একজন করিয়া কোম্পানী নিবন্ধক নিযুক্ত করা হয়। ইনি কোম্পানী গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায় হইতে শেষ পর্যায় পর্যন্ত কোম্পানীর কার্যকলাপ অবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান (Supervision) করেন।

(৩) **শেয়ার ও লগ্নিপত্রের তালিকাভুক্তিকরণ :** কোম্পানীর লগ্নিপত্র শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করা হইলে বিবরণপত্র প্রকাশ করিবার দশ দিনের মধ্যে ঐ শেয়ার বা লগ্নিপত্রের একটি তালিকা শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং পাঠাইবার চার সপ্তাহের মধ্যে অথবা বর্ধিত সাত সপ্তাহের মধ্যে শেয়ার বাজারের অনুমোদন পাইতে হইবে। শেয়ার বাজার বিজ্ঞাপনা বা বিবরণপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পরীক্ষা করিবার পর তবেই অনুমোদন প্রদান করিবে। তালিকাভুক্তিকরণ দুর্বল কোম্পানী গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোম্পানী তাহার শেয়ারের বিষয় শেয়ার বাজারের মূল্যজ্ঞাপনপত্রে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক থাকে, তবে তাহাকে বিলিকৃত মূলধনের অন্ততঃ ৯ জনগণের নিকট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিতে হইবে।

(৪) **মূলধন নিয়ন্ত্রকের অনুমতি :** যদি কোন কোম্পানী তিন কোটি টাকার অধিক প্রাপ্ত মূলধনের প্রস্তাব করে তবে তাহাকে মূলধন নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে পূর্ব অনুমতি লইতে হইবে। বিবরণপত্রের একটি নকলসহ আবেদনপত্র নিয়ন্ত্রকের নিকট পেশ করিতে হয়। নিয়ন্ত্রক আবেদনপত্র ও বিবরণপত্র পড়িবার পর অনুমতি প্রদান করিতে পারেন

(৫) **ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ :** কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইয়াছে :

(ক) **কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি**—কার্যনির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করিবার জন্য এবং পরিচালকমণ্ডলীর পরিবর্তন কার্যকরী করিবার জন্য সার্বজনিক কোম্পানীকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইতে হয়।

(খ) **পদসংখ্যা**—কোন একজন কার্যনির্বাহী পরিচালক দুইটির বেশী কোম্পানীতে একসঙ্গে কার্যনির্বাহী পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাইলে একজন কার্যনির্বাহী পরিচালক দুই-এর অধিক কোম্পানীতে কার্যনির্বাহী পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারেন। কোন একজন ব্যবস্থাপক একটির বেশী কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। কোন একজন পরিচালক একসঙ্গে ২০টির বেশী কোম্পানীতে পরিচালক হিসাবে থাকিতে পারিবেন না।

(গ) **পরিচালকমণ্ডলীর স্বাধীনতা**—পরিচালকমণ্ডলীকে অন্যান্য শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত ও স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য এবং কোম্পানী ব্যবস্থাপনাকে প্রগতিশীল করিবার জন্য স্বাধীন সত্তা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যে পরিচালকের বিরুদ্ধে কোন আদালত বিরূপ

মন্তব্য করিয়াছেন অথবা যিনি জুয়াচুরি বা কর্তব্যে অবহেলা অথবা বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালক পদ হইতে বরখাস্ত করিতে পারেন।

(ঘ) **ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পারিশ্রমিক** ঃ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপকগণের পারিশ্রমিকের উপর কোন বাধা নিষেধ ছিল না। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে বলা হইয়াছে যে ব্যবস্থাপনার মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ১ এর বেশী হইবে না, অথবা যে বৎসরে মুনাফার পরিমাণ অত্যন্ত কম সেই বৎসরে মোট পারিশ্রমিক সর্বনিম্ন ৫০ ০০০ টাকা হইবে।

যে কোম্পানীতে অন্যান্য ব্যবস্থাপক নাই, সেখানে পরিচালকগণের পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৩ , হইতে পারে। কিন্তু যেখানে অন্যান্য ব্যবস্থাপক আছে সেখানে পরিচালকগণের পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ১ -এর বেশী হইবে না

কার্যনির্বাহী পরিচালকের মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৫ এর বেশী হইবে না। ব্যবস্থাপকের মোট পারিশ্রমিক নীট মুনাফার ৫ এর বেশী হইবে না

কোন কোম্পানী তাহার পরিচালকগণকে নীট মুনাফার ১ এর অধিক পারিশ্রমিক দিতে পারে যদি কোম্পানীর সাধারণ সভায় এ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব পাশ করানো হয় এবং যদি কেন্দ্রীয় সরকার উহা অনুমোদন করেন এই বিশেষ প্রস্তাবটি ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকে এবং উহা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য নবীকরণ করা যাইতে পারে

কোম্পানীর পরিচালকগণের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত হইবার জন্য উপস্থিতি-দেয়ক (sitting fee)-এর পরিমাণ ২৫০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাচার কমিটির (Sachar Committee) প্রতিবেদন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাপকগণের পারিশ্রমিকের পরিবর্তন করিয়াছেন এই পরিবর্তনগুলি হইল

(i) বেতন ও দস্তুরীর পরিমাণ বৎসরে ৬০,০০০ টাকার বেশী হইবে না। ইহার মহার্ঘভাতা (D A) এবং অন্যান্য স্থির ভাতা যুক্ত থাকে এবং নীট মুনাফার ১ পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ ১২ ০০০ টাকা অথবা বেতনের ২৫ ,—এইগুলির মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন, উহা ঐ ৬ ,০০০ টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(ii) আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ (Perquisites) কখনই বাৎসরিক বেতনের অধিক হইবে না এবং সর্বোচ্চ ৬০,০ ০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে কিন্তু বোম্বাই-এর ব্যবস্থাপকগণের ক্ষেত্রে ইহা ৬২ ৭০০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা, যেমন ছুটিসহ ভ্রমণ ভাতা (LTC), বিনা ব্যয়ে চালকসহ গাড়ীর সুবিধা দুর্ঘটনাবীমা সর্বোচ্চ দুটি ক্লাবের দেয়ক (fees) ব্যবস্থাপকগণকে দেওয়া যাইতে পারে।

যে বৎসরে মুনাফার পরিমাণ কম সেই বৎসরের সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক প্রদানে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য :

(১) মোট বা সার্বিক বেতনের অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকার ১০% বাদ যাইবে।

(২) আনুষঙ্গিক সুবিধা সর্বোচ্চ পরিমাণ পূর্বের মতই থাকিবে।

(৩) কোন দস্তুরি বা বোনাস দেওয়া হইবে না।

সাচার কমিটি (Sachar Committee)র সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপকগণের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক বৎসরে ১,৩২,০০০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

ব্যবস্থাপকগণের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কোম্পানী-বিষয়ক দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশাবলী হইল (১.৪.১৯৮৩ হইতে প্রযোজ্য) :

(১) মহার্ঘ ও অন্যান্য ভাতাসহ [illegible] সর্বাধিক [illegible] পারিশ্রমিক [illegible] ৭,৫০০ টাকা [illegible] মাসিক।

(২) [illegible] নীট মুনাফার [illegible] কমিশন দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] সর্বোচ্চ সীমা অনুমোদিত বেতনের ৫০% অথবা [illegible] ৪৫,০০০ টাকা। [illegible] কমিশন দেওয়া [illegible] বৎসরে [illegible] টাকা। [illegible] হইবে।

(৩) আনুষঙ্গিক সুবিধা বা পার্কুইজিট (Perquisites) [illegible] সর্বাধিক পরিমাণ বাৎসরিক বেতন অথবা ৪৫,০০০ টাকা, এই দুইটির মধ্যে যেটি কম তাহার বেশী হইবে না। উপরি পাওনা তিন প্রকার হইতে পারে যেমন (ক) বাড়ি ভাড়া ভাতা, এল টি সি, চিকিৎসার ব্যয়, ক্লাবের দেয়ক (fees) এবং ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা। বাড়ি ভাড়ার সর্বাধিক পরিমাণ হইল বোম্বাই-এ বেতনের ৩৫%, দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও বাঙ্গালোরে বেতনের ৩০% এবং অন্যান্য স্থানে বেতনের ২৫%। গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য কোম্পানীর ব্যয় বেতনের ১০%-এর বেশী হইবে না। চিকিৎসার ব্যয় বাবদ কোম্পানীর প্রদত্ত অংশ এক মাসের বেতনের পরিমাণের অধিক হইবে না। এল টি সি বাবদ বৎসরে কোম্পানী একবার ব্যয় করিতে পারে এবং তাহা নিজের ও পরিবারের জন্য অনুমোদিত হইতে পারে। সর্বাধিক দুইটি ক্লাবের দেয়ক (fees) কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমার চাঁদা বৎসরে সর্বাধিক ১,০০০ টাকা পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে।

(খ) কোম্পানী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেন্‌শন্‌, বার্ষিক বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করিতে পারে। গ্র্যাচুইটির সর্বাধিক পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকার বেশী হইবে না।

যে সকল ব্যবস্থাপক পারিশ্রমিক হিসাবে কেবল কমিশন পাইবেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে উপরি-পাওনার সর্বাধিক পরিমাণ হইবে কমিশনের পরিমাণ অথবা ৩,০০০ টাকার মধ্যে যেটি স্বল্পতর সেইটি। ইঁহারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেন্‌শন্‌ অথবা গ্র্যাচুইটি পাইবেন না, চিকিৎসাখাতে ব্যয় বাবদ বৎসরে ১৫,০০০ টাকার বেশী পাইবেন না এবং বৎসরে একবার কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী এল টি সি পাইবেন।

বর্ধিত হারে গ্র্যাচুইটি বা উপরি-পাওনা দিতে হইলে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

(ঙ) **সময়কাল**ঃ কোন একজন কার্যনির্বাহী সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসরের জন্য এবং কোন একজন ব্যবস্থাপক সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসরের জন্য কোম্পানীতে নিযুক্ত হইতে পারেন। অবশ্য তাঁহাদের অনধিক ৫ বৎসরের জন্য পুনর্নিয়োগ করা যায়। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে (Rotationally) অবসরগ্রহণ করিবেন।

(চ) **কোম্পানী নিবন্ধক (Company Registrar)**ঃ কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ করে কোম্পানী আইন পর্ষদ (Company Law Board)। আঞ্চলিক নির্দেশালয় বা আধিকারিক কোন বিশেষ অঞ্চলের কোম্পানীর পরিচালনা, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করে। কোম্পানী নিবন্ধক প্রত্যেক রাজ্যে নিযুক্ত হন এবং সেই রাজ্যের কোম্পানীর গঠন ও পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ছ) **অনুসন্ধান (Investigation)**ঃ সংখ্যালঘু শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানী আইন অনুসারে এক বা একাধিক পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত করিতে পারেন। উপযুক্ত সংখ্যক শেয়ার-হোল্ডার, অথবা কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট হইতে আবেদন আসিলে তবেই কেন্দ্রীয় সরকার অনুসন্ধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

(জ) **শেয়ার-হোল্ডারদের সংস্থা (Shareholders' Association)**ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোহেন কমিটির (Cohen Committee) অনুকরণে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনে শেয়ার-হোল্ডারগণের সমিতি গঠনের ধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমিতিতে শেয়ার-হোল্ডারগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়া পরিচালকগণের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করেন এবং তাঁহাদের স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টা চালান।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবলুপ্তিতে অন্যান্য ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি (Development of other Contemporary forms of Company Management after the abolition of Managing Agency system)ঃ

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবলুপ্তির পরবর্তীকালে ভারতীয় কোম্পানীগুলির ব্যবস্থাপনায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্য কোম্পানী আইনে তিন প্রকার ব্যবস্থাপকের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। **ইঁহারা হইলেন**ঃ

(১) পরিচালকগণের কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee of Directors)

(২) কার্যনির্বাহী পরিচালক বা ব্যবস্থাপক-পরিচালক (Managing Director)

(৩) ব্যবস্থাপনার উপদেশাত্মক সংস্থা (Management Consultancy Firm)।

(১) পরিচালকগণের কার্যনির্বাহী কমিটি: পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্য হইতে কয়েকজন পরিচালককে লইয়া কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন না। প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা চালাইবার জন্য পরিচালকগণের কার্যনির্বাহী কমিটিকে সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং এই কমিটি কোম্পানীর পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। কমিটির সদস্যগণ যৌথভাবে কোম্পানীর সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করেন এবং এই সকল সিদ্ধান্ত ও নীতি রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হন।

একদিকে যৌথ সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কল্যাণদায়ক, কারণ ইহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যুক্ত হইয়া সিদ্ধান্ত সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু অন্যদিকে যৌথ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অসুবিধাজনক। ইহা শুধু যে সময়-সাপেক্ষ তাহা নহে ইহাতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়াইবার প্রবণতাও দেখা যায়।

(২) ব্যবস্থাপক-পরিচালক বা কার্যনির্বাহী পরিচালক: পূর্বেই এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) ব্যবস্থাপনার উপদেশাত্মক সংস্থা: ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবলুপ্তির ভাবে একটি নূতন পদ্ধতি হিসাবে ব্যবস্থাপনার উপদেশাত্মক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়েছে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবলুপ্তি ঘটে। ইহার অব্যবহিত পরেই অনুভূত হয় যে, ম্যানেজিং এজেন্টগণের স্থলাভিষিক্ত কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনার উপদেশাত্মক সংস্থা গড়িয়া ওঠে।

উপদেশাত্মক সংস্থাগুলি বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করে। তাহাদের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ সাহায্য করে। উপদেশাত্মক সংস্থাগুলি বিশেষজ্ঞ সেবা ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উপদেশ দিয়া থাকে। ইহারা বাহ্যিক সংস্থা। সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে যে কোন উপদেশাত্মক সংস্থার নিকট সমস্যা সমাধানের আবেদন করিতে পারে ও তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। সাধারণতঃ নিয়মমাফিক কার্যকলাপের জন্য ইহাদের উপদেশ চাওয়া হয় না। কিন্তু জটিল আইনগত, হিসাবশাস্ত্রগত, কারিগরি ও ইঞ্জিনীয়ারিং কার্যের জন্য ইহাদের উপদেশ প্রয়োজন হইতে পারে। ইহা ছাড়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি করা, বাজার গবেষণা, জন-সম্পর্ক ও শ্রমিক-সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, মূলধন বাজেট প্রস্তুত করা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা ইত্যাদি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উপদেশাত্মক সংস্থাগুলির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিত উপদেশাত্মক সংস্থাগুলি সেই ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে ম্যানেজিং এজেন্টগণের তিনটি ভূমিকা ছিল : (ক) প্রবর্তক হিসাবে, (খ) অর্থলগ্নিকারক হিসাবে এবং (গ) ব্যবস্থাপক হিসাবে। উপদেশাত্মক সংস্থা কেবলমাত্র ব্যবস্থাপকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

নূতন নূতন যে সকল ক্ষেত্রে উপদেশাত্মক সংস্থাগুলি ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, সেইগুলি হইল—

(ক) শিল্পে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ ঘটান,

(খ) শিল্প-পদ্ধতিতে উন্নততর কলাকৌশল প্রবর্তন করা,

(গ) উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদিকাশক্তি আনয়ন করা,

(ঘ) সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা,

(ঙ) মজুত দ্রব্যের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ করা,

(চ) উপযুক্ত মূলধন বাজেট প্রস্তুত করা,

(ছ) বাজার সম্প্রসারণ করা।

কিন্তু বাস্তবে অসুবিধা হইতেছে যে অনেক কোম্পানী উপদেশাত্মক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। কারণ ভারতে এখনও 'বিক্রেতার বাজার' (Seller's market) [illegible], উৎপাদন [illegible] তাহাই [illegible] বাজারে সহজেই বিক্রী হয় [illegible] অধিকাংশ [illegible] ত্যাগ করায় আগ্রহী নয় এবং [illegible] উপদেশাত্মক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ভারতে তেমন অনুভূত হয় না। বর্তমানে কারবারীগণ যে সকল বিষয়ে [illegible] ও আগ্রহী সেগুলি হইল :

(ক) শিল্পে অশান্তি ও শ্রমিক বিক্ষোভ,

(খ) কাঁচামালের অভাব,

(গ) যানবাহনের অভাব,

(ঘ) বৈদেশিক মুদ্রার অভাব,

(ঙ) অতিরিক্ত করের বোঝা,

(চ) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

কারবারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ আঁতাত করিয়া এবং অসৎ উপায়ে ভোক্তাকে শোষণ করে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করিতেছে এবং উন্নত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী হইতেছে ততদিন উপদেশাত্মক সংস্থার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। উপরন্তু উপদেশাত্মক সংস্থাগুলির সাফল্য ও অগ্রগতি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

(ক) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে উপদেশাত্মক সংস্থাগুলির স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া প্রভূত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান না থাকিলে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানে ইহারা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না।

(খ) উপদেশাত্মক সংস্থাগুলি যে সুপারিশ করিবে উহা যেন কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য না হয়। এই উপদেশগুলি বাস্তবে কার্যকরী এবং গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে।

(গ) ব্যবস্থাপকগণের সহিত আলোচনার পর এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সমস্যা অনুধাবনের পর তবেই উপদেশ বা সুপারিশ প্রদান করা উচিত।

(ঘ) সুপারিশগুলি যেন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকগণের আত্মসম্মান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আঘাত না করে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকগণের যোগ্যতার উপর কটাক্ষ করা উচিত নহে।

(ঙ) কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশাত্মক সংস্থা ও আভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত হইবে তৎক্ষণাৎ বিরোধের কারণসমূহ ও ভুল-বোঝাবুঝি দূর করিয়া সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংস্থাগুলি উপদেশাত্মক ভূমিকায় কাজ করে। সুতরাং তাহাদের নিকট অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও পেশাগত জ্ঞানের সুবিধা গ্রহণ করাই কোম্পানীগুলির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

(চ) যদি উপদেশাত্মক সংস্থা কোন সময় আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকগণের কার্যকলাপের উপর কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য করে তবে উহা আদর্শগতভাবে মানিয়া লওয়া সমীচীন।

(ছ) এইরূপ সংস্থাকে কার্যকরীভাবে পাইতে হইলে তাহাদের সহিত সমস্যার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। তাহা না হইলে ডাক্তারের কাছে রোগ গোপন রাখিলে যে অবস্থা হয়, সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

(জ) ব্যবস্থাপকগণ এবং কর্মচারিগণকে উপদেশাত্মক সংস্থাগুলির সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ সুপারিশ পাওয়া সম্ভব হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় কারবারিগণের সচেতনতা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকগণের সদিচ্ছার উপর উপদেশাত্মক সংস্থাগুলির সাফল্য অনেকাংশ নির্ভর করিতেছে। অদূরভবিষ্যতে অধুনা-বিলুপ্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণের ভূমিকা পালনে তাহারা কতখানি সাফল্য অর্জন করিবে তাহা লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারবারী জোট ও সংহতি
(Business Combination and Concentration or Integration)

কারবারী জোট কাহাকে বলে (What is Business Combination) :

সমস্বার্থ-বিশিষ্ট একাধিক কারবারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের সাধারণ স্বার্থ-রক্ষার্থে যখন একত্রে কারবারী কার্য-কলাপ চালাইবার জন্য চুক্তি করে, তখন তাহাকে কারবারী জোট বলে। কারবারী জোটে স্বার্থের [illegible] বন্ধন হয়। [illegible] অংশগ্রহণকারী [illegible] পৃথক সত্ত্বা বিনষ্ট হইতে পারে অথবা নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া [illegible]।

জোট গঠনের কারণ (Causes of Combination) :

জোট গঠনের বিভিন্ন কারণ হইতে পারে। প্রধান কারণগুলি [illegible] করা হইল :

(১) **তীব্র প্রতিযোগিতার অবসান (Elimination of Intense Competition) :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক পরিস্থিতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা ও অবাধ নীতির (Laissez faire) অর্থ-ব্যবস্থা অর্থাৎ অবাধ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নীতির প্রচলন হয়। [illegible] অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিজের [illegible] স্বাধীনভাবে রচনা করে। এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে কোন কারবারী প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার সাহায্যে নিজেকে কারবারে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত। [illegible] ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। কারবারী স্বার্থ এবং দেশের অর্থনৈতিক কার্য-কলাপে সরকারের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছিল না। সরকার প্রশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। কারবারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বড় ছোট ছোট কারবার গড়িয়া উঠে এবং ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। যাহারা কারবারে শক্তিশালী তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল কারবারীদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিত। এইরূপ ব্যবস্থায় কেবল শক্তিশালী কারবারিগণই কারবারে টিকিয়া থাকিতে পারিত। এই ব্যবস্থা "যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকা" (Survival of the fittest) তত্ত্বকে অনুসরণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। বৃহদাকার উৎপাদন-ব্যবস্থা শুরু হওয়ায় "বহুল উৎপাদন" (mass production) সম্ভবপর হয়। জেমস্ ওয়াট (James Watt)-এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে রেল ও জাহাজ পরিবহণ সম্ভব হয় এবং "বহুল বণ্টন" (mass distribution) ব্যবস্থা চালু হয়। একদিকে বহুল-উৎপাদন এবং অন্যদিকে বহুল-বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে। কারবার গঠন করিবার অবাধ স্বাধীনতায় তীব্র প্রতিযোগিতার

সৃষ্টি হয়। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিক্রয় বাড়াইয়া অধিক মুনাফা লাভের আশায় সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। ফলে বাজারে পণ্যের প্রচুর সরবরাহ হয় এবং তীব্র বা গলা-কাটা (Cut-throat) প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। চাহিদার তুলনায় যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য হ্রাস পায়। অনেক সময় বাধ্য হইয়া কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সাময়িকভাবে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কমমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। এই সময় উৎপাদকগণ কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল-ব্যয় (Variable Costs) বিক্রয়মূল্যের সমান হইলেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ তীব্র প্রতিযোগিতায় (Intensified Competition) বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং আত্মরক্ষার জন্য জোট গঠন করে। বৃহৎ কারবারীরাও এই অসুবিধার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জোট গঠন করিয়া স্বার্থরক্ষা করে। এই কারণেই বলা হয় যে, 'তীব্র প্রতিযোগিতা জোট সৃষ্টি করে' (**Competition leads to Combination**)।

(২) **উৎপাদন ও বণ্টনে ব্যয়-সংকোচের সুবিধা** (Economies of Production and Distribution): বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা লাভের জন্যও জোট গঠন করা হয়। একসঙ্গে প্রচুর কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদনে যন্ত্রীকরণের ফলে ব্যয় সংকোচ হয়। পণ্য সরবরাহ, পরিবহণ, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ইত্যাদির ব্যয় সংকুচিত হয়। জোট গঠনে প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি ও বাণিজ্যিক এবং পরিচালনা ও আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

(৩) **চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য** (Equilibrium in Demand and Supply): চাহিদা ও যোগানের অসমতায় পণ্যমূল্য উঠানামা করে এবং মুনাফা অনিশ্চিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগান নির্ধারণ করিয়া সেই অনুসারে উৎপাদন করে এবং যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। ইহাতে পণ্যমূল্যের অস্থিরতা দূর হয়।

(৪) **বাণিজ্য-চক্র** (Business Cycle): কারবারে কোন সময় তেজী, আবার কোন সময় মন্দাভাব দেখা দেয়। তেজীর সময় একই পণ্যের উৎপাদনে অনেক নূতন কারবারের প্রতিষ্ঠা হয় ও উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু মন্দার সময় সকলের মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা বেশী থাকায় পণ্যের মূল্য দ্রুত কমিতে থাকে; কিন্তু কারবারীর অন্যান্য খরচ, বিশেষ করিয়া স্থায়ী খরচ, যেমন—স্থায়ী কর্মচারীর মাহিনা ইত্যাদি সেই অনুপাতে কমে না। ফলে ছোট ছোট কারবারিগণ আর্থিক সমস্যায় পড়ে ও অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য জোট গঠন করে।

(৫) **শুল্ক-নীতি** (Tariff Policy): সংরক্ষণ-শুল্ক 'জোটের জননী' (Tariff is the mother of combination)। দেশীয় শিশু ও দুর্বল শিল্পকে রক্ষার জন্য সরকার অনুকূল শিল্প-নীতি গ্রহণ করিলে অচিরেই বহু ছোট ছোট সংস্থা গড়িয়া উঠে এবং পরবর্তী কালে সরকার শুল্কের সুবিধা তুলিয়া লইলে তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। প্রতিযোগিতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইহারা জোট গঠন করে।

(৬) **আত্মরক্ষা** (Self-Defence) : বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য অথবা বিদেশী প্রতিযোগী কর্তৃক আমদানিকৃত অস্বাভাবিক অল্পদামে বিক্রীত পণ্যের (dumping) বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য এবং আত্মরক্ষার তাগিদে ছোট ছোট কারবারীরা জোটবদ্ধ হয়।

(৭) **সরকারী আইন** (Government Legislation) : বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার আইন করিয়া জোট সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন ভারতীয় রেলপথ।

(৮) **পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি** (Improvement in Transport) : পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট গঠন সম্ভব হইয়াছে।

(৯) **ক্ষমতালিপ্সুতা** (Power Intoxication) : বৃহৎ ব্যবসায়ীরা নিজেদের সামাজিক ক্ষমতা সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত ছোট ছোট কারবারগুলিকে জোট গঠনে প্রভাবিত করে।

(১০) **অপরাপর কারণ** (Other Causes) : বিক্রয় সাফল্যের নিমিত্ত গবেষণামূলক কার্য, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, উৎপাদী স্বত্বের (Patent Right) সংযুক্তিকরণ লগ্নিকারকগণের চাপ, যেমন—ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী সংস্থার চাপ ইত্যাদি কারণেও জোট সৃষ্টি হয়।

জোটের সুবিধা (Advantages of Combination) :

জোট গঠনের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

(১) **অধিক মূলধন** (Greater Capital) : জোট গঠনে ছোট ছোট কারবারীরা তাহাদের পুঁজি একত্রিত করিয়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

(২) **উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ** (Reduction in Cost of Production) : অধিক পুঁজি সংগ্রহের ফলে একসঙ্গে অধিক কাঁচামাল ক্রয় করা যায় এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ করা যায়।

(৩) **বণ্টনের সুবিধা** (Economies in Distribution) : একত্রে বিক্রয় করিলে পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরিবহণ-ব্যয়, বিজ্ঞাপন-ব্যয়, বিক্রয়-ব্যয় ইত্যাদি কম পড়ে।

(৪) **পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি** (Increase of Efficiency in Management) : জোট গঠনে দক্ষ পরিচালক তৈয়ারী হয় এবং ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসায়ের স্থায়ী-ব্যয় (Fixed Costs) কমিয়া যায়।

(৫) **ক্রেতার সুবিধা** (Facility to Customers) : উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যয় হ্রাস, পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ ইত্যাদির ফলে ক্রেতাসাধারণ জোট গঠনের সুবিধা ভোগ করে।

(৬) **তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার সুযোগ** (Collection of Information and Research Facilities): শিল্প-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং যৌথ গবেষণা চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় জোটবদ্ধ সংস্থাসমূহ তাহা সহজেই জোগাইতে পারে।

(৭) **বিনিময়ের সুবিধা** (Facility of Exchange): দেশী ও বিদেশী সংস্থার মধ্যে জোট গঠনের ফলে কারিগরি জ্ঞান ও উৎপাদী স্বত্ব বা পেটেন্ট রাইট প্রভৃতি বিনিময় হইতে পারে।

(৮) **প্রতিযোগিতা হ্রাস** (Elimination of Competition): জোট গঠনের ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা এবং গলা-কাটা প্রতিযোগিতা হ্রাস করা যায়।

(৯) **একচেটিয়া কারবারের সুবিধা** (Facility of Monopoly): জোট গঠনের ফলে জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ চুক্তি দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ এমনভাবে স্থির করে যে চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম থাকে। ইহার ফলে তাহারা একচেটিয়া কারবারের সুবিধা পায় এবং সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে।

(১০) **দামের স্থিরতা** (Stability in Price): জোট গঠনে প্রতিযোগিতা হ্রাসের ফলে পণ্যমূল্যের অস্থিরতা দূর হয়।

(১১) **কর্মসংস্থান** (Employment): জোট গঠনে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

জোটের কুফল (Demerits of Combination):

জোট গঠনের কুফলগুলি নিম্নে আলোচিত হইল:

(১) **একচেটিয়া মুনাফা** (Monopoly Profit): জোট গঠনে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয় এবং ক্রেতারা অধিক দামে অন্যায়ের শিকার হয়।

(২) **শ্রমিক শোষণ** (Exploitation of Labourers): জোটবদ্ধ সংস্থা কম মজুরী দিয়া শ্রমিক শোষণ করে।

(৩) **কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি** (Creation of Unhealthy Atmosphere): পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ সংস্থা অসৎ উপায়ে বাজারে কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করে এবং 'ফন্দি-আঁটা অভাব' (Contrived Scarcities) তৈয়ারী করে।

(৪) **রাজনীতির উপর প্রভাব** (Influence upon Politics): স্বার্থসৃষ্টির উদ্দেশ্যে উৎকোচ (Bribe) দিয়া ইহারা শাসকগোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে।

(৫) **ফটকা কারবার** (Speculation): অধিক মূলধন থাকায় ইহারা ফটকা কারবারে উৎসাহিত হয়।

(৬) **পরিচালনায় দক্ষতা হ্রাস** (Fall of Efficiency in Management): জোট গঠনে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়, আত্মতুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং দক্ষতা হ্রাস পায়। জোট গঠনে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পায়, ফলে পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

(৭) **সম্পদ পুঞ্জীকরণ** (Concentration of Wealth) ঃ জোট গঠনে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় এবং সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয় ও বৃহত্তর জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

জোটের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Combination) ঃ

জোটের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া হইল :

কারবারী জোট (Combination)

- **প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ (Combination as to Lines)**
  1. ভিন্ন শিল্প জোট (Vertical Combination)
  2. সমশিল্প জোট (Horizontal Combination)
  3. বৃত্তাকার জোট (Circular Combination)
  4. পার্শ্বিক জোট (Lateral Combination)
  5. আঞ্চলিক জোট (Territorial Combination)
- **গঠন-সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ (Structural Combination)**
  - সমিতি
    1. ব্যবসায়ী সমিতি (Trade Association)
    2. বণিকসভা (Chamber of Commerce)
    3. শ্রমিক সংঘ (Trade Union)
    4. ভদ্রলোকের চুক্তি (Gentlemen's Agreement)
  - সংঘ
    1. কার্টেল (Cartel)
    2. পুল (Pool)
  - একীকরণ (Consolidation)
    - আংশিক একীকরণ (Partial Consolidation)
      1. ট্রাস্ট (Trust)
      2. হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company)
      3. সমস্বার্থ গোষ্ঠী (Community of Interest)
    - সম্পূর্ণ একীকরণ (Complete Consolidation)
      1. একত্রীকরণ (Amalgamation)
      2. অন্তর্ভুক্তি (Merger)

পর্বাপর বা ভিন্ন শিল্প বা উল্লম্ব জোট এবং সমান্তরাল জোট (Vertical and Horizontal Combination) ঃ

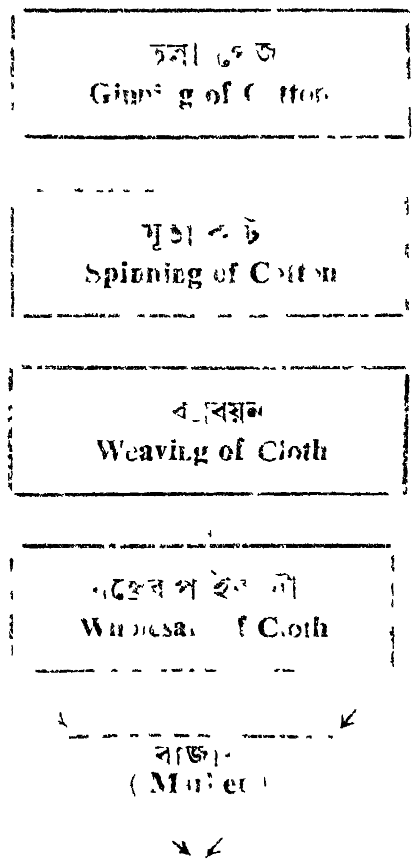
কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন স্থির থাকে না। ইহা উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়। সম্প্রসারণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই প্রকারের হইতে পারে। কারবারের নিজস্ব সম্পদ

বৃদ্ধিতে আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ ঘটে। একটি কারবারের সহিত অন্য কারবারের জোটের ফলে বাহ্যিক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুসারে বাহ্যিক সম্প্রসারণ বা কারবারী জোট, পূর্বাপর জোট ও সমান্তরাল জোট হইতে পারে।

পূর্বাপর বা উল্লম্ব বা ভিন্ন শিল্প জোট (Vertical Combination) ঃ

একই পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন প[illegible] উৎপাদক একত্রিত হইয়া জোট সৃষ্টি করিলে তাহাকে পূর্বাপর জোট বলে। উদাহরণ: টাটা আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী, বস্ত্র-শিল্প ইত্যাদি।

পূর্বাপর জোট দুই প্রকার হইতে পারে: কাঁচামাল উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কার্যাবলী একই নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলে উহাকে [illegible] পূর্বাপর জোট বলে। [illegible] জোট দুই প্রকার হইতে পারে: [illegible] উৎপাদন কার্যের [illegible] সংযুক্ত হয়, [illegible] পূর্বাপর জোট সৃষ্টি হয়। [illegible] সংযুক্ত হয় [illegible] সুতাকাটা [illegible] পূর্বাপর জোট [illegible]



পূর্বাপর জোটের তীর চিত্র

উদ্দেশ্য (Objects)ঃ ইহার উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) কাঁচামালপ্রাপ্তির সুবিধা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা,

(২) উৎপাদন কার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাবলম্বী হওয়া

বৈশিষ্ট্য (Features)ঃ ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) একটি মূল পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি এই জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকারীর সহিত কয়লা, লৌহ-আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জোট। অথবা তুলা পেঁজা হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্রের বাজার পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া পূর্বাপর জোটের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

(২) ইহা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জোট।

(৩) উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর একই মালিকানায় থাকিবে।

(৪) ইহাতে প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক সম্প্রসারণ ঘটিবে।

(৫) পূর্বাপর জোট অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী হইতে পারে।

(৬) পূর্বাপর জোটে উৎপাদনের সমস্ত অথবা অধিকাংশ একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকে।

(৭) জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের সত্তা বজায় রাখিতে পারে।

সুবিধা (Advantages)ঃ ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) পূর্বাপর জোটে উৎপাদনকার্যে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

(২) ইহাতে উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয় হ্রাস পায় বলিয়া ব্যয়-সংকোচ সম্ভব হয়।

(৩) ইহাতে কাঁচামালপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে বলিয়া উৎপাদনের পর্যায় ব্যাহত হয় না।

(৪) পূর্বাপর জোট মধ্যস্থ কারবারীর বিলোপ সাধন সম্ভবপর হয়।

(৫) ইহা উৎপাদন ও বিক্রয়কার্যে অনিশ্চয়তা দূর করে।

(৬) ইহাতে পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় ও উৎপাদন-ব্যয় স্থির রাখা যায়।

(৭) ইহাতে পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও প্রয়োগ কৌশল উন্নত হয়।

(৮) পূর্বাপর জোটে অতিরিক্ত কাঁচামাল মজুতের প্রয়োজন হয় না বলিয়া কার্যকরী মূলধন আবদ্ধ থাকে না।

(৯) ইহাতে পূর্বচুক্তিকৃত দামে কাঁচামাল পাওয়া যায় বলিয়া বাণিজ্য-চক্র ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

(১০) ইহাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(১১) কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিশ্চিত বাজার পায়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ এই প্রকার জোটের অসুবিধাগুলি হইল :

(১) পূর্বাপর জোটে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

(২) কাঁচামালের যোগান কোন কারণে বন্ধ হইলে সমস্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(৩) ইহাতে উচ্চস্তরের কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখান সম্ভব হয় না, কারণ প্রত্যেক উৎপাদন-স্তরের মধ্যে সঠিক সংযোজন ও ভারসাম্যের অভাব ঘটিতে পারে।

(৪) পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ইহাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

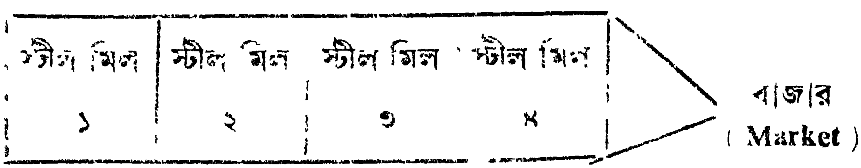
(৫) ইহাতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রকার জোটে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে বলিয়া বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধা পায় না।

(৭) ইহাতে অধীনস্থ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি মূল দ্রব্য উৎপাদনকারীর দ্বারা শোষিত হইতে পারে।

সমান্তরাল জোট বা সমশিল্প জোট (Horizontal Combination) ঃ

একই পণ্য উৎপাদনকারী অথবা সেবাব্রত দুই বা ততোধিক কারবারী প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত হইয়া যৌথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহাকে সমান্তরাল বা সমশিল্প জোট বলে। উদাহরণ : এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ (ACC), ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান পেপার মকার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি।



সমান্তরাল জোটের তীর চিত্র

উদ্দেশ্য (Objects) ঃ এই প্রকার জোটের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা,

(২) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা,

(৩) বিক্রয়মূল্য স্থির করা,

(৪) যৌথ বিপণন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা,

(৫) বাজার বিভাজন করা,

(৬) বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন-ব্যয় হ্রাস করা,

(৭) উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা;

(৮) পণ্যমূল্য স্থির রাখা।

বৈশিষ্ট্য (Features) ঃ ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল :

(১) সমান্তরাল জোটে অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিতে পারে।

(২) জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি একই প্রকার দ্রব্য বা সমপণ্য উৎপাদনকারী অথবা সেবারত প্রতিষ্ঠান।

(৩) জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথভাবে চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

(৪) সমান্তরাল জোটে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও বাজার দামের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

(৫) ইহাতে তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় বলিয়া বাজারের উপর কর্তৃত্ব আনা যায়।

(৬) ইহাতে যৌথ বিপণন ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে।

(৭) সমান্তরাল জোটে বাজারের বিভাজন বা ভাগাভাগি করা হয়।

সুবিধা (Advantages) ঃ এই প্রকার জোটের সুবিধাগুলি হইল :

(১) সমান্তরাল জোটে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়।

(২) এইপ্রকার জোটে উৎপাদন-ব্যয়, বিক্রয়-ব্যয় ও বিজ্ঞাপন-ব্যয় হ্রাস পায়।

(৩) তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় বলিয়া পণ্যমূল্য স্থির থাকে।

(৪) ইহাতে ব্যবস্থাপনা ও গবেষণাকার্যে ব্যয় সংকোচ সম্ভব হয়।

(৫) জোটের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) বাণিজ্য-চক্রের ফলে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হইলে এইরূপ জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(৭) প্রাথমিকভাবে মূল্য স্থির রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হইলে পরবর্তীকালে এইপ্রকার জোটে একচেটিয়া শক্তি অর্জিত হয় বলিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

(৮) ইহার গঠন সহজসাধ্য।

(৯) ইহাতে প্রতিষ্ঠানগুলির পৃথক সত্তা বজায় থাকে।

(১০) প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হওয়ায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব হয় এবং ইহাতে বৃহদাকার কারবারের আভ্যন্তরীণ সুবিধা ভোগ করা যায়।

(১১) এইপ্রকার জোট বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া কাঁচামালপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ভোগ করে।

অসুবিধা (Disadvantages) : এই প্রকার জোটে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) কাঁচামালের যোগানের চুক্তি না থাকায়, কাঁচামাল সংগ্রহে কিছু অসুবিধা হইতে পারে।

(২) কোন শিল্পের অধীনস্থ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এইপ্রকার জোটে অংশগ্রহণ না করিলে বিক্রয়-ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(৩) ইহাতে একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠে বলিয়া কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি হয় এবং ক্রেতা ও শ্রমিক শোষিত হয়।

(৪) এইরূপ জোট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেআইনী কার্যকলাপ করে এবং সরকারের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে।

(৫) উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ইহাকে প্রচুর কাঁচামাল মজুত রাখিতে হয়। ইহার ফলে কার্যকরী মূলধন আবদ্ধ থাকে।

বৃত্তাকার জোট (Circular Combination) **:** প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিহীন ভিত্তির উপর জোট সৃষ্টি হইলে উহাকে বৃত্তাকার জোট বলে। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রথমে ছোট আকারে সমশিল্পের ভিত্তিতে গঠিত হইয়া কালক্রমে সম্প্রসারণের সুযোগ পাইয়া উত্তরোত্তর বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন শিল্পের ভিত্তিতে রূপায়িত হইলে তাহাকে বৃত্তাকার জোট বলে। উদাহরণ, কানপুরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের পরিচালনায় কতিপয় কার্পাসবস্ত্র, পশমবস্ত্র, চর্মদ্রব্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া বৃত্তাকার জোট সৃষ্টি করিয়াছে।

পার্শ্বিক জোট (Lateral Combination) **:** যখন একটি প্রতিষ্ঠান তাহার প্রধান কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন জাতীয় কার্যে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত জোটবদ্ধ হয়, তখন উহাদের পার্শ্বিক জোট বলে। উদাহরণ: রেল ও স্টীমার কোম্পানীর সংযুক্তিকরণ।

আঞ্চলিক জোট (Territorial Combination) **:** একই পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা বাজারে আধিপত্য বিস্তার ও পরিবহণ-ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে একত্রিত হইলে আঞ্চলিক জোট সৃষ্টি হয়। উদাহরণ: দিল্লী ক্লথ মিলস্, বাটা সু কোম্পানী ইত্যাদি।

ব্যবসায়ী সমিতি (Trade Association) **:** শ্রমিক ও জন-সম্পর্ক, শিল্প-নীতি বিপণন-ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপনের পদ্ধতি, ঋণ ও কমিশন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ স্বার্থরক্ষার জন্য একই কারবারে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়ী সমিতি বা জোট সৃষ্টি করে। উদাহরণ: ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এ্যাসোসিয়েশন।

বণিকসভা (Chamber of Commerce) **:** আঞ্চলিক কারবারী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে স্বার্থের জোটবদ্ধ হইলে তাহাকে বণিকসভা বলে। ইহারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত হয় ও কেন্দ্রীয় বণিকসভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। উদাহরণ: বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ। ভারতের প্রথম বণিকসভা ক্যালকাটা চেম্বার অফ্ কমার্স ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের দ্বারা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে যথাক্রমে বোম্বাই চেম্বার অফ্ কমার্স এবং মাদ্রাজ চেম্বার অফ্ কমার্স গঠন করে।

কার্যাবলী (Functions) : ইহাদের প্রধান প্রধান কার্যাবলী হইল :

(১) সদস্যগণের স্বার্থ রক্ষা করা।

(২) গবেষণা, বাজার সমীক্ষা করা ইত্যাদি।

(৩) কারিগরি, ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ও আইন-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান।

(৪) তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করা।

(৫) সালিশির মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি করা।

(৬) রপ্তানি বাণিজ্যে প্রভবলেখ (Certificate of Origin) প্রদান করা, ইত্যাদি।

শ্রমিক সংঘ (Trade Union) : কোন একটি কারবারের শ্রমিকগণ যখন নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে সমিতিবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে শ্রমিক সংঘ বলে। ইহা "শ্রমিক সংঘ আইন" দ্বারা নিবন্ধিত হয় এবং এই আইনে প্রদত্ত সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করে। এইরূপ সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ ঐচ্ছিক। ইহা সাধারণ সমিতিবদ্ধ কারবার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC), সেণ্টার অফ্ ট্রেড ইউনিয়নস্ (CITU), হিন্দ্ মজদুর সভা (HMS), অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) ইত্যাদি।

কার্যাবলী (Functions) : ইহার প্রধান প্রধান কার্যাবলী হইল :

(১) চাকরির নিরাপত্তা রক্ষা করা।

(২) মজুরী বৃদ্ধি করা।

(৩) শ্রমিকগণের চাকরি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করা, ইত্যাদি।

ভদ্রলোকের চুক্তি বা অলিখিত চুক্তি (Gentleman's Agreement) : সাধারণতঃ মৌখিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন কারবারের সাধারণ শর্ত ও নীতি যেমন, মোড়ক-পদ্ধতি, বাট্টা প্রদান, দস্তুরি প্রদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বোঝাপড়ার মাধ্যমে জোট সৃষ্টি হইলে, উহাকে ভদ্রলোকের চুক্তি বলে। এইরূপ জোট উৎপাদন বা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয় না। ইহা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু চুক্তিভঙ্গ করিলে আইনতঃ কিছু করিবার নাই। ইহার অস্তিত্ব ভঙ্গুর ও স্বল্পস্থায়ী।

কার্টেল (Cartel) : বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য এবং পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সমশিল্পে নিযুক্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি বিক্রয়-সংস্থা স্থাপন করিলে যে জোট সৃষ্টি হয়, উহাকে কার্টেল বলে। জার্মানীতে কার্টেলের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। **জার্মানী কার্টেলের জন্মভূমি।** উদাহরণ : সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া। মূল্য-ভিত্তিক, উৎপাদন-ভিত্তিক, বাজার-ভিত্তিক ইত্যাদি নানাপ্রকারের কার্টেল হইতে পারে।

বৈশিষ্ট্য (Features) : ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) কার্টেলে সদস্যদের নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় থাকে।

(২) বিক্রয়-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কার্টেল তৈয়ারী হয়।

(৩) ইহা পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহার গঠন ব্যয়-সাপেক্ষ নহে।

(২) ইহাতে সদস্য-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

(৩) ইহাতে চাহিদার পরিবর্তনের সহিত যোগানের সামঞ্জস্য স্থির করা যায়।

(৪) ইহাতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের যোগদানের সুযোগ থাকে।

(৫) ইহাতে একচেটিয়া মুনাফা আয় করা যায়।

(৬) ইহাতে বিপণন-ব্যবস্থায় ব্যয়-সংকোচ হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) ইহার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম, কারণ ইহা স্বেচ্ছামূলক জোট।

(২) ইহা একচেটিয়া মুনাফা করে বলিয়া পণ্যমূল্য অধিক হয় ও ক্রেতা শোষিত হয়।

(৩) ইহাতে কারবারের সম্প্রসারণ হয় না বলিয়া আয়তন বৃদ্ধি-জনিত ব্যয়-সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় না।

পুল (Pool) : ইহা কার্টেলের নামান্তর মাত্র। জার্মানীতে যাহা কার্টেল, আমেরিকায় তাহা পুল নামে পরিচিত। সমাজবিরোধী কার্য-কলাপের জন্য ইহা আমেরিকায় বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যৌথ বিক্রয়-সংস্থা-সম্বলিত কার্টেল ছাড়া পুল অন্যান্য কার্টেলের মতই। উৎপাদন, মুনাফা, বাজারদর ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন কিছু প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়, তখন তাহাকে পুল বলে। উৎপাদন-ভিত্তিক, বাজার-ভিত্তিক, আয়-ভিত্তিক, মুনাফা-ভিত্তিক, পেটেন্ট-ভিত্তিক, মিশ্র-ভিত্তিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পুল দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ : ভারতের তৈল শোধনের কোম্পানী বার্মাশেল, রয়েল ডাচ্ শেল ও ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোলিয়াম-এর মধ্যে জোট পুলের বিশিষ্ট উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য (Features) :

(১) ইহা ঐচ্ছিক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত জোট।

(২) ইহার গঠনে আইনের বাধ্যবাধকতা নাই।

(৩) ইহাতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের পৃথক সত্তা বজায় থাকে।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহার গঠন-প্রণালী সহজ।

(২) স্বল্পব্যয়ে এইরূপ জোট গঠন করা যায়

(৩) ইহাতে জোটবদ্ধ সংস্থাসমূহের পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

(৪) ইহাতে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা পাওয়া যায়, কারণ এই প্রকার জোটে উৎপাদন ও পরিবহণ-ব্যয় কম পড়ে।

(৫) ইহাতে প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

(৬) ইহাতে পণ্যের বিক্রয়মূল্য স্থির রাখা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) ইহাতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয় ও জনস্বার্থ ব্যাহত হয়।

(২) ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন সংকোচন করা হয়।

(৩) প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়ই চুক্তিভঙ্গ করে।

(৪) ইহা ক্ষণস্থায়ী জোট।

ট্রাস্ট (Trust) : ট্রাস্টের জন্মভূমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কয়েকটি যৌথ মূলধনী সংস্থার শেয়ার-হোল্ডারগণ যদি উহাদের পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট সার্টিফিকেটের পরিবর্তে তাহাদের শেয়ার কোন অছি (Trust) প্রতিষ্ঠানের হস্তে সমর্পণ করে, তবে তাহা দ্বারা যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহের অছি হিসাবে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহাকে ট্রাস্ট বলে। ভোটিং ট্রাস্ট, শেয়ার ট্রাস্ট, কারবারী ট্রাস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ট্রাস্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য (**Features**) :

(১) ইহাতে কোম্পানীসমূহের সত্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। কেন্দ্র পরিচালনার ভার অছি পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়।

(২) শেয়ার-হোল্ডারদের মালিকানা ও লভ্যাংশের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়।

সুবিধা (**Advantages**) :

(১) ইহা দীর্ঘস্থায়ী জোট।

(২) একত্রীকরণের ফলে ইহাতে প্রভূত মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

(৩) উৎপাদনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় ইহাতে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়।

(৪) এইরূপ জোটে পণ্যের মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(৫) ইহাতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় ও বণ্টনের সুবিধা ভোগ করা যায়।

(৬) ইহা লোকসানজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবসান ঘটাইয়া এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ যুক্ত করিয়া কাম্য-আয়তন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে।

অসুবিধা (**Disadvantages**) :

(১) ইহার গঠন ব্যয়সাধ্য ও জটিল।

(২) ইহা পরিবর্তনশীল নহে—অনমনীয়।

(৩) ইহাতে জনস্বার্থ-বিরোধী একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয়।

(৪) ইহাতে সংগৃহীত অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্ট বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর হোল্ডিং কোম্পানীর সৃষ্টি হয়। একটি কোম্পানী অন্য এক বা একাধিক কোম্পানীর অধিকাংশ অন্ততঃ ৫১% বা সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া

উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিলে যে জোট গঠিত হয়, তাহাকে হোল্ডিং কোম্পানী বলে। মূল, মধ্যবর্তী, মিশ্র, বিশুদ্ধ, আদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হোল্ডিং কোম্পানী হইতে পারে।

বৈশিষ্ট্য (**Features**):

(১) অধীনস্থ কোম্পানীর (Subsidiary) মোট শেয়ারের অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগের অধিক ইহাকে অধিকার করিতে হইবে।

(২) ইহাতে অধীনস্থ কোম্পানীর সত্তা বজায় থাকে।

সুবিধা (**Advantages**):

(১) ইহা স্বল্পব্যয়ে ও সহজে গঠন করা যায়।

(২) কেন্দ্রীভূত পরিচালন-ব্যবস্থায় অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের পরিচালনায় সুষ্ঠুতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পায়।

(৩) ইহাতে অধীনস্থ কোম্পানীর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

(৪) ইহা অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের ঝুঁকির ভার ছড়াইয়া দিতে পারে এবং নিজ সুনাম (Goodwill) বজায় রাখিতে পারে।

(৫) ইহা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**):

(১) হোল্ডিং কোম্পানী স্বল্প অর্থ বিনিময় করিয়া অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

(২) ইহাতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত সম্পদ জমা হয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় ও একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়।

(৩) ইহাতে অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের স্বার্থ সর্বদা রক্ষিত হয় না।

(৪) অধীনস্থ লাভজনক কোম্পানী হইতে দুর্বল কোম্পানীতে অর্থ স্থানান্তরকরণের ফলে লাভজনক কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাও দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

(৫) হোল্ডিং কোম্পানী অনেক সময় অধীনস্থ কোম্পানীর হিসাবে কারচুপি করে।

সম-স্বার্থগোষ্ঠী (Community of Interest): একদল সঙ্ঘবদ্ধ বিনিয়োগকারী, যাহাদের বিভিন্ন কোম্পানীতে শেয়ার আছে, তাহারা যখন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে সম-স্বার্থগোষ্ঠী জোট বলে।

ইহা **তিন প্রকারের: (ক) পরস্পর সংযবদ্ধ পরিচালকবর্গ** (Interlocking Directorate), **(খ) নির্বাহিক সংহতি** (Managerial Integration) এবং **(গ) আর্থিক সংহতি** (Financial Integration)।

সুবিধা (**Advantages**):

(১) এই প্রকার জোটে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একই প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা যায়।

(২) ইহাতে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আর্থিক সংহতি স্থাপিত হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) এইরূপ জোট ক্ষণস্থায়ী।

(২) ইহাতে স্বল্প-স্বত্ব কোম্পানীসমূহ অধিক-স্বত্ব কোম্পানীর দ্বারা শোষিত হয়।

(৩) ইহা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না

একত্রীকরণ (Amalgamation) **:** কয়েকটি চলতি কারবারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি নূতন কারবার গঠন করিলে উহাকে একত্রীকরণ বলে। এইরূপ জোটে যোগদানকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তাহাদের পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের একত্রীকরণে একটি বৃহৎ নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। উদাহরণ: ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের ৪টি ব্যাঙ্ক একত্রীকরণের ফলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি হয়।

অন্তর্ভুক্তি (Merger) **:** একটি বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে যে জোটের সৃষ্টি হয় তাহাকে অন্তর্ভুক্তি বলে। ইহাতে বড় প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বজায় থাকে কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। উদাহরণ: ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানীর সহিত স্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল-এর অন্তর্ভুক্তি।

টীকা Notes

সাধারণ সমিতি Simple Association :

যখন কিছু সংখ্যক প্রতিযোগী সংস্থা পণ্যের উৎপাদন বাজার দাম, মুনাফা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য লিখিত বা অলিখিতভাবে জোটবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে সাধারণ সমিতিবদ্ধতা বা সাধারণ সমিতি বলে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ স্বর্ণকার সমিতি

অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি (Informal Agreement) :

যখন কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করে যে, কারবারের কোন কোন বিষয়ে তাহারা একই নীতি ও আচার-আচরণ মানিয়া চলিবে তখন তাহাকে অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা স্বেচ্ছামূলক। ইহাতে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না ও সদস্যদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। যেমন পেট্রোল বিক্রয় কোম্পানীগুলির জোট

উৎপাদন সংঘ (Output Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। এই প্রকার জোটে সংঘ প্রত্যেক সদস্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল অতি-উৎপাদন বন্ধ করা।

বাজার সংঘ (Market Pool or Territorial Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। এই প্রকার জোটে সংঘ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা বাজার স্থির করিয়া দেয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল বাজার নিয়ন্ত্রণ করা।

মুনাফা সংঘ (Profit Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। ইহাতে সংঘ পণ্যের নিম্নতম মূল্য স্থির করিয়া দেয় এবং ইহার বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রীত হইলে অতিরিক্ত মুনাফা জমা দিতে হয়। ইহার অতিরিক্ত মোট মুনাফা পরে উৎপাদনের অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে সংঘ বণ্টন করে।

আয় সংঘ (Income Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। ইহাতে সদস্যগণ তাহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ সংঘে জমা দেয় এবং সংঘ পরে উক্ত অর্থ হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়া যে নীট আয় হয় তাহা সদস্যগণকে উৎপাদন-অনুপাত অনুসারে বণ্টন করে।

অর্থ সংঘ (Money Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। ইহাতে সংঘ ফরমাশ সংগ্রহ করে, সর্বনিম্ন পণ্যমূল্য স্থির করে, সদস্যদের মধ্যে ফরমাশ বণ্টন করে এবং সদস্যগণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য অর্থাৎ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সংঘে জমা দেয়। পরে সংঘ উহা পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে।

যাত্রী সম্পর্কীয় সংঘ (Traffic Pool) :

এইরূপ সংঘ 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। ইহাতে পরিবহণ সংস্থাগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করিবার জন্য পরিবহণের রুট বা যাত্রাপথগুলি সংঘের সদস্যগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং মাশুল বা ভাড়া কি হইবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

উৎপাদী স্বত্ব বা পেটেণ্ট সংঘ (Patent Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। ইহাতে সংঘের সদস্যগণ নিজেদের উৎপাদী স্বত্বের বা পেটেন্টের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিবার চুক্তি করে।

মিশ্র সংঘ (Mixed Pool) :

ইহা 'পুল' (Pool) বা উৎপাদক সংঘের একটি শ্রেণী। যখন একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গঠিত হয় তখন তাহাকে মিশ্র সংঘ বলে। ইহা উৎপাদন, বাজার, মূল্য ইত্যাদি একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্ত কার্টেল (Condition Cartel) :

ইহাতে পণ্য বিক্রয়ে নানারূপ শর্ত যেমন, বাট্টার হার, ধারে বিক্রয়ের মিয়াদ, বণ্টন পদ্ধতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সদস্যগণকে বিক্রয়ের সময় এই শর্তগুলি মানিতে হয়।

উৎকর্ষ কার্টেল (Quality Cartel) :

ইহাতে পণ্যের গুণগত মান ও অন্যান্য বিভিন্ন নির্ধারিত মান অনুসারে মূল্য স্থির করা হয়। সদস্যগণকে উক্ত মান ও বিক্রয়মূল্য বজায় রাখিতে হয়।

উৎপাদন কার্টেল (Output Cartel) :

এইরূপ সংঘে মোট উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া সদস্যগণ কে কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

বাজার কার্টেল (Market Cartel) :

ইহাকে আঞ্চলিক কার্টেলও বলে। ইহাতে সংঘ এক একটি বাজারে এক একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের অধিকার দেয়।

ট্রাফিক সিণ্ডিকেট (Traffic Syndicate) :

ইহাতে পরিবহণের বিভিন্ন রুট বা যাত্রাপথ সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং মাশুল বা ভাড়া স্থির করিয়া দেওয়া হয়

বিক্রয় সিণ্ডিকেট (Selling Syndicate) :

ইহাতে সদস্যগণ একটি নির্দিষ্ট মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য কেন্দ্রীয় বিক্রয় সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করে এবং কেন্দ্রীয় সিণ্ডিকেট উহা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিয়া মুনাফা করে। এই মুনাফা পরে সদস্যগণের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে বণ্টন করা হয়

কারবারী চক্র (Business Ring or Corner) :

ইহা একটি সাময়িক জোট এই জোটে কিছু সংখ্যক কারবারী একত্রিত হইয়া কোন পণ্যের যোগানকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে ও বাজারে যোগান হ্রাস করিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে।

পরস্পর-সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী (Inter-locking Directorates) :

যখন কিছু শক্তিশালী নেতৃস্থানীয় পরিচালক অনেকগুলি কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে থাকে, তখন পরস্পর-সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। যেমন টাটা ও বিড়লার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগোষ্ঠী।

পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোটের পার্থক্য (Difference between Vertical and Horizontal Combination) :

পূর্বাপর জোট	সমান্তরাল জোট
১। ইহা একই পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ে ঘটে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জোট।	১। ইহা একই পণ্য উৎপাদন ও সেবারত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট বন্ধনের ফলে সৃষ্টি হয়।

পূর্বাপর জোট	সমান্তরাল জোট
২। ইহাতে সদস্যগণের মধ্যে মূল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য চুক্তি হয়।	২। ইহা দ্রব্যের যোগান ও বাজার দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।
৩। ইহাতে উৎপাদন-সংক্রান্ত সুবিধা পাওয়া যায়।	৩। ইহাতে বণ্টন-সংক্রান্ত সুবিধা পাওয়া যায়।
৪। ইহাতে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর একই মালিকানায় থাকে।	৪। ইহাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরা পৃথক পৃথকভাবে উৎপাদন কার্য চালায়।
৫। ইহাতে কাঁচামাল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বজায় থাকে।	৫। ইহাতে কাঁচামাল প্রাপ্তির অসুবিধা ঘটিতে পারে।
৬। ইহাতে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় ও উৎপাদন ব্যয় স্থির রাখা যায়।	৬। ইহাতে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নাও হইতে পারে এবং উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হইতে পারে।
৭। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি পর্যায় বা স্তরভুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।	৭। পর্যায়ভুক্ত উৎপাদন ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য কারবারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

ট্রাস্ট ও কার্টেলের পার্থক্য (Difference between Trust and Cartel)

ট্রাস্ট	কার্টেল
১। ইহা একটি সুসংহত, দৃঢ় এবং পর্ণাঙ্গ জোট।	১। ইহা অসংহত ও শিথিলবদ্ধ জোট।
২। ইহা দীর্ঘস্থায়ী জোট।	২। ইহা স্বল্পস্থায়ী জোট।
৩। ইহার গঠন জটিল ও ব্যয়সাধ্য।	৩। ইহার গঠন সহজসাধ্য ও ব্যয়বহুল নহে।
৪। ইহা অনমনীয় (Inflexible) জোট।	৪। ইহা নমনীয় (Flexible) জোট।
৫। ইহা একচেটিয়া কারবার গড়িয়া তুলিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।	৫। ইহা বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া সর্বাধিক মুনাফার চেষ্টা করে।
৬। ইহাতে অদক্ষ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া কাম্য আয়তন আনা সম্ভব।	৬। ইহাতে অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় থাকে।
৭। ইহা উৎপাদনের ও বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে।	৭। ইহা শুধু বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে।
৮। এইরূপ জোট দৃঢ় ও স্থায়ী হয় বলিয়া ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা শক্ত।	৮। ইহা হইতে যে কোন সময় বাহির হইয়া আসা যায়।

ট্রাস্ট	কার্টেল
৯। ইহার আয়তন খুব বৃহৎ হয় না।	৯। ইহার আয়তন খুব বড় হয়।
১০। ইহাতে পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয়।	১০। ইহাতে পরিচালনা বিকেন্দ্রীভূত থাকে।
১১। ইহা কেবলমাত্র যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।	১১। সকল প্রকার সংস্থাই কার্টেল গঠন করিতে পারে।

ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর পার্থক্য (Difference between Trust and Holding Company) :

ট্রাস্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
১। যখন কয়েকটি কোম্পানী তাহাদের শেয়ার একটি অছি পরিষদের নিকট সমর্পণ করে, তখন ট্রাস্টের উদ্ভব হয়।	১। একটি কোম্পানী যখন অপর একটি বা একাধিক কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার (অন্ততঃ ৫১%) ক্রয় করে, তখন হোল্ডিং কোম্পানীর সৃষ্টি হয়।
২। ইহার গঠনে সকল শেয়ার-হোল্ডারগণের সম্মতি প্রয়োজন।	২। ইহার গঠনে শেয়ার-হোল্ডারগণের সম্মতির প্রয়োজন হয় না।
৩। ইহার গঠন জটিল ও ব্যয়সাধ্য।	৩। ইহার গঠন ব্যয়সাধ্য নহে।
৪। ইহার পরিচালনার ভার বোর্ড অফ্ ট্রাস্টির হাতে ন্যস্ত থাকে।	৪। ইহার পরিচালনা বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্ বা পরিচালকমণ্ডলীর হাতে থাকে।
৫। ট্রাস্ট নিজে মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত হয় না।	৫। ইহা একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান।
৬। ইহা চুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করে।	৬। ইহা মালিকানার ভিত্তিতে অধীনস্থ কোম্পানীগুলির উপর কর্তৃত্ব করে।
৭। ইহা একটি নূতন প্রতিষ্ঠান।	৭। হোল্ডিং কোম্পানী নূতন অথবা চলতি কারবার হইতে পারে।

কার্টেল ও একত্রীকরণের পার্থক্য (Difference between Cartel and Amalgamation) :

কার্টেল	একত্রীকরণ
১। ইহাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।	১। ইহাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়।
২। সাধারণতঃ মন্দার সময়ে ইহা গঠিত হয়।	২। যে কোন সময় একত্রীকরণ হইতে পারে।

কার্টেল	একত্রীকরণ
৩। প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া উচ্চ বিক্রয়মূল্য পাইবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হয়।	৩। ব্যয় সংকোচ করিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা ও প্রতিযোগিতা কমাইবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হয়।
৪। এইরূপ জোটের ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী।	৪। ইহার পরিধি সীমিত।
৫। ইহার স্থায়িত্ব স্বল্প।	৫। ইহা দীর্ঘস্থায়ী ও চিরন্তন হয়।
৬। কার্টেলের কার্যকলাপ জনস্বার্থ-বিরোধী হয়।	৬। ইহা জনস্বার্থের পরিপন্থী নাও হইতে পারে।
৭। জার্মানীতে কার্টেলের জন্ম। কার্টেলের জনপ্রিয়তার পিছনে সরকারের সহযোগিতা ছিল।	৭। আমেরিকায় কঠোর নিয়ন্ত্রণে ইহার জন্ম।
৮। উদাহরণ: স্টীল কার্টেল অফ্ জার্মানী।	৮। উদাহরণ: ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া।

কার্টেল ও পুলের পার্থক্য (Difference between Cartel and Pool):

কার্টেল	পুল
১। জার্মানীতে ও ইউরোপীয় দেশে কার্টেল (Kartell or Cartel) কথাটি ব্যবহৃত হয়।	১। আমেরিকায় পুল বা একার্থ সংঘ কথাটি ব্যবহৃত হয়।
২। একই কারবারে নিযুক্ত কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া যখন বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয় তখন তাহা কার্টেল নামে পরিচিত হয়।	২। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া মুনাফা অর্জনের জন্য সমজাতীয় পণ্য উৎপাদকগণ পুল গঠন করে।
৩। ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয়।	৩। ইহা কার্টেল অপেক্ষা স্বল্পস্থায়ী।
৪। ইহা সাধারণতঃ উৎপাদনের পরিমাণ, বাজার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।	৪। ইহা প্রধানতঃ পণ্য মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিবার জন্য গঠিত হয়।
৫। কার্টেল হইল একটি সাধারণ বিক্রয় সংস্থা।	৫। ইহা সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়া পণ্য মূল্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।
৬। ইহার বাঁধন শক্ত।	৬। ইহার বাঁধন শিথিল।

কার্টেল	পুল
৭। ইহা কারবারকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে।	৭। ইহা সীমিত পর্যায়ে থাকে।
৮। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয় সংকোচ ঘটে না।	৮। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয় সংকোচ ঘটে।

একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তির পার্থক্য (Difference between Amalgamation and Merger) :

একত্রীকরণ	অন্তর্ভুক্তি
ইহাতে যোগদানকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।	১। ইহাতে একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং যে প্রতিষ্ঠানটি অপরকে গ্রাস করে তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকে।
২। ইহাতে যোগদানকারী সকল কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।	২। কেবল অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।
৩। ইহার গঠনে প্রত্যেক সংস্থার মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন	৩। ইহার গঠনে কোন সংস্থার উদ্যোগ প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্পে কারবারী জোটবন্ধনের প্রসার (Combination Movement in Indian Industries) :

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে কারবারী জোট শক্তিশালী। ভারতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জোটবন্ধন শুরু হয়। অনুন্নত শিল্পাবস্থা, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবস্থিতি, কারবারের ক্ষুদ্র আয়তন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান, কারবারিগণের সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভারতে জোটবন্ধনে বিলম্বের কারণ। তিরিশ-এর দশক হইতে ভারতে জোটবন্ধনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতে বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধরনের জোট গঠনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হইল :

(১) **সরল সমিতি ও বণিকসভা (Simple Association and Chamber of Commerce) :** কারবারিগণ নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার্থে সরল কারবারী সমিতি গঠন করে। 'ভদ্রলোকের চুক্তি' (Gentlemen's Agreement)-র ভিত্তিতে এইরূপ সমিতি নিজেদের মধ্যে সাধারণ বিষয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে জোট গঠন করে। মোড়কজাত-করণ, রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি হয়। এইরূপ চুক্তি ঐচ্ছিক—বাধ্যতামূলক নহে। ইহাতে কারবারিগণ ইচ্ছামত চুক্তিভুক্ত ও চুক্তি-বহির্ভূত হইতে পারে। উদাহরণ—ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি।

বণিকসভা হইল কারবারীদের সঙ্ঘ। কোন অঞ্চলের ব্যবসায়ী, দালাল, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, শিল্পপতিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে (voluntary) নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার্থে এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের উন্নতিতে বণিকসভা গঠন করে। ইহারা ব্যবস্থাপনাগত, আইনগত ইত্যাদি বিষয়ে বণিকসভার সভ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকে উদাহরণ—বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ, ফেডারেশন অফ্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কারবারিগণ কলিকাতায় প্রথম ক্যালকাটা চেম্বার অফ্ কমার্স এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ক্রমে বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্স এবং মাদ্রাজ চেম্বার অফ কমার্স গঠন করে।

(২) পুল ও কার্টেল (Pool and Cartel) ঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন পুল অথবা কার্টেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পাট-শিল্পের ৯০ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১টি বৃহৎ সিমেন্ট কোম্পানী একত্রীকরণের মাধ্যমে এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী (ACC) গঠন করে এবং ডালমিয়া গোষ্ঠীর সহিত একত্রে ইহা ভারতের সিমেন্ট উৎপাদনের প্রায় [illegible] শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী পুলের দৃষ্টান্ত। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে সিমেন্ট কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া গঠিত হইয়াছে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চিনি-শিল্পে [illegible] বিক্রয় সংস্থা হিসাবে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯[illegible] খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও ইউ. পি. চিনি মিল মজদুর ফেডারেশনের সভাপতি ডঃ শিবনলাল সাক্সেনা ভারতীয় পার্লামেন্টে সুগার সিণ্ডিকেটের জনস্বার্থ-বিরোধী কার্য-কলাপ তুলিয়া ধরিলে ভারত সরকার ইহার অবলুপ্তি ঘটান এবং ইহার পর ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েশন কার্টেল হিসাবে গঠিত হয়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাগজ-শিল্পে ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন কার্টেল হিসাবে গঠিত হয়। ইহা কাগজ উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। অধুনা ভারত সরকার হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন।

তৈল শোধনকারী কোম্পানী বার্মা শেল ও রয়্যাল ডাচ্ শেল এবং ইণ্ডো-বার্মা পেট্রলিয়াম কোম্পানীর মধ্যে পুলের আকারে জোট বন্ধন হয়। এই জোটে সম্মতি জানায় আমেরিকান তৈল কোম্পানী ক্যালটেক্স ও এসো (Esso) কোম্পানী। এই পুল অনুসারে ভারতের সর্বত্র একই মূল্যে পেট্রোল বিক্রয় করিবার চুক্তি হয়। অধুনা ভারত সরকার হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম সংস্থা গঠন করিয়াছেন।

জাহাজী ব্যবসায়েও পুল গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে শিপিং কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী (WIMCO) দিয়াশলাই-শিল্পে জোটবন্ধনের দৃষ্টান্ত।

(৩) ট্রাস্ট (Trust) ঃ টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, করমচাঁদ থাপা, সিংহানিয়া ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ ট্রাস্ট গঠন করিয়াছে। উদাহরণ—ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া, ইনভেস্টা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ইত্যাদি।

(৪) **হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) :** চা, পাট, কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পে হোল্ডিং কোম্পানী দেখা যায়। উদাহরণ—স্টীল অথরিটি অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

(৫) **একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তি (Amalgamation and Merger) :** এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী, বাকিংহাম কর্ণাটিক মিলস্, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি একত্রীকরণের দৃষ্টান্ত।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নির্দেশানুক্রমে স্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল (SCOB), ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী (IISCO)-র অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে ইহাকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে।

(৬) **যৌথ প্রয়াস প্রতিষ্ঠান (Joint Enterprises) :** বর্তমানে ভারতে দেশীয় ও বিদেশীয় কারবারের জোট গঠনের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। মোটরগাড়ী শিল্পে হিন্দুস্থান মোটরস্ বিড়লা ও নুফিল্ড ব্রাদার্সের যৌথ প্রয়াসে গঠিত হইয়াছে। প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্, অশোক লেল্যাণ্ড, টাটা মার্সিডিজ বেনজ্ ইত্যাদিও যৌথ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়া টাটা ও ভলকার্ট ব্রাদার্সের যৌথ উদ্যোগে ভলটাস লি গঠিত হইয়াছে। হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস কোম্পানী, সেন-র‍্যালে, ব্যাবকক ভিকার্স, ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস্, দুর্গাপুর, রাউরকেলা, ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত প্রকল্প, ন্যাশনাল রেয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি যৌথ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত।

সংহতি বা সংযুক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানী (Integration and Multinational Companies) :

কারবারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধিকে সংযুক্তি বলে। সংযুক্তি বিভিন্নভাবে হইতে পারে, যেমন, (১) আভ্যন্তরীণ সংযুক্তি (২) বাহ্যিক সংযুক্তি (৩) আন্তর্জাতিক সংযুক্তি ও (৪) বহুজাতিক সংযুক্তি।

আভ্যন্তরীণ সংযুক্তি (Internal Integration) : কোন একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান যখন নিজেই উপাদান বৃদ্ধি ও সংযুক্তি করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে তখন তাহাকে আভ্যন্তরীণ সংযুক্তি বলে। অন্তর্ভুক্তির দ্বারা ইহা সম্ভব। শ্রম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপাদানের সংযোজন, কেন্দ্রীকরণ ও ব্যয় সংকোচের ফলে ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহা বৃত্তাকার জোটের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

বাহ্যিক সংযুক্তি (External Integration) : যখন সমগোত্রীয় অথবা ভিন্নগোত্রীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখিয়া একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে, তখন তাহাকে বাহ্যিক সংযুক্তি বলে। ইহা কেন্দ্রীকরণ, জোটবন্ধন ও সংহতির ফলে হইতে পারে এবং বিভিন্ন জোটের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, ট্রাস্ট, কার্টেল, হোল্ডিং কোম্পানী ইত্যাদি। উৎপাদন ও বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হয়।

জাতীয় সংযুক্তি (National Integration) : যে সকল জোটবদ্ধ কারবারের কার্যকলাপ কোন একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহাকে জাতীয় সংযুক্তি বলে। ইহা যে কোন প্রকার জোটের দ্বারা সম্ভব, যেমন, সমিতি, ট্রাস্ট কার্টেল, হোল্ডিং, কোম্পানী একত্রীকরণ ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সংযুক্তি (International Integration) : যে সকল জোটবদ্ধ কারবার শুধু দেশের অভ্যন্তরে কার্যকলাপ করে না, যাহাদের কার্যকলাপ বিদেশেও প্রসারিত তাহাদের আন্তর্জাতিক সংযুক্তি বলা হয়। যে কোন প্রকার জোট যেমন, ট্রাস্ট, কার্টেল, হোল্ডিং কোম্পানী ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযুক্তি সম্ভব। সরকারী প্রচেষ্টায় এইরূপ সংযুক্তি ঘটে যেমন, ভারতের হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড। ইহার অন্তর্ভুক্ত রাউরকেলা স্টীল প্রকল্প ক্রুগ ডেমাগ অফ জার্মানীর সহিত সংযুক্তির ফলে, দুর্গাপুর স্টীল প্রকল্প বৃটেনের ইস্কনের সহিত সংযুক্তির ফলে এবং ভিলাই স্টীল প্রকল্প সোভিয়েত সরকারের সহিত সংযুক্তির ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আন্তর্জাতিক শিল্পদৈত্য বা বহুজাতিক কোম্পানী (International Giants or Multinational Corporations) : কোন একটি দেশের একটি কারবারী সংস্থা যখন বিভিন্ন দেশে তাহার কার্যকলাপ প্রসারিত করিয়া সেই দেশের কারবারী ক্ষেত্রের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাহাকে বহুজাতিক কোম্পানী বলে। ইহাদের MNCs-ও বলা হয়। ইহা আন্তর্জাতিক সংযুক্তির ফল। উদাহরণ : রয়াল ডাচ্ শেল, ফিলিপস্, আই সি আই, ডানলপ, ইউনিয়ন কারবাইড, ইউনিলিভার কোকাকোলা আই বি এম, ইত্যাদি ইহারা আন্তর্জাতিক শিল্পদৈত্য।

বৈশিষ্ট্য (**Features**) :

(১) ইহাদের একাধিক দেশে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ভিত্তি থাকে।

(২) ইহারা বিভিন্ন দেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সেই দেশ অথবা সদর কার্যালয় হইতে পরিচালনা-সংক্রান্ত নির্দেশ অর্থ, সংবাদ, কলাকৌশল ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া থাকে।

(৩) উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশে যেমন, ভারত, মেক্সিকো, তাইওয়ান, ব্রেজিল ইত্যাদিতে ইহাদের আগ্রহ বেশী।

(৪) ইহাদের প্রত্যেকের মূলধন ও সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল।

(৫) অন্য দেশের কারবারী সংগঠনের মাধ্যমে সহযোগিতার ভিত্তিতে ইহারা সেই দেশের কারবারে যুক্ত হয়।

(৬) বিভিন্ন দেশে পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বণ্টন, অর্থ সংস্থান ইত্যাদির উপর ইহারা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

(৭) ইহারা নীতি ও কার্যকলাপে কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করে।

(৮) ইহারা পূর্বাপর জোট (Vertical Combination) গড়িয়া তোলে।

(৯) ইহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক।

(১০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে পরিবহণের ও মূলধনের উন্নতিতে ইহারা দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Types of Multinationals) ঃ

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান পাঁচ প্রকার :

(১) **ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান (Colonial Companies) ঃ** ইহারা সামাজিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত। কাঁচামাল আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা গঠিত হয়। যেমন, তৈল উৎপাদন ও শোধনে নিযুক্ত কোম্পানীগুলি।

(২) **সম্পদ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (Resource based Companies) ঃ** সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইহারা গঠিত হয়।

(৩) **জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (Public Utilities Companies) ঃ** ইহারা বিদেশে শক্তি সরবরাহ ও আকাশপথ পরিবহণে যুক্ত থাকে। যেমন, ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (বর্তমানে সি ই এস সি)।

(৪) **যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান (Manufacturing Companies) ঃ** ইহারা বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই দেশের সরকারের নিকট হইতে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পায়।

(৫) **সেবা প্রতিষ্ঠান (Service Companies) :** কলাকৌশল সরবরাহ করাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। যেমন, শেরাটন চেন্ অফ্ হোটেলস্।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলি আবার স্বদেশের কর্তৃত্বাধীন এককেন্দ্রিক কোম্পানী, বিদেশের কর্তৃত্বাধীন বহুকেন্দ্রিক কোম্পানী অথবা বিশ্বের কর্তৃত্বাধীন বিশ্বকেন্দ্রিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হইতে পারে।

সুফল (Merits) ঃ

(১) ইহারা উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সরবরাহ করে ;
(২) ইহারা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ;
(৩) ইহারা বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সুরাহা করে ,
(৪) ইহারা দ্রুত শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করে ,
(৫) শিল্পে স্বয়ম্ভরতা আনয়নে ইহারা সাহায্য করে ;
(৬) ইহারা বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করিয়া বৈদেশিক মূলধন বৃদ্ধি করে ,
(৭) ইহারা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

কুফল (Demerits) ঃ

(১) ইহারা উৎকোচ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি আনে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মার্কিন কোম্পানী ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্পোরেশন (International Telephone and Telegraph Corporation) ল্যাটিন আমেরিকার চিলির প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপতি সালভেডর আলেণ্ডি

(Salvador Allende)-র নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। লক্‌হীড কেলেংকারীতে ঘুষ দিয়া লক্‌হীড কোম্পানী বহু বিমানপোত বিক্রয় করিয়াছিল।

(২) ইহারা ধনবৈষম্য বৃদ্ধি করে।

(৩) ইহারা পরিবেশ দূষিত করে।

(৪) ইহারা শ্রমিক ও জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটায়, যেমন, ভূপালে ইউনিয়ন কারবাইডের গ্যাস লিক ঘটনা।

(৫) ইহাতে দেশীয় অর্থব্যবস্থা পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

(৬) ইহাতে জাতীয় আদর্শ ও স্বার্থ ব্যাহত হয়।

(৭) ইহা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে বাধা দেয়।

(৮) ইহারা নানাভাবে কর ফাঁকি দেয়।

(৯) ইহারা অন্যায় উপায়ে দেশীয় অর্থ বিদেশে স্থানান্তরিত করে।

(১০) ইহারা দেশের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(১১) ইহারা একচেটিয়া কারবার গড়িয়া তোলে।

ভারত ও বহুজাতিক কোম্পানী (India and MNC) :

ভারতে বহুজাতিক কোম্পানীর প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে তাহাদের মূলধনের বিনিয়োগ ছিল মাত্র ২৪৮ কোটি টাকা, বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২,০০০ কোটি টাকায় পৌছাইয়াছে। ভারতের যন্ত্রপাতি শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, ঔষধপত্র, লৌহ, পরিবহণ, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বিস্তার বিশেষভাবে ঘটিয়াছে। ইহাদের উদ্যোগে শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আসিয়াছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ক্রমাগত দেশীয় অর্থ বিদেশে স্থানান্তরিত করিতেছে, দেশের রাজনীতিতে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, উৎকোচ বা ঘুষ প্রদান করিতেছে এবং অন্তরায়মূলক ব্যবস্থা চালাইতেছে। এই সকল দুর্নীতি রোধকল্পে ভারতে মূলধন সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ আইন, একচেটিয়া এবং অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা আইন (MRTP ACT), শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি প্রণীত হইয়াছে। এই সকল আইন মান্য না করায় আমেরিকার কোকাকোলা ও আই বি এম কোম্পানীগুলিকে ভারত হইতে কারবার গুটাইয়া লইতে হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিল্পদৈত্যদের রুখিবার জন্য আন্ডিয়ান চুক্তি (Andean Pact ও জাতিপুঞ্জের ৭৭-গোষ্ঠী (Group of 77) যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

ভারতে শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া এবং অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা নিয়ন্ত্রণ আইন (Control over Industries in India and Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) :

কারবারী জোটে একচেটিয়া কারবার গড়িয়া ওঠে ও কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব হয়। জোট বন্ধনের ফলে ভারতে টাটা, বিড়লা প্রভৃতির মত বৃহৎ একচেটিয়া কারবার গড়িয়া

উঠিয়াছে। ফলে জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন, ক্রেতা ও শ্রমিক শোষণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কারবারীর অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার, শিল্প পরিচালনায় দক্ষতার অভাব ও ত্রুটি, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, ফাটকাবাজীর প্রবণতা ও অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপক প্রসার ঘটিতেছে।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণে ডঃ প্রশান্ত মহলানবীশের পরামর্শে গঠিত মনোপলি অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে MRTP (Monopoly Restrictive and Trade Practices) আইন গঠিত হয়। ইহা কারবারী জোটকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার **উদ্দেশ্যগুলি** হইল :

(১) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের মাত্রা প্রতিহত করা,
(২) একচেটিয়া ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা রোধ করা ;
(৩) উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন ও সুষম বণ্টন যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহা দেখা,
(৪) একচেটিয়া কারবারের ক্ষতিকারক কার্যকলাপের প্রতিবিধান করা,
(৫) একচেটিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করা,
(৬) অবাঞ্ছিত ও কারসাজিমূলক বাণিজ্যিক প্রথা দমন করা।

MRTP আইন উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ধারাগুলি সংযোজন করিয়াছে :

(১) এই আইন প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান (Dominant Undertaking) ও একচেটিয়া বা একচেটিয়ামূলক প্রতিষ্ঠান (Monopolistic Undertaking)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। **প্রভাবশালী** কারবার হইতেছে সেই কারবার যাহা একাকী অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কারবারের সহিত মিলিয়া কোন পণ্য অথবা সেবার উৎপাদন কিংবা বণ্টনের $\frac{1}{3}$ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন একটি বা একাধিক কারবার মিলিতভাবে কোন পণ্যের উৎপাদন অথবা সেবার অন্ততঃ $\frac{1}{2}$ অংশের অধিক নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তাহাকে **একচেটিয়া** কারবার বলা হয়।

(২) এই আইনে কারবার সম্প্রসারণের নিয়ন্ত্রণকল্পে কারবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে : (ক) অন্ততঃ এক কোটি টাকার (সম্প্রতি ৫ কোটি টাকার) পরিসম্পদবিশিষ্ট প্রভাবশালী কারবার ও (খ) অন্ততঃ ২০ কোটি টাকার পরিসম্পদবিশিষ্ট পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠান।

উপরোক্ত দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন একত্রীকরণ, অন্তর্ভুক্তি অথবা অধিগ্রহণের মাধ্যমে যে সম্প্রসারণ হয় উহা নিয়ন্ত্রণ করে এবং উহাদের পরিচালক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) এই আইনের দ্বারা ২০ কোটি টাকার অধিক পরিসম্পদবিশিষ্ট সকল পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন কারবার গঠন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৪) এই আইনে জনস্বার্থের পরিপন্থী সকল প্রকার একচেটিয়া ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা দমন ও নিবারণ করিবার ধারা নিযুক্ত হইয়াছে।

(৫) আইনটি বলবৎ করিবার জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এম আর টি পি সি (MRTPC) নামে একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশন বড় বড় কারবারী যাহাতে তাহাদের ক্ষমতা অপব্যবহার না করে তাহা দেখে।

(৬) এম আর টি পি সি কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য এই আইনের ধারা অনুসারে দুইজন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক নিযুক্ত হইয়াছেন—(ক) **অনুসন্ধান আধিকারিক** (Director of Investigation) ও (খ) **অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথার নিবন্ধক** (Registrar of Restrictive Trade Practices)। অনুসন্ধান আধিকারিক অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথার নিবন্ধন করেন।

(৭) এই আইনে একচেটিয়া ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা বলিতে বুঝায় উৎপাদন ও বণ্টনে কারচুপি করিয়া পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতা রোধ করা, দ্রব্যমানের অবনতি ঘটানো, মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ রুদ্ধ করা ইত্যাদি কার্যকলাপকে। এই সকল প্রথা নিবারণের ক্ষেত্রে কমিশনের নির্বাহিক ক্ষমতা আছে। এই সকল প্রথার বিরুদ্ধে কমিশনের সম্মুখে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়, অনুসন্ধান আধিকারিক উহার উপযুক্ত সমীক্ষা করেন এবং সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক এই সকল প্রথার নিবন্ধনকার্য সম্পাদন করেন।

এম আর টি পি সি আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে সাচার কমিটির (Sachar Committee) সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম অধ্যায় | সংগঠিত বাজার (Organised Market)

বাজারের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী (Definition, Importance and Functions of Market) :

সাধারণভাবে বাজার বলিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়, যে স্থানে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হয় এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। অর্থনীতিতে 'বাজার' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলীর সমষ্টিকে অর্থনীতিতে বাজার বলা হয়। অর্থনীতিতে বাজার বলিতে পণ্যের বাজার বুঝায়; যেমন—গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার ইত্যাদি। অর্থনীতিতে বাজার কোন নির্দিষ্ট স্থান নয়। ইহাতে কোনও দ্রব্যের চাহিদার ও সরবরাহের অবস্থা বুঝায়।

কোন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলা হয়। অর্থনীতিবিদ্ বেন্‌হাম বাজারের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন—"যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে আদান-প্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের দ্রব্যমূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হোক, বা বিস্তৃত হোক, উহাকে বাজার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।"

পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হইতে পারে। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন হইতে পারে।

বাজারের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার গুরুত্ব নির্ভর করে। এই গুরুত্বসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(১) বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তাহাদের অভীষ্ট পূরণ করিতে পারে। ইহা ক্রয়-বিক্রয়ের একটি সংগঠিত ক্ষেত্র।

(২) বাজার দ্রব্যের উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়-জনিত অনিশ্চয়তা দূর করে।

(৩) বাজার পণ্য-সরবরাহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ও ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করে।

(৪) সংগঠিত বাজার পণ্যের মূল্য ও মান বজায় রাখে।

(৫) বাজারে 'আগাম চুক্তি'র দ্বারা ভবিষ্যতে কাঁচামাল ও পণ্য-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

(৬) বাজার যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য আনে।

(৭) বাজার বহু লোকের কর্মসংস্থান করে।

(৮) বাজার পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করিয়া ঝুঁকি বহনে সাহায্য করে।

(৯) বাজার নূতন নূতন চাহিদা সৃষ্টি ও নিরীক্ষণে সাহায্য করে।

(১০) বাজারে আত্মরক্ষামূলক চুক্তির বা রক্ষণের (Hedging) দ্বারা মূল্যের স্থিরতা আসে।

(১১) বাজারে পণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও মান নির্ধারণ করা হয়।

বাজারের কার্যাবলী (Functions of Market) :

১। দ্রব্যের একত্রীকরণ ও পণ্য সমাগম করা ;
২। পণ্যের গুদামজাতকরণ ;
৩। পণ্যের পরিবহণের ব্যবস্থা করা ;
৪। পণ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ;
৫। পণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও মান নির্ণয় করা ;
৬। পণ্যের মোড়কজাতকরণ ;
৭। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বণ্টন করা ;
৮। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া
৯ বীমার সাহায্যে পণ্য বিনষ্ট-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করা ;
১০। গবেষণার সাহায্যে চাহিদা নিরূপণ করা।

কারবারী প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (Firm) :

যে শিল্পীয় প্রতিষ্ঠান দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাকে ফার্ম বলে। আবার যে প্রতিষ্ঠান বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাকেও ফার্ম বলা যায়। অর্থনীতির ভাষায় "যে অর্থনৈতিক ইউনিট বা একক প্রতিষ্ঠান দ্রব্য ও সেবার বাজাবে উৎপাদন ও বিক্রয় করে তাহাকেও ফার্ম বলে।" উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন একক হইল ফার্ম। প্রত্যেকটি ফার্ম উৎপাদন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেমন, কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে, উৎপাদনের উপকরণগুলি কত পরিমাণে নিয়োগ করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে, কাহাদের জন্য উৎপাদন করা হইবে এবং কত পরিমাণ উৎপাদন বাজারে ছাড়া হইবে।

বিভিন্ন প্রকার বাজার (Different classes of Markets) :

(১) স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজার (**Local market, National market and International market**) : একটি নির্দিষ্ট স্থানে ক্রয়-বিক্রয় সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে, যেমন, বোম্বাই বাজার। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ কোন একটি দেশে ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে দেশীয় বাজার বলে, যেমন, ভারতীয় বাজার। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে, যেমন, বিশ্ব বাজার।

(২) তৈরী বাজার, ফটকা বাজার, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজার (**Ready market, Speculative market, Short and Long-term market**) : যখনই ক্রয় সম্পাদিত হয় তখনই পণ্য সমর্পণ করা হইলে তাহাকে তৈরী বাজার বলে। বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইল কিন্তু ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ করা হইলে তাহাকে ফটকা বা ভবিষ্যৎ বাজার বলে। স্বল্প সময়ের বাজার হইলে স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘ সময়ের বাজার হইলে তাহাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

(৩) **সংগঠিত ও অসংগঠিত বাজার (Organised market and Unorganised market) ঃ** যে বাজারের কার্যাবলী বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাকে **সংগঠিত বাজার** এবং যে বাজারের কার্যাবলী কোন আইন বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালিত হয় না তাহাকে **অসংগঠিত বাজার** বলে। যে বাজারে সরকারী নিয়মকানুন বলবৎ থাকে তাহাকে **নিয়ন্ত্রিত (Regulated) বাজার** বলে।

(৪) **পাইকারী ও খুচরা বাজার (Wholesale and Retail market) ঃ** যে বাজারে একসঙ্গে অনেক দ্রব্য বিক্রীত হয় তাহাকে **পাইকারী বাজার** বলে। যে বাজারে স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য অনেক ক্রেতাকে বিক্রয় করা হয় তাহাকে **খুচরা বাজার** বলে।

(৫) **প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজার (Competitive market and Monopoly market) ঃ** যে বাজারে সমজাতীয় দ্রব্যের জন্য বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা থাকে এবং চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় তাহাকে **প্রতিযোগিতার বাজার** বলে। যে বাজারে কোন দ্রব্যের একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে এবং সেই বিক্রেতা **মূল্য নির্ধারক** (Price-maker), তখন তাহাকে **একচেটিয়া বাজার** বলে।

(৬) **দ্রব্যের ও পণ্যের বাজার, টাকার বাজার, মূলধনের বাজার ও শেয়ার বাজার (Commodity and Produce market, Money market, Capital market and Share market) ঃ** যে সংগঠিত বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য ও কাঁচামালের লেনদেন হয়, তাহাকে **পণ্যের বাজার** বলে। যে সংগঠিত বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের লেনদেন হয়, তাহাকে **দ্রব্যের বাজার** বলে। যে বাজারে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য টাকাকড়ির লেনদেন হয়, সেই সংগঠিত বাজারকে **টাকার বাজার** বলে। যে বাজারে দীর্ঘকালীন মূলধন পাওয়া যায় সেই সংগঠিত বাজারকে **মূলধনের বাজার** বলে এবং যে সংগঠিত বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্রের ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে **শেয়ার বাজার** বলে।

(৭) **বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (Foreign Exchange market) ঃ** যে সংগঠিত বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হয়, তাহাকে **বৈদেশিক মুদ্রার বাজার** বলে।

পণ্যের বাজার ও দ্রব্যের বাজার (Produce Exchange and Commodity Exchange) ঃ যে সংগঠিত বাজারে কৃষিজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সেই বাজারকে **পণ্যের বাজার** বলে। যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার ইত্যাদি। ইহাকে **কাঁচামালের বাজারও** বলে।

যে সংগঠিত বাজারে শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেই বাজারকে **দ্রব্যের বাজার** বলে। যেমন, সোনার বাজার, রূপার বাজার ইত্যাদি।

পণ্যের বাজার ও দ্রব্যের বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Produce Exchange and Commodity market) ঃ

(১) ইহারা সাধারণতঃ যৌথ কোম্পানীর আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) ইহাদের পরিচালনায় পরিচালকমণ্ডলী থাকে।

(৩) এই সকল বাজারে দালাল মারফত ক্রয়-বিক্রয় হয়।

(৪) পৃথক পৃথক পণ্যের জন্য বিশেষায়িত পণ্যের বাজার থাকে।

(৫) এই সকল বাজার নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সভ্যগণকে আইনের বিধান মানিয়া লেনদেন করিতে হয়।

(৬) পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণীবিভাগ (Grading) ও নমুনা (Sample) স্থির করা হয়।

(৭) এই সকল বাজারে নগদ এবং ভবিষ্যৎ বা ফটকা লেনদেন হয়।

পণ্যের ও দ্রব্যের বাজারের কার্যাবলী (Functions of Produce Exchange and Commodity Exchange) :

পণ্য ও দ্রব্যের বাজারের কার্যাবলী একই প্রকার। ইহার কার্যাবলী নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) এই বাজারে পণ্য বা দ্রব্য নমুনা ও বর্ণনার ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় বলিয়া বাজারে পণ্য বা দ্রব্য আনিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে, পরিবহণ-ব্যয় হ্রাস পায় এবং পণ্যের বা দ্রব্যের লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন হয়।

(২) এই বাজারে ক্রেতা প্রয়োজনীয় পণ্য বা দ্রব্যটি যথাসময়ে পাইতে পারেন।

(৩) পণ্যের বা দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা করে।

(৪) এই বাজারে পণ্য বা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মানের পণ্য বা দ্রব্য সরবরাহের নিশ্চয়তা আসে।

(৫) ইহা পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য গুণাগুণ ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করে।

(৬) ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার্থে রক্ষণ (Hedging) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রক্ষণ ব্যবস্থায় যে পণ্য বা দ্রব্য বর্তমানে নগদ লেনদেন ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়, তাহাই আবার ভবিষ্যৎ লেনদেনের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য উঠা-নামাজনিত কারণে লাভ-লোকসানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

(৭) এই বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগমের ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে এবং মূল্যের স্থিরতা আসে।

(৮) নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা ইহা পরিচালিত হয় বলিয়া ক্রেতার ঠকিবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পণ্য বা দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রীত হয়।

(৯) নমুনা, বর্ণনা, স্তরবিভাগ ও নামকরণের মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্য বিক্রীত হয়। ফলে পণ্যের বা দ্রব্যের মান বজায় থাকে।

(১০) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে উহার মীমাংসা করা এবং বাজারের নিয়ম ভঙ্গ করিলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করাও পণ্য বা দ্রব্যের বাজারের কাজ।

(১১) এইরূপ বাজারে ফটকা লেনদেন (Futures) সংঘটিত হয়।

(১২) বহু দূর স্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর (grade) পণ্য বা দ্রব্যের সমাগম ঘটে বলিয়া ক্রেতা পছন্দমত পণ্য বা দ্রব্য ক্রয় করিবার চুক্তি করিতে পারে।

(১৩) এই বাজারে পরোক্ষ বিনিময় (Arbitrage) ব্যবস্থা থাকায় পণ্যমূল্যের বা দ্রব্যমূল্যের স্থিরতা আসে।

ফটকা কারবার (Speculation) :

'স্পেকুলেশন' (Speculation) কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'স্পেকুলের' (Speculare) হইতে আসিয়াছে। ইহার বাংলা অনুবাদ হইতেছে ফটকা। ফটকা বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব হইতে অনুমান করা।

যে কারবারী ভবিষ্যৎ মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুমান করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহাকে ফটকা কারবারী বলে। সেলিগম্যান ফটকা কারবারের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন, "ফটকা কারবার বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ মূল্য পরিবর্তনজনিত মুনাফা লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা।"

ফটকা কারবারের ক্রেতা ও বিক্রেতা কেহই প্রকৃত ক্রেতা-বিক্রেতা নহে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইলেও প্রকৃত আদান-প্রদান নাও হইতে পারে। ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

দ্রব্যের বাজারের ফটকা কারবারের কারবারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি হইল :

(১) **তেজী কারবারী (Bull) :** তেজী কারবারিগণ (Bulls) ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে অনুমান করে এবং মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাহারা আশাবাদী (Optimist)। তাহারা ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে বর্তমান মূল্যে ক্রয়ের চুক্তি (Purchase Contract) করে।

(২) **মন্দা কারবারী (Bear) :** মন্দাওয়ালা নিরাশাবাদী (Pessimist)। এইরূপ কারবারী ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাসের অনুমান করে এবং মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করে। মন্দা কারবারিগণ ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে বর্তমান মূল্যে বিক্রয়-চুক্তি (Sale Contract) করে।

(৩) **খেলাপী মন্দা কারবারী (Lame Duck) :** ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস পাইবে এই আশায় যে ফটকা কারবারী বর্তমান উচ্চমূল্যে অগ্রিম বিক্রয়ের চুক্তি করে কিন্তু ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস না পাওয়ায় চুক্তির খেলাপ করে, তাহাকে খেলাপী মন্দা কারবারী বলে।

ফটকা কারবারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও সুবিধা (Economic Significance and Advantages of Speculation) :

ফটকা কারবারিগণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেজীওয়ালা ও মন্দাওয়ালা ফটকা কারবারিগণের বিপরীতমুখী কার্যের ফলে মূল্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই ফটকা কারবারের প্রধান তাৎপর্য। এই কারণেই ফটকা কারবার অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া গণ্য হয়। ফটকা কারবারের সুবিধাগুলি এই স্থানে আলোচনা করা হইল :

(১) ফটকা কারবার দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনে এবং পণ্যের যোগানও মোটামুটি অব্যাহত রাখে।

(২) ফটকা কারবারের দ্বারা উৎপাদক উপকৃত হয়। যেহেতু ফটকা কারবার কাঁচামালের মূল্য মোটামুটি স্থির রাখে, উৎপাদনকারী ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের আশায় উৎপাদন চালাইয়া যায় এবং **ভবিষ্যৎ সরবরাহের দায়িত্ব** গ্রহণ করে।

(৩) ফটকা কারবারিগণ উৎপাদকের **ঝুঁকি হ্রাস** করে। ইহারা উৎপাদকের নিকট কাঁচামাল বিক্রয় করে এবং তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে।

(৪) ফটকা কারবারিগণ পণ্যের চাহিদা ও যোগানের **ভারসাম্য রক্ষা** করে।

(৫) ফটকা কারবার ক্রয়-বিক্রয়ে **ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতা** আনে।

(৬) ফটকা কারবার মূলধনের সঠিক গতি-নির্দেশক। শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার **বিনিয়োগ প্রবণতা** গড়িয়া তোলে।

(৭) শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার দেশের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও শিল্প-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন করে।

(৮) **রক্ষণ** (Hedging) ব্যবস্থায় অত্যধিক দর উঠা-নামা করে না এবং ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়।

(৯) **পরোক্ষ বিনিময়** (Arbitrage) ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাজার-মূল্যের মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হয়।

ফটকা কারবার ও জুয়াখেলা (Speculation and Gambling) :

জুয়াখেলার ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। কেবল মূল্য উঠা-নামা লইয়া বাজী ধরা হয়। কোন দল খেলায় জিতিবে বা হারিবে ইহার উপর বাজী ধরা জুয়াখেলার সামিল।

জুয়াখেলার কুফল (Evils of Gambling) :

(১) ইহার দ্বারা কোন উপযোগ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সম্পদ ও সময় ব্যয়িত হয়, ফলে আর্থিক অপচয় ঘটে।

(২) ইহার দ্বারা আয়-বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

(৩) ইহা কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করিয়া মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করে।

(৪) বেপরোয়া মনোভাব সৃষ্টি, মুনাফাবাজী ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটায় বলিয়া ইহা সমাজ-বিরোধী কার্য।

প্রকৃত ফটকা কারবার মূল্যের স্থায়িত্ব আনয়ন করে এবং পণ্য বা শেয়ারের হস্তান্তরও ঘটায়। মূল্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ফটকা কারবারের মূল তাৎপর্য; কিন্তু জুয়াখেলায় পণ্যের মূল্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

ফটকা কারবারের কুফল (Evils of Speculation) :

ফটকা কারবার যখন বিপথে পরিচালিত হয় এবং অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তখনই ইহার কুফল দেখা দেয়। ইহার কুফলসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) ফটকা কারবারিগণ যদি ভবিষ্যৎ-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুমান ভুল করে তবে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্বের অভাব সৃষ্টি হয়।

(২) ফটকা কারবারিগণ অবৈধভাবে পণ্য বা শেয়ারের ঘাটতি সৃষ্টি করিয়া মূল্য বাড়াইয়া দেয়।

(৩) ফটকা কারবার অনিয়ন্ত্রিত থাকিলে জুয়াখেলায় পরিণত হয়।

(৪) ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলে অবৈধ (Illegitimate কারবারে পরিণত হয় ও মন্দা বাজারের সূচনা করে। অবৈধ ফটকা কারবার সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

ফটকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Measures against Speculation) :

লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes) আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিতির জন্য ফটকা কারবারকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যে ইহার অবদান আছে। ফটকা কারবারের সুফল পাইতে হইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ভারতে ভবিষ্যৎ চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন [Forward Contracts (Regulations) Act]-এর মাধ্যমে ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য চারজন সদস্য-বিশিষ্ট একটি আগাম বাজার কমিশন (Forward Market Commission) গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনকে ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন হইলে কোন বাজারের গঠনতন্ত্র ও উপবিধি (Bye-laws) রচনা, সংশোধন ও পরিবর্ধনের নির্দেশ দিতে পারেন। ইহাতে প্রত্যেকটি কারবার নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবে। এই আইনের আওতায় নির্দিষ্ট মূল্যাংশ জমা দেওয়া, নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা, কারবারী চক্র (Ring or Corner) নিরোধ প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কোন বাজারের অনুমোদন নাকচ, পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা খারিজ, সাতদিন বা ততোধিক সময়ের জন্য সকল প্রকার লেনদেন বন্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বাজার-সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ বা তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য কারবারকে বাধ্য করিতে পারে।

কিন্তু আইনের বিধানই ফটকা কারবারের অশুভ ফল রোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে অধ্যাপক লার্ণার-এর মতে অবৈধ ফটকা কারবারের প্রতিরোধক হিসাবে পাল্টা ফটক বাজার (Counter Speculation Market) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যাহা বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিবে এবং বাজার দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য যথাযথ বিধান প্রণয়ন করিবে। অধ্যাপক টাউজিক-এর মতে অবৈধ ফটকা কারবারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়া উচিত।

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (Forward Trading) : এই প্রকার লেনদেন-ব্যবস্থায় বর্তমানের বাজারদর অনুযায়ী ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহাকে ভবিষ্যৎ-দেয় চুক্তিও (Forward Delivery Contract) বলে। প্রত্যেক অগ্রিম চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে চুক্তিমূল্যের একটি অংশ জমা

রাখিতে হয়। পণ্য সরবরাহ করিবার নির্দিষ্ট মাসে বিক্রেতা যে কোন নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করিতে পারে। পণ্য সরবরাহের স্থান চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা থাকে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য সরবরাহ করিতে হয়। অন্য স্থানে পণ্য সরবরাহ করিলে উল্লিখিত স্থান হইতে ঐ স্থানে পণ্য প্রেরণ পর্যন্ত পরিবহণ-ব্যয় বিক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

সুবিধা (**Advantages**) :

(১) ভবিষ্যতে পণ্যের দাম উঠানামা-জনিত লোকসানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এই প্রকার চুক্তি সুবিধাজনক।

(২) এই জাতীয় লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হয়।

(৩) ক্রেতা ভবিষ্যতে পণ্য পাইবার নিশ্চয়তা পায় এবং বিক্রেতা পণ্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা পায়।

(৪) সততার সহিত লেনদেন করা হইলে এই জাতীয় লেনদেনের ফলে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

ভবিষ্যৎ বাজার (**Future Market**) :

যে বাজারে বর্তমান চুক্তির ভিত্তিতে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ ও উহার মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে ভবিষ্যৎ বাজার বলে। কিছু কারবারী দ্রব্যমূল্য হ্রাস বৃদ্ধির সুযোগে মুনাফা করিবার চেষ্টা করে এবং তাহারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। ভবিষ্যতের দাম, পরিবর্তন বর্তমানে অনুমান করিয়া পরিবর্তিত মূল্য হইতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় মারফত লাভ অর্জন করা তাহাদের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ বাজার ফাটকা বাজার।

রক্ষণ (**Hedging**) : ফাটকা বাজারে আগাম চুক্তির ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয় হয়। পণ্যমূল্যের পরিবর্তন অনেক সময় ফটকা কারবারীগণের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ইহাতে কারবারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। ভবিষ্যৎ চুক্তিজনিত ক্ষতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ফটকাদারগণ বিপরীত (Contra) ক্রয় বা বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তিটি ক্রয় চুক্তি হইলে দ্বিতীয় চুক্তিটি বিক্রয় চুক্তি হইবে। আবার প্রথম চুক্তিটি বিক্রয় চুক্তি হইলে দ্বিতীয়টি ক্রয়-চুক্তি হইবে। দ্বিতীয় চুক্তিটিকে রক্ষণ বলে। রক্ষণ ব্যবস্থায় যে পণ্য বর্তমানে নগদ লেনদেন ভিত্তিতে ক্রয় করা হয় তাহাই আবার ভবিষ্যৎ লেনদেন ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়। ফলে ক্রেতার ও বিক্রেতার দাম উঠা-নামাজনিত কারণে লাভ-লোকসান মিটমাট (Set off) হইয়া যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই মূল্যের পণ্যের দুইটি চুক্তি করা হয়—একটি ক্রয়ের ও অপরটি বিক্রয়ের। ইহার ফলে একটি চুক্তির ফলে যাহা ক্ষতি হইবে অপর চুক্তির লাভ হইতে উহা পূরণ (Set off) করা যাইবে।

পরোক্ষ বিনিময় কারবার (Arbitrage operation) : ঝুঁকিগ্রহীতা কারবারী সর্বদাই কমমূল্যের বাজার হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া বেশী মূল্যের বাজারে উহা

বিক্রয় করে এবং মুনাফা অর্জন করে। এইরূপ কারবারকে পরোক্ষ বিনিময় কারবার বলে এবং যাহারা এইরূপ কারবার করে তাহাদের পরোক্ষ বিনিময় কারবারী (Arbitrage operator) বলে। ইহার ফলে দেশীয় ও বৈদেশিক বাজারে পণ্যের মূল্য মোটামুটি একই স্তরে বজায় থাকে। ইহাতে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে দ্রব্য মূল্যের অত্যধিক উঠানামা কমিয়া যায় এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্যের সমতা বজায় থাকে।

টাকার বাজার (Money Market) :

যে সংগঠিত বাজার শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা এবং বিল বাট্টার কারবারিগণকে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদান করে তাহাকে টাকার বাজার বলে। টাকার বাজারে টাকার স্বল্পকালীন আদান-প্রদান হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিলের দালাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান লইয়া টাকার বাজার গঠিত হয়। টাকার বাজার ঋণদাতা ও ঋণ-গ্রহীতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।

টাকার বাজারের কার্যাবলী (Functions of Money Market) :

(১) টাকার বাজার স্বল্পমিয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া মূলধনের অভাব দূর করে।

(২) ইহা জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে ও কারবারী সংস্থাসমূহকে ঋণ দেয়।

(৩) ইহা আমানতের উপর বিভিন্ন হারে সুদ প্রদান করে।

(৪) ইহা জামিনের পরিবর্তে অধিবিকর্ষ (Overdraft), রোক ঋণ (Cash Credit), অগ্রিম (Advance), ব্যাঙ্ক-লোন (Loan) ইত্যাদির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে।

(৫) ইহা বিল বাজারের কাজ করে। ইহা বিল বাট্টা করে এবং চেক ভাঙ্গাইয়া দেয়।

(৬) ইহা আমানতকারিগণের পক্ষে শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে।

(৭) এই বাজার মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(৮) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মূল্যবান দলিলাদি ও অলঙ্কার গচ্ছিত রাখে।

(৯) ইহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করে।

(১০) এই বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য একদিকে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(১১) ইহা চলতি মূলধনের অভাব দূর করে।

(১২) ইহা অনেক সময় দায়গ্রাহকের কাজ করে।

(১৩) ইহা আমানতকারিগণের অর্থ সঠিক পথে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে।

(১৪) ইহা স্বনিযুক্তি-কর্মসংস্থান প্রকল্পে (Self-employment Project) সাহায্য করে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা (Banking) ঃ

কাঁচামাল অথবা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, শ্রমিকের বেতন, পরিবহণ-ব্যয় ইত্যাদি চলতি খরচ মিটাইবার জন্য স্বল্প-মিয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। স্বল্প-মিয়াদী ঋণের সাহায্যে শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের চলতি খরচ মিটান হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদানের দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্যিক লেনদেনে (transactions) সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সংগঠিত টাকার বাজারের প্রধান উপাদান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণকারেরা প্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয় ও ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের প্রথম ব্যাঙ্ক—'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড' (Bank of England) এর জন্ম হয়।

ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক সংগঠন (Indian Money Market and Banking Organisation) ঃ

উন্নত এবং সংগঠিত টাকার বাজার দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির ধারক ও বাহক। বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন সকল প্রকার কারবারে স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন হয়। ব্যাঙ্ক এই স্বল্প-মিয়াদী ঋণ সরবরাহ করে। উন্নত টাকার বাজারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা। ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকা অপরিহার্য। টাকার বাজারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল সুসংবদ্ধ পরিপূরক ও প্রতিযোগী বিশেষ বিশেষ ধরনের ঋণদান কাজে পারদর্শী উপ-বাজার (Sub-markets)।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ব্যাঙ্ক শিল্প ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, পোস্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি লইয়া ভারতের সংগঠিত টাকার বাজার গঠিত।

দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ (Indigenous Banks) অসংগঠিত টাকার বাজারের অঙ্গ। মহাজন, শ্রফ, সাহুকর, শেঠ প্রভৃতি দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগের জন্য (Consumption) ঋণ দেয় এবং অত্যধিক হারে সুদ গ্রহণ করে। ভারতের টাকার বাজারের সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশ দুইটি পরস্পর সম্পর্কবিহীন।

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ভারতের মাথা-পিছু আমানতের পরিমাণ মাত্র ৫৪ টাকার মত। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাও অকিঞ্চিৎকর। ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রধানতঃ শহরভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শাখা প্রসারে অগ্রসর হইতেছে। পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ভারতের বিল বাজার (Bill market) অতি সংকীর্ণ। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সংকীর্ণ। ১৯৫৪ ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে

বিল বাজারের পরিধি কিছুটা বিস্তৃত করা হয় এবং রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার প্রসার ঘটে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও পর্যন্ত টাকার বাজারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনিতে সক্ষম হয় নাই। অসংগঠিত টাকার বাজার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার পরিকাঠামো (Super-Structure of Banking System in India) :

উচ্চে বা শৃঙ্গে (**at the apex**)—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া।

মধ্যে (at the middle)—স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বেসরকারী তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, বেসরকারী তফসিল-বহির্ভূত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ।

নিম্নে (at the bottom)—সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ, পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, দেশীয় মহাজনী ব্যাঙ্কসমূহ (Indigenous Bankers) ইত্যাদি।

ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা (Definition of Bank) এবং কারবারে ব্যাঙ্কের ভূমিকা (Role of Banks in Business) :

ব্যাঙ্ক এক প্রকার বিশেষজ্ঞ কারবারী প্রতিষ্ঠান। পূর্বে কারবারের যে বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, শিল্প (Industry) ও ব্যবসা (Trade) প্রত্যক্ষভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনকার্য করে। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসায়ের সহায়ক নানাবিধ কার্য আছে যাহা ব্যতীত শিল্প ও ব্যবসা অসম্ভব। ব্যাঙ্ক ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের কার্য টাকার লেনদেনের কারবার করা।

অনেক মানুষেরই কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সেই সঞ্চয় নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা এবং ফলপ্রসূভাবে বিনিয়োগের জন্য অনেকেই তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। যাহারা সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখে তাহাদের আমানতকারী (Depositors) বলে। প্রয়োজন অনুসারে ব্যাঙ্ক হইতে সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস থাকিলেই আমানতকারিগণ তাহাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সুতরাং সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ব্যাঙ্কের একটি কার্য। ইহাকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ গ্রহণও বলে। ব্যাঙ্ক আমানতকারিগণের আমানতী (Deposit) অর্থ হইতে শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়িগণকে ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ প্রদান করে। ঋণ-গ্রহীতা কারবারিগণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাস থাকিলে তবেই ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া থাকে। বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাঙ্ক কাহাকেও ঋণ দেয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের কার্য দ্বিবিধ—(১) সাধারণের নিকট হইতে দাবীমাত্র ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতিতে আমানত গ্রহণ (Receiving deposit repayable on demand or borrowing) এবং (২) ঋণপ্রদান (Lending)। সুতরাং ব্যাঙ্ক ঋণের কারবারী (Dealer in credit)। ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ এবং ঋণপ্রদান বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ ও বিশ্বাস সমার্থবোধক। সুতরাং ব্যাঙ্ককে বিশ্বাসের কারবারী বলে। আমানতকারিগণের নিকট হইতে অল্প সুদে আমানত গ্রহণ করিয়া অধিক সুদে ঋণ প্রদান করিয়া মুনাফা আয় করাই ব্যাঙ্কের কার্য।

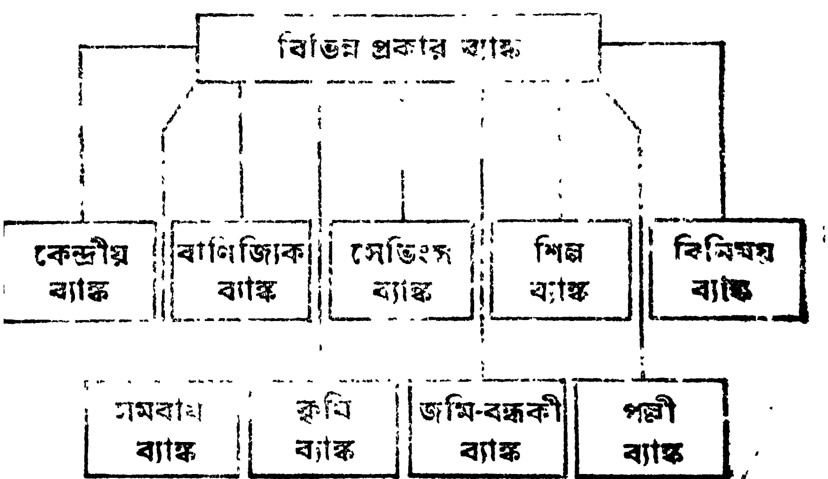
সকল প্রকার ব্যাঙ্কই যে ঋণের কারবার অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ ও ঋণদান করিয়া মুনাফা করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়, তাহা নহে। আমরা উপরে যে ব্যাঙ্কের কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম উহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের (Commercial Bank) কার্য।

ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ (Types of Banks) :

প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্ক আছে। আধুনিককালে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখা যায়। এই সঙ্গে ইহাদের কার্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করা হইল :

(১) **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :** দেশের ঋণ সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। ইহা অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক (Friend, philosopher and guide) হিসাবে কার্য করে। ইহা টাকা ছাপাইয়া মুদ্রা সরবরাহ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক এবং ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক। ইহা সরকারকে মুদ্রা সরবরাহ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে। উদাহরণ : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া।

(২) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) :** যে ব্যাঙ্ক দাবীমাত্র ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া অপরের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং অপরকে ঋণ প্রদান করে, তাহাই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিচিত। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক কথাটির দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই বোঝায়।



(৩) **সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (Savings Bank) :** ভারতে পোস্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কই সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য করে। অন্যান্য দেশে স্বল্প-সঞ্চয়কারিগণের সুবিধার জন্য এই

প্রকার ব্যাঙ্ক যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা অল্প পরিমাণ আমানত গ্রহণ ও তুলিবার ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া ইহারা ব্যবসা পরিচালনা করে। ইহারা সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক। ইহাদের সুদের হার তফসিলী ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা ½% অধিক।

(৪) **শিল্পীয় ব্যাঙ্ক (Industrial Bank)**: ইহারা স্বল্প-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করে না, অথবা স্বল্প-মিয়াদী ঋণও প্রদান করে না। দীর্ঘ-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করা এবং শিল্পসমূহকে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ প্রদান করাই ইহাদের কার্য। ইহারা নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ক্রয় করিয়াও দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংস্থানে সাহায্য করে। এই কারণেই ইহাদের শিল্পীয় ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক বলে।

(৫) **বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank)**: ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। এই সকল ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ ও কারবারীকে ঋণ প্রদান করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় করা, আমদানি ও রপ্তানিকারকের প্রতিনিধিত্ব করা, ঋণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা, বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বীকৃতি দেওয়া, বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া রপ্তানিকারককে মূল্য প্রদান করা ইত্যাদি ইহাদের মুখ্য কাজ। উদাহরণ—গ্রিণ্ডলেজ্‌ ব্যাঙ্ক।

(৬) **সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank)**: গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় সমবায় ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের সদস্যদের ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকার ব্যাঙ্ক গঠন করে। ব্যাঙ্কের উপবিধি দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হইলে ইহারা অ-সদস্য সাধারণের (non-member public) নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহারা অ-সদস্যদের ঋণ প্রদান করে না। কৃষি ও সমবায় সমিতির উন্নতিতে ঋণ প্রদান করে।

(৭) **কৃষি ব্যাঙ্ক (Agricultural Bank)**: কৃষির উন্নতির জন্য নাতিদীর্ঘ মিয়াদে ঋণ প্রদান করাই এই জাতীয় ব্যাঙ্কের কাজ।

(৮) **জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank)**: জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ঋণদান করাই এই জাতীয় ব্যাঙ্কের কাজ। ভারতে এই প্রকার ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব নাই। তবে কিছু কিছু সমবায় ব্যাঙ্ক এই জাতীয় ব্যাঙ্কের কার্য করে।

(৯) **পল্লী ব্যাঙ্ক (Rural Bank)**: ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি এক আদেশ (Ordinance) জারী দ্বারা পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ৫টি পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কসমূহ উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ ও গোরক্ষপুর, হরিয়ানার ভিওয়ানি, রাজস্থানের জয়পুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদায় স্থাপিত হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এই পল্লী ব্যাঙ্কসমূহ গঠনে প্রবর্তক ব্যাঙ্কের ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে এইরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পল্লী ব্যাঙ্ক তফসিলী ব্যাঙ্করূপে কার্য করিতেছে। কিন্তু

ইহাদের কার্য কোন নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ শিল্পকে ঋণদান ইহার প্রধান কার্য। কৃষক, গ্রাম্য কারিগর, গ্রাম্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটিরশিল্পকে অল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণদানের উদ্দেশ্যে পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। মহাজনের গ্রাস হইতে পঙ্গু গ্রাম্য অর্থনীতিকে মুক্ত করা ও পুনরুজ্জীবিত করার মহান উদ্দেশ্যে গ্রামীণ বা পল্লী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঋণ প্রদানে সুদের হার সমবায় ব্যাঙ্কের অনুরূপ। প্রতিটি পল্লী ব্যাঙ্কের মূলধনের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার, ১৫ শতাংশ যে প্রদেশে স্থাপিত হইবে সেই রাজ্য সরকার এবং ৩৫ শতাংশ প্রবর্তক ব্যাঙ্ক (Sponsoring Bank) বিনিয়োগ করে। ৯ জন পরিচালক-সমন্বিত পরিচালকমণ্ডলী এই ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা করে। ৯ জন পরিচালকের মধ্যে ৪ জন পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকার, ৩ জন পরিচালক প্রবর্তক ব্যাঙ্ক এবং ২ জন পরিচালক রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ৪ জন পরিচালকের মধ্যে ১ জন চেয়ারম্যান বা সভাপতি হইবেন।

(১০) **মিশ্র ব্যাঙ্ক (Mixed Bank)**: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানীতে এই ধরনের ব্যাঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। মিশ্র ব্যাঙ্ক-পদ্ধতিতে (Mixed Banking System) ব্যাঙ্কসমূহ একাধারে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যকে সাহায্য করে, অন্যদিকে মধ্য ও দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ প্রদানের দ্বারা শিল্পে স্থায়ী মূলধন গঠনে সহায়তা করে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মিশ্র ব্যাঙ্ক-পদ্ধতিতে উৎসাহ দেয় না।

(১১) **দেশীয় ব্যাঙ্ক (Indigenous Banks)**: মহাজন, স্রফ, শেঠ ইত্যাদি দেশীয় ব্যাঙ্কের কাজ করে। ইহারা চড়া সুদে টাকা ঋণ দেয়।

তফসিলী ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks): যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) আইনের তালিকাভুক্ত তাহাদের তফসিলী ব্যাঙ্ক বলে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল : (১) এইরূপ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা হওয়া চাই। (২) ইহার কার্যকলাপ আমানতকারীদের স্বার্থানুকূল হইতে হইবে। (৩) ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত নিয়ম-কানুন ও শর্ত মানিতে হইবে এবং সময় সময় বিভিন্ন প্রকারের বিবৃতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই ধরনের একটি বিবৃতি প্রতি শুক্রবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পেশ করিতে হয়। (৪) ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন অনুসারে (Reserve Bank Amendment Act, 1962) এইরূপ ব্যাঙ্ককে তাহাদের মোট চলতি আমানত (Demand deposit) ও মিয়াদী আমানত (Time deposit) উভয়ের শতকরা ১০ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। (৫) তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা পূর্ণনিয়ন্ত্রিত। (৬) এইরূপ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট "বাট্টাকরণের সুবিধা" (Discounting facility) পায়।

তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহ জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন এবং টাকার বাজারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালিত নিকাশী-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা (Clearing facility) লাভ করে।

তফসিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক (Non-Scheduled Banks) :

যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনে তালিকাভুক্ত নয়, তাহারাই তফসিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক। ইহাদের যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, তবুও ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পূর্ণনিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং এইজন্য তফসিলী ব্যাঙ্কের ন্যায় জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন নহে। এইরূপ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাট্টাকরণের সুবিধা' (Discounting facility) পায় না। ইহারা নিকাশী ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাও (Clearing facility) পায় না। এই সকল ব্যাঙ্ক তফসিলী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চেক নিকাশী করাইয়া লয়।

তফসিলী ও তফসিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের পার্থক্য (Distinction between Scheduled and Non-Scheduled Bank) :

তফসিলী ব্যাঙ্ক	তফসিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক
(১) ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক।	(১) ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত নহে।
(২) তফসিলী ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।	(২) ইহা যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে তবুও ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নহে।
(৩) ইহা জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন।	(৩) ইহা জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন নহে।
(৪) এইরূপ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাট্টাকরণের সুবিধা পায়।	(৪) এইরূপ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাট্টাকরণের সুবিধা পায় না।
(৫) ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালিত নিকাশী ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা পায়।	(৫) ইহা নিকাশী ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা পায় না।
(৬) ইহার সুদের হার তফসিল-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা কম।	(৬) ইহার সুদের হার তফসিলী ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা কিছু বেশী।
(৭) টাকার বাজারে ইহার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	(৭) টাকার বাজারে ইহার গুরুত্ব আছে বটে তবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নহে।

সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক (Public Sector Banks) :

সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক বলিতে সেই ব্যাঙ্কসমূহকে বুঝায় যাহাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সরকার অথবা সরকারের অধীনস্থ সংস্থার অধীনে থাকে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও তাহার অধীনস্থ ৭টি সরকারী ব্যাঙ্ক, ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং পল্লী ব্যাঙ্কসমূহ সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক। ইহা ছাড়া ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহও সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কের নিকাশ-ব্যবস্থা (Banking Clearing System) :

প্রতিটি ব্যাঙ্কে প্রত্যহ অসংখ্য চেক আমানতকারীরা ভাঙ্গাইবার জন্য জমা দেয় এবং এইভাবে ব্যাঙ্কটি অন্য ব্যাঙ্কের নিকট টাকা পাওয়ার অধিকার লাভ করে। অনুরূপভাবে

অন্য ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক হইতে টাকা পাওয়ার অধিকারী। কোন ব্যাঙ্ককে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হইলে সেই ব্যাঙ্কের নিকট চেক উপস্থিত করিতে হয়, যাহা সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমানে সমস্ত উন্নত দেশেই ব্যাঙ্কারগণের নিকাশী ঘর-ব্যবস্থা (Clearing House System) আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা ইহা পরিচালিত। নিকাশী-ঘরে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে' প্রতিনিধিগণ পাওনা চেকগুলি লইয়া উপস্থিত হন এবং পাওনা ও দেয় চেকের পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ করিয়া দেনা-পাওনা মিটান হয়। এই ব্যবস্থাকে "নিকাশী-ব্যবস্থা" (Clearing System) এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ককে 'নিকাশী ব্যাঙ্ক" (Clearing Bank) বলে। হিসাব-নিকাশের পর পাওনা ব্যাঙ্কের (Receiving Bank) টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে পাওনা ব্যাঙ্কের যে হিসাব থাকে উহাতে জমা পড়ে এবং দেনা ব্যাঙ্কের (Paying Bank) দেয় অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট খোলা হিসাব হইতে বাদ যায়। এইভাবে পরস্পরের সহিত দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া নীট দেনার পরিমাণ টাকা একে অপরকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া দেয়।

আমানত বীমা কর্পোরেশন (Deposit Insurance Corporation) ঃ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের যুক্ত আমানত বীমা (Federal Deposit Insurance) পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারতে ১ কোটি টাকা মূলধনে আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই কর্পোরেশন প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ৫ কোটি টাকা ঋণের সুবিধা পাইতে পারে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহার মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া ১·৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বীমার সুবিধা সকল বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য এই সুযোগ গ্রহণের জন্য তাহাদের বীমা গ্রহণ করিতে হইবে। আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ প্রত্যেকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে।

আজ পর্যন্ত এই কর্পোরেশন মোট ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের ক্ষতি-পূরণ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ্ চায়না ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্ পাকিস্তান ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (Savings Bank) ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতের পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কই একমাত্র সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করে। ইহা ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত। যে কোন ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা যায়। ইহা নির্দিষ্টহারে সুদ দেয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানতে টাকা নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না কারণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

সেভিংস হিসাব খুলিবার পদ্ধতি ঃ আমানতকারী যে ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিতে ইচ্ছুক তাহাকে সেই ব্যাঙ্ক হইতে সেভিংস হিসাব খুলিবার আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট ফরম সংগ্রহ করিতে হয়। প্রাথমিক আমানত হিসাবের অর্থ ও তাহার সহিত উক্ত

ফরমখানি পূরণ করিয়া নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট দাখিল করিতে হয়। ঐ ফরমখানিতে আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর (Specimen signature) দিতে হয় কারণ আমানতী অর্থ তুলিবার সময় আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষরের সহিত আবেদনপত্রে আমানতকারীর স্বাক্ষর মিলাইয়া দেখা হয়। উভয় স্বাক্ষর মিলিলে তবেই অর্থ তুলিতে দেওয়া হয়। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত হইবার পর ব্যাঙ্ক হিসাব খুলিতে পারে।

হিসাব খোলা হইলে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ আমানতকারীকে একখানি হিসাবের বই দিয়া থাকে। উহাকে পাশবই (Pass Book) বলে। পাশবইতে আমানতকারীর টাকা জমা এবং টাকা তুলিবার হিসাব লেখা হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার পদ্ধতি : আমানতকারী নিজ হিসাব হইতে টাকা তুলিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে ব্যাঙ্ক হইতে একখানি আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহ করিবেন। পরে কত টাকা তুলিতে চাহেন তাহা লিখিয়া এবং স্বাক্ষর করিয়া পাশবই (Pass Book) সমেত ঐ ফরমখানি যে ব্যাঙ্কে তিনি হিসাব খুলিয়াছেন সেই ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর হাতে অর্পণ করিবেন। উক্ত কর্মচারী আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর আবেদনপত্রে যে স্বাক্ষর করা হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। উভয় স্বাক্ষর যে একই ব্যক্তির (অর্থাৎ আমানতকারীর) এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার পর আবেদনকারীকে আবেদনপত্রে লিখিত অর্থ দেওয়া হয়। যে অর্থ তোলা হইল তাহা পাশবইতে লিখিয়া বইখানি আমানতকারীকে ফেরত দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা হইলে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, শুধু ফরম-এর বদলে চেক ব্যবহার করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of a Commercial Bank) :

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—মুখ্য কার্যাবলী (Primary functions) ও গৌণ কার্যাবলী (Secondary functions)।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মুখ্য কার্যাবলী (Primary Functions of a Commercial Bank) :

(১) সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে **আমানত গ্রহণ করা** (Receiving Deposit) ব্যাঙ্কের অন্যতম মুখ্য কার্য। চলতি আমানত হিসাব, সঞ্চয়ী আমানত হিসাব, মিয়াদী আমানত হিসাবের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করে।

(২) শিল্প ও ব্যবসায়ে **ঋণ প্রদান করা** (Lending) ব্যাঙ্কের অপর একটি মুখ্য কার্য। ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ রোক ঋণ (Cash credit), অধিবিকর্ষ (Overdraft) ও ব্যাঙ্ক-লোনের (Loan) মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে। ব্যাঙ্ক অগ্রিম (Advance) এবং ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Letter of Credit) দিয়াও ঋণ প্রদান করে।

(৩) **বিল ভাঙ্গানো** (Discounting bills) ব্যাঙ্কের অপর একটি মুখ্য কার্য। ব্যাঙ্ক এই জন্য বাট্টা (Discount) গ্রহণ করিয়া থাকে।

বর্তমানে কাগজী মুদ্রা (Note) ছাপাইবার একমাত্র অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রথমদিকে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নিজ নিজ ব্যাঙ্ক-নোট মুদ্রণ করিত। কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলে ব্যাঙ্ক জমা-পরিমিত অর্থের নোট দিত। ঐ নোট অপর কোনও ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলে নোটে লিখিত অর্থ পাওয়া যাইত। এই ব্যবস্থা বর্তমানে অবলুপ্ত হইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গৌণ কার্যাবলী (Secondary Functions of a Commercial Bank) : ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে কিছু কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যে যে বিশেষ কার্যের ভার উহার উপর ন্যস্ত করা হয় ব্যাঙ্ক সেই সেই কার্যই মাত্র সম্পাদন করে। গৌণ কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি বিশেষ কার্যের উল্লেখ করা হইতেছে :

প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যকলাপ (Agency Services) :

(১) ব্যাঙ্কের উপর স্থির নির্দেশ থাকিলে মক্কেলের পক্ষে তাহার হিসাব হইতে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময় অন্তে বাড়ীভাড়া, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করে।

(২) ধারে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতার আর্থিক অবস্থা যাচাই করিবার জন্য বিক্রেতা ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া থাকে। বিক্রেতা ক্রেতার ব্যাঙ্কের নিকট ক্রেতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া তাহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ, অর্থাৎ তাহার নিকট ধারে দ্রব্য বিক্রয় নিরাপদ কিনা এবং তাহাকে ধারের সুযোগ দিলে কত টাকা পর্যন্ত ধার দেওয়া চলে ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিয়া (বিক্রেতাকে) জানাইতে অনুরোধ করিতে পারে। ক্রেতার ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলকে ধারে সরবরাহ করা সঙ্গত কিনা এবং সঙ্গত হইলে কত টাকার দ্রব্য ধারে বিক্রয় করা যায় তাহা বিক্রেতাকে জানাইয়া দেয়।

(৩) অনেক আমানতকারী তাহার ব্যাঙ্কের উপর বাড়ীভাড়া, বিনিয়োজিত অর্থের সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদি আদায় করিবার ভারও অর্পণ করে। ব্যাঙ্ক মক্কেলের পক্ষে পাওনা আদায় করিয়া তাহার (মক্কেলের) হিসাবে জমা করে।

(৪) মক্কেলের মধ্যে যাহারা শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তাহারা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ ব্যাঙ্কের উপর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ভার অর্পণ করিতে পারে। এই প্রকার ভারপ্রাপ্ত হইলে ব্যাঙ্ক মক্কেলের পক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে।

(৫) ইচ্ছা করিলে সোনা-রূপার অলঙ্কারাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারা যায়। ব্যাঙ্ক উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অলঙ্কারাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য ব্যাঙ্ককে ভাড়া দিয়া স্থান সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাকে সেফ ডিপোসিট ভল্ট (Safe Deposit Vault) বলে।

(৬) ইচ্ছা করিলে আমানতকারী ব্যাঙ্ককে তাহার সম্পত্তির অছি (Trustee) নিয়োগ করিতে পারে।

বিবিধ কার্যাবলী (Miscellaneous Services) :

(১) ব্যাঙ্কের মারফত অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে এক স্থান হইতে অপর কোনও স্থানে অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব। **ব্যাঙ্কের নোট** (**Bank Draft**) দ্বারা এক স্থান হইতে অপর কোন স্থানে সহজে ও অল্প ব্যয়ে অর্থ প্রেরণ করা যায়।

(২) নগদ টাকা লইয়া দূর দেশে ভ্রমণ করা কেবল অসুবিধাজনকই নহে, বিপজ্জনকও বটে। দূরদেশে ভ্রমণকারিগণ ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে **"ভ্রমণকারিগণের চেক"** (**Travellers' Cheque**) ক্রয় করিতে পারে। ভ্রমণকারিগণ দূর দেশস্থ ব্যাঙ্ক হইতে চেকে লিখিত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে।

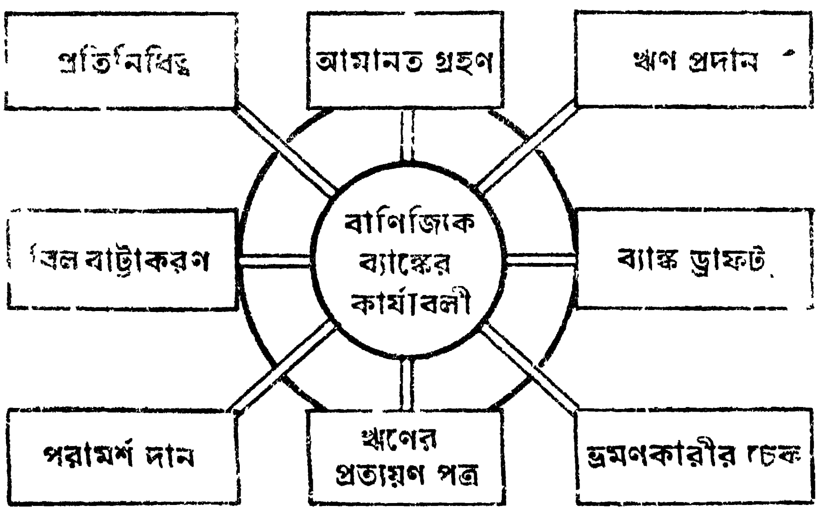
(৩) লেনদেন ও কারবার সম্বন্ধে নানাবিধ **পরামর্শ** ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লওয়া যায়।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাঙ্ক **ঋণের প্রত্যয়নপত্র** (**Letter of Credit**) দিয়া বিশেষ সাহায্য করে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর গুরুত্ব (Importance of the Functions of a Bank) :

দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতিতে ব্যাঙ্কের অবদান অনস্বীকার্য। ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর গুরুত্বসমূহ হইল :

(১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমানতী অর্থের উপর সুদ দেয় বলিয়া জনসাধারণ সঞ্চয় করিতে উৎসাহ পায়। ইহা দেশে সঞ্চয় গঠনে সাহায্য করে।



(২) সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সঞ্চয় শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করিয়া ব্যাঙ্ক দেশের শিল্পের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

(৩) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের নিষ্পত্তি চেকদ্বারা করা হয়। ইহাতে নগদ টাকার প্রয়োজন কমিয়া যায়। চেকে লেনদেন নিরাপদও বটে। টাকা হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু চেক হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হয় তাহাকে চেকের নম্বর জানাইয়া দিলে ব্যাঙ্ক চেকে লিখিত অর্থ প্রদান বন্ধ রাখে।

আমানত হিসাবের প্রকারভেদ (Types of Deposit Account) :

ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রাখা হয় তাহাকে আমানত (Deposit) বলে। ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিতে হইলে ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিতে হয়। টাকা জমা রাখিতে হইলে ব্যাঙ্কে একটি হিসাব খুলিতে হয়। ইহাকে আমানত হিসাব (Deposit Account) বলা হয়। আমানত হিসাব বিভিন্ন প্রকারের :

(১) চলতি আমানত হিসাব (**Current Deposit Account**),

(২) সঞ্চয়ী আমানত হিসাব (**Savings Account or Savings Deposit Account**),

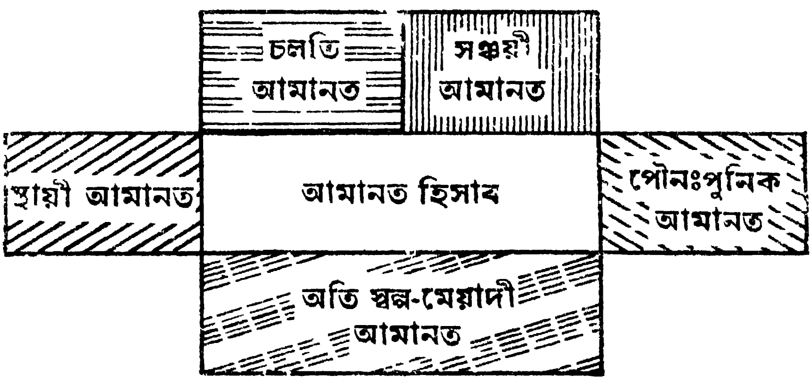
(৩) মিয়াদী বা স্থায়ী আমানত হিসাব (**Fixed Deposit or Time Deposit Account**),

(৪) পৌনঃপুনিক বা আবর্তক আমানত হিসাব (**Recurring Deposit Account**),

(৫) অতি স্বল্প-মিয়াদী আমানত হিসাব (**Money at call and short notice**)।

উল্লিখিত আমানত হিসাবসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে :

চলতি আমানত হিসাব (Current or Demand Deposit Account) : এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিলেই চলতি আমানত হিসাব খুলিতে পারা



যায়। চলতি আমানত হিসাব খুলিয়া আমানতকারী যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে পারে, যে কোন সময়েই আমানতী অর্থ তুলিতে পারা যায়। ব্যাঙ্ক ইহার উপর

কোনও প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারে না। তবে আমানতকারীর হিসাবে সর্বদাই এক ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ থাকা প্রয়োজন। চলতি আমানত হিসাবে চেক কাটিয়া অর্থ তুলিতে হয়। এই প্রকার আমানত হিসাবের অসুবিধা এই যে, ব্যাঙ্ক চলতি আমানতের উপর কোন সুদই দেয় না। চলতি আমানত হিসাব খুলিলে আমানতকারীকে কোন পাশবহি দেওয়া হয় না, তবে এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যাঙ্ককে নিয়মিতভাবে আমানতকারীর হিসাবের বিবৃতি (Statement) পাঠাইতে হয়। ইহা কারবারের হিসাব নামে পরিচিত।

সঞ্চয়ী আমানত হিসাব (Savings Deposit Account) : যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম এবং যাহারা অল্প পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খুলিবার সুযোগ গ্রহণ করে। উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত বা প্রস্তাবিত হইলে এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট ন্যূনতম অর্থ জমা দিলে সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খুলিতে পারা যায়। সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খুলিবার পর ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একখানি পাশবই (Pass Book) দেয়। উহাতে আমানতকারীর জমা ও হিসাব হইতে যে টাকা তোলা হয় তাহার হিসাব রাখা হয়। সঞ্চয়ী আমানত হিসাব হইতে মাসে নির্দিষ্ট কয়েকবারের অধিক টাকা তোলা যায় না। সাধারণতঃ মাসে পাঁচবারের বেশী টাকা তোলা সম্ভব হয় না। তবে ব্যাঙ্কের বিশেষ অনুমতিতে অধিকবার টাকা তোলা যায়। কোনও একখানি চেক অথবা উত্তোলন ফরম (Withdrawal Form) দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক টাকা তুলিতে পারা যায় না। কোনও একটি হিসাব হইতে ১০,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ তুলিতে হইলে ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট দিনের নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদের হার বর্তমানে শতকরা ৫ টাকা। বিদেশে অনেক ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের গৃহেও সঞ্চয় করিবার সুযোগ দেয়। আমানতকারীকে একটি তালাবদ্ধ ছোট বাক্স দেওয়া হয়। বাক্সটিতে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। সঞ্চয়কারী তাহার সামর্থ্য অনুসারে অল্প অল্প পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে বাক্সে ফেলিয়া দেয়। বাক্সটি পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্কে লইয়া যাইতে হয়। সেখানে বাক্সটি খুলিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা আমানতকারীর হিসাবে জমা করা হয়। ইহাকে হোম সেভিংস সেফ অ্যাকাউন্ট (Home Savings Safe Account) বলা হয়।

মিয়াদী বা স্থায়ী আমানত হিসাব (Fixed Deposit Account or Time Deposit Account) : মিয়াদী আমানত হিসাবে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। আমানতের মিয়াদ এক মাস, দুই মাস, ছয় মাস বা এক বৎসর ইত্যাদি আমানতকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে আমানত তুলিতে পারা যায় না। যথেষ্ট সময় দিয়া অগ্রিম নোটিশ দিলে ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেও টাকা তুলিতে দিতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইবে না। মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে টাকা তুলিলে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সুদের হার অপেক্ষা কম হারে সুদ দিয়া থাকে। মিয়াদী আমানত হিসাব

খুলিবার পর আমানতকারীকে একখানি প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়। উহাকে মিয়াদী আমানত প্রত্যয়নপত্র বা প্রপত্র (Fixed Deposit Certificate) বলে। মিয়াদী আমানত হিসাবে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চয়-বিনিয়োগের ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক তাহারাই মিয়াদী আমানত হিসাব অধিক পছন্দ করে।

পৌনঃপুনিক আমানত হিসাব (Recurring Deposit Account) ঃ এইরূপ আমানত হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক অথবা বাৎসরিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ পুনঃপুনঃ জমা দিতে হয়। ইহাতে স্থায়ী আমানতের হারে সুদ পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়অন্তে গ্রাহক আসল ও সুদসহ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত পায়। ইহাতে সুদের উপর সুদ জমা হয়। এইরূপ হিসাব খুলিবার সময় চালু আমানত হিসাব রহিয়াছে এইরূপ একজন আমানতকারীর স্বাক্ষর ও হিসাব নম্বরসহ 'পরিচিতি'র বা প্রস্তাবনা বা প্রবর্তনার (Introduction) প্রয়োজন। এইরূপ আমানতের টাকা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তোলা যায় না।

অতি স্বল্প-মিয়াদী আমানত হিসাব (Money at call and short notice) ঃ অতি স্বল্প-মিয়াদী আমানত হিসাবে খুব অল্প-নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ জমা রাখা হয়। আমানতের মিয়াদ অতি অল্প, যেমন, ১০ হইতে ১৫ দিনও হইতে পারে। এই হিসাবে আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়-অন্তে একসঙ্গে সমস্ত আমানত তুলিতে পারিবে এবং যদিও মিয়াদ অতি অল্প তথাপি অল্প হারে সুদ পাইবে। কিন্তু এইরূপ দশ-পনের দিনের মিয়াদে অন্য কোন হিসাবে অর্থ জমা রাখিলে সুদ পাওয়া যায় না। ইহা মিয়াদী আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

চলতি আমানত হিসাব ও স্থায়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Current Deposit Account and Fixed Deposit Account) ঃ

চলতি আমানত হিসাব	স্থায়ী আমানত হিসাব
১। ইহাতে যে কোন সময়ে টাকা তোলা যায়	১। ইহাতে সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে সাধারণতঃ টাকা তোলা যায় না, নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা কম হারে সুদ পাওয়া যায়
২। ইহাতে বার বার অর্থ জমা দেওয়া ও তোলা যায়।	২। ইহাতে একসাথে মোট জমার অর্থ জমা করিতে হয়। ইহা ইচ্ছামত তোলা যায় না।
৩। ইহাতে যে কোন সময়ের জন্য অর্থ জমা হয়	৩। ইহাতে ১ মাসের কম সময়ের জন্য অর্থ জমা হয় না।
৪। ইহাতে সুদ দেওয়া হয় না	৪। ইহাতে অধিক হারে সুদ পাওয়া যায়।
৫। ইহাতে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময়অন্তে আমানতকারীকে হিসাবের বিবরণ পাঠায়।	৫। ইহাতে টাকা জমা দিলে ব্যাঙ্ক মিয়াদী আমানত প্রত্যয়নপত্র দেয়।
৬। ইহা কেবল কারবারী প্রতিষ্ঠানই খুলিয়া থাকে।	৬। ইহা বিনিয়োগের ঝুঁকিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা খুলিয়া থাকে।

চলতি আমানত হিসাব	স্থায়ী আমানত হিসাব
৭। ইহাতে চেক কাটিয়া টাকা তোলা হয়।	৭। ইহাতে চেক কাটিয়া টাকা তোলা যায় না।
৮। ইহাতে কারবারী টাকার আবর্তন (Turnover) বাড়াইতে পারে বলিয়া ইহা কারবারীর পক্ষে সুবিধাজনক।	৮। ইহাতে টাকা একসাথে অনেক দিন জমা থাকে, ফলে টাকার আবর্তন হয় না। তাই ইহা কারবারীর পক্ষে অসুবিধাজনক।
৯। এই আমানতের অর্থ চেক কাটিয়া হস্তান্তর করা যায়।	৯। ইহাতে অর্থ হস্তান্তর করা যায় না (Not transferable)।
১০। টাকা তুলিবার পূর্বে বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হয় না।	১০। টাকা তুলিবার পর্বে বিজ্ঞপ্তির প্রযোজন হয়।
১১। আনুষঙ্গিক খরচ বা ব্যাঙ্ক চার্জ (Bank Charge) বাবদ ব্যাঙ্ক কিছু টাকা কাটিয়া লয়।	১১। কোন ব্যাঙ্ক চার্জ (Bank Charge) লাগে না।

চলতি আমানত হিসাব ও সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Current Deposit Account and Savings Deposit Account):

চলতি আমানত হিসাব	সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
১। ইহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে অন্ততঃ ১০০ টাকা) সর্বদাই হিসাবে জমা রাখিতে হয়।	১। ইহাতে স্বল্প পরিমা (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ন্যূনতম ৫ টাকা) অর্থ হিসাবে সর্বদা জমা রাখিতে হয়। চেকের সুবিধা পাইতে হইলে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা রাখা দরকার।
২। যে কোন সময় ও যতবার ইচ্ছা চেক কাটিয়া অর্থ তুলিয়া লওয়া যায়।	২। ইহাতে অর্থ তুলিবার বিধি নিষেধ থাকে। মাসে নির্দিষ্ট কয়েকবারের বেশী ও একত্রে বেশী পরিমাণ অর্থ তুলিবার বিধি-নিষেধ আছে, অবশ্য ব্যাঙ্কের নিকট বিশেষ অনুমতি লইয়া তোলা যায়।
৩। ইহাতে সাধারণতঃ সুদ দেওয়া হয় না।	৩। ইহাতে সঞ্চয়কারীকে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে (বর্তমানে সুদের হার ব্যাঙ্কে ৫ ও পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে ৫½%)।
৪। চেকের মাধ্যমে অর্থ তুলিতে হয়	৪। চেক কাটিয়া অথবা উত্তোলন ফরমের (Withdrawal Form) দ্বারা অর্থ তুলিতে হয়
৫। নির্দিষ্ট সময়অন্তে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে হিসাবের বিবরণ (Bank Statement) পাঠায়।	৫। ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে পাশবই (Pass Book) দেয়।
৬। ইহা কারবারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খোলা হয়।	৬। ইহা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী আমানত
৭। ব্যাঙ্ক প্রদেয় সেবার জন্য আমানতকারীকে ব্যাঙ্ক চার্জ (Bank Charges) দিতে হয়।	৭। ইহাতে ব্যাঙ্ক চার্জ (Bank Charges) দিতে হয় না।
৮। একসঙ্গে অধিক পরিমাণ টাকা তুলিতে পূর্ব-বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হয় না।	৮। অধিক টাকা উত্তোলনে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়।
৯। লেনদেনের সুবিধার্থে এইরূপ হিসাব খোলা হয়।	৯। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইহা খোলা হয়।

সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Savings Deposit Account and Fixed Deposit Account) :

সঞ্চয়ী আমানত হিসাব	স্থায়ী আমানত হিসাব
১। এইরূপ আমানত হিসাব খুলিতে হইলে স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা দিতে হয়।	১। এই প্রকার আমানত হিসাব খুলিতে হইলে আমানত করিবার সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে জমা দিতে হয়।
২। এইরূপ আমানত চালু রাখিতে হইলে নির্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ টাকা সব সময়ের জন্য জমা রাখিতে হয়।	২। এইরূপ আমানত চালু রাখিতে হইলে আমানতের সম্পূর্ণ টাকাই চুক্তিবদ্ধ সময়ের জন্য জমা রাখিতে হয়।
৩। এইরূপ আমানত ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা এবং তোলা যায়। তবে মাসে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কয়েকবারের বেশী তোলা যায় না।	৩। এইরূপ আমানত ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা যায় না এবং চুক্তিবদ্ধ সময়ের পূর্বে আমানত তোলাও যায় না।
৪। ইহাতে অর্থ জমা দিলে ব্যাঙ্ক পাশবই (Pass Book) দেয়।	৪। ইহাতে অর্থ জমা দিলে ব্যাঙ্ক মিয়াদী আমানত প্রত্যয়নপত্র (Fixed Deposit Receipt) দেয়।
৫। ইহাতে স্বল্প হারে সুদ পাওয়া যায়।	৫। ইহাতে অধিক হারে সুদ পাওয়া যায়।
৬। ইহাতে সময়-ভিত্তিক চুক্তির প্রয়োজন নাই।	৬। ইহাতে সময়-ভিত্তিক চুক্তি করিতে হয়।
৭। এইরূপ আমানতের টাকা চেক কাটিয়া হস্তান্তর করা যায়।	৭। এইরূপ আমানতের টাকা চেক কাটিয়া হস্তান্তর করা যায় না।
৮। এইরূপ আমানতের মাধ্যমে দেনাদারের নিকট হইতে পাওয়া চেক ভাঙান যায়।	৮। এইরূপ আমানতের মাধ্যমে চেক ভাঙান যায় না।
৯। এইরূপ আমানত খুলিতে ঐ ব্যাঙ্কের কোন আমানতকারীর অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।	৯। এইরূপ আমানত চুক্তিতে সাধারণতঃ কোন পরিচিতির প্রয়োজন হয় না, তবে কোনও কোনও ব্যাঙ্ক পরিচিতি চাহিয়া থাকে।
১০। এইরূপ আমানত হইতে মাঝে মাঝে টাকা তোলা যায় বলিয়া আমানতকারী সুবিধা পায়।	১০। চুক্তিবদ্ধ সময়ের পূর্বে সাধারণতঃ এইরূপ আমানত তোলা যায় না। মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে আমানত তুলিলে সুদের হার কমিয়া যায়।

মিয়াদী আমানত ও চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানতের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Time Deposit and Demand Deposit) :

মিয়াদী আমানত হইল সময়-ভিত্তিক আমানত। স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) মিয়াদী আমানতের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার স্থায়ী আমানত, অতি স্বল্প-মিয়াদী আমানত (Money at call and short notice) ও পৌনঃপুনিক আমানত (Recurring Deposit) মিয়াদী আমানতের উদাহরণ। ইহাতে মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে সাধারণতঃ অর্থ তোলা যায় না।

চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানত বলিতে চলতি আমানতকে বুঝায়। এইরূপ আমানত হইতে ইচ্ছামত অর্থ তোলা যায়।

সঞ্চয়ী আমানত আংশিকভাবে মিয়াদী আমানত এবং আংশিকভাবে চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানত।

ইহাদের পার্থক্য নিম্নে আলোচিত হইল :

মিয়াদী আমানত	চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানত
১। এই প্রকার আমানত খুলিতে হইলে আমানতের সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে জমা দিতে হয়।	১। এই প্রকার আমানত খুলিতে হইলে সামান্য পরিমাণ টাকা জমা দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেশে চলতি আমানতের ক্ষেত্রে শহর ও মেট্রোপলিটান অঞ্চলে বর্তমানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ন্যূনতম ৩০০ টাকা জমা দিয়া এইরূপ আমানত হিসাব খুলিতে হয়।
২। এইরূপ আমানত সময় ভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে খোলা হয়।	২। ইহাতে সময় ভিত্তিক চুক্তির প্রয়োজন হয় না।
৩। এইরূপ আমানত হইতে মিযাদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে সাধারণতঃ জমা টাকা তোলা যায় না।	৩। ইহাতে ইচ্ছামত আমানত হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায়। তবে সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মাসে নির্দিষ্ট কয়েকবারের বেশী অর্থ তোলা যায় না।
৪। ইহাতে সুদের হার সর্বাপেক্ষা বেশী। তবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে টাকা তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে বাট্টা (Discount) দিতে হয় বলিয়া সুদের হার অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়।	৪। চলতি আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কোন সুদ দেয় না ; উপরন্তু, ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদেয় সেবার জন্য কিছু মূল্য (Bank Charges) ব্যাঙ্ক কাটিয়া লয়। কিন্তু সঞ্চয়ী আমানতে ব্যাঙ্ক সামান্য হারে সুদ দেয়।
৫। কারবারের ক্ষেত্রে ইহা অসুবিধাজনক, কারণ ইহা স্থির আমানত এবং প্রয়োজনে ইহা হইতে অর্থ তোলা যায় না	৫। কারবারের ক্ষেত্রে এইরূপ আমানত সুবিধাজনক ; কারণ প্রয়োজনে ইহা হইতে অর্থ তোলা যায়।
৬। এইরূপ আমানত চালু রাখিতে হইলে আমানতের সম্পূর্ণ টাকাই জমা রাখিতে হয়।	৬। এই প্রকার আমানত চালু রাখিতে হইলে নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হয়।

ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান (Lending by Bank) : ব্যাঙ্কের কার্যের মধ্যে উহার মক্কেলগণকে ঋণ প্রদান করা ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক যখন মক্কেলকে ঋণ প্রদান করে তখন জামানত বা প্রত্যাভূতি (Security) দাবী করে। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে হইলে ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকার দ্রব্য জামিন হিসাবে রাখিতে হয়। জামিনের মূল্য ও ঋণের পরিমাণের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাকে **মার্জিন (Margin)** বলে। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ঋণের ঝুঁকি কমাইবার জন্য ২০ হইতে ৩০ শতাংশ মার্জিন রাখিয়া ঋণ দেয়। যে সম্পদ ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য জামানত (Security) হিসাবে রাখা হয়, মক্কেল সময়মত ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্ক সেই জামানত বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইতে পারে। যে দ্রব্য ব্যাঙ্কের নিকট জামানত হিসাবে

রাখা হয় সেই দ্রব্যে মক্কেলের মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে সেই জামানত গ্রহণ করা হয় না। মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণক দলিলপত্রাদি ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। মনে করা যাক, কেহ জমি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে। সে ক্ষেত্রে জমির মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণক দলিল ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। নির্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্কের বন্ধকী জমি বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে। ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে মক্কেলকে ঋণ প্রদান করে :

(১) **অধিবিকর্ষ বা জমাতিরিক্ত গ্রহণ** (**Overdraft**) ঃ সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে যে অর্থ জমা থাকে তাহার অধিক অর্থ কখনও ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায় না ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্ক মক্কেলকে জমার অতিরিক্ত অর্থ তুলিয়া লইবার অধিকার দিতে পারে। যদি ব্যাঙ্ক চলতি হিসাব হইতে অতিরিক্ত অর্থ তুলিবার অধিকার দেয়, তাহা হইলে উহাকে **অধিবিকর্ষ** (**Overdraft**) বলে। ইহার পরিমাণ অল্প এবং পরিশোধের সময়ও স্বল্প।

অধিবিকর্ষ দ্বারা ঋণ লইতে হইলে পূর্বেই ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থের অধিবিকর্ষের অধিকার দেয় মক্কেল নিজের হিসাবেই চেক কাটিয়া সেই পরিমাণ অর্থ তুলিয়া লইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যত টাকা তোলা হয় তাহার উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে জামিন না লইয়াও এই সুযোগ দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগত জামিনেও এইরূপ সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) **রোক ঋণ** (**Cash Credit**) ঃ ব্যবসায় চালু রাখিবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ী এইরূপ ঋণ লইয়া থাকে। এইরূপ ঋণ ব্যাঙ্ক ও ঋণ-গ্রহীতার মধ্যে চুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ-গ্রহীতাকে দেওয়া হয়। ঋণের টাকা ঋণ-গ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা থাকে এবং ঋণ-গ্রহীতা প্রয়োজন অনুসারে চেক কাটিয়া উহা তুলিতে পারে। রোক ঋণে যে টাকা প্রকৃত তোলা হয় তাহারই উপর ব্যাঙ্ক সুদ দাবী করে। পরিশোধিত ঋণ পুনরায় ঋণ হিসাবে রোক ঋণ হিসাব (Cash Credit Account) হইতে তোলা যায়।

(৩ **ব্যাঙ্কের ঋণ** (**Bank Loan**) ঃ আমানতকারী ইচ্ছা করিলে অধিবিকর্ষ ব্যবস্থা না করিয়া সরাসরি ঋণের আবেদন করিতে পারে। ঋণ মঞ্জুর করিবার পূর্বে ব্যাঙ্ক ঋণের অর্থ পরিমিত জামানত লইয়া থাকে। চুক্তির শর্ত অনুসারে মক্কেল ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্ক জামানত বিক্রয় করিয়া ঋণের অর্থ আদায় করে। ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে ঋণ মঞ্জুর করা হইবে সেই ঋণের অর্থ যদি মক্কেল নাও তুলিয়া লয় তাহা হইলেও যে সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে সেই সময়ের জন্য সুদ দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধের শর্ত স্থির করিয়া ঋণ-গ্রহীতা ব্যাঙ্কের সহিত একটি চুক্তি করিবে। এইরূপ ঋণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য লওয়া হয়।

(৪) **অগ্রিম** (**Advance**) ঃ বিলের টাকা আদায় বা সংগ্রহার্থে ব্যাঙ্কের নিকট বিল জমা দিলে ব্যাঙ্ক বিলদাতাকে অগ্রিম অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে ঋণ দেয়।

(৫) **বাট্টা দিয়া হুণ্ডি ভাঙানো (Discounting Bill)**ঃ হুণ্ডির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্ক অনুত্তীর্ণ সময়ের জন্য বাট্টা (Discount) লইয়া নগদ টাকা প্রদান করে। ইহাও ঋণপ্রদানের একটি পদ্ধতি।

(৬) ইহা ছাড়া **ঋণের প্রত্যয়নপত্রের (Letter of Credit)** মাধ্যমে ব্যাঙ্ক আমদানিকারককে ঋণ প্রদান করে।

ব্যাঙ্ক কেবল ব্যবসায়ীকেই স্বল্প-মিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে।

অধিবিকর্ষ ও রোক ঋণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Overdraft and Cash Credit)ঃ

অধিবিকর্ষ	রোক ঋণ
১। ইহাতে কোন পৃথক ঋণের হিসাব খোলা হয় না। ঋণ-গ্রহীতার চলতি আমানত হিসাবেই ইহা দেখান হয়।	১। ইহাতে একটি পৃথক ঋণের হিসাব ঋণ-গ্রহীতার নামে খোলা হয়।
২। ইহা অতি স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা।	২। ইহা স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা।
৩। ঋণ-সীমার মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রকৃতপক্ষে অধিবিকর্ষ করা হইয়াছে, তাহারই উপর সুদ দিতে হয়।	৩। রোক ঋণ-সীমার মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ তোলা হইয়াছে, তুলিবার দিন হইতে সেই পরিমাণ অর্থের উপর সুদ দিতে হয়।
৪। ইহা কারবারে বিশেষ প্রচলিত।	৪। ইহা তেমন প্রচলিত নহে, কারণ ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থায় বিশেষ আগ্রহী নয়। ইহাতে ব্যাঙ্কের টাকা কিছুদিন আটকাইয়া থাকে।
৫। ইহাতে ব্যক্তিগত জামিনেও ঋণ পাওয়া যায়।	৫। ইহাকে দ্রব্য জামিন হিসাবে রাখিতে হয়।
৬। ইহাতে ব্যাঙ্কের সহিত পূর্বেই একটি **অস্থায়ী ব্যবস্থা** (Temporary arrangement) করিতে হয়।	৬। ইহাতে ব্যাঙ্কের সহিত পূর্বেই একটি **স্থায়ী ব্যবস্থা** (Parmanent arrangement) করিতে হয়।
৭। ইহাতে ঋণের অর্থের পরিমাণ স্বল্প।	৭। ইহাতে ঋণের অর্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।
৮। ঋণের পরিশোধিত অর্থ পুনরায় তোলা যায় না।	৮। ঋণের পরিশোধিত অর্থ পুনরায় তোলা যায়।

ব্যাঙ্ক ঋণ ও অধিবিকর্ষের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Loan and Overdraft) ঃ

ব্যাঙ্ক ঋণ	অধিবিকর্ষ
১। ইহাকে পৃথক ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়।	১। ইহাকে পৃথক ঋণ হিসাবে লেখা হয় না। ঋণ-গ্রহীতার চলতি আমানত হিসাবেই ইহা দেখান হয়।
২। ইহা মধ্য-মিয়াদী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা।	২। ইহা অতি স্বল্প-মিয়াদী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা।
৩। ঋণের সমস্ত অর্থের উপর সুদ দিতে হয়।	৩। ঋণ-সীমার মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রকৃতপক্ষে অধিবিকর্ষ করা হইয়াছে, শুধু তাহারই উপর সুদ দিতে হয়।
৪। কারবারে এইরূপ ঋণ-ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত।	৪। অধিবিকর্ষ ঋণ-ব্যবস্থাও প্রচলিত, তবে ব্যাঙ্ক ঋণ-ব্যবস্থা অপেক্ষা কম প্রচলিত।
৫। ইহাতে দ্রব্য জামিন হিসাবে বন্ধক রাখিতে হয়।	৫। ইহাতে ব্যক্তিগত জামিনেও ঋণ পাওয়া যায়।
৬। ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়।	৬। ইহা অস্থায়ী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা।
৭। ইহাতে অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ পাওয়া যায়।	৭। ইহাতে ঋণের অর্থের পরিমাণ স্বল্প।

ব্যাঙ্ক ঋণ ও রোক ঋণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Bank Loan and Cash Credit) ঃ

ব্যাঙ্ক ঋণ	রোক ঋণ
১। ইহা মধ্য-মিয়াদী ঋণ-ব্যবস্থা।	১। ইহা স্বল্প-মিয়াদী ঋণ-ব্যবস্থা।
২। ঋণের সমস্ত অর্থের উপর সুদ দিতে হয়।	২। রোক ঋণ-সীমার মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রকৃত তোলা হইয়াছে, তুলিবার দিন হইতে সেই পরিমাণ অর্থের উপর সুদ দিতে হয়।
৩। কারবারে এইরূপ ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয়।	৩। এইরূপ ঋণ-ব্যবস্থা তেমন প্রচলিত নহে। কারণ, ব্যাঙ্ক এইরূপ ঋণ-ব্যবস্থায় বিশেষ আগ্রহী নয়।

ব্যাঙ্ক ঋণ	রোক ঋণ
৪। ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত স্থায়ী একটি ব্যবস্থা করিতে হয়।	৪। ইহাও ব্যাঙ্কের সহিত পূর্বে স্থিরীকৃত একটি স্থায়ী ব্যবস্থা।
৫। ইহাতে অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে পাইবার সুবিধা আছে।	৫। ইহাতে মাঝারি পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়।
৬। ঋণের পরিশোধিত অর্থ পুনরায় তোলা যায় না।	৬। ঋণের পরিশোধিত অর্থ পুনরায় তোলা যায়।

বিভিন্ন প্রকারের জামানত বা প্রত্যাভূতি (Different Forms of Security) ঃ

লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত ও সুদপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জামিন (Security) যেমন, স্বর্ণ, সরকারী ঋণ-পত্র, জীবন-বীমা পলিসি ইত্যাদি রাখিয়া ঋণ প্রদান করে। উপযুক্ত মার্জিন রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। জামিন ছাড়াই যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাকে **জামিনবিহীন ঋণ** (Clean Credit or Advance) বলে।

ব্যাঙ্কের ঋণ-সৃষ্টি (Creation of Credit by Banks) ঃ

অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, কারেন্সি নোট ও মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ—এই দুইটির যোগফল = মোট অর্থের পরিমাণ। কারেন্সি নোট ও মুদ্রা আইনানুগ অর্থ (Legal Tender), কারণ, পাওনাদার (Creditor) দেনাদারের (Debtor) দ্বারা ঋণ-পরিশোধার্থে প্রদত্ত এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ—যেমন, চেক ইত্যাদি আইনানুগ অর্থ নহে, কারণ ইহা গ্রহণ করিতে দেনাদারদের বাধ্যবাধকতা নাই।

ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে (Loan creates a deposit)। ব্যাঙ্ক যখন কোন কারবারীকে ঋণ দেয় তখন ব্যাঙ্ক কারবারীকে উহার উপর চেক কাটিবার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কেবল আমানতকারীই চেক কাটিবার অধিকারী। ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণ দিতে পারে এই কারণে যে, সমস্ত আমানতকারী একই সঙ্গে এবং একই সময়ে তাহাদের আমানতের সমস্ত অর্থ তুলিয়া লয় না। ঋণ-গ্রহীতাকে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিবার অধিকার প্রদান করিবার এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করে।

মোট আমানতের পরিমাণ $(\Sigma) = \frac{a}{1-r}$ যেখানে, a = প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ

= ১০,০০০ টাকা (ধরা হইল);

বিধিবদ্ধ নগদ সঞ্চিতি (Statutory Cash Reserve) = ১০% (ধরা হইল);

এবং r = সাধারণ অনুপাত (Common Ratio) = ৯/১০ ;

$$\Sigma = \frac{১০০০}{১-\frac{৯}{১০}} = \frac{১০০০}{\frac{১}{১০}} = ১০,০০০ \text{ টাকা।}$$

সুতরাং ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট আমানত = মোট আমানত − প্রাথমিক আমানত
= টাঃ (১০,০০০ − ১,০ ০
= ৯,০০ টাকা।

সুবিধা ঃ

(ক) ঋণ-পদ্ধতি অর্থের ব্যবহারে সুবিধা প্রদান করে।

খ) ইহা বৃহদায়তন সংস্থাকে অর্থ প্রদান করিয়া সুবিধা দান করে।

(গ) ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুসারে উৎপাদন কার্য চালাইতে ঋণ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করে।

(ঘ) ইহা অধিকতর উৎপাদনক্ষম সংস্থায় সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(ঙ) আপৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অর্থ সরবরাহ করিয়া ইহা সাহায্য করে।

চ) সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত ঋণ কারবারে ও দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনে।

অসুবিধা ঃ

(ক) অধিক ঋণ প্রদানের ফলে কারবারে ফাটকা দেখা দেয়। কারবারিগণ এই ঋণের সাহায্যে পণ্য মজুত করিয়া অযথা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও ভোগকারীকে শোষণ করে।

খ) সহজলভ্য ঋণের অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) দেউলিয়া সংস্থাকে ঋণ প্রদান করিলে তাহা অনাদায়ী ঋণে পরিণত হয়।

জামিনের প্রকারভেদ ঃ

১) **ব্যক্তিগত জামিন Personal Security** ঃ ঋণ-গ্রহীতার আর্থিক সচ্ছলতা, সুনাম ও ব্যাঙ্কের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে ব্যক্তিগত জামিনে ব্যাঙ্ক স্বল্প সময়ের জন্য অল্প ঋণ দিয়া থাকে।

(২) **ব্যক্তিগত জামিন ও জামিনদার (Personal Security and Guarantor)** ঃ ঋণ-গ্রহীতা ব্যাঙ্কের সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলে ও তাহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলে ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতাকে টাকা ধার দেয় তখনই, যখন টাকা পরিশোধের দায়িত্ব অন্য কোন জামিনদার (Guarantor) গ্রহণ করে।

(৩) **সম-জামিন (Collateral Securities)** ঃ সম-জামিনে বন্ধকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে।

সম-জামিন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যেমন, (ক) **লিয়েন** (Lien), (খ) **প্লেজ** (Pledge), (গ) **হাইপথিকেশন** (Hypothecation), (ঘ) **মর্টগেজ** (Mortgage) ও (ঙ) **ট্রাস্ট রিসিপ্ট** (Trust Receipt)।

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্প-মিয়াদী ঋণ-সংস্থানের পদ্ধতি ঃ

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে আবর্তন পর্যায়ে পুঁজির (Working or Circulating Capital) প্রয়োজন অধিক। সাধারণতঃ ব্যবসা সংস্থাসমূহ ব্যাঙ্ক হইতে এই অর্থ

সংগ্রহ করে। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ রোক ঋণ, অধিবিকর্ষ ও ব্যাঙ্ক ঋণ-এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

রোক ঋণ (Cash Credit) পদ্ধতিতে ঋণ দিবার সময় উৎপন্ন দ্রব্য অথবা উৎপাদিত পণ্য কোন অনুমোদিত গুদাম অথবা ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে জামিন হিসাবে জমা রাখিতে হয়।

অধিবিকর্ষ (Overdraft) পদ্ধতিতে জামিন হিসাবে ব্যাঙ্কের নিকট স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্য, শেয়ার, স্টক, ডেলিভারী অর্ডার ইত্যাদি জমা রাখিয়া ঋণ প্রদান করা হয়।

ব্যাঙ্ক ঋণ (Loan) পদ্ধতিতে শেয়ার, স্টক ইত্যাদি ঋণের সম-জামিন (Collateral Securities) হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে।

ক্ষুদ্রায়তন ও অধিকাংশ গ্রামীণ শিল্পে সাধারণতঃ দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ চড়া সুদে হ্যাণ্ডনোটের বিনিময়ে টাকা ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ঋণদান এই সকল ক্ষেত্রে এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

রপ্তানি ব্যবসায়ে বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ স্বীকারযোগ্য দলিলী হুণ্ডি বা D/A Bills (Documents against Acceptance) বাট্টা লইয়া ভাঙ্গাইয়া দেয়।

আমদানি ব্যবসায়ে আমদানিকারক ব্যাঙ্কের নিকট পণ্য বন্ধক (Hypothecation) রাখিয়া অর্থ-সংস্থান করিতে পারে।

ব্যাঙ্ক ও তাহার গ্রাহকের সম্পর্ক (Relationship between Banker and Customer):

ব্যাঙ্ক অর্থ-ব্যবসায়ী। আমানতকারীর সহিত ব্যাঙ্কের নিয়মিত ও সংগঠিত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের গ্রাহক (Customer) আমানতকারী নাও হইতে পারে। ব্যাঙ্ক এই গ্রাহককে সাময়িক সেবাকার্যের দ্বারা সাহায্য করে, যেমন অনেক সময় আমানতকারী না হইয়াও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক ড্রাফট (Bank Draft) বা ট্রাভেলার্স চেক (Travellers' Cheque) কিনিতে পারে।

ব্যাঙ্ক ও তাহার গ্রাহকের সম্পর্ক সাধারণতঃ উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাঙ্কের সহিত তাহার গ্রাহকের সাধারণ সম্পর্কসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক **ঋণ-গ্রহীতা বা অধমর্ণ** (Debtor) এবং আমানতকারী **ঋণদাতা বা উত্তমর্ণ** (Creditor)। কিন্তু ব্যাঙ্ক আমানতকারীর জমা অর্থের অছি (Trustee) বা তত্ত্বাবধায়ক (Custodian) নহে। কারণ, ব্যাঙ্ক সাধারণ অছি ও তত্ত্বাবধায়কের মত গচ্ছিত অর্থ তাহার প্রয়োজন বা ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকারীও নহে। কিন্তু ব্যাঙ্ক আমানতকারীর জমা অর্থ তাহার ব্যবসায়ে ঋণদান ইত্যাদি কার্যে ব্যবহার করিতে পারে।

(২) **ব্যাঙ্ক সাধারণ ঋণ-গ্রহীতা বা অধমর্ণের মত নহে।** সাধারণ ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণের মিয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিশোধ করিতে বা অর্থ ফেরত

দিতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে আমানতকারী অর্থ চাহিদা করিলে তবেই অর্থ প্রদান করে।

(৩) ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর প্রতিনিধি (Agent) হিসাবে অনেক কাজ করিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক আমানতকারীর পক্ষে অন্য ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেকের অর্থ আদায়, শেয়ারের উপর লভ্যাংশ আদায়, শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়, পেনশন আদায়, বীমার প্রিমিয়াম প্রদান ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকে।

(৪) ব্যাঙ্ক আমানতকারী অথবা অন্য গ্রাহকের সম্পত্তির অছি (Trustee) হিসাবে কাজ করে বলিয়া মক্কেলগণের সহিত অছির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

(৫) ব্যাঙ্ক গ্রাহকের তত্ত্বাবধায়কের (Custodian) কাজ করে এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও দলিলপত্রাদি নিরাপদে রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

(৬) ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে নোটিশ দিয়া অথবা আমানতকারীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া সেই আমানতকারীর ঐ ব্যাঙ্কে খোলা বিভিন্ন হিসাব একত্রে যুক্ত করিতে পারে। এই যুক্তকরণের উদ্দেশ্য হইল ডেবিট ব্যালান্স কাটাইয়া আমানতকারীর সপক্ষে ক্রেডিট ব্যালান্স সৃষ্টি করা।

(৭) ভারতীয় চুক্তি-আইন অনুসারে ব্যাঙ্ক সাধারণ পূর্বস্বত্ব (General lien) বলে বিপরীত মর্মে চুক্তি না থাকিলে, সমগ্র পাওনা টাকা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিকট গচ্ছিত দ্রব্যাদি আটক করিতে পারে।

(৮) ব্যাঙ্ক সাধারণভাবে তাহার আমানতকারীর হিসাবের গোপনীয়তা (Secrecy) রক্ষা করিবে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর হিসাবের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে। যেমন—

(ক) যখন আমানতকারী নিজেই তাহার হিসাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়।

(খ) যখন আদালত নির্দেশ দেয়।

(গ) দেশের কোন আইন অনুসারে—যথা, আমানতকারীর হিসাব প্রকাশ করা ব্যাঙ্কের জন-কর্তব্য (Public duty)।

(ঘ) ব্যাঙ্কের নিজস্ব স্বার্থরক্ষার জন্য।

(ঙ) যখন প্রতিশ্রুতিদাতা (Guarantor) আমানতকারীর হিসাবের অবস্থা জানিতে চাহে।

(চ) নিকাশী-ব্যবস্থায় একটি ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট আমানতকারীর হিসাব প্রকাশ করিতে পারে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (**Reserve Bank of India**) :

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া শেয়ার-হোল্ডার ব্যাঙ্ক হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার

পরবর্তীকালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (IMF) সদস্য হইবার পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উহা আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য দায়িত্বশীল। দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শক (Friend, philosopher and guide) হিসাবে কাজ করে। ভারতের মত উন্নয়নশীল (Developing) দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য-কলাপকে 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড' (Bank of England)-এর অনুকরণে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :

(১) নোট প্রচলনের কাজ (Note Issue Function) এবং

(২) ব্যাঙ্কের বিভাগীয় কার্য-কলাপ (Banking Functions)।

ইহা ছাড়া ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও নানাবিধ কার্য-কলাপ রহিয়াছে। কৃষি-ঋণ বিভাগ, ব্যাঙ্ক পরিচালন বিভাগ, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, শিল্প-মূলধন বিভাগ, পরিদর্শন বিভাগ ও ব্যাঙ্ক উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা বিভাগীয় কার্য-কলাপ সম্পাদিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **নোট ছাপাইবার কাজ (Note Issue Function)** : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে নোট ছাপাইবার একমাত্র অধিকারী। স্বর্ণ, বিদেশী মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত গ্যারাণ্টি বা প্রত্যাভূতির বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা ছাপিয়া থাকে। এক টাকা মূল্যের কাগজী মুদ্রা ও অন্যান্য ধাতুমুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকার তৈয়ারী করেন। এক টাকার নোট প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা (coin), কিন্তু ধাতুর অপ্রাচুর্যের দরুন বর্তমানে কাগজী মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইতেছে।

পূর্বে কাগজী নোট ছাপাইতে হইলে আনুপাতিক হারে স্বর্ণ অথবা স্টার্লিং জমা রাখিতে হইত। ইহাকে আনুপাতিক জমা পদ্ধতি (Proportionate Reserve System) বলা হইত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এই পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বনিম্ন জমা পদ্ধতি (Minimum Reserve System) প্রচলন করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে যে কোন পরিমাণের কাগজী নোট ছাপাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট ২০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা রিজার্ভ রাখিতে পারে। ইহার মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা অবশ্যই রাখিতে হইবে।

(২) **সরকারের ব্যাঙ্ক (Government's Banker)** : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। এই ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে সরকারকে স্বল্পকালীন ঋণ দিয়া থাকে। ইহা সরকারী ঋণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে ও সরকারের পক্ষে অর্থ স্থানান্তর করে। ইহা সরকারের হইয়া বিদেশী মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করে এবং ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়।

(৩) **ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক** (**Banker's Bank**) : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহকে এই ব্যাঙ্কের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশের বিবৃতি দিতে হয় এবং মোট চলতি ও মিয়াদী আমানতের শতকরা ১০ ভাগ জমা রাখিতে হয়।

(৪) **শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত ঋণদাতা** (**Lender of Last Resort**) : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ যখন অন্য কোনও উৎস হইতে ঋণ পাইতে সমর্থ হয় না তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত ঋণদাতা বা কর্জদাতা হিসাবে আপৎকালীন ঋণ প্রদান করে। কোনও সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ব্যাঙ্ক-রেট (Bank Rate) দিয়া ঋণপত্র ভাঙ্গাইয়া ঋণ সংগ্রহ করে। ইহা তফসিলী ব্যাঙ্কের অর্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিনাব্যয়ে প্রেরণ করে।

(৫) **টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা** (**Maintenance of Exchange Value of Currency**) : আই এম এফ (IMF)-এর সহায়তায় নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা করিয়া থাকে।

(৬) **নিকাশী ঘরের কাজ** (**Acts as Clearing House**) : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের কাজ করে এবং চেকের মাধ্যমে আদান-প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ইহার মাধ্যমে দেনা-পাওনা মিটাইতে পারে।

(৭) **কৃষি-ঋণ** (**Agricultural Credit**) : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে ঋণ দেয় এবং জাতীয় কৃষি-ঋণদান তহবিল (দীর্ঘকালীন) [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] ও জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থায়িত্ব বিধানকারী) তহবিল [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]-এর মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে মাঝারি-মিয়াদী ঋণ প্রদান করে।

(৮) **ঋণ-নিয়ন্ত্রণ** (**Credit Control**) : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বজায় রাখা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে **নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বিস্তৃতির** (Controlled Economic Expansion) নীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে : (১) ব্যাঙ্ক-রেট পরিবর্তন, (২) জমার অনুপাত পরিবর্তন, (৩) খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়, (৪) বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (৫) ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ স্থিরীকরণ, (৬) নৈতিক প্রবর্তনা, (৭) প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় নিয়ন্ত্রণবিধি।

(৯) **পরামর্শদাতা** (**Advisor**) : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া থাকে।

(১০) **বিবিধ কার্যাবলী** (**Miscellaneous Functions**) : সাময়িক বুলেটিন প্রকাশ, অর্থনৈতিক গবেষণাকার্য পরিচালনা, ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কার্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ (Credit Control Measures by the Central Bank) ঃ

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার (Weapons) আছে। ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) ব্যাঙ্ক-রেট (Bank Rate) ঃ যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হুণ্ডিগুলি পুনর্বাট্টা করে, তাহাকে ব্যাঙ্ক-রেট বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি এবং মুদ্রা-সংকোচের (Deflation) সময় ব্যাঙ্ক-রেট কমাইয়া দেয়। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতি ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাঙ্ক-রেটের পরিবর্তন সংগঠিত টাকার বাজারে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি পাইলে মার্কেট-রেট, অ্যাডভান্স-রেট, ইন্টারেস্ট-রেট ইত্যাদিও সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে অধিক বাট্টা দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিল ভাঙ্গাইতে হয় এবং এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ঋণপ্রদানে উৎসাহিত হয় না। ইহার ফলে বাজারে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমিয়া যায় ও মোট টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়। এইভাবে ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০% ব্যাঙ্ক-রেট ধার্য করিয়াছে। ব্যাঙ্ক-রেট পরিবর্তনশীল।

অনুরূপভাবে মুদ্রা-সংকোচের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট হ্রাস করিয়া এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে।

(২) খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় (Open Market Operation ঃ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধির সহিত খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এই ঋণপত্র ক্রয় করিলে তাহাদের ঋণপ্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়, কারণ ঋণপ্রদানযোগ্য নগদ অর্থ ঋণপত্র ক্রয় করিতে খরচ হইয়া যায়। অন্যদিকে, মুদ্রা-সংকোচের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিতে থাকে ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্র বিক্রয়ের ফলে ঋণদানযোগ্য নগদ অর্থ হাতে পায়।

(৩) জমার অনুপাত পরিবর্তন (Variable Reserve Ratio) ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অথবা কমাইয়া ঋণ সংকোচন অথবা ঋণ সম্প্রসারণ করিতে পারে। আমানত দুই প্রকারের হয় ; যেমন, (ক) চলতি আমানত (Demand Deposit) ও (খ) মিয়াদী আমানত (Time Deposit)। জমার অনুপাত বৃদ্ধি করিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ঋণপ্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং জমার অনুপাত হ্রাস করিলে ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধিত আইন অনুসারে ভারতে চলতি ও মিয়াদী মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়।

(৪) **আইনানুগ নগদ জমা বা সঞ্চিতি (Statutory Cash Reserve)**: অনুপাত হইল ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নগদ অর্থ ও ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের অনুপাত, নগদ অর্থাৎ নগদ অনুপাত $= \frac{\text{নগদ অর্থ}}{\text{ঋণ}}$। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের সাহায্যে ব্যাঙ্কে নগদ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ঋণপ্রদানের ক্ষমতা সংকুচিত করিতে পারে। এই ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে গ্রহণ করা হয়। আবার মুদ্রা-সংকোচের সময় নগদ জমার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারতে বর্তমানে আইনানুগ জমা ৩৮% করা হইয়াছে।

(৫) **নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control)**: এই পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে কোন কোন্ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া যাইবে, তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহের ঋণের বরাদ্দ (Quota), ঋণদানের মার্জিন (Margin) ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেয়। ব্যাঙ্কসমূহকে ঋণদানের নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন সুদের হার বজায় রাখিবার নির্দেশও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিয়া থাকে।

(৬) **নৈতিক প্রবর্তনা (Moral Suasion)**: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলির নৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নানারূপ নির্দেশ ও অনুরোধ জানাইয়া থাকে। যদিও ব্যাঙ্কসমূহ এই অনুরোধ মানিতে বাধ্য নহে, তথাপি ইহারা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরোধ অমান্য করে না।

(৭) **প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণবিধি (Direct Action)**: নির্দেশ অমান্য করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরাসরি নির্দেশ অমান্যকারী ব্যাঙ্ককে ঋণদান স্থগিত রাখিতে পারে, অথবা ইহার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিতে পারে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে **নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ নীতি** (Controlled Expansion Policy) গ্রহণ করিয়াছে তাহা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। প্রথমতঃ, ইহা ফাটকা ঋণকে নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা উন্নয়নমূলক ঋণকে সম্প্রসারণ করিবে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের **"প্যাকেজ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা"** (Package Credit Control Scheme) পর্দ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে:

(১) ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি করিয়া ১০% করা,

(২) আইনানুগ নগদ জমা ৩৮% করা,

(৩) চলতি ও মিয়াদী জমার অনুপাত ৮% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০% করা, এবং

(৪) ঋণদানের সর্বনিম্ন সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া ১২% করা।

ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India):

এ. ডি. গরওয়ালার নেতৃত্বে গঠিত 'অল্ ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি'র সুপারিশ অনুসারে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক' জাতীয়করণ করা হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই। জাতীয়করণের পর ইহার নাম হয় 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২০ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ৫·৬ কোটি টাকা। ইহার

শাখা নিজস্ব ৭,৫৭৭টি এবং অধীনস্ত ৩,৭৮৪টি অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্কের মোট শাখা ১১,৩৬১টি (৩১.১২.৮৭ পর্যন্ত)। ৩১.৩.৮৭ পর্যন্ত দেশের মোট ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৫৩,৫৬৭টি। সুতরাং স্টেট ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের শাখার প্রায় ⅕ অংশ। ইহার ৪৮% শাখা গ্রামে বা আধা শহর এলাকায় অবস্থিত। শাখার সংখ্যার দিক হইতে ইহা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মীর সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যা অপেক্ষা বেশী।

কার্যাবলী ঃ স্টেট ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজ ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণ সরবরাহ করা ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। ইহা সর্বোচ্চ ১০ বৎসরের মিয়াদী ঋণ প্রদান করিবার অধিকারী।

(২) **গ্রামীণ ঋণদান ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করে। গ্রামাঞ্চলে ঋণ-ব্যবস্থার প্রসার, গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত করা, সমবায় ও ঋণদান সমিতিসমূহকে অধিক ঋণ মঞ্জুর, সমবায় বিক্রয় সমিতিসমূহকে ঋণদান, কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-ঋণ প্রদান, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহকে আর্থিক ও অর্থপ্রেরণের সুযোগ দান ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান ঃ** ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্টেট ব্যাঙ্ক স্বয়ং অথবা 'স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন'-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সরবরাহ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট ব্যাঙ্ক 'পথ-নির্দেশক পরিকল্পনা' (Pilot Scheme) প্রবর্তন করে। স্টেট ব্যাঙ্ক অন্যান্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্পকে এই পরিকল্পনা অনুসারে ঋণদান করে। উদার ঋণনীতি (Liberalised Credit Scheme) অনুসারে স্টেট ব্যাঙ্ক অন্যান্য ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য-কলাপের সংযোজনা (Co-ordination) করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করিয়াছে। ঋণের সুদের হার এবং শর্তসমূহ সহজ করিয়া ইহা ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সম্প্রসারণ-নীতিকে রূপায়িত করিতেছে।

(৪) **রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক ঃ** যে সকল অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যালয় নাই সেই সকল অঞ্চলে স্টেট ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ (Bank Nationalisation) ঃ

জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এবং আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৪টি প্রথম শ্রেণীর তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া জাতীয়করণ (Nationalisation) করেন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ পার্লামেন্ট

একটি আইন পাশ করিয়া ভারত সরকার যে সকল তফসিলী ব্যাঙ্কের আমানত ৫০ কোটি টাকা বা তাহার উর্ধ্বে, সেইরূপ ১৪টি ভারতীয় ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করেন। এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহ হইল: সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কানাড়া ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, দেনা ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ মহারাষ্ট্র, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক। অধ্যাপক সেয়ার্স-এর মতে আর্থিক সম্বল বৃদ্ধি, দেশের আর্থিক সংযোজন, অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ও সমাজতন্ত্রীকরণ (Monitization, Integration and Socialisation)-এর উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। পুনরায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ৬টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়। এই ৬টি ব্যাঙ্ক হইল: বিজয়া ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব এণ্ড্ সিন্ধ্ ব্যাঙ্ক, নিউ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং অন্ধ্র ব্যাঙ্ক।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। Objects of Nationalised Banks:

১) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্বল সরকারের হাতে আসিবে

২) যে ১৪টি ব্যাঙ্ক পূর্বে জাতীয়করণ করা হইয়াছিল জাতীয়করণের সময় তাহাদের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের মোট আমানতের ৭২%। ব্যাঙ্কের একচেটিয়া মালিকানা ও কর্তৃত্বের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জাতীয় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন দূর করিয়া শিল্পক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সম্প্রসারণ এবং সমাজতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

(৩) প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার কারসাজি ও অপচয় বন্ধ করা।

(৪) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া পণ্যসামগ্রী মজুত করিয়া কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি ও ফটকাবাজী বন্ধ করা।

৫) সঠিক আয় গোপনের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে স্বনামে অথবা বেনামীতে আমানত হিসাব খুলিয়া কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করা।

(৬ ব্যাঙ্ক-বিপর্যয়ের আশঙ্কা দূর করা।

(৭) জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিবিধান করা।

(৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করা ও ব্যাঙ্কসমূহকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(৯) সামাজিক সঞ্চয়কে সরকারী পরিকল্পনা, কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনে বিনিয়োগ করা।

(১০) নূতন ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক-ঋণের সুবিধা দান করা।

(১১) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণদানের নীতি কার্যকর করা।

(১২) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে অর্থনীতি গড়িয়া তোলা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সাফল্য : ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় ১৪টি ব্যাঙ্কের মোট আমানত ছিল ২,৬২৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭২%। বর্তমানে এই আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৮৫%। জাতীয়করণের সময় ১৪টি ব্যাঙ্কের মোট ৪,১৩৪টি অফিস ছিল, অর্থাৎ দেশের মোট ব্যাঙ্ক-অফিসের ৫০%; বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা ভারতের মোট ব্যাঙ্ক-অফিসের ৮০%।

ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ : ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়করণের পর দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুরোধে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরের জন্য একটি **সম্প্রসারণ পরিকল্পনা** গ্রহণ করিয়াছে। অধিক-সংখ্যক শাখা খুলিবার ফলে বর্তমানে প্রতি ১৩ হাজার লোকের জন্য একটি করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে ৬৫ হাজার লোকের জন্য একটি ব্যাঙ্ক ছিল। নবস্থাপিত শাখাগুলির ৬০% গ্রামীণ কেন্দ্রগুলিতে খোলা হইয়াছে। ৩১শে মার্চ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মোট ব্যাঙ্কের শাখা দাঁড়াইয়াছে ৫৩,৫৬২টি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০,০৭০টি (৩০ ৬৮৫ পর্যন্ত), ইহা মোট ব্যাঙ্কের ৬০%। বর্তমানে দেশের মোট ৫·৭ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ২০,৪০০ গ্রামে ব্যাঙ্ক আছে।

আমানত বৃদ্ধি : ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়করণের পূর্বে ১৪টি ব্যাঙ্কের মোট আমানত যাহা ছিল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পরে তাহার পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত দেশের সমস্ত তফশিলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানত জমার প্রায় ৮৫ শতাংশ।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়করণের পরে ঋণদানের পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩০শে জুন, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে দাঁড়াইয়াছে ২৯,৭৭০ কোটি টাকা। এই ঋণের মধ্যে কৃষিতে ৫,১৪৪ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পে ৪,৩০১ কোটি টাকা এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ১১,৮৬৭ কোটি টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫,৯১৪ কোটি টাকা। জাতীয়করণের পর বাৎসরিক ১৬% হইতে ১৭% আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, খুচরা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি, রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণ সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাছাড়া 'লীড ব্যাঙ্ক' বা অগ্রণী ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা অনুসারে দেশের অভ্যন্তরস্থ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হইতেছে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instruments) :

ভারতের 'হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১' (Negotiable Instrument Act of India, 1881) হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (Negotiable Instrument) সংজ্ঞা

এইভাবে দিয়াছে, 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা বাহককে প্রদেয় প্রমিসরি নোট, চেক এবং বাণিজ্যিক হুণ্ডিই হস্তান্তরযোগ্য দলিল।' এই আইনে বলা হইয়াছে যে, যখন কোন দলিল নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তৈয়ারী করা হয়, তাহা হস্তান্তরযোগ্য দলিলরূপে পরিচিত হইবে। ইংরাজী **Negotiable** কথাটির অর্থ "**হস্তান্তরযোগ্য**" এবং "Instrument" কথাটির অর্থ '**লিখিত আদেশপত্র**' বা '**দলিল**'। সুতরাং Negotiable Instrument একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল বা আদেশপত্র। হস্তান্তরযোগ্য দলিল একটি লিখিত আদেশপত্র, যাহা শুধুমাত্র প্রদানের (Delivery) দ্বারা অথবা স্বত্বান্তরকরণ (Endorsement) ও প্রদানের দ্বারা হস্তান্তর করা যায়। আইন অনুসারে প্রমিসরি নোট, চেক ও বাণিজ্যিক হুণ্ডি এই তিনটিই কেবল হস্তান্তরযোগ্য দলিল। কিন্তু **হুণ্ডি** (**Hundi**) ও **ওয়ারেণ্ট** (**Warrant**) আমাদের দেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিলরূপে ব্যবহৃত হয়, অবশ্য যদি হুণ্ডিকার, গ্রাহক, প্রাপক ইত্যাদি ব্যক্তি চুক্তি করিয়া হস্তান্তরযোগ্য আইনের দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে বলিয়া স্বীকার করে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩১-নং ধারা অনুসারে বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রমিসরি নোট একই সঙ্গে বাহক প্রদেয় (Payable to bearer) এবং চাহিবামাত্র প্রদেয় (Payable on demand) এইভাবে লিখিত হইতে পারিবে না, কারণ কারেন্সি নোট এইভাবে লিখিত হয়।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Negotiable Instrument) :

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) এইরূপ দলিল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) ইহাতে দেয় ও প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই দলিলের স্বত্ব বা মালিকানা শুধুমাত্র প্রদান (mere delivery) করিয়া বা স্বত্বান্তরকরণ ও প্রদান করিয়া হস্তান্তর করা যায়।

(৪) দলিলের ধারক (Holder) বা স্বত্বাধিকারী মূল্যবান প্রতিদানের (Valuable consideration) বিনিময়ে ইহা প্রাপ্ত হয়।

(৫) সদ্বিশ্বাস ও হস্তান্তরকারীর (Transferor) স্বত্ব অবৈধ না জানিয়া দলিল লইলে হস্তান্তর-গ্রহীতা (Transferee) নির্দোষ স্বত্ব (Better title) লাভ করে। এই ক্ষেত্রে যদি দলিলে হস্তান্তরকারীর কোন স্বত্ব নাও থাকে তবুও হস্তান্তর-গ্রহীতা (Transferee) বা নিয়মানুসারে স্বত্বাধিকারী (Holder in due course) নির্দোষ স্বত্ব লাভ করে।

(৬) দলিলের অর্থ আদায় করিবার জন্য হস্তান্তর-গ্রহীতা নিজ নামে আদালতে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারে।

হস্তান্তরযোগ্য ও প্রায়-হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পার্থক্য
(Difference between Negotiable and Quasi-Negotiable Instruments)

হস্তান্তরযোগ্য দলিল	প্রায়-হস্তান্তরযোগ্য দলিল
(১) এইরূপ দলিল শুধুমাত্র প্রদান (mere delivery) অথবা স্বত্বান্তরকরণ ও প্রদানের দ্বারা (by endorsement & delivery) হস্তান্তর করা যায় এবং সদ্বিশ্বাস ও হস্তান্তরদাতার স্বত্ব (title) অবৈধ না জানিয়া দলিল পাইলে হস্তান্তর-গ্রহীতা (Transferee) নির্দোষ স্বত্ব (Better title) লাভ করে।	(১) যদিও এইরূপ দলিল শুধুমাত্র প্রদান অথবা স্বত্বান্তরকরণ ও প্রদানের দ্বারা হস্তান্তর করা যায়, তথাপি হস্তান্তর-গ্রহীতা (Transferee) হস্তান্তরদাতার (Transferor) স্বত্ব হইতে উত্তম (Better) স্বত্ব লাভ করে না। সদ্বিশ্বাস ও হস্তান্তর-দাতার স্বত্ব অবৈধ না জানিয়া দলিল লইলেও সে নির্দোষ স্বত্বের অধিকারী হয় না।
(২) এইরূপ দলিলের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করা হয়। নগদ অর্থের মতই এই দলিল দ্বারা দেনা পরিশোধ করা যায়।	(২) এইরূপ দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি স্থানান্তর করা হয়।
(৪) বাণিজ্যিক হুণ্ডি, চেক ও প্রমিসরি নোট ইহার দৃষ্টান্ত।	(৩) বহনপত্র (Bill of Lading), রেলওয়ে চালান (Railway Receipt ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত।
(৪) ইহা ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য আইনের দ্বারা পরিচালিত।	(৪) ইহা ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের দ্বারা পরিচালিত নহে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Bill of Exchange) :

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৫নং ধারায় বাণিজ্যিক হুণ্ডির সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

হুণ্ডির লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন লিখিত দলিলে উক্ত ব্যক্তি যদি কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, অপর একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে প্রদানের জন্য শর্তহীন আদেশ দেয়, তখন উক্ত দলিলকে বাণিজ্যিক হুণ্ডি বলে।

("Bill of exchange is an unconditional order in writing directing a certain person to pay a certain sum of money either to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument.")

বাণিজ্যিক হুণ্ডির বিভিন্ন পক্ষ (Parties to a Bill of Exchange) ঃ

বাণিজ্যিক হুণ্ডির সহিত সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ জড়িত। যেমন, (১) হুণ্ডি-লেখক বা হুণ্ডিকার (Drawer)—যে ব্যক্তি হুণ্ডি লিখিয়া ও সই করিয়া অর্থ প্রদানের আদেশ দেয়। (২) হুণ্ডি-গ্রাহক (Drawee)—যাহার উপর অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়। হুণ্ডি-গ্রাহক পণ্যের ক্রেতা এবং (৩) হুণ্ডি-প্রাপক (Payee)—যে ব্যক্তি হুণ্ডির অর্থ পাইবে। হুণ্ডি-লেখক ও হুণ্ডি-প্রাপক একই ব্যক্তি হইতে পারে।

হুণ্ডি-লেখক হুণ্ডিটি লিখিবার পর গ্রাহকের নিকট স্বীকৃতির জন্য পাঠায়। গ্রাহক হুণ্ডিটির উপর "স্বীকৃত" (Accepted) লিখিয়া সহি করিয়া পুনরায় উহা হুণ্ডি-লেখকের নিকট পাঠাইয়া দেয়। হুণ্ডি-লেখক নিজেই প্রাপক (Payee) হইলে ইহা নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। অন্যথায় সে ইহা প্রাপকের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এইভাবে হুণ্ডিটি যাহার নিকট থাকে, তাহাকে বাণিজ্যিক হুণ্ডির স্বত্বাধিকারী বা ধারক (Holder) বলে।

ইহা ছাড়া যখন হুণ্ডিটি স্বত্বান্তরকরণ (Endorsement) করা হয় তখন ইহাতে (ক) স্বত্বান্তরকারক (Endorser)—যিনি স্বত্ব হস্তান্তর করেন ও (খ) স্বত্বান্তর-গ্রহীতা (Endorsee)—যিনি স্বত্বান্তরের পরে গ্রাহক হন, থাকিতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক হুণ্ডি স্বীকৃত না হইলে 'প্রয়োজনবোধে হুণ্ডি-গ্রাহক' (Drawee in case of need) থাকিতে পারে। তিনি ঐ হুণ্ডি স্বীকার (Accept) করিবেন। তাঁহার নাম হুণ্ডিতে নির্দেশ করা হয়।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি স্বীকৃত না হইয়া প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হইলে পর এবং নিকরাই (Noting) বা সিকরাই (Protesting) হইবার পর যদি কোন ব্যক্তি ঐ হুণ্ডি-গ্রাহকের বা কোন স্বত্বান্তর-গ্রহীতার সম্মানার্থে উহা স্বীকার করিয়া নেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে 'সম্মানার্থে হুণ্ডি-স্বীকারী' (Acceptor for Honour) বলা হয়। ইহার নাম হুণ্ডিতে লিখিত থাকে না।

স্বত্বান্তরকরণের পর দলিলের হস্তান্তর-গ্রহীতাকে 'নিয়মানুসার স্বত্বাধিকার' (Holder in due course) বলা হয়। ইনি দলিলের পূর্ণ স্বত্ব লাভ করেন।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির শ্রেণীবিভাগ (Types of Bill of Exchange) ঃ

বাণিজ্যিক হুণ্ডি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে :

(১) **আভ্যন্তরীণ হুণ্ডি (Inland Bill) ঃ** যে হুণ্ডি ভারতে লিখিত বা প্রস্তুত এবং ভারতে প্রদেয় অথবা ভারতের কোন নাগরিক কর্তৃক বিদেশে প্রদেয় তাহাকে আভ্যন্তরীণ হুণ্ডি বলে।

(২) **বৈদেশিক হুণ্ডি (Foreign Bill) ঃ** যে হুণ্ডির প্রস্তুতকারক, গ্রাহক ও প্রাপক একই দেশের অধিবাসী নহে এবং যাহার দ্বারা একাধিক দেশের মধ্যে টাকার আদান-প্রদান ঘটে, তাহাকে বৈদেশিক হুণ্ডি বলে।

(৩) **দলিলী হুণ্ডি (Documentary Bill) ঃ** যে সকল হুণ্ডির সহিত বিক্রীত পণ্যের স্বত্ব-সম্পর্কিত দলিলগুলি সংযুক্ত থাকে, তাহাকে দলিলী হুণ্ডি বলে। এই দলিলগুলি হইল বহনপত্র (Bill of Lading), বীমাপত্র (Insurance Policy), চালান

(Invoice), জাহাজ ভাড়ার রসিদ (Freight Receipt), প্রভবলেখ (Certificate of Origin), বাণিজ্য-দূতের প্রত্যয়িত চালানী রসিদ (Consular Invoice) ইত্যাদি।

(৪) **সাহায্যকারী বা উপযোজক হুণ্ডি (Accommodation Bill):** পণ্যের লেনদেন ছাড়াই অপর কাহাকেও আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য যে বাণিজ্যিক হুণ্ডি কোনরূপ প্রতিদান (Consideration) ব্যতিরেকে লিখিত ও স্বীকৃত হয়, তাহাকে সাহায্যকারী হুণ্ডি বলে।

(৫) **কেতা হিসাবে প্রস্তুত হুণ্ডি (Bill in Sets):** এইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হুণ্ডি বিভিন্ন খণ্ডের কেতা হিসাবে ক্রমিক-সংখ্যা এবং স্ট্যাম্পযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সবগুলিই একটি হুণ্ডির অংশ। প্রাপক একটি হুণ্ডি পাইয়া গেলে অপর হুণ্ডিগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য হয়।

(৬) **ভুয়া হুণ্ডি (Fictitious Bill):** হুণ্ডি-লেখক, গ্রাহক বা প্রাপকের নাম অথবা সকলের নামই ভুয়া হইলে ইহা ভুয়া হুণ্ডি নামে অভিহিত হইবে।

(৭) **ব্যাঙ্ক হুণ্ডি (Bank Draft):** যখন একটি ব্যাঙ্ক তাহার শাখা-ব্যাঙ্কের উপর প্রাপককে অর্থ প্রদানের নিদেশ (Order) দিয়া হুণ্ডি লিখিয়া দেয়, তখন উহাকে ব্যাঙ্ক হুণ্ডি বলে।

(৮) **মুদ্দতি হুণ্ডি (Usance Bill):** বিভিন্ন দেশের রীতি অনুযায়ী বৈদেশিক হুণ্ডি পরিশোধের জন্য যে সময় নির্ধারিত থাকে সেই সময় অনুযায়ী যে হুণ্ডি প্রস্তুত করা হয় তাহাকে মুদ্দতি হুণ্ডি বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ ৯০ দিনের মিয়াদী হুণ্ডি হয়।

(৯) **দাবিমাত্র হুণ্ডি (Demand Bill):** যে সকল হুণ্ডির অর্থ দাবিমাত্র দেয়, তাহাকে দাবিমাত্র হুণ্ডি বলে।

(১০) **সময় হুণ্ডি (Time Bill):** যে সকল বাণিজ্যিক হুণ্ডির অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর দেয়, তাহাই সময় হুণ্ডি। এই ক্ষেত্রে মিয়াদের তারিখের পরেও দলিলের অর্থ প্রদানের জন্য তিনদিন সময় দেওয়া হয়। এই তিনদিনকে "রেয়াতি দিন" (Days of Grace) বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ হুণ্ডির নমুনা (Specimen of Inland Bill):

Stamp

Calcutta

Dated the 25th July, 1988

Rs. 1000/—

Three moths after date pay to me or my order, the sum of Rupees One thousand only for value received.

To
R. C. Ghosh
Calcutta

Accepted
R. C. Ghosh
26.7.88

P. Mukherjee
(Drawer)

বৈদেশিক হুণ্ডির নমুনা (Specimen of Foreign Bill) :

Stamp	

Calcutta

Dated the 25th July, 1988

Rs. 1000/—

Ninety days after sight of this first of exchange (second and third of the same tenor and the date unpaid) pay to Chartered Bank, London or order the sum of Rupees One thousand only for value received.

To
G. Ferguson
London

Accepted by :
G. Ferguson 30. 7. 88

P. Mukherjee
(Drawer)

বাণিজ্যিক হুণ্ডির নমুনা (Advantages of Bill of Exchange) :

বাণিজ্যিক হুণ্ডির প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) ইহা ঋণের প্রত্যক্ষ ও সন্দেহাতীত প্রমাণ এবং ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত দলিল।

(২) ইহা হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া কেবলমাত্র প্রদান বা স্বত্বান্তরকরণের দ্বারা হস্তান্তর করা যায় এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগে বাট্টা দিয়া ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গান যায়।

(৩) ইহা অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে সাহায্য করে।

(৪) ইহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে প্রভূত সাহায্য করে।

(৫) পণ্যের ক্রেতা হুণ্ডি কাটিয়া ধারে পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

(৬) ইহা ব্যবসায়ীকে স্বল্পকালীন ঋণের সংস্থান করিয়া দেয়।

(৭) ইহা এক হইতে অন্য দেশে অর্থের স্থানান্তর ঘটাইতে সাহায্য করে।

দেশী হুণ্ডি (Hundi) :

দেশী হুণ্ডি বাণিজ্যিক হুণ্ডির মতই, কিন্তু ইহা সাধারণতঃ কোন ভারতীয় ভাষায় লেখা হয়। ইহা ইংরাজী ভাষায়ও লেখা হইতে পারে। "হুণ্ডি" কথাটি সংস্কৃত 'হুণ্ড' (Hund) শব্দ হইতে আসিয়াছে, যাহার অর্থ "আদায় করা"। ইহা স্থানীয় ব্যবসায়ের রীতি-নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। যে ক্ষেত্রে হুণ্ডির পক্ষগণ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের বিধানসমূহ দ্বারা পরিচালিত হইবে বলিয়া চুক্তি করে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে দেশী হুণ্ডি এই আইনের আওতায় আসিতে পারে।

দেশী হুণ্ডির শ্রেণীবিভাগ (Types of Hundi) :

(১) **শাহ্‌যোগ হুণ্ডি (Shah Jog Hundi)**—গণ্যমান্য ও সুপরিচিত ধনী ব্যক্তিদের প্রদেয় হুণ্ডিকে শাহ্‌যোগ হুণ্ডি বলে।

(২) **নামযোগ হুণ্ডি (Nam Jog Hundi)**—এইক্ষেত্রে যাহার নাম প্রাপক হিসাবে হুণ্ডিতে লেখা থাকে, শুধু তাহাকেই অথবা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে হুণ্ডির অর্থ প্রদেয়।

(৩) **ফরমানযোগ হুণ্ডি (Farman Jog Hundi)**—এইরূপ হুণ্ডির অর্থ হুণ্ডির ধারকের (Holder) আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদেয়

(৪) **ধানীযোগ হুণ্ডি (Dhani Jog Hundi)**—এইরূপ হুণ্ডির অর্থ উহার বাহককে প্রদেয়।

(৫) **দর্শনী হুণ্ডি (Darshani Hundi)**—এইরূপ হুণ্ডির অর্থ হুণ্ডি-গ্রাহককে দেখাইবা মাত্র প্রদেয়।

(৬) **মুদ্দতি হুণ্ডি (Muddati Hundi)**—নির্দিষ্ট দিন পরে প্রদেয় হুণ্ডিকে মুদ্দতি হুণ্ডি বলে।

(৭) **জবাবী হুণ্ডি (Jawabee Hundi)**- টাকা এক স্থান হইতে অন্যত্র ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠাইবার জন্য এইরূপ হুণ্ডি ব্যবহৃত হয়। প্রাপক ইহার মাধ্যমে প্রেরককে অর্থপ্রাপ্তির 'জবাব" দেয়।

(৮) **জখ্মী হুণ্ডি (Jakhmi Hundi)**—বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও বীমাপত্রযুক্ত হুণ্ডিকে জখ্মী হুণ্ডি বলে। ইহা একদিকে অর্থপ্রদানের অঙ্গীকার, অন্যদিকে দুর্ঘটনা বীমা-ব্যবস্থা।

চেক (Cheque)

চেক ব্যাঙ্কের লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। চেকের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

'চেক ব্যাঙ্কের উপর তলবমাত্র দেয় আদিষ্ট সম্প্রদেয় দলিল" (Cheque is a Negotiable Instrument drawn on a Bank and payable on demand)।

"চেক একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি যাহা একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের উপর লিখিত ও তলবমাত্র দেয়" (Cheque is a Bill of Exchange drawn on a specified Banker and payable on demand only)।

"চেকের লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন লিখিত দলিলে উক্ত ব্যক্তি যদি কোন একটি ব্যাঙ্ককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অপর একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে চাহিবামাত্র প্রদানের জন্য শর্তহীন আদেশ প্রদান করে, তখন উক্ত দলিলকে চেক বলে।"

(Cheque is an unconditional order in writing directing a certain Bank to pay a certain sum of money either to or to the order of or to the bearer of the instrument on demand only.)

চেকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Cheque) : চেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

(১) চেকে তিনটি ব্যক্তি থাকে ; যথা, চেকদাতা (Drawer) অর্থাৎ আমানতকারী, প্রাপক (Payee) অর্থাৎ যাহাকে টাকা দিবার নির্দেশ থাকে এবং ব্যাঙ্ক, যাহার উপর চেকের অর্থ প্রদান করিবার নির্দেশ থাকে।

(২) আমানতকারী ব্যতীত কেহই চেক দিতে পারে না।

(৩) চেকদাতার উপর চেক-গ্রহীতার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে চেকের দ্বারা আদান-প্রদান সম্ভব নয়।

(৪) চেকের অর্থ চাহিবা মাত্র দেয়।

(৫) চেক স্বত্বান্তরকরণ (Endorsement) করিয়া হস্তান্তর করা যায়।

(৬) চেক একটি বিশেষ ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল যাহা একই সঙ্গে বাহকদেয় ও চাহিবামাত্র দেয় দলিলরূপে লেখা যায়।

চেকের নমুনা (Specimen of a Cheque)

Dated 15.7.88 In favour of Shri S.P. Bose Previous Balance 500 Deposits... 10,000 Total .. 10,500 Less this cheque 1,000 Balance...Rs. 9,500 993806 : 700029	Ledger ... Folio ... Initials ...	State Bank of India Code No. 2 Ballygunge Branch 15.7.1988 Pay to Shri S. P. Bose or Bearer Rupees One Thousand only. Rs. 1000/= only S. Mukherjee Savings Bank A/c No. C733 993806 . 700029

প্রমিসরি নোট (Promissory Note) :

সংজ্ঞা (Definition) : প্রমিসরি নোট একটি লিখিত দলিল (যাহা ব্যাঙ্কের নোট বা কারেন্সি নোট নহে) যাহা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে প্রদানের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি [A Promissory Note is an instrument in writing (not being a Bank-note or a Currency-note) containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money either to, or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument (Sec. 4 of N. I. Act, 1881)]।

একটি প্রমিসরি নোটের নমুনা (Specimen) নিম্নে দেওয়া হইল :

Stamp	Calcutta March 18, 1988

Rs 1000/—

On demand I Promise to pay Mr. S. Dey or order, a sum of Rupees one thousand only, for value received.

R. Biswas

স্বত্বান্তরকরণ বা পিছনসহিকরণ (Endorsement) ঃ

Endorsement-এর পারিভাষিক অর্থ সম্মতিজ্ঞাপন। দলিল স্বত্বান্তরকরণ করিবার অর্থ হইল পিছনসহি করিয়া দলিলে লিখিত অর্থ যাহার অনুকূলে স্বত্বান্তরকরণ করা হয় তাহাকে প্রদান করিবার সম্মতিজ্ঞাপন। যে এইভাবে দলিলটি হস্তান্তর করে তাহাকে স্বত্বান্তরকারী (Endorser) এবং যাহাকে স্বত্বান্তর করা হইল তাহাকে স্বত্ব-গ্রহীতা (Endorsee) বলে।

স্বত্বান্তরকরণ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে : সাধারণ স্বত্বান্তরকরণ (Blank Endorsement), বিশেষ স্বত্বান্তরকরণ (Special Endorsement) এবং নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ (Restrictive Endorsement) ইত্যাদি।

(১) **সাধারণ স্বত্বান্তরকরণ (Blank Endorsement) ঃ** ইহাতে স্বত্বদাতা বা পিছনসহিকারক (Endorser) কেবলমাত্র দলিলের পিছনে সহি করে। এরূপ স্বত্বান্তরকরণে স্বত্ব-গ্রহীতার নাম দেওয়া হয় না।

(২) **বিশেষ স্বত্বান্তরকরণ (Special Endorsement) ঃ** ইহাতে স্বত্বান্তরকারী বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে অথবা তাহার নির্দেশমত অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

(৩) **নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ (Restrictive Endorsement) ঃ** এই জাতীয় স্বত্বান্তরকরণে নির্দেশিত প্রাপক ব্যতীত অপর কাহারও নিকট দলিলের হস্তান্তর বৈধ বলিয়া গণ্য হয় না। স্বত্বান্তরকারী দলিলের পিছনে 'Pay to Shyam or order for collection'—এই প্রকার লিখিয়া সহি করে।

(৪) **আংশিক স্বত্বান্তরকরণ (Partial Endorsement) ঃ** যেখানে দলিলের অর্থ অংশত পরিশোধ করা হইয়াছে এবং উহা দলিলে লেখা আছে, তখন বাকী অংশের জন্য দলিলটি হস্তান্তর করিয়া স্বত্বান্তরকরণকে আংশিক স্বত্বান্তরকরণ বলে।

(৫) **শর্তাধীন স্বত্বান্তরকরণ (Conditional Endorsement) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য আইনের ৫২নং ধারা অনুসারে স্বত্বান্তরকারী তাহার দায়িত্ব রহিত করিয়া অথবা স্বত্ব-গ্রহীতার অর্থ পাইবার অধিকার কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিবার পর বলবৎ হইবে এইভাবে স্বত্বান্তরকরণ করে, তখন তাহাকে শর্তাধীন স্বত্বান্তরকরণ বলে। যেমন, পণ্য-

বোম্বাই জাহাজটি নিরাপদে বন্দরে পৌঁছাইলে তবেই বহনপত্রটি স্বত্বান্তরকরণ করা যাইবে।

(৬) **ত্যাগ-বৃদ্ধি স্বত্বান্তরকরণ (Facultative Endorsement)**: স্বত্বান্তর-করণের সময় স্বত্বান্তরকারী (Endorser), কোন শব্দ যোগ করিয়া দলিল-সংক্রান্ত তাহার অধিকার ত্যাগ করিলে অথবা দায়িত্ব বাড়াইলে, তাহাকে ত্যাগ-বৃদ্ধি স্বত্বান্তর-করণ বলে।

উদাহরণ: দলিলের পিছনে সহি করিবার সময় এই কথা লিখিতে পারে: "Notice of dishonour waived."

(৭) **দায়িত্ব-রহিত স্বত্বান্তরকরণ (Sans Recourse Endorsement)**: যখন স্বত্বান্তরকারী স্বত্বান্তরকরণের সময় স্বত্ব-গ্রহীতা বা পরবর্তী ধারক কাহারও নিকট দায়ী থাকিবে না এইরূপ কথা লিখিয়া দেয়, তখন ইহাকে দায়িত্ব-রহিত স্বত্বান্তরকরণ বলে।

উদাহরণ: "Pay to A. Banerjee or order Sans Recourse."

(৮) **'Sans Frais' স্বত্বান্তরকরণ**: যখন স্বত্বান্তরকারী তাহার এইরূপ ইচ্ছা লিখিতভাবে প্রকাশ করে যে, স্বত্বান্তর-গ্রহীতা দলিলের উপর কোনরূপ খরচ করিবে না, তখন তাহাকে 'Sans Frais' স্বত্বান্তরকরণ বলে।

স্বত্বান্তরকরণের ফল (Consequence of Endorsement):

হস্তান্তরযোগ্য দলিল স্বত্বান্তর করা হইলে দলিলদাতা দলিলে লিখিত অর্থ পরিশোধ না করিলে অর্থাৎ দলিলটি প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হইলে স্বত্বান্তরকারী দলিলে লিখিত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং যে সর্বশেষে স্বত্বান্তর করিয়াছে দলিলের অর্থ পরিশোধ করিতে তাহার দায়িত্বই প্রথম।

দলিলপত্রী (Alonge): হস্তান্তরযোগ্য দলিলে পুনঃ পুনঃ সহি করিয়া স্বত্বান্তরকরণের ফলে যদি এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পরবর্তী স্বত্বান্তরকারী (Endorser) স্বত্বান্তরকরণের জন্য যখন আবার দলিলের সম্মুখভাগে অথবা পিছনে সহি করিতে চায়, তখন ইহাতে সহি করিবার আর কোন জায়গা থাকে না বলিয়া ইহার সহিত আলাদা একটি কাগজ জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে সে সহি করে। এই কাগজটিকে দলিল-পত্রী বলে। কখনও কখনও ইহাতে স্বাক্ষরকারীর রবার স্ট্যাম্প থাকে। রবার স্ট্যাম্পটি এমনভাবে দেওয়া হয় যাহাতে উহার এক অংশ মূল দলিলে ও অপর অংশ দলিলপত্রীতে থাকে।

দলিল প্রতি-হস্তান্তরকরণ (Negotiation Back):

স্বত্বান্তরকারী (Endorser) স্বত্বান্তরকরণ করিয়া দলিলটি হস্তান্তর করে। কিন্তু চক্রগতিতে (Circular) হস্তান্তরের ফলে যদি পুনরায় সে একই দলিলের স্বত্ব-গ্রহীতা (Endorsee) হয়, তাহা হইলে ঐ দলিলটিকে প্রতি-হস্তান্তরকরণ বলে।

বিভিন্ন প্রকারের চেক
(Different Kinds of Cheque)

চেক বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যেমন :

(১) **বাহকদেয় চেক (Bearer Cheque) :** যে চেকের টাকা প্রাপক বলিয়া উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা বাহকের নিকট প্রদেয়, তাহাই বাহকদেয় চেক। ব্যাঙ্কের নিকট যিনি এই প্রকার চেক উপস্থিত করেন, তিনিই সেই চেকের অর্থ লইতে পারেন। ইহাকে খোলা চেকও (Open Cheque) বলা হয়। এই প্রকার চেকে নিরাপত্তা থাকে না।

(২) **আদিষ্ট চেক (Order Cheque) :** যে চেকের টাকা চেকে বর্ণিত প্রাপক অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেওয়া হয় না, তাহাকে আদিষ্ট চেক বলে।

(৩) **আড়ি চেক বা রেখাঙ্কিত চেক (Crossed Cheque) :** যে চেকের টাকা ব্যাঙ্ক কাউণ্টারে উপস্থিত করিলেই প্রদেয় নহে, যাহা কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়, তাহাই আড়ি চেক বা রেখাঙ্কিত চেক। চেকের উপর আড়াআড়িভাবে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা হয় বলিয়া ইহাকে আড়ি চেক বা রেখাঙ্কিত চেক বলে।

(৪) **পরতারিখী বা ভবিষ্যদেয় চেক (Post-dated Cheque) :** যে তারিখে চেক দেওয়া হয় চেকে তাহার পরবর্তী কোন তারিখ লিখিত থাকিলে, তাহাকে পরতারিখী বা ভবিষ্যদেয় চেক বলে। চেকে লিখিত তারিখের পূর্বে এই চেক ভাঙ্গান যায় না।

(৫) **পূর্বতারিখী চেক (Ante-dated or Back-dated Cheque) :** যে তারিখে চেক দেওয়া হয় চেকে তাহার পূর্ববর্তী কোন তারিখ লিখিত থাকিলে, তাহাকে পূর্বতারিখী চেক বলে।

(৬) **প্রত্যাখ্যাত বা অনাদৃত বা ফেরত চেক (Dishonoured Cheque) :** চেকে কোনও প্রকার ত্রুটি থাকিলে অর্থাৎ তারিখ লিখিতে ভুল হইলে, আমানতকারীর নমুনা সহির সহিত চেকের সহির অমিল হইলে অথবা চেকে অর্থের পরিমাণ লিখিতে ভুল হইলে ব্যাঙ্ক চেক ফেরত দিয়া থাকে। আবার চেকে লিখিত পরিমাণ অর্থ আমানতকারীর হিসাবে জমা না থাকিলেও ব্যাঙ্ক চেক ফেরত দেয়। এই প্রকার চেককে প্রত্যাখ্যাত বা অনাদৃত বা ফেরত চেক বলে।

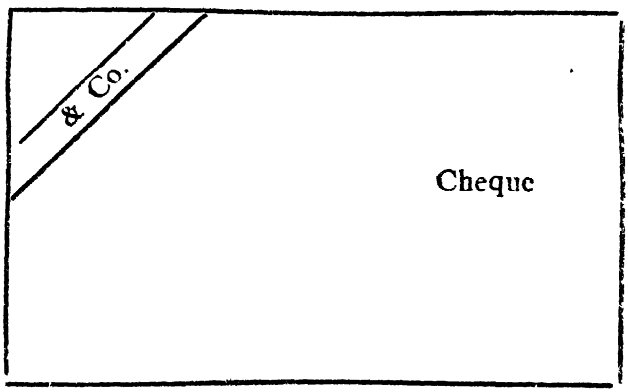
(৭) **ছেঁড়া চেক (Mutilated Cheque) :** চেকটি যদি ছেঁড়া অথবা ফাটা হয়, তখন তাহাকে ছেঁড়া চেক (Mutilated Cheque) বলে।

(৮) **গতমিয়াদী চেক (Stale Cheque) :** চেকে লিখিত তারিখের পর কতদিন উহা বৈধ থাকিবে তাহা আইনদ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। ব্যাঙ্ক কারবারীদের

মধ্যে যে রেওয়াজ চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের উপর লিখিত চেক ৬ মাস, দাবি আমানত হিসাবের উপর লিখিত চেক ৬ মাস এবং ট্রেজারী চেক বা সরকারী চেক সাধারণতঃ ৩ মাস পর্যন্ত বৈধ থাকে। যে চেকের সময় বৈধ সময়ের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে গতমিয়াদী চেক বলা হয়।

চেকে রেখাঙ্কনকরণ (Crossing of Cheques)ঃ সঠিক প্রাপক যাহাতে চেকের অর্থ পায়, সেই প্রাপ্তির নিরাপত্তার কারণেই চেকে রেখাঙ্কনকরণ করা হয়। রেখাঙ্কন দুই প্রকারের হইতে পারে—সাধারণ রেখাঙ্কন (General Crossing) এবং বিশেষ রেখাঙ্কন (Special Crossing)।

সাধারণ রেখাঙ্কন (General Crossing)ঃ যে কোনও চেকের গায়ে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা টানিয়া দিলেই সাধারণ রেখাঙ্কন করা হয়। নিম্নে সাধারণ রেখাঙ্কনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল:

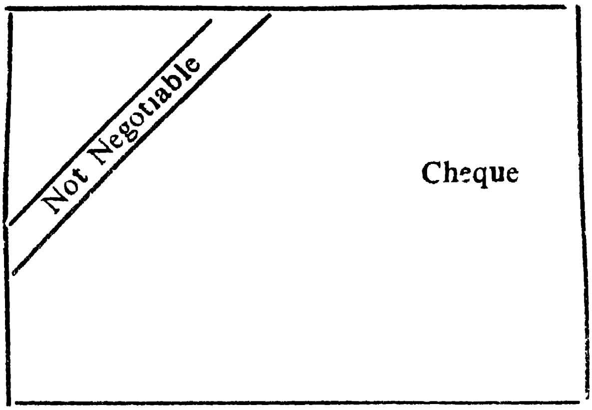


রেখাঙ্কিত চেক স্বত্বান্তরকরণ দ্বারাই হস্তান্তর করা যায়। হস্তান্তরকারীর উপর বিশ্বাস থাকিলে হস্তান্তর-গ্রহীতা চেক গ্রহণ করিয়া থাকে। যে কেহ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রেখাঙ্কিত চেক গ্রহণ করে, সে-ই চেকে লিখিত অর্থ আদায় করিতে পারে।

যেহেতু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট মারফতই এইরূপ চেক ভাঙ্গান যায় সেই কারণে ইহা খোলা চেক অপেক্ষা নিরাপদ।

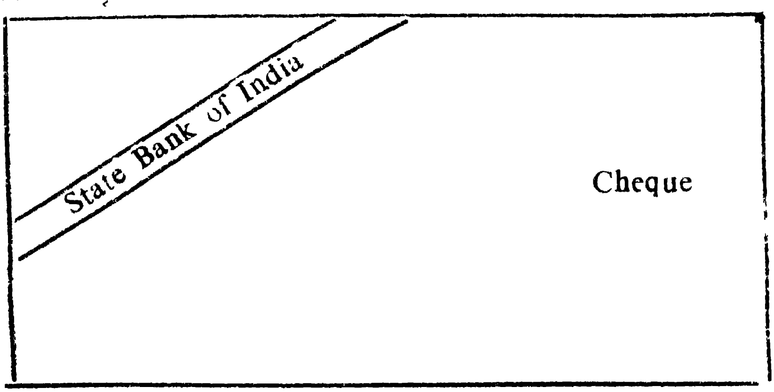
অসম্প্রদেয় রেখাঙ্কন (Not Negotiable Crossing)ঃ চেকের গায়ে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা টানিয়া উহার মাঝখানে "Not Negotiable" লিখিলে উহাকে অসম্প্রদেয় রেখাঙ্কন বলে। অসম্প্রদেয় বলিয়া ইহা যে স্বত্বান্তরকরণ করিয়া হস্তান্তর করা যায় না তাহা নহে, কিন্তু এইপ্রকার রেখাঙ্কনে যদি হস্তান্তর-গ্রহীতার স্বত্বতে ত্রুটি থাকে অর্থাৎ সেই চেক পাইবার কোনও অধিকারই না থাকে তাহা হইলে সে ঐ

চেকের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য। নিম্নে অসম্প্রদেয় রেখাঙ্কনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :



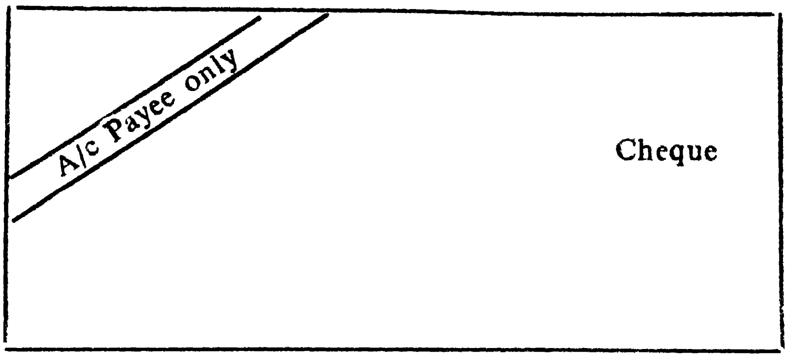
হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন (Negotiable Instrument Act) অনুসারে স্বত্বদাতার চেকে যে স্বত্ব থাকে স্বত্ব-গ্রহীতা (Endorsee) তাহার অধিক কোন স্বত্ব পাইতে পারে না। এই প্রকার চেক আদান-প্রদানে হস্তান্তর-গ্রহীতার হস্তান্তরকারীর চেকে কোন স্বত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা দ্বারা স্বত্ব-গ্রহীতাকে চেকে স্বত্বদাতার বৈধ স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং স্বত্ব-গ্রহীতার বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়।

বিশেষ রেখাঙ্কন (Special Crossing) : চেকদাতা বিশেষ কোন ব্যাঙ্ককেই মাত্র চেকের অর্থ আদায় করিবার অধিকার দিয়া থাকিলে তাহাকে বিশেষ রেখাঙ্কন বলে। এইরূপ রেখাঙ্কন সাধারণ রেখাঙ্কন অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এইরূপ রেখাঙ্কিত চেক কেবল একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ভাঙ্গান যায়। নিম্নে বিশেষ রেখাঙ্কনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :



উপরে যে বিশেষ রেখাঙ্কনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে বিশেষ ব্যাঙ্কটির নাম রেখাঙ্কনের মধ্যে লেখা আছে সেই ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর কাহাকেও চেকের টাকা প্রদেয় নহে।

Account Payee বা A/c Payee রেখাঙ্কন ঃ এই প্রকার রেখাঙ্কনে চেকের অর্থ কেবলমাত্র প্রাপকের ব্যাঙ্ক চেক ভাঙ্গাইয়া প্রাপকের হিসাবে জমা দিবে। A/c Payee রেখাঙ্কন থাকিলে চেকে প্রাপক ব্যতীত অপর কাহাকেও চেকের অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ। সেই কারণেই A/c Payee চেক সবাপেক্ষা নিরাপদ। নিচে A/c Payee রেখাঙ্কনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :



চেক ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার পদ্ধতি (Method of Encashment of Cheque) ঃ

বিভিন্ন প্রকারের চেক ভাঙ্গাইবার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। বাহকদেয় চেক (Bearer Cheque), আদিষ্ট চেক (Order Cheque) এবং আড়ি চেক (Crossed Cheque) প্রত্যেকটি ভাঙ্গাইবার পদ্ধতিও পৃথক।

বাহকদেয় চেক ভাঙ্গাইবার পদ্ধতি ঃ যাহার নামে চেক লিখিত হয় সে নিজে অথবা যে কোন ব্যক্তি বাহকদেয় চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলে চেকের টাকা পাইতে পারে। চেক উপস্থিতকারী ব্যক্তি চেকের পিছনে সহি করিবে। কাউণ্টারে ব্যাঙ্কের কর্মচারীর নিকট জমা দিলে কর্মচারী তাহাকে একখানি চাকৃতি (Token) দেয়। চাকতিটির গায়ে ব্যাঙ্কের নাম ও একটি নম্বর খোদাই করা থাকে। চাকৃতিটির গায়ে যে নম্বর থাকে কর্মচারী উহা চেকের পিছনে লিখিয়া রাখে। ইহার পর হিসাব বিভাগের একজন কর্মচারী চেকটি পাশ করাইয়া ক্যাশিয়ারের নিকট পাঠায়। কিছুক্ষণ পরে ঐ চাকৃতিটি ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিলে চাকৃতিটি ফেরত লইয়া চাকৃতি উপস্থিত-কারীকে চেকের অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু চেকের প্রাপক টাকা নগদ না তুলিয়া যদি তাহার নিজের ব্যাঙ্কের মারফত আদায় করিতে চাহে তাহা হইলে সে ব্যাঙ্কের জমা দিবার বহিতে লিখিয়া চেকটি স্বত্বান্তরকরণ (Endorse) করিয়া নিজ হিসাবে জমা দিবে। ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের মাধ্যমে চেকের অর্থ নিকাশ (Clearance) করিয়া আমানতকারীর হিসাবে জমা করিবে।

আদিষ্ট চেক ভাঙ্গাইবার পদ্ধতি ঃ আদিষ্ট চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিবার পূর্বে প্রাপক বলিয়া উল্লিখিত ব্যক্তির স্বত্বান্তরকরণ করা বাধ্যতামূলক। চেকে প্রাপকের

নাম যেরূপ বানানে লেখা হয় হুবহু সেই বানানেই স্বাক্ষর করিবার নিয়ম। নিজে চেক না ভাঙ্গাইয়া অপর কাহারও অনুকূলে হস্তান্তর করিলে Pay……or order লিখিতে হয়। যাঁহার অনুকূলে স্বত্বান্তরকরণ করা হইল তিনি আবার স্বত্বান্তরকরণ করিয়া চেকটি জমা দিবেন। কাউন্টারে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট করণিক একটি টোকেন বা চাকতি দিবেন। পরে টোকেন ক্যাশিয়ারের নিকট উপস্থিত করিয়া প্রাপক চেকের টাকা লইবেন।

আড়ি চেক ভাঙ্গাইবার পদ্ধতি ঃ আড়ি চেক কখনই সরাসরি ভাঙ্গাইতে পারা যায় না। ইহা সর্বদাই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়। চেক জমা দিবার বইতে প্রবিষ্টি (Entry) করিয়া প্রাপক ব্যাঙ্কে নিজের হিসাবে উহা জমা দিবেন। ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের মাধ্যমে টাকা আদায় করিয়া আমানতকারীর হিসাবে জমা করিবে। চেকটি ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া স্বত্বান্তরকরণ করিয়া অপর কাহাকেও হস্তান্তর কবিতে পারা যায়। হস্তান্তর-গ্রহীতাকে (Endorsee) চেকটি ভাঙ্গাইতে হইলেও উপরে লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

সঞ্চয়ী আমানত হইতে আমানতকারীর নিজের টাকা তুলিবার পদ্ধতি ঃ সঞ্চয়ী আমানত হিসাব হইতে আমানতকারী নিজে চেক দিয়া অর্থ তুলিতে পাবে। কিন্তু সে যদি চেকবহি না লইয়া থাকে তাহা হইলে জমা অর্থ তুলিবাব ফবম (Withdrawal Form) পূরণ করিয়া টাকা তুলিবে। ইহাতে পার্থক্য এই যে, আমানতকারী চেকের পরিবর্তে জমা অর্থ তুলিবার ফরম ব্যবহার করে। উত্তোলন ফরম ব্যাঙ্কের কাউন্টারে জমা দেওয়া, টোকেন গ্রহণ এবং টোকেনের বদলে ক্যাশিয়াবের নিকট অর্থ গ্রহণ পদ্ধতি বাহকদেয় চেক ভাঙ্গাইবার পদ্ধতিরই অনুরূপ।

ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার ফরমের নমুনা
(Specimen of a Withdrawal Slip)

ALLAHABAD BANK	
Calcutta	2.8.88
Pay Self/Bearer the sum of Rs. 200 (Rupees Two Hundred) only.	
Rs. 200 only	
Savings Bank Account No. 3129	Ramen Sen
727618 : 700069	Signature

নিকরাই বা লেখ্য প্রমাণ (Noting) ঃ বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা চেক প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হইলে প্রত্যাখ্যানের প্রমাণস্বরূপ এবং ভবিষ্যতে কোনও মোকদ্দমায় সাক্ষ্য-প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন মনে করিলে প্রত্যাখ্যাত দলিলটি লেখ্য প্রমাণকের (Notary Public) অফিসে নিকরাই বা লেখ্য প্রমাণ (Noting) করাইতে হয়। নোটারী পাবলিকের কার্যালয়ে নির্দিষ্ট মাশুল জমা দিলেই

নিকরাই করান যায়। এই মাশুলকে নিকরাই ব্যয় (Noting charge বা Notarial charge) বলা হয়।

সিকরাই (Protesting): বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা চেক প্রত্যাখ্যাত হইলে লেখ্য প্রমাণক বা নোটারী পাবলিক প্রত্যাখ্যানের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যে আনুষ্ঠানিক প্রমাণপত্র (Certificate) দেন, তাহাকেই সিকরাই বলে। ইহা আইনমাফিক আপত্তি (Protest) জানাইবার পদ্ধতি।

লেখ্য প্রমাণক (Notary Public): ইনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী। ইনি একজন আইন ব্যবসায়ী এবং সাধারণতঃ একজন সলিসিটার। ইনি নিকরাই, সিকরাই ও বিভিন্ন দলিলে প্রত্যয়ন (Attestation) করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও চেকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bill of Exchange and Cheque):

বাণিজ্যিক হুণ্ডি	চেক
(১) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে হুণ্ডিকার (Drawer), গ্রাহক (Drawee), স্বীকৃতি-কারী (Acceptor) এবং প্রাপক (Payee)—সাধারণতঃ এই পক্ষগুলি থাকে।	(১) চেকের ক্ষেত্রে চেকদাতা (Drawer), চেক-গ্রাহক (Drawee) এবং প্রাপক (Payee)—ইহারা থাকে।
(২) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে হুণ্ডিকার ঋণদাতা এবং হুণ্ডিগ্রাহক ঋণী।	(২) চেকের ক্ষেত্রে চেকদাতা ঋণী এবং প্রাপক গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ-গ্রহীতা।
(৩) ইহার ক্ষেত্রে হুণ্ডি গ্রাহকের স্বীকৃতি (Acceptance) প্রয়োজন, স্বীকৃতি শর্তসাপেক্ষও হইতে পারে।	(৩) চেকের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই।
(৪) ইহা দেনাদারের উপর পাওনা-দারের প্রদত্ত লিখিত আদেশ।	(৪) ইহা ব্যাঙ্কের উপর আমানত-কারীর প্রদত্ত লিখিত আদেশ।
(৫) ইহা চাহিবামাত্র দেয় হুণ্ডি (Demand Bill) অথবা মিয়াদী হুণ্ডি (Time Bill) হইতে পারে।	(৫) ইহা কেবল চাহিবামাত্র প্রদেয় (Payable on demand only)।
(৬) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ফেরত বা প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হইলে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ (Notice of dishonour) দেওয়া আবশ্যিক নহে।	(৬) চেকের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রত্যাখ্যানের নোটিশ দিতে হয়।
(৭) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হইলে সিকরাই	(৭) সিকরাই বা নিকরাই চেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি	চেক
(Protesting) ও নিকরাই (Noting) আবশ্যিক নহে, তবে সাধারণতঃ এইরূপ করা হয়; কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Foreign Bill) প্রত্যাখ্যাত হইলে সিকরাই ও নিকরাই আবশ্যিক।	
(৮) বৈদেশিক হুণ্ডি তিন-চার প্রস্থে (Bill in Sets) প্রস্তুত করাই রীতি।	(৮) চেক একপ্রস্থ প্রস্তুত করা হয়।
(৯) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ঠিক সময়ে উপস্থিত না করিলে হুণ্ডিগ্রাহক অর্থ প্রদানের দায়িত্ব হইতে ছাড় পায়।	(৯) আমাদের দেশে চেকের ক্ষেত্রে কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে ও সেভিংস অ্যাকাউণ্টে ৬ মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট চেক উপস্থিত না করিলে ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং চেকদাতা ঋণ হইতে মুক্তি পায় না।
(১০) মিয়াদী হুণ্ডির ক্ষেত্রে মিয়াদের পরেও হুণ্ডি পরিশোধ করিবার জন্য তিন দিন রেয়াতি দিবস (Days of Grace) হিসাবে দেওয়া হয়।	(১০) চেকের ক্ষেত্রে রেয়াতি দিবস দিবার প্রথা নাই।
(১১) ইহাতে বাট্টা (Discount) করিবার সুবিধা আছে।	(১১) ইহা বাট্টা করা যায় না।
(১২) ইহাতে স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়।	(১২) সাধারণতঃ স্ট্যাম্প লাগে না তবে, নির্দেশ থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপককে (Payee) চেকের পিছনে রেভিনিউ স্ট্যাম্প দিয়া ইহার উপর স্বাক্ষর করিয়া টাকা লইতে হয়।
(১৩) বাণিজ্যিক হুণ্ডি রেখাঙ্কিত (Crossed) করিবার প্রথা নাই।	(১৩) চেক নিরাপত্তার কারণে রেখাঙ্কিত করা যাইতে পারে।
(১৪) ইহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।	(১৪) ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এবং ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয়।
(১৫) বাণিজ্যিক হুণ্ডি একই সঙ্গে বাহককে প্রদেয় ও চাহিবামাত্র প্রদেয় এই-ভাবে লিখিত হইতে পারিবে না। (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের ৩১নং ধারা অনুসারে)।	(১৫) চেক একটি বিশেষ হস্তান্তর-যোগ্য দলিল। ইহা একই সঙ্গে বাহককে প্রদেয় ও চাহিবামাত্র প্রদেয় হইতে পারে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রমিসরি নোটের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bill of Exchange and Promissory Note) :

বাণিজ্যিক হুণ্ডি	প্রমিসরি নোট
(১) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে হুণ্ডিকার, গ্রাহক, স্বীকৃতিকারী এবং প্রাপক —সাধারণতঃ এই পক্ষগুলি থাকে।	(১) ইহাতে প্রতিশ্রুতিদাতা (Promisor) এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (Promisee)—এই দুই পক্ষ থাকে।
(২) ইহা দেনাদারের উপর লিখিত আদেশ।	(২) ইহা দেনাদার কর্তৃক পাওনাদারের নিকট লিখিত প্রতিশ্রুতি।
(৩) ইহাতে স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়।	(৩) ইহাতে স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই।
(৪) ইহাতে অর্থপ্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রাহকের।	(৪) ইহাতে অর্থ প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রতিশ্রুতিদাতার।
(৫) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ফেরত বা প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হইলে সাধারণতঃ লেখ্য প্রমাণক বা নোটারী পাবলিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান নোটিশ (Notice of dishonour) দেওয়া হয়।	(৫) প্রত্যাখ্যান নোটিশ দিবার প্রয়োজন নাই।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর চেক প্রত্যাখ্যান করিতে পারে (Circumstances under which a Bank may dishonour Cheques of Depositors) :

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল আমানত গ্রহণ ও ঋণদান। আমানতকারী ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে অর্থপ্রদান করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর চেক অনাদৃত বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে :

(১) যখন চেকদাতা ব্যাঙ্কে কেহ তাহার স্বাক্ষরিত চেক উপস্থিত করিলে চেকের অর্থ তাহাকে প্রদান না করিবার নির্দেশ দেয়। ইহাকে অর্থ প্রদান প্রত্যাহার বা রদ (Countermand) বলে।

(২) যখন আমানতকারীর হিসাবে জমা অর্থ চেকে লিখিত অর্থ হইতে কম থাকে।

(৩) যখন হিসাবে অনুকূল আমানত আছে বটে, কিন্তু ঐ আমানত হিসাবটি ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লইবার কারণে বন্ধক আছে।

(৪) যখন ব্যাঙ্ক মনে করে যে, ধারকের স্বত্বে কোন ত্রুটি আছে।

(৫) ছেঁড়া চেক, পরতারিখী চেক ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

(৬) চেকে লিখিত কোন বিষয় যদি কাটিয়া লেখা হয় এবং ঐ কাটিয়া লেখা অংশ যদি চেক-লেখকের দ্বারা স্বাক্ষরিত না থাকে।

(৭) যখন চেকের স্বাক্ষরের সহিত ব্যাঙ্কের কাছে রাখা আমানতকারীর স্বাক্ষরে অমিল থাকে।

(৮) যখন চেকটি ব্যাঙ্কের কার্যের সময়ের মধ্যে উপস্থিত না করিয়া আগে বা পরে উপস্থিত করা হয় এবং যখন রেখাঙ্কিত চেক অর্থ গ্রহণের জন্য কাউণ্টারে উপস্থিত করা হয়।

(৯) যখন চেকের পিছনে প্রাপককে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের উপর অথবা রেভিনিউ স্ট্যাম্প ছাড়া স্বাক্ষর করিতে হয় তখন উক্ত স্বাক্ষর করা না থাকিলে।

(১০) চেকে সংখ্যায় লিখিত অর্থের পরিমাণের সহিত কথায় লিখিত অর্থের পরিমাণের অমিল থাকিলে।

(১১) যখন ব্যাঙ্ক চেক-লেখকের মস্তিষ্ক-বিকৃতির নোটিশ পায়।

(১২) যখন ব্যাঙ্ক চেক-লেখকের দেউলিয়া হইবার অথবা মৃত্যুর নোটিশ পায়।

(১৩) কোন কোম্পানীর চেকের ক্ষেত্রে যখন ব্যাঙ্ক উক্ত কোম্পানীর অবসায়নের (Liquidation) নোটিশ পায়।

(১৪) আদালতের নিকট হইতে চেকের অর্থপ্রদানের 'নিষিদ্ধ নির্দেশ' পাইলে। আদালত আমানতকারীর হিসাবের অর্থ ক্রোক করিবার আদেশ অথবা অন্য কাহাকেও না দিবার আদেশ দিতে পারে। এই আদেশকে 'সতর্ক আদেশ' বা 'Garnishee order' বলে।

মূল্য প্রেরণ বা প্রদানের উপায় (Means of Remittance of Payment)

দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হইবার সময়ই কিভাবে মূল্য পরিশোধ করা হইবে তাহা স্থির হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ ভবিষ্যতে মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা ও উপায় সম্বন্ধে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

মূল্যপ্রদানের উপায় ও পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) নগদ অর্থে মূল্যপ্রদান : দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া মূল্য আদান-প্রদান করিবার জন্যই টাকা-পয়সার প্রচলন হইয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার দিকে অর্থের (টাকা-পয়সার) প্রচলন ছিল না। তখনকার দিনে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের (Barter) দ্বারাই মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই মানুষ টাকা-পয়সার প্রচলন করিয়াছে। বর্তমান যুগে যে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা টাকা-পয়সার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ক্রেতা বিক্রেতাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না করিলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত হয় না। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় নগদ অর্থের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় খুব কম হয়। তবে নগদ অর্থে ক্রয়-বিক্রয় যে

মোটেই হয় না, তাহা নহে। খুব অল্প পরিমাণে খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নগদ অর্থেই পরিশোধ করা হয়। প্রত্যেক দেশেই মানমুদ্রার (Standard Money) প্রচলন আছে। ভারতে মানমুদ্রা বলিতে টাকাকে বুঝায়। আমরা নগদ অর্থ বলিতে কাঁচা টাকা, কাগজের নোট এবং খুচরা ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা মুদ্রা ইত্যাদি বুঝিয়া থাকি। নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে কাঁচা টাকা, কাগজী নোট অথবা খুচরা ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা মুদ্রা ইত্যাদি দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা হয়। ভারতে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার নোটের প্রচলন রহিয়াছে। কাঁচা টাকা, এক টাকার নোট ও খুচরা ৫০, ২৫, ২০, ১০, ৫ পয়সা মুদ্রা ইত্যাদি সরকার তৈয়ারী করে বলিয়া ইহাদের সরকারী মুদ্রাও বলা হয়। সুতরাং নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারী মুদ্রার সাহায্যে মূল্যপ্রদান করা হয়। তবে কারবারী ক্রেতা-বিক্রেতা যখন দ্রব্য নগদে ক্রয় করে তখন কাগজের নোটই দিয়া থাকে। কাগজের নোট প্রচলিত হইবার পর কাঁচা টাকার চলন কমিয়া গিয়াছে। দৈনন্দিন খুচরা ও স্বল্প পরিমাণে যে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার মূল্য এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার কাগজের নোট ও খুচরা পয়সাতেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

(২) **পোস্ট অফিস মারফত**ঃ সরকারী অর্থে মূল্যপ্রদান ব্যতীত পোস্ট অফিসের মারফতও মূল্য শোধ করা যায়। পোস্ট অফিস মারফত প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে মূল্য পরিশোধ করা যায়—সাধারণ মণি অর্ডার (Ordinary Money Order), তারযোগে বা টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার (Telegraphic Money Order), পোস্টাল অর্ডার (Postal Order)।

(ক) **সাধারণ মণি অর্ডারযোগে মূল্য পরিশোধ**ঃ এই ব্যবস্থায় এক পোস্ট অফিসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিলে নির্দেশিত অপর একটি পোস্ট অফিস মারফত সেই টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিলি দেওয়া হয়। এক পোস্ট অফিস অপর একটি পোস্ট অফিসের উপর টাকা দিবার আদেশ দেয় বলিয়া ইহাকে মণি অর্ডার বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ মণি অর্ডার যোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণ করিবার পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়া থাকে। মণি অর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে প্রথম কোনও পোস্ট অফিস হইতে নির্দিষ্ট পয়সা দিয়া মণি অর্ডার ফরম ক্রয় করিতে হয়। ফরমটি পূরণ করিয়া ফরমটিসহ নির্দিষ্ট টাকা (যাহা মণি অর্ডারযোগে প্রেরণ করিতে হইবে) ও টাকা প্রেরণ করিবার জন্য ডাক-বিভাগের মাশুল (Commission) পোস্ট অফিসে জমা দিতে হয়। ফরমটিতে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি থাকে—কত টাকা প্রেরণ করা হইবে, প্রাপকের নাম, ঠিকানা এবং প্রেরকের নাম, ঠিকানা। ফরমটিসহ টাকা ও মাশুল পাইয়া পোস্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Clerk) একখানা রসিদ দেন। প্রাপকের নিকট টাকা বিলি হইলে তাহার প্রাপ্তি-স্বীকারসহ ঐ ফরমের একাংশ পোস্ট অফিসের মারফত প্রেরকের নিকট ফেরত আসে। যতদিন প্রাপকের প্রাপ্তি-স্বীকার না পাওয়া যায় ততদিন পোস্ট অফিস কর্তৃক যে রসিদ দেওয়া হয় তাহা যত্নসহকারে রাখিতে হয়। প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র পাইতে বিলম্ব হইলে অথবা প্রেরিত

টাকা বিলিতে কোনও ত্রুটি হইলে এই রসিদের ভিত্তিতে ডাক-বিভাগের নিকট অনুসন্ধান বা অভিযোগ করা হয়। মণি অর্ডারের মাশুল বা কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবৎসর ধার্য করা হয়।

(খ) তারযোগে বা টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডারযোগে মূল্যপ্রদান: সাধারণ মণি অর্ডারযোগে টাকা পাঠাইলে প্রাপকের টাকা পাইতে বিলম্ব হয়। এইজন্য দ্রুত টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে সাধারণ মণি অর্ডারযোগে টাকা না পাঠাইয়া তারযোগে (টেলিগ্রামযোগে) মণি অর্ডার করা হয়। যে পোস্ট অফিস হইতে টেলিগ্রাম করিবার সুযোগ আছে সেই পোস্ট অফিস হইতেই টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার করা যায়। এক পোস্ট অফিস কর্তৃক অপর কোন পোস্ট অফিসকে টেলিগ্রামযোগে প্রাপককে টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হয়। বিশেষ জরুরী না হইলে টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডারে সাধারণতঃ টাকা পাঠান হয় না। কারণ, ইহাতে মণি অর্ডারের মাশুল ব্যতীত টেলিগ্রামের মাশুল লাগে। টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডারও দুই প্রকার হইতে পারে—সাধারণ টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার (Ordinary Telegraphic Money Order) এবং জরুরী টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার (Express Telegraphic Money Order)।

(গ) পোস্টাল অর্ডার (Postal Order): পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মণি অর্ডার অথবা টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার ব্যতীত পোস্টাল অর্ডার দ্বারাও টাকা প্রেরণ করা যায়। পোস্টাল অর্ডার কোনও পোস্ট অফিস হইতে ক্রয় করিতে হয়। ভারতে ৫ টাকা, ১০ টাকা ইত্যাদি মূল্যের পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করিতে পারা যায়। পোস্টাল অর্ডারের মূল্য ব্যতীত প্রতি পোস্টাল অর্ডারের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাশুল দিতে হয়। ইহাতে প্রাপকের নাম, কোন্ পোস্ট অফিস হইতে পোস্টাল অর্ডারে লিখিত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা লিখিয়া ডাকযোগে প্রাপকের নিকট পাঠাইতে হয়।

পোস্টাল অর্ডারে যে পোস্ট অফিসের উপর টাকা দিবার নির্দেশ থাকে সেই পোস্ট অফিস হইতে টাকা গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং, একজনের নামে লিখিত পোস্টাল অর্ডার অপর কাহারও হস্তগত হইলে সে পোস্টাল অর্ডারে লিখিত টাকা পাইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা আছে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পোস্টাল অর্ডারের কোণে আড়াআড়িভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া দেওয়া হয়। সমান্তরাল রেখা দুইটির মাঝখানে 'and Co.' অথবা উহার সংক্ষিপ্ত লিখন '& Co.' লিখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ রেখাঙ্কিত করা পোস্টাল অর্ডারকে 'রেখাঙ্কিত পোস্টাল অর্ডার' (Crossed Postal Order) বলা হয়। রেখাঙ্কিত পোস্টাল অর্ডার কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়। সুতরাং পোস্টাল অর্ডারে যাহার নাম লেখা থাকে তাহার নিজের হিসাবে উহা জমা দিলে ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস হইতে পোস্টাল অর্ডারে লিখিত টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার হিসাবে জমা দেয়। এইরূপ পোস্টাল অর্ডার দ্বারা টাকা প্রেরণ নিরাপদ।

পোস্টাল অর্ডারের উপর Not Negotiable' কথাটি মুদ্রিত থাকে। 'Not Negotiable' লেখার জন্য পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠান খুবই নিরাপদ। 'Not

Negotiable'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। ক ১০ টাকা মূল্যের একখানা পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়া প্রাপক হিসাবে খ-এর নাম লিখিয়া ডাকযোগে খ-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। কিন্তু পোস্টাল অর্ডারখানি খ-এর হাতে না পড়িয়া গ-এর হাতে পড়িল। গ একজন অসৎ ব্যক্তি। গ ইহা ঘ কে দিয়া ১০ টাকা লইল। ঘ সরল বিশ্বাসে এবং ইহাতে গ-এর কোন স্বত্ব নাই তাহা না জানিয়া পোস্টাল অর্ডারখানি লইয়াছিল। খ-এর নিকট হইতে পোস্টাল অর্ডারের স্বীকৃতি না পাইয়া ক ডাক-বিভাগে অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, ঘ এই পোস্টাল অর্ডারে লিখিত টাকা আদায় করিয়াছে। তখন ক ঘ-এর নিকট হইতে পোস্টাল অর্ডারে লিখিত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারে। ঘ নিরপরাধ এবং সরল বিশ্বাসে গ-এর নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিলেও ঘ আসল প্রাপকের নিকট দায়ী। সুতরাং 'Not Negotiable' হইবার জন্য একজনের পোস্টাল অর্ডার অন্য কাহারও ভাঙ্গান উচিত নহে। 'Not Negotiable'-এর তাৎপর্য এই যে, হস্তান্তরকারীর দলিলে (Postal Order অথবা Cheque) ন্যায্য অধিকার না থাকিলে হস্তান্তর আইনসিদ্ধ নহে।

(৩) **ব্যাঙ্ক মারফত মূল্যপ্রদান** : আধুনিককালে নগদ মূল্যপ্রদান ও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মূল্যপ্রদানের পরিমাণ খুবই কম। তাহার স্থলে ব্যাঙ্কের মারফত মূল্যপ্রদানই খুব বেশী। বর্তমানে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা খুবই প্রসার লাভ করায় কারবারিগণের ব্যাঙ্ক মারফত মূল্যপ্রদান খুব সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক কারবারীই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া নিজের নামে অথবা কারবারের নামে হিসাব (Account) খোলে। ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হইলে ব্যাঙ্ক মারফত কারবারিগণ একে অপরের সহিত লেনদেন করে। ব্যাঙ্ক মারফত টাকা আদান-প্রদানই যথেষ্ট সুবিধাজনক। ব্যাঙ্ক মারফত টাকা আদান-প্রদান একদিকে যেমন নিরাপদ, অপরদিকে তেমনি স্বল্প ব্যয়ে হইতে পারে। ইহা ব্যতীত টাকার আদান-প্রদান খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ব্যাঙ্কের মারফত চেক ও ড্রাফট দ্বারা মূল্য আদান-প্রদান হয়।

(ক) **চেক (Cheque)** : ব্যাঙ্কের মারফত চেক দ্বারা টাকা আদান-প্রদান করিতে হইলে প্রথমে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া হিসাব খুলিতে হয়। জমা টাকা তুলিবার জন্য ব্যাঙ্ক মুদ্রিত (ছাপান) ফরম দিয়া থাকে। ইহাকে 'চেক' বলা হয়। চেকে প্রাপকের নাম ও কত টাকা দিতে হইবে তাহা লিখিয়া চেকদাতাকে স্বাক্ষর করিতে হয়। চেকে লিখিত প্রাপক ঐ চেক ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করিলে চেকে চেকদাতার স্বাক্ষর মিলাইয়া ব্যাঙ্ক চেকে লিখিত টাকা দিয়া থাকে। চেক প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যথা—বাহক (**Bearer**) চেক, আদিষ্ট (**Order**) চেক ও রেখাঙ্কিত বা আড়ি (**Crossed**) চেক। বাহক চেকের ক্ষেত্রে প্রাপক অথবা চেকের বাহক যে কেহই চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করে, তাহাকেই চেকের লিখিত টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আদিষ্ট চেকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রাপক অথবা সে যাহাকে চেকে লিখিত টাকা দিবার আদেশ দিবে, ব্যাঙ্ক হইতে সে-ই মাত্র টাকা তুলিতে পারে। প্রাপক নিজে টাকা না তুলিলে চেকের পিছনে স্বাক্ষর করিয়া অন্য কাহাকেও টাকা তুলিবার অধিকার দিতে

পারে। রেখাঙ্কিত চেক সর্বদাই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়। রেখাঙ্কিত চেক পাইলে প্রাপক সেই চেক ব্যাঙ্কে নিজের হিসাবে জমা দেয়। চেকে লিখিত টাকা আদায় করিয়া ব্যাঙ্ক প্রাপকের হিসাবে অর্থ জমা করিয়া রাখে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যপ্রদান চেকের মারফতই বেশী হয়। ইহাতে অনাবশ্যক নগদ টাকা লইয়া চলাফেরা করিতে হয় না। নগদ টাকা লইয়া চলাফেরা করিবার কালে নানাপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, চেকে মূল্য আদান-প্রদান খুবই নিরাপদ। চেক অপহৃত হইলেও চেকের টাকা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ চেকখানা কে, কোন্ ব্যাঙ্ক হইতে, কবে ভাঙ্গাইয়াছে তাহার সকল তথ্যই ব্যাঙ্কের বইতে লিপিবদ্ধ থাকে। সুতরাং, অসাধু উপায়ে একের চেক অন্য কেহ ভাঙ্গাইলে ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিলে অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(খ) ড্রাফট (Draft): ড্রাফটকে ব্যাঙ্কের হুণ্ডিও বলা হয়। অনেক সময় ক্রেতার নিজের নামে ব্যাঙ্কে কোন হিসাব থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রেও নগদান মূল্য পরিশোধ না করিয়া অথবা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদান না করিয়া ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা ব্যাঙ্কের হুণ্ডি ক্রয় করিয়া এক স্থান হইতে অপর কোনও স্থানে অতি সত্বর টাকা পাঠান যায়। যে স্থানে টাকা পাঠাইতে হইবে সেই স্থানে শাখা আছে এইরূপ ব্যাঙ্কের নিকট যে পরিমাণ টাকা পাঠাইতে হইবে তাহা জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার শাখার উপর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার আদেশপত্র দেয়। ইহাকেই ব্যাঙ্কের হুণ্ডি বলা হয়। যে ব্যাঙ্ক ঐরূপ ড্রাফট বা হুণ্ডি বিক্রয় করে, সে ড্রাফটে লিখিত টাকার উপর কিছু দস্তুরি (Commission) দাবী করে। তবে দস্তুরি বাবদ যে টাকা দিতে হয় তাহা মণি অর্ডারের মাশুল হইতে অনেক কম এবং মণি অর্ডারের তুলনায় অনেক কম সময়ের মধ্যে ড্রাফট আদান-প্রদান হয়।

চেক অপেক্ষা ড্রাফটে মূল্য আদান-প্রদান অনেক সুবিধাজনক। অনেক সময় ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা না থাকিলেও ক্রেতা চেক দিয়া থাকে। ইহাতে বিক্রেতা প্রতারিত হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসাবে ড্রাফটে লিখিত টাকা জমা না থাকিলে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে লিখিত অর্থ জমা না দিলে কখনই ড্রাফট খরিদ করা যায় না। এই কারণে ড্রাফট দ্বারা বিক্রেতাকে প্রতারিত করা সম্ভব হয় না। বিক্রেতা নিশ্চিন্ত মনে ড্রাফট গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) মূল্যপ্রদানের অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Methods of Payment): নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে নগদ অথবা চেক দ্বারা দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়। কিন্তু যখন ধারে ক্রয়-বিক্রয় হয় তখন ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে (১ মাস, ২ মাস, ৩ মাস) ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে যখনই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট দ্রব্যটি হস্তান্তর করে তখন একখানি ঋণের দলিল (Credit Instrument) তৈয়ারী করে। এই ঋণের দলিলখানিকে হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডি দুই প্রকারের হইতে পারে—

বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Bill of Exchange) ও প্রত্যর্থপত্র (Promissory Note)। প্রত্যর্থপত্রকে সাধারণ হুণ্ডি বলা হয়।

(ক) বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Bill of Exchange) : ক্রেতা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিলে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। কিন্তু ব্যবসায়িক রীতি অনুসারে বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্রব্যটি অর্পণ করিবার কালেই বাণিজ্যিক হুণ্ডি তৈয়ারী করে। ইহাতে বিক্রেতা কোনও এক ব্যক্তিকে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার আদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু বিক্রেতার এই আদেশ কার্যকরী করিতে হইলে ক্রেতাকে ঐ হুণ্ডিখানি স্বাক্ষর করিয়া দিতে হয়। সেই কারণে বিক্রেতা হুণ্ডিখানি লিখিয়া ক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ক্রেতা ঐ হুণ্ডির উপর আড়াআড়িভাবে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে 'গৃহীত' (Accepted) লিখিয়া নিজে সহি করে এবং বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠায়। পরে নির্দিষ্ট সময়-অন্তে বিক্রেতা স্বয়ং অথবা তাহার ব্যাঙ্ক মারফত ক্রেতার নিকট বাণিজ্যিক হুণ্ডিখানি উপস্থিত করিলে ক্রেতা হুণ্ডিখানি ফেরত লইয়া হুণ্ডিতে লিখিত টাকা প্রদান করে। অবশ্য বিক্রেতার যদি ঋণের সময়ের মধ্যে টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে ঐ হুণ্ডির পরিবর্তে নিজের ব্যাঙ্ক হইতে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। বাণিজ্যিক হুণ্ডির মাধ্যমে দেশাভ্যন্তরে এবং বহির্দেশের সহিতও ধারে ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে। তবে ভারতে এখনও বাণিজ্যিক হুণ্ডির প্রচলন খুব বেশী নহে।

(খ) **প্রত্যর্থপত্র বা সাধারণ হুণ্ডি (Promissory Note) :** বিক্রেতা বাণিজ্যিক হুণ্ডি তৈয়ারী করিয়া ক্রেতার নিকট পাঠায় এবং ক্রেতা উহা স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় বিক্রেতার নিকট পাঠায়। প্রত্যর্থপত্র বা সাধারণ হুণ্ডি ক্রেতাই লেখে এবং সরাসরি বিক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে ক্রেতা বিক্রেতাকে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্রেতা প্রত্যর্থপত্রখানি বিক্রেতার নিকট অর্পণ করে। নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট প্রত্যর্থপত্র বা সাধারণ হুণ্ডিখানি উপস্থিত করিয়া টাকা আদায় করে।

ট্রেজারি চালান (Treasury Challan) : নগদ টাকা, চেক অথবা হুণ্ডি ইত্যাদি ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে খুবই প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ এক পদ্ধতি রহিয়াছে, যাহার মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা যায়। ইহা সরকারী পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি। সরকারের যে-কোনও পাওনা সরকারের খাজাঞ্চীখানায় অথবা ট্রেজারিতে জমা দিতে হয়। খাজাঞ্চীখানায় টাকা জমা দিতে হইলে একখানি চালান পূরণ করিতে হয়। ঐ চালানে যে টাকা জমা দিতেছে তাহার নাম, ঠিকানা; কত টাকা জমা দিতেছে তাহা; কি বাবদে জমা দেওয়া হইতেছে তাহা; সরকারের হিসাবে কোন্ খাতে ঐ টাকা জমা দেওয়া হইবে ইত্যাদি লিখিতে হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। তবে সরকার যখন কোন ঠিকাদারী কার্যের জন্য দর-উল্লেখের আহ্বান করেন এবং কোনও কারবারী সেই দর-উল্লেখের আহ্বানে সাড়া দেয় তখন কারবারীকে কার্য সম্পাদনের সামর্থ্যের নিদর্শনরূপে

নির্দিষ্ট অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। ইহাকেই ইংবাজীতে বলে বায়না বা Earnest Money. ইহা খাজাঞ্চীখানায় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। দর-উল্লেখপত্র গৃহীত না হইলে জমা টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

মূলধনের বাজার (Capital Market) ঃ যে সংগঠিত বাজারে দীর্ঘমিয়াদী ও নাতি-দীর্ঘমিয়াদী ঋণের লেনদেন হয় তাহাকে মূলধনেব বাজাব বলে। মূলধনেব বাজাব স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও কারবাব সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করে। যে বাজাবে দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধনের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য ঘটে অর্থনীতিতে তাহাকে মূলধনেব বাজাব বলে।

বিনিয়োগকাবী জনগণ (Investing Public), অর্থলগ্নিকারী সংস্থা (Investment Corporation) বীমা কোম্পানী (Insurance Companies), বিনিয়োগকাবী ট্রাস্ট (Investment Trust), দায় গ্রাহকগণ (Underwriters), ইউনিট ট্রাস্ট, শেয়াব বাজাব (Stock Exchange) ইত্যাদি সংস্থা মূলধন বাজারেব অঙ্গ।

মূলধন বাজারের কার্যাবলী (Functions of Capital Market) :

(১) মূলধন সরবরাহ করা ইহার প্রধান কাজ। এই মূলধন সাধারণতঃ স্থায়ী মূলধন হিসাবে কারবারে নিয়োজিত হয়।

(২) ইহা দীর্ঘমিয়াদী ঋণ প্রদান করে।

(৩) ইহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদান করে।

(৪) কারবার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্যও ইহা দীর্ঘমিয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করে।

(৫) অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঋণ প্রদান না করিয়া ইহা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন, শেয়ার বাজার।

(৬) লগ্নিকারক ট্রাস্ট এবং ইউনিট ট্রাস্ট জনগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নির্বাচিত লগ্নিপত্রে উহা বিনিয়োগ করে।

(৭) ইহা বিভিন্ন কোম্পানী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্র বিক্রয়ের দায়-গ্রাহক হিসাবে কাজ করে।

(৮) অনেক ক্ষেত্রে লগ্নিকারক সংস্থা (Investment Corporations) ব্যবস্থাপনা প্রশাসনিক ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়।

(৯) ইহা শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহকে অর্থ ঋণ দিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

মূলধন বাজারের সাম্প্রতিক পরিবর্তন (Recent Change in Capital Market) ঃ

ভারতের মূলধনের বাজার অনুন্নত ছিল; কারণ ভারতীয় কারবারিগণ শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগে অনাগ্রহী ছিল। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মূলধন বাজারের যুগান্তকারী

পরিবর্তন লক্ষণীয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে অনেক লগ্নিকারক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যেমন, শিল্পীয় অর্থ সংস্থান কর্পোরেশন, বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট, ইউনিট ট্রাস্ট, বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, বাস্তুনির্মাণ সমিতি, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। সরকারী ক্ষেত্রের ঋণদান সংস্থাগুলি সাম্প্রতিককালে মূলধন বাজারের সম্প্রসারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাগুলি হইল: ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইন্‌ভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন, রি-ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধনের সংস্থান করিতেছে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবন-বীমার জাতীয়করণ, স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্প, ইউনিট ট্রাস্টের গঠন, সাধারণ বীমা জাতীয়করণ এবং সিকিউরিটিস কণ্ট্রাক্টস্ রেগুলেশন অ্যাক্ট (Securities Contracts Regulation Act)-এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারের সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ মূলধন বাজারের সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিতেছে।

যে সকল বিষয় মূলধন বাজারের সাম্প্রতিক পরিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে সেইগুলি হইল:

(১) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লগ্নিকারকদের স্বার্থরক্ষায় সিকিউরিটিস কণ্ট্রাক্টস্ রেগুলেশন আইন পাশ করান হয় এবং ইহার মাধ্যমে ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হয়,

(২) লগ্নিপত্রের প্রাচুর্য ও শেয়ার বাজারের উন্নয়ন,

(৩) শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা,

(৪) বিভিন্ন প্রকার লগ্নিকারী সংস্থা স্থাপন,

(৫) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে কিছুটা দীর্ঘমিয়াদী ঋণ প্রদান করিতেছে,

(৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্কের সমবেত প্রচেষ্টা।

শেয়ার বাজার (Stock Exchange)

সংজ্ঞা (Definition): যে সুসংহত বাজারে সরকারী ও বেসরকারী পাব্লিক কোম্পানীর শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকে শেয়ার বাজার বলে। শেয়ার বাজার দীর্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে পাব্লিক কোম্পানীর অর্থসংস্থানে সাহায্য করে। সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্র শেয়ার বাজারে সংঘটিত হয়। যে সকল লগ্নিপত্র শেয়ারে বাজারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে সেইগুলিকে অবশ্যই শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত (Listing) করিতে হইবে। শেয়ার বাজার লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের খোলা বাজার। ইহা সাধারণতঃ সমিতির আকারে গঠিত হয়।

শেয়ার বাজারের গুরুত্ব (Importance of Stock Exchange): শেয়ার বাজারকে "জাতীয় আয়না" (National mirror) বা জাতীয় অর্থনীতির দর্পণ

বলা হয়। ইহা দেশের অর্থনীতির মূল প্রতিফলন কেন্দ্র ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপের মাপকাঠি। ইহা যে শুধু দেশীয় লগ্নিপত্র লেনদেন করে তাহা নহে; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তালিকাভুক্ত লগ্নিপত্র (Listed Securities) এই বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

ইহার গুরুত্ব নিম্নে আলোচিত হইল :

(ক) **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে (From the social point of view) :**

(১) ইহা দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ অবস্থার পূর্বাভাস করে।

(২) ইহা বিনিয়োগের উৎসাহ সৃষ্টি করিয়া অনুৎপাদনক্ষম অর্থকে উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে (Productive Sector) প্রবাহিত করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

(৩) ইহা মূলধন সংগ্রহের তৈরী বা সদাপ্রস্তুত বাজার (Ready Market) সৃষ্টি করে।

(৪) সরকার যে সকল সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়।

(৫) শেয়ার বাজারকে জাতীয় অর্থনীতির আয়না বা দর্পণ (National mirror) বলা হয়, কারণ ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি।

(৬) ইহার মাধ্যমে লগ্নিযোগ্য আর্থিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৭) ইহা মূলধন গঠন ও শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করে।

(খ) **কোম্পানীর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে (From the company's point of view) :**

(১) ইহার মাধ্যমে পাবলিক কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

(২) ইহাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাধিকার ও সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(৩) কোম্পানী সম্প্রসারণের সময় এবং আধুনিকীকরণ ও প্রগতিমূলক কাজকর্মে ইহার মাধ্যমে নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়া কোম্পানী অধিক তহবিল সংগ্রহ করিতে পারে।

(৪) তালিকাভুক্ত শেয়ারের বাজার দাম সাধারণতঃ কোম্পানীর মুনাফা, লভ্যাংশের হার ও তাহার আর্থিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কোম্পানীর লগ্নিপত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic value) শেয়ার বাজারের মূল্যজ্ঞাপনপত্রে (Quotation) প্রকাশ পায়।

(৫) শেয়ার বাজার কোম্পানীর লগ্নিপত্র বিক্রয়ের জন্য তৈরী বা সদাপ্রস্তুত ও বিস্তৃত বাজারের ব্যবস্থা করে।

(৬) ইহা পুঁজির বাজারের দুর্গ হিসাবে কাজ করে বলিয়া কোম্পানীসমূহ স্থায়ী ও চলতি মূলধন শেয়ার বাজারের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারে।

(গ) **বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে (From the investor's point of view) :**

(১) বিনিয়োগকারী তাহার বিনিয়োগের একটি তৈরী বাজার পায়।

(২) শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীকে লগ্নিপত্রে বিনিয়োগে উৎসাহী করে।

(৩) ইহাতে শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) বিনিয়োগকারী তালিকাভুক্ত শেয়ার জামিন হিসাবে রাখিয়া সহজেই ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।

(৫) ইহা আইনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করে। ইহা লেনদেনে নিরাপত্তা আনে এবং বিনিয়োগকারিগণ লগ্নিপত্রের নায্য মূল্য পায়।

(৬) শেয়ার বাজার মূল্য তালিকা (Price list) এবং মূল্যজ্ঞাপনপত্র (Quotation) প্রকাশ করে। ইহার সাহায্যে বিনিয়োগকারী তাহার শেয়ারের মূল্য যাচাই করিতে পারে।

(৭) শেয়ার বাজারে যে সকল শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় সেইগুলি সাধারণতঃ জাল শেয়ার (shoddy shares) নহে কারণ এই বাজারে অসৎ ও কৃত্রিম লেনদেনের (Fake dealings) সম্ভাবনা কম থাকে।

(৮) অভিজ্ঞ দালালগণ বিনিয়োগকারীকে উপদেশ দেয় ; ফলে কোন্ শেয়ারে বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে বিনিয়োগকারী তাহা জানিতে পারে। দালাল অনেক ক্ষেত্রে দর ওঠা-নামাজনিত "মানসিক আঘাত ও চাপ" (shocks and strains) নিজেই গ্রহণ করে ; ফলে বিনিয়োগকারী স্বস্তি পায়।

শেয়ার বাজারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Functions of Stock Exchange) :

শেয়ার বাজার জাতীয় অর্থনীতির দর্পণ (Mirror of National Economy)। ইহার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর শিরোনামাভিত্তিক আলোচনা করা হইল :

(১) সদাপ্রস্তুত বাজার (Ready Market) : শেয়ার বাজার হইল লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের তৈরী বাজার। এই বাজারে যে কোন সময় লগ্নিপত্রকে নগদে এবং নগদ অর্থকে লগ্নিপত্রে রূপান্তরিত করা যায়। ইহার ফলে লগ্নিপত্রের সহজ বিপণন সম্ভব হয় এবং ইহা বিনিয়োগকারিগণকে শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে।

(২) সুসংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ বাজার (Well-organised and Perfect Market) : বর্তমানে প্রত্যেকটি শেয়ার বাজার বিধিবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত। সেই কারণে ইহার লেনদেন কঠোর নিয়মকানুন ও প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। ব্যাপক অঞ্চলের ক্রেতা ও বিক্রেতা এইস্থানে সমবেত হইয়া লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে বলিয়া ইহা পূর্ণাঙ্গ বাজার সৃষ্টি করে।

(৩) **লগ্নিপত্রের মূল্যায়ন (Evaluation of Securities) :** শেয়ার বাজার লগ্নিপত্রের খোলা বাজার। এই বাজারে 'মূল্য তালিকা' (Price List) ও মূল্যজ্ঞাপন-পত্র বা দরপত্র (Quotation) প্রকাশ করা হয়। ফলে বিনিয়োগকারী যে কোন সময় তাহার শেয়ারের মূল্য জানিতে পারে।

(৪) **ভবিষ্যৎ মূল্যের পূর্বানুমান (Price Forecasting) :** শেয়ার বাজারের ফটকা লেনদেন, তালিকাভুক্ত কোম্পানীর কার্যকলাপ এবং দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া লগ্নিপত্রের ভবিষ্যৎ মূল্য পূর্বানুমান করা যায়।

(৫) **নিরাপত্তা (Security) :** শেয়ার বাজার লগ্নিপত্র চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া এই বাজারে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষিত হয়। ইহাতে দালাল দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। দালালীর হার নির্দিষ্ট থাকায় শেয়ার বাজারে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অবৈধ কাজের জন্য উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা আছে বলিয়া ইহা নিয়ন্ত্রিত বাজার।

(৬) **কোম্পানীর দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in Efficiency of Companies) :** শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের মূল সূত্র হইল :

$$\frac{\text{মুনাফা}}{\text{মূলধনীকরণের হার}} \times ১০০$$

[মূলধনীকরণের হার বলিতে বুঝায় এমন হার, যে হার কোন শিল্পে নিযুক্ত একজন সাধারণ বিনিয়োগকারীকে সন্তুষ্ট করে।]

মুনাফা বৃদ্ধি পাইলে উহা লভ্যাংশের হারে প্রতিফলিত হয় এবং কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ও তাহার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যজ্ঞাপনের মাধ্যমে শেয়ার বাজার কোম্পানীগুলিকে উৎসাহিত করে এবং কর্মদক্ষতার মান উন্নয়নে সাহায্য করে।

(৭) **কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Company Management) :** যে কোম্পানী শেয়ার বাজারের মাধ্যমে তাহার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিতে চাহে তাহাকে ইহার শেয়ার নির্দিষ্ট শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত (Listing) করিতে হইবে এবং তাহার ব্যবস্থাপনায় শেয়ার বাজার প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া ইহার কার্যকলাপ জনস্বার্থবিরোধী হইতে পারে না।

(৮) **মূলধন গঠনে প্রতিনিধিত্ব (Agency of Capital Formation) :** ইহা সঞ্চয়ে ও শিল্পলগ্নিতে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ঝুঁকি বহনের ইচ্ছাকে বিকশিত করে। ইহার ফলে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর মূলধন গড়িয়া ওঠে। যদিও শেয়ার বাজার প্রত্যক্ষ ঋণ প্রদান করে না কিন্তু ইহা অর্থসংস্থানে প্রতিনিধিত্ব করে।

(৯) **মূলধনের সঠিক প্রবাহ** (**Proper Canalisation of Capital**) : শেয়ার বাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারিগণ মুনাফাজনক সংস্থায় মূলধন বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। অর্জিত মুনাফা অথবা সুদ পুনরায় বিনিয়োজিত হয়। এইভাবে শেয়ার বাজারের মাধ্যমে শিল্পে মূলধনের চিরন্তন প্রবাহ চলিতে থাকে।

(১০) **অর্থের উপযুক্ত বিনিয়োগ** (**Proper Investment of Money**) : শেয়ার বাজার অর্থকে উপযুক্ত কোম্পানীর মূলধনে বিনিয়োগ করিতে সাহায্য করে। ফলে অর্থের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং সমাজ ও আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়।

(১১) **টাকার বাজারের স্তম্ভ** (**Pillar of Money Market**) : ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের অতিরিক্ত অর্থ লগ্নিপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিতে পারে।

(১২) **ফটকা কারবারের সুযোগ** (**Facility of Speculation**) : প্রকৃতপক্ষে ফটকা কারবারের সুযোগ আছে বলিয়াই শেয়ার বাজার এত জনপ্রিয়। শেয়ার মূল্যের ওঠা-নামার সুযোগে দালালগণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। ফটকার ফলে বিভিন্ন শেয়ার বাজারের যোগান ও চাহিদায় সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য আনে এবং শেয়ারের দামের স্থিরতা আসে।

(১৩) **বিক্রয়যোগ্যতা ও তারল্য বা নগদ অর্থে পরিণত করিবার সম্ভাব্যতা** (**Marketability and Liquidity**) : শেয়ার বাজারের মাধ্যমে লগ্নিপত্র সহজে এবং দ্রুত বিক্রয় করা যায় এবং শেয়ার নগদ অর্থে পরিণত করা যায়

(১৪) **শিল্প পরিস্থিতির পরিমাপক** (**Yardstick of Industrial condition**) : শেয়ার বাজারে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। এই কারণে ইহা শিল্পোন্নতির পরিমাপক বা মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়।

(১৫) **সরকারী লগ্নিপত্রের বিপণন** (**Marketing of Government Securities**) : উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকার শেয়ার ও ঋণপত্র শেয়ার বাজারের মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করিতে পারে।

শেয়ার বাজারে শেয়ার ও লগ্নিপত্রের দাম ওঠা-নামার কারণ (Factors in the fluctuation of price of shares and stocks in the Stock Exchange) :

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম স্থির হয়। শেয়ারের চাহিদা ও যোগান দ্বারা শেয়ারের দাম স্থির হয়। শেয়ারের চাহিদা নির্ভর করে কোম্পানীর মুনাফা, লভ্যাংশের হার ও তাহার আর্থিক অবস্থার দ্বারা। আবার বিনিয়োগের আবহাওয়া (climate) শেয়ারের চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শেয়ারের দামের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ নানাবিধ (manifold)। বলা হয় যে, শেয়ারের দাম

প্রভাবকারী কারণগুলি এত বিচিত্র যে, উহা সমুদ্রের তীরে এলোমেলো হাওয়ার মত। যে যে কারণে শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করে সেইগুলি হইল :

(১) শেয়ারের চাহিদা ও যোগান ;
(২) ফটকা কারবারী ও বিনিয়োগকারিগণের কার্যকলাপ ;
(৩) ঝুঁকিবাহকগণের (underwriters) কার্যকলাপ ;
(৪) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের তৎপরতা ;
(৫) ব্যাঙ্ক হারের (Bank rate) পরিবর্তন ;
(৬) অর্থ নৈতিক তেজী ও মন্দার প্রভাব ;
(৭) কোম্পানীর উৎপাদন নীতি, মুনাফা, লভ্যাংশের হার ও আর্থিক অবস্থা ;
(৮) কোম্পানীর সুনাম ;
(৯) যে শিল্পে কোম্পানী অন্তর্ভুক্ত, সেই শিল্পের সাধারণ ও আর্থিক অবস্থা ;
(১০) ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থা ;
(১১) সরকারের স্থায়িত্ব ও সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ;
(১২) দেশীয় মুদ্রা মূল্যের স্থায়িত্ব ;
(১৩) ঋণযোগ্য অর্থের সরবরাহ ;
(১৪) বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অবস্থা ,
(১৫) সাধারণ মূল্যস্তর ;
(১৬) যুদ্ধ-বিগ্রহ ;
(১৭) সরকারী করনীতি, আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতি।

শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ পদ্ধতি (Workings of Stock Exchange) :

যখন কোন বিনিয়োগকারী লগ্নিপত্র ক্রয় করিতে চায় তখন তাহাকে কোন **শেয়ার দালালের** (Broker) সহিত যোগাযোগ করিতে হয়। দালাল শেয়ার বাজারের সদস্য। বিনিয়োগকারী নিজে শেয়ার বাজার হইতে শেয়ার ক্রয় বা শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না। লণ্ডন শেয়ার বাজারে শেয়ার দালাল ছাড়াও **লগ্নিপত্রের কারবারী** (Jobber) থাকে। বোম্বাই শেয়ার বাজারে ইহাদের **তরণীওয়ালা** (Tarawaniwalas) বলে। প্রত্যেক দালালের অধীনে কয়েকজন (কলিকাতায় ২ জন, বোম্বাই-এ ৫ জন এবং মাদ্রাজে ৩ জন) **ক্ষমতাপ্রাপ্ত করণিক** (Authorised Clerks) থাকে। লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ফরমাশ যাহারা সংগ্রহ করে তাহাদের **উপদালাল** (Remisiers or Sub-brokers) বলে। যে দালাল শেয়ার বিক্রয় করিবে সে শেয়ারের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য একই সঙ্গে প্রকাশ করে। উক্ত মূল্য হ্রাসের জন্য অনুরোধ জানাইলে উহাকে **পার্থক্য হ্রাস** (Make up in gap) বলে। ইহার পর ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয় এবং দালাল উহা ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বারা স্বাক্ষরিত করায় এবং নির্দিষ্ট হারে দালালী (Brokerage) পায়।

শেয়ার বাজারে **নগদে লেনদেন** (Cash transaction) হইলে ৩ হইতে ৭ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করিতে হয়। **বাকী লেনদেনের** (Forward contract) ক্ষেত্রে ১৪ দিনের মধ্যে প্রাথমিক নিষ্পত্তি করিতে হয়। যদি ক্রেতা উহা নিষ্পত্তির জের আরও ১৪ দিন টানিতে চান তবে ইহাকে **জের টানা** (Carry forward) বলে। এই বিলম্বজনিত জের টানিবার জন্য ক্রেতাকে দক্ষিণা বা সুদ দিতে হয়। ইহাকে **ব্যাজ** (**Contango**) বলে। যখন বিক্রেতা শেয়ার যোগান নির্দিষ্ট ১৪ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি না করিয়া পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য উহা পিছাইয়া দিতে চায়, তখন বিক্রেতাকে কিছু অর্থ দক্ষিণা বা সুদ হিসাবে দিতে হয়। ইহাকে **হরজানা** (Backwardation) বলে।

লেনদেন নিষ্পত্তির দ্বিতীয় দিনকে **টিকিট ডে** (Ticket Day) বলে। এই দিন দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, শেয়ারের মূল্য ও বিবরণ ইত্যাদি লগ্নিপত্রের কারবারীর নিকট পেশ করে। দ্বিতীয় দিনে উক্ত কাজ শেষ না হইলে অতিরিক্ত একদিন সময় দেওয়া হয়। ইহাকে **মধ্যবর্তী দিন** (Intermediate Day) বলা হয়। এই দিন দলিলাদি প্রস্তুত হয়। শেষদিন বা চতুর্থ দিনকে **নিষ্পত্তির দিন** (Settlement Day) বলে। এইদিন শেয়ার সরবরাহ ও মূল্য প্রদান হয়।

শেয়ার বাজারে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব নিকাশ ঘর (Clearing House) থাকে অথবা ব্যাঙ্ক নিকাশ ঘরের কাজ করে। নিকাশী ব্যবস্থা প্রত্যেক সদস্যের সমস্ত লেনদেন স্থির করিয়া বাকী লেনদেনের সভ্যদের লগ্নিপত্রের মূল্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে বাধ্য করে। তালিকাভুক্ত যে কোন লগ্নিপত্র নগদে লেনদেন করা যায় কিন্তু বাকীতে লেনদেন কেবলমাত্র 'অগ্রিম চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট লগ্নিপত্রে' করা যায়। শেয়ার বাজারে অগ্রিম চুক্তির ভিত্তিতে **ফটকাবাজী** (Speculation) হয়। যখন ইচ্ছা করিয়া প্রকৃত লেনদেন না করিয়া বাজার দর ও চুক্তিমূল্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদান করিবার চুক্তি হয় তখন তাহাকে **ঐচ্ছিক লেনদেন** (Option Dealings) বলে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ লগ্নিপত্র ক্রয়ের ইচ্ছার চুক্তিকে **কল অপসন** (Call Option) বলে এবং অনুরূপ বিক্রয় চুক্তির ইচ্ছাকে **পুট অপসন** (Put Option) বলে। ইচ্ছা অনুযায়ী একসঙ্গে ক্রয় ও বিক্রয় করিবার চুক্তিকে **ডব্‌ল অপসন বা দ্বৈত ইচ্ছা** (Double Option or Straddle) বলে।

বিভিন্ন প্রকারের ফটকাবাজ (Different types of Speculators) :

ভবিষ্যৎ যোগান ও চাহিদা এবং দ্রব্য ও শেয়ারের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুমান করিয়া যে কারবারী শেয়ার ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে তাহাকে ফটকাবাজ (Speculator) বলে। শেয়ার বাজারে প্রধানতঃ চার প্রকারের 'ফটকাবাজ' বা 'পশু' (Animals) দেখা যায় :

(১) **তেজীওয়ালা** (**Bull**) : যে ফটকা কারবারী ভবিষ্যতে কোন শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ভবিষ্যতে অধিক-মূল্যে উহা বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উহা ক্রয় করিবার ভবিষ্যৎ চুক্তি করে তাহাকে তেজীওয়ালা বলে। ইহারা

প্রকৃত পক্ষে শেয়ার গ্রহণ করে না, কেবল দামের পার্থক্য গ্রহণ করিবার জন্য ক্রয় চুক্তি করে। ইহারা আশাবাদী (Optimists) কারণ ইহারা মনে করে যে, শেয়ারের দাম নিষ্পত্তির দিন (Settlement Day) অর্থাৎ ১৪ দিনের মধ্যে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার লাভ হইবে। এই কারণে তাহাদের তেজীওয়ালা বলে। যদি নিষ্পত্তির দিন শেয়ারের মূল্য আশানুরূপ বৃদ্ধি না পায়, তবে তেজীওয়ালা উহা আরও ১৪ দিন আগাম (Carry over) করিতে পারে এবং ইহার জন্য তাহাকে সুদ বা দক্ষিণা দিতে হয়। এই দক্ষিণা বা সুদকে ব্যাজ (**Contango**) বলে।

(২) **মন্দীওয়ালা (Bear):** যে ফটকা কারবারী ভবিষ্যতে কোন শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ভবিষ্যতে কমমূল্যে ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উচ্চমূল্যে ঐ শেয়ার বিক্রয়ের ভবিষ্যৎ চুক্তি করে তখন তাহাকে মন্দীওয়ালা বলে। ইহারা প্রকৃত শেয়ার হস্তান্তর করে না, শুধুমাত্র দামের পার্থক্য গ্রহণ করে। ইহারা নিরাশাবাদী (Pessimists)। যদি নিষ্পত্তির দিন অর্থাৎ ১৪ দিনের মধ্যে মন্দীওয়ালা দেখে যে, দাম তাহার অনুমান মত হ্রাস পায় নাই, তবে সে নিষ্পত্তি আরও ১৪ দিন আগাইয়া (Carry over) দিতে পারে ইহার জন্য তাহাকে যে সুদ বা দক্ষিণা দিতে হয় উহাকে **হরজানা (Backwardation)** বলে। ইহারা তেজীওয়ালাদের বিপরীত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

(৩) **অধিমূল্য শিকারী (Stag):** যখন নূতন কোন কোম্পানী বাজারে শেয়ার ছাড়ে তখন অনেক ফটকা কারবারী অধিক পরিমাণে ঐ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে। ইহারা শেয়ার গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করে না। তাহারা মনে করে যে, ভবিষ্যতে ঐ শেয়ার অধিক মূল্যে অর্থাৎ অধিমূল্যে (Premium) বিক্রীত হইবে এবং তাহারা শেয়ারের অভিহিত মূল্য (Face value) ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে তাহা মুনাফা করিবে। এইরূপ ফটকা কারবারীকে অধিমূল্য শিকারী বলে। ইহাদের **প্রিমিয়াম হান্টার** (Premium hunters)-ও বলে।

(৪) **খেলাপী মন্দীওয়ালা (Lame Duck):** যখন কোন ফটকাবাজ ভবিষ্যতে কমমূল্যে শেয়ার ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করিয়া উক্ত শেয়ার ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের আগাম চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং উভয় চুক্তিই কার্যকালে পালন করিতে অক্ষম হয় তখন তাহাকে খেলাপী মন্দীওয়ালা বলে।

লগ্নিপত্রের মুখ্য-কারবারী ও দালালের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Jobbers and Brokers)

মুখ্য-কারবারী শেয়ার বাজারের সভ্য। ইহারা শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের নামে কারবার করে। কিন্তু দালাল অপরের হইয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদন করে। ইহারা অপরের হইয়া মুখ্য-কারবারীর সঙ্গে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সংযোগ স্থাপন করিয়া দালালী পায়। লণ্ডন শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্রের মুখ্য-কারবারী আছে। ভারতের শেয়ার বাজারে ইহাদের অস্তিত্ব নাই।

লগ্নিপত্র তালিকাভুক্তিকরণ (Listing of Securities) ঃ

যে সকল পাবলিক কোম্পানীর লগ্নিপত্র শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে কেবল সেই সকল লগ্নিপত্র শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। তালিকাভুক্তির জন্য কোম্পানীকে শেয়ার বাজারে আবেদন করিতে হয়।

শর্ত (Requirements) ঃ শেয়ার তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হয় :

(১) বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৪৯% শেয়ার জনসাধারণকে বিলি করিতে হইবে।

(২) মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিকেলস্-এর কপি, লাভ-ক্ষতির হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র বা ব্যালান্স শীটের কপি, শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ, কিভাবে শেয়ার বিলি করা হইয়াছে ইত্যাদি তথ্য শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৩) গত দশ বৎসরের লভ্যাংশ প্রদানের হার কি তাহা শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

(৪) কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ও মূলধন কাঠামোর পরিবর্তন হইলে উহা শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

(৫) আর্টিকেলস্-এ শেয়ার হস্তান্তরের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) বিবরণপত্রের (Prospectus) কপি শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

বিবরণপত্র বিশ্লেষণ করিয়া শেয়ার কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে উহা তালিকাভুক্তির অনুমোদন করে। বিবরণপত্র প্রকাশের দিন হইতে সাত সপ্তাহের মধ্যে তালিকাভুক্তি মঞ্জুর না হইলে কোম্পানীকে শেয়ার আবেদনকারীর প্রদত্ত অর্থ ফেরত দিতে হইবে।

সুবিধা ঃ তালিকাভুক্তিকরণের সুবিধাগুলি হইল :

(১) তালিকাভুক্ত শেয়ার সহজেই হস্তান্তরযোগ্য।

(২) ইহার ফলে কোম্পানীর মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(৩) তালিকাভুক্তিকরণে শেয়ারের বাজার বিস্তৃত হয়।

(৪) তালিকাভুক্ত শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় কারণ ইহাতে বিনিয়োগকারী সহজেই আকৃষ্ট হয়।

(৫) বিনিয়োগকারী তাহার লগ্নির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে।

(৬) শেয়ার বিলি-সংক্রান্ত কার্যকলাপ শেয়ার বাজার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া কোম্পানী অবৈধ উপায়ে শেয়ার বিলি করিতে পারে না।

(৭) লগ্নিপত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic value) বৃদ্ধি পায়।

(৮) অলীক-লেনদেন (Fake dealings) এবং জাল শেয়ার (Shoddy Shares) লেনদেনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

তবে তালিকাভুক্তকরণের অর্থ এই নয় যে, সকল তালিকাভুক্ত শেয়ারই মূল্যবান শেয়ার (Blue Chips)। ইহা অলাভজনক শেয়ারও হইতে পারে। যে সকল

কোম্পানীর নূতন শেয়ার বাজারে বিলি করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যায় অর্থাৎ যে সকল কোম্পানীর নূতন শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী, সেই সকল শেয়ারকে ব্লু চিপস্ (**Blue Chips**) বলে।

কলিকাতা শেয়ার বাজার (Calcutta Stock Exchange) :

সংগঠন (Organisation) :

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসে কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সীমাবদ্ধ কোম্পানী হিসাবে ইহা নিবন্ধিত হয়। ইহার মূলধন তিন লক্ষ টাকা। ২৫০ টাকা দামের মোট ২০০টি শেয়ার আছে। একজন দালালের একটি মাত্র শেয়ার থাকিতে পারে। বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা ১,১১৬টি। সদস্য হইবার প্রবেশ মূল্য ৫,০০০ টাকা এবং প্রত্যেক সভাকে ২০,০০০ টাকা জমা রাখিতে হয়।

প্রত্যেক সভ্য অংশীদার এবং প্রতিনিধি রাখিবার অধিকারী। প্রত্যেক অংশীদার এবং প্রতিনিধির শেয়ার বাজারের প্রবেশ মূল্য ৫০০ টাকা এবং মাসিক চাঁদা ৪ টাকা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের লগ্নিপত্র চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ইহা একটি স্বীকৃত শেয়ার বাজার। ইহার দুই প্রকার সদস্য আছে—(১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং (২) সাধারণ সদস্য। যাহারা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সদস্য ছিল তাহারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং যাহারা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর সদস্য হইয়াছে তাহাদের সাধারণ সদস্য বলে।

কার্যাবলী (Functions) : কলিকাতা শেয়ার বাজারের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহা শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে। দালালের মারফত ক্রয়-বিক্রয় হয়।

(২) ইহা শেয়ারের মূল্য কাগজে প্রকাশ করে।

(৩) এখানে নগদে ও বাকীতে লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়। তবে এই বাজারে নগদ লেনদেন বেশী হয়।

(৪) প্রত্যেক দালালের অধীনে সর্বোচ্চ ২ জন ক্ষমতাপ্রাপ্ত করণিক থাকিতে পারে। উহারা মূল দালালকে ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে।

(৫) লগ্নিপত্র বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক দালালের অধীনে উপদালাল বা রেমিসিয়ার (Remisier) থাকে।

শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজারের পার্থক্য (Distinction between Share Exchange and Produce Exchange) :

শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য আছে :

শেয়ার বাজার	পণ্যের বাজার
১। এই বাজারে শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।	১। ইহাতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

শেয়ার বাজার	পণ্যের বাজার
২। একই শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই কারণে একটি অঞ্চলে একটির বেশী শেয়ার বাজার থাকে।	২। একটি পণ্যের বাজারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের লেনদেন হইতে পারে অথবা একটি পণ্য বাজার একটি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে বিশেষায়ণ অর্জন করিতে পারে।
৩। পণ্যের বাজারের তুলনায় শেয়ার বাজারের সংখ্যা কম।	৩। শেয়ার বাজারের তুলনায় পণ্যের বাজারের সংখ্যা বেশী হয়।
৪। এখানে শুধু মাত্র যে সব শেয়ারের অস্তিত্ব আছে, তাহাদের লেনদেন হয়।	৪। ইহাতে বর্তমানে যে সকল পণ্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যেগুলি উৎপন্ন হইবে এইরূপ উভয় প্রকার পণ্যের লেনদেন হয়।
৫। শিল্পোন্নয়নের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।	৫। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।
৬। লগ্নিপত্রের নমুনাকরণের প্রয়োজন হয় না। তবে অনেক সময় শেয়ারের বা ডিবেঞ্চারের সাঙ্কেতিক নাম (Code name) ব্যবহৃত হয়।	৬। পণ্যের বর্গীকরণ ও নমুনা প্রস্তুত করিতে হয় এবং নমুনার (Sample) সাহায্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
৭। লগ্নিপত্রের নামিক মূল্য (Face Value) থাকে।	৭। পণ্যের নামিক মূল্য থাকে না; তবে মূল্য-তালিকা (Price list) থাকে।
৮। ইহা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে অর্থ লগ্নি করে।	৮। ইহা কৃষিজাত ও কাঁচামালের বাজার সম্প্রসারিত করে।

মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের পার্থক্য (Distinction between Capital Market and Money Market):

মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য আছে :

মূলধনের বাজার	টাকার বাজার
১। এই বাজারে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ পাওয়া যায়।	১। এই বাজারে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ পাওয়া যায়।
২। ইহা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়।	২। ইহা চলতি মূলধনের অভাব পূরণ করে।
৩। ইহা কেবলমাত্র ঋণ প্রদান করে।	৩। ইহা আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান উভয় কাজই করে।
৪। ইহা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করে; যেমন, শেয়ার বাজার।	৪। ইহা বিভিন্ন কোম্পানীর লগ্নিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যে অর্থের যোগান দেয়।

মূলধনের বাজার	টাকার বাজার
৫। ইহা দায়গ্রাহকের কাজ করে।	৫। ইহা প্রতিনিধির কাজ করে।
৬। ইহা আমানত সৃষ্টি করিতে পারে না।	৬। ইহা আমানত সৃষ্টি করিয়া টাকার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে।
৭। ইহা লগ্নিকারিগণের অর্থ লগ্নিকারিগণের স্বার্থে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে।	৭। ইহা নিজের স্বার্থে আমানতকারিগণের অর্থ বিনিয়োগ করে।
৮। অর্থ-লগ্নি করাই ইহার মূল কাজ।	৮। আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করা ইহার মুখ্য কাজ।

মূলধন বাজারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ (Different Institutions in Capital Market) ঃ

(১) **বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট (Investment Trust) ঃ** এইরূপ প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং উহা বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্রে বিনিয়োগ করে। ইহা দায়গ্রাহকের কাজও করে। উদাহরণ : টাটা ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট।

(২) **ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া (Unit Trust of India) ঃ** ইহা একটি বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট। ইউনিট ট্রাস্ট কয়েকটি নির্দিষ্ট লগ্নিতে অর্থ বিনিয়োগ করে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ইহা বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন হিসাবে ইউনিট ট্রাস্ট আইনের দ্বারা গঠিত হয় এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে জনসাধারণকে ইউনিট বিক্রয় আরম্ভ করে। ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মূলধন ৫ কোটি টাকা।

একটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য (Face value) ১০ টাকা। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য পৃথক হয়। জুলাই মাসে ইউনিটের দাম সবচেয়ে কম হয়। কারণ জুন মাস পর্যন্ত সুদ জমা হইয়া জুলাই মাসে উহা প্রদেয়। বিক্রীত অর্থ নির্দিষ্ট শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়। নীট লাভের ৯০% ইউনিট-হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে দিতে হয়। ইউনিট ক্রেতার লভ্যাংশের ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত। ইউনিট-হোল্ডার যে কোন সময় ইউনিট ট্রাস্টের নিকট তাহার ইউনিট বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ইহার লগ্নিযোগ্য মোট তহবিলের ৫%-এর বেশী একটি কোম্পানীতে বিনিয়োগ করা যাইবে না। ইহা মূলধন বাজারের একটি শক্তিশালী সংস্থা।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ (১) দেশের স্বল্প ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া শিল্পক্ষেত্রে উহা বিনিয়োগ করা, (২) ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের আয়ের ব্যবস্থা করা, (৩) সঞ্চয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করা, (৪) পুঁজির বাজার শক্তিশালী করে।

বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক (Investment Bank) ঃ যে সকল ব্যাঙ্ক নিজস্ব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এবং জনগণের নিকট হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়া শিল্পে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ দেয়, তাহাদের বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বলে। ইহারা দায়গ্রাহকের কাজও করে। নূতন ও পুরাতন কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করা এবং বন্ধকী ঋণ প্রদান করা ইহাদের কাজ। ইহারা লগ্নি পরামর্শদাতার কাজও করে।

বাস্তু-নির্মাণ সমিতি (Building Societies) ঃ নিজস্ব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ইহারা মূলধন সংগ্রহ করে। এই মূলধন জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া সহজ কিস্তিতে উহা স্বল্পবিত্তদের মধ্যে বিক্রয় করা।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (IFC) ঃ ইহা একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন হিসাবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত ও আদায়ীকৃত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর এই সংস্থাটি উহার অধীনস্থ (subsidiary) প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ (১) আই এফ সি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘ ও মাঝারি মিয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত হইয়াছে, (২) ইহা কেবল পাবলিক কোম্পানী ও সমবায় সমিতিকে ঋণ দেয়; (৩) দ্রব্য উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, জাহাজী কারবারে, খনিজ শিল্পে, হোটেল পরিচালনায়, বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদনে এবং পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ দেয়, (৪) আই এফ সি অনধিক ২৫ বৎসরের জন্য সম্পত্তির জামিনে অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া ঋণ প্রদান করে; (৫) ইহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে; (৬) ইহা দায়গ্রাহকের কাজ করে, (৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন অন্য সূত্র হইতে ঋণ নেয় তখন ইহা ঐ ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টি বা প্রত্যাভূতি দিতে পারে; (৮) ঋণ গ্রহণের সময় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া ইহা প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

ন্যাশানাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন (NIDC) ঃ ইহা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধিকৃত সংস্থা।

উদ্দেশ্য ঃ ইহার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) অর্থসংস্থান ও পরিকল্পিত শিল্পোন্নতিতে অর্থের যোগান দিবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হয়;

(২) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় পুঁজি ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করা;

(৩) জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপনে পুঁজির সংস্থান করা।

কার্যাবলী (Functions) ঃ

ইহার প্রধান প্রধান কার্যাবলী হইল ঃ (ক) নূতন শিল্প গঠনে এবং নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদনে অর্থ সাহায্য করা; (খ) ইহার কারিগরি উপদেশাত্মক সংস্থার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি উপদেশ প্রদান করা; (গ) কতকগুলি বিশেষ শিল্পকে যেমন, কার্পাস, পাট, মেসিন টুলস্ ইত্যাদি শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ সাহায্য করা; (ঘ) দেশে ও বিদেশে কারিগরি কার্যকলাপ বিস্তার করা।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন (ICIC) ঃ

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের সমর্থনে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরামর্শে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অংশীদারীতে ইহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ (১) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তাহাদের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের জন্য ঋণ দান করে; (২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশগ্রহণে উৎসাহ দান করে; (৩) শিল্প বিনিয়োগে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করে; (৪) পুঁজির বাজার সম্প্রসারণ করে; (৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে; (৬) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করে; (৭) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার সময় প্রত্যাভূতি বা গ্যারাণ্টি প্রদান করে; (৮) পুনর্বিনিয়োগের জন্য অর্থসংস্থান করে; (৯) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবস্থাপনাগত, কারিগরি ও প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দান করে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (IDBI) ঃ ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণদান সংস্থাসমূহ যে ঋণ প্রদান করিত তাহা যথেষ্ট নহে। উপরন্তু ইহাদের মধ্যে সংযোজনারও অভাব ছিল। ইহাদের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ স্থাপন এবং নূতন শিল্প-স্থাপনে উৎসাহদান করিবার জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে IDBI একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনরূপে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। ইহার অনুমোদিত পুঁজি ৫০ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

কার্যক্ষেত্র ঃ সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারবার, জাহাজ, পরিবহণ, হোটেল ইত্যাদি কারবারে ইহা ঋণ প্রদান করে।

কার্যাবলী ঃ (১) ইহা প্রত্যক্ষ ঋণদান করিতে পারে অথবা কোন সংস্থার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

(২) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃ-অর্থ-সংস্থান (Re-finance) করিতে পারে।

(৩) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের প্রত্যাভূতি (Guarantee) দিতে পারে।

(৪) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার অবলেখন (Underwriting) করিতে পারে।

(৫) ইহা উন্নয়ন সাহায্য তহবিল (Development Assistance Fund) গঠন করিয়া অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে অর্থ সাহায্য করে।

(৬) ইহা বিনিয়োগের বাজার সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে গবেষণা করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও প্রশাসনিক পরামর্শ দান করে।

স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (SFC) : ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সরকারগুলিকে একটি করিয়া স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া ভারতীয় লোক-সভা এস এফ সি (SFC) আইন পাস করে। বর্তমানে এইরূপ ১৮টি কর্পোরেশন আছে। ইহাদের পুঁজির পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ হইতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী : (১) এস এফ সি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাঝারি ও দীর্ঘ মিয়াদী ঋণের সংস্থান করে, (২) সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির জামিনে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া ইহা অনধিক ২০ বৎসরের জন্য প্রত্যক্ষ ঋণ দেয়, (৩) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া ঋণ গ্রহণের সময় প্রত্যাভূতি বা গ্যারান্টি দেয়, (৪) ইহা দায়গ্রাহকের কাজ করে।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) :

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার স্রফ্ কমিটির (Shroff Committee) সুপারিশ অনুসারে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন** গঠন করেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ইহার ৪টি শাখা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে সেই সকল শিল্প বুঝায়, যাহাদের মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যেখানে ইহা বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক, সেখানে মূলধন ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যে এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। ইহার মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ভারত সরকার ইহার সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করিয়াছেন। প্রয়োজনে ভারত সরকার ইহাকে চল্‌তি মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। ইহা একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী।

কার্যাবলী (Functions) : (১) ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে অর্ডার বা ফরমাশ সংগ্রহ করা।

(২) চলমান বিক্রয়কারী মোটরগাড়ীর (Mobile Sales Van) সহায়তায় আভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণনের (Marketing) ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিপণন-ব্যবস্থা করা।

(৩) ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক শর্তে এবং ঠিকা-সওদা বা ভাড়া ক্রয় (Hire Purchase) ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

(৪) বৃহৎ শিল্পের চতুর্দিকে সহায়ক ক্ষুদ্র শিল্প (Feeder) স্থাপনের চেষ্টা করা।

(৫) শিল্প-মহল (Industrial Estates) নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা করা। ওখ্‌লা ও নৈনিতে এই প্রকার দুইটি শিল্প-মহল নির্মিত হইয়াছে।

(৬) প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং কন্‌ট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করিবার জন্য কন্‌ট্রাক্ট অবলেখন (Underwriting) করা।

(৭) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। রাজকোট, ওখ্‌লা ও হাওড়াতে এইরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

(৮) ক্ষুদ্র শিল্পের পণ্য-বিপণন কার্যকে সুগম করিবার জন্য পণ্যাগার (Warehouse) স্থাপন করা।

ক্রেডিট গ্যারাণ্টি কর্পোরেশন (Credit Guarantee Corporation) ঃ ইহা ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সরকারী ক্ষেত্রের বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে গঠিত।

উদ্দেশ্য ও কার্য ঃ (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে কম ঝুঁকিতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশী পরিমাণে ঋণ দিতে উৎসাহিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হয়।

(২) ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে যে ঋণ দেয় এই কর্পোরেশন সেই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জামীনদার হিসাবে কাজ করে।

অষ্টম অধ্যায় রাষ্ট্রীয় কারবার ও জনহিতকর সংস্থা (Public Enterprises and Public Utilities)

রাষ্ট্রীয় কারবার বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা (State Enterprise or Public Enterprise)

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে, পরিচালনায় এবং মালিকানায় যে কারবার থাকে, তাহাকে কারবার (Public Enterprise or State Enterprise) বলে। রাষ্ট্রীয় কারবারসমূহের সমষ্টিকে রাষ্ট্রীয় কারবারী ক্ষেত্র (Public Sector) বলা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' (Socialistic Pattern of Society) গঠনের নীতি গ্রহণ করিবার পর হইতে কারবারের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশের অর্থনৈতিক ও কারবারী কার্য-কলাপের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ আছে। একটি মতবাদে অর্থনৈতিক কার্য-কলাপে উদ্যোগীদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়। ইহাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব বা অবাধ নীতি (Laissez faire) বলে। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া কোন প্রকার আইন প্রণয়ন অথবা অর্থনৈতিক কার্য-কলাপে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ করিবার বিরোধী।

দ্বিতীয় মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ একথা স্বীকার করেন না যে, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্য-কলাপে স্বাধীনতা থাকিলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উপকার হয়। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইলে দেশের জনসাধারণ মুষ্টিমেয় শক্তিশালী বিত্তবান মালিকবৃন্দ কর্তৃক শোষিত হয়। শিল্প ও কারবারের মালিকগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা প্রকার অন্যায় কার্য করিয়া থাকে। অন্যায়ের অবসান ও জনসাধারণকে পুঁজিপতিদের শোষণ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্য-কলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল দেশেই জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শিল্প ও সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহে (Public Utility Services) অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা (Purposes and Rationale in the formation of State Enterprise):

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ লইয়া রাষ্ট্রীয় কারবার গঠন করা হয়:

(১) **মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ** (Control of Money and Banking): মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মুদ্রার মান স্থির রাখা হয়। এইজন্য মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। ভারতে ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে।

(২) **দেশরক্ষায় অপরিহার্য শিল্প** (Defence and Strategic Industries) : বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প রাষ্ট্রের আয়ত্তে রাখা হয়।

(৩) **একচেটিয়া কারবার** (Monopoly) : বেসরকারী উদ্যোগে একচেটিয়া কারবারের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় কারবার গঠন করা হয়।

(৪) **ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ** (Control of Consumable Goods) : জনসাধারণের স্বার্থে কোনও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে সেই সকল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। যেমন—আফিম পেনিসিলিন ইত্যাদি

(৫) **অত্যাবশ্যক শিল্পের উন্নতি** (Development of Essential Industries) : জনসাধারণের স্বার্থে কোনও সেবা-প্রদায়ী শিল্প-সংস্থাসমূহের উন্নতির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যেমন—ডাক ও তার রেলপথ ইত্যাদি।

(৬) **কর্ম-সংস্থান** (Employment Opportunities) : বেকার সমস্যা বাণিজ্য-চক্রেরই (Trade Cycle) একটি অনিবার্য ফল। শিল্প ও কারবারকে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া কর্মের সংস্থান করা হয়। সেই উদ্দেশ্যেও শিল্প ও বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

(৭) **আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ** (Control of Import and Export) : অনেক সময় দেশের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কারবার গঠন করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) ইহার একটি বিশেষ উদাহরণ।

(৮) **জাতীয় স্বার্থে শিল্পগঠন এবং শিল্প-বিশেষের রাষ্ট্রীয়করণ** (Establishment and Nationalisation of Industries in the National Interest) : দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ভারী, মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সরকারী প্রচেষ্টায় গঠন করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ, বেসরকারী উদ্যোগে (Private Enterprise) এই সকল শিল্প সুপরিকল্পিত উপায়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করে না। আবার অনেক বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অপচয় বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের দ্বারা সরকারী মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়োজন হয়।

(৯) **সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয়** (Proper utilisation of Resources and Co-ordination among different efforts) : জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করিয়া বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোজনা আনিতে পারে। ফলে সর্বক্ষেত্রে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হয়। কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণ এই দিক হইতে যুক্তিযুক্ত।

(১০) **আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা** (Establishment of Regional Economic Balance) : বেসরকারী ক্ষেত্র কেবলমাত্র যে অঞ্চলে অধিক মুনাফার সম্ভাবনা আছে সেই অঞ্চলে শিল্পোন্নতিতে আগ্রহী হয়। ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অসাম্য দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় কারবার অনুন্নত অঞ্চলে গঠিত হইলে এই অসাম্য দূর করা যায়।

(১১) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন** (Economic Development) : সরকারী কারবারের মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়।

(১২) **শ্রমিক ও ক্রেতা শোষণের অবসান** (Abolition of Labour and Customer Exploitation) : সরকারী কারবার জনগণের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে শ্রমিক শোষণ থাকে না। উপরন্তু, সরকার মুনাফার উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করে না বলিয়া রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা হয় এবং ইহাতে জনগণ শোষিত হয় না।

(১৩) **ফাটকা কারবার প্রতিরোধ** (Prevention of Speculative Business) : বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রীয় কারবারে ফাটকার মনোভাব থাকে না।

উপরে আলোচিত উদ্দেশ্য ও সুবিধাগুলি রাষ্ট্রীয় কারবারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

রাষ্ট্রীয় কারবারের ক্ষেত্র (Field of State Enterprises) :

ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারবারসমূহ পরিচালিত হয় :

(১) **প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত শিল্প**, যেমন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ তৈয়ারী, বিমান তৈয়ারী ইত্যাদি। (২) সরকারী কাজের সুবিধার জন্য এবং জনস্বার্থে **ডাক, তার, টেলিফোন, রেডিও, রেল** ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত। (৩) **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন** ও প্রয়োজনীয় **শক্তি-সম্পদ**, যেমন, ডি ভি সি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত। (৪) **ভারী ও যন্ত্রশিল্প**, যেমন, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ইত্যাদি। (৫) **শিল্পীয় অর্থ-সংস্থান প্রতিষ্ঠান** ও **ব্যাঙ্ক ব্যবসা**, যেমন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। (৬) **বীমা ব্যবসা**, যেমন, জীবন-বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা ব্যবসা। (৭) **ঔষধ ও ভেষজ-শিল্প**, যেমন, পেনিসিলিন তৈয়ারী ইত্যাদি। (৮) **পরিবহণ ব্যবসা**, যেমন, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। (৯) **আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা**, যেমন, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া।

রাষ্ট্রীয় কারবারের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Public Enterprises) : সকল রাষ্ট্রীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপ এক নহে। নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা-পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় কারবারসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) সরকারী বিভাগীয় পরিচালনা, (২) পর্ষদ ব্যবস্থাপনা, (৩) সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং (৪) সরকারী কোম্পানী।

(১) সরকারী বিভাগীয় পরিচালনা (Government Department Management):

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানসমূহই সর্বাধিক প্রাচীন। সরকারের আয় বৃদ্ধি ও জনসেবার উদ্দেশ্যেই ইহারা গঠিত। ডাক ও তার, রেলপথ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় পরিচালনায় আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয় সরকারী তহবিলে জমা হয়। আবার দেশরক্ষায় প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ তৈয়ারীর কারখানাও সরকারী অর্থব্যয়ে এবং তত্ত্বাবধানে গঠন করা হইয়াছে। কারণ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের মত গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিবার যথেষ্ট বিপদ আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

বৈশিষ্ট্য (Features): (১) ইহা সরকারের কোন মন্ত্রক বা বিভাগীয় মন্ত্রীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত। (২) এইরূপ ব্যবস্থায় সরকার ও সংস্থাটি একই অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করা হয়। (৩) ইহার সমস্ত আয় সরকারী কোষাগারে (Treasury) জমা পড়ে এবং ব্যয় সরকারী কোষাগার হইতে নির্বাহ হয়। (৪) ইহার কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হয়। (৫) প্রতি বৎসর আইনসভায় বাজেট পেশ করিয়া ইহার অর্থ-সংস্থান ও ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। (৬) ইহাকে আইনসভার নিকট কার্য-সম্পাদনের হিসাব বা কৈফিয়ত প্রদান করিতে হয়। (৭) ইহার হিসাব কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল অফ্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়।

উদাহরণ: ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ, আকাশবাণী (অল ইণ্ডিয়া রেডিও), দূরদর্শন (টেলিভিশন), চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভস্, কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।

সুবিধা (Advantages):

(১) ইহার নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকে। জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সর্বাধিক।

(২) ইহাতে পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ধরনের গোপনীয়তা অবশ্যই প্রয়োজন।

(৩) ইহার ব্যবস্থাপকেরা বিভাগটির কার্য-কলাপের জন্য মন্ত্রীর মাধ্যমে আইনসভায় (Parliament) জবাবদিহি করিতে বাধ্য। সেই কারণে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

(৪) ইহার কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকে।

(৫) ইহা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিরক্ষা-শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য।

(৬) ইহাতে নীতি ও সিদ্ধান্তের একতা রক্ষা করা যায়।

(৭) ইহা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(৮) খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থায় ইহা খুবই উপযোগী।

(৯) যে সকল প্রকল্প উদ্ভাবনী পর্যায়ে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা আমলাতান্ত্রিক (Bureaucratic) আমলাদের (Bureaucrats) দ্বারা প্রশাসিত হয় বলিয়া ইহাতে লাল-ফিতার (Red-tapism) দৌরাত্ম্য অধিক। ফলে কাজকর্মে অনাবশ্যক বিলম্ব দেখা যায়।

(২) এইরূপ ব্যবস্থাপনায় কর্মচারীদের কাজে উৎসাহ ও উদ্যোগ কম দেখা যায়। ইহার মূল কারণ চাকরীতে অতিবাহিত সময়কাল অনুযায়ী উন্নতির (Promotion) নীতি।

(৩) মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘন ঘন পরিবর্তনে ইহার কার্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় ও নীতির পরিবর্তন ঘটে।

(৪) সরকারী কোষাগার হইতে ব্যয় নির্বাহ হয় বলিয়া ইহাতে ব্যয়-সংকোচ করিবার তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। ফলে প্রায়ই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়।

(৫) ইহার ব্যবস্থাপনা আদৌ পরিবর্তনশীল নহে। নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে আইনসভার (Parliament) স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। ইহা সময়-সাপেক্ষ।

(৬) ইহার কাজে সরকারী হস্তক্ষেপ অধিক এবং প্রত্যেকটি কাজ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ।

(৭) কারবার-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার অভাবে বিভাগীয় সংস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসান দেখা যায়।

(২) পর্ষদ ব্যবস্থাপনা (Board Management) :

যে সকল সরকারী সংস্থা জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক পর্ষদ (Board) গঠন করিয়া কার্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকার সরকারী ব্যবস্থাপনাকে পর্ষদ ব্যবস্থাপনা বলে।

উদাহরণ : ভারতীয় রেল বোর্ড, ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড, কোল বোর্ড, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, জল সরবরাহ, পরিবহণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পর্ষদ ব্যবস্থাপনা দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য (Features) ঃ (১) ইহা মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হয় না। ইহার পরিচালনা একটি বোর্ড বা পর্ষদ-এর হাতে ন্যস্ত থাকে। পর্ষদ গঠন করিয়া একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সভাপতি করা হয়। পর্ষদের অন্যান্য সদস্যগণ সরকারী অথবা বেসরকারী ব্যক্তি হইতে পারেন। সদস্য মনোনয়নের অধিকার একমাত্র সরকারেরই হাতে থাকে।

(২) ইহা সাধারণতঃ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে।

(৩) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হইলেও ইহার কর্মচারীবৃন্দ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হয় না।

(৪) ইহার হিসাব অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল কর্তৃক পরীক্ষিত হয়।

(৫) পর্ষদ-এর সদস্যদের বেতন, চাকুরীর শর্ত, বরখাস্ত ইত্যাদি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পর্ষদকে নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক নীতি সরকারী বিভাগীয় নীতিরই অনুরূপ।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পর্ষদ হইতে প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় জানিতে পারেন।

(২) পণ্য ও সেবার মান-উন্নয়ন, উহাদের যথার্থ মূল্যায়ন, মূল্যনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পর্ষদ ব্যবস্থাপনা কার্যকর।

(৩) ইহার পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিকতার কুফল হ্রাস করা সম্ভব।

(৪) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার ন্যায় লাল-ফিতার (Red-tapism) দৌরাত্ম্য প্রবল নহে।

(৫) সরকার হইতে এইরূপ সংস্থা আর্থিক বরাদ্দ পাইয়া থাকে।

(৬) পর্ষদ-এ যদি সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকার সদস্য থাকে তাহা হইলে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ, তৎপরতা ও জনস্বার্থমূলক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

(৭) ইহাতে সরকারী নীতি পুরোপুরি কার্যকর করা যায়।

(৮) ইহা উন্নয়ন ও গবেষণার কার্যসূচী গ্রহণ করিতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের সদস্যদের কারবারী অভিজ্ঞতা থাকে না।

(২) এইরূপ সংস্থার পরিচালন-ব্যবস্থা বিশেষ পরিবর্তনশীল নহে।

(৩) যদি পর্ষদ-এর সদস্যগণ সকলেই সরকারী কর্মচারী হন তবে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা বা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

(৪) ইহাতে উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৫) ব্যয়-সংকোচে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

(৬) ইহার ব্যবস্থাপনায় সরকারী হস্তক্ষেপ থাকে।

(২) পাবলিক কর্পোরেশন বা সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন (Public Corporation or Statutory Corporation) :

আইনসভা বা পার্লামেন্টে বিশেষ আইন দ্বারা অনুমোদিত হইয়া যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাহাকে সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন বলে। প্রতিটি সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রয়োজন হয়। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন গঠন করা হয়। যে আইনের দ্বারা সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন গঠন করা হয় সেই আইনে লিখিত উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও পরিচালন-পদ্ধতি অনুসারে ইহা কার্য সম্পাদন করে। ভারতে যে সকল সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল: দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য (Features) : (১) ইহা দেশের আইনসভা বা পার্লামেন্টের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন (Statutory Corporation) বলে।

(২) ইহা যৌথ মূলধনী কারবারের অনুরূপ, কিন্তু ইহাতে কোন পরিমেল নিয়মাবলী বা আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশন থাকে না।

(৩) পার্লামেন্টের বিশেষ আইনের দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও কার্যক্ষেত্র স্থিরীকৃত হয়।

(৪) ইহার পরিচালন ভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালক-মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে।

(৫) ইহার মূলধন সরাসরি সরকার বা অন্যান্য সরকারী সংস্থার দ্বারা সংগৃহীত হয়।

(৬) ইহার পৃথক সত্তা আছে।

(৭) সংগঠন, পরিচালনা ও আর্থিক ক্ষেত্রে ইহার স্বাতন্ত্র্য (Autonomy) আছে।

(৮) ইহা নিজস্ব কার্য-কলাপের জন্য বার্ষিক বিবরণীর মাধ্যমে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকে। ইহার হিসাবপত্র অডিটর-জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া দ্বারা নিরীক্ষিত হয়।

(৯) দেশের সমস্ত সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। তিনি সাধারণ নির্দেশ ও আদেশ জারি করিতে পারেন।

(১০) এইরূপ সংস্থা প্রধানতঃ জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য গঠিত হয়।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) মুনাফা অর্জন ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে 'না-লাভ না-ক্ষতি' অর্থাৎ সমচ্ছেদ (Break-Even) ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয়মূল্য স্থির করা হয়। ক্রেতাগণ কম মূল্যে দ্রব্য বা সেবা পায়।

(২) একদিকে ইহা আমলাতন্ত্রের প্রভাব-মুক্ত, অন্যদিকে ইহা পার্লামেন্টের নিকট সীমিতভাবে দায়িত্ব সম্পাদনের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। সুতরাং ইহা গণ-দায়িত্ব এড়াইতে পারে না।

(৩) ইহার পক্ষে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং ইহার পরিচালনায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

(৪) ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুবিধা হইল স্বাতন্ত্র্যতা (Autonomy) ইহা (ক) আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত স্বাধীনতা (খ) পরিচালনায় স্বাধীনতা ও (গ) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ-মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং ইহা সরকারী কোষাগারের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত (Free from treasury control), দীর্ঘসূত্রতা-মুক্ত (Free from red-tapism) ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত (Free from political dictation)।

(৫) নিজস্ব সত্তা থাকায় ইহার পরিচালনায় কারবার-ভিত্তিক উদ্যম ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) একদিকে কারবার-ভিত্তিক উদ্যোগ ও অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকায় ইহা জনস্বার্থের উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারী সংস্থা।

(৭) স্বাধীন সত্তা থাকায় সরকারের পরিবর্তনে ইহার নীতির পরিবর্তন হয় না।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) ইহার সংগঠন ও কাজকর্মের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল নহে, কারণ পার্লামেন্ট আইন সংশোধন না করিয়া ইহা সম্ভব নহে।

(২) ইহার স্বাধীনতা নামেমাত্র। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও তাঁহার দপ্তর প্রায়ই ইহার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন।

(৩) ইহার ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিমাণ আমলাতন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান। উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী কর্মচারীদের দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়।

(৪) ইহার কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী না হওয়ায় ইহাতে শ্রমিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না।

(৫) এইরূপ সংস্থায় মুনাফার উপাদান (Profit element) অনুপস্থিত থাকায় ইহার দক্ষতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে।

(৬) ইহার বৃহৎ আয়তন সংযোজনার ক্ষেত্রে সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে।

(৪) সরকারী কোম্পানী (Government Company) :

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় অথবা গরিষ্ঠ সরকারী মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠিত হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সেবা প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে এবং লাভ-ক্ষতির বিবেচনা অগ্রগণ্য, সেই ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠান যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হিসাবে গঠন করা বাঞ্ছনীয়। সরকারী কোম্পানী সাধারণ বাণিজ্যিক ধারা ও নীতি (Commercial Basis and Principles) অনুসরণ করে। যখন কোন সরকারী সংস্থা ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা নিবন্ধিত হয় এবং যাহার মোট বিলিকৃত শেয়ারের অন্ততঃ ৫১% সরকারের দ্বারা অধিকৃত এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহাকে সরকারী কোম্পানী বলে। হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্ লিঃ, হিন্দুস্থান শিপ্ইয়ার্ড লিঃ, অশোকা হোটেলস্ লিঃ, ইণ্ডিয়ান টেলিফোনস্ লিঃ, ইত্যাদি সরকারী কোম্পানীর দৃষ্টান্ত। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন সরকারী কোম্পানীর সর্বাধুনিক রূপ।

বৈশিষ্ট্য (Features) : (১) ইহা কোম্পানী আইন দ্বারা গঠিত এবং সরকার-মনোনীত নিজস্ব পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা ব্যবস্থাপিত।

(২) ইহার মোট বিলিকৃত শেয়ারের অন্ততঃ ৫১% সরকারের হাতে থাকে।

(৩) ইহার নিজস্ব স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী থাকে।

(৪) ইহার বাৎসরিক হিসাব অডিটর-জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক নিরীক্ষিত হয় ও তাহা আইনসভায় পেশ করিতে হয়।

(৫) ইহার শেয়ার রাষ্ট্রপতি, অর্থমন্ত্রকের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় সচিবের নামে থাকে।

(৬) ইহার গঠনে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র, ন্যূনতম আদায়ী-অর্থ বিবরণপত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

(৭) সরকারী কোম্পানীকে কোম্পানী আইন অনুযায়ী সভা আহ্বান করিতে হয় না।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহা বাণিজ্যিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বলিয়া অন্যান্য সরকারী কারবারের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতে পারে। শ্রী এ ডি. গোরওয়ালার মতে, 'ইহা একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ' (Commercial Venture)।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া ইহার পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয়। বেসরকারী কারবারের ব্যবসা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ইহার কারবার পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

(৩) ইহার পৃথক সত্তা থাকায় সংগঠন, প্রশাসন ও আর্থিক দিক হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

(৪) ইহাতে জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব।

(৫) পরিচালনায় কারবার-ভিত্তিক স্বাধীন উদ্যম ও আইনসভায় আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব ও জবাবদিহির সংমিশ্রণে এইরূপ সংস্থা একদিকে পরিচালনায় যোগ্যতা ও অন্যদিকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় এবং স্বৈরাচার হইতে মুক্ত হয়।

(৬) ইহার পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ও লাল-ফিতার প্রভাব-মুক্ত

(অসুবিধা Disadvantages):

(১) মূলধনের অর্ধেকের অধিক সরকার যোগায় বলিয়া এবং পরিচালকবর্গ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয় বলিয়া কারবারের নীতি নির্ধারণে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। রূপে যৌথ-মূলধনী কারবার হইলেও কার্যতঃ মূলধন সংগ্রহ এবং পরিচালনায় সাধারণের কোনরূপ হাত থাকে না।

(২) দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনায় পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রাধান্যও ইহার অপর অসুবিধা। ইহাতে কিছুটা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের অসুবিধা দেখা দেয়।

(৩) আইনসভার নিকট বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশে বাধ্য নহে বলিয়া ইহা অনেক সময় দায়িত্ব এড়াইয়া যায়।

(৪) ইহার কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীর সুযোগ-সুবিধা পায় না।

(৫) পূর্বতন অডিটর-জেনারেল শ্রীনরহরি রাও-এর মতে, 'সরকারী কোম্পানী গঠন হইল সংবিধান ও কোম্পানী আইনের উপর প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা' (fraud)।

সরকারী বিভাগীয় সংস্থা, সাধারণ কর্পোরেশন ও সরকারী কোম্পানীর তুলনামূলক আলোচনা

Comparative Study of Departmental Organisation, Public Corporation and Government Company

সরকারী বিভাগীয় সংস্থা	সাধারণ কর্পোরেশন	সরকারী কোম্পানী
১। সরকারী মন্ত্রকের দ্বারা গঠিত।	১। পার্লামেন্টের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত।	১। কোম্পানী আইন দ্বারা গঠিত।
২। নিজস্ব অস্তিত্ব নাই।	২। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।	২। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।
৩। বিভাগীয় সচিব দ্বারা পরিচালিত হয়।	৩। সরকার-নিযুক্ত পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।	৩। নিজস্ব পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত। বেসরকারী ব্যক্তিও পরিচালক থাকিতে পারে।
৪। সরকারী কোষাগার হইতে আয়-ব্যয় নির্বাহ হয়।	৪। সরকার অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থা মূলধন সরবরাহ করে।	৪। সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি পুঁজি সরবরাহ করে।

সরকারী বিভাগীয় সংস্থা	সাধারণ কর্পোরেশন	সরকারী কোম্পানী
১। সরকার কর্তৃক পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও আমলা-শাসিত।	৭ পার্লামেন্ট কর্তৃক সীমিতভাবে নিয়ন্ত্রিত।	৫। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদ্বারা সীমিতভাবে নিয়ন্ত্রিত।
২। বাজেট অনুসারে আয়-ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারিত হয়	৬ অর্থ-সংস্থানের স্বাধীনতা আছে	৬। অর্থ-সংস্থানের [illegible] শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারে
৩। প্রশাসনে স্বাধীনতা নাই	[illegible] আর্থিক [illegible] স্বাধীনতা [illegible]	৭ সাধারণ কর্পোরেশন [illegible] কম হইলেও সংগঠন [illegible] ও আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে
[illegible] নীতি [illegible] পরিবর্তনশীল [illegible]	[illegible]	৮। নীতি পরিবর্তন [illegible]
[illegible] ভিত্তিক [illegible]	৯ [illegible] মূলক [illegible]	[illegible] কারবার ভিত্তিক সংস্থা।
[illegible] অত্যাবশ্যক [illegible] উপযুক্ত	[illegible] জনসেবা [illegible]	১০ শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য [illegible]
১১। [illegible] কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী	১১। [illegible] কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী নহে	[illegible] কোম্পানীর কর্মচারী সরকারী কর্মচারী নহে

রাষ্ট্রীয় কারবারের [illegible] ত্রুটি (Merits and Demerits of State Enterprises) :

গুণাবলী (Merits) :

(১) সরকারি কারবার দ্বারা [illegible] বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

(২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সম্পদ ব্যবহার সুপরিকল্পিতভাবে করে না নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বার্থ [illegible] দেয় সরকারী কারবার দ্বারা জাতীয় সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার সম্ভব।

(৩) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মুনাফা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পরিমাণ সংকোচ করিয়া উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন সংকুচিত করে এবং দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। এরূপ অভাবকে স্যুমপিটার (Schumpeter) 'ফন্দি-আঁটা অভাব' (Contrived Scarcities) বলিয়াছেন। সরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে।

(৪) জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও সেবা-কার্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ও সেবার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখিবার জন্যও সরকারী কারবার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ, পরিবহণ ইত্যাদি সংস্থা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ উৎপাদন-সংক্রান্ত সমুদয় শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীনে থাকিলে জাতীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সুনিশ্চিত হয়।

(৬) অনুন্নত দেশসমূহ বেসরকারী কারবারী ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে। সরকার রাষ্ট্রীয় কারবারে মূলধন যোগায় বলিয়া অনুন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব।

(৭) রাষ্ট্রীয় কারবারের আয় বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের উপর করের বোঝা কম পড়ে।

ত্রুটিসমূহ (Demerits)ঃ

(১) সরকারের নিযুক্ত আমলা ও কর্মচারীদের কারবারী জ্ঞানের অভাবের দরুন সরকারী কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত নহে।

(২) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কারবারের সহিত একাত্মবোধ দেখা যায় না। এই কারণে কারবারের সাফল্যের জন্য সরকারী কর্মচারিগণ উদ্যোগী হয় না। ইহাতে কারবারে অপচয় ঘটে

(৩) কারবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতি-প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

(৪) বেসরকারী কারবারের মত ইহারা দ্রুতগতিতে কার্য সম্পাদন করে না।

(৫) বিভাগীয় মন্ত্রী ও কারবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের পরিবর্তনের ফলে কারবারের কার্য-পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে ফলে কারবারের কার্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

উপসংহারঃ উপসংহারে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের পক্ষে ঘরোয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করা বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি জাতীয় স্বার্থে ঘরোয়া ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের দোষ-ত্রুটি দূর করিবার জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রতিযোগিতার নীতি অনুসরণ করা অনুচিত নহে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ কারবারী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিলে উহাদের কার্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সেবা প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কারবারী নীতি অনুসারে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সরকারী ও বেসরকারী কারবারের মধ্যে তুলনা
(Comparison between State Enterprise and Private Enterprise)

সরকারী কারবার	বেসরকারী কারবার
(১) **উদ্দেশ্য :** কেবল মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার কারবার স্থাপিত হয় না। সেবা ও কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই এই প্রকার কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়।	(১) এই প্রকার কারবার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।
(২) **অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা :** সুপরিকল্পিত উপায়ে জাতীয় সম্পদ প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়।	(২) জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা ইহাদের নিকট গৌণ শেয়ার-হোল্ডারগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।
(৩) **মূলধন সংগ্রহ :** কর, জাতীয় ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে মূলধন সংগ্রহের সুবিধা আছে। সুতরাং ইহাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব, ফলে ইহাতে বৃহদায়তন কারবার স্থাপন করা যায়।	(৩) জনসাধারণের সঞ্চয়, ব্যাংকের ঋণ প্রভৃতি দ্বারাই বেসরকারী কারবারে মূলধনের সংস্থান হয়। সুতরাং ইহাদের মূলধনের পরিমাণ সরকারী কারবারে নিয়োজিত মূলধন অপেক্ষা অনেক কম ফলে, সরকারী কারবারের তুলনায় ইহাদের আয়তন অনেক ছোট।
(৪) **পরিচালনা :** সরকারী কারবারসমূহ সরকারী আমলাগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্মীবৃন্দ কারবারে অর্থব্যয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখে না। ফলে, এই প্রকার কারবারে যথেষ্ট অপচয় ঘটে।	(৪) বেসরকারী কারবারের মালিকগণ সর্বদাই আয়-ব্যয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে বলিয়া এই প্রকার কারবারে অপচয়ের সম্ভাবনা কম।
(৫) **দক্ষতা :** সরকারী কারবারে কর্মচারীবৃন্দের ব্যবসা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই চলে। ফলে কারবারে দক্ষ পরিচালকের অভাব দেখা যায়।	(৫) ব্যবসা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই বেসরকারী কারবার গঠন করে। ইহাতে দক্ষ পরিচালকের অভাব হয় না।
(৬) **আয়-বৈষম্য :** সরকারী কারবার দ্বারা আয়ের বণ্টন-বৈষম্য হ্রাস	(৬) বেসরকারী কারবারের সংখ্যা যত বেশী হয় আয়ের বণ্টন-বৈষম্যও তত

সরকারী কারবার	বেসরকারী কারবার
করা যায়, ইহা দ্বারা শিল্প ও অন্যান্য কারবারে একচেটিয়া অধিকারের সম্ভাবনার পথও বন্ধ করা সম্ভব।	অধিক হয়। একচেটিয়া অধিকারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।
(৭) গতিঃ সরকারী কারবারের কার্য-কলাপ মন্থর গতিতে চলে।	(৭) বেসরকারী কারবারের কার্য-কলাপ দ্রুত ও তৎপরতার সহিত সাধিত হয়।

রাষ্ট্রীয় কারবারের সমস্যা (Problems of State Enterprises):

রাষ্ট্রীয় কারবার ভারতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা নাই। এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে রাষ্ট্রীয় কারবারের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একথা বলিলে ভুল হইবে যে যদি রাতারাতি সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী কারবারে রূপান্তরিত করা হয়, তবে জনমনে আর কোন সমস্যা থাকিবে না। ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবারের অনেক সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

(১) সাংগঠনিক সমস্যা (Organisational Problems):

রাষ্ট্রীয় কারবারের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন একরূপ সংগঠনের অভাব থাকায় একাধিক সংগঠন লক্ষিত পাওয়া যায়। বিভাগীয় এবং অন্য সংগঠনের মূল ত্রুটি হইতেছে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। নিগমবদ্ধ সংগঠনের স্বাধীন সত্তা বস্তুতঃ অলীক ধারণা। কারণ ইহাতে সরকারী কর্তৃত্ব দেখা যায়। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কারবারের ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ এ. ডি. গোরওয়ালার মতে, সরকারী কোম্পানী সংগঠন ভারতের পক্ষে শ্রেয়, কারণ বিধিবদ্ধ সংগঠনে স্বাধীন সত্তার ধারণা কাল্পনিক। কিন্তু ভূতপূর্ব অডিটর জেনারেল অশোক চন্দ নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারী কোম্পানী সংগঠন প্রবর্তনে নারাজ ছিলেন।

(২) প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা (Problems of Centralisation and Decentralisation in Administration):

রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিশেষ প্রবণতা আছে। কারণ সরকারী সংস্থায় অধিক সংখ্যক দক্ষতাপূর্ণ ব্যক্তির অভাব থাকে। অবশ্য প্রতিরক্ষা ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কারবারে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠানে, যেমন, ডি ভি সি (DVC), এল আই সি (LIC) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভৌগোলিক, আর্থিক, কারিগরি ও দক্ষতার বিচারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা (**Problems of Management**) ঃ

রাষ্ট্রীয় কারবারে ক্ষমতা অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে কতিপয় কর্মাধ্যক্ষ অতি ক্ষমতাশালী হন। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। ইহাতে একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া ওঠে। সরকারী কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশই আমলা। ফলে দক্ষতা ও উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় কোম্পানীর অধিকাংশই নীতি-নির্ধারক পর্ষদ (Policy Board); ইহার পরিচালকগণ সর্বসময়ের পরিচালক নন বলিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। কার্যভিত্তিক পর্ষদ (Functional Board) গঠন করা এইসকল ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(৪) শ্রমিক সম্পর্কের সমস্যা (**Problems of Industrial Relations**) ঃ

রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায় এবং কতিপয় সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাগুলি হইল : (ক) নিয়োগের শর্তাদি-সংক্রান্ত সমস্যা (খ) বিবাদ-সংক্রান্ত সমস্যা, (গ) শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কিত সমস্যা, (ঘ) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত সমস্যা, (ঙ) মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা, ইত্যাদি।

(৫) জনস্বার্থ রক্ষার সমস্যা (**Problems of Protection of Public Interest**) ঃ

জনগণ সরকারী সংস্থার নিকট ন্যায্য দামে ও উপযুক্ত মানের দ্রব্য এবং সেবা আশা করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারবার সেই আশা পূরণে ব্যর্থ। জনস্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে।

(৬) গণ-জবাবদিহির সমস্যা (**Problem of Public Accountability**) ঃ

রাষ্ট্রীয় কারবারকে তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। গণ-কৈফিয়ৎ রাষ্ট্রীয় কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভায় রাষ্ট্রীয় কারবারের উপর প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, বাৎসরিক বিবরণী পেশ, গণ-হিসাব কমিটি ও মূল্য-অবধারণ বা এস্টিমেট কমিটির প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয়। গণ-কৈফিয়ৎ বেশী হইলে কার্য-পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা যায় না। আবার গণ-কৈফিয়ৎ কম হইলে পরিচালকগণ অনেক ক্ষেত্রে জন-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৭) স্বায়ত্তশাসনের সমস্যা (**Problem of Autonomy**) ঃ

ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকিলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংস্থার সমস্যা হইল অতিরিক্ত স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে গণ-কৈফিয়ৎ শিথিল হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলী জন-স্বার্থবিরোধী হয়। অন্যদিকে অতিরিক্ত গণ-কৈফিয়তে পরিচালনায় স্বাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৮) মালিকানার রূপ নির্ধারণের সমস্যা (Problem of Form of Ownership) :

সরকারী কারবারের রূপ বিভাগীয় হইবে, না পর্ষদ-শাসিত হইবে, না সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, না সরকারী কোম্পানী হইবে, সেই সম্পর্কে সমস্যা চিরাচরিত। সরকারী কারবারের রূপ নির্ধারণে সাধারণতঃ কারবারের প্রকৃতি, আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, আয়তন, সমাজ জীবনের উপর উহার প্রভাব, ব্যবস্থাপনার সমস্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই বিষয়গুলি সমস্যার সমাধান করে না।

(৯) আমলাতন্ত্রের সমস্যা (Problem of Bureaucracy) :

সরকারী কারবারে, বিশেষ করিয়া বিভাগীয় ও পর্ষদ ব্যবস্থাপনায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থাকায় কর্মীদের মধ্যে উদ্যোগ ও উদ্দীপনার অভাব দেখা যায় এবং কাজে শৈথিল্য ও মন্থর গতি আসে।

(১০) অনুপ্রেরণার সমস্যা (Problem of Motivation) :

স্বল্প বেতন, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অযোগ্য কর্মী নিয়োগ ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রীয় কারবারে অনুপ্রেরণার অভাব দেখা যায়। ফলে দক্ষতার সমস্যা দেখা যায়।

(১১) সরকার ও রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপের সমস্যা (Problem of Interference of Government and Political Parties) :

ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিতে সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রায়ই হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ফলে যে কোন সমস্যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পড়ে।

(১২) ক্রমাগত লোকসানের সমস্যা (Problem of Continuous Loss) :

রাষ্ট্রীয় কারবার ক্ষতিতে চলে, ইহা একপ্রকার প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাবই এইরূপ প্রবাদের কারণ। উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সততার অভাব এবং কর্মীদের কাজে অসাধু পন্থা গ্রহণের প্রবণতাও ইহার জন্য দায়ী।

(১৩) মূল্য নির্ধারণের সমস্যা (Problem of Pricing) :

রাষ্ট্রীয় কারবারের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য কিভাবে স্থির করা হইবে তাহাও একটি সমস্যা।

সমস্যার প্রতিকার (Remedies against the Problems) :

রাষ্ট্রীয় কারবারের সমস্যাগুলির সমাধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য :

(১) পরিকল্পনা রচনা বাস্তবানুগ হইতে হইবে এবং ইহার রূপায়ণ সঠিক সময়ের মধ্যে হওয়া উচিত।

(২) কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করেন। উপযুক্ত ব্যবস্থাপকগণকে বদলীর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের উপযুক্ত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে।

(৪) সাংগঠনিক ত্রুটি দূর করিয়া শক্তিশালী কারবারী সংগঠন গড়িতে হইবে।

(৫) আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিহার করিতে হইবে।

(৬) কর্মীদের কাজে আশানুরূপ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার জন্য গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন।

(৭) মূলধন বিনিয়োগকে মুনাফার সহিত কার্যকারিতার ভিত্তিতে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৮) রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ সরকারী কারবারের পরিচালনায় কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে।

(৯) অযথা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ না করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রীয় কারবারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে।

(১০) সরকারী কারবারের লোকসান কমাইতে হইলে মানবিক শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপরিব্যয় (overheads) হ্রাস, সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।

(১১) উৎপাদন পরিকল্পনায় উৎপাদনের সঠিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করিতে হইবে।

(১২) অযথা গণ-কৈফিয়তের দায়িত্ব বৃদ্ধি না করিয়া পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসনের নীতি গ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু গণ-কৈফিয়ত ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

(১৩) সরকারী সংস্থায় নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যবস্থাপক ও কর্মীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও সংহতিবোধ জাগ্রত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় কারবারের পরিচালনায় পরিচালকমণ্ডলীর শ্রেণীভেদ (Classification of Board of Directors in the management of State Enterprises) ঃ

রাষ্ট্রীয় কারবারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পর্ষদ ব্যবস্থাপনা, সরকারী কোম্পানী ব্যবস্থাপনা ও সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় তিনপ্রকার পরিচালকমণ্ডলী দেখা যায়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) নীতি-নির্ধারণ পর্ষদ (Policy Board) ঃ

এইরূপ পর্ষদে সর্বক্ষণের পরিচালক থাকেন না। আংশিক সময়ের পরিচালকবৃন্দ ঐ সংস্থার নীতি-নির্ধারণের জন্য দায়ী থাকেন। কেবলমাত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা চেয়ারম্যান সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত হন। ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবারে এই শ্রেণীর পর্ষদ সর্বাধিক দেখা যায়।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) ইহাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কারবারের উপর অধিকতর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতে পারেন।

(২) যেহেতু নীতি-নির্ধারণ পর্ষদ প্রত্যক্ষভাবে কর্মভারপ্রাপ্ত নন সেইহেতু ইহা সাধারণভাবে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি লইতে পারেন।

(৩) ইহাতে যোগ্য ও দক্ষ আংশিক সময়ের পরিচালকের অভাব হয় না।

(৪) প্রতিদিনের পরিচালন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয় দেখিতে হয় না বলিয়া এইরূপ পর্ষদ সর্বাত্মক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ চালু রাখিতে পারে।

(৫) ইহাতে সম্ভোগকারীর ও শ্রমিক প্রতিনিধি থাকিতে পারে।

(৬) যে সকল সরকারী সংস্থা খুব বৃহৎ নয় সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পর্ষদ সুবিধাজনক

(৭) ইহাতে মুখ্য কার্যনির্বাহীর সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) যাঁহারা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁহারা নীতি রূপায়ণে দায়ী থাকেন না বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতি বাস্তবানুগ হয় না।

(২) অনেক ক্ষেত্রে ইহা ব্যবস্থাপনায় আতিশয্য বলিয়া গণ্য করা হয় কারণ মন্ত্রী নিজেই নীতি-নির্ধারণ করেন।

(৩) আংশিক সময়ের পরিচালকগণ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না।

(৪) ইহাতে দলীয় মনোভাবের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) ইহার পরিচালকগণ উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণ করিতে পারেন না কারণ উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে থাকে।

(৬) ইহারা প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনার সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহেন।

(২) কার্যভিত্তিক বা কর্মভারপ্রাপ্ত পর্ষদ (Functional Board) ঃ

ইহার সকল পরিচালকই সর্বক্ষণের পরিচালক। প্রত্যেক পরিচালক এক একটি নির্দিষ্ট কাজের ভারপ্রাপ্ত। যেমন, রেলওয়ে বোর্ড।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) ইহাতে যৌথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়।

(২) প্রত্যেক পরিচালকের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকায় পরিচালকগণ অধিকতর সচেতন হন।

(৩) ইহাতে সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সুগম হয়।

(৪) সরকারের নিকট পরিচালকগণকে জবাবদিহি করিতে হয়।

(৫) ইহাতে স্ব নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়।

অসুবিধা (Disadvantages):

(১) এই প্রকার পর্ষদ বস্তুতঃ আমলাতান্ত্রিক।

(২) সর্বক্ষণের জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাব হইতে পারে।

(৩) ইহাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি-নির্ধারণ বিলম্বিত হয়।

(৪) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি হয়।

(৫) ইহা একটি ব্যয়-বহুল পরিচালন-ব্যবস্থা।

মিশ্র পর্ষদ (Mixed Board):

এই শ্রেণীর পর্ষদে পরিচালকগণের মধ্যে কিছু সর্বক্ষণের ও কিছু আংশিক সময়ের পরিচালক থাকেন। যাঁহারা সর্বক্ষণের পরিচালক [illegible] উপর নির্দিষ্ট কাজের [illegible] ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে পরিচালকমণ্ডলী [illegible] নির্বাহক পর্ষদ ও কর্মভারপ্রাপ্ত [illegible] মিশ্র পর্ষদই শ্রেয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control over State Enterprises in India):

ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উপর গৃহীত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি হইল :

(১) **মন্ত্রকীয়-নিয়ন্ত্রণ (Ministerial Control):**

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কর্তৃক নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় :

(ক) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রক সাধারণ নীতি ও নির্দেশনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) বিশেষ নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয়।

(গ) রাষ্ট্রীয় সংস্থার সিদ্ধান্তে ও কাজে "ভেটো" (Veto) বা মন্ত্রকের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(ঘ) অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কারবারের পরিচালন সমিতিতে (Governing Body) সদস্য হিসাবে যোগদান করিয়া ইহার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঙ) কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার পরিচালন সমিতির সদস্যগণকে নিয়োগ করিয়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক উহার কার্যাবলীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতে পারে।

(২) **আইনসভার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary Control):**

আইনসভা নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে :

(ক) আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক প্রশ্নের মাধ্যমে,

(খ) আইনসভায় বিতর্কের মাধ্যমে।

বিতর্ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর হইতে পারে, যেমন,

(১) সাধারণ বিষয়ের উপর,

(২) বাজেটের উপর,

(৩) বাৎসরিক অথবা কালান্তিক প্রতিবেদনের উপর,

(৪) নিরীক্ষা-প্রতিবেদনের উপর বিতর্ক।

(গ) আইনসভা-কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

আইনসভা-কমিটি তিনপ্রকার হইতে পারে, যেমন,

(১) মূল্য-অবধারণ কমিটি (Estimates Committee), (২) গণ-হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee), (৩) রাষ্ট্রীয় সংস্থার মনোনয়ন কমিটি (Select Committee)।

আইনসভার সদস্যগণ আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলীর উপর প্রশ্ন ও অনুপূরক প্রশ্ন করিতে পারেন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উপযুক্ত সময়ে ঐ প্রশ্ন বা অনুপূরকের উত্তর প্রদান করেন।

সাধারণ বিতর্ক আইনসভার প্রারম্ভিক অধিবেশনের শুরুতেই আরম্ভ হয়। বাজেট অধিবেশনে সাধারণ বাজেট ও বিভাগীয় বাজেটের উপর বিতর্ক হয়।

আইনসভায় বাৎসরিক প্রতিবেদন, হিসাবের বিবরণী, নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পেশ করা হইলে উহাদের উপর আলোচনা ও বিতর্ক হয়।

মূল্য-অবধারণ কমিটি নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগের আনুমানিক মূল্য বা ব্যয় নির্ধারণ করে। ইহা একটি শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী কমিটি। ইহা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কার্যকলাপের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করে এবং ইহাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সঠিক নির্দেশ দেয় ও সুপারিশ করে। গণ-হিসাব কমিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির হিসাবের বিবরণী পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, কোন সংস্থা অনুমিত ব্যয় (grant) অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়াছে কিনা। মনোনয়ন কমিটি একটি ছোট কমিটি। ইহা সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ এবং বিবিধ সমস্যার কথা আইনসভাকে জানায়। কিন্তু এই কমিটি সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ইহা কোন সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনকে উহার রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি উপদেশ ও তুলনামূলক ব্যয়ের উপর বিভিন্ন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে।

কিন্তু আইনসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী হয় না, কারণ সদস্যগণের কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও আইনসভায় কোন বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যে সীমিত সময় দেওয়া হয় তাহা যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, ইহা মরণোত্তর (Post mortem) পর্যালোচনা করে।

রাষ্ট্রীয় কারবারী সংস্থা দপ্তর (Bureau of Public Enterprises):

এই দপ্তর রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দান করে। যখন কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন এই দপ্তর মূলধনের ব্যবস্থা করে। ইহা রাষ্ট্রীয় কারবারকে উৎপাদনের ক্ষমতা ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পন্থা ও কৌশলের প্রস্তাব করে। এই দপ্তর নির্দিষ্ট

সময়ান্তে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া এবং প্রয়োজন মনে করিলে চাক্ষুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন তথ্য প্রতিবেদনের আকারে আইনসভা বা সরকারী প্রতিনিধির নিকট উপস্থাপন করে।

জনহিতকর সংস্থা (Public utilities) :

সংজ্ঞা (Definition) : যে সকল সংস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণে সমাজের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টন করে এবং একচেটিয়া আঞ্চলিক কারবার করে তাহাদের **জনহিতকর সংস্থা** বলে। জনস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বলিয়া ইহাদের জনহিতকর সংস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। গ্যাস, বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহণ, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি সেবামূলক কার্যে রত প্রতিষ্ঠানগুলি জনহিতকর সংস্থা। সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব, মূল্যনীতি ও সেবা প্রদানের নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে।

জনহিতকর সংস্থার গঠন ও বৈশিষ্ট্য (Forms and Features of Public utilities) :

রূপ বা গঠন (Forms) :

জনহিতকর সংস্থা প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রূপে গঠন করা হয়। এই রূপগুলি হইল :

(১) সরকারের কোন মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন **বিভাগীয় গঠন**, যেমন, ভারতীয় রেল সংস্থা, ডাক ও তার সংস্থা, টেলিফোন সংস্থা ইত্যাদি।

(২) পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন **পৌর-শাসিত গঠন**, যেমন, কলিকাতা পৌরসভা, দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইত্যাদি।

(৩) আইনসভায় বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত **সংবিধিবদ্ধ সংস্থা** যেমন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য (Features) :

(১) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের অপরিহার্য পণ্য ও সেবা পরিবেশন করে। ইহাদের সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে হয়।

(২) এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করা খুবই ব্যয়বহুল, কারণ ইহাতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও খুব বেশী।

(৩) এই সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সেবা ও পণ্য সরবরাহ করিতে হয়।

(৪) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

(৫) ইহা এলাকাভিত্তিক একচেটিয়া কারবার গড়িয়া তোলে, যেমন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

(৬) ইহারা এলাকাভিত্তিক একচেটিয়া কারবারের অধিকার পায় বলিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে জনস্বার্থ বিপন্ন না হয়, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য

বৃদ্ধি না পায় ও মান বজায় থাকে, তাহার জন্য সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৭) ইহাদের কার্যকলাপ কোন একটি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

জনহিতকর সংস্থার সুবিধা ও যৌক্তিকতা (Advantages and Rationale of Public utilities) :

(১) লোকহিতকর কার্যকলাপের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সুগম হয় এবং জনজীবন সহজ ও সাবলীল হয়।

(২) ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প দ্রুত গড়িয়া উঠে।

(৩) এই সকল প্রতিষ্ঠান জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা পরিবেশন করিয়া জীবনযাত্রার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে।

(৪) ইহারা সেবা ও পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়া মানবকল্যাণ সাধন করে।

(৫) ইহাদের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় ব্যয় খুবই কম।

(৬) ইহারা অধিক ক্রয়ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্রেতা শ্রেণীর নিকট অধিক দামে পণ্য ও সেবা বিক্রয় করিতে পারে। যেমন, গৃহস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহের হার ও কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

(৭) ইহারা সরকারী সহায়তায় প্রয়োজনীয় জমি দখল করিতে পারে।

অসুবিধা ও সমস্যা (Disadvantages and Problems) :

(১) এই সকল সংস্থা বৃহৎ হয় বলিয়া ইহাদের স্থাপনে বিস্তৃত জমির প্রয়োজন হয় এবং স্থান নির্বাচনে বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয়।

(২) ইহাদের আয়তন এত বৃহৎ হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়ের অসুবিধা দেখা যায়।

(৩) ইহাদের স্থাপনে ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

(৪) এই সকল সংস্থা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। যদি উপযুক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে ইহারা বিপথগামী হইতে পারে।

(৫) ইহাদের উপরি ব্যয় নির্বাহ এত বেশী হয় যে, দ্রব্য ও সেবার অতিরিক্ত মূল্য শোষণের সামিল হয়।

(৬) ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে। ইহাতে অবিচার অসন্তুষ্ট হয়।

(৭) বেসরকারী মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হইলে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুনাফালোভী হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবস্থাপনায় অনমনীয়তা, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দীর্ঘসূত্রতা ও অদক্ষতা দেখা যায়।

জনহিতকর সংস্থার ব্যাধির প্রতিকার ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ (Remedies against Ailments of Public utilities and Government Control) :

জনহিতকর সংস্থাগুলিতে যে সকল সমস্যা প্রায়ই দেখা যায় সেইগুলির **প্রতিকারকল্পে** নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে—

(১) অতি বিচক্ষণতার সহিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করিতে হইবে।

(২) **সরকারী** অর্থানুকূল্যে ইহারা পুষ্ট হওয়া উচিত। **বস্তুতঃ প্রারম্ভিক মূলধন** সরবরাহ সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৩) বিভাগীয় পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গুলি প্রকাশ জনহিতকর সংস্থার ব্যবস্থাপনায় যে অসুবিধা দেখা যায় তাহা দূর করিতে হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংবিধিবদ্ধ হওয়া উচিত, কারণ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা পৃথক আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় ও স্বয়ংশাসিত হয়।

(৪) মূল্য নির্ধারণজনিত যে অসুবিধা দেখা যায় তাহা দূর করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ মূল্য নির্ধারণ সমিতির উপর দ্রব্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণের ভার দিতে হইবে।

(৫) নিপুণতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সহিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।

(৬) ইহাদের কার্যকলাপের মধ্যে উপযুক্ত সংযোজনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) উপযুক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিয়া একচেটিয়া কারবারের ফলে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইবে।

(৮) উপরি-ব্যয় (overheads) হ্রাস করিয়া দ্রব্য ও সেবার মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয় :

(১) প্রত্যেক ক্রেতাকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় সরকার ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) দ্রব্য ও সেবা পরিবেশনে বৈষম্য দেখা দিলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইবে।

(৩) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে হইবে। অন্যথায় **সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটিবে।**

(৪) প্রয়োজনের সময় সরকারী নির্দেশে ইহাদের অতিরিক্ত দ্রব্য ও সেবা পরিবেশন করিতে হইবে।

(৫) সরকারী নির্দেশ না মানিলে সরকার ইহার কার্যকলাপে **হস্তক্ষেপ** করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় স্বার্থে কোন বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান সরকার **অধিগ্রহণ** করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও কারবারী নীতি (Organisation, Management and Business Policy)

সংগঠন (**Organisation**) **:** শ্রম-বিভাগ ও বিশেষায়ন কারবারী প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের দুইটি মূল নীতি। বিশেষায়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, ব্যয়-সংকোচ ও সময়-সংক্ষেপ ঘটে। বিশেষায়িত কার্যাবলীর জন্য উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

সংজ্ঞা (**Definition**) **:** বিশেষায়ন আনিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত হয়। বিভাগীয় কার্যের ভার ও দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কার্য ও কর্মীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে সংগঠন। অধ্যাপক হ্যানির (Prof. Haney) মতে—"একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশিষ্ট অংশগুলির সুষম বিন্যাসকেই সংগঠন বলা হয়।" মিলওয়ার্ড (G. Milward) মতে—"কর্মী ও কর্মধারার সুষম সমন্বয়কে সংগঠন বলে।" **কারবারের সমগ্র কার্যকলাপ বিভিন্ন ব্যবস্থাপকের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাহাদের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় কারবারের উদ্দেশ্য সাধন করাকে সংগঠন বলে।**

কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মূলধন, শ্রমিক এবং কর্মী সরবরাহ করাই সংগঠনের কাজ। বিশেষায়িত কার্যাবলী সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু সংগঠন প্রয়োজন। কারবারের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ খোলা হয়। যেমন, উৎপাদন-বিভাগ, ক্রয়-বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ-বিভাগ, কর্মী-বিভাগ, সচিব বিভাগ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগের ব্যবস্থাপনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ করাও সংগঠনের কাজ।

সংগঠন গড়িয়া তুলিবার পদক্ষেপ (Steps Involved in Organisation) :

সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(ক) কার্যকলাপ স্থিরীকরণ (Determination of activities) ;

(খ) কার্যাবলীর শ্রেণী-বিভাগকরণ (Classification of activities) ;

(গ) কার্যভিত্তিক বিভাগ গঠন (Creation of functional departments) ;

(ঘ) কর্তব্য বণ্টন (Allocation of duties) ;

(ঙ) ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে কর্তৃত্ব-সম্পর্ক স্থাপন (Establishing Authority-relationship) ;

(চ) ভারার্পণ বা কর্তৃত্ব অর্পণ (Delegation of Authority);

(ছ) সংযোজনা (Co-ordination) ।

বিভাগীয়করণ, ভারার্পণ ও সংযোজনা এই তিনটিই সংগঠনের প্রধান পদক্ষেপ। এল. এফ. আরউইক (L. F. Urwick) বিভাগীয়করণকে মোটরগাড়ীর নকশা আঁকা (designing), ভারার্পণকে মোটরযান তৈয়ারী (making) ও সংযোজনাকে মোটরগাড়ী চালনার (driving) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সংগঠনের বিভিন্ন ধাপগুলির ব্যাখ্যা করা হইল :

(১) কার্যাবলী নির্ধারণ (Determination of Activities) : কারবারের বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন, কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন, বিপণন, অর্থসংস্থান, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, পণ্য মজুতকরণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, হিসাবরক্ষণ, কর্মচারী সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং তাহাদের ব্যাপকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে হইবে।

(২) কার্যাবলীর বিভাগীয়করণ (Departmentation of Activities) : প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যাবলীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিভাগীয়করণ করিতে হয়। বিভাগীয় কার্যের পরিমাণ ব্যাপক হইলে তাহার অধীনে উপ-বিভাগ (Section) গঠন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন বিভাগগুলি হইল : ক্রয়-বিভাগ, বিক্রয়-বিভাগ, উৎপাদন-বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, কর্মী বা ব্যক্তিসম্বন্ধীয় বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার-বিভাগ, নগদ-বিভাগ ইত্যাদি।

(৩) কর্তব্য বণ্টন (Allocation of Duties) : কর্মিগণের দক্ষতা অনুযায়ী তাহাদের উপর কর্তব্য বণ্টন করা হয়। কর্তব্যের নির্দিষ্টতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট কর্তব্য বণ্টনের ফলে দ্রুত কর্মসম্পাদন সম্ভব হয়।

(৪) কর্তৃত্ব অর্পণ (Delegation of Authority) : ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ স্তরানুক্রমে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্তৃত্ব বণ্টন করেন। কর্তৃত্ব প্রবাহ নিম্নগামী হয়। দায়িত্ব অনুসারে কর্তৃত্ব বণ্টন করিতে হইবে। দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য (parity) থাকিবে। কর্তৃত্ব ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন।

সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উপাদান (Elements of Organisation) :

সংগঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি হইল : (১) উদ্দেশ্য ও নীতি স্থিরীকরণ, (২) মোট কর্মধারা নির্ধারণ, (৩) কর্মিগণের মধ্যে নির্দিষ্ট কর্তব্য বণ্টন, (৪) সমন্বয় ও ভারসাম্য, (৫) ভার বা কর্তৃত্ব অর্পণ, (৬) স্তর-অনুক্রমিক যোগসূত্র, (৭) ব্যবস্থাপনার সীমা বা পরিধি নির্ধারণ, (৮) আদেশের একতা, (৯) কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতা, (১০) ব্যয়-সংকোচ ও দক্ষতা, (১১) পরিবর্তনশীলতা; (১২) পরিচালন-ব্যবস্থার সরলতা; (১৩) সংগঠনের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি।

সংগঠন কারবারের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে। সংগঠনের মাধ্যমেই জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইহা কারবারে প্রাণ সঞ্চার করে।

সংগঠনের নীতিসমূহ (Principles of Organisation) :

সংগঠন নিয়মমাফিক (Formal) ও অনিয়মমাফিক (Informal) হইতে পারে। কুনজ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O'Donnell) সংগঠনের নীতিগুলিকে চারিটি ভাগে আলোচনা করিয়াছেন। যেমন, (ক) উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত নীতি (খ) কারণ-সংক্রান্ত নীতি (গ) কাঠামো-সংক্রান্ত নীতি এবং (ঘ) সংগঠন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত নীতি।

সংগঠনের নীতি প্রবর্তিত হয় টেলর, ফেয়ল, আরউইক, পিটার ড্রাকার, অ্যালেন প্রভৃতি প্রখ্যাত সংগঠক ও ব্যবস্থাবিদগণের দ্বারা। নিয়মমাফিক সংগঠনের মূল নীতিগুলি হইল :

(১) **উদ্দেশ্য তত্ত্ব (Principle of Objective)** : বিভাগীয়, উপ-বিভাগীয় ও খুচরা-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইবে।

(২) **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and Responsibility)** : কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কর্তৃত্বের মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীকে আদেশ প্রদান করেন এবং নিজে তাঁহার দায়িত্ব পালন করেন। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য (parity) থাকা দরকার। দায়িত্বভার অর্পণ করা যায় না। অধস্তন কর্মচারীর কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারী দায়ী থাকেন। তবে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে আঙ্কিক সমতা (mathematical equality) থাকে না।

(৩) **নিয়ন্ত্রণের পরিধি (Span of Control or Span of Supervision)** : প্যারিসের ব্যবস্থাপনাবিদ ভি. এ. গ্রেকুনাস (V. A. Graicunas) নিয়ন্ত্রণের পরিধি তত্ত্বের উদ্ভাবক। একজন ব্যবস্থাপকের সামর্থ্য ও নিয়ন্ত্রণের পরিধি সীমাবদ্ধ। একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে যতজন অধস্তন কর্মচারী কাজ করিলে তিনি তাহাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন তাহাকে নিয়ন্ত্রণের পরিধি বলে। নিয়ন্ত্রণের এই বিস্তার নির্ধারণ করা সংগঠনের একটি নীতি। গ্রেকুনাস-এর মতে, ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরে (lower level) ৬ হইতে ১৮ জন এবং উচ্চস্তরে (upper level) ৩ হইতে ৬ জন কর্মচারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহা নির্ভর করে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীর দক্ষতার উপর এবং কাজের প্রকৃতি ও সংগঠনের কাঠামোর উপর। গ্রেকুনাস তিন প্রকার সম্পর্কের (relationship) বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কগুলি হইল : (ক) **প্রত্যক্ষ সম্পর্ক** (Direct relationship), (খ) **দলীয় সম্পর্ক** (Group relationship) এবং (গ) **পারস্পরিক সম্পর্ক** (Cross-relationship)। গ্রেকুনাস মোট সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি সূত্র (formula) দিয়াছেন :

$$N = n\left(\frac{2^n}{2} + n - 1\right)$$

যেখানে, N = মোট সম্পর্ক
এবং n = অধস্তন কর্মচারিগণের সংখ্যা।

ধরা যাক, কোন একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ৩ জন অধস্তন কর্মচারী আছে সুতরাং, মোট সম্পর্ক হইবে :

$$N=৩\left(\frac{২^৩}{২}+৩-১\right)=৩\left(\frac{২\times২\times২}{২}+৩-১\right)=১৮$$

(৪) **স্তর নীতি (Scalar Principle)** : সংগঠনের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল উর্ধ্বতন কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রবাহ অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া।

(৫) **কার্য-বিভাজন ও পদমর্যাদার নীতি (Division of Work Principle)** : যে ব্যক্তি যে কাজে নিযুক্ত থাকিবে তাহার পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব স্থির করিয়া দিয়া কাজের সুস্পষ্ট বিভাজন করা সংগঠনের নীতি।

(৬) **আদেশের একতা (Unity of Command)** : একজন কর্মচারী তাহার কর্মসম্পাদনের জন্য মাত্র একজন উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালন করিবেন। ইহাতে কারবারের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় না এবং কর্মিগণ সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। অন্যথায় কর্তৃত্বের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হইবে এবং সুষ্ঠু সংগঠন গড়িয়া উঠিবে না।

(৭) **কর্তৃত্বের ভারার্পণ নীতি (Principle of Delegation of Authority)** : যাহাকে কার্য সম্পাদনের ভার দেওয়া হইবে তাহাকে উহা সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে। কর্তৃত্ব ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন। কর্তব্য বণ্টনের সহিত কর্তৃত্ব বণ্টন সংগঠনের মূল নীতি। উর্ধ্বতন কর্মচারী অধস্তন কর্মচারীকে ধাপে ধাপে কর্তৃত্ব বণ্টন করেন।

(৮) **কাঠামোগত একতা (Structural Unity)** : কোন একটি বিশেষ বিভাগীয় কার্যকলাপকে অন্য বিভাগের কার্যের তুলনায় বড় করিয়া দেখা উচিত নহে। প্রত্যেকের কর্মপ্রচেষ্টা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন করিয়া দক্ষ ব্যক্তির উপর কর্মসম্পাদনের ভার অর্পণ করিতে হইবে।

(৯) **কার্যের সুনির্দেশকরণ (Functional Definition)** : সংগঠনের প্রত্যেক কর্মচারীর কার্যভার ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতে হইবে এবং সংগঠনের প্রতিটি স্তরের (level) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(১০) **ভারসাম্য (Balance)** : বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যাবলীর মধ্যে সাদৃশ্য রাখিতে হইবে। কর্মসমন্বয় রক্ষা করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা সংগঠনের মূল নীতি।

(১১) **পরিবর্তনশীলতা ও ধারাবাহিকতা (Flexibility and Continuity)** : কারবারের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সংগঠনে নমনীয়তা

প্রয়োজন। কারবার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইয়া এবং যুগের সহিত তাল মিলাইয়া সংগঠনকে কারবারের স্থিতিশীলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১২) **সরলতা (Simplicity)**ঃ সংগঠনের কাঠামো ও স্তর সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। ইহাতে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় ও জটিলতা হ্রাস করা যায়।

(১৩) **ব্যয়-সংকোচ ও মানোন্নয়ন (Economy and Standardisation)**, সময়, অর্থ, পণ্যের মান ও পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সংগঠনকে সচেতন হইতে হইবে। ইহাতে ব্যয়-সংকোচ ও মানোন্নয়ন সম্ভব হইবে।

(১৪) **কৈফিয়ত গ্রহণ (Accountability)**ঃ কর্তৃত্বপ্রবাহ নিম্নগামী। কর্তৃত্ব প্রাপ্তির বিনিময়ে অধস্তন কর্মচারিগণকে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট দায়িত্বের কৈফিয়ত দিতে হইবে। কৈফিয়ত প্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয়।

ইহা ছাড়া (ক) সহযোগিতা ও সমন্বয় (খ) কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ (গ) কর্মী নিয়োগ (ঘ) নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি (ঙ) কার্যকারিতা, ইত্যাদি নীতিও ভাল সংগঠনের নীতি।

সংগঠনের তাৎপর্য অথবা গুরুত্ব (Significance or Importance of Organisation)ঃ

সংগঠন একটি মানবিক পদ্ধতি (human system)। কারবারী প্রক্রিয়া যথাযথ রাখিবার জন্য সুষ্ঠু সংগঠন অপরিহার্য। অ্যানড্রু কারনেগি (Andrew Carnegie)-র মতে, "আমাদের কারখানা, ব্যবসা পরিবহণ অর্থ সকল কিছুই লইয়া যাও শুধু আমাদের জন্য সংগঠনটি রাখিয়া দিও। দেখিবে আগামী চার বছরের মধ্যে আমরা নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠিত করিব।"

সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) সংগঠন একটি যন্ত্রের মত। ইহার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কারবারে নির্দেশ সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী সম্পাদন করে।

(২) ইহা কারবারের সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাহায্য করে। সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের মধ্যে কার্য বণ্টন করিয়া যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের নিশ্চয়তা দেয়।

(৩) কার্যভার বণ্টন ও কর্তৃত্ব অর্পণ করায় কর্মীদের মধ্যে কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা আসে এবং কর্ম-প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

(৪) সংগঠন কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, ফলে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) উপযুক্ত সংগঠন কাঠামো সৃষ্টি করিলে কর্মীদের পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয় ঘটে এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কাজের সময় ও শ্রম সংক্ষেপণ করা সম্ভব হয় এবং শ্রমের অপচয় বন্ধ করা যায়।

(৬) সুষ্ঠু সংগঠনে দলীয় ঐক্য গড়িয়া ওঠে এবং কর্মিগণ দলীয় উদ্দেশ্য পালনে কর্তব্যপরায়ণ হয়।

(৭) কারবারে সামগ্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সংগঠন যোগসূত্র ঘটায় এবং সংযোজনা কাজে সাহায্য করে।

(৮) কারবারের সম্প্রসারণে সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) ব্যবস্থাপনা নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করিয়া সংগঠন ব্যক্তি ও বিভাগীয় কার্যকলাপকে সমন্বিত করে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে সফল করে।

(১০) সংগঠন হইল কারবারের ভিত্তিপ্রস্তর।

ব্যবস্থাপনা (Management) :

সংজ্ঞা ও ধারণা (Definition and Concept) :

কর্মচারিগণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন করাইয়া লইবার পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া (Process)।

ব্যবস্থাপনা হইতেছে কর্মচারিগণকে নির্দেশ প্রদানের কলা ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, যাহার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়। চেস্টার আই. বার্নার্ডের মতে, "ইহা একটি আচরণমূলক জ্ঞান" (behavioural knowledge)।

হেনরী ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে "পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা সংগঠন, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ করার কাজকে ব্যবস্থাপনা বলে।"

জন মী (John Mee)-এর মতে "ব্যবস্থাপনা একটি কৌশল, যাহার সাহায্যে স্বল্প প্রয়াসে নিয়োগকর্তা কর্মচারী ও জনগণের সর্বাধিক উন্নতি, সুখ ও সেবাপ্রদান করা যায়।"

পিটার ড্রাকার (Peter Drucker)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হইল কারবারী প্রতিষ্ঠানের একটি বিষয়গত (objective) প্রয়োজনীয় অঙ্গ যাহা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির উপর কর্তৃত্ব করে এবং ইহার সমস্ত কার্য পরিচালনা করে।'

ইংরাজীতে ম্যানেজমেন্ট-এর বানান হইতেছে "Manage/men/t"—'ম্যানেজ' অর্থে 'ব্যবস্থাপনা', 'মেন' অর্থে 'কর্মচারী' এবং 'টি' (tactfulness) অর্থে কৌশলকে বুঝায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা অর্থে মানবিক শক্তির কৌশলগত ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। সংক্ষেপে, ব্যবস্থাপনা বলিতে বুঝায় সুপরিকল্পিত পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধানে কারবারের যাবতীয় কার্যকলাপ কৌশলের সঙ্গে অপরকে দিয়া করাইয়া লইবার সর্বজনগ্রাহ্য (universal) প্রক্রিয়া।

ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Significance or Importance of Management) :

(১) ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ব্রেক (Brech)-এর উক্তি অনুধাবন করিলে বোঝা যাইবে। তাঁহার মতে, দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা স্বল্প প্রয়াসে নির্দিষ্ট মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া অধিকতর উৎপাদন করা সম্ভব।

(২) ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য অর্জনের চাবিকাঠি।

(৩) কারবারে আটটি 'M'-এর প্রয়োজন হয় যেমন, Men (মানুষ), Materials (কাঁচামাল), Machines (যন্ত্রপাতি), Methods (পদ্ধতি), Money (অর্থ), Motive (ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য), Market (বাজার) ও Management (ব্যবস্থাপনা)। ব্যবস্থাপনা এই 'M'-গুলির শীর্ষে অবস্থান করে এবং ইহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

(৪) ব্যবস্থাপনা মানুষের মস্তিষ্কের মত। ইহা কারবার পরিচালনা করে।

(৫) কারবারে উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া ব্যবস্থাপনা কারবারের সৃজনী শক্তি যোগায়।

(৬) ইহা পরিচালনার মান উন্নয়ন করে, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং কারবারে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

(৭) ব্যবস্থাপনাকে মানব মনের সহিত তুলনা করা যায়। মন যেমন কোন কিছু পাইবার জন্য শরীরকে চালনা করে, ব্যবস্থাপনা তেমনি সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কারবারের উদ্দেশ্য সফল করে।

(৮) ইহা [illegible] নূতন নূতন পরিকল্পনা, [illegible] ও ভাবধারার সৃষ্টি করে এবং কারবারে উন্নয়ন [illegible]।

(৯) ইহা স্বল্পতর মূল্যে অধিক উৎপাদন করিয়া সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ও শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।

(১০) ইহা আর্থিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে এবং কারবারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া স্বাভাবিক কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

(১১) ব্যবস্থাপনা কারবারের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শকের (friend, philosopher and guide) কাজ করে।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Organisation and Management) ঃ

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

সংগঠন	ব্যবস্থাপনা
(১) ইহা কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।	(১) ইহা অপরকে দিয়া কৌশলের সহিত কার্যসম্পাদন করাইয়া লইবার পদ্ধতি।
(২) ইহা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।	(২) ইহা একটি বিষয়গত (objective) প্রক্রিয়া (process)।
(৩) সংগঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য কর্মিগণের দ্বারা বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের সাহায্যে সম্পাদিত হয়।	(৩) পরিকল্পিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবস্থাপনা আদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রাণিত-করণ, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কর্মীদের কাজের তত্ত্বাবধান করে।

সংগঠন	ব্যবস্থাপনা
(৪) ইহা কার্যসম্পাদনের ভিত্তিস্বরূপ।	(৪) ইহা কার্যপরিচালনার পদ্ধতি।
(৫) ইহা মানবদেহের স্নায়ুর মত।	(৫) ইহা মানবদেহের মনের মত।
(৬) ইহার স্তরানুক্রম নাই, কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামো আছে।	(৬) ইহার বিভিন্ন স্তর আছে।
(৭) ইহার কাজ সাংগঠনিক।	(৭) ইহার কাজ প্রশাসনিক।
(৮) ইহা ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদনের কাঠামো।	(৮) সংগঠনের মাধ্যমে ইহা কাজ করে।
(৯) ইহা সর্বস্তরের কর্মীদের কর্মক্ষেত্র।	(৯) ইহা মধ্য ও নিম্নস্তরের কর্মিগণের কর্মক্ষেত্র।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য (Distinction between Administration and Management) :

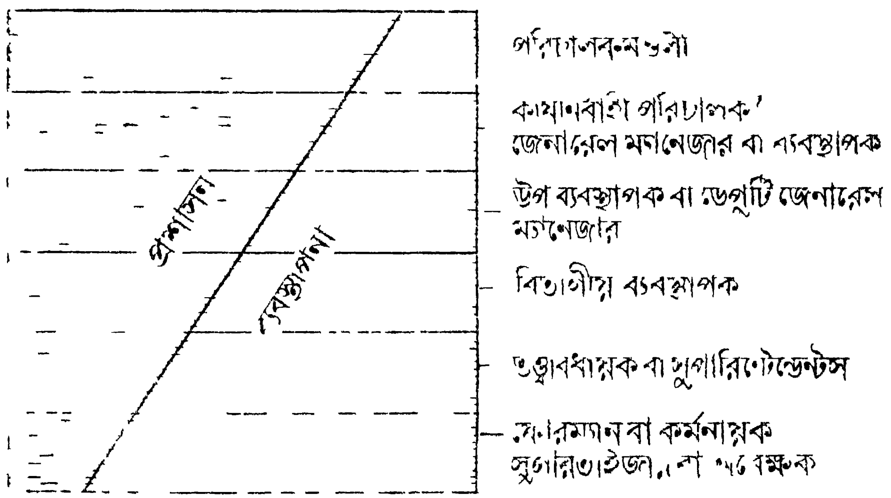
কারবারী জগতে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রকৃতপক্ষে একই [illegible]। হেনরী ফেয়লের মতে, প্রকৃত অর্থে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই। আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদগণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। কারণ, ব্যবস্থাপনা বলিতে কারবার পরিচালনার সামগ্রিক রূপটিকে বোঝায়। প্রশাসনও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ। সুতরাং বাস্তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা যায় না।

কিন্তু ই. এফ. এল. ব্রেক (E. F. L. Brech)-এর মতে ব্যবস্থাপনার অর্থ প্রশাসন অপেক্ষা ব্যাপক। আবার স্প্রিগেল (Spriegel)-এর মতে, প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকিয়া উদ্দেশ্য, নীতি-নির্ধারণ ও সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করে এবং ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য ও নীতির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উদ্দেশ্য ও নীতিকে কার্যে রূপায়িত করে। ব্রেক ও স্প্রিগেলের মত অনুযায়ী প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য দেখান হইল :

প্রশাসন	ব্যবস্থাপনা
(১) ইহা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করে।	(১) ইহা উদ্দেশ্য ও নীতিকে কার্যে রূপায়িত করে।
(২) ইহা পরিকল্পনা ও সংগঠন করে।	(২) ইহা আদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে।
(৩) ইহা বিধান (governing) দেয়।	(৩) ইহা বিধানকে কার্যে রূপায়িত (execution) করে।

প্রশাসন	ব্যবস্থাপনা
(৪) ইহা পরিকল্পনা বা চিন্তা (thinking) করে।	(৪) ইহা কাজ (doing) করে।
(৫) ইহার কাজ প্রধানতঃ শাসন (administration) করা।	(৫) ইহার কাজ পরিচালনা করা।
(৬) মালিকগণের ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে ইহা ন্যস্ত থাকে।	(৬) মধ্য ও নিম্নস্তরের কর্মচারিগণের হাতে ইহার ভার থাকে।
(৭) ব্যবস্থাপনার শীর্ষ স্তরে (top level) প্রশাসকগণ থাকেন।	(৭) ব্যবস্থাপনার মধ্য ও নিম্নস্তরের কর্মচারিগণ ব্যবস্থাপক।
(৮) ইহা দেহ সৃষ্টির কারিগরের মত।	(৮) ইহা মানুষের মনের মত।

কিন্তু উপরোক্ত পার্থক্য বিভ্রান্তিকর (misleading)। কারণ, ব্যবস্থাপকগণকেও পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজ করিতে হয়। পার্থক্য শুধু মাত্রার। ব্যবস্থাপনা হইতেছে কোন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার একটি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান (Specialised Knowledge)। যখন এই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান কোন সরকারী বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ঐ ধরনের



প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্যের রেখাচিত্র

অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে প্রশাসন বলে। আবার এই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান যখন কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে ব্যবস্থাপনা বলে। ইহাদের মধ্যে কোন নিশ্ছিদ্র (watertight) পার্থক্য করা যায় না।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ও স্কুল (Evolution of Management Thought and Schools) :

কারবারের আয়তন বৃদ্ধি ও মানবিক সম্পর্কের জটিলতার ফলে কারবারী সমস্যার সমাধান ও দক্ষতার সহিত দ্রুত কার্য সম্পাদনার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার নীতি-নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। নিম্নে ক্রমবিকাশের পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা করা হইল :

১) ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটেনের **বোলটন** এবং **ওয়াট** উৎপাদন ব্যবস্থাপনার তথ্য প্রকাশ করেন।

(২) ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে **রবার্ট ওয়েন** ব্যবস্থাপনায় মানবিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(৩) ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক **চার্লস বাবেজ** উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করেন।

(৪) **ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর** ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সময় নিরীক্ষণ ও গতি নিরীক্ষণ, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্থক্যমূলক ফুরন-হার পদ্ধতি (Differential Piece Rate System), ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শপ ব্যবস্থাপনা (Shop Management) ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার (Scientific Management) পদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(৫) টেলরের সমসাময়িক ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ ছিলেন—**এইচ. এস. পারসন, গ্যান্ট, ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ, এমারসন, কেনডল, বার্থ** এবং **এফ. এ হ্যালসী**।

(৬) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী শিল্পপতি ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার **হেনরি ফেওল** ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলি ও কার্যের দর্শন উপস্থাপন করেন। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সকল স্তরের ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণ করেন।

৭) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে **ওলিভার শেলডন** ব্যবস্থাপনার দর্শন' (Philosophy of Management) গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(৮) সমসাময়িককালে **এল এফ আরউইক** সংগঠনের নীতি ও ব্যবস্থাপনার উপর অবদান রাখেন।

(৯) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে **হেনরি ডেনিসন** অনুপ্রাণিতকরণ, নেতৃত্ব ও দলগত কার্য সম্পর্কে সংগঠনের কাঠামো বিশ্লেষণ এবং **মুনী** ও **রেইলি** শিল্পের উপর ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব দান ও সংযোজনার নীতি আলোচনা করেন। এই সময় **চেস্টার আই. বার্নার্ড** ব্যবস্থাপকগণের কার্যাবলীর উপর তাঁহার অবদান রাখেন।

(১০) ১৯২৪ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **এলটন মেয়ো, রোয়েথলিস্‌বারজার হথর্ন** পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Hawthorne Experiments) করেন। ইহা চিকাগোর ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুকূল পরিবেশ কর্মচারীকে কাজে অনুপ্রাণিত করিতে পারে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

(১১) সমসাময়িক কালে সমাজ-বিজ্ঞানী **মেরী পারকার ফোলেট** সংগঠন প্রক্রিয়ায় মানুষের কার্যকলাপ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া মনে করেন।

(১২) ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন এবং ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট-এর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Different Approaches to Management):

ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে দুইভাগে আলোচনা করা যায়:

(ক) **সনাতন বা ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি (Classical Approach):** ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারায় যে সকল ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ নীতি, কলাকৌশল ও প্রক্রিয়ার মতাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলিকে ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি আখ্যা দেওয়া যায়। এইগুলি হইল:

(১) **উৎপাদিকাশক্তি দৃষ্টিভঙ্গি (Productivity Approach):** ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর, ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ, এইচ. এল. গ্যান্ট (H. L. Gantt) প্রমুখ ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ এই দৃষ্টিভঙ্গির জনক। ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য। সময়-নিরীক্ষণ, গতি-নিরীক্ষণ, শ্রান্তি-নিরীক্ষণ ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র কারখানা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহা ব্যবস্থাপনার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Total Approach) নহে। ইহা শিল্পে মানবিক দিককে উপেক্ষা করে।

(২) **ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া দৃষ্টিভঙ্গি (Management Process Approach):** ইহাকে সর্বব্যাপী (Universal) বা চিরাচরিত (Traditional) ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। হেনরি ফেওল এই দৃষ্টিভঙ্গির জনক। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য সমর্থক ছিলেন মুনী, রেইলি, আরউইক, হ্যারল্ড কুঞ্জ এবং ও'ডোনেল, নিউম্যান, লুথার গ্যালিক, জর্জ টেরি ই. এফ. আই. ব্রেক, ম্যাকফারল্যাণ্ড ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া (Process)। যে কোন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে **পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশপ্রদান, সংযোজনা** এবং **নিয়ন্ত্রণের** প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ব্যবস্থাপনাকে সর্বব্যাপী বলা সমীচীন নহে, কারণ সংগঠনের কাজ গতিশীল।

(৩) **মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Human Relations Approach):** এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হইলেন এলটন মেয়ো, রোয়েথলিস বার্জার, মেরী ফোলেট, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, কিথ ডেভিস, আব্রাহাম মাসলো, ক্রিস আরগিরিস, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ ইত্যাদি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি কার্যে নিযুক্ত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহা অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া কর্মীদের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক এলটন মেয়ো ও রোয়েথলিস বার্জারের নেতৃত্বাধীনে চিকাগোর নিকট অবস্থিত হথর্নের ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীর কারখানায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Hawthorne Experiments) [illegible]

দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য হইতেছে, উত্তম ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মধুর মানবিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। কিন্তু শুধু মানবিক সম্পর্ক নহে, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য বহু বিষয় ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Empirical Approach) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথা অনুযায়ী (By customs) ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতীত ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা পর্যবেক্ষণের (Case Study) উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর্নেস্ট ডেল হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল, আমেরিকান ম্যানেজমেণ্ট এসোসিয়েশন ইত্যাদি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কিন্তু পরিবর্তনশীল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতীত ঘটনার 'পর্যবেক্ষণ-ফল' প্রয়োগ করিলে উহা ফলদায়ক হয় না।

(খ) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Modern Approach) ঃ

ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক ও গবেষকগণ ব্যবস্থাপনার যে সকল আধুনিক মতাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলিকে ব্যবস্থাপনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) আচরণ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural Approach) ঃ ডগলাস ম্যাকগ্রেগর আব্রাহাম মাসলো, কার্ট লিউইন, চেস্টার আই. বার্নার্ড, মেরী পারকার ফোলেট, রেনসিস লিকার্ট, ক্রিস আরগিরিস, ওয়ারেন বেনিস ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। ইহারা বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানবিক সংগঠন ও মানবিক সম্পর্কের ভারসাম্য ও গতিশীল বিশ্লেষণ এবং সমন্বয়ের উপর জোর দিয়াছেন। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের সমষ্টি হিসাবে ব্যবস্থাপনা কাজ করে। সহযোগিতা ও সংযোজনার ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত। নিয়মমাফিক ও অনিয়মাফিক বা নিয়ম-বহির্ভূত সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ব্যবস্থাপকগণকে অনুধাবন করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মচারিগণের কল্যাণের উপরও দৃষ্টি দিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু আচরণ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে।

(২) নিয়মানুগ দৃষ্টিভঙ্গি (Systems Approach) ঃ বোল্ডিং, জনসন, কাস্ট, রোজেন, চার্চম্যান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, কারবার ব্যবস্থাপনায় যে সকল বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজন হয় উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কেবল একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব বা দৃষ্টি দিলে এবং অন্য বিষয়ের সহিত উহার সম্পর্ক বিবেচনা না করিয়া কাজ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। সংগঠন একটি সামাজিক পদ্ধতি (Social System)। ইহাকে সর্বাত্মক (Wholistic) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বৃহদাকার সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি করে।

(৩) সিদ্ধান্ত-দৃষ্টিভঙ্গি (Decision-Approach) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতিনীতি ও কার্যকারণ অবগত হইতে হইবে। হারবার্ট সাইমন, চেস্টার আই. বার্নার্ড, জেমস মার্চ,

(৪) **গাণিতিক বা পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Mathematical or Quantitative Approach)** : জোয়েল ডিন, নিউম্যান, এক্কফ, হিক্স ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদ্ ইহার সমর্থক। ইহা গাণিতিক (Mathematical) ও ফলপ্রসূ গবেষণা (Operational Research or O R.)-এর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিভিন্ন ধরনের 'মডেল' Model) প্রস্তুত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী। যেমন, শীতযন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের মডেল প্রস্তুত করিতে হইলে F= ভবিষ্যৎ বিক্রয়, f=কোএফিসিয়েণ্ট বা কার্যভিত্তিক সম্পর্ক, ps = অতীত বিক্রয়, t = শীতের তীব্রতা এবং a = বিজ্ঞাপন ধরিতে হইবে। সুতরাং (Model) $Fs=f(ps, t, a)$.

এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য হইতেছে যে, গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এবং কম্পিউটার ও ফলপ্রসূ গবেষণার (Computer and Operational Research) সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব। ফলপ্রসূ গবেষণা গাণিতিক হাতিয়ার এবং অনুকরণ (Simulation) প্রক্রিয়া এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ অবদান। এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কারণ শুধু গণিত নহে, ব্যবস্থাপকের বিচারবুদ্ধিও উত্তম ব্যবস্থাপনায় অপরিহার্য বিষয়। গাণিতিক প্রক্রিয়া শুধু সমস্যা বিশ্লেষণের কৌশল বা হাতিয়ার।

(৫) **আকস্মিকতা দৃষ্টিভঙ্গি (Contingency Approach)** : এই চিন্তাধারার সমর্থক হইলেন জোয়ান উডওয়ার্ড, ফিডলার, লচ, লরেন্স ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদগণ। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা হইতেছে সাময়িক অবস্থাগত বিষয়। ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তনশীল অবস্থার (Situation) সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে হইবে।

(৬) **অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও হিসাবরক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি (Economic Analysis and Accounting Approach)** : এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম ফল পাইতে হইলে ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সম্পদের উপযুক্ত নিয়োগ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি স্থির করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ করা, ব্যয়ের মান স্থির করা, বাজেট তৈয়ারী করা, ব্যয়ের অনুপাত বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অতীত পরিসংখ্যানভিত্তিক এবং ব্যবস্থাপনা কার্যের সীমিত হাতিয়ার। পরিবর্তিত পটভূমিকায় ইহাদের প্রয়োগ করা যায় না।

ব্যবস্থাপনা কি বিজ্ঞান ? (Is Management a Science ?)

ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান না কলা, এই বিষয়ে পূর্বেও মতবিরোধ ছিল, বর্তমানেও আছে। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান কিনা তাহা যাচাই করিতে হইলে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা দরকার। বিজ্ঞান হইল পদ্ধতিগত জ্ঞান-ভাণ্ডার। পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়িয়া ওঠে। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থা ও তথ্যকে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষন করা এবং নীতি নির্ধারণ করা বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি। যখন কোন তথ্য এবং নীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইয়া বৃহত্তর সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা জ্ঞান-ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়।

ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান। কারণ ইহাতে একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে। ব্যবস্থাপনার নীতি আছে, তত্ত্ব আছে। এই নীতি ও তত্ত্ব সর্বজনগ্রাহ্য। কারণ ইহার দ্বারা কোন কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করা যায়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান বা গণিতশাস্ত্রের মত এত সঠিক (Accurate) নহে। ইহা একটি **সমাজবিজ্ঞান** ইহার নীতিগুলি কর্মচারিগণের আচরণ (Behaviour) এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Situation) উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আচরণ ও অবস্থা পরিবর্তনশীল, সেই কারণে ব্যবস্থাপনার নীতি পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হইতে পারে। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান শাখার নবতম সংযোজন। তবে সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে সম্ভবত ইহা সকল সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা প্রাপ্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া সমাজের চাহিদা অধিক পরিমাণে কিভাবে মেটান যায় তাহার পথনির্দেশ করে।

ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহার নীতি প্রয়োগ করেন। তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। বর্তমানে 'ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার অর্থ হইতেছে যে, ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ভাণ্ডার আছে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার ও ফলপ্রসূ গবেষণার (Operational Research) সাহায্যে কারবারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ব্যবস্থাপনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া একটি কার্য সম্পাদন করা যায় ঠিক সেই পদ্ধতির পশ্চাৎ অনুবর্তনে আবার কাজের প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। সুতরাং এইদিক হইতে দেখিলেও ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান।

ব্যবস্থাপনা কি কলা? (Is Management an Art ?)

এমন ব্যবস্থাপক খুব কমই দেখা যাইবে যিনি অস্বীকার করিবেন যে, তাঁহার কার্যে কলাবিদ্যার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-ভাণ্ডার যাহা বিজ্ঞান সৃষ্টি করে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগকে কলা বলে। কলা বলিতে বুঝায় কোন অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে দক্ষতা ও জ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রয়োগকে। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু কলা ব্যবহারিক জ্ঞান। বিজ্ঞান হইতেছে কোন কিছু জানা এবং কলা হইতেছে কোন কিছু করা।

ব্যবস্থাপনা একটি কলা, কারণ ইহা নীতি ও তত্ত্বের প্রয়োগ করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে পূরণ করিবার জন্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ও জ্ঞানকে পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করে। কলার আবশ্যকীয় বিষয় হইল: (ক) ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা এবং (খ) কর্মদক্ষতা। সৃজনশীল ক্ষমতা গড়িয়া ওঠে সমস্যা, ঘটনা ও সম্ভাবনা অনুমান করিবার দূরদর্শিতার উপর এবং কর্মদক্ষতা গড়িয়া ওঠে অভিজ্ঞতা ও ঘটনা পর্যবেক্ষণের দ্বারা। ব্যবস্থাপনা হইল সৃজনশীল কলা। ইহাকে কলার কলা (Art of Arts) বলা যায়, কারণ ইহা মানুষের প্রতিভাকে সংগঠন ও ব্যবহার করে।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপনা একদিকে বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে কলা। ব্যবস্থাপনা একটি পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত যথার্থভাবে তুলনা করা যায়। একজন উত্তম চিকিৎসক হইতে হইলে তাঁহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞান উভয়ই থাকিতে হইবে। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকিলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক হওয়া যায় না। তেমনি যে চিকিৎসকের প্রচুর ব্যবহারিক জ্ঞান আছে অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞান নাই, সেই চিকিৎসককে 'হাতুড়ে ডাক্তার' (Quack or Witch Doctor) বলা হয়। তিনি উত্তম চিকিৎসক নহেন। অনুরূপভাবে একজন উত্তম ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা বৈজ্ঞানিক নীতি ও তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি উহার প্রয়োগ-কৌশলের কলাজ্ঞান থাকাও আবশ্যিক। সুতরাং ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান ও কলার সংমিশ্রণ বলা যায়।

ব্যবস্থাপনা কি একটি পেশা ? (Is Management a Profession ?)

পেশার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। অর্থের বিনিময়ে বাক্তি ও সেবা প্রদানকে পেশা বলে। পেশা কল্যাণমূলক ও বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের মাধ্যমে কাজের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। পেশা স্বাধীনভাবে করা যায় অথবা কাহারও অধীনে কর্মরত থাকিয়া বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও সেবা পরিবেশনের মাধ্যমেও করা যায়।

বিশেষ শিক্ষা, কুশলতা, প্রশিক্ষণ, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা পেশা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করে। পেশা বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। পেশার নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** থাকে :

(১) সংগঠিত ও পদ্ধতিগত জ্ঞান,
(২) প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের নিয়মমাফিক পদ্ধতি,
(৩) বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পেশাগত শিক্ষাপ্রদান,
(৪) সদস্যগণের আচরণবিধি প্রস্তুত করা ;
(৫) সমাজকল্যাণমূলক সেবাপ্রদান।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাপনার নির্দিষ্ট নীতি, কার্যকলাপ ও পদ্ধতি আছে। ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যেমন, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্ট (কলিকাতা, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর ইত্যাদি)।

ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে পেশায় পরিণত হইতেছে। আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ব্যবস্থাপনা একটি পেশা। কারণ—

(ক) ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার হস্তান্তরযোগ্য। ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ প্রয়োগযোগ্য।

(খ) ব্যবস্থাপনা একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

(গ) ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট দক্ষতা ও হাতিয়ার আছে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট আচরণবিধি ও দর্শন আছে।

(ঙ) ইহা একটি শাস্ত্র।

ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (Managerial Skill) :

ব্যবস্থাপনা একটি কলা। ইহা লব্ধ জ্ঞানকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার ব্যবহার বা প্রয়োগের মাধ্যমে অভীষ্ট পূরণে সাহায্য করে। ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। কলিয়ার-এর মতে, ব্যবস্থাপকের **সাংগঠনিক দক্ষতা** থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণের মতে, ব্যবস্থাপকগণের **সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতা** থাকা প্রয়োজন। **রবার্ট এল. কাট্‌জ** ব্যবস্থাপকের তিন প্রকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, **কারিগরি দক্ষতা**, **মানবিক দক্ষতা** ও **ধারণামূলক দক্ষতা**। **হারল্ড কুঞ্জ** এবং **ও' ডোনেল** ইহার সহিত **সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতার** বিষয়ও যোগ করিয়াছেন। এই চারটি দক্ষতার আলোচনা করা হইল :

(১) **কারিগরি দক্ষতা (Technical Skill) :** দক্ষতার সহিত প্রাপ্ত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার ক্ষমতাকে কারিগরি দক্ষতা বলে। কোন বিশেষ ধরনের কাজ বুঝিবার ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবার জ্ঞান থাকা প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন।

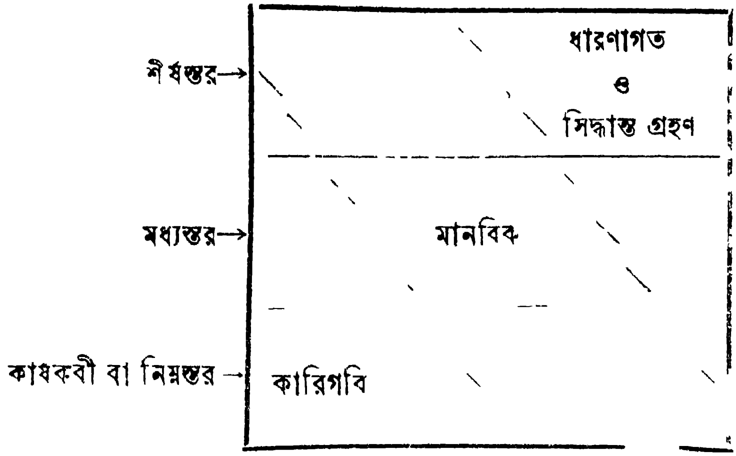
(২) **মানবিক দক্ষতা (Human Skill) :** কর্মচারিগণকে অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করাইয়া লইবার ক্ষমতাকে মানবিক দক্ষতা বলে। ব্যবস্থাপককে প্রত্যেক কর্মচারীকে একক ও দলীয়ভাবে বুঝিতে হইবে এবং তাহাকে দিয়া কর্মসম্পাদন করাইয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে।

(৩) **ধারণামূলক দক্ষতা (Conceptual Skill) :** প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানের সংযোজনার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনাকে পদ্ধতিগত (systematic) দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিবার ক্ষমতা থাকা ব্যবস্থাপকের অন্যতম দক্ষতা।

(৪) **সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতা (Decision-making Skill) :** প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে একদিকে সমস্যা-নির্ধারণকারী এবং অন্যদিকে সমস্যা-সমাধানকারী হিসাবে দক্ষ হইতে হইবে।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দক্ষতাগুলি কোন ব্যবস্থাপক অর্জন করিতে পারেন এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে।

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন দক্ষতার ব্যবহার দেখান হইল :



শিল্প-সংস্থার সামগ্রিক কাজ (Activities of an Industrial Unit) :

হেনরি ফেওল তাঁহার জেনারেল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট (General and Industrial Management) গ্রন্থে শিল্প সংস্থার সামগ্রিক কাজকে ছয়টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এই কাজগুলি হইল :

(১) **কারিগরি** (Technical) অর্থাৎ উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যকলাপ,

(২) **বাণিজ্যিক** (Commercial) অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সংক্রান্ত কার্যকলাপ,

(৩) **আর্থিক** (Financial) অর্থাৎ মূলধন-সংক্রান্ত কার্যকলাপ,

(৪) **নিরাপত্তা** (Security) অর্থাৎ সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ,

(৫) **হিসাব-নিকাশ** (Accounting) অর্থাৎ হিসাব-সংক্রান্ত কার্যকলাপ,

(৬) **ব্যবস্থাপনা** (Managerial) অর্থাৎ পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশ, সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ।

ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ (Principles of Management) :

ব্যবস্থাপনার মূল সূত্রগুলিকে ব্যবস্থাপনার নীতি বলে। **হ্যারল্ড কুঞ্জ** এবং **ও' ডোনেলের** মতে, ব্যবস্থাপনায় চারটি কারণে নীতির প্রয়োজন হয়—

(ক) দক্ষতা বৃদ্ধি,

(খ) নির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু কাঠামো গঠন,

(গ) সম্পদের সদ্ব্যবহার,

(ঘ) গবেষণার উন্নয়ন।

আবার হথর্ন গবেষণার কর্ণধার হার্ভার্ড অধ্যাপক রোয়েথলিস বার্জার নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান। সুতরাং ইহা নীতিভিত্তিক। এফ. ডব্লিউ. টেলর ও হেনরি ফেওলের মতে, নীতির সাহায্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়িয়া ওঠে। হেনরি ফেওলকে ব্যবস্থাপনা নীতির পথপ্রদর্শক হিসাবে গণ্য করা হয়। হেনরি ফেওল ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হন এবং ঐ বৎসরেই ফ্রান্সের একটি কয়লা খনি কোম্পানীতে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি উহার কার্যনির্বাহী পরিচালক হন তখন কোম্পানীটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম। সুদীর্ঘকাল কাজ করিবার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন কোম্পানীটি ইউরোপের একটি অন্যতম বৃহৎ কোম্পানীতে পরিণত হয়। ব্যবস্থাপনায় হেনরি ফেওল এর অসাধারণ দক্ষতার ফলেই উহা সম্ভব হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি ফেওল ফরাসী ভাষায় তাঁহার লিখিত জেনারেল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট (General and Industrial Management) গ্রন্থে ১৪টি নীতির কথা বলেন। এল. এফ. আরউইক এই নীতিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেন, এবং ইহার পরেই সারা বিশ্বে নীতিগুলি সার্বজনিক স্বীকৃতি পায়। ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হইল:

(১) কার্যবিভাজন (**Division of Work**): ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে বিশেষায়ণ আনিবার জন্য কারবারি সংস্থার কার্যাবলীকে বিশ্লেষণ ও শ্রেণীভুক্ত করিয়া কর্মবিভাগ করিতে হইবে। ইহাতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বিশেষজ্ঞ কর্মী গড়িয়া ওঠে।

(২) কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব (**Authority and Responsibility**): কর্তৃত্ব হইতেছে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সমষ্টি। কর্তৃত্বের দ্বারা কোন ব্যবস্থাপক আদেশ প্রদানের, অধস্তন কর্মীকে কাজে বাধ্য করিবার এবং নিজে কাজ করিবার অধিকার লাভ করেন। অপরকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতাকে কর্তৃত্ব বলে। ভারার্পণের দ্বারা কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়। দায়িত্ব কর্তৃত্বের অনুসিদ্ধান্ত। সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের দায়কে দায়িত্ব বলে। যিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন এবং যাঁহার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় উভয়েই নির্ধারিত কাজের জন্য দায়ী হন। ব্যবস্থাপনার নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্মসম্পাদন করিবার দায়িত্ব বর্তায়। কর্তৃত্ব হইতে দায়িত্বের জন্ম হয়। 'কর্তৃত্ব ব্যতীত দায়িত্ব' অর্থহীন। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত। ইহাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমানুপাতিক (Commensurate) হইবে।

(৩) নিয়মানুবর্তিতা (**Discipline**): নিয়মানুবর্তিতার অর্থ হইল চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন—ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের আদেশ পালন করা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। নিয়মানুবর্তিতা আনিবার তিনটি আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে ফেওলের অভিমত হইল:

(ক) ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ করা;

(খ) ব্যবস্থাপকগণকে তাঁহাদের উক্তি ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করা ;

(গ) ভাল কাজের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার এবং অন্যায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত বা ন্যায্য শাস্তির বিধান।

(৪) আদেশের একতা (**Unity of Command**) : একজন অধস্তন কর্মচারী শুধুমাত্র একজন উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করিবেন (One man, one boss)। ফেওলের মতে, একজন কর্মচারীকে যদি একাধিক ব্যবস্থাপক আদেশ দিতে থাকেন তবে জঙ্গলের দানবের (Monster) মত তাহার অস্তিত্ব বিলীন হইতে পারে। আদেশদানের একতা না থাকিলে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার হয়, শৃঙ্খলা থাকে না এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়। আদেশের একতা থাকিলে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব পরিহার করা যায়।

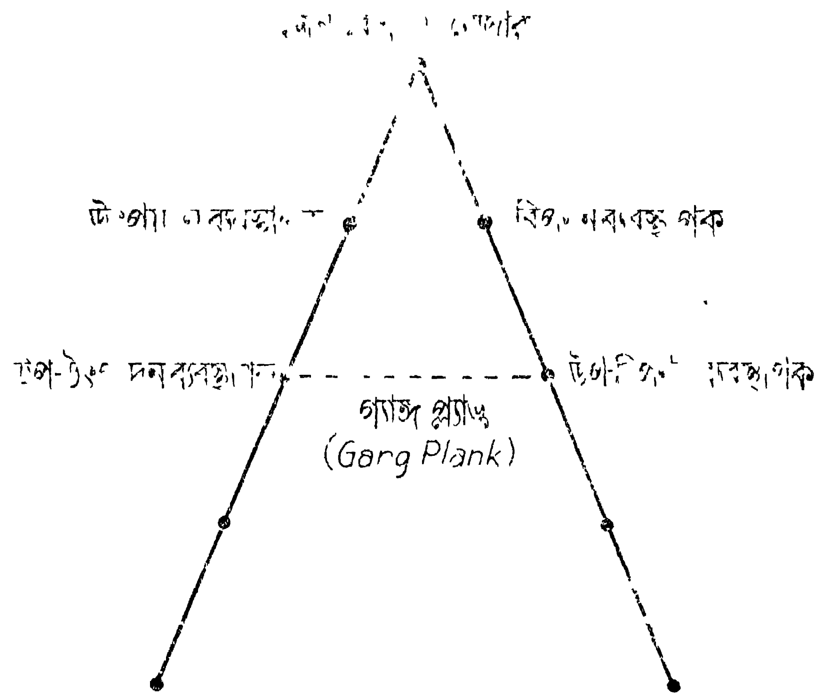
(৫) নির্দেশের একতা (**Unity of Direction**) : একই উদ্দেশ্যের একশ্রেণীভুক্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা থাকা উচিত ; অন্যথায় দুটি মাথা থাকিলে মনুষ্যকুলে বা জন্তুকুলে যেমন তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তেমনি নির্দেশের একতার অভাবে সংগঠনের অবসায়ন হইতে পারে। একজন কর্মী একসঙ্গে একটি পরিকল্পনায় নিযুক্ত থাকিবেন (One man, one plan) এবং একজন কর্মচারীর একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী থাকিবেন।

(৬) ব্যক্তিগত স্বার্থ সার্বজনীন স্বার্থের অধীনে থাকিবে (**Subordination of individual interest to general interest**) : ব্যষ্টি বা দলগত স্বার্থ সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা বড়। ব্যক্তিস্বার্থ কখনই সমষ্টিস্বার্থের উর্ধ্বে থাকিবে না। সার্বজনীন ও ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয় করিতে হইবে। ইহার ফলে দলীয় সহযোগিতা ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

(৭) পারিশ্রমিক (**Remuneration**) : কর্মচারিগণের পারিশ্রমিক ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত। প্রত্যেক কর্মচারীর প্রতি ন্যায় ও সমভাব নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে মালিক ও কর্মচারী উভয়েই সন্তুষ্ট হইতে পারে।

(৮) কেন্দ্রীকরণ (**Centralisation**) : হেনরি ফেওলের মতে, "যাহা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে, তাহাই কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ এবং যাহা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত করে, তাহাই কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ।" কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা দুইটি সাংগঠনিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত বা বিকেন্দ্রীভূত হইতে পারে না। যদি কর্তৃত্বের ভারার্পণের মাত্রা কর্তৃত্ব সংরক্ষণের মাত্রা অপেক্ষা বেশী হয় তবে উহা বিকেন্দ্রীকরণ ঘটায়, কিন্তু যখন কর্তৃত্ব সংরক্ষণের মাত্রা কর্তৃত্বের ভারার্পণের মাত্রা অপেক্ষা বেশী হয়, তখন কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ দেখা যায়। কর্তৃত্বের চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ বা চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

(৯) স্তরানুক্রমিক কর্তৃত্বের শৃঙ্খল বা ক্রমপর্যায় মাপনি শৃঙ্খল (Scalar Chain) : ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হইতে নিম্ন বা পরিদর্শনের স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্বের শৃঙ্খল বজায় রাখিতে হইবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালন করিতে হইবে। শৃঙ্খলের দ্বারা উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্তৃত্বের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। এই সম্পর্কে ফেওল "গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক" (Gang Plank) বা 'মধ্যবর্তী সাঁকো' ধারণার অবতারণা করিয়াছেন। ইহার মাধ্যমে সমস্তরের কর্মাধ্যক্ষগণ দ্রুত যোগাযোগের জন্য সরাসরি নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য পরে তাঁহারা নিজ নিজ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপককে যোগাযোগ বা জ্ঞাতকরণের বিষয় অবগত করাইবেন। নিম্নের রেখাচিত্রে 'গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক' দেখান হইল :



(১০) শৃঙ্খলা (Order) : বস্তু ও ব্যক্তির যথাযথ সমাবেশ এই সূত্রে সূচিত হয়। এই নীতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি বস্তু সঠিক স্থানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে (Right thing in the right place and right man in the right job)।

(১১) সমদর্শিতা (Equity) : ন্যায়পরায়ণতা ও সহৃদয়তা ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি। ব্যবস্থাপককে কর্মচারীদের প্রতি সমদর্শিতা প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাতে কর্মচারীদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্মসম্পাদনে দলীয় মনোভাব গড়িয়া উঠিবে।

(১২) কর্মীদের কার্যকালের স্থায়িত্ব (Stability of tenure of personnel) : কর্মচারীর ঘন ঘন পরিবর্তনে ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্বের অভাব ঘটে।

ইহাতে প্রতিষ্ঠানের কাজের মান বা উৎকর্ষ হ্রাস পায় এবং নিয়োগ ব্যয় ও প্রশিক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তাহাছাড়া নূতন কর্মচারীদের কাজে ভুলভ্রান্তি অধিক হয়। সুতরাং অনবরত কর্মী রদবদল রোধ করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার নীতি হইল শ্রমিক আবর্তনের হার হ্রাস করা।

শ্রমিক আবর্তন (Labour Turnover)

$$= \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা কর্মীর সংখ্যা (R)}}{\text{ঐ সময়ে বেতন খাতায় (Pay Roll) কর্মীর গড় সংখ্যা (W)}} \times ১০০$$

$$= \frac{R}{W} \times ১০০$$

শ্রমিক আবর্তন যত কম হইবে ব্যবস্থাপনার পক্ষে ততই মঙ্গলকর।

(১৩) **উদ্যম (Initiative) :** পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার চিন্তাশক্তি ও উহা কার্যকরী করিবার জন্য কর্মীদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ব্যবস্থাপনার নীতি। উদ্যম কর্মপ্রচেষ্টায় কর্ম-উদ্দীপনা (zeal) সৃষ্টি করে।

(১৪) **স্ব-দলীয় আনুগত্য (Espirit de Corps)**, ব্যবস্থাপনাকে দলীয় উদ্যোগ ও সচেতনতার মাধ্যমে কর্মচারীদের মনে একতার মনোভাব (Sense of bolonging) গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নীতিতে বলা হইয়াছে যে, "একতাই বল" (Union is strength)। এই নীতিতে বলা হয় যে, প্রত্যেক কর্মচারীকে অনুভব করিতে হইবে যে, তাহারা একই পরিবারভুক্ত।

উপসংহার (Conclusion) : হেনরি ফেওল তাঁহার পাঠকদের বারংবার সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপনার নীতি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না। ব্যবস্থাপনা একটি সমাজবিজ্ঞান। সুতরাং সামাজিক বিবর্তনে ও দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে এই নীতিগুলিকে পরিমার্জিত করিয়া অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (Functions of Management) :

হ্যারল্ড কুঞ্জ এবং **ও' ডোনেলের** মতে, ব্যবস্থাপনা হইল কর্মচারিগণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন করাইয়া লইবার কৌশলগত পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে দুইভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে। যেমন—(ক) **প্রশাসনিক কার্যাবলী :** পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ধারণা ও চিন্তামূলক (Thinking) কার্যকলাপের সমষ্টি।

(খ) **সম্পাদনের কার্যাবলী :** আদেশদান, নিদেশদান, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যকলাপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি বাস্তবে ক্রিয়াগত (Doing) কার্যাবলী।

হেনরি ফেওল-এর মতে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল : (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) আদেশদান (৪) সংযোজনা ও (৫) নিয়ন্ত্রণ।

লিনডাল আরউইক-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) আদেশদান (৪) সংযোজনা (৫) যোগাযোগ (৬) পূর্বাভাস ও (৭) অনুসন্ধান।

লুথার গ্যালিক-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) কর্মী নির্বাচন (৪) নির্দেশদান (৫) সংযোজনা (৬) প্রতিবেদন বা বর্ণনা ও (৭) বাজেট প্রস্তুতকরণ।

আরনেস্ট ডেল-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) কর্মী নির্বাচন (৪) নির্দেশদান (৫) নিয়ন্ত্রণ (৬) উদ্ভাবন ও (৭) প্রতিনিধিত্ব।

ডব্লু. টি. গ্রীণউড-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সিদ্ধান্তগ্রহণ (৩) সংগঠন (৪) কর্মী নির্বাচন (৫) নির্দেশদান ও নেতৃত্ব-প্রদান এবং (৬) নিয়ন্ত্রণ।

জোসেফ এল ম্যাসি-র মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) সিদ্ধান্তগ্রহণ (২) সংগঠন (৩) কর্মী নির্বাচন (৪) পরিকল্পনা (৫) নিয়ন্ত্রণ (৬) যোগাযোগ ও (৭) নির্দেশদান।

নিউম্যান, সামার এবং ওয়ারেন-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) নেতৃত্বদান ও (৪) নিয়ন্ত্রণ।

ই. এফ. এল ব্রেক-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) অনুপ্রাণিতকরণ (৩) সংযোজনা ও (৪) নিয়ন্ত্রণ।

হ্যারল্ড কুঞ্জ এবং ও' ডোনেল-এর মতে, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল: (১) পরিকল্পনা (২) সংগঠন (৩) কর্মী নির্বাচন (৪) নির্দেশদান ও নেতৃত্বপ্রদান এবং (৫) নিয়ন্ত্রণ।

লুথার গ্যালিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে **'পড্‌সকর্ব'** (PODSCORB) বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা হইল:

P(Planning) = পরিকল্পনা, O(Organisation) = সংগঠন, D(Direction) = নির্দেশদান, S(Staffing) = কর্মী নির্বাচন, Co(Co-ordination) = সংযোজনা, R(Reporting) = বর্ণনা এবং B(Budgeting) = বাজেট প্রণয়ন।

নিম্নে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী আলোচনা করা হইল:

(১) পরিকল্পনা (Planning):

হেনরি ফেওল-এর মতে পরিকল্পনা হইল 'ভবিষ্যৎকে খাঁচায় ধরিয়া রাখিবার পদ্ধতি' (Trapping the future is planning)। কোন কাজ করিবার পূর্বে ঐ কাজের পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ চিন্তাকে পরিকল্পনা বলে। কাজটি কি, কে করিবে, কোথায় করা হইবে, কিভাবে করা হইবে, কখন করা হইবে—এই বিষয়গুলি স্থির করা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে, কিভাবে ঘটিতে পারে

এবং ঘটিলে তাহার সমাধান কি হইবে, পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহা স্থির করা হয়। পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কার্যসূচী প্রণয়ন করে। এই কার্যক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়:

(ক) পরিমাণগতভাবে উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ (Objectives),

(খ) নীতি নির্ধারণ (Policy),

(গ) কর্ম প্রণালী (Procedure),

(ঘ) কর্মসূচী (Programme),

(ঙ) কলাকৌশল (Strategy),

(চ) সময় নির্দেশ (Scheduling),

(ছ) বাজেট প্রস্তুত (Budgeting),

(জ) পূর্বাভাস (Forecasting)।

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার অগ্রগামী কার্য। ইহা সম্মুখে বা ভবিষ্যতের দিকে তাকায় (It looks ahead)।

(২) সংগঠন (**Organisation**): সংগঠন ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য ইহা কর্মিগণের মিলিত প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে। হেনরি ফেওলের মতে, কারবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন, কাঁচামাল, মূলধন, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিক সরবরাহ করা সংগঠনের কাজ। প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় ও ব্যক্তির অবদান, সহযোগিতা ও কার্যাবলীর মধ্যে বিন্যাস সাধন ও সমন্বয়করণের কাজকে সংগঠন বলে। কারবারের প্রত্যেক স্তরে সংগঠনের কাজ সম্পাদন করিতে হয়। সংগঠন সুষ্ঠু কারবারী পরিবেশ সৃষ্টি করে। সংগঠনের তিনটি ধাপ বা পর্যায় হইল: (ক) বিভাগীয়করণ (খ) কর্তৃত্বের ভারার্পণ এবং (গ) সংযোজনা।

পিটার ড্রাকার সংগঠনের কাঠামো নির্ধারণে (ক) কর্ম বিশ্লেষণ (খ) সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ এবং (গ) সম্পর্ক বিশ্লেষণ—এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। সংগঠন নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক বা নিয়ম-বহির্ভূত হইতে পারে। আবার সংগঠন বৈখিক, কর্মী ও কার্যভিত্তিক হইতে পারে।

(৩) **কর্মী নির্বাচন (Staffing)**: যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা (Right man in the right job) ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। ইহার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন, লিখিত পরীক্ষা, বুদ্ধির পরীক্ষা, অভিজ্ঞতার পরীক্ষা, নির্দিষ্ট কর্মে দক্ষতার পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন ও নিযুক্ত করিতে হইবে। ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মী-প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত স্থানে কর্মী-উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৪) **নির্দেশদান ও আদেশদান (Direction and Command)**: কারবারের

পরিচালনা করাকে নির্দেশদান বলে। বিভিন্ন আদেশের দ্বারা ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের নির্দেশ দেন। ব্যবস্থাপনা কার্যকরী হয় নির্দেশদানের মাধ্যমে (Management in action starts with direction)। সাধারণভাবে নির্দেশদানের অর্থ হইল আদেশ-দান ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত শিক্ষা জ্ঞাপন করা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নির্দেশদান হইতেছে প্রাণবন্ত নেতৃত্বের দ্বারা অধীনস্ত কর্মীদের শিক্ষা দান ও পথপ্রদর্শন করা। মার্শাল ই. ডিমক বলিয়াছেন, "নির্দেশ দান হইতেছে কর্মপ্রণালী স্থির করা এবং প্রাণবন্ত নেতৃত্বের দ্বারা আদেশ ও শিক্ষাদান করা"। নির্দেশদান কাজের গতিকে অব্যাহত রাখে এবং কর্মীদের সঠিক পথে চালনা করে। ইহার ফলে কর্মীরা দ্বিধা ও সংকোচমুক্ত হইয়া কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়।

(৫) **অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation) :** কর্মীদের মধ্যে কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার নাম অনুপ্রাণিতকরণ। প্রাণবন্ত ও গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন। কর্মীদের সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতি ব্যবস্থাপনাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে। আমেরিকান ব্যবস্থাপনাবিদ্ এ. এইচ. মাসলোর মতে, কর্মীদের পাঁচ প্রকার অভাব বা প্রয়োজন (needs) আছে—(ক) দৈহিক প্রয়োজন (Physiological needs), (খ) নিরাপত্তার প্রয়োজন (Security or Safety needs), (গ) সামাজিক প্রয়োজন (Social needs), (ঘ) স্বীকৃতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রয়োজন (Egoistic needs) (ঙ) আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন (Self-actualisation needs). ব্যবস্থাপনাকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদানের মাধ্যমে এই সকল প্রয়োজন মিটাইয়া কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করিতে হয়। ইহা ছাড়া দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, "গাজর ও যষ্টি" (Corrot and Stick) বা পুরস্কার ও শাস্তি দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি, কর্ম-সন্তুষ্টি (Job Satisfaction), কর্ম পরিবর্ধন (Job Enlargement), কাজের বিষয়বস্তুর উন্নয়ন বা কর্মসমৃদ্ধিকরণ (Job Enrichment), চেতনাভিত্তিক প্রশিক্ষণ (Sensitivity Training) ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের কর্মে অনুপ্রাণিত করা যায়।

(৬) **সংযোজনা (Co-ordination) :** কর্মীদের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার জন্য সহযোগিতা ও সমন্বয় উভয়ই প্রয়োজন। বিভাগীয়, উপবিভাগীয় ও কর্মিগণের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি স্থাপন করিয়া সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অখণ্ডতা রক্ষা করাকে সংযোজনা বলে। কর্ম ও কর্মীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কাজের ছন্দ ও তাল বজায় রাখা সংযোজনার উদ্দেশ্য। ইহা ব্যবস্থাপনার হৃৎপিণ্ড (Heart)। কর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মীদের যৌথভাবে কর্মসম্পাদনের সময়, গতি, পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষের উপর নজর দেওয়া হয়। সত্বর আরম্ভ, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, চিরস্তনতা বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদান সংযোজনার নীতি।

প্রতিষ্ঠানগত কার্যাবলী সুসম্পাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি ও ভ্রান্তি দেখা যায় এবং ইহার ফলে পরিকল্পনা বানচাল হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় কর্মপ্রবাহের ধারা নির্ণয় করিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পূর্বাহ্ণেই উপযুক্ত প্রতিষেধমূলক (Preventive) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

নিয়ন্ত্রণের তিনটি ধাপ বা পর্যায় আছে—

(ক) প্রত্যাশিত কর্মের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা,

(খ) সম্পাদিত কাজের পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা,

(গ) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নিয়ন্ত্রণের অর্থ কর্মচারীকে ধাওয়া করা নহে (Control does not mean chasing an employee), কর্মচারীকে অনুসরণ ও সংশোধন করা। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠনের স্বার্থকে কর্মচারীদের স্বার্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ (Goal Congruence) করিতে হইবে।

লিখিত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত পরিদর্শন, পরিসংখ্যান, হিসাব পরীক্ষা, আয়-ব্যয়ের পূর্বানুমান বা বাজেটিং ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনার শেষ পর্যায়ের কাজ বলা হয়।

(৮) **নবীকরণ (Innovation) :** কারবার সংগঠনের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সংগঠনের কর্মপন্থা যথাযথভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়া আধুনিক যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ও উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই নবীকরণের মূল বক্তব্য।

(৯) **প্রতিনিধিত্বকরণ ও উপস্থাপন (Representation and Reporting) :** কারবার একটি সামাজিক পদ্ধতি। বিভিন্ন পক্ষ ইহার সহিত জড়িত। ব্যবস্থাপকগণ কারবারকে বিভিন্ন পক্ষের নিকট তুলিয়া ধরিবেন। কারবারের নীতি, কর্মপন্থা, কর্ম-পদ্ধতি, কর্মসূচী ইত্যাদি সরকার, পাওনাদার, আর্থিক সংস্থাসমূহ ও জনগণের নিকট তুলিয়া ধরা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। ইহাতে বিভিন্ন পক্ষের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করা যায়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের (Report) মাধ্যমে যেমন, লাভ ক্ষতির হিসাব, উদ্বর্তপত্র, নিরীক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ব্যবস্থাপনা কারবারকে বিভিন্ন পক্ষের নিকট তুলিয়া ধরে।

(১০) **আয়-ব্যয়ের পূর্বানুমান (Budgeting) :** কারবারের ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয়ের হিসাবের পূর্বানুমান করাও বর্তমানে ব্যবস্থাপনার কার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

উপসংহার (Conclusion) : ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী কারবারের নীতি নির্ধারণে অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজ পরস্পর সম্পৃক্ত ও অবিচ্ছিন্ন। সকল কার্যকলাপের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়ায় (Process) পরিণত হয় এবং অভীষ্ট ফল লাভে সফল হয়।

ব্যবস্থাপনার স্তর (Levels of Management) :

ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা যায়। স্তরগুলির ক্রমানুগ ধারাকে **ব্যবস্থাপনার যাজকতন্ত্র** বা **ক্রমস্তর** (Management Hierarchy) বলে।

ই. এফ. এল. ব্রেক ব্যবস্থাপনাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন :

(১) উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা (Top Management) :

এই স্তরে পরিচালকমণ্ডলী, সভাপতি, কার্যনির্বাহী পরিচালক, কর্মাধ্যক্ষ, উপ-কর্মাধ্যক্ষ থাকেন। ইহাদের **কার্যাবলী** হইল :

(ক) কারবারের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করা,

(খ) নির্দেশ প্রদান করা ;

(গ) আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক শক্তির সহিত মোকাবিলা করা,

(ঘ) পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা,

(ঙ) সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রদান করা ;

(চ) সংগঠনের গতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য সংগঠনকে একটি সার্বিক পদ্ধতি (Total System) হিসাবে স্থাপন করা,

(ছ) সম্পদ পরিকল্পনা করা,

(জ) বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করা,

(ঝ) কারবারের অনিশ্চয়তা দূর করা,

(ঞ) বাজেট বা আয়-ব্যয়ের পূর্বানুমান অনুমোদন করা,

(ট) বিভাগীয় কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা

এই সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণকে ধারণামূলক দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, মানবিক দক্ষতা ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিতে হয়।

(২) মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনা (Middle Management) :

বিভাগীয় এবং উপ-বিভাগীয় প্রধানগণ ও তত্ত্বাবধায়কগণ (Superintendents) মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনায় থাকেন। ইহারা অধস্তন কর্মাধ্যক্ষ। এই স্তরের **কার্যাবলী** হইল :

(ক) মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মরত অবেক্ষকগণকে (Supervisors) কাজের নির্দেশ দেওয়া ও তাহাদের পরিচালনা করা,

(খ) উর্ধ্বতন স্তর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন করা,

(গ) বিভাগীয় কাজের তদারক করা ;

(ঘ) বিভাগীয় কাজ ও ব্যক্তির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা ;

(ঙ) সমস্যা সমাধানের কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করা ;

(চ) বিভাগীয় কার্যকলাপের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ও উহা উচ্চতর ব্যবস্থাপকগণের নিকট পেশ করা ;

(ছ) বিভাগীয় পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা ;

(জ) নিয়োগ এবং অনুপ্রাণিতকরণের কাজ করা ;

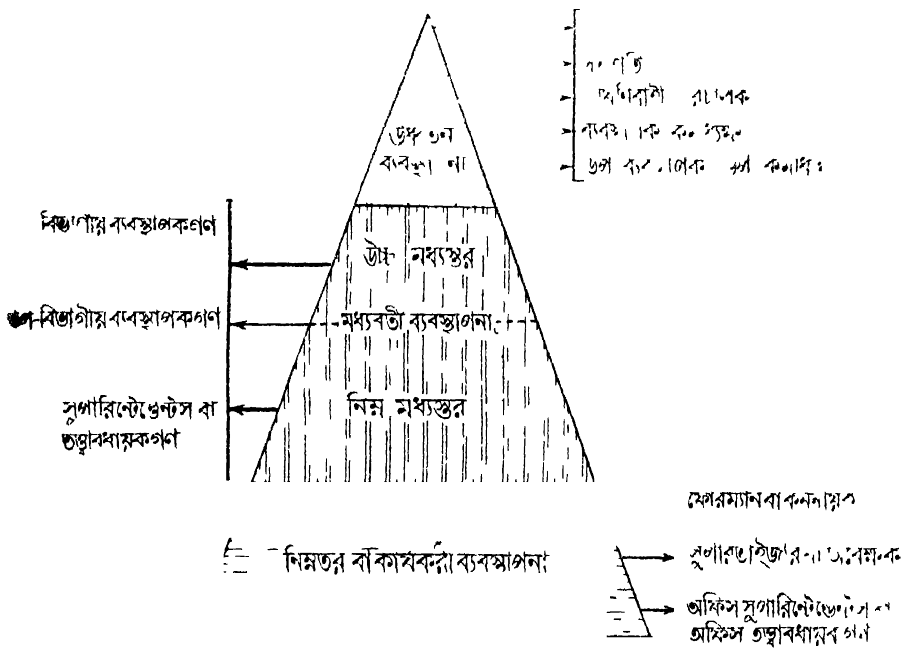
(ঝ) উপকরণ ও উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করা।

এই স্তরের ব্যবস্থাপকগণের মানবিক ও কারিগরি দক্ষতা অধিক থাকা প্রয়োজন। অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ্ মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপনাকে উচ্চমধ্যস্তর ও নিম্নমধ্যস্তর—এই দুইভাগে আলোচনা করেন। উচ্চমধ্যস্তরে থাকেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ এবং নিম্নমধ্যস্তরে থাকেন উপ-বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ ও তত্ত্বাবধায়কগণ।

(৩) নিম্নতর অথবা কার্যকরী ব্যবস্থাপনা (Lower or Operating Management) ঃ

ফোরম্যান বা কর্মনায়ক, সুপারভাইজার বা অবেক্ষকগণ এবং অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বা অফিস তত্ত্বাবধায়কগণ নিম্নতর ব্যবস্থাপনা গঠন করেন। ইহারা কার্যকরী ব্যবস্থাপনায় জড়িত। ইহাদের প্রথম স্তর বা প্রথম-রেখা ব্যবস্থাপক (First-line Managers) বলে। নিম্নস্তর ব্যবস্থাপনা স্তরের কার্যাবলী হইল :

ব্যবস্থাপনার পিরামিড



(ক) কর্মীদের (Rank and File) সহিত উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণের যোগাযোগ (Link) রক্ষা করা ;

(খ) কর্মীদের কাজের তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ দেওয়া এবং কর্মপদ্ধতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা ,

(গ) কর্মীরা তাহাদের মতামত, অভিভাব (Suggestion), অভাব-অভিযোগ, কাজের সুবিধা ও অসুবিধা ইত্যাদি ইঁহাদের নিকট প্রথমে পেশ করে এবং ইঁহারা উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার নিকট উহা প্রতিবেদনের আকারে পেশ করেন ,

(ঘ) ইঁহারা বিভিন্ন কর্মচারীর কর্মসমন্বয় করেন ,

(ঙ) প্রত্যক্ষভাবে সকল স্তরের কর্মীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করা ,

(চ) মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকগণের দৃষ্টি শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি আকৃষ্ট করানো ;

(ছ) শ্রমিক-কর্মচারীদের মানসিকতার স্তর উন্নীত করা ,

(জ) সংগঠনের মূল পরিকল্পনাকে স্বল্পকালীন কার্যকরী পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করা ,

(ঝ) কর্মচারীদের কাজ তদারক করা, মূল্যায়ন করা ও ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা। এই স্তরের ব্যবস্থাপকগণের কারিগরি দক্ষতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতে এইরূপ স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কতটা প্রয়োগযোগ্য ? (How far are these levels applicable in India ?) :

ব্যবস্থাপনার ক্রমস্তর বা যাজকতন্ত্র (Hierarchy) নির্ভর করে সংগঠনের **আয়তনের** উপর ও ব্যবস্থাপনার **পদ্ধতির** উপর। ভারতে যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন খুব বড় অথবা মাঝারি আয়তনের, সেই সকল প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তর দেখা যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র আয়তনের সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল ত্রিস্তরের ব্যবস্থাপনা কার্যকরী হয় নাই।

স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সনাতনী বা ধ্রুপদী (Classical) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্টগণ ভারতবর্ষে এই স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তাহাদের অধীনস্থ কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করে। স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উল্লম্ব (Vertical) ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতেছে সমান্তরাল অথবা পার্শ্বিক ব্যবস্থাপনা (Horizontal Management)।

সংযোজনা বা সমন্বয় (Co-ordination) :

সংজ্ঞা (Definition) : অভীষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগীয়, উপ-বিভাগীয় ও কর্মীদের প্রচেষ্টা ও কর্মধারার সঙ্গতি বিধানকে সংযোজনা বলে। সংযোজনা সহযোগিতামূলক কার্যকারিতা (Collaborative Effectiveness) আনয়ন করে। বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার নাম সংযোজনা।

মুনী ও রেইলীর মতে, "সংযোজনা হইল সমউদ্দেশ্যসাধনে কার্যের একতাবিধানের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।" স্প্রিগেলের মতে, "সংযোজনা হইল সময়, স্থান ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী কর্মবিভাজনের এমন একটি প্রক্রিয়া যাহাতে পরিস্থিতি বিশেষে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সমান যত্ন নেওয়া যায়।"

জর্জ টেরীর মতে, "সংযোজনা হইল সকল কর্মচারীর কর্মপ্রচেষ্টার সুষ্ঠু বিন্যাসের দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টার মাত্রা, সময় ও নির্দেশনার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান।" একটি কাজ কোন একজন ব্যক্তি এককভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। এই কারণে বিভাগীয়করণ করিয়া কর্মবিভাজন করা হয় ও বিশেষায়ণ অর্জন করা হয়। বিভাগীয় ও ব্যক্তি-প্রচেষ্টাকে গ্রন্থনার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রচেষ্টায় পরিণত করা সমন্বয়ের কাজ।

ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের বা সংযোজনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Co-ordination in Management) :

হারল্ড কুঞ্জ এবং **ও'ডোনেলের** মতে, "প্রত্যেক ব্যবস্থাপনার কাজ হইল সংযোজনার অনুশীলন।" ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংযোজনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হইল :

(১) সংযোজনাকে ব্যবস্থাপনার হৃৎপিণ্ড (Heart) বলা হয়।

(২) হেনরি ফেওল সংযোজনাকে ব্যবস্থাপনার একটি স্বতন্ত্র কর্মধারা হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। ইহা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং ব্যবস্থাপনায় সাফল্য আনে।

(৩) সংযোজনার মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষগণ প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতা বা একত্বকরণ (Oneness) অনুধাবন করিতে পারেন।

(৪) সংযোজনা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে।

(৫) সংযোজনা অর্কেস্ট্রা (Orchestra) বাদনের মত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ঐকতান (Harmony) সৃষ্টি করিয়া কর্মধারায় সমতান সৃষ্টি করে।

(৬) ইহা সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় রোধ করিয়া কর্মের গতি ও ছন্দ বজায় রাখে।

(৭) ইহা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে দূর করিয়া কাজের গতি অব্যাহত রাখে।

(৮) সংযোজনা কর্মীদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

(৯) ইহা আদর্শের একতা সৃষ্টি করে।

(১০) একক প্রচেষ্টা অপেক্ষা যৌথ প্রচেষ্টায় অধিকতর ফল লাভ করা যায়। সংযোজনা একক প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটাইয়া প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। সংযোজনা প্রেরণাসঞ্চারী বা সম্মিলিত ফল (Synergic Effect) সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(১১) ইহা কাজের প্রতি কর্মিগণের একক ও যৌথ প্রচেষ্টার মনোবল (Morale) সৃষ্টি করে।

(১২) সংযোজনা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া তোলে। ইহাতে কর্মীদের বিরোধমূলক মনোভাব দূর হয়।

(১৩) ইহা কারবারের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত করে।

(১৪) সংযোজনা না থাকিলে শ্রমবিভাগের ফল লাভ করা যায় না।

(১৫) ইহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক পন্থা উদ্ভাবন করে, কর্মীদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করে এবং কারবারে স্বচ্ছতাপূর্ণ পরিবেশ গড়িয়া তোলে।

(১৬) ইহার সাহায্যে ব্যবস্থাপনার সকল বিভাগীয় কর্মিপ্রচেষ্টার, কর্মধারার ও কর্মশক্তির সংমিশ্রণ সম্ভব হয়।

সহযোগিতা ও সমন্বয় (Co-operation and Co-ordination) :

সহযোগিতা বলিতে অভীষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টাকে বুঝায়। কিন্তু, অভীষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগীয়, উপ-বিভাগীয় ও কর্মীদের প্রচেষ্টার ও কর্মধারার সংহতিবিধানকে সংযোজনা বলে। সংযোজনা সহযোগিতামূলক কার্যকারিতা আনয়ন করে।

সহযোগিতা ও সংযোজনার সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) সহযোগিতা ভিত্তিপ্রস্তর (Pillar), ইহার উপর সংযোজনা প্রতিষ্ঠিত। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অখণ্ড রূপ দিতে হইলে সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া সংযোজনা আনিতে হয়।

(২) সহযোগিতার মধ্যে কাল, মাত্রা ও লক্ষ্যের অভাব থাকে; সংযোজনা ইহা পূরণ করে।

(৩) সংযোজনা সহযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে।

(৪) প্রত্যেক কর্মীর সহযোগিতা সংযোজনার মাধ্যমে সমন্বিত হয়।

কারবারের উদ্দেশ্যসাধনে সহযোগিতা ও সংযোজনা উভয়ই মূল ভিত্তি ও প্রাণশক্তি। সহযোগিতা ও সংযোজনা একই মিলনসূত্রে গ্রথিত। ইহারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একটি অপরটির পদক্ষেপ ইহারা ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহাদের উপর কারবারের অস্তিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে। এই কারণে বলা হয় যে, "কারবারে সহযোগিতা ভিন্ন সংযোজনা বা সংযোজনা ভিন্ন সহযোগিতার ফল ধ্বংসাত্মক" (In business, co-operation without co-ordination or vice versa, is fatal)।

সংযোজনার নীতি (Principles of Co-ordination) :

(১) **সত্বর আরম্ভ** (**Early Start**) : সংযোজনার কাজ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিতে হইবে।

(২) **প্রত্যক্ষ সংযোগ** (**Direct Contact**) : বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মে বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দূর করিয়া সংযোজনার পথ প্রশস্ত করিবেন।

(৩) **ধারাবাহিকতা** (**Continuity**) : সংযোজনার কাজ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইহা পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ের কাজের মধ্যে বিস্তৃত করিতে হইবে।

(৬) ব্যতিহার অথবা পারস্পরিক আদান-প্রদান (Reciprocity): ব্যবস্থাপকগণকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার (Give and Take) মনোভাব থাকিতে হইবে।

সংযোজনার কৌশল (Techniques of Co-ordination):

সংযোজনাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে নিম্নলিখিত **কার্যকর পন্থা বা কৌশল** অবলম্বন করিতে হইবে:

(ক) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য (Clearly Defined Goals): প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য কি তাহা জানিতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্য পূরণে তাহার কি অবদান তাহা বুঝিতে হইবে।

(খ) সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি (Clear Plans and Policies): পরিকল্পনা ও নীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে কর্মচারিগণকে জানাইতে হইবে।

(গ) কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট রেখা (Clear lines of Authority and Responsibility): কর্তৃত্ব উর্ধ্বতন স্তর হইতে নিম্নতর স্তরে প্রবাহিত হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে সম্পর্ক উলম্ব ও সমান্তরাল কর্তৃত্বের মাধ্যমে স্থির হয়। কর্তৃত্বরেখা কে কাহার নিকট কৈফিয়ৎ দান করিবে ও দায়িত্বশীল থাকিবে তাহা নির্দেশ করে। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের রেখা সুস্পষ্ট করিয়া সংযোজনার কার্য সহজ করিতে হইবে। কর্তৃত্বের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইলে বিভিন্ন পদের কর্মী-সম্পর্ক বিশেষ করিয়া 'ঊর্ধ্বতন ও কর্মী' সম্পর্ক উন্নত হয় এবং সংযোজনার কাজ সহজ হয়।

(ঘ) নিয়মিত আলাপ-আলোচনা (Regular Discussion): বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ মিলিত হইয়া নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একে অপরের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করিবেন ও তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

(ঙ) বিশেষ সভা (Special Meetings): মাঝে মাঝে বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

(চ) কমিটি প্রথা (Committee Device): কমিটি (Committee) গঠন করিয়া বিশেষ ধরনের সংযোজনার কাজ করিতে হইবে।

(ছ) সংযোগকারী (Liaison): যোগাযোগকারী (Liaison) বা সংযোগকারী নিয়োগ করিয়া কাজের সমন্বয় আনিতে হইবে।

(জ) কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা (Effective Communication System): প্রত্যক্ষ ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িতে হইবে। ইহার দ্বারা সংযোজনার কাজ সহজ হইবে, কারণ প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয় এবং বিষয়বস্তু উভয়পক্ষের বোধগম্য হয়। **সমান্তরাল যোগাযোগ (Horizontal Communication)** ব্যবস্থা সফল সংযোজনার আবশ্যিক উপাদান।

(ঝ) **কার্যকর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধান (Effective Leadership and Supervision) :** কার্যকর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনায় উত্তম সংযোজনা আনিতে সাহায্য করে। কার্যকর নেতৃত্ব পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণে সংযোজনার কাজকে নিশ্চিত করে। কার্যকর তত্ত্বাবধান কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টাকে সঠিক পথে নির্দেশিত করে। ইহাতে কর্মের একতা আসে এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপের মধ্যে সংযোজনার কাজ সুবিধাজনক হয়।

(ঞ) **ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত (Accountability to Higher Authority) :** একজন উচ্চপদস্থ কর্মাধ্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কাজ পর্যবেক্ষণ করিবেন এই কর্তৃপক্ষের নিকট বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ সংযোজনার কাজের কৈফিয়ত (Accountability) দিবেন।

(ট) **ঐচ্ছিক সহযোগিতা (Voluntary Co-operation) :** কর্মচারীদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা থাকিলে সংযোজনার কাজ সহজ হয়।

(ঠ) **সংগঠনের সরলীকরণ (Simplification of the Organisation) :** বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে সহজ ও সরল সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারিলে সংযোজনার কাজ সহজ হয়।

নিয়ন্ত্রণ (Control) :

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ শেষ কার্য। বলা হয় যে, পরিকল্পনা সম্মুখের দিকে তাকায় এবং নিয়ন্ত্রণ পশ্চাতের দিকে দেখে (While planning looks ahead, control looks behind)।

সংজ্ঞা (Definition) : ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পর্যালোচনা ও মূল্যায়নকে। নিয়ন্ত্রণ হইল কার্যকলাপের পরিমাণগত ও উৎকর্ষগত মান যাচাই করিবার মাপকাঠি।

হ্যারল্ড কুঞ্জ এবং ও' ডোনেল, হেনরি ফেওল, হাইম্যান ও উইলিয়ম স্কট নিয়ন্ত্রণের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—পরিকল্পনা, নির্দেশ ও নীতি অনুযায়ী সব কিছু ঘটিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার নাম নিয়ন্ত্রণ। দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি নির্দেশ করিয়া তাহা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোলারও নিয়ন্ত্রণের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় প্রকৃত কাজের মূল্যায়ন করিয়া কাজের পূর্বনির্দিষ্ট মানের সহিত তাহার তুলনা করা, তারতম্য (Variance) নির্ধারণ করা এবং উপযুক্ত প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাহাতে ভবিষ্যতে ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

নিয়ন্ত্রণ অর্থে কর্মচারীকে প্রতি পদক্ষেপে তাড়না করা বুঝায় না, নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইতেছে কর্মচারীকে অনুসরণ করা এবং তাহার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা। নিয়ন্ত্রণ

কর্মী-ভিত্তিক (Employee-oriented) হওয়া উচিত। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে কর্মীর স্বার্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ (Goal Congruence) করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Control) ঃ

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারীদের নিদেশ প্রদান করেন ও কর্মে তাহাদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। কার্যকরী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য বিষয় (sine qua non)। নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপয নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) নিয়ন্ত্রণ থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটারের মত কারবারের অবস্থার পরিমাপ করে এবং উপযুক্ত সময়ে কারবারের পরিবর্তন অনুধাবন করিয়া পরিকল্পনাকে সার্থক করে

(২) ইহা ব্যবস্থাপনার অত্যাবশ্যকীয় কাজ। পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ইহা কর্মসম্পাদনের বাহন।

(৩) 'মানুষ মাত্রেই ভুল করে' এবং 'কাজ এড়িয়ে যাওয়া মানুষের স্বভাব —এই দুইটি বিষয় দূর করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

(৪) নিয়ন্ত্রণ উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনে।

(৫) ইহা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলীকে পর্যালোচনা করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রদান করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে।

(৬) নিয়ন্ত্রণ কাজের মান (Standard) স্থির করে, ফলে প্রত্যেক কর্মচারীর কার্য ও দায়িত্বের মাত্রা স্থির করা যায়।

(৭) বিভিন্ন কর্মচারীর ও বিভাগীয় কার্যকলাপের সমন্বয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন হয়।

(৮) নিয়ন্ত্রন বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমস্বার্থের মনোভাব সৃষ্টি করে। ইহা কর্মচারিগণকে দায়িত্ব-সচেতন করে।

(৯) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ঐক্য, সমঝোতা ও একাত্মবোধ সৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ও প্রকৃত কাজের মধ্যে একতা রক্ষায় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা অপরিসীম।

(১০ ইহা কর্মচারীদের কাজে স্বাধীনতার প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা (Motivation) সৃষ্টি করে। **ডেলটন ম্যাকফারল্যাণ্ডের** মতে, "নিয়ন্ত্রন একটি প্রয়োজনীয় শক্তি। ইহা কর্মচারিগণের দলীয় ও একক কর্মস্পৃহা ও মনোবল (Morale) বৃদ্ধি করে"।

(১১) নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ যমজ (Twins) ধারণা। নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সহায়তা করে।

(১২) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা (Communication) সুদৃঢ় করা যায়।

(১৩) নিয়ন্ত্রণ নেতৃত্ব প্রদানের (Leadership) ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১৪) ভারার্পণকে (Delegation) সফল করিতে হইলে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(১৫) কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণে (Decentralisation of Authority) নীতি ও সিদ্ধান্তের একতা বিনষ্ট হইতে পারে। বিকেন্দ্রীভূত বিভাগ ও শাখাগুলির মধ্যে ঐক্যের মনোভাব বজায় রাখিতে হইলে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

(১৬) নিয়ন্ত্রন সময়, শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় রোধ করে। কাজের গতি বিপথগামী হইলে ইহা প্রতিরোধের বাঁধ গড়িয়া তোলে।

(১৭) ইহা সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে সাহায্য করে।

(১৮) নিয়ন্ত্রণ কার্যকরণে ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া যথাসময়ে উহার সংশোধনের ব্যবস্থা করে এবং পরিকল্পনা ও উহার রূপায়ণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে।

কারবারী নীতি (Business Policy) ঃ

পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নীতি অন্যতম। কারবারী নীতি একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা। নীতি হইল চিন্তা করিবার নির্দেশক (Guides)। পৌনঃ-পুনিকভাবে সংঘটিত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ প্রয়োজন। নীতি কারবারের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করে। কারবারের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য নীতি সঠিক পথনির্দেশ করে এবং একটি সার্বিক পন্থার সন্ধান দেয়। নীতি হইল চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব (Reflector)।

নীতির প্রয়োজনীয়তা (Necessity or Importance of Policies) ঃ

(১) বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ পদ্ধতিতে নীতি ব্যবস্থাপকগণের পথপ্রদর্শকের কাজ করে।

(২) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নীতি সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটায়।

(৩) নীতি নির্ধারণ করিয়া উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ নিম্নতর ব্যবস্থাপকগণকে পথনির্দে করেন।

(৪) নীতি ভারার্পণের (Delegation) কাজে সুবিধা আনে।

(৫) কারবারী নীতি সিদ্ধান্তগুলিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গত করে এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করে।

(৬) কারবারী নীতি পৌনঃপুনিক ব্যয় রোধ করে।

কারবারী নীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Business Policy) ঃ

জন কাউলার (John Cowler) উত্তম কারবারী নীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন :

(১) কারবারী নীতি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিবে ;

(২) নীতি সহজ, বোধগম্য ও লিখিত হইতে হইবে ;

(৩) ইহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের অনুমান করিবে ;

(৪) অর্থনৈতিক ও কারবারী পরিবর্তনের সহিত তাল মিলাইবার জন্য নীতিকে পরিবর্তনশীল করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে ;

(৫) নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে ইহা কার্যকর করা সম্ভব হয় ;

(৬) নীতি প্রণয়নের মধ্যেই উহা কার্যকর করিবার পদ্ধতি নিহিত থাকিতে হইবে।

বিভিন্নপ্রকার কারবারী নীতি (Different types of Business Policies) :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কারবারী নীতির বিভাগগুলি আলোচনা করা যায় :

(১) **উদ্ভূত, অনুমিত ও আরোপিত নীতি** (Originated, Appealed and Imposed Policies) : এইরূপ শ্রেণীবিভাগ নীতি-প্রণয়নের উৎসের মাপকাঠিতে করা হয়। কর্মচারিগণের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে সকল সাধারণ নীতি-প্রণয়ন করা হয়, সেইগুলি উদ্ভূত নীতি। বিশেষ ধরনের কাজ করিবার জন্য যে নীতি ও পন্থা নির্দেশিত হয়, তাহাকে অনুমিত নীতি বলে। আবার বহির্ভূত শক্তির প্রভাবে যে সকল নীতি প্রণীত হয়, সেগুলি আরোপিত নীতি।

(২) **সাধারণ ও বিভাগীয় নীতি** (General and Departmental Policies) : যে সকল নীতি কারবারের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেইগুলি সাধারণ নীতি এবং যে সকল নীতি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেইগুলিকে বিভাগীয় নীতি বলে।

(৩) **উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থসংস্থান ও কর্মী-বিষয়ক নীতি** (Production, Sales, Finance and Personnel Policies) : এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কারবারের প্রধান প্রধান কার্যাবলীর ভিত্তিতে করা হয়।

(৪) **ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী-সংক্রান্ত নীতি** (Management Operational Policies) : ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী অনুসারে কারবারী নীতিকে পরিকল্পনা-নীতি, সংগঠন-নীতি, নির্দেশদান-নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ-নীতি এই চারভাগে ভাগ করা যায়।

কারবারী নীতির প্রয়োগ (Application of Business Policies) :

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্র (Area) আছে। ব্যবস্থাপনার প্রতিক্ষেত্রে নীতির প্রয়োজন। সুতরাং নীতি বিস্তৃত (Elaborate) হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতির প্রয়োগ হইল :

(১) **অর্থ-সংক্রান্ত নীতি** (Financial Policies) : এই নীতিগুলি হইল :

(ক) মূলধন কাঠামো স্থিরীকরণ নীতি ;

(খ) মূলধন সংস্থান নীতি ;

(গ) লভ্যাংশ নীতি ,

(ঘ) অবচিতি ধার্যের নীতি ;
(ঙ) বিলম্বিত ব্যয় নীতি ;
(চ) অন্তঃসম্ভার মূল্যায়ন নীতি ইত্যাদি।

(২) **উৎপাদন ব্যয় নীতি (Costing Policies) ঃ এই নীতিগুলি হইল :**

(ক) কাঁচামাল বণ্টন (Issue) নীতি যেমন, FIFO, LIFO ইত্যাদি ;
(খ) পরিব্যয় (Overheads) বণ্টনের নীতি ইত্যাদি।

(৩) **ক্রয় নীতি (Purchase Policies) ঃ এই নীতিগুলি হইল :**

(ক) মজুত দ্রব্যের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও ফরমাশ স্তর নির্ধারণ নীতি ;
(খ) কাঁচামাল মজুতের নীতি ইত্যাদি।

(৪) **বিক্রয়-নীতি (Sales Policies) ঃ এই নীতিগুলি হইল :**

(ক) বাট্টা নীতি ;
(খ) পণ্যমূল্য নির্ধারণ নীতি ;
(গ) মোড়কজাতকরণ নীতি ;
(ঘ) ধারে পণ্য বিক্রয় নীতি ইত্যাদি।

(৫) **কর্মী-বিষয়ক নীতি (Personnel Policies) : এই নীতিগুলি হইল :**

(ক) নির্বাচন ও নিয়োগ নীতি ;
(খ) প্রশিক্ষণ নীতি ;
(গ) শ্রমিক সংঘের প্রতি মনোভাব ও আচরণ নীতি ;
(ঘ) নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষণ নীতি ,
(ঙ) মজুরি নীতি ,
(চ) উত্তরণ বা পদোন্নতির নীতি (Promotion Policy) ;
(ছ) বদলী ও সাময়িক ছাঁটাই নীতি ;
(জ) শিল্প-বিরোধ মীমাংসা নীতি ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও কারবার
(State and Business)

ভূমিকা (Introduction) ঃ কারবার একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। সমাজের সহিত কারবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution)। সমাজের বিবিধ অভাব পূরণ করিয়া মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা কারবারের সামাজিক দায়িত্ব। কারবারের দুইটি লক্ষ্য থাকে—(১) মুনাফা অর্জন এবং (২) সামাজিক দায়িত্ব পালন। অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) নীতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বোচ্চ মুনাফা করিবার লোভে আকৃষ্ট করিয়া শ্রমিক ও জনসাধারণকে শোষণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই বর্তমানে সরকার কারবারী প্রতিষ্ঠানের সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের মোকাবিলা করিবার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে অর্থনৈতিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য ও শিল্পোন্নতিকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (Regulated Economy) গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে সরকার কারবারী ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতেছে।

কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control over Business) ঃ

কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায়, কারবারী প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যকলাপের উপর রাষ্ট্রের বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে 'নির্বিরোধ অর্থনীতির' (Laissez Faire Economy) অবসান ঘটিয়াছে। সরকার শুধুমাত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে না, জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপে এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতেও বর্তমানে রাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি উন্নয়ন, পরিবহণ, ধনবৈষম্য দূরীকরণ, শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি কার্যকলাপে সরকার সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে। কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যুক্তিগুলি হইল :

(১) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন করা,

(২) দেশের সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করা ও কাম্য বণ্টন করা ;

(৩) পুঁজিপতিদের দ্বারা জনসাধারণ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণ রোধ করা,

(৪) আয় ও সম্পদ বৈষম্য দূর করা ;

(৫) সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ করা,

(৬) কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানো,

(৭) ভারসাম্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ;

(৮) সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিস্তৃত করা,

(৯) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বীমা জাতীয়করণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা ;

(১০) শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া ও একচেটিয়ামূলক প্রভাবশালী কারবারী প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য হ্রাস করিয়া শোষণ বন্ধ করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করা ;

(১১) বাণিজ্য-চক্রের নিয়ন্ত্রণ ও বেকারত্বের অবসান ঘটানো ,

(১২) অত্যাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও তাহাদের ন্যায্য বণ্টন করা ,

(১৩) দাম ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব আনা ,

(১৪) উন্নয়ন-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ঘটাইয়া দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Measures to exercise Social Control over Business) :

জাতীয়করণ অথবা আইনপ্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্র কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে। ভারতে কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইয়াছে :

(১) **জাতীয়করণ** (Nationalisation) : ভারতে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা হইয়াছে যেমন, কয়লা খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(২) **মিশ্র অর্থনীতি** (Mixed Economy) : মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে।

(৩) **বেসরকারী শিল্পের নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of Private Industries) : বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যেমন, শোষণ, কালোবাজারী, ভেজাল, মজুতদারী, মুনাফাবৃদ্ধি ইত্যাদি রোধ করিবার জন্য সরকার দমনমূলক কারবারী ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে **শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন** অনুসারে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধীভূত (Registered) হইতে হইবে এবং লাইসেন্স বা অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে। যদি তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয় অথবা ইহার কার্যকলাপ জনস্বার্থ-বিরোধী হয়, তবে এই আইন অনুসারে সরকার ঐ প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করিতে পারে।

(৪) **রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের পরিচালনা** (Management of Sick and Closed Industries) : **শিল্প পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের** মাধ্যমে রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব সরকার সাময়িক অথবা স্থায়িভাবে গ্রহণ করিতে পারে।

(৫) **একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ** (Control over Monopolies) : ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে **মনোপলি এ্যাণ্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস আইন (MRTP Act)** অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসা ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা আইন প্রণয়ন করিয়া প্রভাবশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানের, যাহাদের পরিসম্পদ পাঁচ কোটি টাকা

বা ততোধিক এবং ১০০ কোটি টাকা বা ততোধিক পরিসম্পদবিশিষ্ট পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, সংযুক্তিকরণ, একচেটিয়ামূলক ও অন্তরায়মূলক আচরণ, পরিচালক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৬) **শিল্প আইন প্রণয়ন** (Enactment of Industrial Laws) : কারখানায় শ্রমিক যাহাতে শোষিত না হয় তাহার জন্য কারখানা আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহাতে কাজের সময়, শ্রমিক নিয়োগ, ছুটির সুবিধা, স্বাস্থ্য, কল্যাণ, নিরাপত্তা, পরিবেশ ইত্যাদির বিধি-ব্যবস্থা আছে। মজুরি প্রদান আইন, সর্বনিম্ন মজুরি আইন, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন, শ্রমিকের রাজ্যবীমা আইন, বোনাস আইন, গ্র্যাচুইটি আইন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

(৭) **অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ** (Control over Internal Trade, Commerce and Price) : অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করিয়া দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই কারণে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে **অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন** (Essential Commodities Act) প্রণয়ন করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য, সূতীবস্ত্র, কাগজ, চিনি, কেরোসিন তেল, ভোজ্য তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত মূল্য-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার 'ফুড কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার গড়িয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন প্রকল্প চালু করা হইয়াছে।

(৮) **আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ** (Control over Import-Export Trade) : লাইসেন্স ও কোটা বা বরাদ্দ পদ্ধতির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। **রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন** (State Trading Corporation) গঠন করিয়া আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা হইয়াছে।

(৯) **বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য** (Aid to Private Enterprises) : শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জনকল্যাণমুখী করিবার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য করে।

জাতীয়করণ (Nationalisation) : কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, পরিচালনা, উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি সরকার কর্তৃক পূর্ণ অধিকৃত হইলে তাহাকে জাতীয়করণ বলে।

উদ্দেশ্য : জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাস্বত্ব গ্রহণ করা ;

(খ) পরিচালনায় পূর্ণ অথবা অধিকাংশ কর্তৃত্ব সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা।

সুবিধা : জাতীয়করণের সুবিধাগুলি হইল :

(১) জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি গড়িয়া তোলা ও তাহার সম্প্রসারণ করা ;

(২) প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করা ;

(৩) সম্পদের অপচয় দূর করা ;

(৪) গবেষণামূলক কার্যকলাপ সম্প্রসারণ করা ;
(৫) শোষণ রোধ করা ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ প্রসারিত করা ;
(৬) বেকার সমস্যার সমাধান করা।

অসুবিধা ঃ জাতীয়করণের অসুবিধাগুলি হইল :

(১) জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তিগত উদ্যম কমিয়া যায় ,
(২) আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয় বলিয়া জাতীয়করণের ফলে দক্ষতা হ্রাস পায় ;
(৩) ইহাতে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় ,
(৪) ইহাতে প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট হয়।

কারবারী ক্ষেত্রে সরকার
(Government in Relation to Business)

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কুফল এড়াইবার জন্য স্বাধীনতার পরে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialist Economy) ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের উদ্দেশ্যে সম্পদের সমষ্টিগত মালিকানার ভিত্তিতে সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৈষয়িক কর্মপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করিয়াছে। জাতীয় সম্পদ ও আয়ের বৈষম্যমূলক বণ্টন, শ্রমিক ও ক্রেতা শোষণ ইত্যাদি পরিহারকল্পে সরকারের কারবারী কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে **মিশ্র অর্থনীতি** (Mixed Economy) প্রবর্তিত হইয়াছে। একদিকে সরকারী উদ্যোগের বিস্তার করিয়া দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন করা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ চালু করা এবং অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্ষেত্র নিরূপণ করা—এই দুইটি মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

উদ্যোক্তা (Promoter) হিসাবে স্বাধীনতার পূর্বে সরকার রেল-পরিবহণ, ডাক-তার, গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা ইত্যাদির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বাধীনতার পর প্রবর্তক হিসাবে সরকারের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উদ্যোগে বহু শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা, পেরাম্বুরের রেল-কামরা তৈয়ারীর কারখানা, সিন্ধ্রির রাসায়নিক সার কারখানা, ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যালস্, রাঁচীর হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি সংস্থা সরকারী উদ্যোগে গঠিত। ইহা ছাড়া স্টীল কর্পোরেশন, কোল ইণ্ডিয়া, অয়েল ইণ্ডিয়া, শিপিং কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্, হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফটস্, এল আই সি, ডি ভি সি, এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশন, ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিল্প-উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকারের **নিয়ন্ত্রণকারীর** (Regulator) ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পসমূহকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] চালু করা হয়। এই আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পরিসম্পদের মূল্য ৫ কোটি টাকার অধিক সেই সকল সংস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণ করিতে হইলে মূলধন বিলি-নিয়ন্ত্রণকারীর নিকট হইতে সরকারী অনুজ্ঞাপত্র (Licence) লইতে হয়। একচেটিয়া কোম্পানী এবং শতকরা ৪০ বা তাহার অধিক বিদেশী শেয়ার-হোল্ডারধারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকার বা তাহার অধিক মূলধনের প্রস্তাব করা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আবশ্যক। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন, উৎপাদন ইত্যাদির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতে পারে। ইহা ছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রণভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ অনুসন্ধান ও শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে শিল্প-সংস্থাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে। উপরন্তু, সরকার পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ করিয়া পণ্যের উৎকর্ষ সাধন করে। পণ্যের সরবরাহ কম থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে উহার সম্ভোগও (Consumption) সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। শিল্প ও ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়নের দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে **একচেটিয়া ব্যবসা ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিকপ্রথা আইন** (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act or MRTP Act) পাশ করা হয়। এই আইনের সাহায্যে সরকার একচেটিয়া কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ইহা ছাড়া সরকার কোম্পানীর শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর লগ্নিপত্র চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন [Securities Contract (Regulation) Act, 1956] দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে এবং **শেয়ার-সম্পর্কিত পরামর্শদান ও বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন ও সরকারী কোম্পানীর মূলধন গঠনে শেয়ার ক্রয় করিয়া সাহায্য করে।**

বিভিন্ন প্রকার আইন-কানুন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া সরকার বেসরকারী কারবারের ইচ্ছামত গঠন, সম্প্রসারণ ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য, সামঞ্জস্য ও সমতা আসে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রূপায়ণেও ইহা বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পনীতি (Industrial Policy), অনুজ্ঞাপত্র প্রদান নীতি (Licensing Policy), একচেটিয়া ব্যবসা বা অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা আইন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার বৃহত্তর শিল্পগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে। ১০০ কোটি টাকা অথবা তাহার অধিক পরিসম্পদ থাকিলে উহা বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর আওতায় পড়ে। ইহাদের জন্য মোট ১১টি শিল্প নির্দিষ্ট আছে। ইহারা ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষিত আওতায় কারবার করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া **বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন** (Foreign Exchange Regulations Act অথবা FERA) দ্বারা সরকার বৈদেশিক

মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক এবং শুল্ক বিভাগ।

অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে **আপসে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সরকার সালিশির** (Arbitrator) কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সালিশি পরিষদ (Indian Council of Arbitration) গঠিত হইয়াছে। স্বেচ্ছামূলক বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সালিশ প্রসার পর্ষদ (National Arbitration Promotion Board) স্থাপন করিয়াছে। শিল্প-বিরোধ আইনের (Industrial Disputes Act) মাধ্যমে সরকার কর্মী কমিটি (Works Committee), আপস কর্মচারী (Conciliation Officer), আপস পর্ষদ (Board of Conciliation), অনুসন্ধান আদালত (Court of Enquiry), শ্রম আদালত (Labour Court), শিল্প সালিশ আদালত (Industrial Tribunal), জাতীয় সালিশ আদালত (National Tribunal) ইত্যাদিতে বিরোধ প্রেরণ করিয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। বিরোধ যদি প্রথম পর্যায়ে থাকে তবে উহা কর্মী কমিটির নিকট পাঠান হয়। এই কমিটি বিরোধ মিটাইতে না পারিলে উহা আপস কর্মচারীর নিকট পাঠান হয়। সেখানেও বিরোধ নিষ্পত্তি না হইলে গুরুত্ব অনুযায়ী উহা শ্রম আদালত, শিল্প সালিশ আদালত অথবা জাতীয় সালিশ আদালতে পাঠান হয়। তালাবন্ধ (Lock Out), ধর্মঘট (Strike) ইত্যাদি মীমাংসার জন্য শ্রম আদালতে বিরোধ পাঠান হয়। মজুরি, ক্ষতিপূরণ, ছুটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেনশন ইত্যাদির বিরোধ মীমাংসা করে সালিশি আদালত। জাতীয় আদালতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সংক্রান্ত বিরোধ এবং একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্পের বিরোধ মীমাংসা করা হয়। স্বেচ্ছামূলকভাবে বিরোধ মীমাংসিত হইলে শ্রমিক ও মালিক লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া উহা সালিশিতে পেশ করিতে পারে। সালিশ সরকারের নিকট রায়েদাদ (Award) পেশ করে। শিল্প-বিরোধের সম্পর্কে অনুসন্ধান আদালত তদন্ত করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রের পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার কর আদায় (Tax Raising) করে। কর বিভিন্ন প্রকারের হয় যেমন, আয়কর, বিক্রয়কর, অন্তঃশুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পত্তি কর, দান কর, মূলধনী মুনাফা কর, কৃষি আয়কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। কিন্তু **কর-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য** বিধান না করিয়া ইচ্ছামত কর আদায় করিলে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সরকার এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর-ব্যবস্থা এমনভাবে স্থির করে যে, ইহাতে একদিকে যেমন প্রচুর **রাজস্ব আদায়** (Revenue Raising) হয়, অন্যদিকে তেমনি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। **সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ যাহাতে পুঞ্জীভূত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরকার প্রয়োজনমত কর-নীতির পর্যালোচনা ও পরিবর্তন করে।**

বিভিন্ন প্রকার শুল্ক, যেমন, আমদানি ও রপ্তানি-শুল্ক, আবগারি-শুল্ক ইত্যাদি আরোপ করিয়াও সরকার প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় করে।

যৌথ ক্ষেত্রে (Joint Sector) অংশীদার হিসাবেও সরকারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারবারী ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগে শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। সরকার শেয়ার ক্রয় করিয়া অংশীদার হিসাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইতেছে অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। ছোট ও মাঝারি কারবারী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ইহাদের সহিত সরকার অংশীদারী ভূমিকায় নামিতেছে। বৃহৎ শিল্পসংস্থাকে ও বৈদেশিক কোম্পানীসমূহকে বাধা দিবার জন্য এবং ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য সরকার যৌথ উদ্যোগে শিল্পসংস্থা গড়িয়া তুলিতেছে। দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্যও সরকার যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করিতেছে। বিধাননগরে (ওয়েবেল ইলেকট্রনিকস্) ও হলদিয়ায় পেট্রো-কেমিক্যালস্ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে **নির্দেশক ও সাহায্যকারী হিসাবেও** সরকার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠন ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করিতে এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ-রক্ষার্থে সরকার বিভিন্ন প্রকার আইন-কানুন তৈয়ারী করিয়া নির্দেশ দান করে। দেশীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করিয়া এবং দেশীয় শিল্পকে রাজবৃত্তি (Bounty), অর্থাৎ উৎপাদনের উপর এককালীন নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া অথবা সহায়ক বৃত্তি (Subsidy) অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানকে একক উৎপাদন প্রতি বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দিয়া সরকার শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণে সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক, বীমা-প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অর্থ-সংস্থা, যেমন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান করে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া "পাইলট স্কিম" (Pilot Scheme)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পে বিশেষ ঋণ দান করে। সরকার প্রত্যক্ষভাবেও শিল্পে আর্থিক সাহায্য দান করে। ইহা ছাড়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দপ্তর ও কারিগরি সংস্থার মাধ্যমে সরকার নির্দেশ ও উপদেশ দান করে।

ইহা ছাড়া **শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যেও** সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছে। ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট, ওয়ার্কমেন্স কম্পেনসেশন এ্যাক্ট, এমপ্লয়ীজ স্টেট ইন্সিওরেন্স এ্যাক্ট, মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, পেমেণ্ট অফ্ ওয়েজেস এ্যাক্ট, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এ্যাক্ট, বোনাস এ্যাক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হইয়াছে।

বিভিন্নপ্রকার শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার শ্রমিক কল্যাণের ভূমিকা পালন করে এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করে। **কারখানা আইনের** (Factories Act) মাধ্যমে সরকার কারখানার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখে এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করে। **শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইনের** (Workmen's Compensation Act) মাধ্যমে কর্মরত অবস্থায় এবং কারখানায় থাকাকালীন সময়ে কোন শ্রমিকের আংশিক বা সম্পূর্ণ, স্থায়ী বা অস্থায়ী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। **কর্মচারী রাজ্যবীমা আইনের** (Employees' State Insurance Act) মাধ্যমে অসুস্থতাজনিত সুবিধা, চিকিৎসাজনিত সুবিধা, প্রসূতিকালীন সুবিধা, পোষ্যবর্গের সুবিধা, অক্ষমতাজনিত সুবিধা, সৎকারের সুবিধা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। **মজুরিপ্রদান আইনের** (Payment of Wages Act) মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। **সর্বনিম্ন মজুরি আইনের** (Minimum Wages Act) দ্বারা কোন কোন শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। **প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি আইন** প্রণয়ন করিয়া সরকার শ্রমিকের **সামাজিক নিরাপত্তা** (Social Security) সুরক্ষিত করিয়াছে। **বোনাস আইন** (Bonus Act) প্রণয়ন করিয়া শ্রমিককে সর্বনিম্ন ৮·৩৩% হারে বোনাস দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা (National Planning) :

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকার **জাতীয় পরিকল্পনা** গ্রহণ করিয়া ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করিয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের দ্বারা জাতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হয়। এ পর্যন্ত ভারতে সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারা উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনায় দেশের অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইবার জন্য সামাজিক সম্পদের উপযুক্ত বণ্টন এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা করা হয়। জনতা সরকার ভারতে **চলমান বা গড়ান পরিকল্পনা** (Rolling Plan) রচনা করিয়াছিল। চলমান পরিকল্পনা বলিতে **ছেদ-বিহীন পরিকল্পনা** (No-break Plan) বুঝায়। জনতা সরকারের আমলে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান বা সহ-সভাপতি ডঃ লাকড়াওয়ালা (Dr. Lakdawala) উহা প্রবর্তন করেন। ইহাতে প্রতি বৎসরের শেষে পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয় এবং আরও একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার সময়ের সহিত যোগ করা হয়, যাহাতে সর্বদাই পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর

হাতে থাকে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার উহা বাতিল করে এবং স্থির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পুনঃপ্রবর্তন করে। জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(১) সর্বোচ্চ পরিমাণ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা,

(২) পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা,

(৩) আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করা,

(৪) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা,

(৫) জনগণের নিম্নতম প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা,

(৬) অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরশীলতা আনয়ন করা।

পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের অনুপাত হইল :

	সরকারী ক্ষেত্র		বেসরকারী ক্ষেত্র
প্রথম পরিকল্পনা	৪৬	:	৫৪
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৫৪	:	৪৬
তৃতীয় পরিকল্পনা	৫১	:	৪৯
চতুর্থ পরিকল্পনা	৫৭	:	৪৩
পঞ্চম পরিকল্পনা	৭০	:	৩০
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	৬০	:	৪০
সপ্তম পরিকল্পনা	৫৬ ২৫	:	৪৩ ৭৫

সপ্তম পরিকল্পনায় মোট ৩২০,০০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১,৮০,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ স্থির হইয়াছে ১,৪০,০০০ কোটি টাকা।

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও সংস্থা (Major Government Departments and Institutions for the Furtherance of Business in India) :

ভারতে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি সম্বন্ধে এই স্থানে আলোচনা করা হইল :

যোজনা কমিশন (Planning Commission) : ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে একটি জাতীয় যোজনা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় যোজনা বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এই কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিবেদন কংগ্রেসের নিকট পেশ করে। যোজনা কমিশন জাতীয় পরিকল্পনার সংগঠক। স্বাধীনতার পর জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ ও কার্যকর করিবার জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের সংবিধান অনুসারে ইহা পুনর্গঠিত হয়।

যোজনা কমিশন সারা দেশের প্রয়োজনীয়তা, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি, শ্রম, সম্পদ ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া উহাদের সুষ্ঠু এবং কার্যকর ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনা করে। ইহা সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণসমূহের সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত বণ্টন মারফত নির্ধারিত হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্ভব করিবার ব্যবস্থা, পদ্ধতি, কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোজনা কমিশনের **চেয়ারম্যান। একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তিনজন বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য** (Three-Men Super-Body) থাকে। ইহার মোট সদস্য-সংখ্যা ৬ জন—সভাপতি, সহ-সভাপতি, অর্থমন্ত্রী, যোজনা মন্ত্রী এবং আরও ২ জন সদস্য। ইহার মূল কার্যাবলী হইতেছে : (ক) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করা, (খ) সুষ্ঠু ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা, (গ) আয়ের উৎস নির্ধারণ করা, (ঘ) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনা-ব্যয়ের বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করা, (ঙ) জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা, (চ) পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। ইহা মোট সাতটি পঞ্চবার্ষিকী এবং তিনটি বাৎসরিক যোজনা প্রস্তুত করিয়াছে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) : ইহা যোজনা কমিশনের একটি অঙ্গ। ইহার মূল কার্য হইল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া সম্পদ উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করা। পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য ইহা রাজ্য সরকার ও যোজনা কমিশনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। পরিকল্পনা রূপায়ণে পরিকল্পিত রাজ্য-ভিত্তিক অর্থবণ্টনে ইহা রাজ্য সরকারের সহিত আলোচনা করে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (IDBI) : ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় মিয়াদী ঋণদান সংস্থাসমূহ যে ঋণ দেয় তাহা যথেষ্ট নহে। উপরন্তু ইহাদের মধ্যে সংযোজনারও অভাব ছিল। ইহাদের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ স্থাপন এবং নূতন শিল্প-স্থাপনে উৎসাহ দান করিবার জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে IDBI একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনরূপে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। ইহার অনুমোদিত পুঁজি ৫০ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

কার্যক্ষেত্র : সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা পণ্য উৎপাদনকারী, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারবার, জাহাজ, পরিবহণ, হোটেল ইত্যাদি কারবারে ইহা ঋণ প্রদান করে।

কার্যাবলী : (১) ইহা প্রত্যক্ষ ঋণদান করিতে পারে, কোন সংস্থার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিতে বা উহা বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

(২) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃ অর্থ-সংস্থান (Re-finance) করিতে পারে।

(৩) ইহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হইয়া অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের প্রত্যাভূতি (Guarantee) দিতে পারে।

(৪) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার অবলেখন (Underwriting) করিতে পারে।

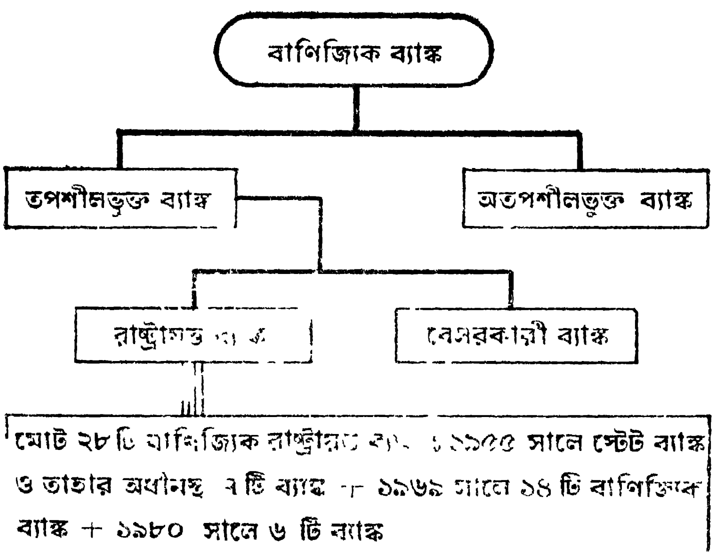
(৫) ইহা উন্নয়ন সাহায্য তহবিল (Development Assistance Fund) গঠন করিয়া অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে অর্থ সাহায্য করে।

(৬) ইহা বিনিয়োগের বাজার সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে গবেষণা করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও প্রশাসনিক পরামর্শ দান করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহ (Public Sector Banks) :

দেশের মোট ৭৪টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই ২৮টি ব্যাঙ্কের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তাহার অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলি আছে। এই ২৮টি ব্যাঙ্ক লইয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কক্ষেত্র গঠিত এবং ইহারা সমগ্র দেশের ব্যাঙ্কিং কার্য-কলাপের ৮৫ শতাংশ কাজ করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে উপযুক্ত সহায়তার জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন" দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে'র জাতীয়করণ ও কতিপয় দেশীয় রাজ্য-ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের বৃহৎ ১৪টি দেশীয় তপশীলী বাণিজ্যিক



ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরও ৬টি তপশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র অধিকাংশ স্থান

দখল করিয়াছে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে কতকগুলি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Rural Banks) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন।

আমদানি ও রপ্তানি-নিয়ন্ত্রক (Controller of Imports and Exports) :

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মন্ত্রক রহিয়াছে। এই মন্ত্রকের নাম **বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক** (Ministry of Foreign Trade)। একটি বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee) নীতি নির্ধারণে ইহাকে পরামর্শ দান করে। গৃহীত বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে **প্রধান আমদানি ও রপ্তানি-নিয়ন্ত্রক** (Chief Controller of Imports and Exports) থাকেন। ইনি আমদানি ও রপ্তানির জন্য অনুজ্ঞাপত্র (Licence) দিয়া থাকেন।

বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ (Department of Commercial Intelligence and Statistics) : এই বিভাগটি কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প-দপ্তরের অধীন এবং ইহার কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। এই বিভাগের মূল কার্য হইল ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজ দ্রব্য এবং নানাবিধ কাঁচামালের উৎপাদন-সংক্রান্ত বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, তাহাদের যথাযথ বিন্যাস এবং প্রকাশ করা; ইহা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের আভাসও প্রদান করে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডিরেক্টর জেনারেল অ. ইণ্টেলিজেন্স এ্যাণ্ড স্ট্যাটিষ্টিকস্।

রাজ্য সরকারের শিল্পাধিকার (State Government's Directorate of Industries) : কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ প্রতি রাজ্যে রাজ্য সরকারের শিল্প মন্ত্রকের অধীনে একটি **শিল্প-অধিকার** থাকে। রাজ্যের শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতিতে সহায়তার জন্য শিল্প-মন্ত্রকের নীতি কার্যকর করা, বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করা, বিদেশে শিল্প-প্রতিনিধি প্রেরণ করা ইত্যাদি এই অধিকারের প্রধান কার্য। এককথায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে রাজ্যের যাবতীয় বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সুশৃঙ্খল বিকাশের ব্যবস্থা করাই এই অধিকারের দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-অধিকার (Directorate of Industries, Government of West Bengal) : একজন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-দপ্তর গঠন করা হইয়াছে। ইহাতে একজন শিল্পাধিকার থাকে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া (Letter of Inde), শিল্প-তালুক (Industrial Estate) স্থাপন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণদান, জামিনদার হিসাবে ঋণ বণ্টনে সাহায্য, শিল্পকে ভরতুকি দেওয়া, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সাহায্য করা ইত্যাদি ইহার প্রধান কার্য।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) ঃ

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার শ্রফ্ কমিটির (Shroff Committee) সুপারিশ অনুসারে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন** গঠন করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ইহার ৪টি শাখা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে সেই সকল শিল্প বুঝায়, যাহাদের মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যেখানে ইহা বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক সেখানে মূলধন ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যে এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। ইহার মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ভারত সরকার ইহার সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করিয়াছেন। প্রয়োজনে ভারত সরকার ইহাকে চল্‌তি মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। ইহা একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী।

কার্যাবলী (Functions) ঃ (১) ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে 'অর্ডার' বা ফরমাশ সংগ্রহ করা।

(২) চলমান বিক্রয়কারী মোটরগাড়ীর (Mobile Sales Van) সহায়তায় অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণনের (Marketing) ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিপণন-ব্যবস্থা করা।

(৩) ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক শর্তে এবং ঠিকা-সওদা বা ভাড়া-ক্রয় (Hire-Purchase) ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

(৪) বৃহৎ শিল্পের চতুর্দিকে সহায়ক ক্ষুদ্র শিল্প (Feeder) স্থাপনের চেষ্টা করা।

(৫) শিল্প-মহল (Industrial Estate) নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা করা। ওখ্‌লা ও নৈনিতে এই প্রকার দুইটি শিল্প-মহল নির্মিত হইয়াছে।

(৬) প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং কনট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করিবার জন্য কনট্রাক্ট অবলেখন (Underwriting) করা।

(৭) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। রাজকোট, ওখলা ও হাওড়াতে এইরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

(৮) ক্ষুদ্র শিল্পের পণ্য-বিপণন কার্যকে সুগম করিবার জন্য পণ্যাগার (Ware house) স্থাপন করা।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে সরকার (Role of Government in the Development of Small-scale Industries) ঃ

ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে সরকারী সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকারী প্রয়াসসমূহ আলোচিত হইল :

(ক) ক্ষুদ্র শিল্পকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে এবং প্রতিটি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে আনা হইয়াছে।

(খ) ইহার কার্য নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের জন্য ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নয়ন কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(গ) ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকার নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহ স্থাপন করিয়াছে:
ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, রিজিওনাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ সার্ভিসেস ইনষ্টিটিউটস্, ব্রাঞ্চ ইনষ্টিটিউটস্, মেজর ইনষ্টিটিউটস্, এক্সটেন্শান সেণ্টার ইত্যাদি।

(ঘ) স্মল-স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে কার্যক্রম বা কার্যসূচী (Programme) প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(ঙ) বিভিন্ন অর্থ-সংস্থা ও স্টেট ব্যাঙ্কের পাইলট স্কীমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

(চ) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটস্ ও সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

(ছ) ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত ও সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ৫০০টিরও অধিক শিল্প ইহার অধীনে আনা হইয়াছে।

(জ) ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পণ্যমেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং ইহার রপ্তানি প্রসারে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

(ঝ) ক্ষুদ্র শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রকার পর্ষদ্ গঠন, যেমন, হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্ বোর্ড, খাদি বোর্ড ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাইসেন্স কমিটি (Licence Committee): ভারতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু করা হইয়াছে। বর্তমানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইলে তাহাকে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স-এর জন্য লাইসেন্স কমিটির নিকট আবেদন করিতে হয়। লাইসেন্স কমিটি বিভিন্ন বিষয় বিচার করিয়া লাইসেন্স মঞ্জুর করে।

জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories): ইহা গবেষণার দ্বারা শিল্প ও কৃষির উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করে। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আবিষ্কার করিয়া ইহা শিল্পোন্নতি ও কৃষি উন্নয়নে সাহায্য করে। ৩০টিরও বেশী জাতীয় গবেষণাগার দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার নিকটে যাদবপুরে গ্লাস এণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী, নিউ দিল্লীর ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ধানবাদের সেণ্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন প্রভৃতি বিখ্যাত।

কারিগরি প্রতিষ্ঠান (Technical Institutes): কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য এবং গবেষণাকার্য চালাইবার জন্য ভারতে অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কারিগরি শিক্ষা পরিষদ গঠন করিয়া কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে।

ভারতীয় মান নির্ধারণ সংস্থা (Indian Standard Institute): উৎপাদিত পণ্যের মান বজায় রাখিবার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ ও বিদেশের বাজারে পণ্যের

উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এই সংস্থা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কাজ হইল কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মান নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রমাণপত্র প্রদান করা। পরীক্ষিত দ্রব্যের উপর I.S.I. নামাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করা যায়। এই ছাপ দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে ক্রেতাকে নিশ্চিত করে।

ক্ষুদ্রায়তন সেবা সংস্থা (Small Scale Service Institutes): এই সংস্থাগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে পরামর্শ ও নানাবিধ সাহায্য দান করে। যেমন, কারিগরি জ্ঞান ও পরামর্শ, কারিগরি কার্যকলাপ প্রদর্শন, কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং সেবা বিতরণ করে। প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ সেবা সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

বিপণন পর্ষৎ বা পণ্য বিক্রয়মণ্ডলী (Marketing Board): কৃষিজাত এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও বিক্রয় বৃদ্ধির কার্যকর পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছে। এই পর্ষৎগুলির মধ্যে টি বোর্ড, কফি বোর্ড, খাদি বোর্ড, সিল্ক বোর্ড, কয়্যার বোর্ড, রবার বোর্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিক্রয়ের দোকান (Sales Emporium): ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এইরূপ দোকান খোলা হয়। যেমন—ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এম্পোরিয়াম, কাশ্মীর সেলস্ এম্পোরিয়াম ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক লাইব্রেরী ও সংগ্রহশালা (Commercial Library and Museums): ইহাতে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাওয়া যায় এবং তথ্য ও দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে। বণিক সংঘও ইহা গঠনে আগ্রহী হয়। যেমন, কলিকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে অবস্থিত কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের লাইব্রেরী ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক কমিশনার (Trade Commissioner): ইহারা সরকারী কর্মচারী। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে নিজ দেশের পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশের সহিত উন্নততর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য ইহারা চেষ্টা করেন। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক তথ্যও ইহারা দেশে পাঠান। ফলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয়েই উপকৃত হন।

উন্নয়ন পরিষদ (Development Councils): শিল্পের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। যেমন, চিনি-শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প, ঔষধ ও ভেষজ শিল্প, জৈব রাসায়নিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়া, কাগজ-শিল্প, চামড়া-শিল্প ইত্যাদি। শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

কার্যাবলী (Functions):

(১) সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করা ও উৎপাদন কার্যক্রমের সংযোজনা করা;

(২) শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ;

(৩) শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার, দক্ষতা ও মান বৃদ্ধি এবং হিসাবরক্ষণ ও পরিব্যয় পদ্ধতি উন্নত করিয়া ব্যয় হ্রাস করা ;

(৪) শিল্প-পণ্যের বিক্রয় ও বণ্টন পদ্ধতির উন্নতি করা ;

(৫) শিল্পের পরিচালনায় দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার ব্যবহার করা ;

(৬) শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রমিক কল্যাণসাধন এবং ছাঁটাই কর্মীর বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করা ;

(৭) শিল্পের প্রয়োজনীয় সংবাদ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিতরণ করা ;

(৮) ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও উৎপাদনে বিভিন্নতা (Diversification) আনয়ন করা।

বাণিজ্যিক নীতি (Commercial Policy) : বাণিজ্য নীতিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় : (ক) আমদানি নীতি ও (খ) রপ্তানি নীতি। বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের মাধ্যমে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ (Control Over Foreign Trade) :

নিয়ন্ত্রণের কারণসমূহ (Causes of Control) :

(১) **স্বয়ং-সম্পূর্ণতা**—অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, শিল্প-সংরক্ষণ, নূতন শিল্প স্থাপন, পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ প্রভৃতি কারণে আমদানি-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

(২) **প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ**—সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন, মূল্যবান খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

(৩) **বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ**—আমদানি-নিয়ন্ত্রণের ফলে কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে উহার উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৪) **ক্ষুদ্র ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা**—অবাধ আমদানি-নীতি ক্ষুদ্র ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থের পরিপন্থী। ক্ষুদ্র ও দেশীয় শিল্প প্রসারের জন্য আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

(৫) **কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ**—আমদানি-নিয়ন্ত্রণের ফলে নূতন নূতন দেশীয় শিল্প স্থাপিত হয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

(৬) **আমদানি রপ্তানি ভারসাম্য**—আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারসাম্য (Balance) রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

(৭) **জাতীয় নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা**—জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-সংস্থাপনে উৎসাহিত হইবার জন্য আমদানি-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

(৮) **পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির সাফল্য**—পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

নিয়ন্ত্রণ সংগঠন (Control Organisation) :

বৈদেশিক ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংগঠনে সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য-বিভাগ, শুল্ক বিভাগ এবং বন্দর-কর্তৃপক্ষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি এবং আমদানি-রপ্তানি-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করেন এবং তৎপরে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণকারী (Controller of Imports and Exports) অনুমতি-পত্র (Licence) প্রদান করেন। উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council) কেন্দ্রীয় সরকারকে নীতি-নির্ধারণে সাহায্য করেন।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Import and Export Duties) আদায় এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে দেশের শুল্ক বিভাগ (Customs Authority) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বন্দর-কর্তৃপক্ষ (Port Authorities) শুল্ক আদায় এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে শুল্ক-বিভাগকে বিশেষ সাহায্য করে।

আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ (Methods of Import-Export Control) :

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রতিকূল অবস্থার জন্য পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করে। নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরোপ করা হয় :

(ক) **আমদানি বরাদ্দ ও অনুমতিপত্র (Import Quota and Licence) :** কোন দেশের সরকার কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ দ্রব্য আমদানি ও কত পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন।

সরকারী নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য সরকার 'আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক' (Controller of Imports and Exports)-এর মাধ্যমে আমদানিকারী ও রপ্তানিকারীকে অনুমতিপত্র (Licence) প্রদান করেন। অনুমতিপত্র দুই প্রকারের : মুক্ত সাধারণ অনুমতিপত্র (Open General Licence or OGL) এবং সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত অনুমতিপত্র (Restricted Licence)। প্রথম ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানি অথবা রপ্তানির মুক্ত অনুমতিপত্র যে কোন আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারককে দেওয়া হয় ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুমতিপত্র কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি অথবা রপ্তানি করিবার জন্য দেওয়া হয়। পণ্যের প্রকৃত ব্যবহারকারী, পুরাতন ও নূতন আমদানি ও রপ্তানিকারীকে জাতীয় স্বার্থে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। অনুমতি-পত্র প্রদানের নীতি বৎসরে একবার পর্যালোচনা করা হয়।

(খ) **নিষিদ্ধকরণ (Prohibition) :** জাতীয় স্বার্থে অবাঞ্ছিত বৈদেশিক পণ্যের আমদানি এবং গুরুত্বপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ দেশীয় পণ্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া আমদানি অথবা রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়।

(গ) **বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ (Foreign Exchange Control) :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সীমাবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সরকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণকারী। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে থাকিয়া বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করে। বিনিময়-হারের স্থায়িত্ব (Stability in Exchange Rate), স্বর্ণ ও মূলধনী রপ্তানি বন্ধ এবং অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ঘ) **বাণিজ্য-শুল্ক (Customs Duty) :** রাজস্ব সংগ্রহ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থমূল্যের স্থায়িত্ব এবং শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার আমদানি ও রপ্তানির উপর বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য করেন। প্রয়োজনবোধে শুল্কের পরিমাণ হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করিয়া আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ঙ) **বাণিজ্য-চুক্তি (Trade Agreement) :** দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

(চ) **পক্ষপাতমূলক আচরণ (Preferential Treatment) :** বাণিজ্য-চুক্তির দ্বারা দুই বা ততোধিক দেশ পারস্পরিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে ; যেমন, শুল্কছাড়, শুল্কহ্রাস ইত্যাদি। ইউরোপীয় কমন মার্কেটভুক্ত দেশসমূহ যেমন, ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস, লুক্সেমবার্গ ও ইংলণ্ড নিজেদের মধ্যে আমদানি-শুল্ক এবং নিষেধ বা কোটা-ব্যবস্থাকে অপসারণ এবং অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) প্রবর্তন করিয়াছে।

(ছ) **বহির্বাণিজ্যে সরকারী সংস্থা (State Trading in Foreign Trade) :** বহির্বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সরকারী সংস্থার প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকারী সংস্থা, যেমন, ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corporation of India) আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণরূপে এবং ধনতান্ত্রিক দেশে আংশিকরূপে সরকারী সংস্থার দ্বারা বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

আমদানি-বাণিজ্যের সংগঠন (Import Organisation) :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জটিলতার দরুন আমদানি-বাণিজ্যের সংগঠনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইহারা আমদানিকারী ও রপ্তানিকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। আমদানি সংগঠনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিদ্যমান :

(১) বাজার অনুসন্ধান কার্যে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(২) জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহণ-সংস্থা।

(৩) দস্তুরি প্রতিনিধি (Commission Agent), দালাল (Broker) এবং পণ্যোৎপাদনকারীর প্রতিনিধি (Manufacturer's Agent)।

(৪) বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ (Exchange Banks) এবং অন্যান্য অর্থসংস্থানকারী সংস্থা (Finance Houses)।

(৫) বীমাকারী (Insurer)।

(৬) গুদামকারী (Warehouser) ও পণ্যখালাসী প্রতিনিধি (Clearing Agent)।

(৭) পণ্য-প্রাপক বা চালানী-গ্রাহক (Consignee), পাইকারী ও খুচরা কারবারী (Wholesaler and Retailer)।

বর্তমানে আমদানি সংগঠনে বৃহৎ সংস্থাসমূহ উপরোক্ত কোন মধ্যস্থ কারবারীর সহযোগিতা গ্রহণ না করিয়া নিজেরাই আমদানি-পদ্ধতির সকল প্রকার কার্য পরিচালনা করে। ইহার আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইহাদের শাখা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

আধুনিক আমদানি ব্যবসায়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই আমদানি নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু করিয়াছে। ইউরোপীয় কমন মার্কেটভুক্ত দেশসমূহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

বর্তমানে আমদানি সংগঠনে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল রাষ্ট্রীয় সংস্থার অনুপ্রবেশ। ভারতে বহুমুখী কর্পোরেশন (Multipurpose Corporation), সরকারী কোম্পানী (Government Company) এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation of India) আমদানি-বাণিজ্যের সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

আমদানি সংগঠনে যুক্ত আমদানিকারিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :

(১) **প্রত্যক্ষ আমদানিকারী (Direct Importers) :** উৎপাদনকারী (Manufacturer) নিজে অথবা পণ্যের বিক্রয়কারী (Seller) সরাসরি ফরমাশপত্র (Indent) প্রেরণ করিয়া নিজেদের নামে পণ্য আমদানি করিলে, উহাকে প্রত্যক্ষ আমদানিকারী বলা হয়।

(২) **মধ্যস্থ আমদানি ব্যবসায়ী (Import Intermediaries) :** ইহারা প্রকৃত আমদানিকারী ও বিদেশস্থ কারবারীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং রপ্তানিকারকের নিকট ফরমাশপত্র প্রেরণ করিয়া আমদানিকারকের নামে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করে।

ফরমাশী আমদানি ব্যবসা (Indent Trade) :

আমদানি ব্যবসায়ে মধ্যবর্তী কারবারী হিসাবে ফরমাশী আমদানি প্রতিষ্ঠান আমদানি ব্যবসা সংগঠনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ফরমাশী আমদানি প্রতিষ্ঠান (Indent Firm or Indent House) বলে। ইহারা আমদানি বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ এবং ছোট ছোট আমদানিকারীর বিশেষ সহায়ক। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ইহাদের নিকট ফরমাশপত্র দেয় এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহ হয় নিজেদের নামে পণ্য আমদানি করিয়া উহা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিয়া মুনাফা করে, অথবা ক্রেতার নামেই বিদেশী রপ্তানিকারীর নিকট হইতে পণ্য আমদানি করে এবং দস্তুরি (Commission) পায়।

ক্রেতা ফরমাশপত্রে (Indent) পণ্যের নাম, বিবরণ, শ্রেণী, পরিমাণ, মূল্য, উভয় পক্ষের দায় দায়িত্ব, দস্তুরির হার, সরবরাহের সময় ও তারিখ প্রভৃতির নির্দেশ দেয়। ফরমাশপত্র গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ফরমাশগ্রহীতা (Indentee) ফরমাশদাতাকে (Indentor) ফরমাশ গ্রহণ অথবা বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায় এবং ছয় মাসের মধ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করিবার ব্যবস্থা করে। যে ক্ষেত্রে ফরমাশগ্রহীতা ফরমাশদাতার নামে পণ্য ক্রয় করে, সেইক্ষেত্রে ফরমাশগ্রহীতা বন্দরে পণ্য পৌছাইবার পর আমদানি-সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি ফরমাশদাতার নিকট প্রেরণ করে। ইহার পর ফরমাশদাতা পণ্য খালাস করে। যদি ফরমাশমাফিক দ্রব্য না পায় তবে ১৪ দিনের মধ্যে ফরমাশদাতা ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে।

রপ্তানি সংগঠন (Export Organisation) :

আমদানি ব্যবসায়ের সংগঠনের মত রপ্তানি ব্যবসা সংগঠনেও বাজার অনুসন্ধানে লিপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহণকারী, দস্তুরি প্রতিনিধি, দালাল, পণ্যোৎপাদনকারী প্রতিনিধি, বিনিময় ব্যাঙ্ক, বীমাকারী, গুদামকারী, পণ্যখালাসী প্রতিনিধি, চালানগ্রহীতা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুই প্রকারের রপ্তানিকারী রপ্তানি ব্যবসায়ে নিযুক্ত। প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক সরাসরি বিদেশ হইতে পণ্য রপ্তানি করে। ইহারা পণ্যোৎপাদনকারী (Manufacturer), পণ্য পরিবেশক (Distributor) ও ঠিকাদার (Jobber) হইতে পারে।

পরোক্ষ রপ্তানিকারিগণ মধ্যস্থ কারবারী হিসাবে ক্রেতাগণের জন্য পণ্য রপ্তানি করে। ইহারা রপ্তানিকারক বণিক (Export Marchant) এবং ঠিকাদার (Jobber), রপ্তানি কারবার প্রতিষ্ঠান (Export House), উৎপাদনকারী রপ্তানি প্রতিনিধি (Manufacturer's Export Agent), রপ্তানিকারী দালাল (Export Broker), ইত্যাদি রূপে কাজ করে। এইস্থানে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক (Direct Exporter) :

প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

ক) পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিকারক (Manufacturer Exporter) : পণ্য উৎপাদনকারী নিজেই সরাসরি বিদেশস্থ আমদানিকারকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করে।

(খ) বিদেশস্থ পাইকারী কারবারী অথবা পণ্য সরবরাহকারী (Wholesaler or Distributor) : বিদেশস্থ পাইকারী কারবারীদের মারফত বিদেশে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

(গ) বিদেশস্থ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদার (Import House and Jobber) : বিদেশস্থ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পণ্য বিক্রয় করা যাইতে পারে।

পরোক্ষ রপ্তানিকারক (Indirect Exporter) :

পরোক্ষ রপ্তানিকারকদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

(ক) রপ্তানিকারক কারবারী ও ঠিকাদার (Export Merchant and Jobber) : ইহারা রপ্তানিকারকের নিজ দেশস্থিত একপ্রকার রপ্তানি-বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। ইহারা নিজ দেশের উৎপাদকগণের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহা বিদেশে রপ্তানি করে।

(খ) রপ্তানি কারবার প্রতিষ্ঠান (Export House) : ইহারা রপ্তানিকারকের দেশে আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমদানিকারকের নিকট চালান দেয়। ইহারা প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিবার জন্য দস্তুরি বা কমিশন পাইয়া থাকে।

(গ) রপ্তানি প্রতিনিধি (Manufacturer's Export Agent) : উৎপাদকের প্রতিনিধি হিসাবে ইহারা বিদেশে ক্রেতা সংগ্রহ করে, পণ্য রপ্তানি করে এবং পণ্য বিক্রয় করে। ইহারা উৎপাদকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। ইহারাও দস্তুরি বা কমিশন পাইয়া থাকে।

(ঘ) দেশে বসবাসকারী বিদেশী ক্রেতা (Resident Buyer) : ইহারা রপ্তানিকারকের নিজদেশে আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশের বাজার হইতে অথবা রপ্তানিকারকগণের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহা সরাসরি আমদানিকারকের নিকট চালান দেয়।

(ঙ) রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দালাল (Export and Import Broker) : ইহারা রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মধ্যবর্তী কারবারী হিসাবে কার্য করে। ইহারা দস্তুরি বা কমিশনের পরিবর্তে আমদানিকারকের

নিকট পণ্য রপ্তানি করে। এক একজন দালাল এক-এক প্রকার দ্রব্য রপ্তানিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্য, যেমন, চা, পাট, তুলা, কফি ইত্যাদির কারবার করিয়া থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলাদি
(Documents used in Foreign Trade)

বৈদেশিক বাণিজ্যে নানাবিধ দলিল ব্যবহৃত হয়। এই দলিলগুলি বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রগুলি জানা থাকিলে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা সহজ হয়। সর্বদা ব্যবহৃত দলিলগুলির সংজ্ঞা ও ব্যবহার সম্বন্ধে এই স্থানে আলোচনা করা হইল :

পণ্য বোঝাইয়ের নির্দেশ (Shipping Order) : জাহাজী প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহণ করিতে স্বীকৃত হইলে পণ্য-প্রেরক ও জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি হয় ; উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইলেও জাহাজের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জাহাজে পণ্য বোঝাই করা যায় না। জাহাজের কর্তৃপক্ষ জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত পণ্য জাহাজে বোঝাই করিবার যে লিখিত নির্দেশ দেয়, তাহাকে পণ্য বোঝাইয়ের নির্দেশ (Shipping Order) বলা হয়।

পণ্য-মাশুলের বিল (Freight Bill) : পণ্যবহনের মাশুল আদায় করিবার জন্য জাহাজী প্রতিষ্ঠান পণ্য-প্রেরককে লিখিত মাশুলের হিসাব দিয়া থাকে। এই লিখিত মাশুলের হিসাবকে পণ্য-মাশুলের বিল (Freight Bill) বলে। সাধারণতঃ দ্রব্যের ওজন (Weight) বা স্থান (Space) অনুসারে উহার মাশুল ধার্য হয়। জাহাজে পণ্য প্রেরণ করিবার সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওজনকারীর প্রদত্ত 'ওজনের প্রত্যয়নপত্র' (Certificate of Weighment) অনুযায়ী মাশুল ধার্য করা হয়।

অব্যবহৃত স্থানের পণ্য-মাশুল (Dead Freight) : পণ্য-প্রেরক নির্দিষ্ট আয়তনের স্থান ভাড়া লইবার পর যদি ঐ স্থান সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করিতে পারে তবে জাহাজী কোম্পানী স্বল্পতর হারে অব্যবহৃত স্থানের যে মাশুল নেয়, তাহাই অব্যবহৃত স্থানের পণ্য মাশুল (Dead Freight)।

রেলের রসিদ (Railway Receipt or RR) : পণ্য রেলে পরিবাহিত হইলে এই রসিদের প্রয়োজন হয়। রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবহণের জন্য পণ্য জমা দিলে রেল-কর্তৃপক্ষ এই রসিদ দিয়া থাকে। রসিদে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, প্রাপকের নাম ও ঠিকানা, মাশুলের পরিমাণ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি লিখিত থাকে। রেল রসিদ দ্বারা পরিবাহিত পণ্যের মালিকানা নির্দেশ করা হয়। ইহা হস্তান্তরযোগ্য। রেল রসিদ হস্তান্তর করিয়া পরিবাহিত পণ্যের মালিকানাও হস্তান্তর করা যায়, অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় করা চলে। এই রসিদের আইনসঙ্গত স্বত্বাধিকারী রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পণ্য খালাস করিতে পারে।

বহনপত্র বা চালানী রসিদ (Bill of Lading): জাহাজে পণ্য পরিবাহিত হইলেই এই দলিলটি ব্যবহৃত হয়। জাহাজী কর্তৃপক্ষ পণ্য-প্রেরককে পরিবাহিত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, প্রেরক ও প্রাপকের নাম-ঠিকানা এবং প্রদেয় মাশুলের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া প্রেরককে একখানি রসিদ দিয়া থাকে। এই রসিদখানিই বহনপত্র বা চালানী রসিদ (Bill of Lading) নামে পরিচিত। **ইহা পরিবাহিত পণ্যের মালিকানা নির্দেশ করে। ইহা হস্তান্তরযোগ্য এবং ইহার আইনসঙ্গত স্বত্বাধিকারী জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পণ্যের দখল লইতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যে বহনপত্র হস্তান্তর দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হয়।**

পরিবহণের মাশুল পণ্য-প্রেরক (Consignor) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কিংবা পণ্য-প্রাপক (Consignee) প্রদান করিবে তাহা বহনপত্রের উপর লিখিত থাকে। পণ্যের মাশুল পণ্য-প্রেরক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে বহনপত্রের উপর **মাশুল প্রদত্ত** (Freight Paid) লিখিত হয়। কিন্তু মাশুল যদি পণ্য-প্রাপক কর্তৃক প্রদেয় হয়, তাহা হইলে বহনপত্রে **মাশুল প্রদেয়** (Freight Not Paid or Freight Forward) এই কথাটি লিখিত থাকে।

বহনপত্রে পরিবাহিত পণ্যের কোন দোষ-ত্রুটি আছে কিনা এবং মোড়কে কোন ত্রুটি আছে কিনা তাহার উল্লেখ করিতে হয়। যদি পণ্যে বা মোড়কে কোন ত্রুটি না থাকে তাহা হইলে এই প্রকার বহনপত্রকে **নির্দোষ বহনপত্র** (Clean Bill of Lading) বলে। কিন্তু পণ্যে বা মোড়কে কোন ত্রুটি থাকিলে বহনপত্রটিকে **ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র** (Foul Bill of Lading) বলে।

বহনপত্র হস্তান্তরিত করিয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলে বলিয়া ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বহনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে :

(১) জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নাম; (২) জাহাজের নাম; (৩) যে বন্দরে পণ্য বোঝাই করা হয়, যে বন্দরে পণ্য খালাস করা হইবে এবং জাহাজের গন্তব্যস্থল—ইহাদের নাম; (৪) পরিবাহিত পণ্যের বিবরণ, (৫) মাশুলের পরিমাণ; (৬) পণ্য-প্রাপকের নাম এবং (৭) সন ও তারিখ।

বহনপত্রের কার্যাবলী (Purposes of Bill of Lading): বহনপত্র বিভিন্ন প্রকার কার্য করে। এই কার্যসমূহ হইল :

(১) ইহা জাহাজে পণ্যবহনের প্রমাণপত্র। পণ্য-প্রেরক জাহাজে পণ্য তুলিবার পর জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট হইতে পণ্যবহনের যে রসিদ বা পত্র পায়, উহা পণ্য-বহনের চুক্তি (Contract of Affreightment)।

(২) ইহা পণ্যবহনের জন্য **পণ্যগ্রহণের স্বীকারোক্তি-সম্বলিত একটি পাকা রসিদ** (Official Acknowledgement)।

(৩) ইহাকে **স্বত্ব-নির্ণায়ক দলিলরূপে** (Document of Title) গণ্য করা হয়।

(৪) ইহা পণ্যবহন চুক্তির **অস্তিত্ব ও শর্তাবলী** নির্দেশ করে।

(৫) ইহা **অর্ধ-হস্তান্তরযোগ্য দলিল** (Quasi-Negotiable Instrument)। স্বত্বান্তরকরণের (Endorsement) সাহায্যে ইহা হস্তান্তর করা যায়।

(৬) ইহা **পণ্যখালাসের মূল দলিল** (Basis for Delivery of Goods)। আমদানিকারী জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট বহনপত্র স্বত্বান্তর করিলে তবেই জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা যাইবে।

চালান (Invoice) ঃ বিক্রেতা যখন ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ করে তখন পণ্যের সহিত ইহার বিশদ বিবরণ, সংখ্যা বা পরিমাণ, মূল্য এবং মোড়কের বিবরণ লিখিয়া একখানি বিবরণী দিয়া থাকে। উহাকে চালান (Invoice) বলা হয়। ক্রেতা চালানে লিখিত পণ্যের সহিত প্রেরিত পণ্য মিলাইয়া দেখে। চালানে ভুল থাকিলে উহা সত্বর সংশোধন করাইয়া লইতে হয়।

ক্রয় চিঠা ও বিক্রয় চিঠা (Bought Note and Sold Note) ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মৌখিক চুক্তি হইলে ভবিষ্যতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইতে পারে। মৌখিক চুক্তি হইবার পর ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই পরস্পরকে লিখিত বিবরণী দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়বস্তু ও শর্তাদি জানাইয়া দেয়। এই বিবরণীতে পণ্যের বিশদ বিবরণ, পরিমাণ, মূল্যপ্রদানের শর্ত ইত্যাদি লিখিত থাকে। ক্রেতা বিক্রেতাকে যে বিবরণ প্রেরণ করে, উহা **ক্রয় চিঠা** (Bought Note) এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে যে বিবরণ প্রেরণ করে, উহা **বিক্রয় চিঠা** (Sold Note) বলিয়া পরিচিত।

নমুনা চালান (Proforma Invoice) ঃ প্রকৃতপক্ষে ইহা চালান নহে, কিন্তু চালানে যে বিষয়বস্তুর উল্লেখ থাকে ইহাতেও তাহারই উল্লেখ থাকে। এইজন্য ইহাকে 'নমুনা চালান' বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইবার পর পণ্য প্রেরণের সময় চালান পাঠান হয়। কিন্তু নমুনা চালান পণ্য বিক্রয়ের এবং প্রেরণের পূর্বেই পাঠান হয়। চালানের মতই ইহাতে দ্রব্যের বিশদ বিবরণ, পরিমাণ, দর, মোড়কের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকে। তবে চালানে যে দর উল্লেখ থাকে উহা চুক্তিকৃত দর। নমুনা চালানে যে দরের উল্লেখ করা হয়, উহা প্রকৃত দর নহে, উহা দরের আভাস মাত্র। নমুনা চালান নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবহার করা হয়—(১) অপরিচিত ক্রেতার নিকট হইতে পণ্য প্রেরণের পূর্বেই মূল্য আদায় করিবার জন্য নমুনা চালান পাঠান হয়। (২) রপ্তানিকারক পণ্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক নিরূপণ করাইবার জন্য শুল্ক-অফিসে নমুনা চালান পাঠাইয়া থাকে। (৩) চালানী কারবারে (Consignment Business) চালানী পণ্য-প্রাপকের (Consignee) নিকট ইহা পাঠাইয়া তাহাকে পণ্যের মূল্যের আভাস দেওয়া হয়। (৪) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিলে বিক্রেতা সম্ভাব্য ক্রেতাকে নমুনা চালান পাঠাইয়া পণ্যের মূল্যের আভাস দেয়।

প্রভবলেখ (Certificate of Origin) ঃ আমদানিকারকের নিকট ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অনেক আমদানিকারকের দেশ আমদানি-শুল্ক বিষয়ে বৈষম্যমূলক

নীতি গ্রহণ করে। একই পণ্যের উপর একই হারে আমদানি-শুল্ক ধার্য হয় না। বিশেষ কোন দেশে উৎপাদিত পণ্যের উপর আমদানি-শুল্কের হার অপেক্ষাকৃত কম হইতে পারে। সুতরাং পণ্যটি যে সেই বিশেষ দেশেই উৎপাদিত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে আমদানিকারক শুল্ক-সম্বন্ধায় এই সুবিধা দাবী করিতে পারে না। পণ্যের উৎপত্তিস্থল প্রমাণক প্রত্যয়নপত্রকে প্রভবলেখ (Certificate of Origin) বলে। রপ্তানিকারকের দেশে নিযুক্ত ও অবস্থানকারী আমদানিকারকের দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি অথবা চেম্বার অফ্ কমার্সের সচিব অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই প্রত্যয়ন দেওয়া হয়। প্রভবলেখ আমদানিকারকের দেশের শুল্ক-বিভাগকে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে শুল্ক ধার্যে সহায়তা করে। রপ্তানিকারক ইহা আমদানিকারককে প্রেরিত পণ্যের সহিত পাঠাইয়া থাকে।

বাণিজ্য-দূতের প্রত্যয়িত চালান (Consular Invoice): আমদানি-শুল্ক নির্ধারণে কোন কোন দেশ রপ্তানিকারকের দেশস্থিত তাহাদের বাণিজ্য-দূত কর্তৃক প্রত্যয়িত চালান দাবী করে। এইরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে তাহার নিজ দেশস্থিত আমদানিকারক দেশের বাণিজ্য-দূত কর্তৃক চালান প্রত্যয়িত করাইতে হয়। ইহাতে চালানের সত্যতা প্রত্যয়িত হয়। প্রত্যয়নের জন্য চালানপত্র উক্ত বাণিজ্য-দূতের দপ্তরে পেশ করিতে হয় এবং বাণিজ্য-দূতকে নির্দিষ্ট দর্শনী বা দেয়ক (Fee) দিতে হয়। বাণিজ্য-দূতের প্রত্যয়নের নিদর্শন হিসাবে বাণিজ্য-দূত চালানে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। ইহাই বাণিজ্য-দূতের প্রত্যয়িত চালান (Consular Invoice)।

জাহাজী বিবরণ (Ship's Report or Ship's Import Manifest):

পণ্যবোঝাই জাহাজ বিদেশ হইতে বন্দরে আসিয়া নোঙর করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্ক-কর্তৃপক্ষের নিকট জাহাজে বাহিত সমস্ত পণ্য এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশদ বিবরণ-সম্বলিত একটি বিবৃতি দাখিল করিতে হয়। ইহাই 'জাহাজী বিবরণ' বলিয়া পরিচিত। প্রয়োজন বোধ করিলে শুল্ক-কর্তৃপক্ষ জাহাজী বিবরণে লিখিত পণ্য চাক্ষুষ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। জাহাজী বিবরণে উল্লেখ নাই এমন কোন পণ্য জাহাজে পাওয়া গেলে উহা শুল্ক কর্তৃপক্ষ আটক করেন।

জাহাজী বিবরণ দাখিল করিবার পূর্বে জাহাজ হইতে কোন পণ্য খালাস করা যায় না অথবা জাহাজে আনীত পণ্য খোলা যায় না। অসত্য বিবৃতি দাখিল করিলে জাহাজের অধ্যক্ষকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

জাহাজী বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিবরণসমূহের উল্লেখ থাকে:

(১) জাহাজের নাম, (২) যে দেশের জাহাজ সেই দেশের নাম; (৩) যে বন্দরে নিবন্ধন হইয়াছে; (৪) কোন্ বন্দর হইতে আগত; (৫) অধ্যক্ষের নাম; (৬) যাত্রীদের সংখ্যা; (৭) লস্করদের সংখ্যা; (৮) পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ; (৯) মোড়কের সংখ্যা; (১০) পণ্য-প্রাপকের নাম; (১১) জাহাজের অধ্যক্ষ ও লস্করদের নিজ-ব্যবহার্য শুল্ক-প্রদেয় পণ্যের তালিকা।

আগমপত্র বা শুল্ক চালান (Bill of Entry or Customs Challan) ঃ ইহা আমদানিকারক অথবা তাহার প্রতিনিধিকে শুল্ক-কর্তৃপক্ষের দপ্তরে দাখিল করিতে হয়। পণ্যসমেত জাহাজ বন্দরে নোঙর করিলে আমদানিকারক অথবা তাহার প্রতিনিধিকে আমদানিকৃত পণ্যের বিশদ বিষয়-সম্বলিত যে বিবরণটি শুল্ক-কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয়, তাহাকে আগমপত্র বা শুল্ক চালান (Bill of Entry or Customs Challan) বলে। শুল্ক-কর্তৃপক্ষ এই বিবরণী পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিলে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করিতে পারা যায়।

অজ্ঞাত আমদানি পণ্যদ্রব্য (Bill of Sight) ঃ আমদানিকারক রপ্তানিকারকের নিকট হইতে চালান অথবা বহনপত্র না পাইলে আমদানিকৃত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে পারে না। চালান অথবা বহনপত্র প্রাপ্তির পূর্বেই যদি জাহাজ বন্দরে নোঙর করে তাহা হইলে আমদানিকারক আগমপত্র শুল্ক চালান পূরণ না করিয়া একটি বিবৃতি দিয়া থাকে। ইহাতে বলা হয় যে, পণ্য না দেখিয়া উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে ঐ বিবৃতিতে আমদানিকৃত পণ্যের একটি মোটামুটি বিবৃতি দিতে হয়। এই বিবৃতিকে অজ্ঞাত আমদানি পণ্যদ্রব্য (Bill of Sight) বলা হয়

ডক রসিদ (Dock Receipt) ঃ রপ্তানিকারক রপ্তানিদ্রব্য জাহাজে বোঝাই করিবার জন্য ডক-কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখিলে ডক-কর্তৃপক্ষ একখানি কাঁচা রসিদ দেয়। উহাই ডক রসিদ। জাহাজী কর্তৃপক্ষের নিকট ডক রসিদ দাখিল করিয়া বহনপত্র লওয়া হয়।

মেট রসিদ (Mate's Receipt) ঃ ডক-কর্তৃপক্ষের নিকট রপ্তানি পণ্য জমা না রাখিয়া জাহাজী প্রতিষ্ঠানের কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর জিম্মায়ও পণ্য রাখা যায়। এইক্ষেত্রে জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একখানি কাঁচা রসিদ দিয়া থাকে। উহাই মেট রসিদ। মেট রসিদ দেখাইয়া জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বহনপত্র লইতে হয়।

দলিলী হুণ্ডি বা সদলিল হুণ্ডি (Documentary Bill) ঃ রপ্তানিকারক পণ্যমূল্য আদায়ের জন্য বহনপত্র, চালান, প্রভবলেখ, বাণিজ্য-দূত প্রত্যয়িত চালান, বীমাপত্র ইত্যাদিসহ একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র (Bill of Exchange) নিজ ব্যাঙ্কের মারফত আমদানিকারকের নিকট পাঠায়। ইহাকে দলিলী হুণ্ডি বা সদলিল হুণ্ডি বলা হয়।

দলিলী হুণ্ডি বা সদলিল হুণ্ডি **দুই প্রকারের ঃ স্বীকার-সাপেক্ষ হুণ্ডি** (D/A Bill or Documents against Acceptance of Bill) ও **মূল্যপ্রদান-সাপেক্ষ হুণ্ডি** (D/P Bill or Documents against Payment of Bill) । (১) স্বীকার-সাপেক্ষ হুণ্ডি আমদানিকারকের স্বীকৃতির (Acceptance) জন্যই পাঠান হয়। আমদানিকারক কর্তৃক হুণ্ডি স্বীকৃত (Accepted) হইলে তাহাকে বহনপত্র ইত্যাদি দলিলগুলি দেওয়া হয়। (২) মূল্যপ্রদান-সাপেক্ষ হুণ্ডি হইলে হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ পরিশোধের পর আমদানিকারককে সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ প্রদান করা হয়।

জিম্মা রসিদ বা হেপাজতি রসিদ (Trust Receipt) ঃ ঋণের প্রয়োজন হইলে আমদানিকারক জাহাজী দলিলসমূহ (Shipping Documents) এবং পণ্যের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণক দলিলাদি ব্যাঙ্কের নিকট হস্তান্তর করিয়া ঋণ গ্রহণ করে। পরে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করিবার জন্য ব্যাঙ্ককে একখানি রসিদ প্রদান করিয়া উক্ত জাহাজী দলিলসমূহ গ্রহণ করে। এই রসিদকে জিম্মা রসিদ বলে। পরে আমদানিকারক পণ্য বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে। জিম্মা রসিদ বলিবার তাৎপর্য এই যে, যতদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ না হয় ততদিন পণ্যের মালিকানা থাকে ব্যাঙ্কের, আর আমদানিকারক ব্যাঙ্কের পণ্যের জিম্মাদার হিসাবে কাজ করে। জিম্মা রসিদে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ থাকে :

(১) পণ্যের মালিকানা থাকে ব্যাঙ্কের, আমদানিকারক জিম্মাদার মাত্র।

(২) আমদানিকারকের গুদামে ঐ পণ্যগুলি থাকিলেও উহা আমদানিকারকের অন্যান্য পণ্য হইতে পৃথকভাবে রাখিতে হয়।

(৩) পণ্যগুলি ব্যাঙ্কের নামে বীমা করিতে হয় এবং বীমাপত্রখানি (Policy) ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়।

(৪) জিম্মা রসিদ বাতিল করিয়া পণ্যের দখল লইবার অধিকার ব্যাঙ্কের আছে।

(৫) ব্যাঙ্ক চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করিলেও তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না।*

বন্ধকপত্র বা রেহননামা (Letter of Hypothecation) : ব্যাঙ্ক অথবা কোন ঋণদাতা প্রয়োজন হইলে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণের অর্থ আদায় করিবার পূর্বস্বত্ব (Lien) রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে যে পত্র আদায় করে, তাহাকে বন্ধকপত্র বা রেহননামা (Letter of Hypothecation) বলে। রপ্তানিকারক সদলিল হুণ্ডি বা দলিলী হুণ্ডি ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক আমদানিকারকের নিকট হইতে প্রদত্ত অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ হইলে এই পত্রের বলে পত্রে লিখিত পণ্য বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধিত না হইলে ঘাটতি পাওনা রপ্তানিকারকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই পত্র দ্বারা ঋণদাতার ঋণ অনাদায়ের সম্ভাবনা কাটিয়া যায়।

পণ্য-মাশুলের বিল (Freight Bill Note) ঃ পণ্য-মাশুল-সংক্রান্ত লিখিত হিসাব, যাহা জাহাজী কোম্পানী পণ্য-প্রেরকের নিকট দাখিল করে, উহাকে পণ্যমাশুলের বিল বলে।

পরিদর্শনী (Primage) ঃ জাহাজে পণ্য বোঝাই ও খালাস করিবার জন্য যে মূল্য (Charge) প্রদান করা হয়, তাহাই পরিদর্শনী। ইহা সাধারণতঃ পণ্য-শুল্কের শতকরা দশ ভাগ হিসাবে দিতে হয়।

সংরক্ষিত দিন (Lay Days) ঃ পণ্য বোঝাই ও পণ্য খালাসের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিকে 'লে ডেজ' বা সংরক্ষিত দিন বলা হয়।

মাল খালাসে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ (Demurrage) : জাহাজ, বিমান, রেলপথ অথবা অন্যান্য পরিবহণ হইতে মাল খালাসের বিলম্বের জন্য যে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়, তাহাই বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ।

সত্বর পণ্য খালাস অর্থ (Despatch Money) : চুক্তি-নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যদি জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পুরস্কার-বাবদ জাহাজী কোম্পানী যে অর্থ প্রদান করে, তাহাকে সত্বর পণ্য খালাস অর্থ বলে।

বাণিজ্য হুণ্ডি (Bill of Exchange) : নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার শর্ত-নিরপেক্ষ নির্দেশপত্রকে বাণিজ্য হুণ্ডি বলে। রপ্তানিকারক এইরূপ দলিল প্রস্তুত করে এবং যে ব্যাঙ্ক 'ঋণের প্রত্যয়নপত্র' দেয় তাহার নিকট হইতে বিলটি বাট্টা (Discount) করিয়া লয়।

শুল্ক-বিভাগীয় চালান (Customs House Challan) : পণ্য জাহাজে বোঝাই করিবার পূর্বে শুল্ক বিভাগীয় কালেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হয়। ইহাই শুল্ক-বিভাগীয় চালান।

জাহাজী বিল (Shipping Bill) : পণ্য জাহাজে তুলিবার পূর্বে রপ্তানিকারক পণ্যের বিশদ বিবরণ, যেমন, বিশেষ চিহ্ন পরিমাণ, মূল্য, প্রেরিত দেশের নাম, জাহাজের নাম, পণ্যখালাসী বন্দরের নাম ইত্যাদিসহ জাহাজী বিল প্রস্তুত করে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া শুল্ক-বিভাগ রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করে। ইহার প্রপত্র (Form) শুল্ক অফিসে পাওয়া যায়। রপ্তানিকারীকে ইহার তিনটি কপি প্রস্তুত করিতে হয়।

ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Letter of Credit or L/C) : ঋণের প্রত্যয়নপত্র একটি আদেশপত্র, যাহা আমদানিকারকের দেশের ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রদান করে এবং যাহা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, রপ্তানিকারক আমদানিকারকের উপর পত্রে নির্দেশিত পরিমাণ পর্যন্ত লিখিত অর্থের বাণিজ্য হুণ্ডি কাটিয়া তাহা ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপন করিলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক উহা সম্মানিত হইবে (A letter of credit is a letter containing an undertaking that bill of exchange drawn by the exporter upon the importer upto the amount specified therein will be honoured by the bank on presentation)। আমদানিকারকের পক্ষ হইতে বিদেশস্থ ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্যপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে পত্র প্রদান করে, তাহাই ঋণের প্রত্যয়নপত্র। রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট হইতে পণ্যের মূল্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিবার জন্য তাহার নিজের ব্যাঙ্ক অথবা কোন সুপরিচিত ব্যাঙ্কের নিকট পণ্যের মূল্যের এক অংশ জমা রাখিতে আমদানিকারককে নির্দেশ দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক বিক্রেতাকে উদ্দেশ্য করিয়া একখানা আদেশপত্র দেয় যে, বিক্রেতা কর্তৃক লিখিত হুণ্ডির অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য বিক্রেতার নামে তাহাদের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আমানত করিয়া হিসাব খোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের এই আদেশপত্রকে ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Letter of Credit) বলে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এইরূপ

শর্ত থাকিলে বিক্রেতা ঋণের প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী ব্যাঙ্কের উপর হুণ্ডি লিখিতে পারে। ঋণের প্রত্যয়নপত্রের ফলে রপ্তানিকারক ব্যাঙ্ককে জানে এবং ব্যাঙ্ক আমদানিকারককে জানে, ফলে আস্থার সহিত ব্যবসা চলিতে পারে। ঋণের প্রত্যয়নপত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ইহা রপ্তানিকারীকে পণ্যের মূল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট হইতে দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশপত্র পাইলে, ফরমাশপত্র অনুসারে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে রাজী থাকিলে আমদানিকারককে তাহার দেশে রপ্তানিকারকের নামে তাহার পরিচিত কোনও ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া নির্দিষ্ট অর্থ জমা রাখিতে নির্দেশ দেয়। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের নির্দেশ অনুসারে ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিলে ব্যাঙ্ক ঋণের প্রত্যয়নপত্র দিয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য এই যে, রপ্তানিকারকের নামে ঋণের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হইলে রপ্তানিকারক ঋণ প্রত্যয়নপত্রদাতা ব্যাঙ্কের নামেই বাণিজ্যিক হুণ্ডি লিখিয়া থাকে এবং রপ্তানিকৃত দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ, যথা বহনপত্র (Bill of Lading), চালানপত্র (Invoice), বীমাপত্র (Insurance Policy) ইত্যাদি উহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু রপ্তানিকারক ঐ হুণ্ডির মূল্য আদায় হইবার পূর্বেই পণ্যের বিক্রয়মূল্য আদায় করিতে পারে। সে ঐ হুণ্ডি ও দলিলাদি তাহার দেশের কোনও ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ ঋণ দেয়। অবশ্য রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যাঙ্কের পূর্বস্বত্ব (Lien) বক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ককে একখানি পত্র দেয়। উহাকে বন্ধকীপত্র বা বেহননামা (Letter of Hypothecation) বলে। যদি আমদানিকারক সম্পূর্ণ মূল্য শোধ না করে তবে ব্যাঙ্ক আমদানিকারকের দেশে তাহার প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক মারফত বন্ধকীপত্রের বলে আমদানিকৃত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মূল্য আদায় করে। ব্যাঙ্ক আমদানিকারকের দেশে ঋণ প্রত্যয়নপত্রদাতা ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও দলিলসমূহ পাঠাইয়া দেয়। পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় দিয়া নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমদানিকারক দলিলসমূহ সংগ্রহ করে এবং জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পণ্য খালাস করিবার বন্দোবস্ত করে। ঋণের প্রত্যয়নপত্র দুই শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—

(ক) **বাণিজ্যিক প্রত্যয়নপত্র (Commercial Letter of Credit or Commercial L/C) :** এইরূপ প্রত্যয়নপত্র ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনে ব্যবহৃত হয়। ইহা নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে :

(১) **প্রত্যাহারযোগ্য ঋণ প্রত্যয়নপত্র (Revocable L/C)**—এইরূপ প্রত্যয়নপত্র ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত প্রত্যাহার করিতে পারে ও রপ্তানিকারীকে ইহা জানাইয়া দেয়।

(২) **অ-প্রত্যাহারযোগ্য ঋণ প্রত্যয়নপত্র (Irrevocable L/C)**—এইরূপ প্রত্যয়নপত্র যাহার নামে দেওয়া হয় তাহার অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাহার করা যায় না।

ঋণের প্রত্যয়নপত্র
(Letter of Credit)

- বাণিজ্যিক ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Commercial Letter of Credit)
  - প্রত্যাহারযোগ্য (Revocable)
  - অ-প্রত্যাহারযোগ্য (Irrevocable)
  - দলিল-সাপেক্ষ (Documentary)
  - শর্তবিহীন (Clean)
  - আবর্তমান (Circular)
  - নির্দিষ্ট (Fixed)
- অ-বাণিজ্যিক ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Non-Commercial Letter of Credit)
  - ভ্রমণকারীর ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Traveller's L/C)
  - ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's Cheque)
  - সারকুলার নোট (Circular Note)

(৩) **দলিল-সাপেক্ষ ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Documentary Letter of Credit or Documentary L/C)**—এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে পণ্যের দলিলপত্রাদি সংযুক্ত হুণ্ডি ক্রেতা ব্যাঙ্কের স্বীকৃতির (Acceptance) জন্য প্রেরণ করিতে হয়।

(৪) **শর্তবিহীন ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Clean L/C)**—এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে হুণ্ডির সহিত কোন প্রকার দলিলপত্র দাখিল করিতে হয় না।

(৫) **আবর্তমান ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Circular or Revolving L/C)**—যে ক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একাদিক্রমে বারংবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কতকগুলি শর্তের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ বারংবার ব্যবহারের সুযোগ দেয়। একটি লেনদেন (Transaction) সম্পাদনের পরেই উক্ত ঋণ আপনা হইতেই পরবর্তী লেনদেন সম্পাদনের জন্য মঞ্জুর হইয়া যায়। এইরূপ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের বার বার ঋণ প্রত্যয়ন মঞ্জুরের কষ্ট লাঘব এবং সময় সাশ্রয় হয়।

(৬) **নির্দিষ্ট ঋণ প্রত্যয়নপত্র (Fixed L/C)**—এইরূপ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী একটি লেনদেন (Transaction) সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পায়।

(খ) **অ-বাণিজ্যিক ঋণ প্রত্যয়নপত্র (Non-Commercial L/C)** : এইরূপ প্রত্যয়নপত্র ব্যবসায়-সংক্রান্ত নহে। ইহা নিম্নলিখিত শ্রেণীর হইতে পারে :

(১) **ভ্রমণকারীর ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Traveller's L/C)**—এইরূপ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারিগণকে সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাঙ্ক তাহার অন্য স্থানে অবস্থিত শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্ককে উক্ত ভ্রমণকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করিবার আদেশ দিয়া যে পত্র দেয়, তাহাকে ভ্রমণকারীর ঋণের প্রত্যয়নপত্র বলে। ভ্রমণকারী প্রয়োজনমত ইহা দেখাইয়া নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ড্রাফটের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তুলিতে পারে।

(২) **ভ্রমণকারীর চেক** (**Traveller's Cheque**)—বড় বড় ব্যাঙ্ক ও **আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী সহায়ক প্রতিষ্ঠান**, যেমন, Thomas Cook & Co. ও American Express Inc—যাহাদের বিভিন্ন স্থানে শাখা ও প্রতিনিধি আছে তাহারা ভ্রমণকারীকে স্থানীয় শাখায় অর্থ জমা দিলে ঐ পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন মূল্যের কুপন ক্রয়ের সুযোগ দেয়। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ভ্রমণকারীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি 'পরিচয়পত্র' (Letter of Introduction) শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীর নিকট দেয়। ভ্রমণকারীকে অর্থ তুলিবার জন্য উক্ত শাখা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সম্মুখে কুপনে স্বাক্ষর করিতে হয় এবং তৎপরে পরিচয়পত্রের স্বাক্ষরের সহিত উহা মিলাইয়া শাখা ব্যাঙ্ক অথবা প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক সমপরিমাণ দেশীয় অথবা বিদেশী মুদ্রা প্রদান করে।

(৩) **সারকুলার নোট** (**Circular Note**)—বৃহৎ ব্যাঙ্ক ভিন্ন দেশে অবস্থিত তাহাদের প্রতিনিধি মারফত বিভিন্ন মূল্যের নোট বিক্রয় করে। ঐ নোটের ক্রেতা ভ্রমণকারী যে কোন শাখা ব্যাঙ্কে বা প্রতিনিধি ব্যাঙ্কে ঐ নোট ভাঙ্গাইয়া নির্দিষ্ট অর্থ তুলিতে পারে।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বা বহিঃশুল্ক এবং আবগারী শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক (Customs Duties and Excise Duties)

শুল্ক (Duty) : সরকার রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য কর (Tax) আদায় করেন। কর দুই প্রকার : **প্রত্যক্ষ কর** (Direct Tax) এবং **পরোক্ষ কর** (Indirect Tax)। **আয়কর** (Income-tax) প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। ভোগ্যদ্রব্যসামগ্রীর উপর যে কর বসান হয় তাহা পরোক্ষ কর। **শুল্ক** (Duty) পরোক্ষ কর। সরকার (Government) আয় বৃদ্ধির জন্য দ্রব্যসামগ্রীর উপর **শুল্ক** আরোপ করিতে পারেন। **শুল্কও** দুই প্রকার—(১) বহিঃশুল্ক বা আমদানি-রপ্তানি **শুল্ক** (Customs Duty) এবং (২) **অন্তঃশুল্ক** বা আবগারী শুল্ক (Excise Duty)।

বহিঃশুল্ক বা আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (**Customs Duty**) **:** বহিঃশুল্ককেও দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) **আমদানি-শুল্ক** (**Import Duty**) এবং (২) **রপ্তানি-শুল্ক** (**Export Duty**)।

আমদানি-শুল্ক ও রপ্তানি-শুল্ক (**Import Duty and Export Duty**) **:**

বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কর বসান হইলে, সেই করকে আমদানি-**শুল্ক** (Import Duty) বলা হয়। নিজদেশে উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করা হইলে উহার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহাকে বলা হয় রপ্তানি-**শুল্ক** (Export Duty)।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়: (১) **সরকারের আয়বৃদ্ধি** (**Revenue**) এবং (২) **শিল্প-সংরক্ষণ** (**Protection**)।

আমদানি-শুল্ক দ্বারা সরকারের দুইটি উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে। বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করা হইলে উহার উপর যদি কর প্রদেয় হয় তাহা হইলে সরকারের আয় হয়। কিন্তু আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা হইলে আমদানিকৃত দ্রব্যের সহিত নিজদেশের শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার শক্তি বাড়ে। ইহাই **সংরক্ষণ নীতি** (**Policy of Protection**)। সুতরাং নিজদেশে বিদেশী দ্রব্যের ভোগ সংকোচ করিয়া শিল্প সম্প্রসারণ করিবার পথ সুগম হয়।

রপ্তানি-শুল্ক দ্বারাও সরকারের আয় হয়। রপ্তানি-শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া রপ্তানি সংকোচ করা হয় এবং রপ্তানি-শুল্কের হার হ্রাস করিয়া রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা করা হয়। রপ্তানি-শুল্কের দ্বারা স্বদেশীয় শিল্প সংরক্ষণ পায় না; উহার দ্বারা বিদেশী শিল্প **সংরক্ষিত** (**Protected**) হয়, অর্থাৎ বিদেশী শিল্পসংস্থা স্বদেশের সরকার কর্তৃক আমদানি-শুল্ক বসান হইলে যে সংরক্ষণ পায়, রপ্তানি-শুল্কের ফলে বিদেশী শিল্পও সেই সংরক্ষণ পায়।

অন্তঃশুল্ক বা আবগারী শুল্ক (**Excise Duty**): দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপর যে কর বসান হয়, তাহাকেই অন্তঃশুল্ক বা আবগারী শুল্ক (Excise Duty) বলে। ভারতে কাপড়, কাগজ, দিয়াশলাই, জুতা প্রভৃতি বহু শিল্পজাত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক দিতে হয়। আবার প্রেক্ষাগার চালাইবার, মদ্য, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লইতে হইলেও কর দিতে হয়, উহাও আবগারী শুল্ক। কেবল সরকারের আয়ের উদ্দেশ্যেই আবগারী শুল্ক বসান হয় না; স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর দ্রব্যাদির ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যেও আবগারী শুল্ক আরোপিত হয়। গাঁজা, আফিম, মদ্য ইত্যাদির উপর আবগারী শুল্ক এই পর্যায়ে পড়ে। আবগারী শুল্কের দরুন এই সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতাগণ ঐ দ্রব্য ভোগে উৎসাহ পায় না। অনেক সময় সরকার ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দিবার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক আরোপ করেন। ভারতে মিলজাত কাপড়ের উপর আবগারী শুল্ক ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

শুল্ক ধার্যের নীতি (**Principles of the Imposition of Duties**):

শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে দুইটি নীতি অনুসৃত হয়—(১) **পরিমাণানুসার বা পরিমাণ-ভিত্তিক** (**Specific**) এবং (২) **মূল্যানুসার বা মূল্য-ভিত্তিক** (**Advalorem**)। দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী শুল্ক ধার্য করা হইলে তাহা পরিমাণানুসার বা পরিমাণ-ভিত্তিক শুল্ক। পরিমাণ বলিতে ওজনের একক-প্রতি, সংখ্যার একক-প্রতি, আয়তনের একক-প্রতি ইত্যাদি বুঝায়। যেমন, প্রতি মিটার কাপড়ের উপর পাঁচ পয়সা, প্রতি লিটার স্পিরিটের উপর দশ পয়সা, প্রতিটি দিয়াশলাইর উপর এক পয়সা হিসাবে, ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু শুল্ক যদি দ্রব্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া ধার্য করা

হয় তাহা হইলে তাহাকে মূল্যানুসার বা মূল্য-ভিত্তিক কর বলে। যেমন, মোটরগাড়ীর উপর মূল্যের শতকরা হিসাবে শুল্ক ধার্য করা হয়। আমদানি-শুল্ক, রপ্তানি-শুল্ক এবং আবগারী শুল্ক পরিমাণানুসারে অথবা মূল্যানুসার নীতিতে ধার্য হইতে পারে।

অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্কের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Excise Duty and Customs Duty) ঃ

অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্কের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় :

অন্তঃশুল্ক	বহিঃশুল্ক
(১) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক অরোপিত হয়।	(১) বিদেশে রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর বহিঃশুল্ক আরোপিত হয়।
(২) কতকগুলি দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার অন্তঃশুল্ক আদায় করেন এবং কতকগুলি দ্রব্যের উপর রাজ্য সরকার অন্তঃশুল্ক আদায় করেন।	(২) বহিঃশুল্ক অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করেন।
(৩) অন্তঃশুল্ক দ্বারা দেশের শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারে, কারণ ইহার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ভোগ সংকুচিত হয়।	(৩) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক দেশীয় শিল্পের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।
(৪) উৎপাদনের পর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অন্তঃশুল্ক আদায় করা হয়।	(৪) বহিঃশুল্ক আমদানি এবং রপ্তানি বন্দরে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের নিকট হইতে আদায় করা হয়।
(৫) ইহা সরকারের রাজস্ব আদায়ের জন্য আরোপিত হয়। ইহা ছাড়া এইরূপ শুল্ক আরোপের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হইল : (ক) কোনও দ্রব্যের ব্যবহার সীমিত করা; (খ) সামাজিক ক্ষতিকারক দ্রব্য, যেমন, আফিম, মদ্য ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবহার সংকুচিত করা; (গ) কোনও উন্নত দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া তাহা হইতে উপার্জিত অর্থ অনুন্নত দ্রব্যের উন্নতিতে বিনিয়োগ করা।	(৫) ইহা সরকারের রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়। ইহা আরোপের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হইল : (ক) কোনও দ্রব্যের আমদানি অথবা রপ্তানি সীমিত করা; (খ) কোনও বিশেষ দেশের দ্রব্য ব্যবহারে অনুৎসাহিত করা।
(৬) ইহা উৎপাদন স্থান হইতে আদায় করা হয়।	(৬) ইহা বন্দর হইতে আদায় করা হয়।
(৭) ইহা স্থিতিস্থাপক (Elastic); কারণ সরকার অন্তঃশুল্ক প্রয়োজনমত বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন।	(৭) ইহা অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) ; কারণ ইহা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে।

শুল্ক-সংশ্লিষ্ট কতিপয় শব্দ (A Few Terms relating to Duties) ঃ

শুল্ক ফেরত (Duty Drawback) ঃ একই দ্রব্যের উপর দুইবার কর আরোপ করা অনুচিত। এই নীতি সর্বদেশে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। যে দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক দেওয়া হইয়াছে, যদি তাহা পুনঃরপ্তানি হয় তাহা হইলে তাহার উপর আদায়ীকৃত রপ্তানি-শুল্ক ফেরত দেওয়া হয়। একই নীতি অনুসারে যে দ্রব্যের উপর

অন্তঃশুল্ক দেওয়া হইয়াছে সেই দ্রব্যের উপর আদায়ীকৃত রপ্তানি-শুল্কও ফেরত দেওয়া হয়। ইহাকে শুল্ক ফেরত (Duty Drawback) বলা হয়।

শুল্ক ফেরত দলিল (Debenture) ঃ প্রদত্ত শুল্ক সরকার কর্তৃক ফেরত দিবার স্বীকৃতিকে শুল্ক ফেরত দলিল (Debenture) বলে। ইহা হস্তান্তরযোগ্য।

রাজ অনুদান বা রাজবৃত্তি (Bounty) ঃ কোন শিল্পের সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের জন্য অথবা বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই শিল্পকে সরকার এককালীন আর্থিক সাহায্য দান করিলে, তাহাকে রাজ অনুদান বা রাজবৃত্তি (Bounty) বলা হয়।

অনুদান বা আর্থিক সহায়তা (Subsidy) ঃ সরকার কর্তৃক কোন শিল্পকে জাতীয় স্বার্থে উৎপাদন একক প্রতি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হইলে তাহাকে অনুদান বা আর্থিক সহায়তা বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শিল্পটি যদি জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহা হইলে সরকার লোকসান পূরণ করিবার জন্য উৎপাদককে আর্থিক সহায়তা দিয়া থাকেন।

আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে দ্রব্য বিলির ব্যয়বহনের ভিত্তিতে চালানের প্রকারভেদ (Different Types of Invoices on the Basis of Apportionment of Delivery Cost between the Importer and Exporter) ঃ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দ্রব্য বিলি-ব্যবস্থার শর্ত স্থির করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ব্যয়কে কি হারে বহন করিবে তাহা পণ্য সরবরাহের শর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। রপ্তানিকারক তদনুসারে চালানপত্র (Invoice) তৈয়ারী করিয়া থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য বিলির ব্যয়বহনের ভিত্তিতে চালানসমূহকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) **মূল্য-বীমা মাশুল চালানপত্র (CIF—Cost, Insurance and Freight Challan) ঃ** এই প্রকার চুক্তিতে পণ্যের মূল্য, বীমা ও পরিবহণ-ব্যয় যুক্ত করিয়া মূল্য স্থির করা হয়। ইহাতে আমদানিকারক যে বন্দর হইতে পণ্য খালাস করিবে সেই বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাইবার ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করে।

(২) **মূল্য-মাশুল চালানপত্র (CF—Cost and Freight Challan) ঃ** এই প্রকার চালানে রপ্তানিকারক, আমদানিকারক যে বন্দর হইতে পণ্য খালাস করিবে সেই বন্দরে পণ্য পৌঁছাইবার পরিবহণ-ব্যয় বহন করে।

(৩) **মূল্য-বীমা-মাশুল-বিনিময়-দর চালানপত্র (CIFE—Cost, Insurance, Freight and Exchange Challan) ঃ** ইহাতেও আমদানিকারকের সহিত যে বন্দরে পণ্য খালাস দিবার চুক্তি হয় সেই বন্দর পর্যন্ত পণ্য পরিবহণের ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করিয়া থাকে।

(৪) **জাহাজ পর্যন্ত চালানপত্র (FAS—Free Alongside Ship Challan) ঃ** ইহাতে জাহাজ পর্যন্ত পরিবহণ ও অন্যান্য ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করে। জাহাজে পণ্য বোঝাই করা এবং জাহাজের পরিবহণ মাশুল আমদানিকারক বহন করিয়া থাকে।

(৫) জাহাজে বোঝাইসহ চালানপত্র (FOB—Free on Board Challan) ঃ এই প্রকার চালানে যে মূল্য উদ্ধৃত করা হয় তাহাতে জাহাজে বোঝাই করা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করে। জাহাজের মাশুল এবং সংশ্লিষ্ট বন্দর হইতে আমদানিকারকের গুদামে পণ্য বহনের পরিবহণ-ব্যয় আমদানিকারককে বহন করিতে হয়।

(৬) ক্রেতার গুদামঘর চালানপত্র (Franco Challan) ঃ ক্রেতার গুদামঘর পর্যন্ত পণ্য পরিবহণের যাবতীয় ব্যয় ধরিয়া যে চালান তৈয়ারী করা হয়, তাহাকে ক্রেতার গুদামঘর চালানপত্র বলে। ইহাতে পরিবহণ-ব্যয় সম্পূর্ণভাবে রপ্তানিকারক বহন করে।

(৭) বিক্রেতার গুদামঘর চালানপত্র (Ex-godown Challan) ঃ ইহাতে রপ্তানিকারক কোন পরিবহণ-ব্যয় বহন করে না। রপ্তানিকারকের গুদাম হইতে আমদানিকারকের গুদামে পৌছাইবার যাবতীয় ব্যয় আমদানিকারককে বহন কবিতে হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্যপ্রদানের পদ্ধতিসমূহ
(Methods of Payment in Foreign Trade)

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ক্রেতা নিজ দেশের মুদ্রায় ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশের আইনানুগ মুদ্রা নহে। সুতরাং ক্রেতা নিজ দেশের মুদ্রা দ্বারা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিতে পারে না। ভারতের মানমুদ্রা টাকা, গ্রেট ব্রিটেনের মানমুদ্রা পাউণ্ড। যদি ভারতের কোন কারবারী গ্রেট ব্রিটেনের কোন কারবারীর নিকট হইতে কোন পণ্য ক্রয় করে তাহা হইলে বিক্রেতা মূল্য পাউণ্ডে পরিশোধ করিতে নির্দেশ দেয়। তেমনি গ্রেট ব্রিটেনের কোন কারবারীর নিকট পণ্য বিক্রয় করিলে তাহাকে টাকায় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আমদানিমূল্য পরিশোধ করা যায়ঃ (১) ক্রেতা যত পাউণ্ড মূল্যের পণ্য ক্রয় করিয়াছে সেই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ পাঠাইয়া মূল্য শোধ করিতে পারে। অথবা, (২) যত পাউণ্ড মূল্যের পণ্য ক্রয় করিয়াছে সেই পরিমাণ পাউণ্ড ক্রয় করিয়া সেই পাউণ্ড দ্বারা রপ্তানিকারকের মূল্য শোধ করিতে পারে।

স্বর্ণের দ্বারা মূল্য পরিশোধ (Payment by Gold) ঃ

স্বর্ণের আদান-প্রদান দ্বারা মূল্য পরিশোধ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে। যতবার গ্রেট ব্রিটেন হইতে দ্রব্য ক্রয় করা হইবে ততবারই গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণ পাঠাইতে হইবে এবং যতবার গ্রেট ব্রিটেন ভারত হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবে ততবারই ভারতে স্বর্ণ পাঠাইতে হইবে। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে বহুবার স্বর্ণের আদান-প্রদান (গমনাগমন) হইবে। স্বর্ণ আদান-প্রদানে ব্যয়ও প্রচুর হইবে। এই কারণে স্বর্ণ দ্বারা মূল্য পরিশোধ না করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডির আদান-প্রদান করিয়া মূল্য পরিশোধ করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি দ্বারা মূল্য পরিশোধ (Payment by Foreign Bill of Exchange) :

বাণিজ্যিক হুণ্ডি দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা খুবই সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে ইহা দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হয়। বাণিজ্যিক হুণ্ডি দ্বারা মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

মনে করা যাক, ভারতের একজন ব্যবসায়ী রমেন, গ্রেট ব্রিটেনের একজন ব্যবসায়ী স্মিথের নিকট হইতে পাউণ্ডে মূল্য পরিশোধ করা হইবে এই চুক্তিতে ৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একখানি মোটর গাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং রমেনের উপর স্মিথ ৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একখানি বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র পাঠাইয়া দিলেন। রমেন ঐ হুণ্ডিখানি 'স্বীকৃত' বা 'গৃহীত' (Accepted) লিখিয়া স্মিথের নিকট ফেরত পাঠাইলেন। স্মিথ ঐ হুণ্ডিখানা বিক্রয় বা বাট্টা (Discount) করিয়া গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য মূল্য পাইলেন। গ্রেট বিটেনের জন ভারতের খগেনের নিকট পাউণ্ডে মূল্য পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতিতে ৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের চা ক্রয় করিয়াছেন। এখন জন গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ হুণ্ডিখানি ক্রয় করিলেন এবং তাহা হাজারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন। হাজারিকা ঐ হুণ্ডিখানি বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয়কারী একটি ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় বা বাট্টা করিয়া মূল্য গ্রহণ করিলেন। এই উপায়েই বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উপরে বর্ণিত উদাহরণটিতে ভারতে আমদানি এবং ভারত হইতে রপ্তানির মূল্য সমান ধরা হইয়াছে বলিয়াই স্মিথের হুণ্ডিখানি জন ক্রয় করিয়া আমদানিমূল্য শোধ করিতে পারিয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রকার সমমূল্যের হুণ্ডি পাওয়া নাও যাইতে পারে। তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের নিষ্পত্তি কিভাবে হইবে? প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ও করে। এই কারণে রপ্তানিকারক এইরূপ ব্যাঙ্কের নিকট বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি বিক্রয় করিয়া মূল্য আদায় করে এবং আমদানিকারক বৈদেশিক মুদ্রার লিখিত হুণ্ডি ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করে। ভারতের যে ব্যাঙ্কটি হাজারিকাকে জন কর্তৃক স্বীকৃত হুণ্ডিখানি ক্রয় করিয়া বা বাট্টা করিয়া অর্থ প্রদান করিল সে উহা গ্রেট ব্রিটেনে উহার শাখা অফিসে পাঠাইয়া দিবে। ব্যাঙ্কের শাখা অফিস ঐ হুণ্ডিখানি গ্রেট ব্রিটেনে বিক্রয় করিবে অথবা জনের নিকট হুণ্ডি উপস্থিত করিয়া হুণ্ডির মূল্য আদায় করিবে এবং হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ ব্যাঙ্কের নামে নিজ অফিসে জমা রাখিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, যে বিক্রেতা ক্রেতার উপর হুণ্ডি কাটে বা লিখে, তাহাকে বলা হয় হুণ্ডিকারক বা হুণ্ডিলেখক (Drawer)। যে ক্রেতা ঐ হুণ্ডি স্বীকার (Accept) করে, তাহাকে বলে হুণ্ডিগ্রহীতা (Acceptor)। যে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে হুণ্ডিকারক বা হুণ্ডিলেখক (Drawer) এবং হুণ্ডিগ্রহীতা (Acceptor) একই দেশের লোক, সেই হুণ্ডিকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Inland Bill of Exchange) এবং যে বাণিজ্যিক

হুণ্ডির লেখক ও গ্রহীতা ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী, সেই বাণিজ্যিক হুণ্ডিকে বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Foreign Bill of Exchange) বলে।

ব্যাঙ্ক মারফত মূল্য পরিশোধ (Payment by Bank Transfers) ঃ

এই পদ্ধতিতে মূল্য প্রদানকারী আমদানিকারক নিজের দেশের স্থানীয় কোন ব্যাঙ্ককে দেশীয় মুদ্রায় আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য রপ্তানিকারকের অনুকূলে বিদেশে পাঠাইবার জন্য প্রদান করে। রপ্তানিকারী তাহার নিজের দেশের মুদ্রায় পণ্যমূল্য প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক (Correspondent Bank) হইতে গ্রহণ করে। এইভাবে আমদানিকারকের দেশ হইতে রপ্তানিকারকের দেশে পণ্যমূল্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। ব্যাঙ্ক মারফত অর্থ স্থানান্তরকরণের তিনটি পদ্ধতি আছে; যেমন, (ক) **টেলিগ্রামযোগে স্থানান্তর** (Telegraphic Transfer—TT), (খ) **ডাকযোগে স্থানান্তর** (Mail Transfer—MT) এবং (গ) **ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট** (Bank Draft) মারফত স্থানান্তর।

ঋণের প্রত্যয়নপত্র মারফত মূল্য পরিশোধ (Payment by Letter of Credit) ঃ ঋণের প্রত্যয়নপত্রের সাহায্যেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ মূল্যপ্রদান হইয়া থাকে। যেহেতু আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অনেক, সেইহেতু রপ্তানিকারক প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। আমদানিকারকের ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকের অনুকূলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের প্রত্যয়নপত্র লিখিয়া দেয়। রপ্তানিকারক মূল্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করে। পণ্য জাহাজে তুলিবার পর রপ্তানিকারক ব্যাঙ্কের উপর বাণিজ্যিক হুণ্ডি কাটিয়া উহা বাট্টা দিয়া ভাঙাইয়া লয় এবং রপ্তানিমূল্য পাইয়া যায়।

দলিলের বিনিময়ে নগদ অর্থে মূল্য পরিশোধ (Payment by Cash against Documents) ঃ এইরূপ ব্যবস্থায় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে চুক্তি হয় যে, রপ্তানিকারক পণ্যের স্বত্ব সম্বলিত দলিলাদি আমদানিকারক অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করিলে পণ্যের মূল্য নগদ অর্থে রপ্তানিকারককে দেওয়া হইবে।

আন্তর্জাতিক মণি অর্ডারযোগে মূল্যপ্রদান (Payment by International Money Order) ঃ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কম হইলে এইরূপ ব্যবস্থায় মূল্য প্রদান করা চলে। কোন কোন দেশের ডাক-বিভাগ আন্তর্জাতিক মণি অর্ডারযোগে রপ্তানিকারকের মূল্যপ্রদান করে। আমদানিকারক নিজের দেশের পোস্ট অফিসে দেশীয় মুদ্রায় মণি অর্ডার করে এবং বৈদেশিক পোস্ট অফিস বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানিকারককে অর্থ প্রদান করে।

ব্যক্তিগত চেক মারফত মূল্যপ্রদান (Payment by Personal Cheques) ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্যপ্রদান ব্যক্তিগত চেক মারফত তখনই সম্ভব, যখন দুইটি দেশের

মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে এবং বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পারস্পরিক চেক-নিকাশী ব্যবস্থায় সাহায্য করে। আমদানিকারক তাহার নিজের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া উহা রপ্তানিকারককে পাঠাইয়া দেয়। রপ্তানিকারক উহা নিজের ব্যাঙ্কে জমা করিয়া নিজের হিসাবে অর্থ পাইয়া যায়।

বন্ধকীপত্রের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি (Receipt of Money by Letter of Hypothecation) : রপ্তানিকারক বাণিজ্যিক হুণ্ডির মাধ্যমে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিতে পারে ও ব্যাঙ্ককে বন্ধকীপত্র দিতে পারে। এই বন্ধকীপত্রে রপ্তানি-কারক ব্যাঙ্ককে এইরূপ ক্ষমতা দেয় যে, আমদানিকারক যদি ব্যাঙ্ককে মূল্য পরিশোধ না করে তবে ব্যাঙ্ক পণ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

আমদানি-রপ্তানি উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment) :

কোন একটি দেশের মোট আমদানিপণ্যের মূল্য রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্যের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। স্বর্ণ-ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে বলিয়া স্বর্ণ দ্বারা সাময়িকভাবে মূল্য শোধ করা গেলেও তাহা স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই কারণে আমদানি ও রপ্তানিপণ্যের মূল্যের সমতা আবশ্যক। তাহা না হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সুস্থতা বজায় থাকে না এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটে যদি মোট আমদানিপণ্যের মূল্য মোট রপ্তানিপণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তবে তাহাকে **আমদানি-রপ্তানির প্রতিকূল উদ্বৃত্ত** (Unfavourable Balance of Trade) বলে। ইহা দেশের অর্থনৈতিক অসুস্থতার লক্ষণ। আর যদি মোট রপ্তানিপণ্যের মূল্য মোট আমদানিপণ্যের মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে তাহাকে **আমদানি-রপ্তানির অনুকূল উদ্বৃত্ত** (Favourable Balance of Trade) বলে। ইহাতে দেশের আর্থিক সুস্থতা আসে। ধারাবাহিকভাবে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।

মোট রপ্তানি-বাণিজ্য ও মোট আমদানি-বাণিজ্যের সমতা সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের চূড়ান্ত অবস্থা বাণিজ্য লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment)-এর উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য কেবল পণ্যের আমদানি রপ্তানি মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহা অস্পর্শনীয় বা অদৃশ্য কার্য এবং সেবার—যেমন, ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ, মূলধনের সুদ, ভ্রমণ ইত্যাদির জন্য প্রাপ্য অথবা দেয় মূল্যের আমদানি ও রপ্তানির উপরও নির্ভরশীল। যদি কোন দেশের পণ্য ও সেবার (Tangible goods plus Intangible services) রপ্তানির মোট মূল্য পণ্য ও সেবার আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের অনুকূল ভারসাম্য (Favourable Balance of Payment) বলে। আর যদি পণ্য ও সেবার মোট আমদানিমূল্য পণ্য ও সেবার মোট রপ্তানিমূল্যের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের প্রতিকূল ভারসাম্য (Unfavourable Balance of Payment) বলে। ইহা মুদ্রামান ও রপ্তানি-বাণিজ্যের হ্রাস ঘটাইয়া গভীর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।

চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম (Bonded Warehouse) ঃ

শুল্কপ্রদানের পূর্বে আমদানিকৃত শুল্ক-দেয় পণ্যসমূহ গুদামে নিরাপদে মজুত রাখিবার জন্য দেয় শুল্ক প্রদান না করিলে উক্ত পণ্য অর্পণ করা হইবে না, এই চুক্তিতে অঙ্গীকারপত্র (Bond) লিখিয়া দিয়া গুদামের মালিক শুল্ক কর্তৃপক্ষের (Customs Authorities) সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে, উহাকে শুল্কাধীন গুদাম বা চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম (Bonded Warehouse) বলে। শুল্ক-কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন এই গুদামসমূহ বন্দর-এলাকায় স্থাপিত হয়। ইহা শুল্ক-কর্তৃপক্ষীয় অথবা বেসরকারীও হইতে পারে। পণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী চুক্তির শর্তাবলী সরকারী ব্যবহারজীবীর (State Solicitor) নির্দেশমত স্থির করা হয় এবং ইহাতে মালিকপক্ষের কয়েকজনকে জামিনদার থাকিতে হয়। শুল্ক-কর্তৃপক্ষ এই গুদামের তত্ত্বাবধান করে এবং ইহা সরকারী রক্ষীর প্রহরাধীনে থাকে।

পণ্য রাখিবার পদ্ধতি (Method of Keeping Goods) ঃ

এইরূপ গুদামে পণ্য রাখিতে হইলে পণ্যের মালিক পণ্যের বিবরণ-সম্বলিত পূর্ণ তালিকা (Entry for Warehousing) শুল্ক-কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে। উহা পরীক্ষা করিয়া শুল্ক-কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিলে জমার আদেশ (Landing Order) দেয়। পণ্য গুদামে রাখিবার পর মালিক জমা রসিদ (Warrant) পায়। পরে শুল্ক সম্পূর্ণ বা কিস্তিতে প্রদান করিলে পণ্য খালাস আদেশ (Warehouse keeper's Order) বলে গুদাম হইতে পণ্য খালাস করা যায়।

চুক্তিবদ্ধ মালগুদামের সুবিধা (Advantages of Bonded Warehouse) ঃ

(১) ইহাতে ব্যবসায়ের অর্থ শুল্কপ্রদানের দ্বারা আটক থাকে না এবং ঐ অর্থ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা যায়। শুল্ক বাবদ দেয় অর্থ তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে, এই ব্যবস্থায় পণ্য শুল্কাধীন গুদামে রাখা যায়।

(২) ইহা আংশিক (Piecomeal)-ভাবে শুল্ক প্রদান করিয়া আনুপাতিক পণ্য মুক্ত করিতে সাহায্য করে। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা বাকী পণ্য খালাস করা যায়।

(৩) ইহা পুনঃরপ্তানি (Re-export) বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক। পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানি-শুল্কের প্রয়োজন হয় না বলিয়া মালগুদাম হইতে সরাসরি পণ্য পুনঃরপ্তানি করা যায় এবং শুল্ক জমা ও ফেরত (Duty Drawback) লইবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

(৪) রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক (Excise Duty) না দিয়া উহা মালগুদামে রাখা যায়। সেখানে রপ্তানি-শুল্ক প্রদান করিয়া সহজে পণ্য রপ্তানি করা যায়।

(৫) জমা রসিদ (Warrant) স্বত্বের দলিল (Document of Title) হিসাবে কাজ করে এবং পণ্যের উপস্থিতি ছাড়াই জমা রসিদ বিক্রয় করিয়া পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা যায়।

(৬) প্রয়োজনমত গুদামের অভ্যন্তরে মান অনুযায়ী পণ্যের শোধনকরণ (refining), শ্রেণীবদ্ধকরণ (grading), নমুনা প্রস্তুতকরণ (sampling), মিশ্রণ (blending), মোড়কজাতকরণ (packing), তত্ত্বাবধান (supervision), পরীক্ষাকরণ (examining) ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

(৭) ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পণ্য সংরক্ষণ ও পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে।

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি বা শুল্কনীতি (Fiscal Policy) :

এই নীতি একদিকে শিল্প-সংরক্ষণ (Protection) এবং অন্যদিকে সরকারের কর নীতি ও আয়-ব্যয়ের রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতিকে বুঝায়। সংরক্ষণের ফলে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটে। দুইভাবে শিল্প সংরক্ষণ করা যায় :

(১) **প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ :** দেশীয় শিল্পকে সরাসরি 'সাবসিডি' (Subsidy) অর্থাৎ উৎপাদন-একক-প্রতি অর্থ সাহায্য অথবা 'বাউন্টি' (Bounty) অর্থাৎ এককালীন অর্থ সাহায্য প্রথায় আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ, এবং

(২) **পরোক্ষ সংরক্ষণ :** বিদেশী পণ্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করিয়া দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ করা।

ভারতের বর্তমান সংরক্ষণ বা শুল্ক-নীতি (Present Fiscal Policy of India) :

স্বাধীনতা লাভের পর সুপরিকল্পিত উপায়ে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে টি. টি. কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে নূতন ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কমিশন তাহার সুপারিশ পেশ করে। পূর্বতন শুল্ক-নীতি ছিল **প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ**। নূতন শুল্ক-নীতি **উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের নীতি**। এই নীতির উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) সংরক্ষণ নীতি নিজে কোন লক্ষ্য নয় ; ইহা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র।

(২) দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণসাধন।

(৩) সংরক্ষণ নীতিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি উন্নয়নের অঙ্গীভূত করিতে হইবে যাহাতে ভারসাম্য শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়।

(৪) সংরক্ষণের ব্যয়কে অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক ব্যয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৫) সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পগুলিকে পরবর্তীকালে পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

কমিশনের সুপারিশ (Commission's Recommendations) :

বর্তমান ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশগুলি হইল :

(১) শিল্পগুলিকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :

(ক) ব্যয় যাহাই হোক, জাতীয় স্বার্থে দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বুনিয়াদী ও মূল শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ ও সাহায্য দিতে হইবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইহাদের সাহায্যের পরিমাণ, শর্ত ইত্যাদি স্থির করিবে ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে।

(গ) বাদবাকী অন্যান্য শিল্প যেগুলি পরিকল্পনার অগ্রাধিকার শিল্প, অথবা যাহারা মূল ও ভাবী শিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক, তাহারাও সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে।

(২) সংরক্ষণ করিবার জন্য শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধা, জাতীয় স্বার্থ এবং সংরক্ষণ-ব্যয় বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য সুবিধা থাকিলে কাঁচামালের স্থানীয় যোগান আছে কিনা তাহা বিবেচনার প্রয়োজন নাই।

(৪) একটি সংরক্ষিত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য অপর যে সকল সংরক্ষিত শিল্প কাঁচামালরূপে ব্যবহার করিবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণমূলক সংরক্ষণ-এর সুবিধা দিতে হইবে।

(৫) যে সকল শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে তাহাদের পণ্যের উচ্চ গুণগত মান বজায় রাখিতে হইবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) যে সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পে প্রচুর মূলধন, বিশেষায়ণ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং যাহাদের ক্ষেত্রে তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আছে তাহাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়। তবে এক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরের অধিক সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না।

(৭) কোন শিল্প যদি অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিতে অক্ষম হয় তবুও তাহাকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে।

(৮) কোন শিল্পের রপ্তানির সম্ভাবনা থাকিলে তাহাকে সংরক্ষণ দেওয়া যাইবে।

(৯) সংরক্ষিত শিল্পকে কোন উৎপাদন-শুল্ক (Excise Duty) দিতে হইবে না।

(১০) জাতীয় স্বার্থে কৃষিপণ্য সংরক্ষিত হইতে পারে।

(১১) সংরক্ষণ নীতি পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী ও বিধিবদ্ধ শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) গঠন করিতে হইবে। এই সংস্থা সংরক্ষণ নীতি স্থির করিবে।

(১২) সংরক্ষণমূলক শুল্ক হইতে আয়ের একাংশ লইয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) গঠন করিয়া উহা হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পে অর্থ সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

ভারত সরকার উপরোক্ত সকল সুপারিশই গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী শুল্ক কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পনীতি (Industrial Policies) :

স্বাধীনোত্তরকালে ভারত সরকার দেশের সুসংহত, ভারসাম্যযুক্ত ও ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে এই সকল শিল্পনীতি আলোচনা করা হইল :

(১) ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1948):

এই শিল্পনীতির ৪টি উদ্দেশ্য ছিল: (ক) ন্যায়বিচার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করা, (খ) প্রাপ্ত ও সম্ভাব্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, (গ) ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন করা, (ঘ) সকলের জন্য সমাজসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বৈশিষ্ট্য (Features): (১) এই শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে ৪টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়:

(ক) সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র যেমন, অস্ত্রশস্ত্র, পরমাণু শক্তি, রেল-পরিবহণ ইত্যাদি।

(খ) সরকার-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র যেমন, কয়লা, লোহ-ইস্পাত, বিমান নির্মাণ, টেলিফোন, খনিজ তৈল ইত্যাদি।

(গ) সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র যেমন, মোটরগাড়ী, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, খনিজ ইত্যাদি।

(ঘ) সাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র যেমন, ব্যক্তিগত ও সমবায় শিল্প।

(২) এই শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প উল্লেখ করা হয় ও সরকারের শিল্প-ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের ক্ষমতাও সরকারকে দেওয়া হয়।

(৩) এই শিল্পনীতি ঘোষণা করে যে, বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারতীয়গণের হাতে রাখিতে হইবে।

(৪) ইহাতে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৫) এই শিল্পনীতি উপযুক্ত সংরক্ষণ বা শুল্কনীতি গ্রহণের কথা ঘোষণা করে।

(৬) ইহাতে করনীতির পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের কথাও ঘোষিত হয়।

(২) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1956):

উদ্দেশ্য (Objectives): (ক) শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি করা, (খ) ভারী যন্ত্রপাতি-শিল্প গঠন করা; (গ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করা, (ঘ) সমবায় ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা, (ঙ) একচেটিয়া কারবার রোধ করা, (চ) আয় ও সম্পদ বৈষম্য হ্রাস করা।

বৈশিষ্ট্য (Features): (১) শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

(ক) প্রথম শ্রেণীতে ১৭টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত যেমন, পরমাণু, লৌহ ও ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, কয়লা, লৌহ ইত্যাদি। এই সকল শিল্পস্থাপনে কেবল সরকারের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, মিশ্র ধাতু, মেশিন টুলস, রবার ইত্যাদি। ইহা সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্র। এগুলি ক্রমশঃ সরকারী উদ্যোগে চলিয়া আসিবে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীতে অন্যান্য যাবতীয় শিল্প অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পগুলি বেসরকারী শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্র।

(২) এই শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ইহাতে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের কথা ঘোষিত হইয়াছে।

(৪) এই নীতি শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার উপর জোর দেয়।

(৫) এই নীতিতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে শিল্প-কাঠামো গড়িবার কথা ঘোষণা করা হয়।

(৬) শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাও এই নীতিতে ঘোষিত হয়।

৩) ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1970) :

উদ্দেশ্য (Objectives) : (ক) যে সকল শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশের বাজারে রপ্তানির তুলনামূলক অধিক সুবিধা আছে তাহাদের সরকার উৎসাহ প্রদান করিবে।

(খ) যে সকল শিল্পের পণ্য রপ্তানির বাজার সৃষ্টির সুবিধা আছে তাহাদের শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

বৈশিষ্ট্য (Features) : ( ) লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে শিল্পগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :

(ক) মূল ক্ষেত্র বা কোর সেক্টর : বুনিয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মধ্যম ক্ষেত্র : এক কোটি টাকা হইতে পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে শিল্পগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত

গ) যৌথ ক্ষেত্র : ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মালিকানা সমবেতভাবে শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে

ঘ) সংরক্ষিত ক্ষেত্র ও সমবায় ক্ষেত্র : মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্র হইল সংরক্ষিত ক্ষেত্র ... শিল্প সমবায় ক্ষেত্রে লাইসেন্স পাইবে।

২) ঋণকে মূলধনে পরিণত করিয়া যৌথ উদ্যোগে পরিণত করা হইবে।

৩) বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ রোধ করা হইবে।

(৪) বৈদেশিক মূলধন ও প্রযুক্তির প্রয়োজনে বড় বড় সংস্থার অনুপ্রবেশের শর্ত শিথিল করা হইবে

(৪) ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1973) :

এই শিল্পনীতিতে শিল্পের সাময়িক অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য সরকার একটি সংযুক্ত তালিকা প্রকাশ করেন। এই সংযুক্ত তালিকায় ১৯টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, তাহাদের সংশ্লিষ্ট শিল্প ও রপ্তানি শিল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নীতি অনুসারে যৌথ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করা হইবে।

(৫) ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জনতা সরকারের শিল্পনীতি (**Janata Government's Industrial Policy of 1977**) :

উদ্দেশ্য (Objectives) : (ক) জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি করা, (খ) শিল্পায়নের হার দ্রুত বৃদ্ধি করা, (গ) কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা, (ঘ) আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের বৈষম্য দূর করা।

বৈশিষ্ট্য (Features) : (১) এই শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলির শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

(২) ৫০০টি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষিত হইয়াছে।

(৩) ৫ লক্ষের কম জনসংখ্যাযুক্ত শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

(৪) বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(৫) ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবেশকারী বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিজেরাই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন অর্থ-লগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ পাইবে না। ইহার উৎপাদন-স্তরও বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৬) যে সকল কোম্পানী তাহাদের বৈদেশিক ইকুইটি শেয়ারের অংশ ৪০%-এর নীচে কমাইয়া আনিয়াছে, সেই সকল কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর মতই সম্প্রসারণের সুবিধা পাইবে।

(৭) বৈদেশিক বিনিয়োগে সুবিধা দেওয়া হইবে।

(৬) ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি (**Industrial Policy of 1980**) :

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইন্দিরা সরকার পূর্বতন জনতা সরকারের শিল্পনীতিকে অচল শিল্পাবস্থার জন্য দায়ী মনে করিয়া নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করে।

উদ্দেশ্য (Objectives) : (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ধারিত ক্ষমতার কাম্য ব্যবহার করা, (খ) উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা, (গ) আঞ্চলিক শিল্প-অসাম্য দূর করা ও অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করা, (ঘ) অধিকতর কর্মসংস্থান করা, (ঙ) কৃষিভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার দান করা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, (চ) রপ্তানি-শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন করা, (ছ) অর্থ নৈতিক সঙ্ঘসূত্রের (Economic Federalism) উন্নয়ন করা, (জ) সমতার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা।

বৈশিষ্ট্য (Features) : (১) প্রত্যেক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া উহাতে সময়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(২) বেসরকারী ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫% হারে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে, প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনশীলতায় উন্নতির জন্য এবং রপ্তানির জন্য উদার-হস্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(৩) অনুন্নত অঞ্চলে সহায়ক শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প গঠনের জন্য **কেন্দ্রীন শিল্পসংস্থা** (Nucleus Plants) গঠিত হইবে। ক্ষুদ্রশিল্পের আওতায় সংরক্ষিত পণ্যের সংখ্যা ৫০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮৩৪টি করা হইয়াছে।

(৪) ক্ষুদ্রশিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হইয়াছে।

(৫) শিল্পস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য ৩ কোটি টাকা (বর্তমানে ৫ কোটি টাকা) পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না। পূর্বে এই সীমা ছিল ১ কোটি টাকা।

শিল্প লাইসেন্স নীতি (Industrial Licensing Policy) ঃ

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অধিক স্থির পুঁজি লইয়া গঠিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য ডক্টর আর কে. হাজারীর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। হাজারী কমিটি মন্তব্য করে যে, লাইসেন্সযোগ্য ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বড় বড় শিল্পপতিদের দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয় নাই। ইহার পর ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় সুবিমল দত্ত কমিটি। এই কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন লাইসেন্স নীতি গঠিত হয়।

(১) ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1970) ঃ

এই নীতিতে শিল্পগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(ক) **মূলক্ষেত্র বা কোর সেক্টর :** বুনিয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভারী বিনিয়োগক্ষেত্র এবং ৫ কোটি টাকার অধিক নূতন বিনিয়োগযোগ্য শিল্প ইহার অন্তর্গত।

(খ) **মধ্যম ক্ষেত্র ঃ** ১ কোটি হইতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের শিল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত। MRTP আইন অনুসারে যে সকল শিল্পগোষ্ঠীর স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য অনধিক ২০ কোটি টাকা (বর্তমানে ১০০ কোটি টাকা), তাহাদেরও এই ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

(গ) **যৌথ ক্ষেত্র :** এই ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মালিকানা সমবেতভাবে কোন শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। ইহাতে সরকারী নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা থাকিবে। যে সকল বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ কোটি টাকার অধিক এবং যাহারা সরকারী অর্থসংস্থানের নিকট হইতে ঋণ লইয়াছে তাহাদের পরিচালনায় সরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থসংস্থানের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ লইবে তাহাদের ঋণদানের শর্ত হইবে ঋণকে শেয়ার মূলধনে পরিণত করা এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীতে উক্ত সংস্থার প্রতিনিধি রাখা।

(ঘ) **সংরক্ষিত ও সমবায় ক্ষেত্র** : যে সকল শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট উহারাই সংরক্ষিত ক্ষেত্রে থাকিবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য সমবায় ক্ষেত্রকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

২) **১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1973) :**

(ক) এই নীতিতে বৃহৎ শিল্পভবনের সম্প্রসারণকে আরও সংকুচিত করা হয়।

(খ) ইহাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থার প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(গ) ইহাতে যৌথ উদ্যোগে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ঘ) এই নীতিতে রপ্তানি প্রসারের জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারণের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়।

(৩) **১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1975) :**

এই লাইসেন্স নীতিতে বলা হয় যে নূতন সংস্থার ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকা লগ্নি পর্যন্ত এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা লগ্নি পর্যন্ত কোন লাইসেন্স লাগিবে না।

(৪) **১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1978) :**

এই নীতিতে বলা হয় যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত লগ্নির ব্যাপারে কোন লাইসেন্স লইতে হইবে না। ২৪টি নির্দিষ্ট শিল্পকে লাইসেন্স-বিধির আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

(৫) **১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1983) :**

এই নীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিল্প লাইসেন্সের অব্যাহতির ঊর্ধ্বতম মাত্রা ৩ কোটি টাকা হইতে ৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে। শিল্পবিহীন জেলাগুলিকে সর্বাধিক ভর্তুকি দেওয়া হইবে। ভর্তুকি প্রদানের জন্য জেলাগুলিকে 'ক', 'খ' এবং 'গ' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) :

দেশের সার্বিক আর্থিক কাঠামোর স্থায়িভাবে উন্নত হওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ ব্যাপক। অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সার্বিক প্রসার ঘটে, বেকার-সমস্যার সমাধান হয়, মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয় এবং দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব আসে। জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নত করে।

অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিশ্বের দেশসমূহকে অনুন্নত, অর্ধোন্নত ও উন্নত—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **অধ্যাপক রসটো** (Rostow) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা নিম্নলিখিতভাবে দেখাইয়াছেন –

(১) **অচল অবস্থা (Stagnant Situation) :** এইরূপ অবস্থায় অর্থনীতি স্থির অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকে। উন্নয়নের হার খুব

মন্থর হয়, সরকার উন্নয়নে আগ্রহী থাকে না এবং কোনও মতে খাওয়া, থাকা ও জীবনযাপন চলে।

(২) **ঊর্ধ্বগমনের পূর্বাবস্থা (Precondition to Take off) :** ইহা উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরম্ভের পর্যায়। এই অবস্থায় উৎপাদন বিনিয়োগের হার ৫% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০% হয়। এই অবস্থায় কয়েকটি মূল ও ভারী শিল্পের (Key and Heavy Industry) পত্তন হয়। এই সময় অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(৩) **ঊর্ধ্বগমন স্তর (Take off Stage) :** এই স্তরে বিনিয়োগহার বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন-কৌশল বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়, সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয় ১৪% হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়া যায়। এই স্তর ১৫ হইতে ২৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

(৪) **স্ব-নির্ভরশীল স্তর (Self-sustaining Stage) :** এই অবস্থায় দেশ বৈদেশিক মূলধন, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কলাকৌশল ছাড়াই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। এই সময় দেশ শিল্পে স্বয়ংভর হয়।

(৫) **বহুল-ভোগ্য স্তর (Mass Consumption Stage) :** এই স্তরে উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ভোগ্যপণ্যের বহুল-উৎপাদন হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ভারত ঊর্ধ্বগমন স্তরে পৌঁছাইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং খনিজ তৈল আমদানির জন্য বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতি দেখা যাইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব দূর করিবার জন্য ভারতে রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সংগঠন ও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে

রপ্তানি উন্নয়ন (Export Promotion) :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকল্পে সরকার রপ্তানি উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ভোগ সংকোচন, রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি-শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অনুকূল জনমত সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

রপ্তানি উন্নয়নের ব্যবস্থাসমূহকে দুই ভাগে আলোচনা করা যায় :

(১) **সাধারণ নীতি** —অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানির উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি এই নীতির অন্তর্ভুক্ত।

(২) **বিশেষ পণ্যনীতি**—এই নীতি অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানিপণ্য প্রস্তুতকারক শিল্পগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ, শুল্কছাড়, আর্থিক সাহায্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদির অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

রপ্তানি সম্প্রসারণে সরকারী কর্মসূচী (Export Promotional Devices of the Government) :

(১) **প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা** (Institutional Measures) : সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া রপ্তানি উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ হইল : রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation), খনিজ ও ধাতব বাণিজ্য কর্পোরেশন (Minerals and Metals Trading Corporation), রপ্তানি ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation), রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (Export Advisory Council), রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Council), বৈদেশিক বাণিজ্য পর্ষদ (Foreign Trade Board), পণ্যমণ্ডলী (Commodity Board), বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা (Trade Development Authority) ইত্যাদি।

(২) **বৈদেশিক সাহায্যের জন্য প্রচেষ্টা** (Endeavour to Secure Foreign Assistance) : অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য, বিনিয়োগ, ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) **পণ্য-বিনিময় চুক্তি** (Agreement Relating to Exchange of Goods) : বিভিন্ন দেশের সহিত পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে।

(৪) **রপ্তানি-পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ** (Price Control of Export Goods) : যাহাতে রপ্তানি-পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি না পায় সেই কারণে সরকার মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী আর্থিক ও রাজস্ব-সম্বন্ধীয় নীতিসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫) **নূতন বৈদেশিক বাজার সন্ধান** (Searching for New Foreign Markets) : এই উদ্দেশ্যে দেশে দেশে শিল্প-বাণিজ্য মিশন পাঠাইয়া ও শিল্প প্রদর্শনী এবং আন্তর্জাতিক শিল্প-মেলা ও কৃষি-মেলা অধিকারের Directorate of Exhibition মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

(৬) **পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি** (Improvement in Quality of Goods) : রপ্তানি-পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) করা রপ্তানি উন্নয়নের আর একটি ব্যবস্থা। রপ্তানির পূর্বে পণ্যসামগ্রীর মান পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

(৭) **টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস** (Devaluation) : ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রামান হ্রাস করিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৮) **উদার রপ্তানি নীতি** (Liberal Export Policy) : সহজ শর্তে রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর, রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস, রেল ও জাহাজের মাশুল হ্রাস (Freight Concession) ইত্যাদির দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

(৯) **বিবাদ মীমাংসা** (Settlement of Disputes) : ভারতীয় সালিশী কাউন্সিল (Indian Council of Arbitration) নামক সংস্থা বিবাদ মিটাইবার জন্য

সালিশীর ব্যবস্থা করে। GATT (General Agreement on Trade and Tariff), Kenedy Round Agreement ইত্যাদি বিশ্ব বাণিজ্য-সংস্থায় ভারতের অংশগ্রহণও রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশেষ সহায়ক।

রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Council) ঃ

ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট প্রকট। এই মুদ্রা-সংকটের প্রধান কারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য কাঁচামাল ও মূলধনী সম্পত্তির আমদানি। আমদানির তুলনায় রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। উপরন্তু খনিজ তৈল ও প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি এই মুদ্রা-সংকটকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। মুদ্রা-সংকটের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র পথ হইল আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি। কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় আমদানি এবং সবপ্রকার রপ্তানি বৃদ্ধি দ্বারা সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার আহরণই এই অবস্থার মোকাবিলা করিতে পারে। রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্পর্কে দেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রপ্তানি সম্প্রসারণের বিশেষ পন্থা হিসাবে ভারত সরকার রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

সংগঠন (Organisation) ঃ

রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদসমূহ কৃষক, শিল্প-উৎপাদক এবং রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহারা আমদানি রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের (Import-Export Advisory Council) অধীন এই সকল পরিষদের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার এবং সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য ইহাদের উপরে ভারতীয় রপ্তানি সংগঠন ফেডারেশন (Federation of Indian Export Organisation) আছে। এইরূপ পরিষদের সংখ্যা ১৯টি। এই ১৯টি পরিষদ হইল কার্পাসতন্তু, রেশম ও বয়নতন্তু, প্লাস্টিক ও লিনোলিয়াম, কাজুবাদাম, তামাক, লাক্ষা, চামড়া, চামড়ার দ্রব্যাদি, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, অভ্র, রাসায়নিক ও উহার উপযোগী দ্রব্য, খেলাধূলার সরঞ্জাম, মূল রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ দ্রব্য ও সাবান, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, হস্তচালিত তাঁতদ্রব্য, মশলা, সামুদ্রিক পণ্য এবং প্রক্রিয়াগত (Processed) খাদ্যসামগ্রী।

কার্যাবলী (Functions) ঃ এই পরিষদসমূহের মূল কার্যসমূহ হইতেছে :

(১) রপ্তানি সম্প্রসারণের সকল প্রকার বাধা অপসারণ করা।
(২) বিদেশে পণ্যটির বাজারের পরিমাপ করা।
(৩) বিদেশে পণ্যটির নূতন বাজার সৃষ্টি করা।
৪) বিদেশে পণ্যটির বর্তমান বাজারের সম্প্রসারণ করা।
(৫) পণ্যটির নূতন নূতন ও অধিকতর উপযোগী ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করা।
(৬) রপ্তানি উন্নয়নে সরকারকে পরামর্শ দান করা।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) ঃ

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া ইহা ভারত সরকারের একটি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী হিসাবে ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা গঠিত হয়। পরে অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকায় এবং আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ইহা একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) দ্বারা পরিচালিত।

উদ্দেশ্য (Objects) ঃ

ইহার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে পণ্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় করা।

২) ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ত্রুটি দূর করিয়া আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণ করা।

(৩) খাদ্যশস্য বণ্টন এবং ঘাটতি অঞ্চলে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

(৪) মজুতদারী, কালোবাজারী, ফটকাবাজী প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করা।

(৫) দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (Bilateral Trade Agreement) সম্পাদন করা।

(৬) রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

(৭) অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি করা।

(৮) আমদানি ব্যয়-সংকোচ করা।

(৯) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তিতে অনুকূল শর্ত আদায় করা।

কার্যাবলী (Functions) ঃ

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন খনিজ আকরিক, জুতা, কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি, পশম ও পশমী দ্রব্য, আম, মাছ ইত্যাদি পণ্য বিদেশে, বিশেষ করিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রপ্তানি করে। এই সংস্থা নূতন পণ্যের রপ্তানি এবং নূতন বাজার সৃষ্টিরও চেষ্টা করিতেছে।

আমদানিদ্রব্যের মধ্যে সিমেণ্ট, সোডা-অ্যাশ, কষ্টিক সোডা, কাঁচা রেশম, সালফার, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, গুঁড়া দুধ, যন্ত্রপাতি, পারদ, রঙ, খাদ্যশস্য ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সহায়তার জন্য বন্দর, খনি ও পরিবহণ-সংক্রান্ত বিষয়ে কর্পোরেশন চেষ্টা করে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কর্পোরেশনকে বিভক্ত করিয়া খনিজ ও ধাতব বাণিজ্য কর্পোরেশন লিঃ (Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.—MMTC Ltd.) নামে একটি নূতন সংস্থা গঠন করা হয়। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাইকা ট্রেডিং কর্পোরেশন (Mica Trading Corporation) নামে আর একটি সংস্থা MMTC-র অধীনস্থ হিসাবে গঠন করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিপণন ব্যবস্থাপনা
(Marketing Management)

বিপণনের সংজ্ঞা ও ধারণা (Definition and Concept of Marketing) :

বাজার ও বিপণন এক কথা নয়। যে স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতা একত্রে মিলিত হইয়া ক্রয়-বিক্রয় করে তাহাকে বাজার বলে। অর্থনীতিবিদ্ **বেনহামের** মতে "যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আদান প্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ইহার ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের দ্রব্যমূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হোক বা বিস্তৃত হোক, উহাকে বাজার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে"। **ক্লার্কের** মতে, যে কর্মসমন্বয় পণ্যের ও ইহার মালিকানার স্থানান্তর ঘটায় তাহাকে বিপণন বলে। মূল্যের বিনিময়ে পণ্য ও সেবা আদান-প্রদানকে বিপণন বলে। **ড্রাকারের** মতে বিপণন খরিদ্দার সৃষ্টি সম্পর্কীয় কারবারী কার্যকলাপের সমন্বয়। ইহা খরিদ্দার সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

আমেরিকান বিপণন সমিতির মতে, "বিপণন হইল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের এমন একটি প্রক্রিয়া যাহা দ্রব্য উৎপাদকের নিকট হইতে ভোক্তার নিকট স্থানান্তর করে।"

হ্যারী হ্যানসেনের মতে, খরিদ্দারগণের গ্রহণযোগ্য পণ্যের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট পণ্য সহজভাবে হস্তান্তরের জন্য সকল প্রকার কার্য পরিচালনা করাকে বিপণন বলে।

উইলিয়াম স্ট্যানটনের মতে, বাজার হইল পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যবসায়িক কার্যকলাপের এমন একটি সামগ্রিক পদ্ধতি যাহা বর্তমান ও সম্ভাব্য খরিদ্দারগণের চাহিদা পূরণকারী পণ্য ও সেবার পরিকল্পনা, মূল্য, মানোন্নয়ন এবং বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হয়।

সি. ই. এলরিজের মতে, বিপণন হইল জনগণের চাহিদা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, চাহিদা সৃষ্টি করা, চাহিদা পূরণ করা এবং ইহাদের মাধ্যমে মুনাফা করা।

বিপণন পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত বহুবিধ কার্যাবলীর ফল। বিপণন পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় কার্যে লিপ্ত থাকে। বিপণনকে উৎপাদনমুখী, বিক্রয়মুখী, ক্রেতামুখী ও সমাজমুখী হইতে হয়।

বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Marketing Management) :

ক্যানডিফ ও স্টিলের মতে, সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত, সংগঠিত, সংযোজিত ও নিয়ন্ত্রিত বিপণন কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনাকে বিপণন ব্যবস্থাপনা বলে।

বিপণন ব্যবস্থাপনা বলিতে বুঝায় বিনিময়ের কাজকে সহজ, দ্রুত, সুনিপুণ ও সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সংগঠন, রূপায়ণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির সম্মিলিত প্রক্রিয়া।

বিপণনের গুরুত্ব (Importance of Marketing) :

বিপণন কারবারের সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। ইহা সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **কারবারের অস্তিত্ব রক্ষা :** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ইহা কারবারের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করে।

(২) **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা :** বাজার সমীক্ষা করিয়া বিপণন চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আনে।

(৩) **নিশ্চিন্তভাব :** বিপণনের সাহায্যে উৎপাদক তাহার পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পায় এবং ভোক্তা সঠিক সময়ে চাহিদামাত্র পণ্যের যোগান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

(৪) **সরলতা ও সজীবতা সৃষ্টি :** বিপণনের সাহায্যে বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা জানিতে পারে এবং ক্রেতা দ্রব্যটির প্রাপ্তিস্থান জানিতে পারে।

(৫) **জীবিকার উপায় :** বিপণন পাইকার, দালাল, খুচরা কারবারী ইত্যাদির জীবিকার সংস্থান করে।

(৬) **চাহিদা সৃষ্টি :** বিপণন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুপ্ত চাহিদাকে জাগ্রত করে।

(৭) **ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি :** বিপণন সফল বাজার সৃষ্টি করে বলিয়া উৎপাদকের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়। উত্তম বিপণন ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদক ঝুঁকি লইয়া উৎপাদন কার্য চালাইতে পারে।

(৮) **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** বিপণন ভোক্তার ভোগস্পৃহা জাগ্রত করিয়া চাহিদায় বৈচিত্র্য আনে এবং জীবনযাত্রাব মান বৃদ্ধি করে।

(৯) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** ইহা নূতন কর্মস্থান সৃষ্টি করে এবং আয় বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে।

(১০) **চাহিদার দিক নিরূপণ :** চাহিদার গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া বিপণন চাহিদার পরিবর্তন নির্দেশ করে ও উৎপাদনে সাহায্য করে।

(১১) **উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা :** বিপণন স্থায়ী বাজার সৃষ্টি করিয়া দ্রব্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাহায্য করে।

(১২) **পণ্যের স্বত্বান্তরকরণ :** বিপণনের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় এবং পণ্যটি বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট পৌঁছায়।

বিপণনের কার্যাবলী (Functions of Marketing Management) :

বিপণন অধিকারগত, সময়গত ও স্থানগত উপযোগিতা সৃষ্টি করে। এই সকল উপযোগিতা সৃষ্টি করিবার জন্য বিপণনকে অনেকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে হয়। বিপণনের কার্যাবলী বিশ্লেষণে **পাইলের ও ক্লার্কের** শ্রেণীবিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

পাইলের বিপণন প্রক্রিয়া

কেন্দ্রীকরণ	বিলি-বণ্টন
(১) ক্রয় ও একত্রীকরণ	(১) বিক্রয়
(২) পরিবহণ	(২) পরিবহণ
(৩) গুদামজাতকরণ	(৩) গুদামজাতকরণ
(৪) পর্যায়করণ	(৪) পর্যায়করণ
(৫) অর্থসংস্থান	(৫) অর্থসংস্থান
(৬) ঝুঁকিবহন	(৬) ঝুঁকিবহন
	(৭) বিভাজন

ক্লার্কের বিপণন কার্যাবলী

বিনিময়ের কাজ	ভৌতিক সরবরাহের কাজ	সহজসাধ্য করিবার কাজ
(১) ক্রয়	(১) পরিবহণ	(১) অর্থ সংস্থান
(২) বিক্রয়	(২) গুদামজাতকরণ	(২) ঝুঁকিগ্রহণ
		(৩) বাজারের সংবাদ
		(৪) মান নির্ণয়

পাইল ও ক্লার্কের মতানুসারে বিপণন কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) **ক্রয়ঃ** উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীকেও তৈয়ারী পণ্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। পণ্য ক্রয়ে পণ্যের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা, মান, উৎকর্ষ, পরিমাণ, মূল্য, উৎস, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, গুদামজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হয়। দ্রব্যটি দেখিয়া অথবা দ্রব্যের নমুনা অনুসারে অথবা দ্রব্যের বর্ণনা শুনিয়া উহা ক্রয় করা হয়।

(২) **একত্রীকরণ:** অনেক সময় উৎপাদনের কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য বিভিন্ন উৎস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ক্রীত দ্রব্যাদি একস্থানে সংগ্রহ করা ও একত্রীকরণ করা বিপণনের কাজ।

(৩) **বিক্রয়ঃ** বিক্রয় কারবারে সাফল্য আনে। বিপণন পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করে। পণ্যের বাজার, খরিদ্দারের চাহিদার স্বরূপ, রুচি, পছন্দ, পণ্যের দাম নির্ধারণ ইত্যাদি উপাদান বিক্রয়ের বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচ্য। বিপণন গবেষণা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিক্রয়ে সাফল্য আনে। দর্শন, নমুনা অথবা বর্ণনার ভিত্তিতে বিক্রয় করা যায়। খরিদ্দার সৃষ্টি ও বিক্রয় করাই বিক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য।

(৪) **পরিবহণঃ** পণ্যের বাজার স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হইতে পারে। বিপণনের ক্ষেত্রে পরিবহণ স্থানগত, আকারগত, সময়গত ও প্রচারগত উপযোগিতা সৃষ্টি করে।

(৫) **গুদামজাতকরণ** : একসঙ্গে বহুল উৎপাদন বা প্রচুর পণ্য ক্রয় করিলে উহা গুদামজাত করিয়া রাখিতে হয়। পণ্য গুদামজাত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে সঠিক সময়ে বাজারের চাহিদা ও ব্যাপকতা নির্ধারণ করিয়া পণ্য সরবরাহ করিতে হয়।

(৬) **অর্থসংস্থান** : পণ্য উৎপাদন, পণ্য মজুতকরণ, ধারে পণ্য বিক্রয় করা, পরিবহণ-ব্যয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার-ব্যয়, বিক্রয়িক ও কর্মচারীদের বেতন-ব্যয় ইত্যাদি নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থান প্রয়োজন।

(৭) **মাননির্ণয়, পর্যায়করণ, নামকরণ ও নমুনাকরণ** : গুণ অনুসারে পণ্যের মাননির্ণয়, শ্রেণীভুক্তকরণ, নামকরণ ও নমুনাকরণ প্রয়োজন হয়।

(৮) **প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কজাতকরণ** : পণ্যকে ভোক্তার ব্যবহার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা বিপণনের কাজ। পণ্য স্থানান্তরের জন্য উত্তমরূপে মোড়ক করিতে হয়। তাহাছাড়া, পণ্যের প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যও মোড়কের প্রয়োজন। পণ্যের প্রকৃতি ও গুণাগুণ অনুসারে মোড়ক কি প্রকার হইবে তাহা ঠিক করা হয়।

(৯) **বণ্টন** : পণ্যবণ্টন প্রণালী সরাসরি দোকান মারফত অথবা বিক্রয়িক বা মধ্যস্থ কারবারীর মাধ্যমে হইতে পারে। পণ্যের প্রকৃতি, দূরত্ব, পরিবহণ-ব্যয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া বণ্টন প্রণালী স্থির করা হয়।

(১০) **বিক্রয়কুশলতা** : দক্ষ বিক্রয়িক নিযুক্ত করিয়া সম্ভাব্য ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং পণ্যের গুণাগুণ তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরা বিপণনের কাজ।

(১১) **বিজ্ঞাপন** : বিজ্ঞাপন বিপণনের একটি শক্ত হাতিয়ার। ইহা নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে, বর্তমান চাহিদা ধরিয়া রাখে এবং চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়।

(১২) **বীমাকরণ** : পণ্যের স্থানান্তরকরণের সময় পণ্য অগ্নিতে বিনষ্ট হইতে পারে, জলমগ্ন হইতে পারে অথবা চুরি হইতে পারে। এই সকল দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবার উদ্দেশ্যে পণ্য বীমা করা বিপণনের কাজ।

(১৩) **ঝুঁকি গ্রহণ** : পণ্যের মূল্য পরিবর্তন, চাহিদার পরিবর্তন, তীব্র প্রতিযোগিতা, সরকারী নীতি ইত্যাদি কারণে নানাবিধ ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এই সকল ঝুঁকি বহন করা বিপণনের কাজ।

(১৪) **গবেষণা** : বাজার সম্পর্কে নানাবিধ বিষয় যেমন, পণ্যের চাহিদা, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, প্রতিযোগীদের পণ্যমূল্য, মান ও উৎকর্ষ ইত্যাদি জানিবার জন্য বিপণন গবেষণার প্রয়োজন।

বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী (Functions of Marketing Manager) :

বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

(১) **বিপণন গবেষণা** : জনসংখ্যা, সম্ভাব্য ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস, খরিদ্দারের মনস্তত্ত্ব ও চাহিদা, প্রযুক্তিবিদ্যার গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি জানিবার জন্য তাঁহাকে বিপণন গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হয়।

(২) **বিক্রয় লক্ষ্য নির্ধারণ :** বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার (Sales Target) উপর উৎপাদনের মাত্রা নির্ভরশীল। সঠিকভাবে বিপণন গবেষণা করিয়া তাঁহাকে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করিতে হয়।

(৩) **চাহিদা সৃষ্টি :** ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পণ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ, মেলা, প্রদর্শনী, প্রচার, বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা ও নমুনা বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাকে ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া সক্রিয় চাহিদা সৃষ্টি করা তাঁহার কাজ।

(৪) **খরিদ্দার তালিকা প্রস্তুত করা :** সম্ভাব্য খরিদ্দারগণের নাম, ঠিকানা ইত্যাদির সূচীপত্র প্রস্তুত করা তাঁহার অন্যতম কাজ।

(৫) **বিক্রয় নীতি স্থির করা :** বিপণনের উৎকর্ষসাধনের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত বিক্রয় নীতি স্থির করিতে হয়।

(৬) **সহযোগিতা ও সংযোজনা :** বিপণনের উদ্দেশ্য ও নীতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া বিপণন কার্যে সহযোগিতা আহ্বান করা তাঁহার কাজ। বিপণন ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন কার্যধারা যেমন, ক্রয়, একত্রীকরণ, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন গবেষণা, মূল্য নির্ধারণ, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়কলা ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হয়।

(৭) **ধারে বিক্রয়ের নীতি স্থির করা :** কতদিনের জন্য ধারে পণ্য বিক্রয় করা হইবে এবং কি শর্তে ধারে পণ্য বিক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করাও তাঁহার কাজ।

(৮) **আদায়-নীতি :** বিপণন ব্যবস্থাপক আদায়-নীতি (Collection Policy) স্থির করেন।

(৯) **বাট্টা-নীতি :** কত পরিমাণ বিক্রয়ে কত শতাংশ বাট্টা (Discount) দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা তাঁহার কাজ।

(১০) **তদারকি :** বিক্রয় ব্যবস্থাপক, বাজার গবেষক ও বিপণন কর্মচারীদের কার্যকলাপ তদারক করা তাঁহার অন্যতম কাজ।

(১১) **প্রতিবেদন পেশ করা :** নির্দিষ্ট সময় অন্তর মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট তাঁহাকে বিপণন কার্যকলাপের উপর প্রতিবেদন পেশ করিতে হয়।

বিপণন কার্যকলাপ (Marketing Activities) :

ক্রয়, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, একত্রীকরণ, পরিবহণ, পর্যায়করণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ, অর্থসংস্থান, বিপণন গবেষণা, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যকলাপ বিপণনের অন্তর্ভুক্ত।

বিপণন-গবেষণা (Marketing Research) :

আধুনিক বণ্টন ও বিপণন-ব্যবস্থায় বিপণন-গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইহা একদিকে বিজ্ঞাপন অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত ও অন্যদিকে বিপণন কর্মধারাকে প্রভাবিত করে। এই গবেষণার প্রধান প্রধান বিষয়-বস্তু হইল : (ক) বিক্রয়যোগ্য পণ্য-সম্বন্ধীয় গবেষণা, (খ) বাজার-সম্বন্ধীয় গবেষণা ও (গ) বিক্রয়-পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় গবেষণা।

'আমেরিকান মারকেটিং এসোসিয়েশন' (American Marketing Association) বিপণন-গবেষণার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন : "বিপণন-গবেষণা বুদ্ধিদীপ্ত ও নিয়মানুগ পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া উহার মাধ্যমে বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের সনাক্ত করে এবং তাহাদের প্রয়োজন নির্দেশ করে যাহাতে কারবারী জগতের অনিশ্চয়তার ভার হ্রাস করা সম্ভব হয় (an intelligent and systematic collection, analysis and interpretation of data to identify the present and potential customers and their specific needs with a view to reducing the burden of uncertainties surrounding business world.)

বিপণন-গবেষণাকে বিপণন-সংক্রান্ত উপাত্ত, তথ্য ও সমাচার সংগ্রহের এবং বিশ্লেষণের বর্ণালী (Spectrum) বলা হয়।

বিপণন-গবেষণা হইল বিপণন-ব্যবস্থার রঞ্জনরশ্মি দ্বারা গৃহীত আলোকচিত্র গ্রহণ এবং বিপণন-ব্যবস্থার রোগ নিরূপণ পদ্ধতি (Market research is the radiology and pathology of Marketing)। X-ray বা রঞ্জনরশ্মি দ্বারা যেমন রোগীর দেহাভ্যন্তরের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া রোগ নিরূপন-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ সঠিক রোগ নিরূপণ করেন, বিপণন-গবেষণাও তেমনি বিপণন-ব্যবস্থার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া বিপণন ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি নিরূপণ করে।

বিপণন গবেষণার উদ্দেশ্য (Purposes of Marketing Research) :

বিপণন-গবেষণা বিপণন কর্মধারার ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হইল :

(১) বাজার সনাক্তকরণ ও বিক্রয়াঞ্চলের বিস্তৃতি স্থির করা।
(২) সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা নির্ণয় করা।
(৩) ক্রেতার চাহিদার ধরন ও আর্থিক ক্ষমতা নির্ধারণ করা।
(৪) পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা।
(৫) বিক্রয়যোগ্য পণ্য ও সেবার পরিমাণ নিরূপণ করা।
(৬) বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত মাধ্যম স্থির করা।
(৭) প্রতিযোগী সংস্থাসমূহের বিক্রয়-কৌশল, শক্তি ও নীতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া।
(৮) পণ্য-বণ্টন পদ্ধতি স্থির করা।
(৯) বণ্টনস্থলে পণ্য-মজুতের পরিমাণ স্থির করা।
(১০) বিক্রয়াঞ্চলে বিক্রয়িক (Salesman) নিয়োগ করা।

বিপণন-গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Marketing Research) :

বিপণন-গবেষণাকার্য তিনভাগে বিভক্ত। ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) ক্রেতা-সংক্রান্ত গবেষণা (Consumer-Research) : এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা বাজার অনুসন্ধানকারী (Field Investigator) নিযুক্ত করে এবং ক্রেতার সহিত সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্য হইতে

ক্রেতার চাহিদার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়। বিক্রেতা সাধারণতঃ একটি প্রশ্নাবলী (Questionnaire) তৈয়ারী করিয়া ক্রেতাদের মতামত সংগ্রহ করে। ক্রেতা কোন্ জাতীয় ব্র্যাণ্ড ব্যবহার করে, পছন্দের কারণ, পণ্যটির মূল্য, প্রকৃতি ও গুণাগুণ, ক্রেতা পণ্যটি কি পরিমাণ ক্রয় করে, কোথা হইতে ক্রয় করে, ক্রেতার মাসিক আয় ইত্যাদি বিষয় প্রশ্নাবলীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(২) **ব্যবসা প্রতিনিধি-সংক্রান্ত গবেষণা** (Dealers-Research): এই জাতীয় গবেষণায় ব্যবসায়ীরা কোন্ শ্রেণীর পণ্য বিক্রয় করিতে পছন্দ করে, কি ধরনের বিক্রেতা ঐ পণ্যটি ক্রয় করে, বিক্রয়ের পরিমাণ, কমিশন বা দস্তুরির হার ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তথ্যভিত্তিক প্রচার অভিযান চালান হয়।

(৩) **মাধ্যম-সংক্রান্ত গবেষণা** (Media-Research): মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবহন ক্ষমতার (Circulation Power) তথা, মাধ্যম হিসাবে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার কার্যকারিতা, বিজ্ঞাপন ফলক বসাইবার স্থান নির্বাচন ইত্যাদি এইরূপ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

বিপণন গবেষণার উৎসসমূহ (Sources of Marketing Research):

অভ্যন্তরীণ উৎস: কারবারের বিভিন্ন নথিপত্র, চিঠিপত্র, হিসাবের বই ইত্যাদি বিপণন গবেষণার অভ্যন্তরীণ উৎস।

বাহ্যিক উৎস: বাহ্যিক উৎস দুই প্রকার:

(১) **প্রাথমিক উৎস:** নিরীক্ষণ ও প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে কারবারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এই উৎস আবার তিন প্রকার হইতে পারে: (ক) **বিয়ক্রিক:** ইহারা পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথা জানায়, (খ) **প্রতিনিধি** বা **ডিলার:** পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী ও বিক্রয় প্রতিনিধি পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার মতামত ও মনোভাব জানায়; (গ) **সম্ভোগকারী:** বাছাই করা সম্ভোগকারীর নিকট পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার পছন্দ, অপছন্দ, অভিযোগ, মতামত ইত্যাদি জানা যায়।

(২) **গৌণ উৎস:** বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান যাহারা পণ্য বিপণনের নানাবিধ তথ্য ও সমাচার সংগ্রহ ও পরিবেশন করে তাহাদের নিকট হইতে বিপণন গবেষণার তথ্যসমূহ পাওয়া যায়। তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলি হইল: (ক) **ব্যবসায়িক পত্রিকা** যেমন, কমার্স, ইকনমিক টাইমস্, ক্যাপিটাল পত্রিকা ইত্যাদি; (খ) **প্রকাশিত তথ্য** যেমন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ব্যালান্স শীট বা উদ্বর্তপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব, বার্ষিক বিবরণী ইত্যাদি; (গ) **সরকারী ও বেসরকারী বিবরণী ও পুস্তিকা** যেমন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, ইকনমিক সার্ভে রিপোর্ট ইত্যাদি; (ঘ) **বণিক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য** যেমন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি।

(ঙ) **আন্তর্জাতিক প্রকাশন** যেমন, রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আই এম এফ (IMF), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) ইত্যাদি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক।

(চ) **আদমসুমারীর বিবরণ:** ইহা হইতে জনসংখ্যা, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, বয়স, অর্থ নৈতিক গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি জানা যায়।

ক্রয়-বিক্রয় (Buying and Selling): কোন মানুষের পক্ষেই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নহে। আবার মানুষের অভাব যতই বাড়িতে থাকে, অভাব মিটাইবার জন্য ততই অধিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যাহার যে দ্রব্য উৎপাদনে বেশী দক্ষতা আছে, সে কেবল সেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকে, অন্য দ্রব্য উৎপাদন করে না। ফলে, উৎপাদনকারী যে দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং নিজের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যের নিকট হইতে সে সংগ্রহ করে। এই প্রথায় দ্রব্য-বিনিময়কে **সরাসরি পণ্য-বিনিময়** (Barter) বলা হয়। সরাসরি পণ্য-বিনিময়ের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নততর জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিল, ফলে মানুষের অভাব বোধও বাড়িতে লাগিল। তখন সরাসরি পণ্য-বিনিময় (Barter) দ্বারা মানুষের অভাব মিটান অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই কারণে টাকা-পয়সার (অর্থের) প্রচলন আরম্ভ হইল। অর্থের প্রচলন হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য-বিনিময় আরম্ভ হইল। বর্তমানে অর্থের বিনিময়েই দ্রব্যের আদান-প্রদান চলিতেছে। অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য গ্রহণ করাকে ক্রয় বলা হয়, আর অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য প্রদান করাকে বিক্রয় বলা হয়।

ক্রয়-বিক্রয় কারবারের সংকটপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (Purchase and Sale are the Critical Areas of Business):

ক্রয় ও বিক্রয়—এই দুইটি কার্য কারবারের প্রধান অঙ্গ। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্য দিয়াই পণ্যসামগ্রী ভোগকারীর হাতে পৌঁছায়। ক্রয়-বিক্রয় না থাকিলে মানুষের অভাব মিটান সম্ভব হয় না। উৎপাদন, ভোগ অথবা পুনর্বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ এবং পণ্যাদি সংগ্রহ করার নাম ক্রয়। বাজারের চাহিদা, প্রতিযোগিতা ও লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া সফল বিক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। প্রত্যেক কারবারী দ্বৈত ভূমিকা পালন করে—একটি ক্রয়ের ভূমিকা এবং অপরটি বিক্রয়ের ভূমিকা। উৎপাদক ও ভোক্তার ব্যবধান, মধ্যস্থ কারবারীর আবির্ভাব, প্রতিযোগিতা, ক্রয় ও বিক্রয়ের বর্ধিত ঝুঁকি, পণ্যের ও চাহিদার বৈচিত্র্য, বাজারের ব্যাপকতা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রকে সংকটময় করিয়াছে।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয় উভয় কার্যই অপরিহার্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে নানাবিধ কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ক্রয় করিতে হয়। কাঁচামালের সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্য তাহারা পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। কম মূল্যে ও সুবিধাজনক শর্তে দ্রব্য ক্রয়

করিতে পারিলে ব্যবসায়িগণ লাভজনক উপায়ে ব্যবসা করিতে পারে। কম মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইলেও ব্যবসায়ী কখনও এমনভাবে মূল্য বাড়াইবে না যাহাতে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য বেশী দাবী করিলে ক্রেতা অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা যে মূল্য দাবী করিবে, ক্রেতা সেই মূল্যেই দ্রব্য কিনিতে বাধ্য নহে। সুতরাং বিক্রেতাকে এমনভাবে মূল্য স্থির করিতে হইবে যাহাতে তাহার যথেষ্ট মুনাফা হয়, অথচ সেই মূল্যে ক্রেতাও আকৃষ্ট হয়। কারবারের সাফল্য বহুলাংশে দক্ষতার সহিত বিক্রয়-ব্যবস্থা পরিচালনার উপর নির্ভর করে।

কারবারের ক্রয়কার্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অনুধাবনযোগ্য :

(১) কি ধরনের কাঁচামাল ক্রয় করিতে হইবে ,

(২) কিরূপ মানের ও গুণগত উৎকর্ষযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে ,

(৩) উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কত পরিমাণ কাঁচামাল মজুত রাখিতে হইবে ;

(৪) উৎপাদন ও বিক্রয় অব্যাহত রাখিবার জন্য ঠিক কোন্ সময়ে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হইবে ,

(৫) কোথা হইতে বা কোন্ সূত্র হইতে উহা ক্রয় করা হইবে ;

(৬) কোথায় সুবিধা দরে অথচ মানসম্পন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে ,

(৭) কত পরিমাণ দ্রব্য একসঙ্গে কিনিলে সুবিধা দরে ক্রয় করা যাইবে , ইত্যাদি।

বিক্রয়-ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইলে মুনাফা হয়। দক্ষ বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য :

(১) কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Sales Target) পূর্বানুমান করিতে হইবে ;

(২) ক্রেতা-সাধারণের রুচি ও পছন্দ (Taste and Fashion) অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে ;

(৩) বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) বিক্রয় বৃদ্ধির (Sales Promotion) উপায়সমূহ, যেমন, নমুনা বিতরণ, বিক্রয় প্রতিযোগিতা সংগঠন, মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, পুরস্কারের ব্যবস্থা, জন-সংযোগ ব্যবস্থা, বাট্টা-প্রদান ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে ;

(৫) পণ্যের বিক্রয়মূল্য কিরূপ হইলে অধিক বিক্রয় হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে ;

(৬) প্রতিযোগিগণের বিক্রয়-নীতি জানিতে হইবে ;

(৭) সুষ্ঠু বিক্রয় সংগঠন (Sales Organisation) গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ক্রেতার শ্রেণীভেদ
(Classification of Buyers)

যাহারা পণ্য ক্রয় করে তাহারা ক্রেতা বা খরিদ্দার। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুই-ই আছে, তাহাদেরও ক্রেতা বলা হয়।

ক্রেতা কি প্রকারের পণ্য ক্রয় করিবে, কত পরিমাণে ক্রয় করিবে, কি উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবে ইত্যাদি নানা দিক বিচার করিয়া ক্রেতাগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু ক্ষমতা নাই, এমন ব্যক্তি ক্রেতা নহে।

(১) **উৎপাদক-ক্রেতা অথবা উৎপাদনকারী ক্রেতা (Producer-Buyer)**ঃ যাহারা দ্রব্য বা পণ্য ক্রয় করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য দ্বারা নূতন দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহাদের উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদক-ক্রেতা বলা হয়। ইহারা যে দ্রব্য ক্রয় করে তাহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন, কাঁচাতুলা, কাঁচাপাট, নানাবিধ বনজ ও খনিজদ্রব্যের ক্রেতা। ইহারা সাধারণতঃ এককালীন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে। ইহারা শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

(২) **পাইকারী ক্রেতা (Wholesale-Buyer)**ঃ পাইকারী ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা আয় করে। ইহারা সর্বদাই এককালীন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে। তবে যখন বিক্রয় করে, পাইকারী হিসাবেই বিক্রয় করে, কিন্তু খুচরা বিক্রয় যে করে না তাহা নহে।

(৩) **খুচরা ক্রেতা (Retail Buyer)**ঃ খুচরা ক্রেতাও মুনাফার জন্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা এককালীন স্বল্প পরিমাণে ক্রয় করে এবং স্বল্প পরিমাণে বিক্রয় করে।

(৪) **ভোগকারী ক্রেতা (Consumer-Buyer)**ঃ ভোগকারী ক্রেতা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই দ্রব্য ক্রয় করে। ভোগকারী ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় তাহা বিক্রয় করে না।

বিক্রেতার শ্রেণীভেদ
(Classification of Sellers)

ক্রেতার মত বিক্রেতারও শ্রেণীভেদ আছে। দ্রব্যের রকম, বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বিক্রেতাগণকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

(১) **উৎপাদনকারী বা উৎপাদক-বিক্রেতা (Producer-Seller)**ঃ যে বিক্রেতা শুধুমাত্র নিজের উৎপাদিত দ্রব্যই বিক্রয় করে, তাহাকে উৎপাদক-বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী বিক্রেতা বলে। কৃষক নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে, খনির মালিক নিজের খনি হইতে উত্তোলিত দ্রব্য বিক্রয় করে, আবার কল-কারখানার মালিকও নিজের কল-কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা সকলেই উৎপাদক-বিক্রেতা অথবা উৎপাদনকারী বিক্রেতা।

(২) **পাইকারী বিক্রেতা (Wholesaler) ঃ** পাইকারী বিক্রেতা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করে। তবে কোন কোন সময়ে ইহারা যে খুচরা হারে (অল্প পরিমাণে) দ্রব্য বিক্রয় করে না, তাহা নহে। সাধারণতঃ ইহাদের এককালীন বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বেশী হয়।

(৩) **খুচরা বিক্রেতা (Retailer) ঃ** খুচরা বিক্রেতা অল্প পরিমাণে বিক্রয় করে। ইহারা সাধারণ ভোগকারীর চাহিদা অথবা অভাব অনুসারে স্বল্প পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি অত্যাবশ্যক দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Brief discussion of the three essential aspects of buying and selling) ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কথা ক্রয়-বিক্রয়। এই ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি অত্যাবশ্যক বিষয় হইল ঃ

(১) ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য ,
(২) দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় ,
(৩) মূল্য পরিশোধ।

(১) **ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য ঃ** পণ্য ভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব নয়। পণ্য কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নানা ধরনের হইতে পারে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হইবার পূর্বে সর্বাগ্রে পণ্যের সর্ববিধ পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক : (ক) পণ্য কি জাতীয় , (খ) পণ্যের গুণাগুণ , (গ) পণ্যের প্রাপ্তিস্থান ; (ঘ) পণ্যের মূল্য , (ঙ) পণ্যের অনুমোদিত ব্যবসা-চিহ্ন ; (চ) পণ্যের শ্রেণীবিভাগ ; (ছ) বিক্রয় পরিমাণ স্থিরীকরণের উপায় , (জ) কিরূপে পণ্যের মোড়ক বা বাঁধাই হয়, ইত্যাদি বিশেষভাবে জানিতে হয়। আবার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রস্তুত থাকিতে পারে অথবা চুক্তি সম্পাদনের পর ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে। শেষোক্ত পণ্যকে 'ভবিষ্যৎপণ্য' (Future Goods) বলে।

পণ্যের গুণমান সাধারণতঃ **ব্যবসা-চিহ্ন** বা বিশেষ চিহ্নের ছাপ, যেমন, মোড়কের উপর **শঙ্খ চিহ্ন** আঁকা থাকিলে, তাহার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় **ট্রেড মার্ক** আইনের দ্বারা ব্যবসা-চিহ্ন রেজিস্ট্রি করান হয়। ব্যবসা চিহ্ন বিজ্ঞাপনের কাজ করে ও জাল পণ্যের হাত হইতে পণ্যের গুণকে রক্ষা করে।

নামকরণের (Branding) দ্বারাও পণ্যের গুণমান রক্ষিত হয়। ইহা সরকারী অনুমোদন পাইলে উৎপাদকের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করে। ইহাকে **পেটেন্ট** অধিকার বা উৎপাদী স্বত্ব (Patent Right) বলে।

পণ্যের স্তরবিভাগ (Grading) এবং **নামকরণ** (Branding) পণ্যের বিভিন্ন উপযোগিতা ও মূল্যের ক্রমসূচনা করিয়া পণ্যের গুণমান প্রকাশ করে।

পণ্যের মোড়ক দেখিয়া ক্রেতা দ্রব্য চিনিতে পারে। পণ্যের গুণগত মূল্য ও পরিমাণ অনুযায়ী মোড়ক স্থির করা হয়। মোড়কের ওজন বাদ দিয়া দ্রব্যের ওজন কত তাহা মোড়কের উপর লেখা হয়।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে।

(২) **দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয়ঃ** ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময় দ্রব্য সরবরাহের শর্ত এবং মালিকানা হস্তান্তরের সময় মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় নির্ভর করে: (ক) সরবরাহের সময়; (খ) অবিলম্বে সরবরাহ, দ্রুত সরবরাহ ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের চুক্তি; (গ) পরিবহণ-ব্যবস্থা, (ঘ) পরিবহণ-ব্যয় ইত্যাদির উপর।

(৩) **মূল্য পরিশোধঃ** ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের শেষ ধাপ হইল মূল্য পরিশোধ। মূল্য পরিশোধ-সংক্রান্ত বিষয়টি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত:

(ক) মূল্য নির্ধারণ, (খ) মূল্য পরিশোধের সময়; (গ) মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি।

(৪) **মূল্য-তালিকা ও বাজারদর তালিকা** মূল্য জ্ঞাপন ও মূল্য নিরূপণের কাজ করে। বিক্রেতা মূল্য-তালিকার দাম হইতে ক্রেতাকে শতকরা হারে যে 'বাদ' দেয়, তাহাকে **ব্যবসায়িক বাট্টা** (Trade Discount) বলে। আবার নগদে দ্রব্য ক্রয় অথবা দাম পরিশোধের সময়ের পূর্বেই মূল্য পরিশোধ করিলে ক্রেতা আরও কিছু শতকরা 'বাদ' পায়। তাহাকে **নগদ বাট্টা** (Cash discount) বলে।

মূল্য পরিশোধ চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা হুণ্ডির মাধ্যমে হইতে পারে। ক্রেতা ব্যাঙ্কে মূল্য প্রদান করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে পণ্যের স্বত্বের দলিলপত্র ছাড়াইতে পারে। কিন্তু ধারে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য হুণ্ডির দ্বারা পরিশোধ করা যায় অথবা প্রত্যয়পত্র (Promissory Note) দ্বারা পরিশোধ করা যায়। টাকার পরিমাণ কম হইলে 'মণি অর্ডার' মারফতও মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব।

মূল্য পরিশোধের সময় বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মূল্যপ্রদানকে 'নগদ পরিশোধ', দুই-চার দিনের মধ্যে মূল্য প্রদানকে 'দ্রুত পরিশোধ' ও নির্দিষ্ট সময় অন্তে মূল্য প্রদানকে 'বিলম্বিত পরিশোধ' বলে। মূল্য পরিশোধ নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের ভিত্তিতে হইলে তাহা দুই প্রকারের হইতে পারে; যেমন, (ক) কিস্তিবন্দী পরিশোধ ও (খ) কেয়ারা বা ভাড়া-ক্রয় পরিশোধ।

অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ধারে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অথবা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ ব্যক্তির সুনাম, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি সম্পর্কে সুপারিশ গ্রহণ করিতে হয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি অত্যাবশ্যক দিকের বিস্তারিত আলোচনা (Broad Discussion of the Three Essential Aspects of Buying and Selling) ঃ

ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিম্নলিখিত তিনটি অত্যাবশ্যক বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়: (১) সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-বিষয়ক তথ্যাদি, (২) দ্রব্য সরবরাহের সময় ও পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং (৩) মূল্যপ্রদান-ব্যবস্থা।

[১] সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-বিষয়ক তথ্যাদি :

ক্রেতা যে দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেই দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। ইহার মধ্যে পরিমাপের একক, ওজন, ফরমাশের পরিমাণ, গুণাগুণ, মোড়ক-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফরমাশ দিবার সময় সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দিলে পরে এ বিষয়ে বিক্রেতার কোনও ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধনের উপায় থাকে না।

(ক) **পরিমাপের একক (Unit of Measurement)** : খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাপের এককের গুরুত্ব খুব অধিক নহে। স্বল্প-পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হয় বলিয়া খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা চাহিদা অনুসারে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ক্রয় করে। কিন্তু পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ে এক-একটি দ্রব্যের এক-এক প্রকার পরিমাপের একক প্রচলিত আছে। আমরা আর্যায় পড়িয়াছি যে, ১২টিতে এক ডজন হয়। কিন্তু এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ে ১৩টিতে ডজন ধরা হয়। সাধারণ হিসাবে ২০ দিস্তা কাগজে এক রিম। এক দিস্তায় ২৪টি কাগজ থাকে। সেই হিসাবে ১ রিম কাগজে ৪৮০টি কাগজ হইবার কথা। কিন্তু রিম হিসাবে কিনিলে ১ রিমে ৫০০টি কাগজ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ী ক্রেতার পক্ষে কোন্ দ্রব্য কি হিসাবে বিক্রয় হয় তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন এবং উহা বিবেচনা করিয়া ক্রয়ের ফরমাশ দিতে হয়।

(খ) **ওজন (Weight)** : ওজনকে ব্যবসা ক্ষেত্রে দুইভাবে দেখা হয়। মোট ওজন (Gross Weight) এবং নীট ওজন (Net Weight)। কোনও দ্রব্যের নিজস্ব ওজনকে নীট ওজন বলা হয়। কিন্তু যে পাত্রে অথবা আধারে রাখা হয় উহার ওজনসমেত ধরিলে দ্রব্যটির যে ওজন হয়, তাহাকে মোট ওজন (Gross Weight) বলা হয়। আধার অথবা পাত্রটির ওজনকে বলা হয় কড়তা (Tare)। মোট ওজন হইতে কড়তা বাদ দিলে নীট ওজন পাওয়া যায়। শস্যজাতীয় দ্রব্য—ধান, গম ইত্যাদি বস্তায় পুরিয়া বিক্রয় হয়। তেমনি—তৈল, ঘি, বনস্পতি ইত্যাদি টিনে বিক্রয় হয়। ব্যবসায়ী ক্রেতার জানা প্রয়োজন যে, বিক্রেতা যে মূল্য উল্লেখ করিয়াছে উহা নীট ওজন কিংবা মোট ওজন অনুযায়ী কিনা। নচেৎ, হয়ত কোনও ক্রেতা মনে করিল যে, মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে (Quotation) যে মূল্য উল্লেখ করা হইয়াছে উহা নীট ওজনের কিন্তু সরবরাহের পর দেখা গেল যে, দ্রব্যটি মোট ওজন হিসাবে সরবরাহ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাহার লোকসান হয়। কারণ, যে পরিমাণ দ্রব্যের জন্য মূল্য দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। যখন একই সময়ে বেশী পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয় তখন প্রতিটি আধারের ওজন পৃথকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে আধারের গড় ওজন ধরিয়া মোট ওজন হইতে কড়তা বাদ দিয়া নীট ওজন বাহির করা হয়। আবার কাঁচামাল, তরি-তরকারি, চিনি, লবণ, গুড় ইত্যাদির বেলায় মোট ওজন হইতে চল্‌তি হিসাবে কিছু পরিমাণ চল্‌তা (Draft) বাদ দিবার রেওয়াজ আছে। তরি-তরকারি শুকাইয়া ওজন কমিয়া যায় ; চিনি, লবণ, গুড় ইত্যাদি গলিয়া যায়।

উহাতে ক্রেতার যে পরিমাণ লোকসান হইতে পারে তাহার পরিমাণ কমাইবার জন্যই চল্‌তা দেওয়ার রীতি। কোন্ দ্রব্যে কত পরিমাণ চল্‌তা বাদ দেওয়া হইবে তাহা দ্রব্য ও ব্যবসায়ের রীতির উপর নির্ভর করে।

পাইকারী ব্যবসায়ে কড়তা ও চল্‌তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ, পাইকারী ব্যবসায়ে যে ওজনের দ্রব্য পাওয়া যায়, উহা নীট ওজন হইতে অনেক বেশী। সর্বদাই যে কড়তার ওজন ও চল্‌তার ওজনের পরিমাণে ক্রেতার লোকসান হয়, তাহা নহে। সুতরাং, এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে ক্রেতার কিছু লাভও হইতে পারে।

(গ) **ফরমাশের পরিমাণ** (**Quantity to be ordered for**)ঃ অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে ক্রয়মূল্য কম পড়ে। তাহাতে অনেক সময়ে ব্যবসায়ী কম ক্রয়মূল্যের সুবিধা লইবার জন্য অধিক পরিমাণে ক্রয়ের ফরমাশ দিতে পারে। কিন্তু কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিলে ব্যবসায়ীর সর্বাধিক সুবিধা হইবে, তাহা কেবল ক্রয়মূল্যের সুবিধা দ্বারাই বিচার করা যায় না। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী ক্রেতাকে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া কার্য করিতে হয়, অর্থাৎ দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দিতে হয়।

ধরা যাক, ১ রিম কাগজের মূল্য ৮ টাকা। কিন্তু ১০ রিম কাগজ ক্রয় করিলে ৭৫ টাকায় পাওয়া যায়। সুতরাং, ব্যবসায়ী ক্রেতা মনে করিতে পারে যে, ১০ রিমের হিসাবে ক্রয় করাই সুবিধাজনক এবং প্রতি ১০ রিমে ৫ টাকা সুবিধা পাইবার জন্য সে প্রচুর পরিমাণে কাগজ সরবরাহের ফরমাশ দিতে পারে। কিন্তু ফরমাশ দিবার পূর্বে তাহাকে ভাবিতে হইবে যে, অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিলে অধিক দিন টাকা আবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ, উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে সময়ও অধিক লাগিবে। সেই সময়ের মধ্যে সেই টাকা অন্যভাবে খাটাইলে তাহার লাভ আশানুরূপ হইবে কিনা তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। সেই টাকা অন্য দ্রব্যে বিনিয়োগ না করিলেও ব্যাঙ্কে জমা রাখা যাইবে। ব্যাঙ্ক হইতে যে সুদ পাওয়া যাইবে তাহা যদি অধিক পরিমাণে কাগজ ক্রয় করিবার সুবিধা হইতে বেশী হয় তাহা হইলে উহা ক্রয় করিলে ব্যবসায়ীর কোনই সুবিধা হয় না, বরং লোকসানই হয়। সুতরাং, অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিবার দরুন কোনও সুবিধা হয় কিনা তাহা দেখিতে হইলে ক্রয়মূল্যের সুবিধা হইতে ক্রয়মূল্য পরিমাণ অর্থের উপর চলতি হারে সুদ বাদ দিতে হয়।

আবার, অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিলে উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ও অধিক হয়। ক্রীত দ্রব্য গুদামজাত করা হইলে গুদামের কত অংশ ঐ দ্রব্য অধিকার করিল তাহার হিসাবও প্রয়োজন। কারণ, গুদামের যত অংশ ঐ দ্রব্য অধিকার করিয়া থাকিবে, গুদাম ভাড়ার তত অংশ ঐ দ্রব্যকে হারাহারিতে বহন করিতে হইবে।

অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিলে সর্বদাই যে অসুবিধার সম্ভাবনা বেশী, তাহা নহে। অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবার ফলে ক্রয়মূল্যে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যবসায়ী ইচ্ছা করিলে প্রতিযোগী ব্যবসায়ী হইতে কম মূল্যে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে।

ফলে, অতি সত্বর ক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই দ্রব্যের ক্রয়মূল্য পরিমিত অর্থ ব্যবসায়ে ফেরত আনিতে পারে।

অনেক সময় ব্যবসায়ী অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে অনুমান করিয়া অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। দ্রব্যটির মূল্য যদি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় তবে তাহার লাভ হয়। কিন্তু যদি আকস্মিকভাবে মূল্য হ্রাস পায় তবে তাহার লোকসান হয়। এইরূপ সম্ভাবনার বিষয়ও তাহাকে বিবেচনা করিতে হয়। যে সকল দ্রব্যের মূল্য খুব ঘন ঘন উঠা-নামা (Fluctuate) করে সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিক্রেতা যদি ক্রেতার ফরমাশ অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ না করে তাহা হইলে ক্রেতার কর্তব্য কি হইবে?—ক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দিয়াছে বিক্রেতা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে তাহার ফরমাশ অনুসারে দ্রব্য রাখিয়া বাকী দ্রব্য ফেরত দিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ক্রেতা সম্পূর্ণ দ্রব্যও রাখিতে পারে। সম্পূর্ণ দ্রব্য রাখিলে অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য আনুপাতিক মূল্য দিতে হইবে।

কিন্তু বিক্রেতা যদি সরবরাহের ফরমাশ অপেক্ষা কম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিলে ক্রেতা সকল দ্রব্যই ফেরত দিতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা যে দ্রব্য পাঠাইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতেও পারে। এ অবস্থায় দ্রব্যের যোগানমত কেবল আনুপাতিক মূল্য দিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বিক্রেতা ফরমাশ ব্যতীত অন্য দ্রব্যও পাঠাইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিলে ক্রেতা সমস্তই ফেরত দিতে পারে অথবা কেবলমাত্র ফরমাশমত দ্রব্য রাখিয়া বাকী দ্রব্য ফেরত দিতে পারে।

(ঘ) গুণাগুণ (Quality) ঃ পাইকারী ব্যবসায়ে সর্বদাই বর্গ বা স্তর (Grade) অনুযায়ী অথবা পণ্য-চিহ্ন (Trade Mark) বা বিশেষ ছাপ (Brand) অনুসারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। কৃষিজাত দ্রব্য বর্গ অনুসারে এবং শিল্পীয় দ্রব্য পণ্য-চিহ্ন অথবা বিশেষ ছাপ অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। বর্গ ও পণ্য-চিহ্ন দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয় করে। সুতরাং, ব্যবসায়ী ক্রেতার পক্ষে ফরমাশ দিবার পূর্বে দ্রব্যের বর্গ অথবা পণ্য-চিহ্ন উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। বিক্রেতারও ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, সে সঠিকভাবে বুঝিতে পারে ক্রেতা কোন্ বর্গের অথবা কোন্ পণ্য-চিহ্ন-সম্বলিত দ্রব্যের ফরমাশ দিয়াছে। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি পাইলে যে বর্গ বা পণ্য-চিহ্নের ফরমাশ দিয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারে। ফরমাশে যে বর্গ অথবা পণ্য-চিহ্ন উল্লেখ করা হইয়াছে প্রেরিত দ্রব্যের সহিত তাহার তারতম্য হইলে ক্রেতার সম্পূর্ণ দ্রব্যই ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে।

(ঙ) মোড়ক (Packing) ঃ দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দেওয়ার সময়ই ক্রেতার জানা প্রয়োজন যে, বিক্রেতা দ্রব্যটিকে কিভাবে মোড়ক করিয়া পাঠাইবে;

পরিবহণকালে বার বার উঠান-নামান হইলে দ্রব্যের ক্ষতি হইতে পারে। সেইজন্যই দ্রব্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মোড়কের ব্যবস্থা থাকে। কাপড় জাতীয় দ্রব্য চটে মোড়ক করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম। কিন্তু ভঙ্গুর দ্রব্য কখনই চটে মোড়ক করিয়া পাঠান সম্ভব নহে। মোড়কের ব্যয় কে বহন করিবে ক্রেতার তাহা জানা প্রয়োজন। মোড়কের ব্যয় যদি তাহাকে বহন করিতে হয় তাহা হইলে তাহার ক্রয়মূল্য অধিক পড়িয়া যায়।

[২] দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় (**Matters relating to Delivery of Goods**) :

দ্রব্য সরবরাহ-সংক্রান্ত ফরমাশ দিবার পূর্বেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে স্থির হওয়া প্রয়োজন, বিশেষতঃ, সরবরাহের সময়, পরিবহণের ব্যবস্থা এবং পরিবহণ-ব্যয়। ইহা ছাড়া আরও খুঁটিনাটি ব্যাপার থাকিতে পারে যাহা ক্রেতার পক্ষে ফরমাশ দিবার পূর্বেই জানা প্রয়োজন।

(ক) **সরবরাহের সময়** (**Time of Delivery**) : কারবারী-জগতে অনেক সময় দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে সরবরাহের সময় স্থির করা হয়। ভাবী ক্রেতা দ্রব্য সম্বন্ধে ভাবী-বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান পত্রে সে কখন দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে তাহা জানিতে চাহিতে পারে, কিন্তু ক্রেতার অনুসন্ধান পত্রে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকিলে বিক্রেতাকেই অনুসন্ধান পত্রের উত্তরে মূল্যজ্ঞাপনের সহিত কখন দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে তাহা উল্লেখ করিতে হয়। দ্রব্য সরবরাহের সময় তিন প্রকার—অবিলম্বে বা তৎক্ষণাৎ সরবরাহ, দ্রুত সরবরাহ ও ভবিষ্যতে সরবরাহ।

(১) **অবিলম্বে সরবরাহ বা তৎক্ষণাৎ সরবরাহ** (**Ready Delivery**) : ক্রয়-বিক্রয়ের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি যখন বিক্রেতার নিকট মজুত থাকে এবং সরবরাহের ফরমাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করিবার ক্ষমতা থাকে, তখন বিক্রেতা 'অবিলম্বে সরবরাহ' এই কথাটি ব্যবহার করে।

(২) **দ্রুত সরবরাহ** (**Prompt Delivery**) : বিক্রেতার নিকট সংশ্লিষ্ট দ্রব্য মজুত না থাকিলেও বিক্রেতা যদি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দ্রব্যটি সরবরাহ করিতে পারে তবে 'দ্রুত সরবরাহ' কথাটি প্রয়োগ করে। অল্প কয়েকদিন বুঝাইতে কতদিন বুঝায়, তাহা ব্যবসায়ের রীতি অনুসারেই স্থির হইয়া থাকে।

(৩) **ভবিষ্যতে সরবরাহ** (**Future Delivery**) : এমন দ্রব্যও ক্রয়-বিক্রয় হয় যাহা এখনও উৎপাদন করা হয় নাই। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে। ভবিষ্যৎ সরবরাহে বিক্রেতা ভবিষ্যতে কোন এক নির্দিষ্ট তারিখে অথবা এক নির্দিষ্ট সময়ের পরে দ্রব্য সরবরাহ দিতে পারে, এইরূপ বুঝায়। সাধারণতঃ কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ, শিল্পীয় কাঁচামাল, পাট, তুলা, শণ ইত্যাদিই ভবিষ্যতে সরবরাহের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হয়। শিল্পজাত দ্রব্যও ভবিষ্যৎ সরবরাহের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

উদাহরণ : একজন কাপড়ের কলের মালিক অদ্য হইতে ১ মাস পরে সরবরাহ

দিবার চুক্তিতে প্রতি গাঁট ১০০ টাকা দরে ৫০০ গাঁট তুলা ক্রয় করিল। বিক্রেতা ১ মাস পরে বাজার হইতে ৫০০ গাঁট তুলা ক্রয় করিয়া সরবরাহ দিবে। ভবিষ্যতে সরবরাহ ক্রয়-বিক্রয়ে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একজনকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতে পারে। ১ মাস পরে তুলার দাম ১০০ টাকার স্থলে ৯৯ টাকা হইল। ঐ তারিখে ক্রেতা যদি বাজার হইতে ৫০০ গাঁট তুলা ক্রয় করিত তবে তাহার ৫০০ টাকা কম দিতে হইত। সুতরাং ভবিষ্যতে সরবরাহ চুক্তিতে ক্রেতার ৫০০ টাকা লোকসান হইল। বিপরীতভাবে, যদি ১ মাস পরে বাজারে তুলার দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতার লোকসান হয়। ভবিষ্যতে সরবরাহের কারবারকে **ফটকা কারবারও** বলা হয়।

কোন্ সময়ে দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে তাহা ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে লিখিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। চুক্তি-অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করা না হইলে ক্রেতা আইনতঃ সেই দ্রব্য ফেরত দিতে পারে।

(খ) পরিবহণ-ব্যবস্থা (Mode of Carriage)ঃ কোন্ পরিবহণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রেতা দ্রব্য পাঠাইবে তাহা ক্রেতার জানা প্রয়োজন। দ্রব্য পাঠাইতে কোন্ পরিবহণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা—(ক) পরিবহণ-ব্যয়, (খ) ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসা-স্থলের দূরত্ব, (গ) পরিবহণের গতিবেগ, (ঘ) দ্রব্য কি পরিমাণ স্থান অধিকার করিতে পারে, (ঙ) দ্রব্য ভারী কিংবা হাল্কা, (চ) দ্রব্যের মূল্য, (ছ) একসঙ্গে কত পরিমাণ দ্রব্য বহন করা সম্ভব, ইত্যাদি।

পরিবহণ-ব্যয় কত হইবে তাহার উপর পরিবহণের উপায় স্থির করা অনেকাংশে নির্ভর করে। পরিবহণ-ব্যয় যদি অধিক পড়ে তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়। সুতরাং ব্যবসায়ী সর্বদা এমন পরিবহণ-ব্যবস্থার সাহায্য লইতে চাহে যাহাতে পরিবহণ-ব্যয় অধিক না হয়। এই কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থা না হইলে সাধারণতঃ বিমানপথে দ্রব্য পরিবাহিত হয় না। কারণ, বিমানে দ্রব্য পরিবহণের ব্যয় খুবই অধিক। আবার যে সকল দ্রব্যের মূল্য খুব অধিক অথচ তুলনায় খুব কম স্থান অধিকার করে, অথবা যাহা খুব হাল্কা সেই সকল দ্রব্য বিমানপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এমন অবস্থা যদি হয় যেক্ষেত্রে বিমানপথ ব্যতীত দ্রব্য চলাচল সম্ভব নহে, সেক্ষেত্রে বিমান পরিবহণের ব্যয় বেশীই হোক না কেন বিমানেই পণ্য পরিবহণ করিতে হয়।

দূরত্বও পরিবহণ-পদ্ধতি স্থির করিবার পক্ষে একটি বিচার্য বিষয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসা-স্থলের দূরত্ব বেশী হইলে জলপথে, রেলপথে অথবা সড়কপথে ট্রাক, লরি ইত্যাদি মারফত দ্রব্য পাঠান হয়। এই প্রকার অবস্থায় জাহাজে কিংবা রেলপথে মাল পাঠান হইবে কিনা তাহা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উত্তর প্রদেশ হইতে শর্করা-শিল্পের জন্য ইক্ষু আনিতে হইলে ট্রাক অথবা লরি অপেক্ষা রেলপথে আনাই সুবিধাজনক।

কারণ, রেলগাড়ীর গতিবেগ অনেক বেশী। অথবা মনে করা যাক, মাদ্রাজ হইতে বোম্বাইয়ে আকরিক লৌহ পাঠান হইবে। সেক্ষেত্রে রেলগাড়ীতে না পাঠাইয়া জাহাজ-যোগে পাঠান সম্ভব। কারণ, লৌহ এমন জিনিস যাহা পরিবহণে সময় অধিক লাগিলেও উহার গুণহানি হইবে না।

যে দ্রব্য বহন করা হইবে উহার মূল্য কি এবং মূল্যের তুলনায় উহা কতটা স্থান অধিকার করিতে পারে তাহার উপর পরিবহণের মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করে। কয়লার মূল্য কম, কিন্তু উহা অনেকটা স্থান অধিকার করে। সুতরাং কয়লা পরিবহণের জন্য রেলগাড়ী অথবা জাহাজ উভয় মাধ্যমই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচার করিতে হইবে, যে স্থান হইতে যে স্থানে কয়লা পাঠান হইবে উভয় স্থানে রেল ও জাহাজ দুইটির মধ্যে কোন্‌টির চলাচল সুবিধাজনক। অনেক জায়গা আছে যেখানে ভাল পোতাশ্রয় নাই, কিন্তু অন্যান্য দিক বিচার করিলে জাহাজে পাঠানই সুবিধাজনক, সেখানেও জাহাজে দ্রব্য পাঠান সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রেলগাড়ীতে দ্রব্য পাঠান সুবিধাজনক। কিন্তু রেলগাড়ীতে স্থান (ওয়াগন) সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয়। সুতরাং যদি দ্রব্যটি সত্বর পৌঁছাইবার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে রেলগাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া স্থলপথের সুবিধা থাকিলে লরি অথবা ট্রাকযোগে দ্রব্যটি পাঠান হয়।

এমন দ্রব্য আছে যাহা ভঙ্গুর—যেমন, কাঁচদ্রব্য। এই প্রকার দ্রব্য রেলযোগে পাঠাইলে পথে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। রেলগাড়ীতে উঠান ও রেলগাড়ী হইতে নামান ইত্যাদি কারণে ভঙ্গুর দ্রব্য সহজেই ভাঙিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভঙ্গুর দ্রব্য সাধারণতঃ নদীপথেই পাঠান হয়। তবে দ্রব্যটির পরিমাণ কম হইলে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসা-স্থলের দূরত্ব কম হইলে টেম্পো, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী ইত্যাদিতেও দ্রব্য পাঠান হয়।

পাহাড় অঞ্চলে দ্রব্য পরিবহণ খুবই কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। এমন জায়গা আছে, যেখানে রেলগাড়ীর ব্যবস্থা নাই, লরি বা ট্রাকে দ্রব্য পরিবহণ বিপজ্জনক, সেক্ষেত্রে একমাত্র মানুষই স্থানান্তরে দ্রব্য বহন করে। এইরূপ জায়গায় দ্রব্য পাঠাইতে হইলে পরিবহণ-ব্যবস্থার মাধ্যম বিচার করিবার সুযোগ থাকে না। যে স্থানে বিকল্প পরিবহণ-ব্যবস্থা আছে সেই স্থানেই পরিবহণ মাধ্যম বাছিয়া লইবার সুযোগ থাকে।

(গ) পরিবহণ ব্যয় (Freight)ঃ পরিবহণের ব্যয় বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে কে বহন করিবে তাহা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইবার পূর্বেই স্থির করা প্রয়োজন। ইহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মূল্যজ্ঞাপন পত্রে উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ বিক্রেতা পরিবহণ ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করিতে রাজী, কিংবা মোটেই বহন করিতে রাজী নহে, অথবা আংশিক গ্রহণ করিতে রাজী—মূল্যজ্ঞাপন পত্রে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম অনুসারে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার দ্রব্যটি সংগ্রহ করা উচিত এবং দ্রব্য পরিবহণের ব্যয়ও ক্রেতার বহন করা উচিত। কিন্তু ক্রেতা সর্বদাই আশা করে যে, বিক্রেতা পরিবহণ-ব্যয়ের কিছু অংশ বহন করুক। সুতরাং, মূল্যজ্ঞাপন পত্রে বিক্রেতাকে উল্লেখ

করিতে হয় যে, সে পরিবহণ-ব্যয় বহন করিতে আদৌ রাজী আছে কিনা; অথবা রাজী থাকিলে পরিবহণ-ব্যয় সম্পূর্ণই বহন করিবে, না আংশিক বহন করিবে। পরিবহণ-ব্যয় ব্যতীত আরও একটি বিষয় বিক্রেতাকে মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে উল্লেখ করিতে হয়—ইহা হইতেছে কোন্ স্থান হইতে কি অবস্থায় দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে এই সকল তথ্য-প্রকাশমূলক যে সকল শব্দ মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে উল্লেখ থাকে তাহার কয়েকটির আলোচনা করা হইল :

(১) **Ex-warehouse or Ex-godown**—এই শব্দটির অর্থ হইল গুদামঘর হইতে। মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে মূল্যের সহিত এই শব্দটি সংযুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যটি বিক্রেতার গুদামঘর হইতে সরবরাহ করা হইবে, কিন্তু বিক্রেতার গুদামঘর হইতে ক্রেতাকে সেই দ্রব্যটি সংগ্রহ করিতে হইবে। বিক্রেতার গুদামঘর হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছাইবার পরিবহণ ব্যয় ক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে।

(২) **Loco**—মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে উল্লিখিত মূল্যের সহিত এই শব্দটি যুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যটি বিক্রেতার গুদামঘর অথবা বিক্রেতার দোকান যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ক্রেতাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই সরবরাহ করা হইবে। দ্রব্যটির জন্য মোড়ক ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়ও ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

(৩) **CIF**—ইহা Cost, Insurance & Freight কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মূল্যজ্ঞাপন-পত্রে CIF শব্দটি জুড়িয়া দেওয়া হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যের মধ্যে পরিবহণ-ব্যয় এবং বীমা মাশুলও ধরা হইয়াছে। অবশ্য ক্রেতার কারবারে নিকটবর্তী বন্দর অথবা রেল-স্টেশন পর্যন্ত পরিবহণ-ব্যয়ই ধরা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এইক্ষেত্রে চালানপত্রে দ্রব্যের মূল্য, বহন-ব্যয়, বীমার প্রিমিয়াম ও পরিবহণের মাশুল অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিক্রেতার কর্তব্য হইল পণ্য বীমা করা এবং পরিবহণের মাশুল প্রদান করা। যখন বিক্রেতা পণ্যের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করে অথবা জাহাজী দলিলাদি শর্তহীনভাবে ক্রেতার পক্ষে স্বত্বান্তরকরণ করে, তখন পণ্যটির স্বত্ব বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয়।

(৪) **CF**—ইহা Cost & Freight-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বিক্রেতা যে মূল্যজ্ঞাপন করিয়াছে উহাতে দ্রব্যের মূল্যের সহিত পরিবহণ-ব্যয়ও ধরা হইয়াছে। CIF-এর ন্যায় এক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে যে, ক্রেতার কারবারের নিকটতম বন্দর অথবা রেল-স্টেশন পর্যন্ত পরিবহণ-ব্যয়ই বিক্রয়মূল্যে ধরা হইয়াছে। ক্রেতা যদি দ্রব্যের বীমাকরণ চাহে তবে বীমা-মাশুল অতিরিক্ত দিতে হইবে।

(৫) **FOR**—ইহা Free on Rail-এর সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বিক্রেতা বিনা খরচায় রেলগাড়ীতে মাল তুলিয়া দিবে। কিন্তু রেলগাড়ীর ভাড়া এবং গন্তব্যস্থলে পৌছাইলে রেল-স্টেশন হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছাইতে যাবতীয় ব্যয় ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

(৬) **FOB**—ইহা Free on Board-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যখন মাল জাহাজে পাঠান হয় তখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জাহাজে মাল তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় বিক্রেতা বহন করিবে। কিন্তু জাহাজের ভাড়া এবং গন্তব্যস্থলে পৌছাইলে জাহাজ হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছাইবার ব্যয় ক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে।

এইরূপ ক্ষেত্রে চালানপত্রে পণ্যের মূল্য, বহন-ব্যয় ও জাহাজে পণ্য তুলিবার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্রেতাকে পণ্য বীমার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরিবহণের মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু বিক্রেতার কর্তব্য হইল ক্রেতাকে পণ্য বোঝাইয়ের সংবাদ জানান। যখন পণ্যটি জাহাজে তোলা হয়, তখন পণ্যের স্বত্ব বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয়।

(৭) **FAS**—ইহা Free Alongside Ship-এর সংক্ষিপ্ত আকার। ইহাও জাহাজে মাল পাঠাইবার ক্ষেত্রে মূল্য-উদ্ধৃতিতে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বিক্রেতা বন্দরে জাহাজের কাছে বিনা ব্যয়ে মাল সরবরাহ দিবে। জাহাজে মাল তুলিবার ব্যয়, জাহাজের মাশুল এবং গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌছাইলে জাহাজ হইতে ক্রেতার ঘরে মাল বহন করিবার সকল ব্যয় ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

এইক্ষেত্রে চালানপত্রে পণ্যের মূল্য এবং বহন-ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্রেতাকে পণ্যের উপর বীমা গ্রহণ করিতে হয়। পণ্যটি যখন বন্দরে আনিয়া জাহাজের ধারে রাখা হয়, তখন পণ্যের স্বত্ব বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয়।

(৮) **Carriage Paid**—যখন বিক্রেতা দ্রব্য পাঠাইবার ব্যয় বহন করিতে রাজী হয় তখন এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

(৯) **Carriage Forward**—যখন ক্রেতাকে পরিবহণের মাশুল বহন করিতে হয় তখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

(১০) **Franco**—ইহার বাংলা প্রতিশব্দ হইল **সর্বসাকুল্যে**। মূল্যবেদনপত্রে যে মূল্য উদ্ধৃত করা হয় তাহার সহিত এই শব্দটি যোগ করা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ক্রেতার ঘরে পৌছান পর্যন্ত সকল ব্যয়ই বিক্রয়মূল্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে। দ্রব্যটি যদি এমন হয় যে, উহাকে আমদানি-শুল্ক দিতে হইবে, তাহা হইলে আমদানি-শুল্কও দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিনা খরচায় সরবরাহ (Free Delivery) বুঝাইতেও এই কথাটি ব্যবহার করা হয়।

পণ্য বা দ্রব্য সরবরাহের বিবিধ ব্যবস্থা : একথা সকলেই স্বীকার করিবে যে, ক্রেতা যদি তাহার ঘরে বসিয়াই ক্রীত দ্রব্য পায় তাহা হইলে সে অনেক ঝামেলা হইতে রেহাই পায়। যে সকল বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে মাল বা পণ্য পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের দ্রব্য সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে এবং তাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়ে। এই কারণে অধুনা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় শহর ও নগরীতে কিছু কিছু বিক্রেতা আছে যাহারা ক্রেতার ঘরে মাল

পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কয়েকটি দুগ্ধ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন, ক্যাভেণ্টার্স (Ca enters)—যাহারা ক্রেতাদের গৃহে দুগ্ধ সরবরাহ দিয়া থাকে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ক্রেতার গৃহে বিলি দিবার ব্যবস্থা (Home Delivery Service)।

ভারতীয় রেলপথ-কর্তৃপক্ষ ইদানীং বিক্রেতার ঘর হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ক্রেতার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি নগরীতেই এই পদ্ধতি চালু করিয়াছে। প্রেরকের গুদাম বা দোকান ঘর হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিজেদের লরি অথবা ট্রাকের সাহায্যে রেল-স্টেশনে দ্রব্য বহন করিয়া সেখান হইতে রেল কর্তৃপক্ষ রেলযোগে উহা ক্রেতার নিকট পাঠাইয়া থাকে।

রেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা অনুসরণে কতিপয় বিমান পরিবহণ (Air Transport) এবং সড়ক পরিবহণ (Road Transport) সংস্থাও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে। ইহারাও বিক্রেতার ঘর হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং নিজেদের যানবাহন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই দ্রব্য ক্রেতার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

[৩] মূল্যপ্রদান পদ্ধতি (**System of Payment**) ঃ

দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দিবার সময় ক্রেতাকে মূল্যপ্রদান পদ্ধতি সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিক্রেতার নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়। মূল্যপ্রদান সম্বন্ধে মূল্যপ্রদানের পদ্ধতি ব্যতীতও উহার সময় ও মূল্য হইতে কোনও প্রকার বাট্টা (ছাড়) পাওয়া যাইবে কিনা তাহা জানা প্রয়োজন।

বাট্টা (Discount) ঃ অনেক সময় ব্যবসা ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী পাইকারী-ক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্য হইতে কিছু অংশ ছাড়িয়া দেয়, পাইকারী-ব্যবসায়ীও যখন খুচরা-ব্যবসায়ীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করে তখন খুচরা-ব্যবসায়ী ক্রেতাকে মূল্যের কিছু অংশ ছাড়িয়া দেয়। ইহাকে কারবারী-জগতে বাট্টা (ছাড়) বা Discount বলা হয়। নির্ধারিত মূল্য হইতে কিছু বাদ বা ছাড় দিলে ক্রেতা কম দরে ক্রয়মূল্যের সুবিধা পাইয়া থাকে। ইহাতে বিক্রেতারও কিছু সুবিধা হয়। নির্ধারিত মূল্য হইতে কিছু অংশ বাদ দিলে ক্রেতা সেই বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে উৎসাহ পাইতে পারে। তাহাতে বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষি একটি নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা বা উৎপানকারী নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে সেই ক্ষেত্রে দর-কষাকষির কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রেই উৎপাদনকারী অথবা বিক্রেতা পণ্যের নির্ধারিত মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে বাট্টা বা ছাড় (Discount) দিয়া থাকে। বাট্টা ক্রেতার মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বাট্টা দুই প্রকার—ব্যবসায়িক বাট্টা (**Trade Discount**) এবং নগদান বাট্টা (**Cash Discount**)।

(ক) **ব্যবসায়িক বাট্টা (Trade Discount)** : দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য-তালিকার (Price List) যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই স্বীকার করে। মূল্য-তালিকায় অথবা সচিত্র মূল্য-তালিকায় (Catalogue) দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য লিখিত থাকে। লিখিত মূল্যকেই নির্দিষ্ট মূল্য ধরিতে হয়। কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে মূল্য-তালিকায় যে মূল্য লিখিত থাকে তাহা সাধারণ ক্রেতার নিকট বিক্রয়মূল্য বুঝায়। খুচরা ব্যবসায়ী যখন সেই দ্রব্য ক্রয় করে তখন সে নির্দিষ্ট মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে বাট্টা পাইয়া থাকে। কারণ, খুচরা ব্যবসায়ী যদি বাট্টার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহার কোন লাভ থাকে না। সাধারণ ক্রেতা যে দরে কিনিতে পারে খুচরা ব্যবসায়ীকেও যদি সেই দরে কিনিতে হয় তাহা হইলে তাহার সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে কোন লাভ থাকে না এবং সেই ব্যবসা করিতে তাহার কোনও উৎসাহও থাকে না। ব্যবসায়ী বাট্টার হার ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে বেশী বা কম হয়।

(খ) **নগদান বাট্টা (Cash Discount)** : বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক বাট্টা দেওয়া হয়। কিন্তু সত্বর ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিতে উৎসাহ দিবার জন্য নগদান বাট্টা দেওয়া হয়। উৎপাদনকারী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাইকারী ক্রেতার নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। আবার পাইকারী বিক্রেতা যখন খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য বিক্রয় করে তখন অনেক ক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ধারে বিক্রয় করিলে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা ২ মাস, ৩ মাস, ৪ মাস যাহাই হোক না কেন। উৎপাদনকারী পাইকারী-ক্রেতাকে নগদ মূল্য পরিশোধ করিতে উৎসাহ দিবার জন্য যে বাট্টা দেয়, তাহাকে **নগদান বাট্টা** (Cash Discount) বলা হয়। পাইকারী-বিক্রেতাও অনুরূপভাবে খুচরা ব্যবসায়ী-ক্রেতাকে নগদ মূল্য পরিশোধ করিতে উৎসাহ দিবার জন্য নগদান বাট্টা দিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়িক বাট্টা ছাড়াও নগদান বাট্টা দেওয়া হয়। ব্যবসায়িক বাট্টা নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় করিলেও পায়, আবার ধারে পণ্য ক্রয় করিলেও পায়। কিন্তু নগদান বাট্টা কেবল নগদ মূল্যে ক্রয় করিলেই পাইতে পারে, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিলেই পাইতে পারে, নচেৎ নহে।

যখন ব্যবসায়িক বাট্টা ও নগদান বাট্টা উভয়ই দেওয়া হয়, তখন বিজ্ঞাপিত মূল্য হইতে প্রথমে ব্যবসায়িক বাট্টা বাদ দিয়া নীট মূল্য বাহির করা হয় এবং নীট মূল্য হইতে নগদান বাট্টা দেওয়া হয়। নগদান বাট্টায় বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়।

নগদান বাট্টা দেওয়ায় বিক্রেতার লাভ : পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধারে হইয়া থাকে। এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা ২ মাস, ৩ মাস, ৪ মাস যাহাই হোক না কেন। ক্রেতাকে মেয়াদ-অন্তে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় করিলে নগদান বাট্টা দেওয়া হয়।

ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে বিক্রেতা কম মূল্য পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে তাহার লাভই হয়। ইহার কারণ দুইটি :

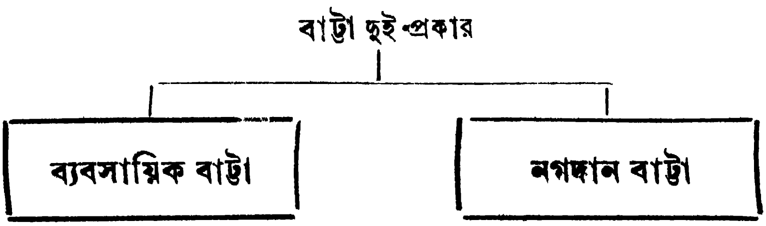
(১) নগদ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে বিক্রেতা দ্রুত নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। সেই অর্থ দ্বারা পুনরায় নগদে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে এবং নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া নগদান বাট্টার সুযোগ লইতে পারে। ইহাতে তাহার ব্যবসায়ের সুনাম ও খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

(২) ধারে বিক্রয় করিলে অনেক সময়েই মেয়াদ-অন্তে বিক্রয়মূল্য আদায় হয় না। ইহাতে অনেক সময় উৎপাদক এবং পাইকারী বিক্রেতাকে অর্থের অভাব বোধ করিতে হয়। আবার ধারে বিক্রয় করিলে অনাদায়ী ঋণের (Bad Debt) সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে নগদান বাট্টা দিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে অনাদায়ী ঋণ বাবদ লোকসান হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

নগদান বাট্টা পাওয়ায় ক্রেতার লাভঃ (১) নগদান বাট্টায় ক্রেতাকে ক্রয়কালে মূল্য দিতে হয়। অনেক সময় ক্রেতা মনে করিতে পারে যে, নগদ মূল্য না দিয়া সেই অর্থ ব্যাঙ্কে থাকিলে সুদ পাওয়া যাইবে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দিবে তাহা হইতে নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া যে অর্থ বাঁচানো গেল তাহাতে সুদের হার অধিক হয় কিনা। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, নগদে মূল্য পরিশোধ করিয়া যে অর্থ বাঁচানো গেল তাহাতে সুদের হার ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা বেশী হয়।

(২) অনেক সময় ব্যবসায়ী-ক্রেতা মনে করে, যখন ধারে ক্রয় করিবার সুযোগ পাওয়া গেল তখন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করাই ভাল এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ব্যবসায়ী অনেক সময় অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ফেলে। পরে দেখা যায় যে, যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছে তাহা বিক্রয় হইতেছে না। প্রচুর পরিমাণে অবিক্রীত দ্রব্য জমিয়া থাকে। অনেক ব্যবসায়ী এইভাবে মজুত দ্রব্য বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসা গুটাইয়া দেয়।

(৩) নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট যে সমাদর পায়, ধারে ক্রয় করিলে কখনও সেই সমাদর পায় না। এই সকল কারণে ক্রেতার পক্ষে নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া নগদান বাট্টার সুযোগ লওয়া উচিত।



ব্যবসায়িক বাট্টা ও নগদান বাট্টার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Trade Discount and Cash Discount) :

ব্যবসায়িক বাট্টা	নগদান বাট্টা
(১) এইরূপ বাট্টা Price List বা দ্রব্যমূল্যের তালিকায় উল্লেখ থাকে।	(১) ইহা মূল্য পরিশোধের সময় নীট বিক্রয়মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয়।
(২) ইহা পণ্য বিক্রয়ের সময় দেওয়া হয়।	(২) ইহা পণ্যমূল্য পরিশোধের সময় দেওয়া হয়।
(৩) মধ্যস্থ ব্যবসায়ী যাহাতে পণ্য বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহা দেওয়া হয়।	(৩) ক্রেতা যাহাতে দ্রুত মূল্য পরিশোধ করে সেই উদ্দেশ্যে এই বাট্টা দেওয়া হয়।
(৪) ইহা হিসাবে গণ্য হয় না এবং হিসাবের বইতে লেখা হয় না।	(৪) ইহা হিসাবে ধরা হয় এবং হিসাবের বইতে লেখা হয়।
(৫) ইহা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ীকে ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেওয়া হয়।	(৫) ইহা ঋণ পরিশোধে উৎসাহব্যঞ্জক হিসাবে কাজ করে।

ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর একটি উদাহরণ

(Illustration of the Procedure of a Buying and Selling Transaction)

ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনও দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বিশেষ একটি পদ্ধতিতে চলিতে হয়। ইহাকেই ব্যবসা-জগতে ক্রয়-বিক্রয় প্রণালী বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয়কে পাঁচটি ধাপে বা পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

(১) **অনুসন্ধান** (**Enquiry**)
(২) **মূল্যজ্ঞাপন বা মূল্যবেদন** (**Quotation**)
(৩) **ফরমাশ** (**Order**)
(৪) **দ্রব্যের সরবরাহ** (**Delivery of Goods**)
(৫) **মূল্য পরিশোধ** (**Payment**)

প্রথম পর্যায় (First Step) : অনুসন্ধান (Enquiry) : ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথম পর্যায় অনুসন্ধান। অনুসন্ধান দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয়ের সূচনা হয়। ক্রেতার যে দ্রব্যের প্রয়োজন সেই দ্রব্য বিক্রেতা সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা তাহাই ক্রেতা সর্বপ্রথম জানিতে চাহে। আমরা যে দৈনন্দিন দ্রব্য ক্রয় করি সেক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাহার নিকট সেই দ্রব্যটি পাওয়া যাইবে কিনা। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে। ব্যবসায়ী যখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য মজুত রাখিতে হয়। সুতরাং, তাহার পক্ষে দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হয়। ভাবী-বিক্রেতার

নিকট ভাবী-ক্রেতা সরাসরি মৌখিক অনুসন্ধান করিতে পারে, পত্রদ্বারা অনুসন্ধান করিতে পারে অথবা নিজের প্রতিনিধি মারফতও অনুসন্ধান করিতে পারে। যদি পত্রদ্বারা অনুসন্ধান করা হয় তাহা হইলে সেই পত্রকে **অনুসন্ধান পত্র** (**Letter of Enquiry**) বলা হয়।

ক্রেতা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দুইটি বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া থাকে :

(১) বিক্রেতা দ্রব্যটি সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা? এবং (২) সরবরাহ করিতে পারিলে কি মূল্যে সরবরাহ করিতে পারিবে?—এই দুইটি বিষয় প্রধান হইলেও বিক্রেতা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ও অনুসন্ধান করে। সরবরাহের সময়, সরবরাহের ব্যবস্থা, মূল্য প্রদানের পদ্ধতি, পরিবহণ-পদ্ধতি, পরিবহণ-ব্যয় কে বহন করিবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ভাবী-ক্রেতা অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ভাবী-ক্রেতার নিজস্ব কোন শর্ত থাকিলে তাহা ভাবী-বিক্রেতা পূরণ করিতে রাজী আছে কিনা সে বিষয়েও অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ভাবী-ক্রেতা যখন দ্রব্যের বিশেষ বর্গ বা স্তর (Grade), মান ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না, তখন ভাবী-বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যের মূল্য-তালিকা (Price List) চাহিয়া পাঠায়। মূল্য-তালিকা দেখিয়া সে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। অনুসন্ধান আসিলেই যে দ্রব্যটি বিক্রয় হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহাতে বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে, ইহাই মাত্র বুঝায়। অনুসন্ধানকারীকে ক্রেতায় পরিণত করাতেই ব্যবসায়ীর সাফল্য নির্ভর করে।

অনুসন্ধান আহ্বানের উপায় (Method of Inviting Enquiry)ঃ ক্রেতা যেমন নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারে, বিক্রেতাও তেমনি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট হইতে অনুসন্ধান আহ্বান করিবার জন্য অগ্রণী হইতে পারে। অনুসন্ধান আহ্বানে বিক্রেতা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিয়া থাকে :

(১) ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রেরণ (Sending Travelling Agent)ঃ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিক্রেতা পুরাতন ক্রেতা এবং সম্ভাব্য নূতন ক্রেতার নিকট হইতে তাহার দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধির নিকট দ্রব্যের সম্পূর্ণ বিবরণ, ইহার প্রয়োজনীয়তা, মূল্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় সংবাদ-সম্বলিত পুস্তিকা দেওয়া হয়।

(২) বিজ্ঞাপন (Advertisement)ঃ দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিতে হইলে বিক্রেতাকে দ্রব্যের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবী-ক্রেতাগণকে অবহিত করাইতে হয় এবং দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করাইতে হয়। দ্রব্যের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করাইতে এবং ভাবী-ক্রেতার মনে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করাইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) **পরিপত্র (Circular)**: সর্বসাধারণকে কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত করাইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা কেবলমাত্র পুরাতন ক্রেতা ও কিছু-সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতাগণের নিকট নিয়মিতভাবে পরিপত্র পাঠাইয়া থাকে। পরিপত্রে দ্রব্যের গুণাগুণ এবং মূল্যের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়েরও উল্লেখ করা হয়। পরিপত্র দ্বারা ভাবী-ক্রেতার মনে দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (Second Step): **মূল্যজ্ঞাপন বা মূল্যবেদন (Quotation)**: ভাবী-ক্রেতা দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিক্রেতাকে মূল্য জানাইতে হয়। ইহাকে মূল্যজ্ঞাপন বা মূল্যবেদন বলা হয়। নানা উপায়েই মূল্যজ্ঞাপন করা হয়। মৌখিক মূল্যজ্ঞাপনের উপর সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রে নির্ভর করা যায় না বলিয়া ভাবী-ক্রেতা লিখিত মূল্যজ্ঞাপন চাহিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা পত্রদ্বারা মূল্যজ্ঞাপন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যে-কোনও উপায়ে লিখিত মূল্যজ্ঞাপন করা হয়—মূল্য-তালিকা (Price List); চলতি বাজার মূল্য-তালিকা (Current Price List), মূল্যবেদন বা মূল্যজ্ঞাপন (Quotation), আনুমানিক মূল্য (Estimate), দরপত্র (Tender), পাকা বা চূড়ান্ত দর (Firm Offer)। ইহার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য মূল্যজ্ঞাপন হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(১) **মূল্য-তালিকা (Price List)**: সাধারণতঃ ভাবী-ক্রেতার অনুসন্ধান পত্রের উত্তরসহ মূল্য-তালিকা পাঠান হয়। তবে বিক্রেতা নিজেই যদি অনুসন্ধান আহ্বান করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে অনুসন্ধান পত্রের অপেক্ষা না করিয়াও পুরাতন ক্রেতা অথবা সম্ভাব্য ভাবী-ক্রেতার নিকট নিজেই মূল্য-তালিকা পাঠায়। মূল্য-তালিকা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ছাপান হয়। মূল্য তালিকা দুই প্রকারের হইতে পারে—সাধারণ মূল্য-তালিকা (Price List) এবং সচিত্র মূল্য-তালিকা (Catalogue)। সাধারণ মূল্য-তালিকায় দ্রব্যের মূল্য এবং ইহার বিশদ বিবরণ থাকে। সচিত্র মূল্য তালিকায় মূল্য এবং বিবরণ ব্যতীত দ্রব্যটির একটি ছবি থাকে। মূল্যবান দ্রব্যসমূহের বেলায় সচিত্র মূল্য-তালিকা তৈয়ারী করা হয়। মূল্য-তালিকায় দ্রব্যের মূল্য ব্যতীত ইহার প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ থাকে। মূল্য-তালিকা উৎপাদনকারী অথবা পাইকারী বিক্রেতা কর্তৃক প্রস্তুত হয় বলিয়া খুচরা বিক্রয়কারীকে বিক্রয় করিবার জন্য কি মজুরি বা কমিশন দেওয়া হইবে তাহার বিবরণ থাকিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে খুচরা ক্রেতাকে অবশ্য মূল্য-তালিকায় লিখিত মূল্যই দিতে হয়। খুচরা বিক্রেতা বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্য-তালিকায় লিখিত হারে কমিশন পাইয়া থাকে। মূল্য-তালিকা পাঠাইলেই বিক্রয়ের চুক্তি হয় না। মূল্য-তালিকা পাঠাইলে বুঝিতে হইবে যে, বিক্রেতা মূল্য-তালিকায় লিখিত দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে সম্মত আছে। মূল্য-তালিকা কতদিনের জন্য প্রকাশিত হইল তাহা নির্দিষ্ট থাকে না।

(২) **চলতি বাজার মূল্য-তালিকা** (**Current Price List**)**:** দ্রব্য অনুসারে মূল্য পরিবর্তিত হয়। এমন দ্রব্য আছে যাহার মূল্য হয়ত পাঁচ বৎসরেও পরিবর্তিত হয় না। আবার, এমন দ্রব্য আছে যাহার মূল্য মাসে মাসে বা দুই মাস পর পরিবর্তন করা হয়। যে সকল দ্রব্যের মূল্য খুব ঘন ঘন পরিবর্তিত হয় সেই সকল দ্রব্যের মূল্য-তালিকা প্রকাশ করা হয় না। সেই সকল দ্রব্যের বেলায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলতি বাজার মূল্য-তালিকা তৈয়ারী করা হয় এবং ভাবী-ক্রেতাগণের অনুসন্ধানের উত্তরে চলতি বাজার মূল্য-তালিকা পাঠান হয়। চলতি বাজার মূল্য-তালিকায় তালিকা প্রকাশনের সময়ে যে মূল্য চলতি আছে তাহার উল্লেখ থাকে। চলতি বাজার মূল্য-তালিকা অনুসারে দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দিলে যে সময় দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দেওয়া হয় সেই সময়ের চলতি দরেই মূল্য দিতে হয়। চলতি দর মূল্য-তালিকার বেলায়ও বিক্রেতা যে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহা বুঝায়।

(৩) **মূল্যজ্ঞাপন অথবা মূল্যবেদন** (**Quotation**)**:** মূল্যজ্ঞাপন একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। যে-কোনও পদ্ধতিতে মূল্য জানানকেই মূল্যজ্ঞাপন বলা হয়। কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে মূল্যজ্ঞাপন কথাটি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় ভাবী-ক্রেতা মূল্য-তালিকা অথবা চলতি দর মূল্য-তালিকা সংগ্রহ করিতে পারে না। তখন ভাবী-ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্যজ্ঞাপন করিতে বলে, অর্থাৎ Quotation পাঠাইতে অনুরোধ করে। বিক্রেতা ভাবী-ক্রেতার অনুসন্ধানের উত্তরে নির্দিষ্ট প্রপত্রে (Form/ ফর্ম) মূল্যজ্ঞাপন (Quotation) পত্র পাঠাইয়া থাকে। আবার অনুসন্ধান পত্রের উত্তরে পত্রের আকারেও মূল্যজ্ঞাপন করা যায়। ইহাতে কেবলমাত্র দ্রব্যের মূল্যেরই উল্লেখ থাকে।

(৪) **আনুমানিক মূল্য** (**Estimate**)**:** এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা ভোগকারীর নিজের পছন্দমত তৈয়ারী করাইতে হয়, বাজার হইতে উৎপাদিত অবস্থায় সরবরাহ করা যায় না—যেমন, বাড়ী, রাস্তা, পুল ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি তৈয়ারী করিতে যত অর্থ ব্যয় হইবে উহাই তাহার মূল্য। সুতরাং, কেহ একটি বাড়ী তৈয়ারী করাইতে চাহিলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাড়ী তৈয়ারী করে তাহার নিকট হইতে বাড়ীটি তৈয়ারী করিতে আনুমানিক কত ব্যয় হইবে তাহা জানা প্রয়োজন। বাড়ীটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানাইয়া আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব চাহিলে বুঝিতে হইবে যে, মূল্য আশানুরূপ হইলে মূল্যজ্ঞাপনকারীর দ্বারাই বাড়ী তৈয়ারী করাইবার ইচ্ছা আছে।

(৫) **দরপত্র** (**Tender**)**:** অনেক সময় কোনও কার্য নিজের তত্ত্বাবধানে না করিয়া অন্যের উপর সেই কার্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়। আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহার যোগানের ভারও অন্যের উপর অর্পিত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে কি মূল্যে সেই কার্যটি সম্পাদন করিতে পারে, অথবা কি মূল্যে সেই দ্রব্যটি সরবরাহ বা যোগান দিতে পারে তাহা কার্য সম্পাদনকারিগণের নিকট হইতে, অথবা দ্রব্য

সরবরাহকারিগণের নিকট হইতে জানা প্রয়োজন। যেমন, গৃহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে কে কি মূল্যে বাড়ীটি তৈয়ারী করিতে সক্ষম তাহা জানাইয়া পত্র দিতে বলা যাইতে পারে। অথবা, মনে করা যাক, একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের জন্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, মাছ, মাংস ইত্যাদি দ্রব্য সরবরাহকারিগণের কে কি মূল্যে সরবরাহ করিতে পারে তাহা জানাইয়া পত্র দিতে বলা হইতে পারে। কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও দ্রব্য সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা দ্রব্য সরবরাহের জন্য যে মূল্য ঘোষণা করিবে তাহাকে দরপত্র (Tender) বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্বনিম্ন দর ঘোষণা করে, তাহারই সহিত কার্য সম্পাদনের অথবা দ্রব্য সরবরাহের চুক্তি হইয়া থাকে। দরপত্র চাহিলে ভাবী-ক্রেতাকে কার্যটি অথবা দ্রব্যের বিশদ বিবরণ জানাইতে হয়। নচেৎ, কার্য সম্পাদনকারীর পক্ষে অথবা দ্রব্য সরবরাহকারীর পক্ষে সঠিকভাবে মূল্যজ্ঞাপন করা সম্ভব হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে দরপত্র চাহিয়া বিজ্ঞাপন বা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় সেই সকল ক্ষেত্রে দরপত্র দাখিলকারক (Tenderer) বা মূল্যবেদনকারীর নিকট হইতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা হয়। যাহার দরপত্র (Tender) গ্রহণ করা হয় তাহার জামানত কার্য সম্পাদনের মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হয় না, তাহার নিকট হইতে গৃহীত জামানত ফেরত দেওয়া হয়। সাধারণতঃ রাস্তাঘাট, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে কিংবা কোন দ্রব্য বহুকাল ধরিয়া অধিক পরিমাণে সরবরাহের প্রয়োজন হইলেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(৬) পাকা দর (**Firm Offer**): দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে দর-কষাকষি একটি প্রচলিত নিয়ম। সাধারণতঃ আমরা যখন বাজারে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া থাকি, তখনও দর-কষাকষি করি। তাহাতে দ্রব্যের দর এক বিশেষ পর্যায়ে আসিলে ভাবী-বিক্রেতা বলে যে, ইহা অপেক্ষা এক পয়সা কমেও সে দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে না। ইহাই পাকা দর। এই নিয়ম যে ব্যবসায়ী ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রচলিত নাই, তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়ী-বিক্রেতা ও ক্রেতাগণের মধ্যে বহুবার পত্র আদান-প্রদানের পর বিক্রেতা দ্রব্যটির পাকা দর বা চূড়ান্ত দর জানায়। চূড়ান্ত দর বা পাকা দর হইলেও ক্রেতা যদি ঐ দরে দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী না থাকে তবে উহার কোনও তাৎপর্য থাকে না। দর পাকা বা চূড়ান্ত হইলে ক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ পাইলেও বিক্রেতা দ্রব্য সরবরাহ করিতে অসম্মত হইতে পারে। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধারণ মূল্য-তালিকা অথবা সচিত্র মূল্য-তালিকার মতই বিক্রেতার দ্রব্যটি বিক্রয়ের ইচ্ছাকে বুঝায়।

তৃতীয় পর্যায় (Third Step): ফরমাশ (Order): ক্রয়-বিক্রয়ের তৃতীয় পর্যায় হইল ক্রেতার নিকট হইতে ফরমাশ (Order) পাওয়া। ক্রেতা অনুসন্ধান পত্রের উত্তরে বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য-তালিকা, সচিত্র মূল্য-তালিকা, মূল্যজ্ঞাপন-পত্র অথবা পাকা দর পাইলে তাহা খুব সতর্কতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দ্রব্য ক্রয় করা হইবে কিনা সে বিষয়ে স্থির করে। দ্রব্য ক্রয় করা স্থির হইলে সরবরাহের

ফরমাশ (Order) দিতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একই দ্রব্যের জন্য বহু বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্যজ্ঞাপন-পত্র বা মূল্য-তালিকা ইত্যাদি চাওয়া হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে যে মূল্য-তালিকা অথবা মূল্যজ্ঞাপন-পত্র পাওয়া যায় তাহার মধ্য হইতে যেটি ক্রেতার সর্বাধিক সুবিধাজনক মনে হয় তাহার নিকটেই দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ দেওয়া হয়।

চতুর্থ পর্যায় (Fourth Step) : দ্রব্যের সরবরাহ (Delivery of Goods) : দ্রব্যসমূহ মোড়কে বাঁধাই করা হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতা ক্রেতার নিকট উহা রেল অথবা লরি অথবা অন্যান্য কোন উপায়ে প্রেরণ করে। ইহার পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট চালান (Invoice) পাঠায়। চালানের সহিত পণ্য পরিবহণের রসিদ ক্রেতার নিকট পাঠান হয়।

পঞ্চম পর্যায় (Fifth Step) : মূল্য পরিশোধ (Payment) : সর্বশেষ স্তরে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য নগদ, চেক, বাণিজ্যিক হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক ড্রাফট ইত্যাদি যে কোন একটির মাধ্যমে পরিশোধ করে ও "মূল্যপ্রাপ্তির রসিদ" (Acknowledgement Receipt) পায়। এইভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ক্রয় ও বিক্রয়-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা
(A Short Description of Buying & Selling Procedures)

ক্রয়-প্রণালী (Buying Procedure) :

কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পণ্য ক্রয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে :

(১) **ক্রয়ের পরিমাণ স্থিরীকরণ (Determining the Quantity of Purchase) :** দ্রব্য ক্রয়ের ভার ক্রয়-বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে। কি ধরনের দ্রব্য কত পরিমাণ ক্রয় করা হইবে তাহা ক্রয়-বিভাগ বিভিন্ন বিভাগ হইতে আগত লিখিত অনুরোধ (Requisition) হইতে স্থির করে অথবা মজুত বিভাগ হইতে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণ ক্রয় করিতে হইবে তাহা জানিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে কোন্ মানের অথবা গুণের (Standard or Quality) দ্রব্য ক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির করা হয়।

(২) **অনুসন্ধান (Enquiry) :** দ্রব্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন, দ্রব্যের মান, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি জানিতে চাহিবার জন্য সরবরাহকারিগণের নিকট অনুসন্ধান পত্র পাঠান হয়। সরবরাহকারিগণ তাহার উত্তরে মূল্যজ্ঞাপন-পত্র (Quotation) পাঠায়।

(৩) **দরপত্র আহ্বান (Tender Call) :** অনুসন্ধান-পত্র না পাঠাইয়া দ্রব্যের বিশদ বিবরণ জানাইয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে অথবা পরিপত্র বা Circular-এর মাধ্যমে সরবরাহকারিগণের নিকট হইতে দরপত্র চাওয়া হয়। সরবরাহকারিগণ তাহার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যজ্ঞাপন-পত্র (Quotation) পাঠায়।

(৪) **সরবরাহকারী নির্ধারণ (Selection of the Supplier)** ঃ অনুসন্ধানপত্র অথবা দরপত্র বাছাই করিয়া মূল্যজ্ঞাপন-পত্রের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা কম দামে যে নির্দিষ্ট মানের দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে তাহাকে দ্রব্য সরবরাহের ফরমাশ (Order) দেওয়া হয়। অবশ্য সরবরাহকারীর নির্ভরযোগ্যতা, মূল্যপ্রদানের শর্ত এবং সরবরাহের শর্তও বিবেচনা করিতে হইবে।

(৫) **ফরমাশ প্রদান (Placing Order)** ঃ ফরমাশপত্রে দ্রব্যের বিশদ বিবরণ, মান, পরিমাণ, সরবরাহের সময়, সরবরাহের শর্ত, মূল্যপ্রদানের শর্ত ইত্যাদি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ফরমাশপত্রের কপি আবেদনকারী বিভাগ, দ্রব্য গ্রহণ বিভাগ ও মজুত বিভাগেও পাঠাইতে হয়।

(৬) **দ্রব্য গ্রহণ (Receipt of Goods)** ঃ পণ্য গ্রহণ বিভাগ দ্রব্য পাইবার পর তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ও ফরমাশপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখে। এই বিবরণী ক্রয়-বিভাগকে পাঠান হয়।

(৭) **পরীক্ষা (Inspection)** ঃ ক্রয়-বিভাগ গৃহীত দ্রব্য ফরমাশপত্র ও নমুনা অনুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করে। যদি কোন কারণে দ্রব্য ফেরত পাঠান হয় তাহা হইলে ক্রয়-বিভাগ সরবরাহকারীকে "ডেবিট নোট" (Debit Note) পাঠায়। ইহাতে ফেরত পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও ফেরতের কারণ লেখা থাকে। ইহার পর বিক্রেতা যে চালান পাঠাইয়াছে উহা মূল্যজ্ঞাপন-পত্র অনুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহা ক্রয়-বিভাগ পরীক্ষা করে এবং চালানটি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করে।

(৮) **মূল্যপ্রদান (Payment)** ঃ ইহার পর চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাশ বা নগদান বিভাগ চেক অথবা ড্রাফট অথবা নগদে মূল্য পরিশোধ করে। অনেক সময় বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা প্রত্যর্থপত্রের মাধ্যমেও মূল্যপ্রদান করা হয়।

বিক্রয়-প্রণালী (Selling Procedure) ঃ

বিক্রয়-বিভাগের দ্বারা পণ্য বিক্রিত হয়। পণ্য বিক্রয়ের প্রণালী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **অনুসন্ধানপত্রের উত্তর (Reply to Letter of Enquiry)** ঃ সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট হইতে অনুসন্ধানপত্র আসিলে দ্রব্যের বিবরণ, মূল্য, বাট্টার হার, মূল্যপ্রদানের শর্ত, সরবরাহের সময় ইত্যাদি জানাইয়া ক্রেতার নিকট মনগ্রাহী উত্তর পাঠাইতে হইবে।

(২) **মূল্যজ্ঞাপন-পত্র প্রেরণ (Sending of Quotation)** ঃ অনুসন্ধানপত্রের উত্তরের সহিত অথবা বিজ্ঞাপনের উত্তরের সহিত বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট মূল্যজ্ঞাপন-পত্র প্রেরণ করিতে হয়। ইহাতে দ্রব্যের বিশদ বিবরণ, মূল্য, ব্যবসায়িক ও নগদান বাট্টা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

(৩) **ফরমাশ গ্রহণ ও স্বীকৃতি (Acceptance of Order)** ঃ ফরমাশপত্র পাইবার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে ফরমাশ গ্রহণের স্বীকৃতি জানায় ও ফরমাশ অনুযায়ী

উৎপাদন আরম্ভ করিবার জন্য উৎপাদন-বিভাগকে ফরমাশের কপি পাঠায়। যদি প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী না হয় তাহা হইলে উহা বাজার হইতে পণ্য সংগ্রহ করে।

(৪) **পণ্য সরবরাহ (Delivery of Goods)** : চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করিতে হয়। রেলযোগে অথবা ট্রাকে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে চুক্তি অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ করা হয়। পণ্য প্রেরণ করিবার সময় "চালানী রসিদ" (Consignment Note) তৈয়ারী করা হয় এবং দ্রব্য বুকিং-এর পর বাহকের নিকট হইতে পণ্যের রসিদ (Receipt) লইতে হয়। যেমন, রেলযোগে পণ্য পাঠাইলে রেলের রসিদ (Railway Receipt) লইতে হয়। চালানী রসিদে দ্রব্যের পূর্ণ বিবরণ, পণ্য-গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং ভাড়ার বিবরণ থাকে। ইহা পণ্য-প্রেরকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(৫) **চালান প্রস্তুতকরণ (Preparation of Invoice)** : ইহার পর বিক্রেতা দ্রব্যের পূর্ণ বিবরণ, পরিমাণ, মূল্যহার, মোট মূল্য, বাট্টা, প্রদেয় নীট মূল্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া কয়েক কপি চালান প্রস্তুত করে।

(৬) **দলিলসমূহ প্রেরণ (Sending of Documents)** : ইহার পর চালান, পণ্যের রসিদ ইত্যাদি ক্রেতার নিকট ডাক অথবা ব্যাঙ্কের মারফত পাঠান হয়।

(৭) **মূল্যপ্রাপ্তি (Receipt of Price)** : সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে নগদে অথবা চেকে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে অথবা বাণিজ্যিক হুণ্ডির মাধ্যমে অথবা প্রত্যর্থপত্রের মাধ্যমে মূল্য গ্রহণ করে ও মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার (Acknowledgement) করে।

আবরণ ও মোড়কজাতকরণ (Package and Packing) : দ্রব্য উৎপাদনের পর উহা ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইবার জন্য ঐ দ্রব্য দূর দূর স্থানে পাঠাইতে হয়। কোন দ্রব্যই আবরণহীন অবস্থায় পাঠান সম্ভব নয়। কারণ আবরণ ও মোড়ক না করিয়া পাঠাইলে পথিমধ্যে দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিটি দ্রব্য বাজারে পাঠাইবার পূর্বে সুন্দররূপে মোড়ক করিয়া এবং আবরণ দিয়া পাঠাইতে হয়। মোড়ক ও আবরণ দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে স্থির করিতে হয়। যেমন, কাচের দ্রব্য বাক্সবন্দী করিতে হইলে ভিতরে চোবড়া, কাগজ ইত্যাদি দিয়া মোড়ক করিতে হয়। যন্ত্রপাতি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে হইলে কাঠের খাঁচা করিয়া তাহার মধ্যে বসাইতে হয়। এইভাবে প্রকৃতি অনুসারে দ্রব্যটি সুষ্ঠুরূপে মোড়ক ও আবৃত না হইলে যানবাহনের পথে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মোড়ক এবং আবরণের ব্যয় দ্রব্যের মূল্যের মধ্যেই ধরিয়া লওয়া হয়।

সুবিধা : (১) দ্রব্য মোড়কে দ্রব্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়; (২) দ্রব্যটি ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়; (৩) সুন্দর মোড়ক ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে; (৪) ক্রেতা মোড়ক দেখিয়া দ্রব্যটি চিনিতে পারে; (৫) দ্রব্যের মান বজায় রাখিতে মোড়ক সাহায্য করে; (৬) ওজনের মান নির্দিষ্ট করা যায়; এবং (৭) বিক্রয় বৃদ্ধিতে মোড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন (Co-ordination between Purchase and Sale) ঃ প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠানেরই দুইটি বিশেষ কার্য হইল ক্রয় এবং বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই উহার লাভ। লাভ করিতে না পারিলে কারবারের অস্তিত্ব বিলোপ হয়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় কার্যকে দুইটি পৃথক কর্তব্য ধরিয়া লইলে কারবার ভুল করিবে। ক্রয় করিয়া বিক্রয় করা, অথবা উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করা মূলতঃ একই কার্যের দুইটি দিক। বিক্রয় হইবাব সম্ভাবনা না থাকিলে কোন দ্রব্য ক্রয় করা যুক্তিহীন। আবার বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলে ক্রয় অথবা উৎপাদন করিবার পূর্বে উহার সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যে কারবারী যত সঠিকভাবে চাহিদার সম্ভাবনা নিরূপণ করিতে পারিবে সেই কারবারী তত সহজে সাফল্য অর্জন করিতে পারে। ক্রয় অথবা উৎপাদনের পূর্বে কারবারের মজুত দ্রব্যের পরিমাণ দেখিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে অথচ পুনরায় দ্রব্য ক্রয় করা সর্বদা লাভজনক নাও হইতে পারে। এক নির্দিষ্ট পবিমাণ দ্রব্য মজুত রাখিয়া পুনরায় ক্রয় করা উচিত।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবাবী প্রতিষ্ঠানে মালিক নিজেই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। কিন্তু বড় বড় কাববারী প্রতিষ্ঠানে কোন এক ব্যক্তির পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয় উভয়েব উপব দৃষ্টি রাখিয়া সমন্বয়সাধন সম্ভব নহে। এই কারণে বড় বড় কারবাবী প্রতিষ্ঠানে ক্রয়-বিশেষজ্ঞ, বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ ও প্রচার-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ কবা হয় এবং প্রত্যেকটি কার্য এক-একটি বিভাগেব উপব ন্যস্ত থাকে। বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ অপব বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষগণেব সহিত পবামর্শ করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য স্থির কবেন। ক্রয়-বিশেষজ্ঞও দ্রব্য ক্রয় কবিবার পূর্বে বিক্রয়-বিভাগেব নিকট হইতে সম্ভাব্য বিক্রয়েব পবিমাণ অনুসন্ধান করেন। বিক্রয়-বিভাগ যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে তাহা জানাইলে তবেই ক্রয়-বিভাগ দ্রব্য ক্রয় করিবে। এইরূপভাবেই ক্রয়-বিভাগ বিক্রয়-বিভাগের সহিত যোগাযোগ রাখে। প্রচারকার্য বিক্রয়-বিভাগের অন্তর্গত থাকে।

ক্রয় ও বিক্রয়ের সমন্বয়ের স্তরগুলি হইল :

(ক) সম্ভাব্য বিক্রয়ের অনুমান করা ;
(খ) উৎপাদন পরিকল্পনা করা ;
(গ) উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করা ;
(ঘ) যন্ত্রপাতি প্রয়োগ ও শ্রমিক নিয়োগ করা ;
(ঙ) উৎপাদন কার্য করা ; এবং
(চ) দ্রব্য বিক্রয় করা।

মূল্য নির্ধারণ (Pricing) ঃ

সঠিক মূল্য নির্ধারণের উপর কারবারের মুনাফা নির্ভর করে। প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে পণ্য মূল্য স্থির হয় : কারণ সেখানে স্বাধীন

মূল্য পদ্ধতি (Free Price Mechanism) কাজ করে। একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতার বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় এবং একচেটিয়ামূলক কারবারে আংশিক কর্তৃত্ব থাকায় সে মূল্য নির্ধারকের (Price-maker) হয়। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) **উৎপাদন-ব্যয় (Cost of Production)** : পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় উৎপাদককে পণ্যের প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফার কথা চিন্তা করিতে হয়। উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামালের মূল্য, মজুরি এবং পরিব্যয় (Overheads) যুক্ত থাকে। উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত মুনাফা যুক্ত করিয়া পণ্যমূল্য স্থির করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রান্তিক ব্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া মূল্য নিরূপণ করা শ্রেয়।

(২) **প্রতিযোগী পণ্যের মূল্য (Price of competitive Goods)** : প্রতিযোগী উৎপাদকের পণ্যের মূল্য অপেক্ষা পণ্যের মূল্য অধিক নির্ধারণ করিলে চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া পণ্য মূল্য নির্ধারণে বাজারের অবস্থা, পণ্যের মান, সাংগঠনিক দক্ষতাও বিচার করিতে হইবে।

(৩) **চাহিদার স্বরূপ (Nature of Demand)** : মূল্য নির্ধারণে চাহিদার প্রকৃতি জানিতে হয়। সম্ভাব্য ক্রেতার মনস্তত্ত্ব, জীবনযাত্রার মান, রুচি ও পছন্দ, সামাজিক প্রথা ও সংস্কার বুঝিয়া চাহিদার স্বরূপ নিরূপণ করা হয়।

(৪) **পণ্যের গুণাগুণ ও উপযোগিতা (Merits and Utilities of the Product)** : পণ্যমূল্য নির্ধারণে ক্রেতা-সাধারণকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিতে হয় এবং পণ্যের গুণাগুণ ও উপযোগিতা অনুসারে এবং ক্রেতার সামর্থ অনুযায়ী পণ্যের মূল্য বেশী বা কম করিতে হয়।

(৫) **পণ্যের প্রকৃতি (Nature of Goods)** : ঋতুপণ্য ও পছন্দসই পণ্যের ক্ষেত্রে দাম বেশী ধার্য করা হয়।

(৬) **মূল্য প্রদান পদ্ধতি (Method of payment)** : ধারে পণ্য বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য নগদ বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়।

(৭) **বণ্টন প্রণালী (Channel of Distribution)** : পণ্যবণ্টন প্রণালী দীর্ঘতর হইলে ব্যয় অধিক হয় বলিয়া পণ্যমূল্যও অধিক হয়।

(৮) **সরকার ঘোষিত মূল্যনীতি (Price-policy declared by the Government)** : পণ্যমূল্য নির্ধারণে সরকারী নীতি অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে।

সারবস্তু গ্রহণকারী মূল্য নির্ধারণ (Skimming pricing) :

দুগ্ধ মন্থন করিয়া তাহার সারবস্তু হিসাবে যেমন মাখন পাওয়া যায়, এই প্রথায় মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেও তেমনি বাজারের সারবস্তু গ্রহণ করা হয়। ধনী ক্রেতার নিকট

অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা স্ফীত করা হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যেই লগ্নিকৃত পুঁজি ফেরত পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতা না থাকিলে তবেই ইহা সম্ভব।

পুনর্বিক্রয় মূল্যরক্ষণ (Resale Price Maintenance) ঃ

পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী যে দামে পণ্য বিক্রয় করে উৎপাদকগণ কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রণকে পুনর্বিক্রয় মূল্যরক্ষণ বলে। ক্রেতা যাহাতে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য পায় তাহার জন্য মূল্যরক্ষণ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে।

সুবিধা ঃ

(১) **উৎপাদকের দিক হইতে সুবিধাগুলি হইল ঃ** পণ্য পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বজায়, লাভজনক মূল্য আদায়, পাইকারী ও খুচরা ব্যসায়ীদের বিবাদের অবসান, ইত্যাদি।

(২) **পাইকারী বিক্রেতাগণের দিক হইতে সুবিধাগুলি হইল** যে, পাইকার নিজেদের অপরিহার্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং নির্দিষ্ট মুনাফা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে।

(৩) **খুচরা বিক্রেতাগণের দিক হইতে সুবিধাগুলি হইল** যে, ইহাতে মূল্য-সম্পর্কিত প্রতিযোগিতা দূর হয় এবং দুর্বল ও শক্তিমান বিক্রেতার মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়।

(৪) **ক্রেতার দিক হইতে সুবিধা হইল** যে, ক্রেতা ন্যায্য মূল্যে পণ্যের যোগান পায়।

স্তর-বিভাগ (Grading) ঃ

পণ্যের বিভিন্ন মান থাকিতে পারে। যন্ত্র-উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে মানের একতা থাকে ; কিন্তু কৃষি পণ্যের মান ভিন্ন ভিন্ন হয়। পণ্যের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্তর-বিন্যাস করাকে স্তর-বিভাগ বলে। ইহাতে গুণানুসারে পণ্যের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যদি স্তর বিন্যাসে কোন ব্যতিক্রম না থাকে তবে তাহাকে **নির্দিষ্ট স্তর-বিভাগ** বলে ; কিন্তু যদি স্তর বিন্যাসে গুণাগুণের সামান্য ব্যতিক্রম হয় তবে তাহাকে **অসম স্তর-বিভাগ** বলে।

সুবিধা ঃ (১) ইহাতে ক্রেতা পণ্য না দেখিয়াও নমুনা বা বর্ণনার সাহায্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

(২) ইহাতে পণ্যের গুণাগুণে নিশ্চয়তা থাকে।

(৩) ইহাতে বাজারের পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং নির্দিষ্ট মানের স্তরভিত্তিক পণ্য সহজেই দেশ ও বিদেশের বাজার পায়।

(৪) স্তর-বিভাগের মাধ্যমে সংগঠিত বাজারে শ্রেণীভুক্ত পণ্য সহজে বিক্রিত হয়।
(৫) ইহাতে পণ্যের মূল্য স্থির থাকে বলিয়া ক্রেতা ঠকিয়া যায় না।
(৬) স্তর বিভক্ত পণ্য বীমা করা যায়।
(৭) ইহাতে পরিবহণ ও মজুতকরণ মাশুল স্থির করা সুবিধাজনক হয়।

বিপণন গতিশীলতা (Marketing Dynamics) ঃ

মানুষের জীবনযাত্রা ও চাহিদা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সেই কারণে বিপণন কার্যক্রমকেও পরিবর্তনশীল হইতে হয় যাহাতে বিপণন পরিবর্তনশীল চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমান তালে চলিতে পারে। বিপণন কার্যক্রমের এই পরিবর্তনশীলতাকে **বিপণন গতিশীলতা** বলে।

বিনিময় কার্য ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত যুক্ত। মানুষের চাহিদা পূরণে বিপণনকে একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করিতে হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান, উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন প্রণালী কালের বিবর্তনে সর্বদা পরিবর্তিত হয় বলিয়া বিপণনে গতিশীলতার প্রয়োজন। মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া বিপণনের গতিশীলতা গড়িয়া ওঠে। বিপণনের গতিশীলতা সমাজের নিত্য নূতন অভাব পূরণের কাজ করে। ইহা চাহিদার অগ্রগতি অনুসারে দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

বিপণন মিশ্র (Marketing Mix) ঃ

বিপণন একটি গতিশীল কলাকৌশল। ইহা বিভিন্ন কার্যকলাপের সমন্বয়। গতিশীল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বিপণন ব্যবস্থা বিভিন্ন বিপণনের কার্যকে শৃঙ্খলার সহিত মিশ্রিত করে। ইহাকেই **বিপণন মিশ্র** বলে। বিপণন মিশ্রে পণ্য পরিকল্পনার, মূল্য নির্ধারণের, পণ্যের শ্রেণীবিভাগের, পণ্য বণ্টন প্রণালীর, ব্যক্তিগত বিক্রয়ের, বিজ্ঞাপনের, অগ্রগতি ও উন্নয়নের, মোড়কজাতকরণের, প্রদর্শনের, সেবা পরিবেশনের, গুদামজাতকরণের এবং পরিবহণের কর্মপন্থা ও পদ্ধতির মিশ্রিতাবস্থা আনা হয়।

বিপণন মিশ্রে ক্রেতার আচরণ, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর আচরণ, প্রতিযোগিগণের আস্থা ও আচরণ, পণ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইনকানুন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

প্রমিতকরণ (Standardisation) ঃ

পণ্যের উৎকর্ষ স্থির করাকে **প্রমিতকরণ** বলে। প্রমিতকরণের উপাদানগুলি হইল : (ক) পণ্যের আকৃতি, (খ) পণ্যের আকার, (গ) পণ্যের বর্ণ, (ঘ) পণ্যের উপাদান, (ঙ) পণ্যের গুণাবলী, ইত্যাদি।

সুবিধা :

(১) ইহাতে নমুনা বা বর্ণনা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করা যায় ,
(২) ইহাতে পণ্যের উৎকর্ষ বজায় থাকে ;
(৩) ইহাতে মোড়কজাতকরণ তাৎপর্যপূর্ণ হয় ,
(৪) ইহাতে পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সরলতা আনা যায় ।

পণ্যের নামকরণ (Branding) :

পণ্যের মোড়কের উপর একটি বিশেষ নাম ব্যবহার করাকে পণ্যের নামকরণ বলে। ইহা তিন প্রকারে করা যায় : (ক) বিশেষ নাম ব্যবহার করা যেমন, লাক্স সাবান, উইলস্ সিগারেট, ইত্যাদি , (খ) বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা যেমন, খেজুর গাছমার্কা ডালডা , (গ) কোম্পানীর নাম ব্যবহার করা যেমন, বাটার জুতো, গোদরেজ-এর আলমারী ইত্যাদি ।

সুবিধা :

(১) নামকরণের দ্বারা পণ্যটিকে অনুরূপ পণ্য হইতে পৃথক করা যায় ,
(২) ইহা নির্দিষ্ট মান নির্দেশ করে ;
(৩) ইহা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা যায় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস করা যায় ;
(৪) ইহাতে 'পুনঃবিক্রয় মূল্য রক্ষণের' কাজ সুবিধাজনক হয় ;
(৫) ইহাতে সহজে পণ্যটি জনপ্রিয় হয় এবং ইহা মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করে ।

ঝুঁকি গ্রহণ (Risk taking) :

বিপণনের ক্ষেত্রে নানাবিধ ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকিগুলি বিপণন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে হয় । প্রধানতঃ যে সকল ঝুঁকি বিপণন গ্রহণ করে সেইগুলি হইল : (১) সময়ের ঝুঁকি, (২) স্থানের ঝুঁকি, (৩) চাহিদা পরিবর্তনের ঝুঁকি, (৪) বিশেষায়িত কর্ম সমন্বয়ের ঝুঁকি, (৫) প্রতিযোগিতার ঝুঁকি, (৬) অনাদায়ের বা কু-ঋণের ঝুঁকি, (৭) দুর্ঘটনা, ধর্মঘট, তালাবন্ধ ইত্যাদির ঝুঁকি, (৮) সরকারী আইন-কানুনের ঝুঁকি ইত্যাদি।

ধারে বিক্রয় ও আদায় (Credit Sale and Collection) :

বিক্রয় নগদে ও ধারে উভয়প্রকারেই হয় । ধারে বিক্রয় না করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। ধারে বিক্রয় করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হয়। ইহাতে বিক্রেতার বিক্রয় বাড়ে এবং নিয়মিত ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে বিক্রয়ের ধারাবাহিকতাও বৃদ্ধি পায় ।

ধারে পণ্য বিক্রয়ের সময় নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা উচিত :

(১) পণ্যের প্রকৃতি ;
(২) পণ্যের ব্যবহার ;
(৩) ক্রেতার ধার শোধ করিবার ক্ষমতা ;

(৪) ক্রেতার সুনাম ;
(৫) ক্রেতার আয় ;
(৬) ধারের শর্ত ;
(৭) ক্রেতার হিসাব পরীক্ষা ; ইত্যাদি।

ধারে পণ্য বিক্রয় করিলে কু-ঋণের (Bad Debt) সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে ধার আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। এই ব্যবস্থাগুলি হইল :

(১) নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা করা ;
(২) শর্ত অনুযায়ী মূল্য প্রদানের নিয়মিত তাগিদা দেওয়া,
(৩) প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণ।

পণ্যবণ্টনের প্রণালীসমূহ (Channels of Distribution) :

ব্যবসা আরম্ভের প্রারম্ভিক যুগে বণ্টন-ব্যবস্থায় জটিলতা ছিল না ; সরল পদ্ধতিতে বণ্টন-ব্যবস্থা চালিত হইত। উৎপাদক সরাসরি ভোগকারীর নিকট পণ্য বণ্টন করিত ; কোন মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হইত না। বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিলতা সরাসরি পণ্যবণ্টন-ব্যবস্থাকে সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করে না। পণ্যবণ্টনে বর্তমানে কোন না কোন মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য প্রায়ই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া বৃহৎ কারবারের পণ্যবণ্টনে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। পণ্যসামগ্রী উৎপাদকের নিকট যে-যে প্রণালীতে (Channels) ভোক্তা বা ভোগকারীর নিকট আসিয়া পৌছায় নিম্নে তাহাদের শিরোনামা-ভিত্তিক আলোচনা করা হইল :

(১) ভোগকারীর নিকট সরাসরি বিক্রয় (Direct Selling to Consumer) : উৎপাদক তাহার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যখন সরাসরি ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে, তখন তাহাকে সরাসরি বণ্টন-ব্যবস্থা বলে। এইরূপ ব্যবস্থায় কোনরূপ মধ্যস্থ ব্যবসায়ী থাকে না। কৃষিজাত পণ্য, বৃহৎ যন্ত্রপাতি, জাহাজ, বৃহৎ ইঞ্জিন, ক্রেন ইত্যাদি এইরূপ প্রণালীতে উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রেতার নিকট বণ্টিত হয়।

(২) নিজস্ব দোকান মারফত বা বহু-শাখা বিপণি মারফত বিক্রয় (Selling through Own Shops or Multiple Shops) : কখনও কখনও উৎপাদক বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব দোকান খুলিয়া তাহার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ ব্যবস্থায় পণ্যের মান ও মূল্য সকল বিপণিতেই সমান থাকে এবং মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর উচ্ছেদ সম্ভব হয়।

(৩) ডাক মারফত বিক্রয় (Selling through Mail Order) : কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য ব্যতিরেকে ডাক-বিভাগের মাধ্যমে উৎপাদক তাহার পণ্য ক্রেতার নিকট ভি পি (VP—Value Payable) যোগে পাঠায়। ইহাতে পণ্যের মূল্য পণ্য সরবরাহের পর ক্রেতা ডাকঘরের মাধ্যমে বিক্রেতার নিকট পাঠায়।

(৪) **সমবায় সমিতি অথবা সমবায়িকার মাধ্যমে বিক্রয় (Selling through Co operative Societies)ঃ** মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর অপসারণের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থায় ভোক্তা সমবায় (Consumers' Co-operatives) অথবা সমবায়িকার মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রেতার নিকট বণ্টিত হয়। ইহাতে ক্রেতা ন্যায্যদামে পণ্য কিনিতে পারে ও ধনতান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থার কুফল হইতে মুক্ত হয়। সাধারণতঃ ভোগ্যপণ্য এইরূপ প্রণালীতে বণ্টিত হয়।

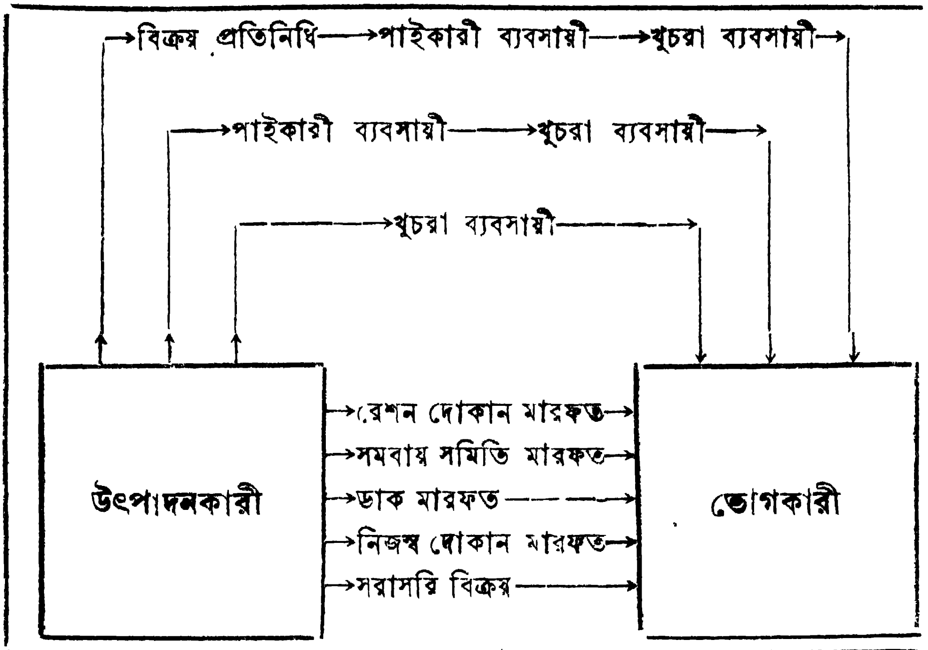
(৫) **রেশন দোকান মারফত বিক্রয় (Selling through Ration Shop)ঃ** সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থায় (Public Distribution System) সরকার নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যসামগ্রী সরাসরি ভোগকারীর নিকট রেশন দোকান মারফত বণ্টন করে। ইহাতে উৎপাদকের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া উহা রেশন দোকান মারফত ভোক্তার নিকট নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিমাণমত বণ্টন করা হয়। ইহা সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **খুচরা ব্যবসায়ী মারফত বিক্রয় (Selling through Retailers):** অনেক সময় উৎপাদকগণ তাহাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সরাসরি খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। এই সকল খুচরা ব্যবসায়ী আবার ঐ সকল পণ্য ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। সুতরাং এইরূপ বণ্টন প্রণালীতে একমাত্র মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হইতেছে—খুচরা ব্যবসায়ী। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে, স্থায়ী চাহিদা আছে এইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে ও পণ্যের বাজার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হইলে এইরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হয়।

(৭) **পাইকার মারফত বিক্রয় (Selling through Wholesalers)ঃ** একাধিক পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা বৃহৎ ও দূরবর্তী বাজারে পণ্যসরবরাহকারী উৎপাদক তাহাদের উৎপাদিত পণ্য পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট বিক্রয় করে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট বিক্রয় করে এবং খুচরা ব্যবসায়িগণ উহা ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ বণ্টন-ব্যবস্থায় পণ্যবণ্টনের ঝুঁকি মধ্যস্থ ব্যবসায়িগণের উপর ন্যস্ত হয় এবং ইহারা মুনাফা রাখিয়া পণ্য ক্রয় করে বলিয়া ভোগকারীর নিকট পণ্যের মূল্য অধিক হয়।

(৮) **বিক্রয় প্রতিনিধি মারফত বিক্রয় (Selling through Selling Agents)ঃ** কখনও কখনও উৎপাদক তাহার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রথমে ইহাদের নিকট বিক্রয় করা হয়। এই সকল প্রতিনিধি বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্যসামগ্রী বণ্টন করে। উহারা আবার পণ্যসামগ্রী ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। বিক্রয় প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারেঃ যেমন, দস্তুরী প্রতিনিধি (Commission Agents), উপস্থাপন প্রতিনিধি (Forwarding Agents), একক প্রতিনিধি (Sole Agents) ইত্যাদি।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পণ্যবণ্টন প্রণালী দেখান হইল :



পণ্যবণ্টন প্রণালী নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়সমূহ (Factors or considerations involved in selecting channels of distribution) :

পণ্যবণ্টন প্রণালী নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

(১) **পণ্যের প্রকৃতি** (Nature of the Product) : পণ্য শিল্পীয় পণ্য অথবা ভোগ্যপণ্য হইতে পারে। শিল্পীয় পণ্য যেমন, বৃহৎ যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ইত্যাদি সরাসরি বিক্রয় করা সুবিধাজনক ; কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল ও ছোট যন্ত্রপাতি প্রতিনিধি মারফত বিক্রয় করা সুবিধাজনক। ভোগ্যপণ্য পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী বা বহুশাখা বিপণির মাধ্যমে বিক্রয় করা সুবিধাজনক। পচনশীল পণ্য সরাসরি বিক্রয় করা উচিত। মরশুমী পণ্যও সরাসরি বিক্রয় করা সুবিধাজনক।

(২) **বাজারের প্রকৃতি** (Nature of the Market) : ক্রেতার প্রকৃতি, রুচি, পছন্দ, স্বভাব, আর্থিক অবস্থা, বাজারের প্রতিযোগিতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্যবণ্টন প্রণালী স্থির করিতে হয়। বিস্তৃত বাজারের ক্ষেত্রে মধ্যস্থ কারবারীর মারফত এবং সীমাবদ্ধ বাজারের ক্ষেত্রে সরাসরি বিক্রয় সুবিধাজনক।

(৩) **প্রতিযোগিতা** (Competition) : প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে আধুনিক প্রথায় সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বণ্টন প্রণালী স্থির করিতে হয়।

(৪) **বিকল্প পদ্ধতি** (Alternate Channel) : কোন বণ্টন প্রণালী নির্বাচনে বিকল্প পদ্ধতির সহিত ইহার তুলনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা যাচাই করিতে হইবে।

(৫) **বণ্টন নীতি** (Distribution Policy) : বণ্টন নীতির উপর পণ্যবণ্টন প্রণালী নির্বাচন নির্ভর করে। বণ্টন নীতি তিন প্রকারের হইতে পারে ; যেমন, আতিশয্যমূলক, নির্বাচনমূলক ও একবাচক।

(৬) **কার্যকারিতা** (Effectiveness) : যে বণ্টন প্রণালী অধিকতর ফলপ্রসূ অর্থাৎ অধিক বিক্রয়ে সমর্থ, তাহাই নির্বাচন করিতে হয়।

(৭) **উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা** (Co-operation between the Producers and Dealers) : উৎপাদক বিজ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিলে এবং ব্যবসায়ী বিক্রয়ের পর প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করিলে উভয়ের সহযোগিতার মাধ্যমে পণ্যবণ্টন পদ্ধতি উন্নত হয়।

(৮) **আর্থিক অবস্থা** (Financial Condition) : উৎপাদকের আর্থিক অবস্থার উপর পণ্যবণ্টন প্রণালী নির্ভর করে।

(৯) **ব্যয়** (Cost) : বণ্টন ব্যয় বিক্রয়ের আর্থিক পরিমাণের সহিত যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(১০) **বিক্রেতার বাজারের উপর প্রভাব** (Influence of the Seller upon the Market) : বিক্রেতা যদি একচেটিয়া কারবারী হয় তবে পণ্যবণ্টন প্রণালী সরল হইবে।

(১১) **সরকারী বিধিনিষেধ** (Government Restrictions) : কোন কোন পণ্য যেমন, মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ মানিয়া বণ্টন প্রণালী স্থির করিতে হয়।

(১২) **প্রতিষ্ঠানের সুনাম** (Goodwill of the Firm) : খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান পছন্দমত বণ্টন প্রণালী স্থির করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (Different Types of Intermediaries) :

বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয় একটি জটিল ব্যবস্থা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যাহারা সংযোগ সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলে। বিভিন্ন প্রকারের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হইল :

পাইকারী বিক্রেতা (Wholesaler)—ইহারা একসঙ্গে প্রচুর দ্রব্য খুচরা বিক্রেতাকে বিক্রয় করে। উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতার মধ্যে ইহারা সংযোগ সাধন করে। ইহারা উৎপাদকের বিক্রয় নিশ্চিত করে, খুচরা বিক্রেতাকে স্বল্প পরিমাণে ক্রয় এবং পণ্যের মূল্য স্থির রাখিতে সাহায্য করে।

খুচরা বিক্রেতা (Retailer)—খুচরা বিক্রেতা অল্প পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা পাইকার ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। পণ্যের বণ্টন-ব্যবস্থায় ও ভোগকারীর চাহিদা পূরণে ইহারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ফড়িয়া (**Factor**)—যে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া দস্তুরী বা Commission-এর বিনিময়ে নিজ নামে দ্রব্যটি বিক্রয় করে, তাহাকে ফড়িয়া বলে। ইহাদের কাজে উৎপাদকগণ নিশ্চিত হয়।

দালাল (**Broker**)—যে সব মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নিজে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে না কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাইয়া দেয়, তাহাদের দালাল বলে। ইহারা দালালীর বিনিময়ে কাজ করে।



নীলামদার (**Auctioneer**)—মূল বিক্রেতার হইয়া এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরে যাহারা পণ্য বিক্রয় করাইয়া দেয়, তাহাদের নীলামদার বলে। ইহারা দস্তুরী বা Commission পায়।

অবলেখক (**Underwriter**)—যে সকল মধ্যস্থ ব্যবসায়ী দস্তুরীর পরিবর্তে কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের অবলেখন দেয় অর্থাৎ বিক্রয় না হইলে নিজেরাই শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া লইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহাদের অবলেখক বা দায়-গ্রাহক বলে।

দস্তুরী-প্রতিনিধি (**Commission Agent**)—ইহারা পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা যোগাড় করিয়া দস্তুরীর বিনিময়ে পণ্য আদান-প্রদান করায়।

ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি (**Del Credere Agent**)—যে বিক্রয় প্রতিনিধি ধারে পণ্য বিক্রয়ের ঝুঁকি বহন করে এবং পণ্যের মূল্য আদায় না হইলে নিজে পণ্যের মালিককে কু-ঋণজনিত ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহাকে ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি বলে। ইহারা অতিরিক্ত দস্তুরী পায়।

উপস্থাপন প্রতিনিধি (Forwarding Agent)—ইহারা রপ্তানিকারকের পক্ষে পণ্য সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্য রপ্তানি পর্যন্ত সকল প্রকার কার্য দস্তুরীর বিনিময়ে করিয়া থাকে।

পণ্যপ্রাপক (Consignee)—যে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী পণ্যের মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের দায়িত্বে দ্রব্য বিক্রয় করে ও দস্তুরী পায়, তাহাকে পণ্যপ্রাপক বলে।

একক প্রতিনিধি (Sole Agent)—কোন বিশেষ অঞ্চলে উৎপাদকের পণ্য বিক্রয়ের জন্য যখন কোন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এককভাবে নিযুক্ত হয় এবং দস্তুরী পায়, তখন তাহাকে একক প্রতিনিধি বলে।

মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয়তা
(Necessity of Middlemen)

বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) সুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যে আর্থিক সমাজে উৎপাদন অব্যাহত থাকে এবং ভোগকারীদের প্রয়োজনমত দ্রব্য সরবরাহ করা যায়, সেই সমাজকে অর্থনৈতিক দিক হইতে সুস্থ সমাজ বলা হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ দেশের ও বহির্দেশের কৃষিজ এবং শিল্পজ দ্রব্য ক্রয় করিয়া উৎপাদনকারিগণকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাতে শিল্প উৎপাদন অব্যাহত থাকে। খুচরা ব্যবসায়িগণ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করিয়া সাধারণ ভোগকারীদের প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করে। সুতরাং উভয়েই দ্রব্য যোগানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি সম্পাদন করে।

(২) উৎপাদকগণ যদি উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা উৎপাদনেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়ী ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়েই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ঝুঁকি লয়। সুতরাং উৎপাদকগণ নিশ্চিন্ত মনে অব্যাহতভাবে উৎপাদন করিতে পারে।

(৩) পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য আবশ্যকীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কার্য করিয়া থাকে। উৎপাদকগণকে পৃথকভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। বিক্রয়ের ঝুঁকি পাইকার ও খুচরা বিক্রেতা গ্রহণ করে বলিয়া উৎপাদকগণকে পৃথকভাবে বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয় না।

(৪) পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা বাজারের চাহিদার উপর সর্বদা নজর রাখে। চাহিদা উঠা-নামার জন্য মূল্যের পরিবর্তন হয়। মূল্য উঠা-নামা করিলে অনেক সময়েই উৎপাদনকারীকে লোকসান স্বীকার করিতে হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ বাজারের চাহিদা অনুমান করিয়া আগাম (Advance) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে। আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া পাইকারী ব্যবসায়িগণ মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(৫) খুচরা ব্যবসায়িগণ প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ ভোগকারীদের সংস্পর্শে আসে বলিয়া তাহারা বাজারের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে। চাহিদা ও

রুচির পরিবর্তন খুচরা ব্যবসায়িগণ পাইকারী ব্যবসায়ীকে জানায়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ তদনুযায়ী পণ্য উৎপাদনকারীকে বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ দিয়া থাকে। উৎপাদনকারিগণ পাইকারী ব্যবসায়িগণের পরামর্শ অনুসারে চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে পারে।

মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কুফল
(Demerits of Middlemen)

মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর যথেষ্ট সুফল আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আবার মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাও করা যায়, যেমন—

(১) মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ নিজেরা পণ্য উৎপাদন করে না অথবা পণ্য উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণও করে না। তাহারা উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য বিক্রয় করে। যখন পাইকারী ব্যবসায়িগণ খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা করে। আবার খুচরা ব্যবসায়ী যখন ভোগকারীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন সেও ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা করে। এইরূপভাবে প্রতিটি স্তরেই দ্রব্য হস্তান্তরের জন্য মূল্য বাড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোগকারীকে উৎপাদনমূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে হয়। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী না থাকিলে উৎপাদনকারী সরাসরি ভোগকারীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিত। তাহাতে সাধারণ ভোগকারী অনেক কম মূল্যে পণ্য ভোগ করিতে পারিত।

(২) মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ প্রত্যক্ষভাবে বাজারের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া অনেক সময় অন্যায়ভাবে সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা অনেক সময় অসঙ্গতভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা করে। গোপনে পণ্য মজুত রাখিয়া বাজারে কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের ঘাটতি সৃষ্টি করিয়া এবং সরবরাহ সংকোচ করিয়া পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রকার অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা অতিরিক্ত মুনাফা করে।

(৩) কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদকগণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ এই সকল উৎপাদকদেরও শোষণ করে, আবার ক্রেতাদেরও শোষণ করে। তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে অন্যায্য মূল্যে (ন্যায্য মূল্য হইতে কম মূল্যে) দ্রব্য ক্রয় করে এবং উহা ক্রেতাদের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। ইহাদের হাত হইতে কৃষকদের এবং ক্রেতাদের রক্ষা করিবার জন্য কৃষক ও ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন আছে।

(৪) মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা অনেক সময় দ্রব্যে ভেজাল দেয়। দ্রব্য তাহাদের গুদামে অথবা দোকানে থাকাকালীন এই কার্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায়ীর কার্যে উৎপাদক এবং ক্রেতা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৫) মধ্যস্থ কারবারিগণ অনেক ক্ষেত্রে অসাধু উপায়ে চাহিদা ও যোগানের ব্যারোমিটার (Barometer)-এ অসাম্য সৃষ্টি করিয়া একটি কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করে এবং অত্যধিক দামে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্ভোগকারিগণকে শোষণ করে।

উপসংহারে বলা যায় যে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের কার্যকলাপের ফলাফল বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের কার্যের ফলে ভোগকারিগণকে অনেক সময় দ্রব্যের অধিক মূল্য দিতে হয় ; কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ই রাষ্ট্রায়ত্ত না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করা সম্ভব নহে। যতদিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক থাকিবে, ততদিন ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে এবং ততদিন পর্যন্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীকে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমাজের **অপরিহার্য পরগাছা** (Indispensable Parasite) হিসাবে স্বীকার করিতেই হইবে। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের তুলিয়া দিতে হইলে বহু-শাখা বিপণি, সমবায় বিপণি, বিক্রয় সংঘ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে খুলিতে হইবে এবং সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইবে।

পাইকারী ব্যবসা
(Wholesale Trade)

পাইকারী ব্যবসায়িগণ মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসাবে কার্য করে। অনেক পাইকারী ব্যবসায়ী কাঁচামাল ক্রয় করে এবং তাহা পণ্য উৎপাদনকারিগণের নিকট বিক্রয় করে। আবার অনেক পাইকারী ব্যবসায়ী আছে যাহারা উৎপাদিত দ্রব্য (Finished goods) ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট উহা বিক্রয় করে। পাইকারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা প্রায় সর্বদাই একবারে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে। ইহাকে পাইকারী হারে ক্রয় বলে। তবে যখন বিক্রয় করে তখন যে সর্বদাই একবারে অধিক পরিমাণে অর্থাৎ পাইকারী হারে বিক্রয় করে তাহা নাও হইতে পারে। যখন কাঁচামাল ক্রয় করিয়া পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদনকারিগণের নিকট বিক্রয় করে, তখন অবশ্য একবারে অধিক পরিমাণেই অর্থাৎ পাইকারী হারে বিক্রয় করে। কিন্তু যখন তাহারা খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য (Finished Consumers' Goods) বিক্রয় করে, তখন যে সর্বদাই একবারে অধিক পরিমাণে পাইকারী হারে বিক্রয় করে, তাহা নহে। পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়িগণ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহারা পণ্য উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়িগণের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে কার্য করে। ইহারা বাজারের অবস্থা পর্যালোচনা করে। সুতরাং ভোগকারী ও পণ্য উৎপাদনকারিগণের মধ্যেও ইহারা সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করে। সংযোগকারী ব্যবসায়ী হিসাবে কার্য করে বলিয়া ইহারা পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে।

পাইকারী ব্যবসায়ের উপযোগিতা : পাইকারী ব্যবসা মধ্যবর্তী কারবার হিসাবে কার্য করে এবং তাহার জন্য মুনাফা আয় করে। ফলে সাধারণ ভোগকারীকে অধিক মূল্য দিতে হয়, এইরূপ অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু মুনাফা করিলেও পাইকারী ব্যবসা যে থাকা উচিত নহে, তাহা সকল ক্ষেত্রে স্বীকার করা যায় না। পাইকারী ব্যবসা থাকিবার জন্য পণ্য উৎপাদনকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতা সকলেই কিছু কিছু সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। পাইকারী ব্যবসা না থাকিলে পণ্য

উৎপাদনকারীকেই সাধারণ ভোগকারীদের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। ইহা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

(ক) পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উৎপাদনকারী যে সুযোগ পাইয়া থাকে (অর্থাৎ উৎপাদনকারীর দিক হইতে পাইকারী ব্যবসায়ের উপযোগিতা) ঃ

পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উৎপাদনকারী যথেষ্ট উপকার ও সুবিধা পাইয়া থাকে। যেমন—

(১) বর্তমান যুগে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বহুল-উৎপাদন (Mass Production) বা বৃহদায়তন উৎপাদনের (Large-scale Production) নিয়ম চলিতেছে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সাফল্য বৃহদায়তন বণ্টনের (Mass Distribution) উপর নির্ভর করে। কারণ, যে পরিমাণে পণ্য উৎপাদিত হয় সেই পরিমাণে পণ্য বিক্রয় না হইলে উৎপাদন-কারিগণের লোকসান হয়। উৎপাদিত পণ্য সত্বর বিক্রয় না হইলে সেই দ্রব্য ভবিষ্যতে বিক্রয়ের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আবার উৎপাদিত পণ্য সত্বর বিক্রয় না হইলে উৎপাদনকারীকে মূলধন আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহাতে মূলধনের আবর্তন (Turnover) কমিয়া যায়। সুতরাং বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ পাইতে হইলে বৃহদায়তন বণ্টনের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। পাইকারী ব্যবসায়িগণ মধ্যবর্তী কারবারী হিসাবে কার্য করে বলিয়া উৎপাদনকারিগণ বৃহদায়তন উৎপাদনের সুফল ভোগ করিতে পারে।

(২) বৃহদায়তন শিল্পে পণ্য উৎপাদনের পর উৎপাদিত দ্রব্য গুদামজাত করিতে হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ সর্বদা বহুল পরিমাণে পণ্য ক্রয় করিয়া তাহা মজুত করিবার ব্যবস্থা করে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ যদি উৎপাদনকারিগণের (শিল্প-মালিকগণের) নিকট হইতে বহুল পরিমাণে পণ্য ক্রয় না করে, তবে উৎপাদিত পণ্যের মজুতের ব্যবস্থাও পণ্য উৎপাদনকারীকেই (শিল্প-মালিককে) করিতে হয়। সুতরাং, পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদনকারীর পক্ষে পণ্য মজুত রাখিবার কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ নিজস্ব গুদামে উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখে। পণ্য উৎপাদনকারীকে উৎপাদিত পণ্য মজুত করিবার জন্য গুদামঘর তৈয়ারী অথবা গুদামঘর সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হয় না। গুদামঘর তৈয়ারী করিতে অথবা গুদামঘর ভাড়া করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হইত, শিল্প-মালিকগণ তাহা পণ্য উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করিতে পারে।

(৩) উৎপাদনকারিগণের পক্ষে যত সত্বর উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হয় ততই সুবিধা। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য বিক্রয় হইলে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ই পুনরায় উৎপাদনে প্রয়োগ করা যায়। ফলে উৎপাদনকারীকে মূলধনের অভাব ভোগ করিতে হয় না। পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পণ্য ক্রয় করে বলিয়া উৎপাদনকারীকে অর্থের অভাব অনুভব করিতে হয় না।

(৪) পাইকারী ব্যবসায়িগণ সর্বদাই বাজারের অবস্থা, চাহিদার প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে। ফলে, বাজারের অবস্থা, ভোগকারীর রুচি ইত্যাদি বিষয়ে পাইকারী

ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকে। পণ্য উৎপাদনকারিগণ বাজারের অবস্থা, ভোগকারীর রুচি, চাহিদার গতি-প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে পাইয়া থাকে এবং তদনুযায়ী উৎপাদনের পদ্ধতি, পরিমাণ ইত্যাদি স্থির করে। এইভাবে সে বাজারের চাহিদার সহিত নিজের উৎপাদনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে।

(৫) পণ্য উৎপাদনকারিগণ পণ্য উৎপাদন কালেই যথেষ্ট ঝুঁকি বহন করে। যে পণ্য উৎপাদিত হইল, তাহা বিক্রয় হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। বর্তমানে যে দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, অদূর-ভবিষ্যতে রুচি পরিবর্তনের জন্য সেই দ্রব্যের চাহিদা আদৌ নাও থাকিতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদনকারিগণের ঝুঁকি নিজেদের উপর টানিয়া লয়। আধুনিক যুগে পণ্য উৎপাদন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং, উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য ক্রয় করে বলিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনা পণ্য উৎপাদনকারীকে ভোগ করিতে হয় না।

(৬) ভবিষ্যতে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা থাকে না বলিয়া পণ্য উৎপাদনকারী সর্বদা উৎপাদনের উপরই নজর দিতে পারে এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থাকে।

(খ) পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়িগণ যে সুবিধা পাইয়া থাকে (অর্থাৎ খুচরা ব্যবসায়ীর দিক হইতে পাইকারী ব্যবসায়ের উপযোগিতা):

পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়িগণও যথেষ্ট উপকার ও সুবিধা পাইয়া থাকে। যেমন—

(১) খুচরা ব্যবসায়িগণ এক স্বল্পনির্দিষ্ট এলাকার ভোগকারিগণের নিকট তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করে। যাহাতে ভোগকারিগণের প্রয়োজনমত সর্বদা পণ্য সরবরাহ করা যায়, তাহার জন্য খুচরা ব্যবসায়িগণের পক্ষেও ভোগ্যপণ্য মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদকের নিকট হইতে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখে। খুচরা ব্যবসায়িগণের ফরমাশ অনুযায়ী সেই মজুত হইতে তাহাদের পণ্য সরবরাহ করিয়া থাকে। সুতরাং খুচরা ব্যবসায়িগণকে দ্রব্য মজুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় না, অথবা মজুত করিবার জন্য অর্থ আবদ্ধ করিতেও হয় না।

(২) খুচরা ব্যবসায়িগণ সর্বদা অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে। কারণ, তাহারা এক নির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। খুচরা ব্যবসায়িগণ পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রয়োজনমত অল্প পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে খুচরা ব্যবসায়িগণ অল্প মূলধনে ব্যবসা করিতে পারে।

(৩) পাইকারী ব্যবসায়িগণ বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য খুচরা কারবারিগণকে ধারে ক্রয় করিবার সুযোগ দিয়া থাকে। খুচরা ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে

দ্বারা পাইকারী ব্যবসায়ীর ধার শোধ করিতে পারে। ইহাতে খুচরা ব্যবসায়ী স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসা করিবার সুযোগ পায়।

(৪) বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এবং নূতন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিতে হইলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রয়োজন হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং খুচরা ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপনের ব্যয় বিশেষ বহন করিতে হয় না।

(৫) বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে বাড়ান যায় এবং নূতন দ্রব্যের চাহিদা কিভাবে সৃষ্টি করিতে হয় সেই সকল বিষয়ে গবেষণা করিবার মত ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য খুচরা ব্যবসায়ীর থাকে না। পাইকারী ব্যবসায়িগণ খুচরা ব্যবসায়িগণকে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য ও পরামর্শ দিয়া থাকে।

(গ) ক্রেতা-সাধারণ পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে যে সুবিধা পাইয়া থাকে (অর্থাৎ ক্রেতার দিক হইতে পাইকারী ব্যবসায়ের উপযোগিতা):

ক্রেতা-সাধারণ পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাইয়া থাকে:

(১) পাইকারী ব্যবসায়িগণ খুচরা ব্যবসায়িগণের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে বলিয়া পণ্য ভোগকারিগণ তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনও সময়ে পণ্য পাইতে পারে।

(২) পাইকারী ব্যবসায়িগণ পণ্য উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখে এবং খুচরা ব্যবসায়িগণের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ফলে, যে কোনও স্থানের ভোগকারিগণ তাহাদের প্রয়োজনমত দ্রব্য পাইতে পারে।

(৩) পাইকারী ব্যবসায়িগণ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনকারীকে পণ্য উৎপাদন করিতে পরামর্শ দেয় বলিয়া উৎপাদনকারী চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে বলিয়া পণ্যের মূল্যের সমতা বজায় থাকে। পাইকারী ব্যবসা থাকিবার ফলে পণ্যের মূল্য দ্রুত উঠা-নামা করিতে পারে না।

পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন (Organisation of Wholesale Trade):

পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন ব্যবসায়ের আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ী স্থির করা হয়। বড় ব্যবসায়ের পক্ষে সংগঠন-ব্যবস্থা যেভাবে করিতে হয়, ছোট ব্যবসায়ের পক্ষে সংগঠন-ব্যবস্থা অন্যরূপে করিতে হয়। পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠনে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অনুধাবনযোগ্য:

(১) পাইকারী ব্যবসাটি যদি বৃহদায়তন হয়, তবে তাহার মূলধনের প্রয়োজন অধিক হয়। সেক্ষেত্রে হয়ত কোনও একজন মাত্র ব্যবসায়ীর পক্ষে সেই পরিমাণ মূলধন

নিয়োগ করা সম্ভব হয় না; সুতরাং মূলধনের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবসাটি এক-মালিকানা, অংশীদারী অথবা যৌথ-মালিকানা প্রতিষ্ঠান হইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই যে মূলধনের পরিমাণের উপর সংগঠনের প্রকৃতি নির্ভর করে, তাহা নহে। যদি কোনও ব্যবসায়ী এককভাবে ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইতে না চাহে, তবে অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ-মালিকানা কোম্পানী গঠন করিয়া থাকে।

আয়তনের উপর যেমন কারবারের মূলধনের প্রয়োজন নির্ভর করে, তেমনই পণ্যের প্রকার অনুসারেও মূলধনের প্রয়োজনের তারতম্য হয়। কাপড়ের পাইকারী ব্যবসায়ের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে, গেঞ্জির পাইকারী ব্যবসায়ের জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূলধন প্রয়োজন হইবে।

(২) যে কোনও কারবারের পক্ষে একটি **অফিসের** প্রয়োজন হয়। অফিসে কারবারের লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। পাইকারী ব্যবসায়িগণ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুদামঘর হইতে পণ্য বিক্রয় করে। পাইকারী ব্যবসায়ের অফিসও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গুদামঘরের সংলগ্নই থাকে। অল্প পরিমাণ ক্রেতার নিকট মাথাপিছু অধিক বিক্রয় হয় বলিয়া লেনদেনের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। সুতরাং পাইকারী ব্যবসায়ের অফিস খুব বৃহৎ হয় না। অল্পসংখ্যক কর্মচারী, করণিক ও শ্রমিক লইয়া পাইকারী ব্যবসায়িগণ অফিস চালাইতে পারে। তবে যে সকল পাইকারী ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পাইকারী ব্যবসা করে তাহাদের পক্ষে বৃহদাকার অফিসের প্রয়োজন হয়।

(৩) পাইকারী ব্যবসায়ের **গুদামেই** লেনদেন অধিক হয়। সুতরাং, পাইকারী ব্যবসায়ের পক্ষে পৃথকভাবে দোকান খুলিবার প্রয়োজন হয় না। তবে অবস্থা-বিশেষে পৃথক দোকানও খুলিতে হইতে পারে। অনেক পাইকারী ব্যবসায়ী শহরের প্রান্তে গুদামঘর রাখে, কিন্তু পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিবার জন্য শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৃথক দোকান খুলিয়া রাখে। ইহাতে পণ্য সুসজ্জিত করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। ইহাকে শো-রুম (Show-room) বা প্রদর্শনী-আগার বলা হয়। পণ্যের শ্রেণীবিভাগ, মোড়ক করা ইত্যাদি কাজ গুদামেই করা হয়।

(৪) যে সকল স্থানে **যানবাহন** এবং **যোগাযোগের** সুবিধা পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সকল স্থানেই গুদামঘর তৈয়ারী করা হয়। ক্রেতা যাহাতে যানবাহনের সুবিধা পায় সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়ীকে নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়, যেমন, সিমেন্ট ব্যবসায়ীর নিজস্ব লরী থাকিলে ক্রেতার ঘরে সহজে সে পণ্য পৌছাইয়া দিতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়ীর পক্ষে নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৫) পাইকারী ব্যবসা যদি এক-মালিকানা হয়, তবে মালিক নিজেই ব্যবসা দেখাশুনা এবং পরিচালনা করিয়া থাকে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, করণিক প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হয়। সেইরূপ, ব্যবসাটি যদি অংশীদারী ব্যবসা হয়, তবে অংশীদারগণ যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে,

অথবা প্রয়োজনবোধে ম্যানেজার নিয়োগ করিয়া প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিতে পারে। ব্যবসাটি যদি যৌথ-মালিকানা কোম্পানী হয়, তবে ব্যবসা পরিচালনার ভার সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত হয়। পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি কর্মচারী এবং অন্যান্য কর্মচারী থাকে। পাইকারী ব্যবসাটি যদি বহুবিধ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় ম্যানেজার নিয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিভাগীয় ম্যানেজারই স্ব-স্ব বিভাগের ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করিয়া থাকে।

(৬) সে সকল পাইকারী ব্যবসায়ী একাধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহারা পণ্যপিছু একটি করিয়া বিভাগ খোলে এবং একজন করিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করে। পাইকারী ব্যবসায়ে সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। এই বিভাগ তিনটি হইল: (ক) নির্বাহী বিভাগ, (খ) ক্যাশ বিভাগ এবং (গ) প্রশাসনিক বিভাগ। বিভাগসমূহ সাধারণতঃ একজন জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে থাকে।

(৭) যাতায়াতের সুবিধা এবং সুষ্ঠু পরিবহণের সুবিধাযুক্ত স্থানে পাইকারী ব্যবসা স্থাপন করিতে হয়। শহরে ও গঞ্জে ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে পাইকারী ব্যবসা স্থাপন করা সুবিধাজনক। অধিক পরিমাণে পণ্য রাখা যায় এইরূপ আবাসে পাইকারী ব্যবসা খুলিতে হয়।

(৮) উৎপাদনকারী, পণ্যের বাজার, আমদানিকারক প্রভৃতি **পণ্য সংগ্রহের উৎস**। বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ী বিভিন্ন উৎস হইতে পণ্য সংগ্রহ করে। পণ্যের চাহিদা, মূল্য, গুণাগুণ, বাট্টা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্য ক্রয় করা হয়।

পাইকারী ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Wholesale Trade)

ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পাইকারী ব্যবসাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

(১) **এক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা (Single Commodity Wholesale Trade)**: পাইকার যদি একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে এক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা বলা হয়।

(২) **সাধারণ পণ্যের পাইকারী ব্যবসা (General Commodity Wholesale Trade)**: পাইকার যখন বহুবিধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাহাকে সাধারণ পণ্যের পাইকারী ব্যবসা বলা হয়।

(৩) **জাতীয় পাইকারী ব্যবসা (National Wholesale Trade)**: কোনও দেশে কোনও দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যদি একজন মাত্র পাইকার থাকে তাহা হইলে তাহাকে জাতীয় পাইকারী ব্যবসা বলা হয়। সাধারণতঃ কোন দ্রব্যের আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে জাতীয় পাইকারী ব্যবসা কথাটি প্রয়োগ করা হয়। যদি কোনও একটি পাইকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনও দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিবার অথবা

বিদেশ হইতে কোনও দ্রব্য আমদানি করিবার একচেটিয়া অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহাকে জাতীয় পাইকারী ব্যবসা বলা হয়।

(৪) **আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা (Regional Wholesale Trade):** এক-একটি অঞ্চলে যদি একটি মাত্র পাইকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা বলা হয়। ইহাতে কোনও অঞ্চলে একটির অধিক পাইকারী ব্যবসা থাকে না। আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা এক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা হইতে পারে, আবার সাধারণ পণ্যের পাইকারী ব্যবসাও হইতে পারে। আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা যদি এক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা হয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চলে ঐ পণ্যের জন্য অন্য কোনও পাইকারী ব্যবসা থাকিতে পারে না। এভারেডি ব্যাটারী তৈয়ারী হয় কলিকাতায়। পশ্চিমবঙ্গে যদি এভারেডি ব্যাটারীর পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় কেবল একটি প্রতিষ্ঠানই করে, তাহা হইলে তাহাকে আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা বলা যাইতে পারে। আবার যদি কোনও শহরে মাত্র একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নানাপ্রকার পণ্যের পাইকারী ব্যবসা করে এবং আর কোনও পাইকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সাধারণ পণ্যের আঞ্চলিক পাইকারী ব্যবসা বলা যাইবে।

(৫) **নগদান পাইকারী ব্যবসা (Cash and Carry Wholesale Trade):** যে পাইকারী ব্যবসা ধারে ক্রয়ের সুযোগ দেয় না, সেই পাইকারী ব্যবসাকে নগদান পাইকারী ব্যবসা বলে। ইহারা সর্বদাই নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। নগদান পাইকারী ব্যবসাও এক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা হইতে পারে, আবার সাধারণ পণ্যের পাইকারী ব্যবসা হইতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহারা সাধারণ পণ্যের পাইকারী ব্যবসা করিয়া থাকে।

(৬) **ক্ষুদ্র পাইকারী ব্যবসা (Small Wholesale Trade):** যখন পাইকারী ব্যবসা আয়তনে ছোট হয় এবং কম মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহা ক্ষুদ্র পাইকারী ব্যবসা। এইরূপ ব্যবসায়ে সাধারণতঃ একটি মাত্র দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ একটি উৎপাদকের পণ্য বিক্রয় করে। যেমন, স্থানীয় চায়ের পরিবেশক।

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের তুলনা
(Comparison of Wholesale Trade with Retail Trade)

পাইকারী ব্যবসায়ী ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়েই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যবসা করে। কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন—

(১) **পণ্য সরবরাহের উৎস (Source of Supply):** পাইকারী ব্যবসা কৃষিজ ও খনিজ পণ্য এবং শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। আমদানিকারকের নিকট হইতেও ইহারা পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহারা নীলাম বাজার

(Auction Market) হইতেও বহুল পরিমাণে পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। চা-এর পাইকারী ব্যবসায়িগণ নীলাম বাজার হইতে চা ক্রয় করিয়া থাকে। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে।

(২) বিক্রয় (**Sale**) : পাইকারী ব্যবসায়িগণ খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট পণ্য বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়িগণ ভোগকারীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে।

(৩) ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (**Scale of Purchase and Sale**) : সাধারণতঃ পাইকারী ব্যবসায়িগণ প্রতিটি লেনদেনে প্রচুর পরিমাণে পণ্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করে কিন্তু খুচরা ব্যবসায়িগণ প্রতিটি লেনদেনে অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করে।

(৪) ঝুঁকি (**Risk**) : পাইকারী ব্যবসায়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে অনাদায়ী ঋণের ঝুঁকি আছে। কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ে নগদান বিক্রয় হইয়া থাকে। এইজন্য অনাদায়ী ঋণের ঝুঁকি নাই। পাইকারী ব্যবসায়ে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। খুচরা ব্যবসায়ে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি খুবই অল্প। সুতরাং মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি-জনিত ঝুঁকি পাইকারী ব্যবসায়ে বেশী এবং খুচরা ব্যবসায়ে কম।

(৫) মূলধন (**Capital**) : পাইকারী ব্যবসায়ে খুচরা ব্যবসা হইতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়।

(৬) মূল্য প্রদানের শর্ত (**Terms of Payment**) : পাইকারী ব্যবসায়ের লেনদেন প্রধানতঃ ধারেই হয়, কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ের লেনদেন প্রায় সর্বদাই নগদান মূল্যে হয়। খুচরা ব্যবসায়ী যে আদৌ ধারে বিক্রয় করে না, তাহা নহে। তবে খুচরা ব্যবসায়ে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই কম এবং বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধারের সুযোগ দেওয়া হয় না।

(৭) ব্যবসায়ের বিস্তৃতি (**Area of Operation**) : পাইকারী ব্যবসায়িগণ বহু দূরদেশের ব্যবসায়ী অথবা সাধারণ ভোগকারীর নিকটও পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ী এক নির্দিষ্ট এলাকার ভোগকারীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে।

(৮) পণ্যশ্রেণী (**Range of Commodities**) : পাইকারী ব্যবসায়ী সাধারণতঃ একটি বা দুইটি শ্রেণীর পণ্যই ক্রয়-বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়ী একই সঙ্গে বহু প্রকার পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে।

খুচরা ব্যবসা (Retail Trade) : ব্যবসায়ের প্রাথমিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তখন খুচরা ব্যবসায়ের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তখনকার সময়ে পরিবহণ-ব্যবস্থা অনুন্নত ছিল, অর্থলগ্নির সুযোগ কম ছিল, চাহিদার বৈচিত্র্যও ছিল কম। এই সকল কারণে তখনকার সময়ে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। তাই ব্যবসায়ের প্রধান রূপই ছিল খুচরা ব্যবসা।

বর্তমান যুগেও খুচরা ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট সীমায় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। বিভিন্ন পাইকারের নিকট হইতে অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয় করিয়া সাধারণ ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করিবার কার্যকে খুচরা ব্যবসা বলিয়া

গণ্য করা হয়। বর্তমান যুগে বহুল উৎপাদন ও উৎপাদনে বিশেষায়ণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদক সরাসরি ভোগকারীদের নিকট উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিবার সুযোগ পায় না। সুতরাং এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর প্রয়োজন আছে যাহারা উৎপাদক ও ভোগকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। খুচরা ব্যবসায়ী উৎপাদক ও ভোগকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে। উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যবর্তী হিসাবে আবার অন্য এক শ্রেণীর ব্যবসা আছে, যাহাদের বলা হয় পাইকারী ব্যবসা।

প্রয়োজনীয়তা (Importance) বা তাৎপর্য (Significance) ঃ ক্রেতাগণ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি নিকটে এবং বিনা অসুবিধায় পাইতে পারে তাহার জন্যই খুচরা ব্যবসা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমরা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় খুচরা ব্যবসা দেখিতে পাই। খুচরা ব্যবসায়ী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পাইকারের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ী ধারেও ক্রয় করিবার সুযোগ পায়। আবার খুচরা ব্যবসায়ীও অনেক ক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ধারের মেয়াদ খুব অল্প। খুচরা ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একই দোকান হইতে নানাবিধ দ্রব্য কিনিতে পারা যায়। মুদিখানা, মশলাপাতির দোকান, মনিহারী দোকান ইত্যাদি খুচরা ব্যবসা। আবার এমনও খুচরা ব্যবসা আছে যেখানে মাত্র একটি দ্রব্যই পাওয়া যায়। যেমন—খুচরা কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান ইত্যাদি। তবে একটি মাত্র দ্রব্য বিক্রয় করিলেও একই দ্রব্য নানারকমের পাওয়া যায়।

ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিবার ক্ষমতার উপর খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। খুচরা ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষভাবে ভোগকারীদের সংস্পর্শে আসে বলিয়া তাহাদের রুচি ও পছন্দ সম্বন্ধে তাহারা অধিক সচেতন থাকে।

রুচি ও পছন্দ অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিবার ক্ষমতা ছাড়াও খুচরা ব্যবসায়ের পক্ষে সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেবল সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থাই নহে, খুচরা বিক্রেতাগণ ব্যবহার দ্বারা ক্রেতাগণকে মুগ্ধ করিতে পারিলে ব্যবসা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করে।

খুচরা ব্যবসা যে সকল ক্ষেত্রেই ছোট ছোট দোকান হইবে, তাহা নহে। বড় দোকানও খুচরা ব্যবসা করিতে পারে। দোকান বড় হইলেও ইহারা এককালীন অল্প পরিমাণে ক্রয় করে এবং সাধারণ ক্রেতাদের নিকট অল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করে। এই কারণে ইহা অর্থ নৈতিক দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

খুচরা ব্যবসায়ের **কার্য ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ** (Functions and Importance) সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

(১) খুচরা ব্যবসায়িগণ উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সেতু রচনা করে।

(২) খুচরা ব্যবসায়ী স্থানীয় চাহিদা মিটায় এবং ভোগকারীর পছন্দমত পণ্য সরবরাহ করে।

(৩) খুচরা ব্যবসায়ী একজাতীয় পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গুণাগুণের এবং রকমারি পণ্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে ও তাহাদের প্রয়োজন মিটায়।

(৪) ইহারা গ্রাম বা শহরের সর্বত্র বিপণি স্থাপন করিয়া ক্রেতার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে।

(৫) পণ্যের চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারী ব্যবসায়ী মারফত উৎপাদককে খবরাখবর দেয় ও উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

(৬) খুচরা ব্যবসায়ীর অবস্থানের ফলে অধিক পণ্য একসঙ্গে ক্রয় করিয়া অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় না।

(৭) খুচরা ব্যবসায়ী অনেক সময় পরিচিত ক্রেতাকে ধারে পণ্য বিক্রয় করে ও ক্রেতাদের সাময়িক অসুবিধা দূর করে।

খুচরা ব্যবসায়ের সংগঠন (**Organisation**) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে :

(ক) **স্থান নির্বাচন (Locality) :** খুচরা ব্যবসায়ীর দোকান সচরাচর ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে দেখা যায়; কারণ ইহাতে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। পল্লী অঞ্চলে বাজারে বা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এবং শহরে বড় রাস্তার উপর বা বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে এইপ্রকার দোকান খোলা হয়। স্থান নির্বাচনের অন্যান্য বিষয়গুলি হইল : (১) ঐ দ্রব্যের খরিদ্দারের সম্ভাবনা ও সংখ্যা; (২) যাতায়াতের সুবিধা; (৩) ভোক্তার ক্রয়-ক্ষমতা; (৪) ঐ প্রকার দ্রব্যের স্থানীয়করণ (localisation); (৫) স্থানটি শান্তিপূর্ণ কিনা, এবং (৬) নিরাপত্তা।

(খ) **পণ্যের যোগান (Sources of Supply) :** ইহারা পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে। ভোগকারীর চাহিদা, পছন্দ ও অপছন্দ বিবেচনা করিয়া ইহারা প্রয়োজনমত পণ্য ক্রয় করে। ইহারা বিভিন্ন উৎস হইতে বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীর পণ্য ক্রয় করে। পণ্যের মূল্য, পরিমাণ, গুণাগুণ, বাট্টা ইত্যাদি পণ্য ক্রয়ে বিচক্ষণতার সহিত বিবেচিত হয়।

(গ) **পণ্য বিক্রয় (Sale of Goods) :** পণ্য বিক্রয়ে ক্রেতার সহিত সুমধুর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য আধুনিক অঙ্গসজ্জার দ্বারা দোকান সাজান হয়। ইহা বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ঘ) **মূলধন (Capital) :** সাধারণতঃ খুচরা ব্যবসায়ে অধিক মূলধন লাগে না। আবার বড় বড় বিভাগীয় বিপণিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। ইহা আয়তনের উপর নির্ভর করে। যে সকল বিষয়ের উপর মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে সেইগুলি হইল : (১) খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির আয়তন; (২) দ্রব্যের প্রকৃতি, (৩) দ্রব্যটির মূল্য; (৪) দ্রব্য মজুতের পরিমাণ; (৫) খুচরা ব্যবসায়ী কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের লেনদেন করে; (৬) মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা, ইত্যাদি।

(ঙ) মালিকানা (Ownership) : খুচরা ব্যবসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক-মালিকী ব্যবসা। অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী, যৌথ-হিন্দু পারিবারিক ব্যবসা, কোম্পানী অথবা সমবায় সমিতি হিসাবেও ইহার মালিকানা দেখা যায়।

খুচরা ব্যবসায়ে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors in the Selection of the Location for a Retail Business) :

খুচরা ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের জন্য স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হয় :

(১) ঐ অঞ্চলের লোকবসতি ঘন কিনা ;

(২) অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়-ক্ষমতা কিরূপ ;

(৩) স্থানটি শান্তিপূর্ণ কিনা ;

(৪) স্থানীয় লোকের দ্বারা দোকানের উপর হামলা বা উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে কিনা ;

(৫) স্থানটি পাইকারী বাজারের নিকটবর্তী কিনা ;

(৬) নিকটে কোন ব্যাঙ্ক আছে কিনা ;

(৭) পাইকারী বাজার হইতে ব্যবসায়স্থলে পণ্য আনিবার জন্য যানবাহনের সুবিধা আছে কিনা ,

(৮) ব্যবসায়ের স্থানটির বা ঘরের ভাড়া কত ;

(৯) নিকটবর্তী অঞ্চলে ঐ ধরনের কোন ব্যবসা আছে কিনা ;

(১০) প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর নীতি কিরূপ ;

(১১) অঞ্চলের অধিবাসীদের সামগ্রিক "ভোগ-অভ্যাস" (Consumption habit) কিরূপ ;

(১২) ধারে দ্রব্য বিক্রয় করা নিরাপদ কিনা ;

(১৩) দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ ও কি পরিমাণ দ্রব্য সর্বদা মজুত (Stock) রাখিতে হইবে ;

(১৪) মূলধনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত ; ইত্যাদি।

খুচরা ব্যবসায়ের শ্রেণী বিভাগ (Types of Retailing) :

খুচরা ব্যবসাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—একক খুচরা ব্যবসা (Unit Retailer), বিভাগীয় বিপণি (Departmental Stores or Department Stores), বহু-শাখা বিপণি (Multiple Shops), বিপণি-শৃঙ্খল বা চেন স্টোর্স (Chain Stores)।

একক খুচরা ব্যবসা (Unit Retailer) : মালিক যখন একটিমাত্র খুচরা দোকান স্থাপন করিয়া নানাবিধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাহাকে একক খুচরা ব্যবসা (Unit Retailer) বলে। পাড়ায় পাড়ায় যে মুদি, মশলা, মনোহারী দ্রব্যের

ছোট ছোট দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা এক-একটি একক খুচরা ব্যবসা। একক খুচরা ব্যবসা আবার বড়ও হইতে পারে। যেমন, শহরের একটি মনিহারী দোকান গ্রামের একটি মনিহারী দোকান অপেক্ষা অনেক বড় হইতে পারে। কিন্তু উভয়ই খুচরা ব্যবসা।

আকারে অথবা লেনদেনের পরিমাণ অনুসারে একটি খুচরা ব্যবসা অপর একটি খুচরা ব্যবসা হইতে বড় বা ছোট হইতে পারে। কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ের মূল বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় ভোগকারীর প্রয়োজনীয় পণ্য অল্প অল্প পরিমাণে সরবরাহ করিয়া থাকে।

একক খুচরা ব্যবসায়ের পক্ষে ক্রেতাদের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায়ে ধারেও দ্রব্য বিক্রয় করা হয়।

বিশিষ্ট খুচরা ব্যবসা (Specialised Retailing): এই প্রকার খুচরা ব্যবসা একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। ইহারা বিভিন্ন উৎপাদক ও পাইকারদের নিকট হইতে একই প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট উহা বিক্রয় করে। ইহাদের নিকট একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন মানের পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎপাদকের প্রস্তুত একই দ্রব্য একটি দোকানেই পাওয়া যায়। ক্রেতা তাহার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী মান বাছাই করিতে পারে। এইরূপ খুচরা ব্যবসা একটিমাত্র দ্রব্য বিক্রয়ে বিশিষ্টতা লাভ করে। যেমন, ছিটকাপড়ের দোকান, শিশুদের পোশাক বিক্রয়ের দোকান ইত্যাদি।

বিভাগীয় বিপণি (Departmental Stores or Department Stores): যখন একই ব্যবসায়ের মধ্যে কয়েকটি বিভাগ তৈয়ারী করিয়া এক-একটি বিভাগ হইতে এক-এক প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করা হয়, তখন তাহাকে বিভাগীয় বিপণি বলা হয়। সব কয়টি বিভাগ লইয়া একটি ব্যবসা গঠিত হয়। আধুনিককালে বড় বড় শহরে এই প্রকার বিভাগীয় বিপণি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভাগগুলি পৃথক হইলেও মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা একই। এই সকল বিভাগীয় বিপণি খুবই বড় হয়। কলিকাতা শহরে 'ওয়াছেল মোল্লা অ্যাণ্ড সন্স' বিভাগীয় বিপণির উদাহরণ। ইহাতে অনেকগুলি বিভাগ আছে। বস্ত্র-বিভাগ হইতে কেবল কাপড়ই বিক্রয় করা হয়, জুতা-বিভাগ হইতে কেবল জুতাই বিক্রয় করা হয়। এই প্রকারের এক-একটি বিভাগকে এক-একটি খুচরা দোকান বলা যাইতে পারে। সব কয়টি বিভাগ লইয়া ব্যবসাটি গঠিত। সুতরাং বিভাগীয় বিপণিকে একই মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার অধীন কতকগুলি খুচরা দোকানের সম্মিলন বলা হয়। ইহাতে বিভিন্ন উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় একস্থানে কেন্দ্রীভূত। আধুনিককালে এই প্রকার খুচরা ব্যবসা বড় বড় শহরে খুবই প্রসার লাভ করিতেছে।

বিভাগীয় বিপণির সুবিধা (Advantages of Departmental Stores or Department Stores): বিভাগীয় বিপণি হইতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়েই কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পারে। যেমন—

(ক) ক্রেতাদের দিক হইতে সুবিধা (Advantages from the viewpoint of Buyers) :

(১) ক্রেতাগণ একই দোকান হইতে প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। তাই ক্রেতাদের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়। পাঁচটি দোকান ঘুরিয়া পাঁচটি দ্রব্য ক্রয় করিতে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়। কিন্তু একটি দোকান হইতে পাঁচটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিলে সময় ও পরিশ্রম লাঘব হয়।

(২) বিভাগীয় বিপণি বৃহদাকারের হয় বলিয়া বিভিন্ন উৎপাদকের তৈয়ারী একই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। ক্রেতাগণ বিভিন্ন উৎপাদকের তৈয়ারী দ্রব্য হইতে নিজেদের পছন্দমত কোনও বিশেষ উৎপাদকের দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ পায়।

(৩) বিভাগীয় বিপণি নির্দিষ্ট মান ও উৎকর্ষযুক্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। ক্রেতাগণও দ্রব্যের মান ও উৎকর্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে।

(৪) এই সকল দোকান সাধারণতঃ শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হইয়া থাকে। তাই শহরের বিভিন্ন অংশের ক্রেতাগণও এই সকল দোকান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। অবশ্য শহরের মধ্যে যানবাহন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু না থাকিলে এই সুযোগ ভোগ করা কষ্টকর।

(৫) অনেক সময় বিভাগীয় বিপণি ক্রেতাদের বাড়ীতে দ্রব্য পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অল্প দ্রব্য ক্রয় করিলে অথবা অপরিচিত ক্রেতা হইলে এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

(খ) বিক্রেতার দিক হইতে সুবিধা (Advantages from the viewpoint of Sellers) :

(১) বিভাগীয় বিপণিতে একটি বিভাগ অপর বিভাগের পক্ষেও প্রচারকার্য করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই প্রকার দোকানের কোনও বিভাগে দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগের দ্রব্য দেখিয়া ক্রেতা সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে আগ্রহী হয়। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রেতা অনেক ক্ষেত্রে অন্য বিভাগের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে বিভাগীয় বিপণির মোট বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

(২) বিভাগীয় বিপণিতে বিভিন্ন বিভাগের গড় প্রচার-ব্যয়ও কম পড়ে। এই প্রকার ব্যবসা একটি বিভাগের জন্যই প্রচারকার্য চালায় না। একই প্রচার-ব্যয়ে অনেকগুলি বিভাগের প্রচারকার্য চলিতে পারে। এই প্রকার ব্যবসায়ে মোট প্রচার-ব্যয় বেশী হইলেও প্রত্যেকটি বিভাগের গড়পড়তা প্রচার-ব্যয় কম হয়।

(৩) বিভাগীয় বিপণি একসঙ্গে বহু বিভাগের জন্য বহু পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে বলিয়া ক্রয়-জনিত ব্যয়-সংকোচ ঘটে। পাঁচটি বিভাগের জন্য একই সময়ে দ্রব্য ক্রয় করিয়া একটি যানযোগে দ্রব্য আনিলে পরিবহণ-ব্যয় পাঁচটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। আবার, ইহাদের ক্রয়ের পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া ইহারা সুবিধা দরে ক্রয় করিতে পারে।

(৪) প্রত্যেক ব্যবসায়ের সাফল্য সুষ্ঠু ও দক্ষ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে। এই সকল বিপণি সাধারণতঃ বিত্তশালী বিপণি। সুতরাং ইহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দক্ষ

ক্রেতা (Purchase Officer) ও বিক্রেতা (Salesman) নিয়োগ করিতে পারে এবং তাহাদের বিশেষজ্ঞ সেবা (Specialised Services) পাইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তন খুচরা দোকান এই সুযোগ পায় না।

(৫) প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগের সুবিধা আছে বলিয়া ইহারা প্রচুর-সংখ্যক বিক্রেতা, করণিক প্রভৃতি নিয়োগ করিয়া শ্রম-বিভাগের সুফল লাভ করিতে পারে। ইহাতে পরিচালন-ব্যয় বেশী পড়িলেও পরিচালন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয়।

(৬) বিভিন্ন বিভাগের বিক্রয়ের ও ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব দ্বারা ইহারা সহজেই ব্যবসায়ের মধ্যে কোন্ বিভাগটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে অথবা কোন্ বিভাগের শ্রমিক শ্রেণী দক্ষ তাহা বিচার করিতে পারে। প্রয়োজনবোধে যে সকল বিভাগ জনপ্রিয় নহে তাহাদের জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। অদক্ষ শ্রমিকদের সুদক্ষ করিবার জন্য শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৭) সাধারণতঃ সমাজের বিত্তশালী মানুষেরাই বিভাগীয় বিপণি হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। ফলে ক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বেশীই হয়।

(৮) বৃহদায়তন দোকান বলিয়া ইহার মোট স্থির ব্যয় বেশী হইলেও বিভাগগুলির গড়পড়তা ব্যয় কম হয়।

বিভাগীয় বিপণির অসুবিধা (Disadvantages of Departmental Stores or Department Stores) :

(ক) ক্রেতাদের দিক হইতে অসুবিধা (Disadvantages from the viewpoint of Buyers) :

(১) বিভাগীয় বিপণি শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয় বলিয়া শহরের বিভিন্ন অংশের ক্রেতাগণ যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সকল বিপণিতে যাইতে অনিচ্ছুক হয়। যাতায়াতের শ্রম ও ব্যয় বহন করিতেও অনিচ্ছুক হয়। তাহারা বাসস্থানের নিকটবর্তী কোনও দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে আগ্রহী।

(২) অল্প পরিমাণে অথবা সাধারণ ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সাধারণ ক্রেতারা এই সকল দোকানে যাইতে সংকোচ বোধ করে।

(৩) দ্রব্যের মান ও গুণের দিক হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া গেলেও এই সকল দোকানের দ্রব্যের মূল্য তুলনায় অন্য খুচরা দোকান হইতে বেশীই হয়। এই অভিযোগ খুবই সত্য। কারণ, বিভাগীয় বিপণির প্রচার ও পরিচালন-ব্যয় বেশী বলিয়া দ্রব্যের মূল্যও বেশী হয়। সুতরাং সাধারণ ক্রেতাগণ এই প্রকার বিপণির দিকে খুব বেশী আকৃষ্ট হয় না।

(৪) সাধারণ ক্রেতাগণের আর একটি অভিযোগ এই যে, এই সকল বিপণি বিত্তশালী ও সাধারণ ক্রেতাগণের মধ্যে প্রভেদমূলক ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অভিযোগও অনেকাংশে সত্য। কারণ, বিত্তশালী ক্রেতা বহু পরিমাণ এবং বহু মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করে বলিয়া ব্যবসায়ের মালিক ও কর্মচারী তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অল্প মূল্যের এবং অল্প পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে বলিয়া মালিক অথবা কর্মচারী সাধারণ ক্রেতার

সন্তুষ্টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। বিত্তশালী ক্রেতার কোনও অভিযোগ থাকিলে তাহা দূরীকরণের জন্য মালিক ও কর্মচারী সচেষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণ ক্রেতার অভিযোগের উপর কেহ কর্ণপাত করে না।

(খ) ব্যবসায়ের দিক হইতে অসুবিধা (Disadvantages from the viewpoint of Business) :

ব্যবসায়ের দিক হইতেও বিভাগীয় বিপণির কিছু অসুবিধা আছে :

(১) বিভাগীয় বিপণিতে প্রভূত মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এই কারণেই বিভাগীয় বিপণি একক মালিকানায় গঠন করা কষ্টকর। ইহা অংশীদারী কারবার কিংবা যৌথ কোম্পানীর মালিকানায় গঠিত হয়।

(২) বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতিও জটিল হয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দের উপর নজর রাখা এবং তাহাদের কার্যের সমন্বয় ঘটানও যথেষ্ট কষ্টকর। এই কারণে বিভাগীয় বিপণিসমূহে অধিক পারিশ্রমিক দিয়া সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলে বিভাগীয় বিপণির পরিচালন-ব্যয়ও খুব বেশী হয়।

(৩) বিভাগীয় বিপণিসমূহের ঝুঁকি বেশী। বিভাগীয় বিপণিসমূহের পরিচালন-ব্যয় অধিক বলিয়া ইহাদের মুনাফার হার অধিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অধিক হারে মুনাফা করিতে হইলে প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা কষ্টকর। কিছু বিত্তশালী ক্রেতার উপর নির্ভর করিয়াই এই প্রকার ব্যবসাকে চলিতে হয়। ইহাদের সাধারণ ক্রেতার আনুকূল্য প্রয়োজন। অথচ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যদি এই সকল ব্যবসায়ের দ্রব্যের মূল্য অধিক হয় তবে তাহারা সাধারণ ক্রেতার সহানুভূতি পাইতে পারে না।

(৪) এই প্রকার ব্যবসা কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া মালিক ও ক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে না। অথচ খুচরা ব্যবসায়ের পক্ষে মালিক ও ক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বড় বড় শহরে বিভাগীয় বিপণি দেখিতে পাওয়া যায় কেন? (Why are Departmental Stores found in big cities ?) :

বিভাগীয় বিপণি বড় বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণসমূহ হইল :

(১) এইরূপ দোকানে সাধারণতঃ জিনিসের দাম বেশী হয়; শহরের ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা বেশী বলিয়া এইপ্রকার বিপণি শহরেই বেশী দেখা যায়।

(২) বড় বড় শহরে বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশী বলিয়া বিভাগীয় বিপণি লাভজনক হয়।

(৩) শহরে ব্যবসা-সম্ভাবনা (Business Possibility) অধিক এবং সেই কারণে ব্যবসায়ীরা শহরে এইরূপ দোকান স্থাপন করিতে আগ্রহী।

(৪) শহরের যানবাহন-ব্যবস্থা উন্নত বলিয়া ক্রেতাগণ দূর-দূরান্তর হইতে আসিতে পারে।

(৫) দ্রব্যের উৎপাদন স্থান ও গুদাম শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় পাইকারী হারে পণ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

(৬) শহরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও অর্থ-সংস্থানের সুবিধা থাকায় এইরূপ বিপণি বৃহদাকারে খোলা সম্ভব হয়।

(৭) শহরে অধিক-সংখ্যক ক্রেতা পাওয়া যায়।

ভারতে বিভাগীয় বিপণির ভবিষ্যৎ (Future of Departmental Stores in India) ঃ

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে বিভাগীয় বিপণির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। কারণ,

(১) দ্রুত নূতন নূতন শহর ও শহরতলি গড়িয়া উঠিতেছে ;

(২) লোকসংখ্যা শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে ;

(৩) শহরের ক্রেতা-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে ;

(৪) ক্রেতাগণ একই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া সময় সাশ্রয় করিতে ইচ্ছুক ;

(৫) অধিক মূলধনের সাহায্যে বৃহদাকার বিভাগীয় বিপণি খুলিলে ব্যবসায়ে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার সুবিধা পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ,

(৬) ভারতে অর্থলগ্নি সংস্থা, যেমন, ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নি-সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে, ফলে বিভাগীয় বিপণির অর্থ-সংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি পাইতেছে ;

(৭) নির্দিষ্ট মানের দ্রব্য বিক্রয় হয় বলিয়া বিভাগীয় বিপণির প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বহু-শাখা বিপণি (Multiple Shops) ঃ উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব কমই ঘটে। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। উৎপাদনকারীর নিকট হইতে পাইকার যে পণ্য ক্রয় করে, তাহা খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়ী উহা আবার ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়েই মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং উৎপাদনমূল্য হইতে অনেক বেশী মূল্যে ভোগকারী দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণ ক্রেতার ধারণা যে, সরাসরি উৎপাদনকারীর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিলে কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য। আবার উৎপাদনকারীর ধারণা যে, যদি ভোগকারীদের নিকট সরাসরি দ্রব্য বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে অনেক মুনাফা করা যায়। তাহারা মনে করে যে, মধ্যবর্তী হিসাবে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতা যে মুনাফা পায় তাহার অধিকাংশই উৎপাদক নিজে পাইতে পারে।

ইহা ছাড়াও উৎপাদকগণ বহু-শাখা বিপণির মাধ্যমে ভোগকারীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে। ইহাতে উৎপাদকগণ ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে এবং ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ অনুসারে পণ্য উৎপাদন করিতে পারে।

এই দুইটি কারণেই বর্তমানে পণ্য উৎপাদনকারী নিজেরাই খুচরা দোকান খুলিয়া পণ্য বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। উৎপাদনকারী যখন দেশের বিভিন্ন অংশে এবং শহর ও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় খুচরা দোকান খুলিয়া উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তখন তাহাকে বহু-শাখা বিপণি বলে। বাটা জুতা কোম্পানী, ঊষা সেলাই কল কোম্পানী, বোম্বে ডাইং, শক্তি ঔষধালয়, সাধনা ঔষধালয় ইত্যাদি বহু উৎপাদক বর্তমানে নিজেরাই খুচরা দোকান খুলিয়া ভোগকারীদের নিকট সরাসরি দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। কলিকাতা শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকায়ই এক বা একাধিক বাটার জুতার দোকান দেখা যায়। ইহা বহু-শাখা বিপণির উদাহরণ।

কোনও এলাকায় নূতন দোকান খুলিতে হইলে দ্রব্য উৎপাদনকারীকে সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা, সম্ভাব্য চাহিদা, যানবাহনের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

বহু-শাখা বিপণির সুবিধা (Advantages of Multiple Shops) : বহু-শাখা বিপণির অনেক সুবিধা আছে এবং সেই সকল সুবিধার জন্য আধুনিককালে বহু-শাখা বিপণি খুচরা ব্যবসা হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

(ক) ভোগকারীর দিক হইতে সুবিধা (Advantages from the viewpoint of Consumers) :

(১) শহরের বিভিন্ন অংশে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা বিপণিসমূহ স্থাপিত হয় বলিয়া ভোগকারিগণ তাহাদের বাসস্থানের অতি নিকটেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে ভোগকারীর পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। দূরবর্তী স্থানে দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য যাতায়াতের পরিশ্রম করিতে হয় না।

(২) সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দ্রব্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে স্থির হয়। কিন্তু উৎপাদক নিজেই যখন দোকান খুলিয়া পণ্য বিক্রয় করে, তখন এমনভাবে মূল্য স্থির করা হয় যাহাতে দর-কষাকষির প্রয়োজন হয় না। এই সকল দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয় হয়।

(৩) এই সকল দোকানে যে দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা সমমানবিশিষ্ট হয়। উৎপাদকগণ প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের জন্য ট্রেড মার্ক লইয়া থাকে। তাহাতে দ্রব্যের মান বজায় থাকে। ভোগকারিগণ দ্রব্যের মান সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না।

(৪) বহু-শাখা বিপণি-ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর বিলোপ ঘটে। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা যে মুনাফা অর্জন করে তাহা সম্পূর্ণই ভোগকারীকে বহন করিতে হয় না। ফলে ক্রেতা কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

(৫) উৎপাদক ভোগকারীর সহিত সরাসরি সম্পর্ক রাখিতে পারে বলিয়া বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সম্বন্ধে সঠিক অনুমান করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদকের ঘরে অবিক্রীত মাল মজুত থাকে না। ক্রেতা সর্বদাই টাটকা দ্রব্য পাইয়া থাকে।

(৬) বহু-শাখা বিপণি-ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজেই বিক্রেতা বলিয়া ক্রেতার পক্ষ হইতে দ্রব্যের মান ও গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ থাকিলে খুব সত্বর তাহার প্রতিকার করিতে পারে।

(খ) উৎপাদক অথবা বিক্রয়কারীর পক্ষে সুবিধা (Advantages from the viewpoint of the Producer or Seller) :

(১) এই সকল দোকানের জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন-ব্যয় কম পড়ে। প্রতিটি দোকান একই প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাদের সজ্জা-পারিপাট্যও একই প্রকার হয়। সুতরাং কারবারের বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থার ফল সকল দোকানই ভোগ করিতে পারে। প্রতিটি দোকানের জন্য উৎপাদক পৃথক পৃথক বিজ্ঞাপন দেয় না। উৎপাদক বিজ্ঞাপন দেয় তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের। ফলে একই বিজ্ঞাপনে সকল দোকানের বিজ্ঞাপনের কাজ হয়। সুতরাং দোকান-পিছু বিজ্ঞাপন-ব্যয় খুব কম পড়ে।

(২) বহু দোকানের মাধ্যমে একই দ্রব্য বিক্রয় হয় বলিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে। আবার, বিক্রেতা সরাসরি দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া সর্বদাই টাটকা দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহাও ক্রেতাকে আকর্ষণ করে। ফলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ হয় বলিয়া উৎপাদক ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ভোগকারী কি প্রকারের, কি মানবিশিষ্ট দ্রব্য পাইতে চাহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়া উৎপাদক ভোগকারীর চাহিদা অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ভোগকারীর চাহিদা সম্পর্কে যদি সঠিকভাবে অনুমান করিতে পারা যায় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সহজ হয়।

(৪) এই প্রকার দোকানসমূহ সর্বদাই নগদ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে। ধারে বিক্রয় হইলে কিছু পরিমাণে অনাদায়ী পাওনা (Bad Debts) হইবার সম্ভাবনা থাকে। নগদ বিক্রয় হয় বলিয়া অনাদায়ী পাওনা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং উৎপাদনকারীকে অনাদায়ী পাওনা বাবদ লোকসান বহন করিতে হয় না।

(৫) নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবার ফলে উৎপাদকের অনর্থক মূলধন আবদ্ধ (Blockade of Capital) রাখিতে হয় না। অধিক পুঁজিরও প্রয়োজন হয় না।

(৬) বহু-শাখা বিপণির মাধ্যমে বিক্রয় অধিক হয় বলিয়া উৎপাদক বহুল-উৎপাদন প্রথায় উৎপাদন করে। ফলে উৎপাদনেও ব্যয়-সংকোচ হয়। আবার, বিক্রয়ের পরিমাণ

বাড়ে বলিয়া বিক্রয়েও ব্যয়-সংকোচ হয়। সুতরাং উৎপাদক উৎপাদন ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয়-সংকোচের সুফল পায়। ইহাতে দ্রব্যের মূল্যও কম হয়।

(৭) উৎপাদনকারী উৎপাদিত পণ্য একই গুদামে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথকভাবে গুদামঘরের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রীয় গুদাম হইতে দোকানের চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

(৮) ইহাতে কোনও দোকানে পণ্যের ঘাটতি হইলে নিকটবর্তী অন্য কোনও দোকান হইতে সত্বর পণ্য পাঠান যায়। পণ্যের ঘাটতি আছে বলিয়া ক্রেতার ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(৯) উৎপাদক ও বিক্রেতা একই বলিয়া মূল দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য (Bye-product) উৎপাদনও সহজ হয়। তাহার ফলে একদিকে যেমন কাঁচামালের অপচয় বন্ধ হয়, অন্যদিকে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া উৎপাদক আয় বৃদ্ধি করিতে পারে।

বহু-শাখা বিপণির অসুবিধা (Disadvantages of Multiple Shops) ঃ

বহু-শাখা বিপণির যথেষ্ট সুবিধা থাকিলেও ইহার কিছু অসুবিধাও আছে। উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ের ক্ষেত্রেই সেই অসুবিধাসমূহ দেখা দেয়।

উৎপাদকের দিক হইতে অসুবিধা (Disadvantages from the viewpoint of the Producer) ঃ

(১) এই প্রকার ব্যবসায়ে বহুল-উৎপাদন নীতি গ্রহণ করিতে হয়। একই সঙ্গে বহু দোকান খুলিতে হয়। ফলে ব্যবসায়ে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। সকল ব্যবসায়ের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে কারবার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের পরিমাণ বজায় রাখিতে পারে না। উৎপাদন ব্যাহত হইলে উৎপাদকের সুনাম নষ্ট হয়।

(২) বহু-শাখা বিপণির প্রতিটি দোকানে সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা বজায় রাখা এক বিরাট সমস্যা। একদিকে বহুল উৎপাদনে প্রচুর শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়, অপরদিকে বহু-সংখ্যক দোকানের জন্য প্রচুর-সংখ্যক কর্মচারীও নিয়োগ করিতে হয়। মালিকের পক্ষে বহু শ্রমিক ও কর্মচারীর কাজের উপর লক্ষ্য রাখা খুবই কষ্টকর। ফলে বহু ক্ষেত্রে কর্মচারী ও শ্রমিকদের কাজে শৈথিল্য দেখা দেয়। এই প্রকার ব্যবসায়ে সংগঠন কেন্দ্রীভূত থাকে। সুতরাং দক্ষ সংগঠনের অভাবে অনেক সময়েই প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৩) এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে এবং নগরীতে দোকান খোলা হয়। বড় বড় শহরে বড় বড় রাস্তার উপর দোকান খুলিবার জন্য স্থান সংগ্রহ করা যথেষ্ট কষ্টকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ। শহরাঞ্চলে বড় বড় রাস্তার উপর দোকানঘরগুলির জন্য প্রচুর ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু সকল দোকানে মুনাফা নাও হইতে পারে।

(৪) কেবল অধিক ভাড়া বাবদই যে ব্যয়বাহুল্য ঘটে, তাহা নহে। এই সকল দোকানের সজ্জা-পারিপাট্যের জন্যও ব্যয় খুব বেশী হয়। সজ্জা-পারিপাট্য দ্বারাই ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিতে হয়।

(৫) এই সকল ব্যবসা বহুল-উৎপাদন প্রথায় উৎপাদন করে বলিয়া উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ হয়। তথাপি বৃহদায়তনের যে অসুবিধা আছে তাহাও এই ব্যবসা ভোগ করিয়া থাকে। ক্রেতার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনে অনেক সময়েই উৎপাদককে নূতন উৎপাদন-নীতি গ্রহণ করিতে হয়। বৃহদায়তন উৎপাদন বলিয়া ক্রেতার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে অনেক ক্ষেত্রে বেগ পাইতে হয়।

ক্রেতার পক্ষে অসুবিধা (Disadvantages from the viewpoint of Buyers) ঃ

এই প্রকার ব্যবসায়ে উৎপাদকের পক্ষে যেমন কিছু কিছু অসুবিধা আছে, ক্রেতার পক্ষেও সেইরূপ কিছু কিছু অসুবিধা দেখা যায়। যেমন—

(১) এই প্রকার ব্যবসায়ে উৎপাদিত দ্রব্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়। উৎপাদনের রকমফের খুবই কম। কাজে কাজেই এই সকল দোকানে মাত্র কয়েক রকমের দ্রব্য পাওয়া যায়। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা এই সকল দোকান হইতে পাওয়া যায় না।

(২) একই প্রকারের দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে ভোগকারীর মনে বিরক্তির সৃষ্টি হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভোগ করিতে চাহে। বৈচিত্র্যহীনতার অভাবে ভোগকারী দ্রব্য ক্রয় হইতে বিরত থাকিতে পারে।

বিভাগীয় বিপণি ও বহু-শাখা বিপণির তুলনামূলক আলোচনা

(Comparison of Departmental Stores with Multiple Shops)

বিভাগীয় বিপণি	বহু-শাখা বিপণি
(১) বিভাগীয় বিপণি একটি মধ্যবর্তী ব্যবসা।	(১) বহু-শাখা বিপণিতে উৎপাদক নিজেরাই বিক্রেতা। ইহারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে কার্য করে না।
(২) ইহা বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া একই দোকানে বিক্রয় করে।	(২) ইহারা মাত্র নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে। অপর উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই দ্রব্য বিক্রয় করে না।
(৩) ইহা কতকগুলি খুচরা দোকানের সমষ্টি।	(৩) ইহাতে প্রতিটি দোকানই পৃথক।

বিভাগীয় বিপণি	বহু-শাখা বিপণি
(৪) ইহা নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে।	(৪) ইহারা মাত্র এক জাতীয় পণ্যই বিক্রয় করিতে পারে।
(৫) এই প্রকার দোকান সাধারণতঃ শহরের কেন্দ্রস্থলেই স্থাপিত হয়। ইহা শহরের নানা অংশের ক্রেতাকে কেন্দ্রস্থলে আকৃষ্ট করে।	(৫) একই প্রকার দোকান শহরের নানা এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা যে স্থানে স্থাপিত হয় তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রেতাদেরই আকৃষ্ট করে।
(৬) ইহা নিজেই মধ্যবর্তী ব্যবসা করে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের মাধ্যমে দ্রব্য ক্রয় করে। সুতরাং ইহা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের বিলোপ চাহে না।	(৬) ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটাইয়া ভোগকারীদের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা।
(৭) ইহাতে নানা স্থান হইতে বিভিন্ন উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্য এক স্থানে আনা হয় এবং সেখান হইতে নানাজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। সুতরাং ইহাতে উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত (Decentralised) হয়, কিন্তু বিক্রয় (বণ্টন) কেন্দ্রীভূত (Centralised) থাকে।	(৭) ইহাতে দ্রব্য উৎপাদন হয় একটি জায়গায় কিন্তু দ্রব্য বিক্রয় হয় বহু দোকানের মাধ্যমে। সুতরাং ইহাতে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত (Centralised) হয় এবং বণ্টন বিকেন্দ্রীভূত (Decentralised) হয়।

বিশেষ ধরনের খুচরা ব্যবসা (Specialised Retailing):

বিপণি-শৃঙ্খল অথবা চেন্ স্টোর্স (Chain Stores): চেন্ স্টোর্সও একপ্রকার খুচরা ব্যবসা। একই মালিকের একাধিক শাখা দোকান থাকে। এই সকল দোকান হইতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার দোকানের মালিক নিজে দ্রব্য উৎপাদন করে না। বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই দ্রব্যসমূহ এক জায়গা হইতে বিক্রয় করা হয়। এই প্রকার খুচরা ব্যবসাকে চেন্ স্টোর্স বলা হয়। কলিকাতা শহরে ও ভারতের অন্যান্য অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, এ. টস এণ্ড সন্স-এর অনেকগুলি চায়ের দোকান রহিয়াছে। এ. টস এণ্ড সন্স বিভিন্ন চা উৎপাদকের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার চা ক্রয় করে এবং তাহা বিভিন্ন দোকান মারফত বিক্রয় করে। এ. টস কেবল চা-ই ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু এমনও দোকান হইতে পারে, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চেন্ স্টোর্স বিশেষভাবে দেখা যায়। ভারতেও সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু চেন্ স্টোর্স প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চেন্ স্টোর্স ও বহু-শাখা বিপণির পার্থক্য (Distinction between Chain Stores and Multiple Shops):

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চেন্ স্টোর্স ও বহু-শাখা বিপণি একই জাতীয় ব্যবসা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইটি দুই জাতীয় ব্যবসা। চেন্ স্টোর্সের মালিক কখনও নিজে দ্রব্য উৎপাদন করে না। ইহারা উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া

ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। পাইকার ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ সাধন করাই ইহাদের কার্য। ইহারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে কার্য করে। কিন্তু বহু-শাখা বিপণির মালিক উৎপাদন ও বিক্রয় উভয় কার্যই করে।

চেন্ স্টোর্স ও বিভাগীয় বিপণির পার্থক্য (Distinction between Chain Stores and Departmental Stores) ঃ

চেন্ স্টোর্সকে আবার অনেকটা বিভাগীয় বিপণির মতই মনে হয়। কারণ বিভাগীয় বিপণির মত ইহারাও বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া একটি জায়গা হইতে তাহা বিক্রয় করে। কিন্তু বিভাগীয় বিপণিতে যে নানা বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, চেন স্টোর্সে সেইরকম বিভাগ থাকে না। বিভাগীয় বিপণিতে এক-একটি বিভাগই এক-একটি দোকান। কিন্তু চেন্ স্টোর্সের বেলায় স্টোর্সটিই একটি দোকান। বিভাগীয় বিপণি বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসা, কিন্তু চেন্ স্টোর্স ক্ষুদ্রায়তন খুচরা ব্যবসা। অবশ্য বিভাগীয় বিপণির মতই চেন্ স্টোর্সে ক্রয় বিকেন্দ্রীভূত (Decentralised), কিন্তু বিক্রয় কেন্দ্রীভূত (Centralised)।

বিপণি-শৃঙ্খল বা চেন্ স্টোর্সের সহিত বিভাগীয় বিপণি ও বহু-শাখা বিপণির তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative Study of Chain Stores with Departmental Stores and Multiple Shops)

বিপণি-শৃঙ্খল বা চেন্ স্টোর্স	বহু-শাখা বিপণি	বিভাগীয় বিপণি
১। এই প্রকার দোকানে নানা প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হয়।	১। এই প্রকার দোকানে এক জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়।	১। এই প্রকার দোকানে নানা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়।
২। ইহা ছোট-বড বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত হয়।	২। ইহারা অনেক স্থানেই অবস্থিত হয়।	২। ইহা কেবল বড শহরের জনবহুল স্থানেই অবস্থিত হয়।
৩। এখানে নগদ ও ধারে ক্রয়-বিক্রয় হয়।	৩। এখানে কেবল নগদে বিক্রয় হয়।	৩। এখানে নগদ ও ধারে ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪। ইহাতে একটি দ্রব্যের লাভের দ্বারা অন্য দ্রব্যের লোকসান পূরণ করা হয়।	৪। এখানে এক জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় হয় বলিয়া লভ্যাংশ ক্ষতি-পূরণের জন্য ব্যয়িত হয় না।	৪। ইহাতে অনেক বিভাগ থাকায় কোন বিভাগের ক্ষতি লাভজনক বিভাগের মুনাফা হইতে পূরণ করা হয়।
৫। এই প্রকার ব্যবসায়ে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী থাকে	৫। ইহাতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী না থাকায়	৫। এই প্রকার ব্যবসায়ে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী থাকে

বিপণি-শৃঙ্খল বা চেন্ স্টোর্স	বহু-শাখা বিপণি	বিভাগীয় বিপণি
বলিয়া ভোগকারীদের **অধিক মূল্যে** পণ্য ক্রয় করিতে হয়।	**পণ্যের বিক্রয়মূল্য কম হয়।**	বলিয়া **পণ্যমূল্য** অধিক হয়।
৬। ইহা অনেক সময় সম্ভোগকারীর **গৃহেও পণ্য পৌঁছাইয়া দেয়।**	৬। ইহাতে পণ্য ক্রেতার **গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা নাই।**	৬। ইহাতে পণ্যাদি ক্রেতার **গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থাও থাকে।**
৭। বিভিন্ন দোকান একই মালিকানাধীন হওয়ায় একটি বিজ্ঞাপনই সকল দোকানের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। ফলে **বিজ্ঞাপন-ব্যয় হ্রাস পায়।**	৭। একই মালিকানা থাকায় বিভিন্ন দোকানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন সকল দোকানের বিজ্ঞাপনের কাজ করে এবং **বিজ্ঞাপন-ব্যয় কম পড়ে।**	৭। একটি বিভাগ অপর একটি বিভাগের প্রচারকার্যে সহায়তা করিতে পারে ও **বিজ্ঞাপনের কিছুটা সুবিধা পায়।**
৮। ইহাতে **মূলধনের প্রয়োজন** অপেক্ষাকৃত কম, কারণ ইহা অল্প অল্প দ্রব্য মজুত করিয়া বিক্রয় করে।	৮। পণ্যের মজুত অধিক পরিমাণে রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় মজুত-ভাণ্ডার হইতে পণ্য আনা যায়। সুতরাং **মূলধন কম লাগে।**	৮। বিভিন্ন জাতীয় পণ্য বেশ কিছু পরিমাণ মজুত রাখিতে হয় বলিয়া ইহাতে **মূলধনের প্রয়োজন বেশী।**
৯। ইহাতে **বিভিন্ন কেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে** বিক্রয় হয়।	৯। ইহাতে **একই কেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন কেন্দ্রে** বিক্রয় হয়।	৯। ইহাতে **বিভিন্ন কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্য একই কেন্দ্রে** বিক্রয় হয়।
১০। ইহাতে **বিশেষী-করণের সুবিধা নাই।**	১০। উৎপাদন বৃহদাকারে হয় বলিয়া **বিশেষীকরণের সুবিধা পাওয়া যায়।**	১০। বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিক্রেতা **বিশেষী-করণের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না।**
১১। বিভিন্ন **স্থানে দোকান খুলিতে হয়**	১১। বৃহদাকার উৎ-পাদন ও **নানা স্থানে**	১১। **একটি দোকানে নানা** জাতীয় পণ্য বিক্রয় **হয়**

বিপণি-শৃঙ্খল বা চেন্ স্টোর্স	বহু-শাখা বিপণি	বিভাগীয় বিপণি
বলিয়া ইহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয় (Overhead Expenses) বেশী পড়ে।	দোকান থাকায় আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।	বলিয়া আনুষঙ্গিক ব্যয় কম।
১২। এই প্রকার ব্যবসায়ে অনেক ক্ষেত্রে লাভজনক নহে এরূপ দ্রব্যও রাখিতে হয়।	১২। কোন বিপণি অলাভজনক হইলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।	১২। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে অলাভজনক বিভাগ রাখিতে হয়।
১৩। ইহা পার্শ্বিক জোটের (Lateral Combination) রূপ গ্রহণ করে।	১৩। ইহা পূর্বাপর জোটের (Vertical Combination) রূপ গ্রহণ করে।	১৩। ইহা পার্শ্বিক জোটের (Lateral Combination) রূপ গ্রহণ করে।

কেরায়া বা ভাড়া ক্রয় (Hire Purchase) : বিলম্বিত মূল্যপ্রদান পদ্ধতির মতই ভাড়া ক্রয় পদ্ধতিতে কিস্তি অনুসারে মূল্য পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুসারে যতদিন দ্রব্যের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হয় ততদিন ইহাকে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না। যতদিন ক্রয়মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয় ততদিন ক্রেতা দ্রব্যটি ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়, কিন্তু সে দ্রব্যের মালিকানাস্বত্ব দাবী করিতে পারে না। দ্রব্যটির মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে দ্রব্যটি অন্যের নিকট বিক্রয় করিতেও পারে না।

এই পদ্ধতিতে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হইলেই ক্রেতা দ্রব্যটি লইতে পারে। পরে চুক্তি অনুসারে মাসিক কিস্তি প্রদান করিয়া থাকে। কোনও কিস্তি না দিলে বিক্রেতা দ্রব্যটি ফেরত লইতে পারে। কিন্তু দ্রব্যটি ফেরত লইয়া গেলে বিক্রেতাকে কিস্তি বাবদ যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে উহা ফেরত দেওয়া হয় না। সেই অর্থকে দ্রব্যটির ভাড়া বলিয়া গণ্য করা হয়। সকল কিস্তি পরিশোধ করা হইলে তবেই ক্রেতা দ্রব্যটির মালিকানাস্বত্ব পায় এবং অপরের নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারে।

কিস্তিবন্দী ক্রয় (Instalment Purchase) : এইরূপ ক্রয়-চুক্তিতে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য একসঙ্গে পরিশোধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় এবং প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের মালিকানা বা স্বত্ব বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়।

কেরায়া বা ভাড়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের পার্থক্য (Distinction between Hire Purchase and Instalment Purchase) :

কেরায়া বা ভাড়া ক্রয়	কিস্তিবন্দী ক্রয়
১। ইহা ভাড়াচুক্তি—প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি নহে।	১। ইহা ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ চুক্তি।
২। ইহাতে কিস্তির মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কিস্তির টাকা ভাড়া (Hire Charge) বলিয়া গণ্য করা হয়।	২। ইহাতে সকল কিস্তির অর্থই পণ্যের মূল্য বলিয়া গণ্য করা হয়।
৩। ইহাতে পণ্য ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিতে হয়।	৩। ইহাতে পণ্যমূল্যের উপর সুদ দিতে হয়।
৪। ইহাতে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিবার পরেই পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় বটে, কিন্তু শেষ কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালিকানাস্বত্ব ক্রেতার উপর বর্তায় না।	৪। ইহাতে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যটি এবং মালিকানাস্বত্ব উভয়ই ক্রেতার নিকট চলিয়া যায়।
৫। কোন কিস্তি খেলাপ (Default) হইলে ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা দ্রব্যটি ফেরত লইবার জন্য আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারে এবং দ্রব্যটি ফেরত লইতে পারে। ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছে উহা ফেরত পায় না। উহা ভাড়া হিসাবে গণ্য করা হয়।	৫। কোন কিস্তি খেলাপ হইলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ফেরত লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সে কিস্তির অর্থ আদায়ের জন্য আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারে।
৬। ইহাতে দ্রব্যটি ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে না, অথবা কাহাকেও বিক্রয় করা বা ব্যবহারের জন্য ধার দেওয়া চলে না।	৬। ক্রীত দ্রব্য ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে। সমস্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের পূর্বেই ক্রেতা ইহা বিক্রয় করিয়া দিতে পারে, অথবা দান করিয়া দিতে পারে, কিংবা অপরকে ব্যবহারের জন্য দিতে পারে।
৭। ইহাতে ক্রেতাকে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়, কারণ মূল্য পরিশোধ না করিতে পারিলে তাহার নিকট হইতে দ্রব্যটি চলিয়া যায়।	৭। ইহাতে ক্রেতাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় না।

কেরায়া বা ভাড়া ক্রয়	কিস্তিবন্দী ক্রয়
৮। এইরূপ চুক্তি বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক। কারণ ইহাতে মূল্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক ; কিস্তি খেলাপ হইলে বিক্রেতাই লাভবান হয়। ইহাতে মূল্য প্রাপ্তির ঝামেলা কম।	৮। এইরূপ চুক্তি ক্রেতার নিকট লাভজনক। কারণ ইহাতে কিস্তি খেলাপ হইলে দ্রব্যটি ফেরত দিবার প্রশ্ন উঠে না।

ডাকযোগে কারবার (Mail Order Business) : কোন কোন বিক্রেতা ডাক মারফত ক্রেতার নিকট দ্রব্য প্রেরণ করে। ইহা খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পড়ে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ হয় না। চিঠিপত্রের মাধ্যমে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং ডাকযোগে দ্রব্য প্রেরিত হয়।

বৈশিষ্ট্য (Features) : এইরূপ ব্যবসায়ে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায় :

(১) দ্রব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া সংবাদপত্রে এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের সহিত ক্রেতার যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞাপনে বিক্রেতার ঠিকানাও দেওয়া হয়।

(২) ক্রেতা ডাক মারফত বিক্রেতার নিকট ফরমাশ (Order) পেশ করে।

(৩) বিক্রেতা ডাকঘর মারফত ভি পি যোগে (Value Payable Post or VPP) ক্রেতার নিকট দ্রব্য প্রেরণ করে।

(৪) ভি পি উল্লেখিত মূল্য ডাক-কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিলে ক্রেতা দ্রব্যটি গ্রহণ করিতে পারে।

(৫) সমস্ত কারবারটি ডাক-মারফত সম্পাদিত হয়।

সুবিধা (Advantages) : ইহার সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহাতে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র খুলিবার প্রয়োজন হয় না এবং সেইজন্য বিক্রয়ের খরচ অনেক কম হয়।

(২) বিক্রেতা নিজে উক্ত দ্রব্যের উৎপাদক হইলে সরাসরি ক্রেতার নিকট দ্রব্যটি প্রেরণ করিতে পারে। ইহাতে মধ্যস্থ কারবারীর প্রয়োজন হয় না।

(৩) ক্রেতা গৃহে বসিয়াই দ্রব্যটি ক্রয় করিতে এবং পণ্যের সরবরাহ পাইতে পারে। ইহাতে তাহার শ্রম ও সময়ের লাঘব হয়।

(৪) ইহাতে বিক্রেতার বাজারের পরিধি বিস্তৃত হয়। শহর ও মফঃস্বলে ডাকযোগে দ্রব্য প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৫) ডাক-কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যপ্রদান না করিলে দ্রব্যটি হস্তান্তর করা হয় না বলিয়া বিক্রেতার দিক হইতে মূল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে।

অসুবিধা (Disadvantages) : এই কারবারের অসুবিধাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(১) ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

(২) ক্রেতার পক্ষে দ্রব্যটি দেখিয়া ও পছন্দ করিয়া ক্রয় করা চলে না। ইহাতে ক্রেতা অনেক ক্ষেত্রে মনের মত দ্রব্য পায় না, অথবা ঠকিয়া যায়।

(৩) ইহাতে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর ব্যয় হয়।

(৪) ক্রেতার রুচি ও চাহিদা পরিবর্তিত হইলে বিক্রেতা উহা জানিতে পারে না। ফলে চাহিদার পরিবর্তনে বিক্রয় কমিয়া যায় ও ব্যবসায়ে মন্দা আসে।

ফেরিওয়ালা (Hawkers or Peddlers) ঃ ইহারা এক ধরনের খুচরা ব্যবসায়ী। ইহাদের ব্যবসায়ের কোন নির্দিষ্ট স্থান বা দোকান নাই। রাস্তার ধারে ফুটপাতে, স্টেশনের পাশে বা প্লাটফর্মে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া অথবা বাড়ী বাড়ী যাইয়া ইহারা পণ্য বিক্রয় করে। ইহারা বিভিন্ন পাইকারের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের ব্যবসায়ের কোন স্থায়ী খরচ (Fixed Cost) না থাকায় ইহারা সুলভে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতাগণ বাড়ী বসিয়া পণ্য ক্রয় করিবার সুযোগ পায়।

ক্রেতা-সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Society) ঃ উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়িগণ মুনাফা অর্জন করে। ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতাকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বেশী মূল্য দিতে হয়। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সাধারণ ক্রেতাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। এই প্রকার সমবায় সমিতি সাধারণতঃ উৎপাদকের নিকট হইতে সরাসরি অথবা পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট উহা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে।

নিবন্ধিত হইলে এইরূপ সমিতি নানাবিধ সুবিধা ভোগ করে। সদস্যগণের দায় সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়। প্রতি সদস্যের একটিমাত্র ভোটাধিকার থাকে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইহা গাড়িয়া উঠে। ইহা নগদে ও ধারে দ্রব্য বিক্রয় করে। সামান্য মুনাফায় এইরূপ ব্যবসা চলে। শতকরা ৯ ভাগের অধিক লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়া যাইবে না। বাকী মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে (Reserve Fund) রাখিতে হইবে।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) ইহাতে মুনাফাবাজী ও কালোবাজারী রোধ হয় ;

(২) ক্রেতাগণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারে ;

(৩) পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে ;

(৪) অত্যাবশ্যক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) অনেক সময় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত থাকে না ;

(২) মূলধনের অভাবে সকল প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না ;

(৩) প্রয়োজনের তুলনায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম ;
(৪) ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয় ;
(৫) প্রতিটি সদস্যের সহযোগিতার মনোভাব না থাকিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

অধিবিপণি (Supermarket) : ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের অতিবৃহৎ আকারের বিভাগীয় বিপণির ন্যায় খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের বিক্রয়-কর্মচারী থাকে না। এক-মালিকী, অংশীদারী অথবা যৌথ-মূলধনী ব্যবসা হিসাবে অথবা সমবায়ের ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদায়তন স্থানে স্থায়ী পণ্য হইতে আরম্ভ করিয়া জামা, কাপড়, মাছ, মাংস, ডিম, সব্জী, দুধ, ঘি, মাখন, প্রসাধন দ্রব্য, কাগজ, বই, খাতা, চাল, ডাল, তৈল ইত্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য বিভিন্ন কাউন্টারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়-কর্মচারী না থাকাই এইরূপ বিপণির বৈশিষ্ট্য ; ফলে পরিচালন-ব্যয় হ্রাস পায়। ক্রেতা পছন্দমত দ্রব্য নিজেই গ্রহণ করে ও ক্যাশ কাউন্টারে মূল্য দিয়া দ্রব্য লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসে।

আমেরিকায় বৃহৎ আকারে ও বহু পণ্যবিশিষ্ট হইয়া এইরূপ বিপণি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে যথার্থ অর্থে অধিবিপণি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ প্রতিটি অধিবিপণিতে বিক্রয়-কর্মচারী আছে। আমাদের দেশে সমবায়ের ভিত্তিতে ইহা গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার "সমবায়িকা" ও দিল্লীর "সুপার বাজার" ইহার দৃষ্টান্ত।

সুবিধা (**Advantages**) :

(১) ক্রেতা একই স্থানে তাহার প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার দ্রব্য অল্প সময়ের মধ্যে ক্রয় করিতে পারে ;
(২) বিক্রয়-কর্মচারী না থাকিলে পরিচালন-ব্যয় হ্রাস পায় ;
(৩) এইরূপ বিপণিতে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় হয় ;
(৪) এইরূপ বিপণিতে পণ্যের প্রচুর মজুত থাকে, ফলে পণ্য বাছাই করিয়া ক্রয় করা যায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) :

(১) ইহাতে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন ;
(২) এইরূপ বিপণির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম ;
(৩) দ্রব্যের সরবরাহ সর্বদা অব্যাহত থাকে না ;
(৪) এক বিভাগের লোকসান অন্য বিভাগকে বহন করিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের অর্থ ও ভূমিকা (Meaning and Introduction of Advertisement) :

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারের যুগ (Age of Advertisement and Publicity)। একটি প্রবাদ আছে যে, একটি মিথ্যা ১০০ বার পুনরাবৃত্তি কর,

উহা সত্য হইবে (Repeat a lie hundred times, it will become a truth)। প্রবাদবাক্যটির অর্থ এই যে, মিথ্যাও যদি বার বার সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে মিথ্যাও লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি স্থায়িভাবে কোন বিষয় মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করাইতে হয় তাহা হইলে উহা বার বার প্রচার করা আবশ্যক। প্রচার অর্থে 'বিজ্ঞাপন' (Advertisement) কথাটি প্রয়োগ করা হয়। পণ্যের সহিত ক্রেতার পরিচয় সাধনের লিখিত মাধ্যমকে **বিজ্ঞাপন** বলে। বিজ্ঞাপন পণ্যসামগ্রীর নূতন পরিবর্ধিত চাহিদা সৃষ্টিকারক (Creator of new increased demand)। বিজ্ঞাপন নৈর্ব্যক্তিক বিক্রয়বিদ্যা (Impersonal salesmanship), কারণ ইহা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিক্রয়-কার্যকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য অবিরত পরিবর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করে। পরিবর্ধিত চাহিদা সৃষ্টি করিবার জন্য চারটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন—

(১) **সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা (Drawing attention)**;

(২) **সম্ভাব্য ক্রেতার আগ্রহ বৃদ্ধি করা (Stimulating interest)**;

(৩) **ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা (Arousing desire)**;

(৪) **ক্রেতাকে পণ্যক্রয়ে প্রবৃত্ত করা (Securing action)**।

ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ, আগ্রহ বৃদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া বিজ্ঞাপন চাহিদা সৃষ্টি করে। শেষোক্তটি বিক্রয়-বিদ্যার (Salesmanship) কার্য।

বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন যে, সম্ভোগকারীর চাহিদা অনুসারে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় না। উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সেই দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ, উপকারিতা, ব্যবহারপ্রণালী ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া মানুষের মনে সেই দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা হয়। বহুল-উৎপাদন প্রথায় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। কারণ উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে সর্বদা সরাসরি যোগসূত্র থাকে না। উৎপাদনকারী উৎপাদন করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভোগকারীর সহিত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে।

'বিজ্ঞাপন' কথাটি পূর্বে প্রচার এবং চাহিদা সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হইত না, সাধারণকে সতর্ক (Warning) করিবার জন্য প্রয়োগ হইত। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বর্তমানে সাধারণকে কোনও দ্রব্যের দিকে আকৃষ্ট করা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও সতর্কতামূলক বিজ্ঞাপন বা প্রচার যে নাই, তাহা নহে। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে লিখিত থাকে 'নকল হইতে সাবধান' (Beware of imitation)। বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য 'আকর্ষণ করা'।

বিজ্ঞাপন যে কেবল উৎপাদক বা বিক্রেতাই করে, তাহা নহে। সম্ভোগকারীরাও বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্য গ্রহণ করে। 'কর্মখালি' (Situation vacant) বা 'কর্মপ্রার্থী' (Situation wanted) উভয়ই অভাবের প্রচার। কর্মখালির বিজ্ঞাপন দ্বারা

চাকুরী-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্তাব (Offer) গ্রহণ করা হয়, আর কর্মপ্রার্থীর বিজ্ঞাপনদ্বারা কর্মপ্রার্থীর নিজের অভাব প্রচার করিয়া তাহার সেবা (Services) গ্রহণ করিবার মত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করা হয়। এইরূপভাবে দেখা যায়, 'বাড়ি ভাড়া চাই' (Wanted House), 'বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়' (House to let)—সবই বিজ্ঞাপন (Advertisement)। এই সকল বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ব্যবসা ক্ষেত্রে খুব অধিক নহে। কারণ, ইহা দ্বারা দ্রব্য উৎপাদনে বা বণ্টনে সাহায্য খুব কমই হয়। কিন্তু এমন চাহিদা বা অভাবের বিজ্ঞাপন আছে, যাহাতে অর্থনৈতিক কার্যের প্রসার হয়। যেমন,—কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান হইতে কলিকাতা নগরীর সকল বস্তি উচ্ছেদ করিয়া বাসোপযোগী ইমারত তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আবশ্যকীয় ইট, বালি, চুন, সুরকী ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ফলে, ঐ সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল। যোগানদারগণও যোগান দিবার জন্য আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করিতে শুরু করিল। ফলে, অর্থনৈতিক কার্যের প্রসার হইতে লাগিল।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Advertisement and Publicity) ঃ

বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন—

(১) বিজ্ঞাপনের দ্বারা কোন কিছুর অস্তিত্ব জানান হয়, প্রচারকার্যের ফলে নানা প্রকার আদর্শ, নীতি ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায়।

(২) বিজ্ঞাপন দ্বারা দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু প্রচারকার্য দ্বারা কারবারী, রাজনৈতিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্যের প্রচার করা হয়। বক্তৃতা করিয়া দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা প্রচারকার্য ; উহা বিজ্ঞাপন নহে। কিন্তু কোনও দ্রব্যের বহুল বিক্রয়ের জন্য প্রচারকার্যকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। সুতরাং পরিধিতে প্রচারকার্য বিজ্ঞাপন হইতে অনেক বড়।

(৩) প্রচারকার্য সর্বদা মুনাফা আয়ের জন্য নহে। ইহা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেও কার্য করে। যেমন, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক প্রচারিত "কলেরার টিকা নিন।" কিন্তু বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।

(৪) প্রচারের পরিধি বৃহত্তর, অর্থাৎ সকল স্তরের ব্যক্তির জন্যই প্রচার হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের পরিধি সংকুচিত, কেবল সম্ভোগকারিগণের জন্যই ইহার ব্যবস্থা।

(৫) প্রচার মৌখিক ও লিখিত উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রিত বা লিখিত মাধ্যমের সাহায্যেই সাধারণতঃ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

(৬) প্রচার বিজ্ঞাপনের অংশ নহে ; কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারের অংশ-বিশেষ।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য (Objects of Advertisement) ঃ

(১) বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করা (Creating Demand) ঃ কোনও দ্রব্য সবেমাত্র উৎপাদিত হইয়াছে ; উহার উপকারিতা এবং ব্যবহার জনসাধারণ জানে না।

এক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় তাহা হইলে জনসাধারণ সেই দ্রব্যের অস্তিত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে না। সুতরাং, উৎপাদক যে উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিয়াছে সেই উদ্দেশ্য মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। দ্রব্য যদি বাজারে সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে প্রচার ব্যতীত জনসাধারণ কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিবে? জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে, এই দ্রব্যটি তাহার কার্যে লাগিতে পারে—অর্থাৎ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে, তখনই তাহার সেই দ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার আগ্রহ হয়। কাজে কাজেই উৎপাদক বা বিক্রেতার পক্ষে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দেওয়া। সম্ভাব্য ক্রেতাকে ক্রয়ে উৎসাহিত করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য।

(২) **চাহিদা বৃদ্ধি করা** (Increasing Demand)**:** অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিযোগিতাপরায়ণ (Competitive)। উৎপাদক এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। কারণ, একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে একাধিক দ্রব্য যখন উৎপাদিত হয় তখন সেই দ্রব্যসমূহের বিজ্ঞাপন দেওয়া না হইলে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক কেহই বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। মনে করা যাক্, কেহ নিয়মিত হরলিক্স্ ব্যবহার করে, কিন্তু বাজারে হরলিক্সের অনুরূপ গুণসম্পন্ন ওভালটিনও বাহির হইয়াছে। এক্ষেত্রে হরলিক্সের তুলনায় ওভালটিন ভাল, কিংবা ওভালটিনের তুলনায় হরলিক্স্ ভাল তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? উভয় উৎপাদকই প্রতিযোগিতায় অপরের দ্রব্যের তুলনায় নিজের দ্রব্য অধিক বিক্রয় করিতে প্রয়াসী। সুতরাং উভয় পক্ষেরই বিজ্ঞাপনদ্বারা ক্রেতাকে আকর্ষণ করা প্রয়োজন। অবশ্য একথা বলিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞাপনের ফলে কিছু লোক হরলিক্সের সম্ভোগ কমাইল এবং কিছু লোক ওভালটিনের সম্ভোগ বাড়াইল। ফলে হরলিক্স্ হইতে চাহিদা ওভালটিনে অপসারিত হইল। মোটের উপর চাহিদা বাড়িল না। সাময়িকভাবে ইহা সত্য হইলেও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মোট চাহিদা বাড়ান। সুতরাং উভয়েই বিজ্ঞাপন দিতে থাকিবে এবং উভয়েই উভয়ের চাহিদা বাড়াইতে চেষ্টা করিবে।

(৩) **সৃষ্ট চাহিদা বজায় রাখা** (Maintenance of Existing Demand)**:** একবার দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইলেও সেই দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না দিলে চাহিদা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্রব্যের অস্তিত্ব যাহাতে সাধারণে ভুলিয়া না যায় তাহার জন্যই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া 'আমি আছি, আমাকে ভুলিও না' (Forget me not)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধের সময় কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কমিয়া গেলেও উৎপাদক বা বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিত। উদ্দেশ্য এই যে, 'আমি মরি নাই, যে কোন সময়েই আবির্ভূত হইতে পারি'। সাধারণের মধ্যে যদি ঐ দ্রব্যের সুনাম থাকে তাহা হইলে সম্ভোগকারী কিছুদিন ঐ দ্রব্যের ভোগ হইতে বিরত থাকিলেও সে জানে, যে কোন সময়েই দ্রব্যের যোগান পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কোনও দ্রব্যের চাহিদা থাকিলে সেই চাহিদা যাহাতে অন্তর্হিত না হয় তাহার জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

(৪) **সুপ্ত চাহিদা জাগানো** (Arousing Potential Demand) : প্রত্যেক মানুষই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কার্য করে। যদি এমন কোনও একটি পিল (Pill) তৈয়ারী হয় যে, একটি পিল মুখে পুরিয়া দিলেই ২৪ ঘণ্টার জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, সেই রকম একটি দ্রব্যের চাহিদা নাই এমন লোক বিরল। সকলেই মনে করিতে পারে যে, ঐ প্রকার একটি দ্রব্য পাওয়া গেলে রান্নাবান্না, বাজার করিবার ঝামেলা ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য হইতে তাহারা রেহাই পাইবে। সুতরাং ধরিয়া লওয়া গেল যে, এই প্রকার একটি দ্রব্যের সুপ্ত চাহিদা সকলের মনেই আছে। মনে করা যাক্, একজন উৎপাদক এইরূপ একটি পিল তৈয়ারী করিল। যদি উৎপাদক ঐ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না দেয় তাহা হইলে সাধারণের মনে যে সুপ্ত চাহিদা আছে তাহা জাগ্রত করা সম্ভব নহে। সুতরাং সুপ্ত চাহিদা জাগ্রত করাও বিজ্ঞাপনের কার্য।

বিজ্ঞাপনের সুবিধা (Advantages of Advertisement) :

বিজ্ঞাপনের সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **বহুল-বিক্রয়ের মাধ্যম** (Medium for Large-selling) : বিজ্ঞাপনের সাহায্যে পণ্যের চাহিদা পরিবর্ধিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারিত বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায়। বহুল-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

(২) **নূতন দ্রব্যসামগ্রীর প্রচলন** (Introduction of New Commodities) : বিজ্ঞাপন ক্রেতাগণকে নূতন নূতন দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত, আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করে। ফলে দেশে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(৩) **মধ্যস্থ কারবারীদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস** (Less Dependence upon Middlemen) : বিজ্ঞাপনের সাহায্যে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ফলে মধ্যস্থ কারবারীদের উপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে বণ্টন-ব্যবস্থা সহজ হয় এবং ক্রেতাগণ কম মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে।

(৪) **বিক্রয়মূল্য হ্রাস** (Reduction in Selling Price) : বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবার ফলে বৃহদাকার উৎপাদন ও বিক্রয়কার্য সম্ভব হয়। ইহাতে উৎপাদিত দ্রব্যটির উৎপাদনে এবং বণ্টনে ব্যয়-সংকোচ ঘটে। এই ব্যয়-সংকোচের একাংশ ক্রেতাগণ ভোগ করে, অর্থাৎ দ্রব্যটি কম মূল্যে কিনিতে পারে।

(৫) **চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য** (Parity of Demand and Supply) : বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ধারাবাহিক চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য অবিরত উৎপাদনকার্য চালাইতে হয়। ইহাতে দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

(৬) **সমমূল্যে ক্রয়ের সুবিধা** (Opportunity to Purchase at Equal Price) : বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত থাকে বলিয়া ক্রেতাগণ স্থান ও কালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র একটি মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিবার সুবিধা পায়।

(৭) **পণ্যের মান রক্ষা** (Maintenance of Standard) : বিজ্ঞাপিত দ্রব্যটির নির্দিষ্ট মান বজায় রাখিবার জন্য উৎপাদক সচেষ্ট হয়। সাধারণতঃ এইরূপ পণ্যসামগ্রীতে নির্দিষ্ট মানের (Standard) ছাপ প্রযুক্ত থাকে। ইহাতে ক্রেতাগণ দ্রব্যটির মান সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে।

(৮) **জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি** (Increase in Standard of Living) : বিজ্ঞাপনের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, চাহিদা বৃদ্ধিতে বিক্রয় বাড়ে, বিক্রয় বাড়িলে উৎপাদনকার্য বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনকার্য বৃদ্ধি পাইলে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। ইহাতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ক্রেতার নূতন নূতন দ্রব্যক্রয়ের সঙ্গতি জন্মায় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৯) **ক্রয়বিদ্যায় শিক্ষা** (Education in Purchasing) : বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ক্রেতা ধীরে ধীরে ক্রয়বিদ্যায় শিক্ষিত হয় এবং নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রীর বিষয়ে অবগত হয়।

(১০) **আয়ের উৎস** (Source of Income) : বিজ্ঞাপন বাণিজ্যিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি (Advertising Agency) ইত্যাদি সংস্থা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে প্রভূত আয় করে।

(১১) **সঠিক স্থান ও মূল্যের অবগতি** (Knowing the Exact Place and Price) : বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাগণ পণ্যপ্রাপ্তির সঠিক স্থান ও মূল্য সম্বন্ধে পূর্বেই জানিতে পারে।

(১২) **গুণাগুণের সহিত পরিচয়** (Acquaintance with Merits and Efficacies) : বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা পূর্বাহ্নেই বিজ্ঞাপিত দ্রব্যটির গুণ ও কার্যকর ক্ষমতা সম্বন্ধে জানিতে পারে।

(১৩) **সুনাম বৃদ্ধি** (Increase of Goodwill) : বিজ্ঞাপন দ্বারা কারবারী সংস্থাটি ক্রেতাসাধারণের নিকট পরিচিত হয় ও দ্রব্যটি নির্দিষ্ট মানের হইলে ইহার সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(১৪) **গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস** (Decrease in Average Cost of Production) : বিজ্ঞাপনের ফলে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যটির উৎপাদন যদি ক্রমহ্রাসমান ব্যয় বিধি অনুসরণ করে, তবে অধিক চাহিদা হেতু অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হয় এবং অধিক উৎপাদনের ফলে দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে ক্রেতা স্বল্প মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে।

বিজ্ঞাপন কি সঙ্গত ব্যয়? (Does it pay to Advertise?) :

বিজ্ঞাপন কি সঙ্গত ব্যয়? বিজ্ঞাপনের ব্যয় কি অনাবশ্যক, না ইহা দ্বারা কারবারী অধিক লাভবান হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বিজ্ঞাপন কারবারীকে লাভবান

করে, কারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি হয় না, বরং হ্রাস পায়। বিজ্ঞাপন চাহিদা বৃদ্ধি করে। চাহিদার বৃদ্ধি হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে। সুতরাং বিজ্ঞাপন বাবদ প্রতিটি পণ্যের উপর যে ব্যয়ভার পড়ে, পরিবর্ধিত বৃহদাকার উৎপাদনে প্রতিটি পণ্যের উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ ইহা অপেক্ষা আরও বেশী হয়। এই কারণেই বিজ্ঞাপন-ব্যয়কে যথাযথ ও সঙ্গত বলা যায়। নিম্নলিখিত কারণে বিজ্ঞাপন-ব্যয় কারবারের সঙ্গত ব্যয়:

(১) বর্তমানে ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণের ফলে বৃহদাকার উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে বহুল-উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন নূতন চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যম। বিজ্ঞাপনের দ্বারা নূতন চাহিদা সৃষ্টি না হইলে বৃহদাকার উৎপাদন অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইদিক হইতে বিজ্ঞাপন কারবারের অঙ্গ।

(২) বিজ্ঞাপন কারবারী সংস্থাকে প্রগতির পথে লইয়া যায়। বিক্রয়ের ব্যাপকতা ঘটাইয়া ও উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ করিয়া ইহা কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করে।

(৩) বিজ্ঞাপন পণ্যের মান-উন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধনের সহায়ক হিসাবে কাজ করে এবং কারবারের সুনাম বৃদ্ধি করে। ফলে কারবারী সংস্থাটি যখন অন্য কোন নূতন পণ্য বাজারে আনে তখন এই পণ্যের জন্য সহজেই বাজার সৃষ্টি হয়।

(৪) প্রগতিশীল কারবারে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা উৎপাদনে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ।

বিজ্ঞাপনকে কি অনাবশ্যক ব্যয় এবং অপব্যয় বলা যায়? (Is Expenditure on Advertisement Unnecessary and Wasteful ?):

পূর্বের আলোচনা হইতে বিজ্ঞাপন যে অপব্যয় নহে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের কুফলগুলিও এই প্রশ্নের উত্তরে অনুধাবনযোগ্য। এই কুফলসমূহ হইল:

(১) বিজ্ঞাপনের জন্য যদি ব্যবসায়ী অসামঞ্জস্যপূর্ণ অতিরিক্ত ব্যয় করে এবং সেই তুলনায় উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ না ঘটে, তবে ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন-ব্যয় মিটায়।

(২) অনেক ক্ষেত্রে কারবারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা নূতন চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে না, কেবল অপর বিক্রেতার নিকট হইতে চাহিদা ছিনাইয়া লয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-ব্যয় সমাজের দিক হইতে গ্রহণীয় নহে। ইহা সমাজের পক্ষে নিরর্থক ও অপচয়।

(৩) কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন, যেমন, কুরুচিপূর্ণ ছবি ও ভাষার প্রয়োগ সমাজের নৈতিক মান, মূল্যবোধ ও শালীনতাবোধকে বিনষ্ট করে।

(৪) বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক পুনঃপুনঃ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবৃতি ক্রেতা-সাধারণের বিজ্ঞাপনের প্রতি আস্থাবোধ নষ্ট করে।

(৫) মিথ্যা বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতা অনেক সময় প্রলুব্ধ হয় ও নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য কিনিয়া প্রতারিত হয়।

এই সকল কুফল যদিও বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আপাতভাবে লঘু করিয়া দেয়, তথাপি অপব্যবহৃত বিজ্ঞাপনের কুফল ইহার প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করিতে পারে না।

অতিরঞ্জিত ও শঠতাপূর্ণ বিজ্ঞাপন সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল ফলপ্রসূ থাকে না। বিজ্ঞাপনদাতাকে অবশ্যই আব্রাহাম লিঙ্কনের (Abraham Lincoln) বিখ্যাত প্রবাদটি মনে রাখিতে হইবে: একজন লোক কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা করিয়া রাখিতে পারে, সকল লোককে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানাইতে পারে, কিন্তু সকল লোককে সব সময়ের জন্য বোকা করিয়া রাখিতে পারে না" (One can befool some people for all time, all people for sometime but not all people for all time.)।

বিজ্ঞাপনের সাফল্য (Success of Advertisement):

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থ নৈতিক কাঠামো যদি প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থা যদি ঘরোয়া উদ্যোগ (Private Enterprise) হয়, তাহা হইলেই দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন অধিক হয়। এই কারণেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের প্রাধান্য এত অধিক।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থায় যে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। জীবন-বীমা কারবার ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত, তথাপি উহার বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়। কারণ, জীবন-বীমা এমন একটি বস্তু নহে, যাহা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগিবে। জীবন-বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে যাহারা সচেতন তাহারা অবশ্য বিজ্ঞাপন না দিলেও সন্ধান করিয়া লইবে, কিভাবে জীবন-বীমা করা যায়। আবার রেলপথও রাষ্ট্রায়ত্ত, রেলভ্রমণও অপরিহার্য নহে। রেলভ্রমণ বাড়িলে রাষ্ট্রের আয় অধিক হয়। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বৎসরের কোন কোন সময়ে রেল-কর্তৃপক্ষ যাত্রী চলাচল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যাত্রীদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত থাকে তবে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কমিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খাদ্যদ্রব্যের (চাল, আটা ইত্যাদি) বিলি-ব্যবস্থা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত (State Controlled) ছিল। সংভাগ (Rationing)-প্রথার মাধ্যমে বিলির সাম্য-ব্যবস্থা (Equality) বজায় রাখা হইত। তখন কোন চাল বা আটা কারবারীর কোনও বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু চালের বিলি-ব্যবস্থা যখন আবার প্রতিযোগী কারবারীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল অমনি দেখিতে পাওয়া গেল যে, বড় বড় কারবারী বিজ্ঞাপন দিতেছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কারবারে প্রতিযোগিতা থাকিলেই কারবারী টিকিয়া থাকিবার জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা অবলম্বন করে।

বিজ্ঞাপনের ফলে যদি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কার্যকর হয় না। অনেকেই মনে করে যে, বিজ্ঞাপনের জন্য যে ব্যয় করা হয় সেই ব্যয় মুখ্যতঃ সম্ভোগকারীই বহন করে। একথা সর্বৈব মিথ্যা অথবা সর্বতোভাবে সত্য তাহা বলা চলে না। ইহা আংশিক সত্য। তবে যে দ্রব্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি অনুসারে (Law of Increasing Cost) উৎপাদিত হয় সেই দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অ-ফলপ্রসূ হয়। কারণ, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি অনুসারে (Law of Increasing Cost) দ্রব্য উৎপাদনের ফলে সম্ভোগকারীর চাহিদা সত্যই কমিয়া যায়। সুতরাং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সুফল পাওয়া যায় না।

দ্রব্য **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধিতে** (Law of Diminishing Cost) উৎপাদিত হইলে বিজ্ঞাপন-ব্যয় ধরিলেও দ্রব্যের মূল্য বাড়ে না। আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধিতে উৎপাদন হইতে বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের পড়তা কম বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বিক্রয় কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বিজ্ঞাপনের ফলে বিক্রয়মূল্য বাড়ে, ইহা সর্বদা সত্য নহে।

বিজ্ঞাপনের নীতি (Principles of Advertisement) ঃ

বিজ্ঞাপনেব উদ্দেশ্য চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা অর্জন করা। বিজ্ঞাপনের সাফল্য ও কার্যকারিতা কতকগুলি নীতির উপর নির্ভর করে। এই নীতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হইল :

(১) **ক্রেতার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করা**—কৌতূহল সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞাপনের ভাষা, ভাব, রঙ, চিত্র প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিজ্ঞাপনদাতার বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের ভাষা (Literature of Advertisement) ক্রেতার মনে কৌতূহল সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে বুইক গাড়ীর বিজ্ঞাপনদাতার একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা অনুধাবনযোগ্য : "যখন বুইক গাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলে, তখন কেবলমাত্র যে শব্দ শোনা যায় তাহা ঐ গাড়ীর ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ"।

(২) ক্রেতার নিকট পণ্য ক্রয়ের **আবেদন** (Approach) বিজ্ঞাপনে সফলতা আনে। আবেদন কিভাবে উৎসাহ সৃষ্টি করে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল : বুইক গাড়ীর বিজ্ঞাপনদাতা ক্রেতাকে অনুরোধ করে যে, যদি ক্রয়ের পর চলাকালীন সময়ে গাড়ীটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তবে ক্রেতা যেন বিক্রেতা কোম্পানীকে খবর দেন। কোম্পানী বিনা ব্যয়ে উহা সারাইয়া দিবে। একজন ক্রেতা বুইক গাড়ী ক্রয় করিয়া ১০ মাইল চালাইবার পর গাড়ীটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। বিজ্ঞাপন মত সে কোম্পানীকে এই খবর জানায় এবং কোম্পানীর লোক আসিয়া গাড়ীটির বোনেট খুলিয়া দেখে যে, ঐ গাড়ীতে কোন ইঞ্জিন নাই। ক্রেতা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ইঞ্জিন ছাড়াই গাড়ীটি কিভাবে ১০ মাইল চলিল। কোম্পানীর লোক উত্তর দেয় "কোম্পানীর সুনামে"।

(৩) ক্রেতার মনে **আতঙ্ক সৃষ্টি** করিয়াও অনেক সময় বিজ্ঞাপনকে আকৃষ্ট করা হয়।

(৪) ক্রেতার **সম্ভাব্য অসুবিধা** তুলিয়া ধরিয়াও বিজ্ঞাপনে সাফল্য আনা যাইতে পারে। ইহাতে সাধারণতঃ পণ্যের গুণাগুণের কথা বলা হয়। ক্রেতার অসুবিধা পূরণে ইহা কিভাবে সাহায্য করে, বিজ্ঞাপনে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

(৫) ক্রেতার **সৌন্দর্য অনুভূতি** উদ্দীপিত করিয়াও বিজ্ঞাপনে সাফল্য আনা যায়। প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য অনুভূতির উপর জোর দিতে হয়।

(৬) ক্রেতার মনে **হিংসাবোধ ও সুবিধাবোধ** জাগ্রত করা বিজ্ঞাপনের সাফল্যের অন্যতম নীতি।

(৭) বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের ব্যবহারে ক্রেতার **গর্ব, স্বাচ্ছন্দ্য ও আভিজাত্য** বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করা বিজ্ঞাপনে সাফল্যের একটি নীতি।

(৮) সময় সময় **দেশপ্রেম** জাগ্রত করাও বিজ্ঞাপনের সাফল্যের নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন (Selection of the Medium of Advertisement) ঃ

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হইলে উৎপাদক অথবা বিক্রেতা কি প্রকারে বা উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা স্থির করিয়া থাকে। যে উপায় অবলম্বন করিয়া দ্রব্যের অস্তিত্ব, গুণাগুণ, ব্যবহারের উপকারিতা ইত্যাদি সাধারণের গোচরে আনয়ন করা হয়, তাহাকেই **বিজ্ঞাপনের মাধ্যম** বলা হয়।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপনদাতাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। যেমন:

(১) **পণ্যের প্রকৃতি** (Nature of Goods) ঃ পণ্যটি ভোগ্যপণ্য না উৎপাদকীয় পণ্য, তাহার উপর মাধ্যম নির্বাচন নির্ভর করে। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র. পত্রিকা, সাময়িকী, বেতার ইত্যাদি এবং উৎপাদকীয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পত্র-পত্রিকা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণীয়।

(২) **চাহিদার প্রকৃতি** (Nature of Demand) ঃ যে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে সেই দ্রব্যের চাহিদা সার্বজনিক কিংবা বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা স্থির করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(৩) **ক্রেতার প্রকারভেদ** (Types of Buyer) ঃ যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই সম্প্রদায়ের নিকট কোন্ মাধ্যমটি সহজে গ্রহণীয়, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

(৪) **ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও শিক্ষার মান** ('Taste, Habit and Education of Buyer) ঃ ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, শিক্ষা, জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম স্থির করিতে হয়। শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন ক্রেতা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আবার ক্রেতা তেমন শিক্ষিত না হইলে হ্যাণ্ডবিল, সচিত্র বিজ্ঞাপন ইত্যাদি অধিকতর ফলপ্রসূ।

(৫) **বাজারের পরিধি** (Extent of Market) ঃ বাজার স্থানীয় (Local), আঞ্চলিক (Regional), দেশীয় (National) এবং আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। বাজারের পরিধি ছোট হইলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক মাধ্যম—যেমন, স্থানীয় সংবাদপত্র ইত্যাদি এবং ব্যাপক হইলে বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

(৬) **প্রভাবের স্থায়িত্ব** (Stability of Influence) ঃ বিজ্ঞাপনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী না স্বল্পস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন তাহাও বিবেচ্য।

(৭) **প্রচার ক্ষমতা** (Capacity of Circulation) ঃ মাধ্যমটি কতখানি প্রচারক্ষম পূর্বেই তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(৮) **প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম** (Medium used by Competitors) ঃ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কি প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে তাহাও বিচার্য।

(৯) **ব্যয়** (Cost) ঃ বিজ্ঞাপন হইতে যে ফল আশা করা যায় তাহার তুলনায় বিজ্ঞাপনের ব্যয় কম হইবে, না বেশী হইবে তাহার উপরও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা নির্ভর করে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমসমূহ (Media of Advertisement) :

উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থায় (Productior and Distribution) মধ্যবর্তী কারবারীর (Middleman) সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে বিজ্ঞাপনেব জটিলতা ততই অধিক হইতেছে। বর্তমানে এই জটিলতার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন, উপায় নির্বাচন, বিজ্ঞাপন তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইতেছে। বিজ্ঞাপন এযাবৎ কারবারীর নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি ও রুচির উপর নির্ভব করিত। বিশেষীকরণের যুগে (Age of Specialisation) বিজ্ঞাপনও একটি বিশেষ বিষয়-বস্তু হইয়াছে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণের হাতেই বেশীর ভাগ কারবারী বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়। আবার, খুব বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠান নিজেরাই বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞও কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বিশেষজ্ঞ-মধ্যবর্তী হিসাবে (Specialised Middleman) কারবার করিতেছে। উহাদের বলা হয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রতিষ্ঠান (Advertising and Publicity Concern)। কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথের সংযোগস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় ফলকে 'Ask for space,

SELVEL'; 'Advertise here or elsewhere, ELAP' ইত্যাদি নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন থাকে। SELVEL অথবা ELAP—উহারা বিজ্ঞাপন ও প্রচারে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতার অনুসন্ধান করিতেছে।

এই প্রকার বিজ্ঞাপন ও প্রচারে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের হাতে বিজ্ঞাপনের ভার ন্যস্ত করিবার সুবিধা এই যে, ইহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া কোন্ দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারে এবং তদনুসারে বিজ্ঞাপনদাতাকে পরামর্শ দিতে পারে।

ইহারা বহু বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে কার্য করে বলিয়া বিজ্ঞাপনের গড় ব্যয়ও কম পড়ে। কারণ, বিজ্ঞাপন প্রচারে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে যেমন দস্তুরি বা কমিশন গ্রহণ করে, অনুরূপভাবে যে প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন দেয় (যেমন, পত্রিকা, সিনেমা ইত্যাদি) তাহাদের নিকট হইতেও দস্তুরি পায়। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন মাধ্যমের নিকট হইতে যে দস্তুরি আয় করে উহার সুযোগ বিজ্ঞাপনদাতাও পাইয়া থাকে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে দস্তুরির হার কম গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যমসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(১) **সংবাদপত্র, জার্নাল, মাসিক পত্রিকা** ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে উহা প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং ইহাতে সর্বাধিক প্রচার হয়। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচুর পুনরাবৃত্তি না করিলে উহা হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে না। কি ধরনের পত্রিকায় প্রচার করিতে হইবে তাহা নির্ভর করে, যে বিষয়-বস্তু প্রচার করা হইবে তাহার প্রকৃতির উপর। দৈনিক পত্রিকা হইতে মাসিক বা বার্ষিক পত্রিকায় প্রচার অনেক সময় অধিক ফলপ্রসূ হয়।

(২) **প্রচারপত্রের** মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Circularisation. কর্মচারীর সাহায্যে বিভিন্ন রাজপথে বা গৃহে গৃহে প্রচারপত্র বিলি অথবা ডাক-বিভাগের (Postal Department) সাহায্যে গৃহে গৃহে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

ডাকযোগে প্রচারপত্র কেবল সম্ভাব্য ক্রেতার নিকটই পাঠান হয়। কিন্তু রাজপথে যে প্রচারপত্র বিলি হয় তাহা সাধারণতঃ সকলকেই দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন যে সর্বদাই ফলপ্রসূ হয়, তাহা নহে। তাহার কারণ, প্রচারপত্র অনেক সময়ে অপাত্রেও বিলি করা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রচারপত্রের মাধ্যমে অধিক-সংখ্যক সম্ভোগকারীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব।

(৩) **প্রাচীরপত্র** (Poster): প্রচারপত্র যেমন বিলি করা যায়, প্রাচীরপত্র তেমন সাধারণের মধ্যে বিলি করা যায় না। বিভিন্ন রাজপথে, দেওয়ালের গায়ে কাগজ সাঁটিয়া যে প্রচারের ব্যবস্থা হয়, উহাকে প্রাচীরপত্র বলে। ব্লক করিয়া কালি বা রঙ

লাগাইয়া দেওয়ালে ছাপ দিয়া প্রচারকার্যও প্রাচীরপত্রের মধ্যে পড়ে। বিজ্ঞাপনদাতাকে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া প্রাচীরপত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৪) **পণ্যসজ্জা** (Window Display): কারবারের প্রকৃতি অনুসারে পণ্যসজ্জা কার্যকর হইবে কিনা তাহা স্থির করা হয়। খুচরা বিক্রেতা এবং বিভাগীয় বিপণির পক্ষে পণ্যসজ্জা বিশেষ প্রয়োজন। পণ্যসজ্জা দ্বারা রাজপথে চলমান জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হয়। তবে জনবহুল এলাকা ব্যতীত পণ্যসজ্জা পদ্ধতি কার্যকর হয় না। কলিকাতার এসপ্লানেড, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট ইত্যাদি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দোকানে কাঁচের আয়নাযুক্ত আলমারীতে পণ্যসামগ্রী সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। দ্রব্যের মূল্যও উহাতে উদ্ধৃত থাকে। ইহাই পণ্যসজ্জা।

(৫) **চিত্রগৃহে ছায়াচিত্রের ব্যবস্থাকরণ** (Cinema Show): দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এবং ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় দ্রব্যের প্রয়োগ বা ব্যবহার-পদ্ধতি ছায়াচিত্রের সাহায্যে দেখান হয়। ভারতে সরকারী প্রচার-দপ্তরের অনুজ্ঞা-সম্বলিত ছায়াচিত্র চিত্রগৃহে প্রদর্শন করা হয়।

(৬) **নমুনা ও লভ্যাংশ প্রদান** (Sample and Bonus or Premium): বিশেষ কয়েক প্রকার কারবারে নমুনা প্রদানের মারফত বাজার তৈয়ারী, অর্থাৎ ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। যে দ্রব্যে একের নির্দেশের উপর বহু ব্যক্তির সম্ভোগ নির্ভর করে সেই সমস্ত দ্রব্যের নমুনা প্রদানের ফলে কার্য সিদ্ধ হয়। ঔষধের কারবারে চিকিৎসকগণকে বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, চিকিৎসকগণ যে ঔষধ অনুমোদন করেন রোগী সেই ঔষধ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং, বহু ব্যক্তির সম্ভোগ একজনের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

লভ্যাংশ প্রদান পদ্ধতিতে কারবারী মূল্যের একাংশ ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয়। অনেক কারবারে বৎসরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে 'সম্ভার নিঃশেষ বিক্রয়' (Stock Clearance Sale) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সম্ভার নিঃশেষ বিক্রয়কালে দ্রব্যের মূল্য কিছুটা কমাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যাহা কমান হইল সেই টাকাই লভ্যাংশ (Bonus)। ভারতের খাদি-প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তৈয়ারী করিবার জন্য সর্ব-ভারতীয় খাদি বোর্ডের নির্দেশে খাদি-প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রব্য ক্রয়ের উপর কিছু পরিমাণ বাট্টা দিয়া থাকে।

(৭) **কুপন ও উপহার বিতরণ** (Coupon and Free Gifts): কোনও দ্রব্যের বহুল প্রচার ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অনেক সময় দ্রব্যটি মোড়কের মধ্যে রাখিয়া সেই মোড়কে একখানি কুপন দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট-সংখ্যক কুপন সংগ্রহ করিয়া উহা উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট উপস্থিত করিলে বিনামূল্যে উপহারদ্রব্য পাওয়া যায়। উপহার প্রদান পদ্ধতি বর্তমানে খুবই প্রসারলাভ করিয়াছে।

(৮) **মেলা ও প্রদর্শনী** (Fairs and Exhibitions): পরিবহণ ও যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-মেলার গুরুত্ব কিছুটা কমিয়া গিয়াছে বটে, তবে অধুনা সরকারী প্রচেষ্টায় এই প্রথা পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। মেলায় দূর-দূরাঞ্চল হইতে ব্যবসায়ী সমাগম হয়, তাহারা নিজেদের দ্রব্য প্রদর্শন করাইয়া উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে বহু ব্যক্তিকে ওয়াকিবহাল করিতে পারে। মেলা ও প্রদর্শনী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(৯) **ব্যক্তিগত সংযোগ** (Personal Touch): ব্যক্তিগত সংযোগ সাধারণতঃ কুশলী বিক্রয়ী (Salesman) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় প্রতিনিধি মারফত সম্ভোগকারিগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকে বুঝায়। ব্যক্তিগত সংযোগ-ব্যবস্থা কারবারের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তবে কতকগুলি কারবার আছে যাহাতে কুশলী বিক্রয়ীর সাহায্য অপরিহার্য। বীমা কারবারীর পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ না করিলে বীমা-গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, ঔষধপত্রাদির উৎপাদকও বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative) নিয়োগ করিয়া ঔষধ-বিক্রেতার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে।

(১০) **সম্পাদকীয় প্রচার** (Editorial Publicity): সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অথবা সংবাদ প্রদানের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দ্রব্যের গুণ বিশ্লেষণ করিয়া যখন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অথবা সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাকে সম্পাদকীয় প্রচার বলা হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তবে বিশেষ ধরনের পত্রিকায় অনেক সময় সম্পাদকীয় প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে কোন নূতন দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশংসামূলক আলোচনা দ্রব্যের অস্তিত্ব ও গুণাগুণ প্রচারে সাহায্য করে।

(১১) **রেডিও** (Radio) **এবং টেলিভিশন** (Television): রেডিও এবং টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের শক্তিশালী মাধ্যম। ভারত সরকার রেডিও ও টেলিভিশন মারফত বিজ্ঞাপন (প্রচার) অনুমোদন করায় কিছুদিন যাবৎ ভারতে টেলিভিশন ও রেডিও মারফত বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

অন্যান্য মাধ্যম (Other Media): ইহা ছাড়া স্তম্ভলিখন, প্রাচীরপত্র, ট্রাম-বাস, পণ্যবহনকারী ভ্যান, নিওন লাইট, রম্যরচনা প্রতিযোগিতা, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা (Beauty Contest), বাহকের দ্বারা বাহিত বিজ্ঞাপন ফলক (Sandwitch Board) ইত্যাদিও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞাপনের বার্তাবিন্যাস বা অঙ্গসজ্জা
(Layout of Advertisement)

বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশে ইহার অঙ্গসজ্জা বা বার্তাবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপির (Copy) বিভিন্ন অংশে বার্তা (Message) সংযোজন এবং বিন্যাস-পদ্ধতিকে অঙ্গসজ্জা বা বার্তাবিন্যাস বলে।

বিজ্ঞাপন-বার্তায় তিনটি অঙ্গ থাকে: (১) **শিরোনামা** (Headline) ঃ ইহা বড় এবং রঙিন হরফে আকর্ষণীয় হয়। (২) **চিত্র** (Illustration) ঃ মার্জিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন চিত্র সংযোজনায় বিজ্ঞাপন আকর্ষণীয় হয়। (৩) **বিষয়-বস্তু** (Text or Message) ঃ বিজ্ঞাপনের বিষয় বা বক্তব্য সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

বার্তাবিন্যাস বা অঙ্গসজ্জায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য :

(১) **আয়তন** (Size) ঃ বিজ্ঞাপনের আয়তন পরিমিত (Reasonable) হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ইহা ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে ও তেমন কার্যকর হয় না।

(২) **আকৃতি** (Shape) ঃ বিজ্ঞাপনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞাপনটির আকার স্থির করিতে হয়। ইহা গোলাকার, বর্গাকার, ত্রিভুজাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি (Advertisement Copy) ঃ

বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বা বিষয়-বস্তু বা বার্তাকে (Message) বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি বলে। প্রতিলিপি পণ্যের খবর পরিবহণ করে। এই অর্থে ইহা পণ্য পরিবাহক। বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (ক) লিখিত বার্তা—যেমন, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন; (খ) শ্রবণযোগ্য বার্তা—যেমন, রেডিওর বিজ্ঞাপন ও (গ) দর্শনযোগ্য বার্তা—যেমন, সিনেমা বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি রচনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন :

(১) ইহা সহজ, সরল ও সুন্দর ভাষাসমৃদ্ধ হইবে।
(২) ইহা সম্পূর্ণ বিবরণযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হইবে।
(৩) ইহা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-ভিত্তিক হইবে।
(৪) ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রতিলিপি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
(৫) ইহা উন্নত রুচি ও কৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত।
(৬) উহা শিক্ষামূলক, অর্থপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক ও সৃজনশীল হওয়া উচিত।
(৭) ইহা ক্রেতার মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে।
(৮) ইহার প্রচারে উপযুক্ত মাধ্যম ও প্রকৃষ্ট সময় নির্বাচনের প্রয়োজন আছে।
(৯) প্রতিলিপি রচনায় ক্রেতার ভাবপ্রবণতা ও বিভিন্ন বোধের (Theme)—যেমন, গর্ববোধ, আভিজাত্যবোধ, ভীতিবোধ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।
(১০) বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি-ব্যয় অবশ্যই পরিমিত হইবে।

বিজ্ঞাপন কর্মসূচী (Advertisement Programme) ঃ

বিজ্ঞাপন দিবার পূর্বে বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা রূপায়ণ করিতে হয়। এই কর্মসূচী পরিকল্পনার বিষয়-বস্তুসমূহ হইল :

(১) **বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি তৈয়ারী করা** (Preparation of Copy) : আশু চাহিদা সৃষ্টি, ভবিষ্যৎ চাহিদা সৃষ্টি, স্বল্পস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টির প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিবার পর প্রয়োজন অনুসারে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি রচনা করিতে হইবে।

(২) **বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন** (Selection of Medium) : বিজ্ঞাপিত দ্রব্যটির প্রকৃতি, বাজার, চাহিদা, ক্রেতার প্রকৃতি, রুচি প্রভৃতি বিবেচনার পর বিজ্ঞাপনের মাধ্যম স্থির করিতে হইবে।

(৩) **বিজ্ঞাপনের বার্তাবিন্যাস** (Layout of Advertisement) : বিজ্ঞাপনেব বার্তাবিন্যাস বা অঙ্গসজ্জার শিরোনামা, চিত্র, আয়তন, আকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) **বিজ্ঞাপন অভিযান** (Advertisement Campaign) : ক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থায় ও মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাপনবার্তা প্রচার করাকে **বিজ্ঞাপন অভিযান** বলে। বিজ্ঞাপন অভিযানের পর্যায়সমূহ হইল : (ক) বিজ্ঞাপনের **উদ্দেশ্য** নিরূপণ, (খ) বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত **আবেদন** (approach) নির্ধারণ, (গ) উপযুক্ত বিজ্ঞাপন **প্রতিলিপি** রচনা, (ঘ) উপযুক্ত **মাধ্যম** নির্বাচন, (ঙ) উপযুক্ত **অঙ্গসজ্জাকরণ** ও (চ) প্রয়োজন অনুসারে প্রতিলিপি মাধ্যম ও অঙ্গসজ্জার **পরিবর্তন**।

সম্ভাব্য সকল ক্রেতাকে পণ্যবার্তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনটি পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপন অভিযান কবা যাইতে পারে :

(১) **আঞ্চলিক অভিযান** (Zonal Campaign) : আঞ্চলিক পদ্ধতিতে সমগ্র বাজারকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ধীরে ধীরে এক-একটি অঞ্চলে পর পর বিজ্ঞাপন অভিযান চালান হয়। ইহা ফলপ্রসূ ও ছোট কারবারীর পক্ষে সুবিধাজনক হয়, কারণ ইহাতে বিজ্ঞাপনের এককালীন ব্যয়ভার কম হয়।

(২) **শ্রেণীবদ্ধ অভিযান** (Cream Campaign) : এই ক্ষেত্রে চাহিদার তীব্রতা অনুসারে ক্রেতাসাধারণকে প্রথমে তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা অনুযায়ী "অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ" ও "স্বল্প সম্ভাবনাপূর্ণ" এইরূপভাবে ভাগ করা হয়। প্রথমে "অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ" ক্রেতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন অভিযান চালাইয়া ক্রমান্বয়ে পরবর্তী শ্রেণীর ক্রেতার উদ্দেশ্যে অভিযান চালান হয়। এই প্রকার অভিযান একসঙ্গে অধিক ব্যয়-সাপেক্ষ নহে এবং বাজার সৃষ্টিতে বিশেষ ফলপ্রসূ।

(৩) **জাতীয় অভিযান** (National Campaign) : এই জাতীয় অভিযানে সমস্ত অঞ্চলে এবং সকল শ্রেণীর ক্রেতার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে বিজ্ঞাপন অভিযান চালান হয়। কেবল বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একই সঙ্গে এইরূপ আঞ্চলিক ও শ্রেণীবদ্ধ অভিযান চালান সম্ভব। কারণ, ইহা ব্যয়-সাপেক্ষ। তবে ইহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব (Advertising Agency) :

বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialised) প্রতিষ্ঠান যখন কোন পণ্যোৎপাদক বা পণ্য-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের হইয়া সমুদয় বিজ্ঞাপনকার্য অথবা বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত পরামর্শ দান করে তখন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানটিকে **বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি** এবং ইহাদের কার্যকে **বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব** বলে। ইহারা মধ্যস্থ হিসাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। বিজ্ঞাপন প্রতিনিধির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে এই স্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

(১) পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য উন্নত ধরনের বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় প্রভূত অভিজ্ঞতা না থাকিলে বিজ্ঞাপন হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি এই কাজে দক্ষ বলিয়া ফলপ্রসূ বিজ্ঞাপনে ইহা বিশেষ কার্যকর হয়।

(২) ছোট উৎপাদক এবং নূতন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের সমুদয় ভার বিজ্ঞাপন প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিতে পারে।

(৩) বিজ্ঞাপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনকার্যের অভিজ্ঞ লোক থাকায় বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রতিটি পর্যায়, যেমন, অঙ্গসজ্জা, প্রতিলিপি রচনা ইত্যাদি সুষ্ঠু হয়।

(৪) ইহাদের অধীনে বিজ্ঞাপনের স্থান ইত্যাদি থাকায় প্রয়োজনে ইহারা বিজ্ঞাপনদাতাকে বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত স্থান যোগান দিয়া সাহায্য করিতে পারে।

(৫) ইহারা বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞাপনের মান উন্নত করিতে সাহায্য করে। বিজ্ঞাপনের বাজার-সংক্রান্ত গবেষণা (Market Research) এবং বিজ্ঞাপনের ফলাফলও ইহারাই নির্ধারণ করে।

(৬) ইহারা ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাপন অভিযানও পরিচালনা করে।

(৭) বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি থাকায় উৎপাদক নিজস্ব বিজ্ঞাপন বিভাগ না খুলিয়া বিক্রয়-ব্যয় অনেকাংশে লাঘব করিতে পারে।

'ক্লারিয়ন এডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড', 'আল্‌ফা এডভারটাইজিং সার্ভিস' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি সংস্থার উদাহরণ। বিজ্ঞাপনের অপব্যবহার রোধ করা, নূতন মাধ্যম আবিষ্কার করা, অশালীন বিজ্ঞাপন প্রচার রোধ করা, রুচিশীল ও উন্নত কলাকৌশলসম্বলিত বিজ্ঞাপন রচনা করা, বিপণন গবেষণা করা (Marketing Research) ইত্যাদির জন্য সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে ভারতীয় বিজ্ঞাপন পরিষদ (Advertising Council of India) গঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন (Scientific Advertisement) :

পুরাতন মামুলী ধরনের বিজ্ঞাপনে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করা সম্ভব নহে। উপরন্তু ইহাতে অনেক সময় বিজ্ঞাপন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফার পরিমাণ কমাইয়া দেয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হইল সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক ফললাভ করা। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনদাতা ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, পছন্দ, মনস্তত্ত্ব, বাজারের প্রকৃতি ও চাহিদা, শ্রেণীবিভাগ, প্রতিযোগীদের অনুসৃত মাধ্যম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়। ইহার পরে উপনীত সিদ্ধান্তটির বাস্তব কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া সচেতন ভাষা, ভাব ও বক্তব্য-সম্বলিত চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন অভিযান গ্রহণ করাকেই বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন বলে। প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণাকার্যের জন্য ব্যয় বেশী হইলেও বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে পরবর্তীকালে ব্যয়-সংকোচ ঘটে।

সুবিধা (Advantages) ঃ (১) বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপনে পরিণামে ব্যয়-সংকোচ হয়। ইহাতে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়।

(২) ক্রেতার সহিত বিক্রেতার যোগসূত্র স্থাপিত হয় ও বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদার স্বরূপ ও পরিবর্তন পূর্ব হইতেই অনুধাবন করিতে পারে।

(৩) সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের ফলে মধ্যস্থ কারবারীর বিলোপ সম্ভব।

পদ্ধতিসমূহ (Methods) ঃ সূত্রানুসন্ধান, অনুসরণ ও বিপণন গবেষণা—সাধারণতঃ এই তিনটি পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন করা যায়।

বিজ্ঞাপনের ফলাফল নির্ধারণ (Testing Results of Advertisement) ঃ

বিজ্ঞাপন কতখানি কার্যকর হইল এবং বিজ্ঞাপন-ব্যয় ফলাফলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তাহা নিরূপণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সঠিক ফলাফল নিরূপণ সম্ভব নহে। তথাপি নির্বাচিত মাধ্যমসমূহের কার্যকারিতা বা ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য **সূত্রানুসন্ধান পদ্ধতির** (Keying Method) আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।

সূত্রানুসন্ধান পদ্ধতি (Keying Method) ঃ

কোন একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন-মাধ্যম সকলপ্রকার বিজ্ঞাপনের জন্য কার্যকর হয় না কোন একটি মাধ্যমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হয় তাহাকেই **সূত্রানুসন্ধান** বলে। ইহা কোন একটি মাধ্যম-প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের ফলাফল কি তাহা নির্ধারণ করে। একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ণয় করা হয় :

(১) এইরূপ পদ্ধতিতে **বিভিন্ন সংবাদপত্র** ও **তালিকায়** বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ও বিজ্ঞাপনের সহিত এক **অপূর্ণ অর্ডার ফর্ম** (Blank Order Form) যুক্ত করিয়া ক্রেতাদের নিকট উহা পূরণ করিয়া ফরমাশ বা অর্ডার প্রদানের অনুরোধ করা হয় অর্ডার দিলে ক্রেতাকে কিছু উপহার বা কিছু দাম ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহা হইতে কোন্ মাধ্যমে সর্বাধিক সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা যায় এবং ভবিষ্যতে সেই মাধ্যমটি গ্রহণ করা যায়।

(২) একই বিজ্ঞাপনদাতা একাধিক সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন **নির্দেশক ঠিকানা** (Key Address) দিয়া বিজ্ঞাপন দেয় এবং পণ্য সরবরাহের অর্ডার দিবার অনুরোধ করে ও কিছু কিছু সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। যে পত্রিকার বিজ্ঞাপনে সর্বাধিক ক্রেতা সাড়া দেয় তাহার আপেক্ষিক প্রচার-ক্ষমতা বেশী ও ভবিষ্যতে সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

(৩) অনেক সময় বিভিন্ন **সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন** দিয়া ক্রেতাকে অনুরোধ করা হয় যেন, অর্ডার দিবার সময় তিনি যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন, তাহার নাম উল্লেখ করেন। ইহাতে সর্বাধিক উল্লিখিত সংবাদপত্রটি ভবিষ্যতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

(৪) অনেক সময় বিজ্ঞাপনদাতা এক-একটি পত্র-পত্রিকায় তাহার এক-একটি **বিভাগের বিজ্ঞাপন** দেয় এবং কোন্ পত্রিকায় কোন বিভাগীয় বিজ্ঞাপনটি অধিকতর কার্যকর তাহা বুঝিতে পারে।

(৫) কোন কোন বাছাই-করা অঞ্চলে বিক্রেতা ব্যক্তিগত অনুসন্ধান দ্বারা পণ্যটি সম্পর্কে বিভিন্ন খবর এবং বিজ্ঞাপনের কোন্ কোন্ মাধ্যম তাহাদের নিকট ফলপ্রসূ তাহা জানিয়া লইতে পারে। ইহাতে পণ্য-বার্তার অবগতি সম্পর্কে ক্রেতার মতামত জানা যায়। ইহাকে **Sample Survey Technique** বলে। শ্রবণযোগ্য বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে (যেমন, রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন) ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পদ্ধতিই ফল নিরূপণের একমাত্র পদ্ধতি।

অনুসরণ পদ্ধতি (Follow-up Method) :

বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপনে অনুসরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে অনুসন্ধানপত্র আসে উহা হইতে অনুসন্ধানকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে অনুসন্ধানকারীকে পত্র পাঠান হয় ও তাহাকে ক্রেতায় পরিণত করা হয়। ইহাকেই অনুসরণ পদ্ধতি বলে।

বিক্রয়-কুশলতা (Salesmanship) : কারবারের সুনামের উপর উহার সাফল্য নির্ভর করে। সুনাম গঠনে বিক্রয়-কুশলতার দান নগণ্য নহে। বিক্রয়-কুশলতা বর্তমানে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিতে না পারিলে কারবারের সুনাম গঠনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে।

বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ কর্মী দুই প্রকারের হইতে পারে : (১) খুচরা কারবার বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ বা বিপণি বিক্রয়কর্মী (Shop Salesman) এবং (২) পাইকারী কারবার অনেক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে। তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া দ্রব্যের চাহিদা তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে। এই সম্প্রদায়কে **বিক্রয় প্রতিনিধি** (Sales Representative বা Agent) বলা হয়। তাহারা যাহাতে সম্ভাব্য ক্রেতার সকল প্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের সহিত দ্রব্যসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পুস্তকাদি থাকে।

বিক্রয়কার্যে বিশেষজ্ঞ বিক্রয়কর্মীদের প্রযুক্ত **বিক্রয়-নৈপুণ্যকে বিক্রয়-কুশলতা বা বিক্রয়-বিদ্যা** (Salesmanship) বলে। বিক্রয়-বিশেষজ্ঞগণের প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিক বিক্রয়-কুশলতা (Personal Salesmanship) বলা হয়। চাহিদা সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ে ক্রেতাগণকে ক্রয়ে প্রবৃত্তকরণের (Securing Order) জন্য ইহার প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়-কুশলতার (বিক্রয়িকতা) পার্থক্য (Distinction between Advertisement and Salesmanship):

বিজ্ঞাপন	বিক্রয়-কুশলতা
১। ইহা চাহিদা সৃষ্টিকারী।	১। ইহা বিক্রয়ের প্রচেষ্টা।
২। ইহাতে পণ্যের নূতন চাহিদা সৃষ্টি হয়।	২। ইহাতে পণ্যের স্বত্ব আইনানুগভাবে হস্তান্তরিত হয়
৩। ইহা অব্যক্তিক বিক্রয় (Impersonal Selling) প্রচেষ্টা	৩। ইহা ব্যক্তিক বিক্রয় (Personal Selling) প্রচেষ্টা
৪। ইহা গণভিত্তিক (Mass Approach) ব্যবস্থা।	৪। ইহা ব্যক্তিভিত্তিক (Personal Approach) বিক্রয় পদ্ধতি
৫। বিজ্ঞাপন সমূহ ক্রেতাকে সচেতনভাবে প্রভাবিত করে।	৫। ইহাতে ক্রেতাকে প্রভাবিত করা বিক্রয়কের দক্ষতার উপর নির্ভর করে
৬। বিজ্ঞাপনে ব্যয় কম।	৬। ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।
৭। ইহাতে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে অবহিত হয়	৭। ইহা দ্বারা ক্রেতাকে পণ্যের সহিত সরাসরি পরিচয় করান হয়।
৮। ইহা ক্রেতা সংগ্রহ করে।	৮। ইহা ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করে
৯। ইহা পণ্য বাজারজাত করিবার প্রাথমিক পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টি করে।	৯। ইহা চাহিদা সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে ক্রেতাগণকে পণ্য প্রদানের উপায়।
১০। ইহা বিক্রয়কার্যের চাহিদা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া।	১০। ইহা বিক্রয়কার্যের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (Economic Process)

বিক্রয়-কুশলতার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Salesmanship):

উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইলে তবেই উৎপাদন সার্থকতা লাভ করে। পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিক্রয় এই দুইয়ের উপর কারবারের মুনাফা নির্ভর করে। অল্প ব্যয়ে প্রচুর পণ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা যায় না। তাই বিক্রয়কার্যে কুশলতা সমধিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পণ্যের বৈচিত্র্য, বাজারের বিস্তৃতি, ক্রেতার রুচি, সংস্কৃতি, অভ্যাস, জীবন ধারণের মান, আয় ইত্যাদির পার্থক্য, পরিবহণের ব্যয় বৃদ্ধি, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয় কুশলতার প্রয়োজন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যান্ত্রীকরণের ফলে স্বল্পব্যয়ে বহুল পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদন বিক্রয় না হইলে উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত রাখিতে হয়। ইহাতে আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা হয় না। বিক্রয় কুশলতার সাহায্যে বিক্রয় বৃদ্ধি করিয়া বহুল উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করা যায়। ইহাকে বিক্রয়কার্যের **অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া** (Economic Process) বলা হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সফল করিতে হইলে বিক্রয়-কুশলতা প্রয়োজন।

ক্রেতার মন আকৃষ্ট করিতে পারিলে তবেই পণ্য বিক্রয় বাড়ে। ক্রেতার মন আকৃষ্ট করিতে হইলে বিক্রয়-কুশলতার দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতার মনস্তত্ত্ব অনুধাবন ও প্রভাবিত করিতে হয়। ইহাকে বিক্রয়কার্যের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (Psychological Process) বলে।

কারবারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া (Business Process) আছে, যেমন, উৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ, শ্রমিক সংগ্রহ, উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রক্রিয়া বিক্রয়ের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। বিক্রয়-কুশলতা কারবারের প্রক্রিয়াসমূহের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যসাধন করে।

বিক্রয়-কুশলতার মৌলিক বিষয়সমূহ (Fundamentals of Salesmanship) :

বিক্রয়-কুশলতার মূল কথা হইল সম্ভাব্য ক্রেতার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করা। সম্ভাব্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিক্রয়কার্যে কুশলতার প্রয়োজন। বিক্রয়-কুশলতার মৌলিক বিষয়সমূহ এই প্রসঙ্গে আলোচনাযোগ্য। নিম্নে এই বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(ক) **বিক্রয়ের নীতি নির্ধারণ পরিকল্পনা** (Sales Policy and Planning) : বিক্রয়কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে বিক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া বিক্রয়ের নীতিসমূহ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) **বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা** (Sales Target) : বিক্রয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া লক্ষ্যমাত্রা বা পরিমাণ পূর্ব হইতে স্থির করিতে হইবে এবং সেই অনুসারে বিক্রয় প্রক্রিয়াসমূহকে সজাগ রাখিতে হইবে।

(গ) **বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি** (Sales Programme and Methods) : বাজারের পরিধি, ক্রেতার শ্রেণীবিভাগ, বাজার অনুসারে পণ্য সরবরাহের পরিমাণ, পরিবহণ পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যক্রম ও পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে।

(ঘ) **বিক্রয় সংগঠন** (Sales Organisation) : শক্তিশালী বিক্রয় সংগঠনের উপর বিক্রয়ের সাফল্য নির্ভর করে। সুদক্ষ সেলস ম্যানেজার বা বিক্রয় কর্মাধ্যক্ষের অধীনে একটি বিক্রয়-বিভাগ গঠন করিতে হইবে। এই বিভাগে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিক্রয়কর্মী এবং পণ্য সরবরাহের গাড়ী ইত্যাদি থাকিবে।

(ঙ) **বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ** (Sales Control) : বিক্রয়ের স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার সহিত প্রকৃত বিক্রয়ের পরিমাণের তুলনা করা এবং তাহার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাকেই বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। ব্যক্তিক বিক্রয়-বরাদ্দ ও প্রকৃত বিক্রয়ের পরিমাণের তুলনা এবং সামগ্রিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিক্রয় পরিমাণের তুলনা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। একদিকে দক্ষতা প্রদর্শনে পুরস্কার এবং অন্যদিকে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তিরস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করিতে হয়।

বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার পার্থক্য (Distinction between Sales Management and Marketing Management) :

বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য করা যাইতে পারে :

বিক্রয় ব্যবস্থাপনা	বিপণন ব্যবস্থাপনা
১। ইহা বিপণন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।	১। ইহা কারবার ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
২। ইহা শুধু বিক্রয় কার্যে লিপ্ত থাকে।	২। ইহা পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আইনগতভাবে পণ্য স্বত্বান্তর ও হস্তান্তর করা পর্যন্ত সকল প্রকার কার্যকলাপের সমন্বয় করে।
৩। ইহা বিক্রয় কার্য পরিচালনা করে।	৩। ইহা ক্রয়-বিক্রয়, একত্রীকরণ, স্তরবিন্যাস, নামকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহণ, বিজ্ঞাপন, ঝুঁকি গ্রহণ, মোড়কজাতকরণ, বিক্রয়কলা, জনসম্পর্ক ইত্যাদি কার্যের সমন্বয় করে।
৪। ইহা প্রত্যক্ষ বিক্রয় ব্যবস্থা।	৪। ইহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিক্রয়-ব্যবস্থার সমষ্টিগত কার্যকলাপ।
৫। ইহার কার্যক্ষেত্র পণ্য স্বত্বান্তর ও হস্তান্তরে সীমাবদ্ধ।	৫। ইহার কার্যক্ষেত্র ব্যাপক।
৬। ইহা বিক্রয় পরিকল্পনা করে।	৬। ইহা বাজার সৃষ্টির সামগ্রিক পরিকল্পনা করে।

বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের গুণাবলী Qualities of a Salesman) :

সফল বিক্রয় বিশেষজ্ঞের কতিপয় গুণ থাকা প্রয়োজন। বিক্রেতাকে ধনী, মধ্যবিত্ত, স্বল্প বিত্ত, নির্বোধ, অতিচালাক, খুঁতখুঁতে, খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি নানা ধরনের ক্রেতার সংস্পর্শে আসিতে হয়। সুতরাং সফল বিক্রেতা হইতে হইলে তাহাকে সকলের সহিত মানাইয়া চলিতে হয়।

বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের গুণাবলীকে **স্বাভাবিক** ও **অর্জিত**, এই দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইল :

স্বাভাবিক গুণাবলী :

১. **সুদর্শন ও চটপটে** (Handsome and Smart) : সুদর্শন চেহারা, সুন্দর ও রুচিশীল পোশাক সহজেই ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে এবং তাহার মনস্তত্ত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ সুদর্শন হওয়া বাঞ্ছনীয়। চটপটে স্বভাবের দরুন বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ সহজেই ক্রেতার মনে রেখাপাত করিতে পারে।

(২) **স্বাস্থ্যবান ও সদভ্যাস** (Good Health and Habit): বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে কঠোর পরিশ্রম এবং দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করিতে হয়। এই কারণে তাহার অটুট স্বাস্থ্য ও কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

(৩) **ব্যক্তিত্ব, মার্জিত স্বভাব ও আচার-আচরণ** (Personality, Polite Manners and Etiquette): আচরণে মাধুর্য ও ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কোন বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মধুর ও বিনয়ী ব্যবহার এবং মিষ্ট ব্যক্তিত্ব ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। মার্জিত আচার-আচরণ ক্রেতা-সাধারণকে প্রভাবিত করে।

(৪) **মিশুকে স্বভাব** (Sociability): বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে প্রতিদিন বহু ক্রেতার সংস্পর্শে আসিতে হয়। এই কারণে তাহাকে অবশ্যই সামাজিক ও মিশুকে প্রকৃতির হইতে হইবে। তাহার আলাপ জমাইবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

(৫) **বুদ্ধিমত্তা** (Intelligence): ক্রেতার সহিত আলাপরত অবস্থায় বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে ক্রেতার মন বুঝিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে হয়। ঠিক সময় ও সুযোগমত বিচক্ষণতার দ্বারা পণ্যসরবরাহের ফরমাশ আদায় করিতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

(৬) **ধৈর্য ও অধ্যবসায়** (Patience and Perseverance): বিভিন্ন প্রকার সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করিতে ধৈর্য ও অধ্যবসায় একান্ত প্রয়োজন। বার বার আবেদন করিয়া অনুৎসুক ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করিবার জন্য বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের এই গুণ থাকা প্রয়োজন।

(৭) **মনস্তত্ত্বের জ্ঞান** (Knowledge of Psychology): ক্রেতার মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের স্বভাবজাত মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কোন্ ক্রেতার মেজাজ ও রুচি কি প্রকারের তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে বিক্রেতা ক্রেতার মনস্তুষ্টি করিয়া দ্রব্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পাবে। ইহা **সম্মোহন বিদ্যার** (Hypnotism) মত। কুশলী বিক্রয়িককে সম্ভাব্য ক্রেতার **মনের উপর মন** (Mind Over Mind) স্থাপন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে হয়।

(৮) **আনুগত্য ও প্রফুল্লতা** (Loyalty and Cheerfulness): প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের পূর্ণ আনুগত্য থাকা প্রয়োজন। কার্যে সাফল্যের জন্য নিজ সত্তাকে প্রতিষ্ঠানের সত্তার সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। ক্রেতার সম্মুখে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিতে হইবে এবং কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৯) **বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল** (Trustworthy and Dependable): বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হইতে হইবে।

অর্জিত গুণাবলী:

(১) **সাধারণ শিক্ষা** (General Education)—বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে।

(২) **সাধারণ যোগ্যতা** (General Competence)—বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই বিক্রয়কার্যে সাধারণ যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

(৩) **প্রশিক্ষণ** (Training)—বিক্রয়-বিশেষজ্ঞকে তত্ত্বগত (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) প্রশিক্ষণ লইতে হইবে। শিক্ষানবীশ হিসাবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লওয়া যাইতে পারে।

(৪) **পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান** (Knowledge of the Product): বিক্রয়-বিশেষজ্ঞের পণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে ক্রেতা দ্রব্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তৎপরতার সহিত উত্তর জবাব দিতে পারে না। জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর দিতে না পারিলে সম্ভাব্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা যায় না।

বিক্রয় সম্প্রসারণ (Sales Promotion):

বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়, ব্যাপক অর্থে তাহাই বিক্রয় সম্প্রসারণ কার্যাবলী। শুধু যে বিজ্ঞাপন ও বিক্রেতার কলাকুশলতাই বিক্রয় সম্প্রসারণের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, তাহা নহে। এই দুটি মূল পন্থা ব্যতীত পারিতোষিক প্রদান, নমুনা বিতরণ, প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, মেলা ও প্রদর্শনী সংগঠন প্রভৃতি পন্থা বিক্রয়ের প্রসার ঘটায়। বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্প্রসারণের পন্থাসমূহ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হইলে সমপ্রেরণা-সঞ্জাত ফল বা সম্মিলিত ফল (Synergi Effect) পাওয়া যায়, যাহার ফলে বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে এই পন্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) **পারিতোষিক প্রদান** (Premium): বিক্রয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অনেক সময় বিক্রয়যোগ্য পণ্যটি মোড়কের মধ্যে রাখিয়া মোড়কে একখানি কুপন দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট-সংখ্যক কুপন সংগ্রহ করিয়া উহা উৎপাদক বা পাইকারের নিকট উপস্থিত করিলে উহার বিনিময়ে ক্রেতাকে একটি উপহার বা পারিতোষিক দেওয়া হয়। উপহারটি সুদৃশ্য ও পছন্দমত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) **নমুনা বিতরণ** (Sample Distribution): বাছাই-করা সম্ভাব্য ক্রেতাদের স্বল্প পরিমাণ পণ্য বিশিষ্ট নমুনা মোড়ক বিতরণ বিক্রয় সম্প্রসারণে সাহায্য করে। নূতন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য এই প্রথা খুবই কার্যকর। ঔষধ, সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে নমুনা বিতরণ ফলপ্রসূ হইতে পারে। ইহা ব্যয়বহুল এবং সীমিত বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৩) **প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা** (Contest): প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তিন প্রকারের হইতে পারে :

(ক) **বিক্রয়কর্মী প্রতিযোগিতা** (Salesmen's Contest)—এইরূপ প্রতিযোগিতায় পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রয়কর্মীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(খ) **ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা** (Dealers' Contest)—এই পদ্ধতিতে যে ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট পণ্যটি সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

(গ) **ক্রেতা প্রতিযোগিতা** (Buyers' Contest)—এই পদ্ধতিতে ক্রেতাদের নিকট হইতে কোন জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রচনা বা অভিমত অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাওয়া হয়। সফল প্রতিযোগীকে নগদ টাকা অথবা উপহার দেওয়া হয়।

(ঘ) **মেলা ও প্রদর্শনী** (Fairs and Exhibitions) : স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই মেলায় ও প্রদর্শনীতে স্টল ভাড়া করিয়া সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রদর্শন—ইহার গুণাগুণ, ব্যবহার ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিয়া ক্রেতাকে পণ্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও আকৃষ্ট করা হয়।

(ঙ) **জনসংযোগ** (Public Relations) : কারবারের সুনাম (Goodwill) ও ভাবমূর্তি (Image) উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং বিক্রয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জনসংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। জনসংযোগ বিভাগ ক্রেতার অভাব-অভিযোগ, পণ্যের উন্নতি সম্পর্কিত মতামত ও বিক্রয়োত্তর সেবার (After-sales Service) মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে।

বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী (**Functions of Sales Manager**) :

বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) **প্রশাসনিক কার্যাবলী** (**Administrative functions**) :

(ক) **বিক্রয়ের কর্মপন্থা ও কার্যক্রম প্রস্তুত করা** : বিক্রয় ব্যবস্থাপক কিভাবে বিক্রয়ের কাজ সংগঠিত করা হইবে এবং কি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করেন।

(খ) **বিপণন গবেষণা** : ক্রেতার চাহিদা নিরূপণ, পণ্যের বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন পদ্ধতি স্থির করা, বিক্রয়িক নিয়োগ করা ইত্যাদি বাজার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **বিক্রয় পর্যবেক্ষণ** : পণ্য বিক্রয় কোন বাজারে তেজী এবং কোন্ বাজারে মন্দা তাহা পর্যবেক্ষণ করা তাঁহার কাজ।

(ঘ) **বিক্রয় প্রণালী পর্যবেক্ষণ** : গৃহীত বিক্রয় প্রণালী কতখানি কার্যকরী হইয়াছে তাহা দেখাও তাঁহার কাজ।

(ঙ) **কর্মপন্থা ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ** : গৃহীত কর্মপন্থা ও কার্যক্রম কতখানি কার্যকরী হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা এবং কর্মপন্থার উৎকর্ষ বিধান করা বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কাজ।

(২) **প্রক্রিয়াগত কার্যাবলী** (**Operating functions**) :

(ক) **বিক্রয়কার্য পরিচালনা** : বিক্রয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক বিক্রয় সংগঠন করেন, বিক্রয়িক নির্বাচন ও নিয়োগ করেন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন, বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন, ইত্যাদি।

(খ) বিক্রয়ের কাজ তদারক করা : বিক্রয় প্রতিনিধি, পাইকার ও খুচরা কারবারীদের কার্যকলাপ তদারক করা তাঁহার কাজ।

(গ) বিক্রয়ের উৎকর্ষসাধন : কর্মপন্থা ও কার্যক্রমের উন্নয়ন করিয়া বিক্রয় বৃদ্ধি করা তাঁহার অন্যতম কাজ।

(ঘ) বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ : বিক্রয় ব্যবস্থাপককে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা, বিক্রয় নীতি, বিক্রয় পন্থা ও কার্যক্রম স্থির করিতে হয়।

(ঙ) বিক্রয় প্রতিবেদন : নির্দিষ্ট সময় অন্তর শ্রেণীভুক্ত বিক্রয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থাপক বিপণন ব্যবস্থাপকের নিকট প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় চিত্র তুলিয়া ধরেন।

জনসংযোগ (Public Relations) :

কারবারের সুনাম ও ভাবমূর্তি (Image) উজ্জ্বল করিবার জন্য এবং বিক্রয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জনসংযোগ বর্তমানে বিপণন ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। জনসংযোগ কারবার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষকে কারবারের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং কারবার সম্পর্কে জনমত হইতে বিরূপ মনোভাব দূর করে। জনসংযোগের জন্য একটি দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা করিতে হয়।

জনসংযোগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় :

(১) জনসাধারণকে শ্রেণীভুক্ত করিয়া জনসংযোগের কাজ আরম্ভ করিতে হয়।

(২) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে অথবা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে জনসংযোগ করিতে হয়।

(৩) কারবারের উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনও সংবাদ বা তথ্য জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

(৫) কর্মীদের মধ্যেও কারবারের কার্যকলাপ ও নীতি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৬) সমালোচনার সদুত্তর দিতে হইবে।

(৭) কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষের সকলকে জনসংযোগের কার্যকরী উপায়ের শিক্ষা দিতে হইবে।

(৮) বড় কারবারে একজন জনসংযোগ কর্মাধ্যক্ষ (Public Relations Officer or PRO) নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন :

(ক) কারবারের নীতি নির্ধারণে জনসংযোগের প্রয়োজনীয় দিকের উপর আলোকপাত করিবেন ;

(খ) জনসম্পর্ক স্থাপনের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবেন ;

(গ) জনসম্পর্ক-নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করিবেন ;

(ঘ) বিভাগীয় সহযোগিতা ও সংযোজনার কাজ করিবেন ;

(ঙ) বিভিন্ন জনসংযোগ সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন ;

(চ) জনগণ, বণিক সংঘ, সরকার, সংবাদ সংস্থা ইত্যাদির সহিত সভা করিয়া কারবারকে তুলিয়া ধরিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় | আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

সংজ্ঞা ঃ অর্থলগ্নি পরিকল্পনা, অর্থ সংস্থান, অর্থ বিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং যাবতীয় আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়-সাধনকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেমন, অর্থলগ্নিকরণ, অর্থ সংস্থান ও লভ্যাংশ নীতি।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (Functions of Financial Management) ঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী অনুধাবন করা যায়। আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী হইল :

(১) **মূলধন কাঠামো নির্ধারণ (Determination of the Capital Structure) ঃ** প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজ। একটি প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ দুই প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয় :

(ক) **স্থায়ী মূলধন** (Fixed Capital) ঃ ইহা দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকে এবং স্থায়ী সম্পত্তিতে লগ্নিকৃত হয়।

(খ) **কার্যকরী বা চলতি মূলধন** (Working Capital) ঃ ইহা স্বল্পকালীন মূলধন এবং চলতি সম্পত্তিতে ব্যবহার করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অনুমান করিয়া এবং সংকল্পিত আর্থিক বিবরণী (Projected Financial Statements) প্রস্তুত করিয়া মূলধন কাঠামো স্থির করা হয়।

(২) **অর্থ সংগ্রহ করা (Procurement of Funds) ঃ** বিভিন্ন উৎস হইতে মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। স্থায়ী মূলধন দীর্ঘকালীন মূলধন। শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং মুনাফা ও সংরক্ষিত তহবিলের পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইহা সংগ্রহ করা যায়। চলতি মূলধন বা স্বল্পকালীন মূলধন ব্যাঙ্ক, জন-আমানত ইত্যাদি উৎস হইতে সংগ্রহ করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপককে বাহ্যিক উৎস ও অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সংগৃহীত মূলধনের অনুপাত স্থির করিতে হয়। এই অনুপাত লভ্যাংশ বণ্টন, মুনাফা ও শেয়ারের মূল্যের উপর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মূলধনের ব্যয় ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ মূলধন অনুপাত স্থিরীকরণে বিবেচ্য বিষয়।

(৩) **অর্থের লগ্নিকরণ (Investment of Funds) ঃ** সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়। ইহাকে সম্পত্তির মিশ্রণ (Asset Mix) বলে। স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থলগ্নি সংকটপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয়, কারণ ইহাতে মূলধন অনেক দিন আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ মুনাফার উপর প্রভাব বিস্তার করে। মূলধন বাজেটের মাধ্যমে অর্থলগ্নির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। নগদ-প্রবাহের (Cash Flow) অনুমান, মুনাফার হার বিশ্লেষণ ও মূলধনের ব্যয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়।

অনুরূপভাবে চলতি সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করিবার পূর্বে অন্ত-মজুত (Closing Stock), নগদ, অধমর্ণ (Debtors) ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাণ বিবেচ্য। আদায় পদ্ধতি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হইলে মূলধন অযথা আবদ্ধ হইতে পারে। নগদ বাজেট (Cash Budget) পদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব।

(৪) **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ (Financial Control and Analysis) :** বিভিন্ন কার্যাবলীর মূল্যায়ন করিবার জন্য আর্থিক অনুপাত (Financial Ratios) অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। মূলধনের কার্যকারিতা পরিমাপে এবং আর্থিক অবস্থা যাচাই করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার লাভ ক্ষতির অনুপাত, সম্পত্তি ও দায়-দায়িত্বের অনুপাত এবং মিশ্র অনুপাতের সাহায্য লওয়া হয়। এই সকল অনুপাতের মধ্যে চলতি অনুপাত (Current Ratio), মোট লাভের অনুপাত (Gross Profit Ratio), নীট লাভের অনুপাত (Net Profit Ratio), মজুত ও বিক্রয়ের অনুপাত (Stock Turnover Ratio), অধমর্ণ গতি অনুপাত (Debtors Velocity Ratio), মূলধন বিন্যাস অনুপাত (Capital Gearing Ratio) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নগদ-প্রবাহ বিবরণীর (Cash Flow Statement) মাধ্যমে অর্থের উৎস ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হয় এবং উহাদের প্রভাব আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ তাহা বিশ্লেষণ করা হয়।

(৫) **আর্থিক নীতি (Financial Policies) :** আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণ করিতে হয়; যেমন, লভ্যাংশ প্রদানের নীতি, অবচয় নীতি, নূতন বিনিয়োগ নীতি; মুনাফা ও সঞ্চিতির পুনর্বিনিয়োগ নীতি, সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি ইত্যাদি।

অর্থ সম্পর্কে পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা (Changing Concept of Finance) :

সনাতন মতবাদে আর্থিক ধারণা খুবই সংকীর্ণ ছিল। তখন আর্থিক ধারণা বলিতে কেবলমাত্র নগদ অর্থ (Cash)-কে বুঝাইত। আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিধি পুঁজি সংগ্রহে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা ছাড়া আর্থিক ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিত এবং কিভাবে সংগ্রপত্র বিপণন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তাহার উপায় বিবেচনা করিত। মুনাফা সর্বাধিকীকরণ (Profit Maximisation) নীতির উপর ইহার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। সনাতন মতবাদ অর্থ-সংগ্রহ ও অর্থলগ্নি: কাম্য সম্পর্কটি উপেক্ষা করিয়াছিল। উহা পুঁজি সংগ্রহের ব্যয়ের (Cost of Capital) উপরেও তেমন গুরুত্ব দেয় নাই।

শিল্প-বিপ্লবের পর ঐতিহাসিক যৌথ মূলধনী কারবারের সূত্রপাত হয় এবং মূলধনের প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। কারবারী কাযকলাপের বিস্তৃতি এবং ঋণের প্রয়োজন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি করে। শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস যথেষ্ট নয় বলিয়া বাহ্যিক উৎস হইতে মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। অর্থ সংগ্রহের ব্যয় ও

বিনিয়োগজনিত আয়ের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যৌথ-মূলধনী ক্ষেত্রের আবির্ভাব, তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রয়োগ কৌশলের উন্নয়ন, বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিধি ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

পরিবর্তনশীল আর্থিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি অর্থ বিনিয়োগ বা অর্থের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে চলতি সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে হয়। বর্তমানে মুনাফা সর্বাধিকীকরণ ছাড়াও সম্পদের সর্বাধিকীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিনিয়োগ, বিনিয়োগের উপর তদারক করা এবং বিনিয়োগ আর্থিক ব্যয়ের ফলাফল অনুসন্ধান করা আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক সংযোজন। অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা ও উৎস স্থির করা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অর্থের সুষ্ঠু বিন্যাস, বিনিয়োগের ক্ষেত্র স্থির, আর্থিক কার্যের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায় পরিবর্তিত পটভূমিকায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজ হইল পুঁজির কাম্য ব্যবহার করা।

আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) :

সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ, মূলধনের কাঠামো নির্বাচন ও মূলধনের বিন্যাস করা এবং মূলধন সংগ্রহ ও উহার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি ও যুক্তিসিদ্ধ পন্থা স্থির করাকে **আর্থিক পরিকল্পনা** বলে। আর্থিক পরিকল্পনা মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করে এবং মূলধন সংগ্রহ ও উহার সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা করে। আর্থিক পরিকল্পনার তিনটি দিক আছে :

(ক) প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ,

(খ) লগ্নিপত্রের প্রকার বা শ্রেণী (type) এবং লগ্নিপত্রের বিলির আনুপাতিক হার নির্ধারণ অর্থাৎ মূলধনের কাঠামো ও মূলধন বিন্যাস স্থির করা ;

(গ) আর্থিক নীতি নির্ধারণ।

আর্থিক পরিকল্পনার উপাদান (Factors of Financial Planning) :

আর্থিক পরিকল্পনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয় :

(১) **মূলধন কাঠামোর পরিকল্পনা :** বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধন লইয়া যে মোট মূলধন গঠন করা হয়, তাহাদের অনুপাতকে **মূলধন** কাঠামো বলে। অতিরিক্ত মূলধন (Over Capitalisation) বা স্বল্প মূলধন (Under Capitalisation) কোন অবস্থাই বাঞ্ছনীয় নহে। অতিরিক্ত মূলধন থাকিলে উহা অব্যবহৃত থাকে এবং লভ্যাংশের হার কমিয়া যায়। ফলে শেয়ারের বাজারমূল্য হ্রাস পায়। স্বল্প মূলধনের ফলে মূলধনের অভাবে কোম্পানীর কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। সুতরাং আর্থিক পরিকল্পনায় স্বাভাবিক মূলধনের কাঠামো স্থির করিতে হইবে।

(২) **মোট মূলধনের প্রয়োজন স্থিরীকরণ (Determination of Capital Requirements or Capitalisation) :**

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে কারবারে মূলধনের প্রয়োজন হয় :

(ক) কারবার প্রবর্তন ,
(খ) স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা ,
(গ) কার্যকরী মূলধন বা চলতি ব্যয় ,
(ঘ) প্রশাসনিক ব্যয় ,
(ঙ) সম্ভাব্য ব্যয় ;
(চ) কারবার সম্প্রসারণের ব্যয়।

স্থায়ী মূলধন আবদ্ধ থাকে। ইহা কারবারের প্রকৃতি, উৎপাদন পদ্ধতি, কারবারের আয়তন ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কার্যকরী মূলধন কারবারের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয়। কার্যকরী মূলধন $= \Sigma$চলতি সম্পত্তি $-$ (বিয়োগ)Σচলতি দায়। চলতি সম্পত্তি : চলতি দায় $=$ ২ : ১ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা কারবারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য নির্দেশ করে। উৎপাদনকালের দৈর্ঘ্যতা, বিক্রয়ের দ্রুততা, বিক্রয়ের শর্ত, চলতি সম্পত্তির নগদে রূপান্তর, কাঁচামালের মূল্যের ও পণ্যের চাহিদার তারতম্য কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়।

কারবারের মূলধনের প্রয়োজন দুইটি উপায়ে স্থির করা যায় :

(ক) **বিশ্লেষণ পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে ব্যয় বিশ্লেষণ করিয়া গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে মূলধনের প্রয়োজন স্থির করা হয়।

(খ) **তুলনামূলক পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে সমজাতীয় ও সমআকারের কারবারে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মূলধনের প্রয়োজন স্থির করা হয়।

উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে মূলধনের প্রয়োজন স্থির করিলে উহা যথাযথ হইবে।

(৩) **মূলধন সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি :** মূলধন সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস আছে। এই উৎসগুলি হইল : শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়, জন-আমানত গ্রহণ, ব্যাঙ্ক ও লগ্নিসংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ, সরকারী ঋণ গ্রহণ, নিজস্ব মুনাফা ও সংরক্ষিত তহবিলের পুনর্বিনিয়োগ ইত্যাদি। একটি উৎস হইতে মূলধন সংগ্রহ যুক্তিযুক্ত নহে। কারবারের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া এবং নগদ-প্রবাহ (Cash Flow) বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন উৎসের অনুপাত স্থির করিতে হয়।

(৪) **লগ্নিপত্র বিপণন (Marketing of Securities) :** বিজ্ঞাপনী মারফত, দালাল মারফত, দায়গ্রাহক মারফত, লগ্নিকারক সংস্থা মারফত, বর্তমান শেয়ার-হোল্ডার ও কর্মচারিগণের মধ্যে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিলি ইত্যাদির মাধ্যমে নূতন লগ্নিপত্র বিপণন করা যায়। কিন্তু যে সকল লগ্নিপত্র পূর্বে বিক্রীত হইয়াছে সেগুলির ক্রয়-বিক্রয় শেয়ার বাজারের মারফত হইতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে কোম্পানীর কোন নূতন মূলধন

সংগৃহীত হয় না। লগ্নিপত্র বিপণনে এক বা একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে যে পদ্ধতি স্বল্প ব্যয়ে সত্বর অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলধন কাঠামো (Capital Structure) :

সংজ্ঞা (Definition) : অর্থ সংস্থানের দুইটি দিক আছে—মূলধনীকরণ বা মূলধনায়ন (Capitalisation)-এর দিক এবং কাঠামোগত (Structural) দিক।

গার্স্টেনবার্গ (Gerstenberg)-এর মতে "মূলধন কাঠামো বলিতে মূলধনীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার লগ্নিপত্র এবং মূলধনে উহাদের অনুপাতকে বুঝায়।"

সুতরাং মূলধন কাঠামোতে একদিকে বিভিন্ন প্রকার লগ্নিপত্র যেমন, ইকুইটি শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থকে এবং অন্যদিকে কি অনুপাতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাকে বুঝায়। বিলিকৃত লগ্নিপত্রের ধরন বা প্রকারভেদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মূলধন কাঠামোর সহিত জড়িত। কারবারের প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত যত্ন ও দক্ষতার সহিত এই অনুপাত স্থির করিতে হয়।

মূলধন বিন্যাস (Capital Gearing) :

সংজ্ঞা (Definition) :

$$\text{মূলধন বিন্যাস} = \frac{\text{ইকুইটি শেয়ার মূলধন} + \text{অবণ্টিত মুনাফা}}{\text{স্থির সুদ বহনকারী লগ্নিপত্র}}$$

$$= \frac{\text{ইকুইটি শেয়ার মূলধন} + \text{অবণ্টিত মুনাফা}}{\text{প্রেফারেন্স শেয়ার মূলধন} + \text{ডিবেঞ্চার মূলধন}}$$

ইকুইটি শেয়ার মূলধনের সহিত প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চার মূলধনের অনুপাতকে মূলধন বিন্যাস বলে। অবণ্টিত মুনাফা ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারদের প্রাপ্য। ইহা অভ্যন্তরীণ মূলধন।

অধ্যাপক এম. সি. শুক্লার (Prof. M. C. Shukla) মতে, "দুই বা ততোধিক লগ্নিপত্রের মধ্যে উপযুক্ত আনুপাতিক হার এবং প্রত্যেক প্রকার লগ্নিপত্রের সহিত সামগ্রিক মূলধনীকরণের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করাকে **মূলধন বিন্যাস** বলে।"

যখন অন্যান্য শ্রেণীর মূলধনের তুলনায় ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাত কম হয়, তখন উহাকে **উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধন** (High-geared Capital) বলে। ইহাতে ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণ লাভের সময় উচ্চতর হারে লভ্যাংশ পায় বলিয়া লাভবান হয়। যখন অন্যান্য শ্রেণীর মূলধনের তুলনায় ইকুইটি শেয়ার মূলধন বেশী হয়, তখন উহাকে **নিম্ন-বিন্যস্ত মূলধন** (Low-geared Capital) বলে।

মূলধন কাঠামো অথবা মূলধন বিন্যাসে বিচার্য বিভিন্ন উপাদান (Factors of Capital Structure or Capital Gearing):

মূলধনের কাঠামো এবং মূলধন বিন্যাসের বিচার্য বিষয়গুলি একই প্রকার। যে সকল উপাদান মূলধন কাঠামো ও মূলধন বিন্যাসে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে সেইগুলি হইল:

(১) **ইকুইটির উপর কারবার** (Trading on Equity): উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধনের ক্ষেত্রে কোম্পানী লাভজনক অবস্থায় পরিচালিত হইলে মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে ডিবেঞ্চারের উপর সুদ এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের পর যে অবশিষ্ট মুনাফা থাকে, তাহা উচ্চহারে ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয়। ইহাকে ইকুইটির উপর কারবার বলে। ইহাতে ইকুইটি শেয়ারে তেজীভাব আসে। নিম্নবিন্যস্ত মূলধনের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত হয়, ফলে ইকুইটি শেয়ারে মন্দা আসে।

(২) **কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা** (Power of Control Over the Company): অনেক সময় প্রবর্তকগণ ডিবেঞ্চার ও প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অধিক পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিতে চান। ভোটদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র ইকুইটি শেয়ার-হোল্ডারগণের আছে। সুতরাং এইভাবে একদিকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে ইকুইটি শেয়ার কিনিয়া প্রবর্তকগণ কোম্পানী পরিচালনার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখিতে পারেন।

(৩) **কারবারের প্রকৃতি** (Nature of Business): বিভিন্ন প্রকার কারবারের বিনিয়োগ, ঝুঁকি, প্রতিযোগিতা, বাজার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। সেই কারণে মূলধন সংগ্রহের উৎসও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং মূলধন কাঠামো কারবারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

(৪) **নমনীয়তা** (Flexibility): মূলধন কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাহাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুসারে অধিকতর মূলধন সংগ্রহ করা যায়। প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চার অধিক মাত্রায় বিক্রি করিলে মূলধনের কাঠামো অপরিবর্তনীয় বা স্থিত (Rigid) হয়, কারণ ইহাতে সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হয়। অধিক ইকুইটি শেয়ার বিক্রি করিলে মূলধন কাঠামো নমনীয় হয়।

(৫) **সময়** (Time): স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক ঋণ ও জন-আমানত বিশেষ উপযোগী, কিন্তু দীর্ঘকালীন বা স্থায়ী মূলধনের জন্য শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রি করিতে হয়।

(৬) **মূলধন সংগ্রহের ব্যয়** (Cost of Raising Capital): অল্প সুদে মূলধনের যোগান পাইলে ঋণকৃত মূলধন অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু আয়ের

নিশ্চয়তা না থাকিলে শেয়ার বিলি করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। মূলধন সংগ্রহের ব্যয় মূলধন কাঠামো স্থিরীকরণে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

(৭) **মূলধন বাজারের অবস্থা** (Condition of Capital Market) ঃ মূলধন বাজারের অবস্থা মন্দা বা তেজী হইলে, শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সহজেই মূলধন সংগ্রহ করা যায়। মন্দা বাজারে শেয়ার অপেক্ষা ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

৮) **বিনিয়োগকারিগণের চাহিদা** (Investors' Demand) ঃ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষমতা, কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিনিয়োগকারিগণের মনে বিনিয়োগে আস্থা ও নিরাপত্তা আনে। এক এক ধরনের বিনিয়োগকারী এক এক প্রকার লগ্নিপত্রে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহী হয়। সেই কারণে কোম্পানীকে বিভিন্ন ধরনের লগ্নিপত্র বিলি করিতে হয়।

৯) **আইনের বিধিনিষেধ** (Legal Restrictions) ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা কোন বিশেষ ধরনের লগ্নিপত্র বিলি করা নিষিদ্ধ হইতে পারে। জন-আমানতের সর্বোচ্চ পরিমাণ সীমিত হইতে পারে। সুতরাং মূলধন কাঠামো গঠনে আইনের বাধ্যবাধকতা মানিতে হয়।

ইহা ছাড়া কারবারের আয়তন, প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, জামিন দিবার মত সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয় মূলধন কাঠামো গঠনে বিবেচ্য বিষয়।

মূলধনীকরণ বা মূলধনায়ন (Capitalisation) ঃ

সংজ্ঞা (Definition) ঃ কারবারের মোট মূলধনের প্রয়োজন নির্ধারণ করিবার প্রক্রিয়াকে **মূলধনায়ন বা মূলধনীকরণ** বলে। মোট মূলধনের প্রয়োজন নির্ধারণ ও উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগ মূলধনায়নের অঙ্গীভূত।

মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ দুইটি উপায়ে করা যায়—

(১) **ব্যয় তত্ত্ব** (Cost Theory) ঃ ইহা কারবার স্থাপনের ব্যয়, সম্পত্তি অর্জনিত ব্যয় ও কারবারের চলতি ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয়। ইহা একটি গাণিতিক পদ্ধতি। ইহাকে বিশ্লেষণ পদ্ধতিও বলে।

(২) **তুলনামূলক পদ্ধতি** (Comparison Method) ঃ এই নীতি অনুসারে একই প্রকার এবং একই আয়তনের কারবারের মূলধন ও অন্যান্য তথ্য তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া মূলধনের পরিমাণ স্থির করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে উভয় প্রকার পদ্ধতিতে মূলধনের প্রয়োজন বাহির করিয়া তাহাদের গড় নির্ণয় করা হয় এবং গড় মূলধনকে মোট মূলধনের প্রয়োজন বলিয়া ধরা হয়।

সঠিকভাবে মূলধনায়ন না করিলে অতিরিক্ত মূলধন (Over Capitalisation) অথবা স্বল্প মূলধন (Under Capitalisation)-এর সমস্যা দেখা দিবে। অতিরিক্ত

মূলধনে মূলধন আবদ্ধ (Blocked) হইয়া থাকিবে, মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং লভ্যাংশের হার কমিয়া যাইবে। অন্যদিকে স্বল্প মূলধনে কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে চালান সম্ভব হইবে না। সুতরাং স্বাভাবিক মূলধনায়ন বিশেষ প্রয়োজন।

মূলধনীকরণের বা মূলধনায়নের উপাদান (Factors of Capitalisation) :

স্থায়ী মূলধনায়নের প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল :

(১) কারবারের প্রকৃতি ;

(২) কারবারের আয়তন ,

(৩) উৎপাদন পদ্ধতির সরলতা ও জটিলতা।

কার্যকরী মূলধনায়নের বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল :

(১) উৎপাদন প্রক্রিয়ার দৈর্ঘ্যতা অথবা স্বল্পতা ,

(২) দ্রব্য বিক্রয়ের দ্রুততা ,

(৩) চল্‌তি সম্পত্তির নগদে রূপান্তরকরণের দ্রুততা ,

(৪) পণ্যের চাহিদার তারতম্য ,

(৫) কাঁচামালের মূল্যের তারতম্য ইত্যাদি।

অর্থ ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী (Functions of Finance Manager) :

অর্থ ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার কার্যাবলী নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

(১) তিনি অর্থ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন। যেহেতু অর্থ সম্পদ অপ্রচুর, সেই কারণে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাঁহাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজ করিতে হয়।

(২) তিনি মূলধন পরিকল্পনা করেন।

(৩) মূলধনের কাঠামো ও মূলধন বিন্যাস করা তাঁহার অন্যতম কাজ।

(৪) তিনি কারবারে মোট মূলধনের প্রয়োজন নির্ধারণ করেন অর্থাৎ সামগ্রিক মূলধনীকরণ করেন।

(৫) মূলধন সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া মূলধন উৎস নির্বাচন করেন।

(৬) তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ হইল মূলধনের উপযুক্ত লগ্নি বা বিনিয়োগ করা।

(৭) নগদ-প্রবাহ, সঞ্চয়-প্রবাহ ও আর্থিক অনুপাতের বিবরণী প্রস্তুত করিয়া তিনি আর্থিক বিশ্লেষণ ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৮) অর্থ ব্যবস্থাপক কারবারের আর্থিক নীতি যেমন, অবচয় নীতি, সঞ্চিতি নীতি, লভ্যাংশ নীতি, বিনিয়োগ নীতি, সম্পত্তির মূল্যায়ন নীতি ইত্যাদি স্থির করেন।

(৯) তিনি মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট পর্যায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন।

যৌথ কোম্পানীর লগ্নি বিপণন পদ্ধতি (Methods of Marketing Securities of a Company) ঃ

শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ঋণপত্র ইত্যাদিকে লগ্নিপত্র (Securities) বলে। একটি যৌথ কোম্পানীর লগ্নিপত্র বিপণন ব্যবস্থাকে দুইভাগে আলোচনা করা যায়—

(১) **নূতন লগ্নিপত্র বিপণন (Marketing of New Issues) ঃ**

(২) **পুরাতন চালু লগ্নিপত্র বিপণন (Marketing of Existing Securities) ঃ**

নূতন ঋণপত্র বিপণন ব্যবস্থা

সাধারণতঃ নূতন কোম্পানী প্রবর্তনের সময় এবং পুরানো কোম্পানী নূতন করিয়া মূলধন সংগ্রহের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে লগ্নিপত্র বিপণন করে :

(ক) **বিজ্ঞাপনী বা বিবরণপত্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিক্রয় (Direct sale through issue of Prospectus) :** সার্বজনিক কোম্পানী বিবরণপত্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে লগ্নিপত্র ক্রয়ের আবেদন করিতে পারে। লগ্নিপত্র ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ লগ্নিপত্র ক্রয়ের আবেদন করেন এবং কোম্পানী তাহাদের লগ্নিপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে।

সুবিধা (Advantages) :

(১) এই পদ্ধতিতে ব্যাপক প্রচার ও বিক্রয় সম্ভব হয় ;

(২) প্রত্যক্ষভাবে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ফলে দালালী দিতে হয় না ,

(৩) ইহাতে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ব্যয় খুব কম পড়ে ;

(৪) ইহাতে দ্রুত লগ্নিপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) ইহাতে লগ্নিপত্র বিক্রয়ে অনিশ্চয়তা থাকে ;

(২) অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লগ্নিপত্রগুলি বিক্রীত হয় না ,

(৩) দালাল না থাকায় নূতন ও অপরিচিত কোম্পানীর লগ্নিপত্র ক্রয়ের জন্য এই পদ্ধতিতে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা যায় না।

(খ) **দালালের মারফত বিক্রয় (Sale through Brokers) ঃ**

এই পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি লগ্নিপত্রের দালাল হিসাবে কাজ করে এবং ইহারা বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে দালালী (Brokerage) পায়।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) দালালগণ অভিজ্ঞতার কারণে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে ;

(২) দালালগণ কোম্পানীকে অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করে ;

(৩) দালালীর হার অপেক্ষাকৃত কম।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) জনগণ লগ্নিপত্র ক্রয় না করিলে দালালগণ বিক্রয়ের নিশ্চিত আশ্বাস দেয় না ;

(২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই।

(গ) দায়গ্রাহক মারফত বিক্রয় (Sale through Underwriters) ঃ যাহারা কোম্পানীর সমস্ত লগ্নিপত্র বিক্রয়ের আশ্বাস দেয় এবং জনগণ লগ্নিপত্র সম্পূর্ণ ক্রয় না করিলে অবিক্রিত লগ্নিপত্র ক্রয় করিবার জন্য কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহাদের দায়গ্রাহক বলে। লগ্নিপত্র বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতিকে দায়গ্রহণের চুক্তি (Underwriting Contract) বলে।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) কোম্পানী লগ্নিপত্র বিক্রয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পায়

(২) ইহাতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ;

(৩) ইহাতে দ্রুত মূলধন সংগৃহীত হয় ,

(৪) ইহারা কোম্পানীকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরামর্শ দেয় ;

(৫) খ্যাতিসম্পন্ন দায়গ্রাহকের মাধ্যমে লগ্নিপত্র বিক্রয় করিলে কোম্পানীর মান ও সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং লগ্নিকারকগণের মনে নিরাপত্তা আসে ,

(৬) লগ্নিপত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত অস্থিরতা হ্রাস পায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) ইহাতে অনেক আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হয় .

(২) আর্টিকেলস্ অফ্ এসোসিয়েশন বা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ না থাকিলে দায়গ্রাহকের মাধ্যমে লগ্নিপত্র বিক্রয় করা যায় না ;

(৩) ইহাদের কমিশন বেশী বলিয়া এই পদ্ধতিতে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ব্যয় অধিক হয়। শেয়ারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবলেখন কমিশন ৫% এবং ডিবেঞ্চারে সর্বোচ্চ অবলেখন কমিশন ২½%।

(ঘ) লগ্নিকারক সংস্থা মারফত বিক্রয় (Sale through Investment Institutions) ঃ ইহারা অভিজ্ঞ সংস্থা। যখন কোন কোম্পানী লগ্নিপত্র বিক্রয় করে তখন ইহারা সম্পূর্ণ লগ্নিপত্র ক্রয় করিয়া লয় এবং পরে উহা জনগণের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দেয়।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) লগ্নিপত্র বিক্রয় সম্পর্কে কোম্পানী নিশ্চিত থাকে ;

(২) দ্রুততার সহিত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ;
(৩) কোম্পানীর লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ঝুঁকি লইতে হয় না।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) ইহাদের কমিশনের হার খুব বেশী ;
(২) এই পদ্ধতিতে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের ব্যয় বেশী।

(ঙ) বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিক্রয় (Sale among Existing Shareholders) ঃ কোন চালু কোম্পানী নূতন শেয়ার অথবা লগ্নিপত্র বিক্রয় করিবার সময় তাহার শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে পারে। যদি তাহারা উহা ক্রয়ে অনিচ্ছুক থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা যায়।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) ইহাতে বিক্রয় ব্যয় খুব কম হয় ;
(২) শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ দ্রুত পাওয়া যায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) ইহাতে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা বেশী ;
(২) বর্তমান শেয়ার-হোল্ডারগণ শেয়ার ক্রয়ে অনাগ্রহী হইতে পারে।

(চ) কর্মীদের মধ্যে লগ্নিপত্র বিক্রয় (Sale among the Employees) ঃ এই পদ্ধতিতে কর্মচারীদের মধ্যে লগ্নিপত্র বিক্রয় করিয়া কোম্পানী মূলধন সংগ্রহ করে।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় ;
(২) ইহাতে কর্মীদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় ;
(৩) ইহাতে বিক্রয় ব্যয় খুব কম হয় ;
(৪) ইহাতে কোম্পানীর প্রতি কর্মীদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) এই পদ্ধতিতে সমস্ত লগ্নিপত্র বিক্রিত হয় না ,
(২) কর্মিগণ লগ্নিপত্র ক্রয়ে অনিচ্ছুক হইতে পারে।

পুরাতন চালু লগ্নিপত্র বিপণন ব্যবস্থা

শেয়ার বাজারের মাধ্যমে লগ্নিপত্র বিক্রয় (Sale through Stock Exchange) ঃ যে সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি পূর্বেই বিক্রিত হইয়াছে উহাদের বিপণন সংগঠিত শেয়ার বাজারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্র

দালালের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আইন ও নিয়ম অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সরকারী কোম্পানী, আধা সরকারী কোম্পানী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সার্বজনিক কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও ঋণপত্র শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত লগ্নিপত্র (Listed Securities) শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহাতে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় ;

(২) এই পদ্ধতিতে লগ্নিপত্র বিক্রয়ের নির্দিষ্ট বাজার পাওয়া যায় ,

(৩) ইহাতে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিবার সুবিধা থাকে ;

(৪) এই পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও লগ্নিপত্র বিক্রয় সম্ভব হয় ,

(৫) শেয়ার বাজারে লগ্নিপত্রের দামের উঠানামার সংকেত পাওয়া যায় ;

(৬) ইহাতে কোম্পানীর সুনাম বৃদ্ধি পায় ;

(৭) ইহা মালিকানা হস্তান্তরের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) এই বাজারে ফাটকা কারবারের অবকাশ থাকে বলিয়া লগ্নিপত্রের দাম অতিরিক্ত উঠানামা করে ,

(২) এই বাজারে দালালের উপর নির্ভর করিয়া লগ্নিপত্র বিক্রয় করিতে হয় ;

(৩) ইহার কাজকর্মের পদ্ধতি বেশ জটিল ,

(৪) লগ্নিপত্র তালিকাভুক্ত করা কষ্টসাধ্য ;

(৫) অসাধু দালালের কবলে পড়িলে বিনিয়োগকারী শোষিত হয়।

মূলধন সংগ্রহের উৎস (Sources of Capital) : সার্বজনিক বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী নিম্নলিখিত উপায়ে দীর্ঘ-মিয়াদী ও স্বল্প-মিয়াদী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে :

(১) শেয়ার বিলির মাধ্যমে (By Issue of Shares) :

নবগঠিত কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বিলিই মূলধনের প্রধান উৎস। ইহাকে প্রথম অবস্থায় শেয়ার বিক্রয় করিয়াই অর্থ-সংস্থান করিতে হয়।

সার্বজনিক বা ব্যাপক মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া শেয়ার বিক্রয় করে, কিন্তু ঘরোয়া বা সীমাবদ্ধ মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানী জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ কোম্পানীর প্রবর্তকগণ নিজেদের মধ্যে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে।

শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের কতকগুলি সুবিধা আছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) শেয়ার-ক্রেতাগণ কোম্পানীর মূলধনের মালিক হয়।

(খ) কারবারী ঝুঁকি (Business Risk) বহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শেয়ার ক্রয় করিতে উৎসাহিত হয়।

(গ) শেয়ার হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কারবারের স্থায়ী মূলধন। কারবারের বিলুপ্তি না ঘটিলে শেয়ারের মূল্য-বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হয় না। তবে একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে। পরিশোধনীয় অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের (Redeemable Preference Share) মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়।

(ঘ) শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থদ্বারা কারবারে যে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয়, তাহা জামিন রাখিয়া স্বল্প-মিয়াদী ঋণের প্রয়োজন মিটান যায়।

(ঙ) শেয়ারের মূল্য অল্প বলিয়া স্বল্প-সঞ্চয়কারীও লাভজনকভাবে তাহার সঞ্চয় খাটাইবার সুযোগ পায়।

(চ) বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকিবাহক হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে।

(২) ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে (By Issue of Debentures) :

পুরাতন কোম্পানী বাজারে সুনাম ও প্রতিষ্ঠাধিকার লাভ করিলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের সুযোগ পায়। নূতন কারবারের পক্ষে প্রথমেই ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয় না। ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হইলে এক নির্দিষ্ট সময়-অন্তে ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। কারবারে মুনাফা হোক বা না হোক ঋণপত্রের উপর চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতেই হয়।

শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমনি ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহের কিছু সুবিধা রহিয়াছে। যেমন—

(ক) কারবারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঋণদাতাগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তাই ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগৃহীত হইলে কারবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ণই থাকে, কিন্তু মূলধনের সংস্থান হয়।

(খ) কারবার ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া যে মূলধন পায় তাহা লাভজনকভাবে খাটাইতে পারিলে সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের অধিক হারে লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, কোম্পানীর আয় বাড়িলেও ঋণের উপর দেয় সুদের হার একই থাকে।

(গ) ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে কারবারের কোন সম্পদ সাধারণতঃ জামিন রাখিতে হয়। এই কারণে বিনিয়োগকারীর আস্থা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অনায়াসে মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

(৩) **জন-আমানত (Public Deposits) :**

ভারতের শিল্প-গঠনের গোড়ার দিকে শিল্পে মূলধন সংস্থানে জন-আমানত এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রবর্তকগণের বন্ধু-বান্ধব, ম্যানেজিং এজেন্টগণের বন্ধু-বান্ধব এবং অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা হইত। বর্তমানে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রসার লাভ করায় জন-আমানতের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অতীতে বস্ত্র, কাগজ, শর্করা (চিনি) প্রভৃতি শিল্পে জন-আমানতের পরিমাণ খুবই অধিক ছিল। আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর অধিকাংশ কাপড়ের কল এইভাবে স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করিত।

তবে এই পদ্ধতিতে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, কোন কারণে পর পর কয়েক বৎসর কোম্পানীর লোকসান হইলে অথবা আর্থিক অবস্থা দুর্বল হইলে আমানতকারী ভীত হইয়া তাহাদের আমানত তুলিয়া লইবার জন্য আগ্রহী হয়। ফলে তাহাদের আমানত ফেরত দিবার জন্য কোম্পানীকে অনেক সময় তাহার স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। ইহাতে কোম্পানী উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) **ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নিকট হইতে সংগৃহীত মূলধন (Capital Supplied by Managing Agents) :**

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার গোড়ার দিকে যখন মূলধনের বাজার (Capital Market সংগঠিত হয় নাই, যখন ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা অনুন্নত ও অনগ্রসর ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের স্পৃহা জন্মায় নাই, তখন ম্যানেজিং এজেন্টদের উপরই যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মূলধন যোগাইবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইত। ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাদের ব্যবস্থাপনাধীন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিত। পরবর্তীকালে নানা কারণে কোম্পানীর মূলধন সংস্থানে তাহাদের ভূমিকার গুরুত্ব কমিয়া যায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল হইতে এই প্রথা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৫) **ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ (Financing by Bank) :**

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের (Commercial Bank) পক্ষে কোম্পানীর শেয়ার অথবা ঋণপত্র (Debenture) ক্রয় করিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন যোগান সম্ভব নহে। কারণ, তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে যে আমানত গ্রহণ করে তাহা দাবিমাত্র পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। তবে সকল আমানতকারী একই সময়ে আমানত ফেরত দাবি করে না, এইজন্য আমানতের অর্থ ব্যাঙ্ক স্বল্প-মিয়াদী ঋণে খাটাইয়া থাকে। কোম্পানীসমূহের স্বল্প-মিয়াদী মূলধন যোগাইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিল্পীয় ব্যাঙ্কও (Industrial Banks) যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। শিল্পীয় ব্যাঙ্কসমূহ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীতে শেয়ার ক্রয় করিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করে।

(৬) সরকারী অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions set-up by the Government) ঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে শিল্পীয় ব্যাঙ্ক ও দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প ও বৃহদায়তন কারবারের মূলধন সংগ্রহে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ভারতে স্বাধীনতালাভের পর শিল্প ও বৃহদায়তন কারবারের দীর্ঘ-মিয়াদী মূলধন সংস্থানে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী উদ্যোগে এবং মালিকানায় কতকগুলি অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Institutions) স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করিয়া, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিয়া (অবলেখন) এবং কোম্পানীর সম্পদ ও সম্পত্তি জামানত রাখিয়া দীর্ঘ মিয়াদী ও মধ্য-মিয়াদী মূলধন যোগাইয়া থাকে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, ন্যাশানাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড্ ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক—ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৭) মুনাফা পুনর্বিনিয়োগকরণ (Ploughing Back of Profits) ঃ

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী যে মুনাফা অর্জন করে উহা শেয়ার-হোল্ডারগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু নীতিগতভাবে মুনাফার সবটাই শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। ভবিষ্যতে কারবারের প্রয়োজন অনুসারে যাহাতে অর্থের সংস্থান হয় সেই উদ্দেশ্যে অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং উহা কারবারের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রকার অর্থ-সংস্থানের পদ্ধতিকে স্বয়ং-ক্রিয় বা স্বীয় অর্থ সংস্থান (Auto-financing or Self-financing), অভ্যন্তরীণ অর্থ-সংস্থান (Internal Financing), মুনাফা বিনিয়োগ (Ploughing Back of Profit) ইত্যাদি নানা নামে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর অর্থ-সংস্থানে এই পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং সরকারও এই পদ্ধতিতে অর্থ-সংস্থানের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন।

(৮) আন্তর্জাতিক ঋণ (International Loans) ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠনের জন্য এবং আর্থিক দিক হইতে অনুন্নত দেশসমূহের শিল্প সম্প্রসারণের জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থ-সংস্থান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের (United Nations) সদস্য-দেশের কোনও শিল্প অথবা বৃহদায়তন কোম্পানী প্রয়োজনবোধে এই সংস্থা হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে রাষ্ট্রে শিল্প-কারবারটি অথবা কোম্পানীটি অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের সরকারকে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সম্প্রতি টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক

(International Bank for Development and Reconstruction or World Bank) হইতে ইহার সম্প্রসারণের জন্য এক কোটি টাকার আর্থিক ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

দীর্ঘ-মিয়াদী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions rendering Long-Term Finance)

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া (IFCI):

ইহা একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন হিসাবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত ও আদায়ীকৃত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর এই সংস্থাটি উহার অধীনস্থ (Subsidiary) প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (Objectives and Functions):

(১) আই এফ সি আই বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘ ও মাঝাবি মিয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত হইয়াছে।

(২) ইহা কেবল সার্বজনিক কোম্পানী ও সমবায় সমিতিকে ঋণ দেয়।

(৩) দ্রব্য উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, জাহাজী কারবারে, খনিজ শিল্পে, হোটেল পরিচালনা, বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদন এবং পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ দেয়।

(৪) আই এফ সি আই অনধিক ২৫ বছরের জন্য সম্পত্তির জামিনে অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া ঋণ প্রদান করে।

(৫) ইহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে।

(৬) ইহা দায়গ্রাহকের কাজ করে।

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন অন্যসূত্র হইতে ঋণ নেয় তখন ইহা ঐ ঋণ পরিশোধের প্রত্যাভূতি বা গ্যারাণ্টি দিতে পারে।

(৮) ঋণ গ্রহণের সময় কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া ইহা প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া (NIDCI):

ইহা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধিকৃত সংস্থা।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

(১) অর্থ সংস্থান ও পরিকল্পিত শিল্পোন্নতিতে অর্থের যোগান দিবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হয়।

(২) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় পুঁজি ও অন্যান্য সাহায্য করা।

(৩) জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপনে পুঁজির সংস্থান করা।

কার্যাবলী (Functions) :

ইহার প্রধান কার্যাবলী হইল :

(ক) নূতন শিল্প গঠনে এবং নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদনে অর্থ সাহায্য করা ;

(খ) ইহার অধীন কারিগরি উপদেশাত্মক সংস্থার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি উপদেশ দান করা ;

(গ) কতকগুলি বিশেষ শিল্পকে যেমন, কার্পাস, পাট, মেসিন টুলস্ ইত্যাদি শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ সাহায্য করা ;

(ঘ) দেশে ও বিদেশে কারিগরি কার্যকলাপ বিস্তার করা।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া (ICICI) :

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের সমর্থনে, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অংশীদারীতে ইহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১৫ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (Objectives and Functions) :

(১) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তাহাদের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের জন্য ঋণদান করে ;

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশগ্রহণে উৎসাহদান করা ;

(৩) শিল্প বিনিয়োগে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা ;

(৪) পুঁজির বাজার সম্প্রসারণ করা ,

(৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা ;

(৬) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করা ;

(৭) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্যসূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার সময় প্রত্যাভূতি বা গ্যারাণ্টি প্রদান করা ;

(৮) পুনর্বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংস্থান করা ;

(৯) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবস্থাপনাগত, কারিগরি ও প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দান করা।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (IDBI) :

পূর্বে ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় মিয়াদী ঋণদান সংস্থাসমূহ যে ঋণ দিত তাহা যথেষ্ট নহে। উপরন্তু ইহাদের মধ্যে সংযোজনারও অভাব ছিল। ইহাদের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সংযোজনা আনিবার জন্য এবং নূতন শিল্প স্থাপনে উৎসাহদান করিবার জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে IDBI একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন-রূপে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা। ইহার অনুমোদিত পুঁজি ৫০ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

কার্যক্ষেত্র (Fields of Operation) : সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা পণ্য উৎপাদনকারী, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারবার, জাহাজ পরিবহণ, হোটেল ইত্যাদি কারবারে ইহা ঋণ দান করে। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ দান করিয়াছে।

কার্যাবলী (Functions) :

(১) ইহা প্রত্যক্ষ ঋণদান করিতে পারে, কোন সংস্থার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় এবং উহা বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

(২) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃ অর্থ-সংস্থান করিতে পারে।

(৩) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের প্রত্যাভূতি দিতে পারে।

(৪) ইহা কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার অবলেখন (Underwriting) করিতে পারে।

(৫) ইহা উন্নয়ন সাহায্য তহবিল (Development Assistance Fund) গঠন করিয়া অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে অর্থ সাহায্য করে।

(৬) ইহা বিনিয়োগের বাজার সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে গবেষণা করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও প্রশাসনিক পরামর্শ দান করে।

স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (SFC) :

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সরকারগুলিকে একটি করিয়া স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া ভারতীয় লোকসভা স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন অ্যাক্ট পাশ করে। বর্তমানে এইরূপ ১৮টি কর্পোরেশন আছে। ইহাদের পুঁজির পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ হইতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (Objectives and Functions) :

(১) এস এফ সি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাঝারি ও দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণের সংস্থান করে ;

(২) সরকারী ও বেসরকারী লগ্নিপত্র বা সিকিউরিটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির জামিনে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া ইহা অনধিক ২০ বৎসরের জন্য প্রত্যক্ষ ঋণ দেয় ,

(৩) ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইয়া ঋণ গ্রহণের সময়ে প্রত্যাভূতি বা গ্যারান্টি দেয় ;

(৪) ইহা দায়গ্রাহকের কাজ করে।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) ঃ

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ফ্রফ্‌ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠন করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ইহার ৪টি শাখা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে সেই সকল শিল্প বুঝায়, যাহাদের মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যেখানে ইহা বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক সেখানে মূলধন ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যে এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। ইহার মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ভারত সরকার ইহার সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করিয়াছেন। প্রয়োজনে ভারত সরকার ইহাকে অতিরিক্ত মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। ইহা একটি সরকারী লিমিটেড কোম্পানী।

কার্যাবলী (Functions) ঃ

(১) ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে অর্ডার বা ফরমাশ সংগ্রহ করা।

(২) চলমান বিক্রয়ব্রতী মোটর গাড়ীর (Mobile Sale, Van) সহায়তায় অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণনের (Marketing) ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিপণন-ব্যবস্থা করা

(৩) ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক শর্তে এবং ঠিকা সওদা বা ভাড়া ক্রয় (Hire Purchase) ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

(৪) বৃহৎ শিল্পের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র শিল্প (Feeder) স্থাপনের চেষ্টা করা।

(৫) শিল্প-মহল (Industrial Estates) নির্মাণ ও ব্যবস্থা করা। ওখ্‌লা ও নৈনিতে এই প্রকার দুইটি শিল্প-মহল নির্মিত হইয়াছে।

(৬) প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং কনট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করিবার জন্য কনট্রাক্ট অবলেখন (Underwriting) করা।

(৭) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। রাজকোট, ওখ্‌লা ও হাওড়াতে এইরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

(৮) ক্ষুদ্র শিল্পের পণ্য-বিপণন কার্যকে সুগম করিবার জন্য পণ্যাগার (Warehouse) স্থাপন করা।

ভারতের শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন (Industrial Reconstruction Corporation of India) ঃ

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ টাকা এবং বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

(১) অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্ত করা,

(২) রুগ্ণ ও দুর্বল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাঁচামাল, বাজার ইত্যাদি সাহায্য দিয়া পুনর্গঠন করা।

কার্যাবলী (Functions) ঃ

(১) রুগ্ণ ও দুর্দশাগ্রস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ করা,

(২) পরিবহণ, কাঁচামাল সরবরাহ, বিপণন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা,

(৩) আর্থিক সাহায্য ও ঋণের জন্য জামিন দেওয়া,

(৪) এই কর্পোরেশন সাধারণতঃ বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি শিল্প এবং ঢালাই শিল্পের রুগ্ণ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত থাকে।

পুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন (Refinance Corporation) ঃ

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ যদি কোন ব্যাঙ্ক মাঝারি আয়তনের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নাতিদীর্ঘ কালের জন্য ঋণ প্রদান করে, তবে উক্ত ব্যাঙ্ককে ঐ পরিমাণ অর্থ এই কর্পোরেশন ঋণ হিসাবে দেয়।

কার্যাবলী (Functions) ঃ (১) ইহা ব্যাঙ্ক মারফত মাঝারি আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।

(২) ইহা প্রত্যক্ষভাবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় না।

(৩) ইহা নাতিদীর্ঘকালের জন্য ৩ হইতে ৭ বছরের জন্য ঋণ দেয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থের সংস্থান (Financing of Trade) ঃ

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারে, আবার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা হইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পমিয়াদী ঋণের প্রয়োজন অধিকতর। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ করে—

(ক) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করে। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে হইলে ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকার দ্রব্য জামিন হিসাবে রাখিতে হয়। জামিনের মূল্য ও ঋণের পরিমাণের মধ্যে যে পার্থক্য রাখা হয়, তাহাকে **মার্জিন (Margin)**

বলে। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ঋণের ঝুঁকি কমাইবার জন্য ২০ হইতে ৩০ শতাংশ মার্জিন রাখিয়া ঋণ দেয়। যে সম্পদ ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য জামানত (Security) হিসাবে রাখা হয়, মক্কেল সময়মত ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্ক সেই জামানত বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইতে পারে। যে দ্রব্য ব্যাঙ্কের নিকট জামানত হিসাবে রাখা হয় সেই দ্রব্যে মক্কেলের মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে উহা জামানত হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণক দলিলপত্রাদি ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। মনে করা যাক, কেহ জমি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে। সে ক্ষেত্রে জমির মালিকানা-স্বত্ব প্রমাণক দলিল ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। নির্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্কের বন্ধকী জমি বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে। ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে মক্কেলকে ঋণ প্রদান করে :

(১) **অধিবিকর্ষ বা জমাতিরিক্ত গ্রহণ (Overdraft)**ঃ সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে যে অর্থ জমা থাকে তাহার অধিক অর্থ কখনও ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায় না, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্ক মক্কেলকে জমার অতিরিক্ত অর্থ তুলিবার অধিকার দিতে পারে। যদি ব্যাঙ্ক চলতি হিসাব হইতে অতিরিক্ত অর্থ তুলিবার অধিকার দেয়, তাহা হইলে উহাকে অধিবিকর্ষ (**Overdraft**) বলে। ইহার পরিমাণ অল্প এবং পরিশোধের সময়ও স্বল্প।

অধিবিকর্ষ দ্বারা ঋণ লইতে হইলে পূর্বেই ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থের অধিবিকর্ষের অধিকার দেয় মক্কেল নিজের হিসাবেই চেক কাটিয়া সেই পরিমাণ অর্থ তুলিয়া লইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যত টাকা তোলা হয় তাহার উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে জামিন না লইয়াও এই সুযোগ দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগত জামিনেও এইরূপ সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) **রোক ঋণ (Cash Credit)**ঃ ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ী এইরূপ ঋণ লইয়া থাকে। এইরূপ ঋণ ব্যাঙ্ক ও ঋণ-গ্রহীতার মধ্যে চুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ-গ্রহীতাকে দেওয়া হয়। ঋণের টাকা ঋণ-গ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা থাকে এবং ঋণ-গ্রহীতা প্রয়োজন অনুসারে চেক কাটিয়া উহা তুলিতে পারে। রোক ঋণে যে টাকা প্রকৃত তোলা হয় তাহারই উপর ব্যাঙ্ক সুদ দাবী করে। পরিশোধিত ঋণ পুনরায় ঋণ হিসাবে রোক ঋণ হিসাব (Cash Credit Account) হইতে তোলা যায়।

(৩) **ব্যাঙ্ক লোন বা ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank Loan)**: আমানতকারী ইচ্ছা করিলে অধিবিকর্ষ ব্যবস্থা না করিয়া সরাসরি ঋণের আবেদন করিতে পারে। ঋণ মঞ্জুর করিবার পূর্বে ব্যাঙ্ক ঋণের অর্থ পরিমিত জামানত লইয়া থাকে। চুক্তির শর্ত অনুসারে মক্কেল ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্ক জামানত বিক্রয় করিয়া ঋণের অর্থ আদায় করে। ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে ঋণ মঞ্জুর করা হইল সেই ঋণের অর্থ যদি মক্কেল নাও তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও যে সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে সেই সময়ের জন্য সুদ দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধের

শর্ত স্থির করিয়া ঋণ-গ্রহীতা ব্যাঙ্কের সহিত একটি চুক্তি করিবে। এইরূপ ঋণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য লওয়া হয়।

(৪) **অগ্রিম (Advance)** ঃ বিলের টাকা আদায় বা সংগ্রহার্থে ব্যাঙ্কের নিকট বিল জমা দিলে ব্যাঙ্ক বিলদাতাকে অগ্রিম অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে ঋণ দেয়।

(৫) বাট্টা দিয়া হুণ্ডি ভাঙানো (Discounting Bill) ঃ হুণ্ডির মিযাদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্ক অনুত্তীর্ণ সময়েব জন্য বাট্টা (Discount) লইয়া নগদ টাকা প্রদান করে। ইহাও ঋণপ্রদানের একটি পদ্ধতি।

(৬) **ঋণের প্রত্যয়নপত্র (Letter of Credit)** ঃ ঋণের প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমেও ব্যাঙ্ক আমদানিকারককে ঋণ প্রদান করে।

(৭) **বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় (Purchase and Sale of Foreign Currency)** ঃ অনেক ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রাব লেনদেন করে এবং বিদেশী আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থের আদান-প্রদানে সহায়তা করে

(খ) **বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Banks)** ঃ ইহাবা বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করে, বৈদেশিক মুদ্রাব বিনিময় করে, আমদানি ও রপ্তানিকারকেব প্রতিনিধিত্ব করে, ঋণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে, বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বীকৃতি দেয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টাকরণ কবিয়া রপ্তানিকারককে মূল্য প্রদান করে।

(গ) **ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India)** ঃ

এ ডি. গবওয়ালাব নেতৃত্বে গঠিত 'অল্ ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি'র সুপারিশ অনুসারে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক' জাতীয়করণ করা হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই। জাতীয়করণের পর ইহার নাম হয় 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'।

কার্যাবলী (Functions) ঃ স্টেট ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজ** ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণ সরবরাহ করা ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। ইহা সর্বোচ্চ ১০ বৎসরের মিয়াদী ঋণ প্রদান করিবার অধিকারী।

(২) **গ্রামীণ ঋণদান** ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করে। গ্রামাঞ্চলে ঋণ-ব্যবস্থার প্রসার, গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত করা, সমবায় ও ঋণদান সমিতিসমূহকে অধিক ঋণ মঞ্জুর, সমবায় বিক্রয় সমিতিসমূহকে ঋণদান, কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-ঋণ প্রদান, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহকে আর্থিক ও অর্থপ্রেরণের সুযোগ দান ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান** ঃ ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্টেট ব্যাঙ্ক স্বয়ং অথবা 'স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন'-এর

মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সরবরাহ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট ব্যাঙ্ক পথ-নির্দেশক পরিকল্পনা (Pilot Scheme) প্রবর্তন করে। স্টেট ব্যাঙ্ক অন্যান্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্পকে এই পরিকল্পনা অনুসারে ঋণদান করে। উদার ঋণনীতি (Liberalised Credit Scheme) অনুসারে স্টেট ব্যাঙ্ক অন্যান্য ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য-কলাপের সংযোজনা (Co-ordination) করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করিয়াছে। ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ১২% এবং শর্তসমূহ সহজ করিয়া ইহা ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সম্প্রসারণ-নীতিকে রূপায়িত করিতেছে।

(ঘ) দেশীয় ব্যাঙ্কার (**Indigenous Bankers**): দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, মহাজন, শ্রফ, শ্রেষ্ঠী, সাহুকর ইত্যাদি। ইহারা গ্রামাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যকে চড়া সুদে ঋণ দান করে। শহরাঞ্চলেও ইহাদের কারবার প্রসারিত।

(ঙ) সমবায় ব্যাঙ্ক (**Co-operative Banks**): কোন অঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ী, উৎপাদক, কৃষক প্রভৃতি ইহাদের নিকট হইতে কম সুদে ঋণ পাইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাঙ্ক শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই দেখা যায়। তবে ইহারা মোট প্রয়োজনীয় ঋণের সামান্যই সরবরাহ করে।

(চ) স্বীকৃতিদানের প্রতিষ্ঠান (**Acceptance Firms**): ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারকের হইয়া হুণ্ডি স্বীকার করে। ফলে রপ্তানিকারক মূল্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এই হুণ্ডি ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায়। রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ-সংক্রান্ত লেনদেনে ইহারা বিশেষ সাহায্য করে।

(ছ) রপ্তানি ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (**Export Credit and Guarantee Corporation**): এই কর্পোরেশন রপ্তানি বাণিজ্যের বাণিজ্যিক ঝুঁকি যেমন, মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি যেমন, যুদ্ধ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন ইত্যাদি বহন করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যে সাহায্য করে।

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital): যে সকল কারণে ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা দুর্বল হইয়াছে তাহার মধ্যে মূলধন এবং কারিগরি বিদ্যার অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে মাথাপিছু আয়ের হার খুব কম। ইহার ফলস্বরূপ মাথাপিছু সঞ্চয় খুবই কম। সঞ্চয় না হইলে মূলধন সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ভারতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নিজস্ব সঞ্চয় দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই ভারতের পক্ষে বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital) আমদানি না করিয়া উপায় নাই।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে বৃহদায়তন শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থা গঠনে বৈদেশিক মূলধনের অবদান প্রচুর। বস্তুতঃ বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত ভারতের বৃহদায়তন শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের গঠন অসম্ভব ছিল। ভারতের চা-শিল্প, শর্করা-শিল্প, পাট-শিল্প, রেলগাড়ী ও জ

ন
হর
onal
for
সহকারী

নির্মাণ-শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বৈদেশিক মূলধন লগ্নিকারিগণ দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বৈদেশিক মূলধন বহু কারণেই প্রয়োজন। তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

প্রথমতঃ, দেশের অভ্যন্তরীণ মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং বৈদেশিক মূলধন আনয়ন করিয়া মূলধনের ঘাটতি পূরণ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে কারবারী অভিজ্ঞতাও কম। বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তিগণ সঠিক মূলধন বিনিয়োগের পথ-নির্দেশ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, উন্নতকামী দেশে বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয় থাকিতে পারে। কিন্তু সেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ আর্থিক কার্যের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে। আর্থিক কার্যের গতি দ্রুত হইলে সঞ্চয় বিনিয়োগের গতিও বাড়ে। আমাদের দেশে বৈদেশিক মূলধন আর্থিক কার্যকলাপের গতি দ্রুততর করিতে সাহায্য করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির প্রথম পর্যায়ে মূলধনের বাজার (Capital Market) সুসংহত থাকে না। ফলে যে সকল কর্ম-পরিকল্পনায় মূলধনের প্রয়োজন সেই সকল ক্ষেত্রে মূলধনের সংস্থান সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক ভিত্তিতে বৈদেশিক মূলধনের আগমনকে স্বাগত জানান হয়। ভারতে মূলধনের বাজার এখনও যথেষ্ট সুসংহত নহে; ফলে যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা সঠিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির সহায়ক, সেই সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অভাব দেখা যায়। বৈদেশিক মূলধন এই অভাব সাময়িকভাবে দূর করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য কারিগরি বিদ্যা, কারবারী অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান মূলধনস্বরূপ প্রয়োজন। ভারতে কারিগরি জ্ঞান, কারবারী অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে এই সকল অভাব দূর করা সম্ভব।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বৈদেশিক মূলধন সাধারণতঃ কোম্পানীর শেয়ার এবং ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত হইত। ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহণ (রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি) ব্যবসা বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হইয়াছিল। বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্রিটিশ মূলধন। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহও ভারতে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগ আরম্ভ করে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকারই ভারত শাসন করিবার অধিকারী ছিল, সেইহেতু ব্রিটিশ নাগরিকগণই ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রাধিকার পাইয়াছিল।

স্বাধীনতালাভের পর বৈদেশিক মূলধনের প্রতি ভারত সরকারের নীতি কি হইবে উহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, ভারত যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং উন্নতির মধ্যে বৈদেশিক মূলধনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নহে। ফলে বিদেশের লগ্নিকারকদের মনে এমন ধারণা হইয়াছিল যে, ভারতে আর মূলধন বিনিয়োগ করা নিরাপদ নহে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণা দ্বারা বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণকে এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে—(১) ভারতের শিল্পনীতিতে বৈদেশিক সংস্থার উপর কোনও প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। (২) দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া বৈদেশিক লগ্নিকারীদের নিজ নিজ দেশে মুনাফা প্রেরণ এবং মূলধন ফেরত লওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। (৩) অদূর-ভবিষ্যতে বৈদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ জাতীয়করণের সম্ভাবনা নাই। যদি কোনও বৈদেশিক ব্যবসা সংস্থা জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে উহার মালিকগণকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পথ অনেকটা সুগম হয়।

বর্তমানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের যে কয়টি ধারা আছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **সরাসরি ঝুঁকি বিনিয়োগ (Direct Entreprenural Investment) :** এই পদ্ধতিতে বিদেশের বিনিয়োগকারী নিজেদের যৌথ-কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে উহার শাখা অথবা সম্পূরক (Subsidiary) সংস্থা স্থাপন করে। শাখা অথবা সম্পূরক কোম্পানী ভারতে ব্যবসা করে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের কোম্পানী আইনের অধীনেও ঐ কিন্তার কোম্পানী নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে।

(২) **বৈদেশিক সহযোগিতা (Foreign Collaboration) :** অধুনা বৈদেশিক সহযোগিতার মাধ্যমেও বৈদেশিক বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক সহযোগিতাকেও আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—বেসরকারীভাবে বৈদেশিক ও দেশীয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সহযোগিতায় কোম্পানী গঠন। উদাহরণস্বরূপ Voltas, Sen-Raleigh, Birla-Nuffield, Tata, ICI ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক সংস্থা এবং ভারত সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা—যেমন, Rourkela Steel, Durgapur Steel Plant ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক এবং ভারত সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় শিল্প গঠন—যেমন, Bokaro Steel Ltd.

(৩) **আন্তঃ সরকার ঋণ (Inter-Government Loan) :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশসমূহের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে উন্নত দেশ কর্তৃক সরাসরি ঋণ এবং সাহায্য দান করিবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। Marshall Aid পরিকল্পনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশসমূহকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দান করিয়াছে। বর্তমানেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশসমূহের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রভূত সাহায্য করিতেছে।

(৪) **আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে ঋণ (Loan From International Institutions) :** ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া International Bank for Reconstruction and Development অর্থাৎ World Bank এবং ইহার সহকারী সংস্থাসমূহ অনুন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ দিতেছে।

বৈদেশিক মূলধনের বিপক্ষে কিছু যুক্তি আছে ; যেমন—

(১) ইহাতে বৈদেশিক স্বার্থ ও কর্তৃত্ব প্রাধান্যলাভ করে, ফলে দেশীয় স্বার্থের হানি হয়।

(২) সুদ ও মুনাফা হিসাবে প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়।

(৩) মূল শিল্পগুলি বিদেশী শিল্পপতিগণের কর্তৃত্বে চলিয়া যায় এবং দেশের স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হইতে পারে।

(৪) বিদেশীরা কারিগরি বিদ্যা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, ফলে দেশের কারিগরি জ্ঞান উন্নত হয় না।

(৫) ইহা কারবারের ক্ষেত্রে অবৈধ বিবাহ (Illegitimate Marriage) বলিয়া সমালোচনা করা হয়।

বৈদেশিক সহযোগিতার বিশ্লেষণ (Analysis of Foreign Collaboration) :

বৈদেশিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য যে সকল চুক্তি করা হইয়াছে উহার মধ্যে ৮৭৭টি কোম্পানী বেসরকারী আওতায় (Private Sector) অন্তর্ভুক্ত। উহার মধ্যে ১৯৭টি বিদেশী কোম্পানীর সম্পূরক (Subsidiary) হিসাবে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে। ৪৩৭টি ক্ষেত্রে বৈদেশিক লগ্নিকারীদের শেয়ার-সংখ্যা অর্ধেকের কম। ইহারা সংখ্যাল্প অধিকার (Minority Right) অনুসারে অংশগ্রহণ করে এবং ২৫৭টি ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতার জন্য কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি ক্ষেত্রে কারবারিগণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভারতে শিল্প-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই উদ্দেশ্য। যে সকল সংস্থা কারিগরি সহযোগিতার জন্য স্থাপিত হইয়াছে তাহারা কারিগরি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হস্তান্তর করিবার জন্য **অধিকার ভাগদেয়** (Royalty) পাইয়া থাকে। কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে বিদেশ হইতে Patent Right, Models ইত্যাদি আমদানি করা হয়। কারিগরি সহযোগিতায় চুক্তিবদ্ধ কোম্পানী ভারতের কিছু শিক্ষার্থীকে নিজ দেশে প্রেরণ করিয়া কারিগরি শিক্ষা দিয়া থাকে।

ভারতে মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্পে বৈদ্যুতিক-শিল্পে, কাঁচ-শিল্পে, সিমেন্ট-শিল্পে, ঘড়ি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্পে, ইস্পাত-শিল্পে এইরূপ বৈদেশিক সহযোগিতার নিদর্শন রহিয়াছে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন এক্ষেত্রে বৈদেশিক সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দুস্থান মোটরস, সেন র‍্যালে, হিন্দুস্থান সিনথেটিক্স গ্লাস ওয়ার্কস, দুর্গাপুর রাউরকেলা ও ভিলাই ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি বৈদেশিক সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহ হইতে ভারতে বৈদেশিক সহযোগিতা আসিতেছে। ইহার ফলে ভারত কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে সাহায্যপুষ্ট হইতেছে।

কারিগরি সহযোগিতায় আবার কেবল পরামর্শ দান করিবার জন্যও কোম্পানী গঠন করা হয়। উহাদের বলা হয় পরামর্শদাতা সংস্থা (Consultancy Firms)। ইহাদের কাজ শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থায় বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টন-বিষয়ক পরামর্শ দান করা। পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের পারিশ্রমিক দিতে হয়।

পরামর্শ ও উপদেশাত্মক সংস্থা (Consultancy Firm) ঃ

কোন কোন কাজে উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও কলাকুশলতার প্রয়োজন হয়। দেশীয় সম্পদ ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য তখন বিদেশী কোন সংস্থার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করা হয়। যে সংস্থা কোন প্রকল্প রূপায়ণে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া সাহায্য করে, তাহাকে **পরামর্শ বা উপদেশাত্মক সংস্থা** বলে। যেমন, কলিকাতার পাতাল রেলের পরিকল্পনা ও নির্মাণে বিদেশী সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল সংস্থা অর্থের বিনিময়ে উপদেশ দেয়। ইহাদের প্রদত্ত উন্নত কারিগরি ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উপদেশে প্রকল্পের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপদেশাত্মক সংস্থা বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়ের "সংগঠন ও পদ্ধতি" (Organisation and Methods) পর্যালোচনা করিয়া উন্নততর সংগঠন-ব্যবস্থা ও কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকে।

পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী-প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। ম্যানেজিং এজেন্টগণ ব্যবসা প্রবর্তন, অর্থ-সংস্থান ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ দান করিত। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্টগণ ভারতীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কলা-কৌশল আমদানি করে। বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেন্টগণের দক্ষ পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহাদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগে ভারত সরকার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল হইতে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী-প্রথা ও সেক্রেটারীজ এণ্ড ট্রেজারার্স প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটান। ফলে ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার শূন্যস্থান পূরণ করিবার প্রয়োজনে পরামর্শকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হইয়াছে। ইহারা দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দান করে।

লাভলক লুইস, এবিসি কন্সালটেন্টস্, ইবকন, এ. এফ্. ফারগুসন এসোসিয়েটস্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরামর্শ ও উপদেশাত্মক সংস্থার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
(Production Management)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও কার্যাবলী (**Nature and Functions of Production Management**) ঃ

শিল্প-বিপ্লবের উত্তরকালে উৎপাদন পদ্ধতিতে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বের ন্যায় সহজ পদ্ধতিতে এখন আর উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না। উৎপাদনকে প্রতিযোগিতামূলক করিয়া তুলিতে হয়, কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে না পারিলে উৎপাদন লাভজনক হয় না। কাঁচামাল সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া মূলধন শ্রমিক, সংগঠন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি উপকরণের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কার্য করিতে হয়। উৎপাদন বলিতে দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টির মাধ্যমে উপযোগিতা সৃষ্টি করাকে বুঝায়। উৎপাদন কাঁচামাল শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠনের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া রূপগত বা আকারগত উপযোগিতা (Form Utility) সৃষ্টি করে।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলি হইল—কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন, সংগঠন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি, বাজার ইত্যাদি। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া সঠিক সময়ে সর্বনিম্ন ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদনের পদ্ধতিকে **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা** বলে। বুফা (**Buffa**)-র মতে, "উৎপাদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বলে, যাহাতে মান অনুযায়ী সর্বনিম্ন ব্যয়ে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন সম্ভব হয়।"

উৎপাদন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী (**Functions of Production Manager**) ঃ

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মূলতঃ দুইটি ক্ষেত্র আছে—(ক) উৎপাদনের **নক্শা ও পরিকল্পনা** (Production Design and Planning) এবং (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার **নিয়ন্ত্রণ** (Control of Production System)।

উৎপাদন নক্শা ও পরিকল্পনা রচনার জন্য বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তগুলি হইল ঃ

(১) উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া নির্বাচন করা ;

(২) দ্রব্য উৎপাদনের নক্শা এবং প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করা ,

(৩) বিভিন্ন উৎপাদন কার্যের নক্শা ও সংগঠন করা ;

(৪) উৎপাদনের সুবিধা পাইবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা ;

(৫) উৎপাদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলীর সুবিধা-বিন্যাস (Facility Layout করা, ইত্যাদি।

উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি হইল :

(১) সম্ভার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ,
(২) যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ,
(৩) উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ ,
(৪) শ্রম নিয়ন্ত্রণ ,
(৫) উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন (Size of Production Unit) :

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে কারখানা, প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিম্নে কারখানা, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের আলোচনা করা হইল :

কারখানা (Plant) : যে নির্দিষ্ট স্থানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাইবার জন্য যন্ত্রপাতির বিন্যাস (Layout) করা হয় এবং শ্রমিক-কর্মচারী ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কার্য ধারাবাহিকভাবে চলে তাহাকে কারখানা বলে। যেমন, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা।

প্রতিষ্ঠান (Firm) : যে সংস্থা উৎপাদন কার্যের পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন, ন্যাশনাল জুট কোম্পানী।

শিল্প (Industry) : একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত রূপকে শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও উহার রূপান্তরের মাধ্যমে **গঠন বা আকারগত উপযোগ** (Shape Utility) সৃষ্টি করা শিল্পের উদ্দেশ্য। যেমন, পাট শিল্প।

কারখানা ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

কারখানা	শিল্প
(১) ইহা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হয়।	(১) ইহা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শিল্পীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়।
(২) কারখানার উদ্দেশ্য হইল দ্রব্য উৎপাদন করা।	(২) কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উহার রূপান্তরের মাধ্যমে গঠন বা আকারগত উপযোগ সৃষ্টি করা শিল্পের উদ্দেশ্য।
(৩) কারখানা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য হইতে পারে।	(৩) শিল্প বলিতে এক জাতীয় দ্রব্যের সমন্বয়কে বুঝায়।
(৪) উদাহরণ—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা।	(৪) উদাহরণ—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।
(৫) ইহার ধারণা ব্যষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে (Micro Approach) ব্যবহৃত হয়।	(৫) ইহার ধারণা সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে (Macro Approach) ব্যবহৃত হয়

আয়তন অনুসারে কারবারী প্রতিষ্ঠানের সরকারী শ্রেণীবিভাগ (Official Classification of Business Units According to Size) ঃ

কারবারের আয়তন স্থির করিতে কোনও একটি নীতি গ্রহণ করা যায় না। মূলধন, শ্রমিকসংখ্যা, উৎপাদনের পরিমাণ, বাজার ইত্যাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া কারবার ছোট, মাঝারি কিংবা বড়—এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কারবার ছোট, মাঝারি, বড় অনুসারে সরকারী নিয়ম-কানুনের আওতায় আসে। কর-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আবার, শ্রমিক-সংক্রান্ত আইন-কানুনও কারবারের আয়তন অনুসারে প্রযোজ্য। কোন কোন আইন—যেমন, কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা আইন—যে সকল কারবারে অনধিক ২০ জন শ্রমিক কাজ করে, সেখানে প্রযোজ্য নহে। বড় বড় কারবারের উপর করের হার ক্ষুদ্র কারবারের উপর করের হার অপেক্ষা অধিক। সুতরাং সরকারের আইন প্রয়োগে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

সরকারী নীতি অনুযায়ী বর্তমানে মূলধনই কারবারের আয়তন নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে ধরা হইয়াছে। কারবারী প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) **অতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রের কারবার (Tiny Sector Business) ঃ** জনতা সরকারের ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি অনুযায়ী যে সকল শিল্পে স্থায়ী মূলধনের (Fixed Capital) বিনিয়োগ ১ **লক্ষ** টাকার বেশী নহে, তাহাদের অতিক্ষুদ্র কারবার বলে।

(২) **ক্ষুদ্রায়তন কারবার (Small Sized Business) ঃ** ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের পর হইতে যে সকল কারবারের স্থির মূলধন ৩৫ **লক্ষ** টাকার অনধিক, সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র কারবার বলা হয়।

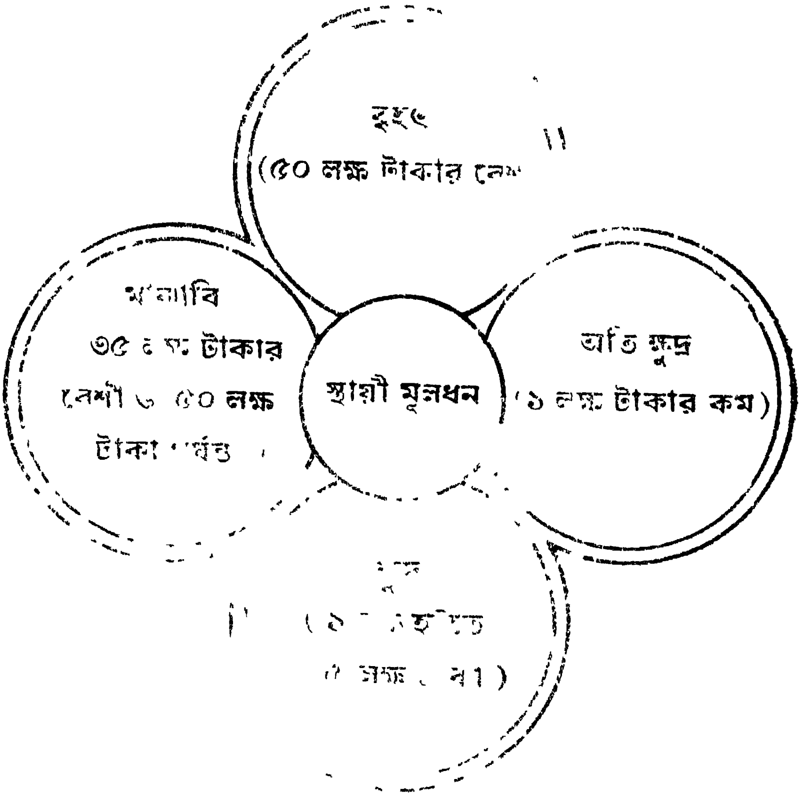
কিন্তু **বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক সংস্থার ক্ষেত্রে** ১৫ **লক্ষ** টাকা হইতে ৪৫ **লক্ষ** টাকার স্থির মূলধনী কারবার ক্ষুদ্রায়তন কারবারের আওতায় স্থান পাইয়াছে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে **বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক কারবার (Anciliary Business)** বলে।

(৩) **মাঝারি আয়তন কারবার (Medium Sized Business) ঃ** যে কারবারের স্থির মূলধনের পরিমাণ ৩৫ **লক্ষ** টাকার অধিক কিন্তু ৫০ **লক্ষ** টাকার অনধিক, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে সেই সকল কারবারকে মাঝারি আয়তনের কারবার বলে কারবারের মূলধনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়।

(৪) **বৃহদায়তন কারবার (Large Sized Business) ঃ** ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন ৫০ **লক্ষ** টাকার অধিক, সেই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানকে বৃহদাকার কারবারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা হইয়াছে।

দেশের শিল্পোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এবং কোন্ শিল্পকে কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হইবে, কোন্ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দান করা হইবে অথবা কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একচেটিয়া ব্যবসা ও অন্তবায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা আইন (Monopolies and Restrictive Trade



কারবারের মূলধন ভিত্তিক আয়তনের চিত্র

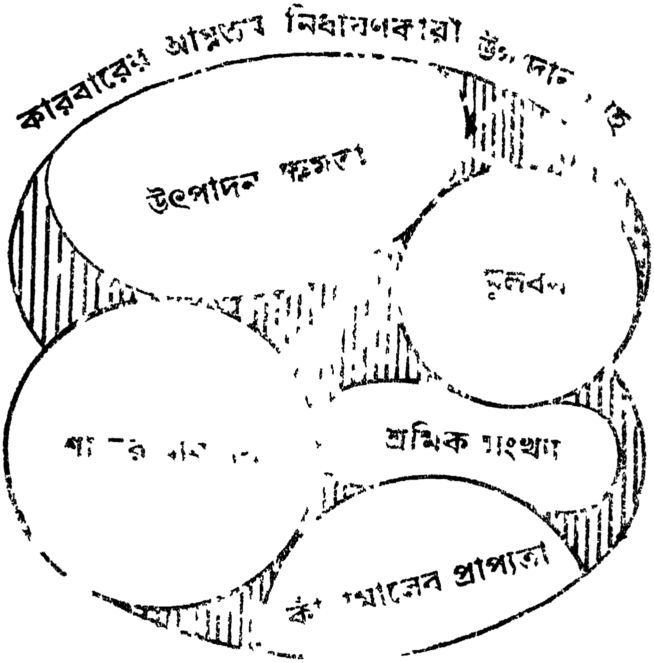
Practices Act—MRTP Act) অনুযায়ী যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য ২০ কোটি টাকার অধিক তাহাকেই বৃহদায়তন শিল্প বলা হইবে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তনের পরিমাপ (**Measurement of the size of a Business unit**) :

কারবারের আয়তন নিরূপণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারবার বড় কিংবা মাঝারি কিংবা ছোট, একথা বলিলে কারবারের কার্যের পরিধি এবং আয়তন সম্বন্ধে কোন কিছু ধারণা হয় না। কারবারের প্রকৃতি, উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য, মূলধন, বিক্রয়ের পরিমাণ, শ্রমিকসংখ্যা ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা বিচার করিয়া কারবারের আয়তন স্থির করা হয়।

কারবারের আয়তনের সহিত কাযের পরিধির একটি সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আয়তন বড় হইলে উহার কার্যের পরিধিও বড় হওয়াই স্বাভাবিক। আবার একথাও সত্য যে, যদি কারবারের কার্যের পরিধি বেশ প্রসারিত হয় তাহা হইলে উহার আয়তনও বড় হইতে বাধ্য।

কারবারের আয়তন স্থির করিবার এমন কোনও মানদণ্ড নাই যে, একটি বিশেষ মানদণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া কোনও কারবারকে বড় বলা হয় অথবা কোনও কারবারকে



কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহের চিত্র

ছোট বলা হয়। কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া কারবারের আয়তন এবং কার্যের পরিধি বড় কিংবা ছোট, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায়।

যে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কারবারের আয়তন ও কার্যের পরিধি পরিমাপ করা হয় তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

(১) **মূলধন (Capital)** ঃ কোনও কারবারে নিয়োজিত মূলধন দ্বারা উহার আয়তন স্থির করিবার একটি পদ্ধতি দেখা যায়। বোর্ড অফ বোম্বে স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (Board of Bombay State Financial Corporation)-এর সংজ্ঞা অনুসারে—যে কারবারের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক, তাহাকে বড় আকারের কারবার বলা হয়। যে কারবারের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার কম কিন্তু ৩৫ লক্ষ টাকার অধিক, তাহাকে মাঝারি কারবার বলা হয়। আর যে কারবারের নিয়োজিত মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা অথবা তাহার কম, তাহাকে ছোট কারবার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে নিয়োজিত মূলধন মাপকাঠি হিসাবে কার্য করে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ নির্মাণ-শিল্প, পাট-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটি কারবারেই প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন এবং প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। কারণ ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী। ইহারা 'ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি' (Law of Increasing Returns) অনুসারে উৎপাদন করিয়া

থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ অধিক বলিয়া মূলধনের প্রয়োজন অধিক। এইজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহৎ কারবারের পর্যায়ে পড়ে। তবে কোন্ কারবারে কত মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে তাহা কেবল আদায়ীকৃত মূলধন দ্বারাই স্থির করা যায় না। কারণ কারবারের এমন অনেক সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) থাকে যাহা মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কারবার ঋণ করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করে এবং তাহা মূলধন হিসাবে কার্য করে। সুতরাং ব্যবহৃত মূলধন কত উহা দ্বারাই কারবারের মোট মূলধন স্থির করা হয়।

(২) **কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতা (Productive Capacity or Plant Capacity) ঃ** কোন কারবারে কি প্রকারে এবং কত পরিমাণ যন্ত্রপাতি দ্বারা কার্য সাধিত হয় তাহা দ্বারাও কারবারের আয়তন পরিমাপ করা হয়। যন্ত্রের পরিমাণ ও প্রকারের উপর কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে। যে কারবারে যন্ত্র-সংখ্যা অধিক এবং যে কারবারে আধুনিকতম যন্ত্র আছে, তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা যে বেশী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁত-শিল্পে যন্ত্রের পরিমাণ দ্বারা উহার আয়তন স্থির হয়। কতগুলি তাঁত, কতগুলি মাকু ইত্যাদি দ্বারা উহা বড় কিংবা ছোট তাহা স্থির করা হয়। কেবল যন্ত্রের সংখ্যা ও প্রকার দ্বারাই যে কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতা নিরূপণ করা হয়, তাহাও নহে। কারণ, এমন অনেক কারবার (শিল্প) আছে যাহাতে একটিমাত্র দ্রব্যই উৎপাদন হয় না, নানাপ্রকারের দ্রব্য উৎপাদন হয়। এই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে নানাবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে কারবারের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট মূল্য দ্বারা ইহার আয়তন স্থির করা হয়। কাঁচ-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, কাগজ-শিল্প প্রভৃতিতে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নিরিখ করিয়া উহার আয়তন স্থির করা হয়।

(৩) **উৎপাদনের পরিমাণ (Volume of Output) ঃ** কতকগুলি সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদিত হয়, সেখানে দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ দেখিয়া কারবারের আয়তন পরিমাপ করা যায়।

(৪) **উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য (Value of Products) ঃ** উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য দ্বারা উহার আয়তন স্থির করিতে কিছু অসুবিধা রহিয়াছে। যে দ্রব্যের বাজার-দর খুব ঘন ঘন উঠা-নামা করে সেই দ্রব্য উৎপাদনকারী কারবারের আয়তন উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য দ্বারা স্থির করা কঠিন। তথাপি মূল্য উঠা-নামার মধ্যে একটি সমতা ধরিয়া কারবারের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাহির করিয়া আয়তন নির্ধারিত হয়। ইহার পরিবর্তে অনেক কারবারে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ (Volume) দ্বারা কারবারের আয়তন স্থির করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কারবারের উৎপাদিত দ্রব্যের স্থূল পরিমাণ কত টন, কত মিটার, সংখ্যায় কত লক্ষ ইত্যাদি দ্বারা কারবারের আয়তন স্থির করা হয়। লৌহ-শিল্পে টন-মাফিক হিসাব ধরা যায়, আবার বস্ত্র-শিল্পে কত মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহা দ্বারা আয়তন স্থিরীকৃত হয়।

(৫) **শ্রমিকসংখ্যা (Number of Labourers) ঃ** কোন কারবারে নিয়োজিত শ্রমিকসংখ্যা দ্বারাও উহার আয়তন স্থির করা যাইতে পারে। কারবারে শ্রমিকসংখ্যা উহার উৎপাদন-ক্ষমতা ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকসংখ্যা বেশী হইলে

ধরিতে হইবে যে, কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতাও বেশী। ফলে সেই কারবারকে বড় বলিয়াই গণ্য করা হয়। কোন কারবারে ৫০০ শ্রমিক কাজ করে, আর কোনও কারবারে শ্রমিকসংখ্যা ৫ জন। যে কারবারে ৫০০ শ্রমিক কাজ করে, তাহাকে তুলনায় বড় বলা যাইবে। আবার কোনও কারবারে ৫,০০০ শ্রমিক কাজ করে। যে কারবারে ৫০০ শ্রমিক কাজ করে তাহার তুলনায় যে কারবারে ৫,০০০ শ্রমিক কাজ করে তাহাকে অতি বৃহৎ কারবার বলা হইবে।

তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কারবারে কতজন শ্রমিক নিয়োজিত হইবে তাহা সেই কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় উৎপাদন-ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োজিত না হইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়, কারণ যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আবার উৎপাদন-ক্ষমতার অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিলেও ক্ষতি হয়। কারণ সেক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রমের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। শ্রম অব্যবহৃত থাকে। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়।

(৬) **কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ (Quantity of Raw Materials Consumed) :** অনেক ক্ষেত্রে কারবারের আয়তন কারবারে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তাহার দ্বারা স্থির হয়। যখন একই জাতীয় দ্রব্য একাধিক কারবারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে তখন বিভিন্ন কারবারের আয়তন স্থির করিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(৭) **শক্তির ব্যবহার (Amount of Power Consumed) :** কারবারে ব্যবহৃত শক্তির (Power) পরিমাণ দ্বারাও উহার আয়তন স্থির করা যায়। একই দ্রব্য উৎপাদনকারী দুইটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান দৈনিক ১০০ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে এবং অপরটি দৈনিক ব্যবহার করে ৫,০০০ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের কারবারটিকে বৃহৎ বলিতে হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার কারবারের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-ক্ষমতা যত অধিক হইবে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবও তত অধিক হইবে। উৎপাদন-ক্ষমতা যন্ত্রপাতির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কারবারে যত অধিক পরিমাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, উহার বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজনও তত অধিক হয়।

কারবারের আয়তন স্থির করিতে কোনও কারবার উল্লিখিত যে কোন একটি অথবা একাধিক মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য নিয়োজিত মূলধন এবং উৎপাদনের পরিমাণের উপর জোর দেওয়া হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় শ্রমিকসংখ্যা এবং মূলধনের উপর।

উপরে কারবারের আয়তন পরিমাপ করিবার পদ্ধতি আলোচনা করা হইয়াছে। কারবারের আয়তন কিভাবে এবং কি কি উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারবারী প্রতিষ্ঠানটি বড় আয়তনে সংগঠিত হইবে কিংবা মাঝারি

আকারে সংগঠিত হইবে অথবা ক্ষুদ্র আয়তনে স্থাপিত হইবে, তাহা মূলধন যোগানের সুযোগ, দ্রব্যের চাহিদা ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ বা বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors determining the size of a Business unit):

যে সকল উপাদান বা বিষয়সমূহ কারবারের আয়তন নির্ধারণ করে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে :

(১) **মূলধন সংগ্রহের সুযোগ (Advantages in Securing Capital)**: কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়ই উহার আয়তন কি হইবে তাহা স্থির করা প্রয়োজন। আয়তনে বড় হইলে উহার মূলধনও প্রচুর প্রয়োজন হইবে। ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি আয়তনের হইলে উহার কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের প্রয়োজন হইলেই যে মূলধন সংগৃহীত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কোন কারবারের উৎপাদনের প্রকৃতি অনুসারে উহার আয়তন বড় হওয়া উচিত। এক মালিকানা অথবা অংশীদারী কারবারের পক্ষে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আবার যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ আছে। সুতরাং কারবার আয়তনে বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় কিংবা বাঞ্ছনীয় নহে তাহার উপর কারবারের আয়তন নির্ভর করিতে পারে না। কারবারের আয়তন বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মূলধন সংগ্রহের সুযোগ না থাকিলে আয়তন ছোট করিতে হয়। কাজেই দেখা যায় এক মালিকানা কিংবা অংশীদারী কারবারে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ মালিক অথবা কতিপয় মালিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ঐ প্রকার কারবারের আয়তন ছোট। কিন্তু যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের সুবিধা আছে বলিয়া ঐ প্রকার কারবারের আয়তন বড় হয়। তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ থাকিলেই কারবার আয়তনে বড় হইতে পারে না। কারবারের প্রকৃতি অনুসারে মূলধনের প্রয়োজনের তারতম্য দেখা দেয়। লৌহ-শিল্পে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইবে কোনও কুটির-শিল্পে সেই পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং কি প্রকারের কারবার হইবে তাহার উপরও উহার আয়তন নির্ভর করে।

(২) **পণ্যের চাহিদা এবং বাজার (Demand for Product and its Market)**: পণ্যের চাহিদার উপর কারবারের আয়তন বহুলাংশে নির্ভর করে। পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হইলে কারবার একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। দেশের সর্বত্র এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। উৎপাদন বাড়াইলে কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ এবং এমনকি বৃহত্তর হইতে পারে। পণ্যের চাহিদাকে অর্থনীতির ভাষায় 'বাজার' বলা হয়। সুতরাং চাহিদা অনুসারে বাজার সৃষ্টি হয়। বাজার যত প্রসার লাভ করে পণ্য উৎপাদনও চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাড়াইতে হয়। সুতরাং চাহিদা ও বাজার ব্যাপক হইলে কারবারের আয়তন বড় হয়। অর্থাৎ চাহিদা ও বাজার দ্বারা কারবারের আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয়

(৩) **পণ্যের প্রকৃতি (Nature of Product) :** পণ্যের প্রকৃতি কারবারের আয়তন স্থিরীকরণে প্রভাব বিস্তার করে। পণ্য যদি এমন হয় যে, উহার গুণাগুণ অল্প সময়ে নষ্ট হইবে না এবং উহার ব্যবহার অতি অল্প সময়েই নিঃশেষ হইবে না, তাহা হইলে সেই পণ্য বহুদিন রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। পচনশীল নহে এমন দ্রব্য বহুল-পরিমাণে উৎপাদন করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিলে বহুদিন যাবৎ সেই দ্রব্য উৎপাদন হয় বলিয়া এই প্রকার কারবারের আয়তন বড় হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য, মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য, রুটি ইত্যাদি পচনশীল। ইহাদের বহুল-পরিমাণে উৎপাদন করিয়া বহুদিন গুদামজাত করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং এই সকল কারবার আয়তনে ক্ষুদ্রই হয়। আবার, বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্য ইত্যাদি বহুদিন গুদামজাত করিয়া রাখিলেও ইহাদের বিশেষ গুণহানি হয় না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদন হয় বহুল-পরিমাণে এবং এই সকল উৎপাদন ও সরবরাহকারী কারবারের আয়তনও বড় হয়।

(৪) **দ্রব্যের মান (Standard of the Product) :** দ্রব্যের মান যদি সমভাবাপন্ন বা প্রমিত (Standardised) হয় তাহা হইলে উহার উৎপাদন বহুল-পরিমাণে হইয়া থাকে। বহুল-উৎপাদনের একটি সুবিধা এই যে, পণ্য সমভাবাপন্ন হয়। সুতরাং যে দ্রব্য অথবা পণ্য গুণের দিক হইতে সমভাবাপন্ন তাহার উৎপাদন বহুল-পরিমাণে হয় এবং ঐ দ্রব্য উৎপাদনকারী কারবারও আয়তনে বড় হয়। কিন্তু যে দ্রব্যের ভোগ মানুষের রুচির উপর নির্ভর করে তাহার উৎপাদন রুচির পরিবর্তনের জন্য কম-বেশী হইয়া থাকে। রুচি সর্বদা পরিবর্তনশীল বলিয়া এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন বহুল-পরিমাণে হয় না এবং এই সকল কারবারের আয়তনও খুব বড় হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির চাহিদা রুচির উপর নির্ভর করে। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী কারবার আয়তনে খুব বড় হয় না। অলঙ্কার, আসবাবপত্র, কারু-শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন-কারী কারবারের আয়তন এই কারণেই সীমিত থাকে।

(৫) **কারবারের ঝুঁকি (Risk) :** কারবারের ঝুঁকি দ্বারাও উহার আয়তন নির্ধারিত হয়। যে কারবারের ঝুঁকি বেশী সেই কারবারের আয়তনও বড় হয়। অথবা একথাই বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে যে, যে কারবার যত বড়, সেই কারবারের ঝুঁকিও তত বেশী। যে সকল কারবারী অধিক ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক তাহারা কারবারের আয়তন ছোট রাখে। অধিক ঝুঁকি লইয়া কারবারকে বৃহদায়তন করিতে তাহারা অনিচ্ছুক হয়।

(৬) ***পরিবহণ-ব্যয় (Cost of Transportation) :*** পরিবহণ-ব্যয় দ্বারাও কারবারের আয়তন প্রভাবিত হয়। এমন অনেক শিল্প আছে যাহাদের বহুদূর হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়। যেমন, শর্করা শিল্প। শর্করা শিল্পে ইক্ষুর প্রয়োজন। ইক্ষু উৎপাদন দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে। দূরবর্তী অঞ্চল হইতে ইক্ষু সংগ্রহ করিতে পরিবহণ-ব্যয় খুবই অধিক পড়ে। সুতরাং শর্করা-শিল্প সাধারণতঃ ইক্ষু-উৎপাদক স্থানের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত ও ক্ষুদ্রায়তনের হয়।

(৭) **কারবার সংগঠনের ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (Organising Ability and Managerial Skill) :** ইহাদের উপর কারবারের আয়তন বহু ক্ষেত্রে

নির্ভর করে। কারবার সংগঠনের ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা না থাকিলে ফলতঃ বৃহদায়তন কারবার গঠন এবং পরিচালনা সম্ভব নহে। ফলে কারবারের সম্প্রসারণের সুবিধা থাকিলেও আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। কারবারের আয়তন বড় হইলে ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয় এবং শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ে। তাহাদের মধ্যে কার্য-বিভাগ, বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সংযোজনা ও সহযোগিতা ঘটান কষ্টকর ব্যাপার। যাহার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা না থাকে তাহার পক্ষে কারবার বৃহদাকারে সংগঠন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কারবার সংগঠনের ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিলে কারবারের আয়তন কখনও বড় হয় না।

(৮) সরকারী আইন ও নিয়ন্ত্রণ (Government Regulation and Control): দেশের সরকারী আইনও বহু ক্ষেত্রে কারবারের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে। কোন্ কারবার কি পদ্ধতিতে চালিত হইবে তাহা সেই দেশের আইনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া উহার আয়তন সীমিত করা হইতে পারে। অধিক মুনাফা আয়কারী কারবারকে যদি উচ্চহারে কর দিতে হয় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে কারবারের আয়তন বাড়ান হয় না। বরং আয়তন সংকুচিত করিয়া ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি আয়তনে রাখা হয়, যাহাতে করের ভার হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

(৯) উৎপাদনের নিয়ম (Laws of Returns): যে সকল কারবারে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি (Law of Increasing Return) প্রচলিত থাকে সেই সকল কারবারে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রারম্ভিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। সুতরাং এই সকল কারবারের আয়তনও বড় হয়। শিল্পীয় পদ্ধতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয় বলিয়া শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই আয়তন বড় হয়। কিন্তু যে সকল কারবারে উৎপাদন ক্রম-হ্রাসমান বিধিতে (Law of Diminishing Return) সংগঠিত হয় সেই সকল কারবারের আয়তন ছোট হয়। কারণ, ক্রম-হ্রাসমান নিয়মে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদনের তুলনায় বেশী হয়। সুতরাং মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যায়। এই সকল কারবারের আয়তন ছোটই হয়।

(১০) মালিকের ইচ্ছা ও ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা (Willingness and Risk bearing Capacity of the Proprietor): মালিকের ইচ্ছা এবং ঝুঁকি লইবার ক্ষমতার উপরও কারবারের আয়তন বহু ক্ষেত্রে নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত এমন অনেক কারবার আছে যাহাতে দক্ষ শিল্প-নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন। শিল্প-নিপুণ শ্রমিকের প্রাচুর্য না থাকায় এই সকল কারবারের আয়তন ছোট হয়। যেমন, আসবাব-পত্র তৈয়ারী, পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী ইত্যাদি কারবারের আয়তন ছোট হয়। আবার ক্রেতা-সাধারণের (সম্ভোগকারী) মনোবৃত্তির উপরও কারবারের আয়তন নির্ভর করে। সম্ভোগকারী সর্বদাই তাহার বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থান হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক। এই কারণে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের সংখ্যা খুব বেশী হয় এবং উহার আয়তনও ছোট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুদী, মশলা, লণ্ড্রী, মনোহারী দ্রব্যের দোকানসমূহের আয়তন ছোট হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবসা কোন শহরের ঠিক

কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ আকারে স্থাপিত হইলে উহা সম্ভোগকারীর ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে না। এইজন্যই এই প্রকারের ব্যবসা আয়তনে ছোট, কিন্তু সংখ্যায় অধিক হইয়া ছড়াইয়া আছে।

(১১) ভৌগোলিক নিষ্ক্রিয়তা (**Geographical Inertia**): কারবারের ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করিলে দেখা যায় যে, কোনও দেশ আছে যেখানে বেশীর ভাগ কারবারের আয়তনই বড়। সুতরাং সেই সকল স্থানে নূতন কোনও কারবার স্থাপন করিলে তাহার আয়তনও সাধারণতঃ বড় হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ শিল্পই বৃহদায়তন। কিন্তু ভারতে অধিকাংশ শিল্প ক্ষুদ্রায়তন। সুতরাং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নূতন শিল্প-ব্যবসা স্থাপিত হইলে উহার আয়তন স্বভাবতঃই বড় হইবে। আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের অধিকাংশই বৃহদায়তন। সুতরাং সেই অঞ্চলে কোনও নূতন শিল্প স্থাপন করিলে উহার আয়তনও বড় হইতে বাধ্য। ইহাকে ভৌগোলিক নিষ্ক্রিয়তা (**Geographical Inertia**) বলা হয়।

কারবারের কাম্য আয়তন কি? (What is the optimum size of a Business?):

বৃহদায়তন কারবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাসমূহ ভোগ করিবার জন্য কারবারের আয়তন সম্প্রসারিত হয়। মিস্টার রবিনসন (Mr Robinson)-এর মতে, যে কারবার বর্তমান কারিগরি অবস্থা এবং সাংগঠনিক দক্ষতায় দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে, তাহাকে কাম্য আয়তন বলে। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদনের মাত্রা কাম্য উৎপাদন স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। কাম্য আয়তন অতিক্রম করিবার পর ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কাম্য আয়তনই কারবারের শ্রেষ্ঠ আয়তন। ইহা আয়তনের প্রান্তিক বিন্দু। ইহা অতি বৃহৎ (Too Big) বা অতি ক্ষুদ্র (Too Small) নহে। ইহাই কারবারের সঠিক আয়তন। ইহা পরিবর্তনশীল। কারবারের কারিগরি অবস্থা, যান্ত্রিক কলাকৌশলগত জ্ঞান, সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদির পরিবর্তনে কাম্য আয়তন পরিবর্তিত হয়। যে আয়তনে কারবারের সর্বাধিক ব্যয় সংকোচ হয় উহাই কাম্য আয়তন। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সময় পণ্যদ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য আসে যখন প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় = গড় ব্যয় = গড় আয় হয়। কাম্য আয়তনে গড় ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম এবং সর্বাধিক ব্যয় সংকোচ ঘটে।

কারবারের কাম্য আয়তন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ বা শক্তিসমূহ (Factors or Forces determining the Optimum Size of a Firm):

একটি প্রতিষ্ঠান বা কারবারের কাম্য আয়তন নির্ধারণকারী বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হইল:

(১) কারিগরি কাম্য আয়তন (**Technical Optimum Size**): কারবারের আয়তন বৃদ্ধিতে উন্নততর যন্ত্রপাতি ও কারিগরি পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে।

ইহাতে শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। বিভিন্ন প্রকার উপজাত দ্রব্য (Bye Products) উৎপাদন সম্ভব হয় এবং কারিগরি ব্যয়-সংকোচ ঘটে। যখন কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া এমন এক পর্যায়ে আসে যেখানে সর্বাধিক ব্যয়-সংকোচ ঘটে এবং স্থিতাবস্থা আসে তখন সেই অবস্থাকে কারিগরি কাম্য আয়তন বলে। এই পদ্ধতিতে নিম্নতম কাম্য আয়তন নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু কারিগরি কাম্য আয়তন হইতে কারবারের আয়তন বৃহত্তর হইলে ব্যয়-সংকোচন কমিয়া যাইবে। তাই ইহার দ্বারা কারবারের বৃহত্তম সীমা নির্ধারণ করা যায় না।

(২) **ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন (Managerial Optimum Size)** : বড় কারবার সুদক্ষ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে পারে। কারণ, ইহার আর্থিক ক্ষমতা বেশী। ইহাতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয়-সংকোচ ঘটে। যখন এই ব্যয়-সংকোচ সর্বাধিক হয় তখন তাহাকে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাম্য আয়তন বলে। কর্তৃত্বের ভাবার্পণের নীতি, পরিচালনা ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাম্য আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কাম্য আয়তন অপেক্ষা কারবারের আয়তন বেশী হইলে বা কম হইলে সর্বাধিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ব্যয়-সংকোচনের সুবিধা পাওয়া যায় না।

(৩) **আর্থিক কাম্য আয়তন (Financial Optimum Size)** : পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান অধিক সুবিধা ভোগ করে। পুঁজি সংগ্রহ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, (ক) সুদের হার, (খ) পুঁজির পরিমাণ এবং (গ) পুঁজি সংগ্রহের শর্ত। বৃহদায়তন কারবার কম সুদে এবং সহজ শর্তে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়া পুঁজি সংগ্রহে ব্যয়-সংকোচ ঘটে।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সুদের হার ও পুঁজি সরবরাহের শর্ত কারবারের আয়তন নির্ধারণ করে না, পরিচালনার সুনামও পুঁজির যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী নীতি অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন কারবার অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে ও সহজ শর্তে পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং কাম্য আর্থিক আয়তনের কোন্ পর্যায়ে সর্বাধিক ব্যয়-সংকোচ ঘটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই।

(৪) **বিপণন কাম্য আয়তন (Marketing Optimum Size)** : ক্রয়-বিক্রয় কারবারের আয়তন ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বাজার ব্যাপক হইলে পরিবহণ-ব্যয়, বিজ্ঞাপন-ব্যয়, বণ্টন-ব্যয় ইত্যাদি হ্রাস পায়। ফলে বিপণনে ব্যয়-সংকোচ ঘটে। যে আয়তনে সর্বাধিক বিপণন ব্যয়-সংকোচ ঘটে, সেই আয়তনই বিপণন কাম্য আয়তন।

(৫) **ঝুঁকিবহনক্ষম বা অস্তিত্বরক্ষণক্ষম কাম্য আয়তন (Risk Bearing or Survival Optimum Size)** : কারবারের আয়তন অনেকাংশে প্রভাবিত হয় ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও চাহিদার পরিবর্তনের দ্বারা। চাহিদা, রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বৃহদায়তন কারবারে উৎপাদন পদ্ধতি জটিল বলিয়া সহজে পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি আনা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কারবার সহজেই এই

পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি আনিতে পারে। কারবারের আয়তন এমন হওয়া উচিত যে, প্রয়োজনে যেন উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। ইহাতে ঝুঁকি কমিয়া যায়। এইরূপ আয়তনকে কাম্য ঝুঁকিবহনক্ষম বা অস্তিত্বরক্ষণক্ষম আয়তন বলে।

বাস্তবে চূড়ান্ত বা সঠিক কাম্য আয়তনের কারবার বিরল। ইহা একটি তাত্ত্বিক ধারণামাত্র।

কাজের পরিবেশ (**Work Environment**) ঃ

শ্রমিকের উৎপাদিকাশক্তি প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) চাকুরীর শর্তাবলী ও বেতন এবং (২) কাজের পবিবেশ। কাজের পরিবেশ বলিতে বুঝায় কর্মস্থান বা কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং কারখানার যান্ত্রিক পরিবেশকে। উত্তম কাজের পরিবেশে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। চিকাগো শহরের ওয়েস্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক প্লাণ্টে হথর্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় (Hawthorne Experiments) অধ্যাপক রয়েথলিস্‌বার্জার ও এলটন মেয়ো দেখাইয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট কাজের পরিবেশ কর্মীর মানসিক পরিবেশের (Mental Environment) উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কাজের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে :

(১) **কারখানার অবয়ব (Factory Design)** ঃ কারখানার অবয়ব আধুনিক ও কর্মীদের কাজের পক্ষে আরামদায়ক হইতে হইবে।

(২) **অগ্নি প্রতিরোধের ব্যবস্থা (Fire Prevention Arrangement)** ঃ কারখানা এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে সহজে আগুন না ধরিতে পারে। অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে।

(৩) **আলোর ব্যবস্থা (Lighting Arrangement)** ঃ আলোর স্তর সঠিকভাবে স্থির করিতে হইবে। স্বাভাবিক আলো ও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর মাত্রার এমনভাবে সমন্বয় করিতে হইবে যাহাতে কাজে আরামদায়ক অবস্থা আসে এবং কাজের দক্ষতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৪) **পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness)** ঃ কারখানার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলে কর্মীর মনে কর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়।

(৫) **অবাধ বায়ু-চলাচল (Good Ventilation)** ঃ কারখানার দূষিত ও গরম বাতাস বাহিরে নির্গমনের এবং বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা বাতাস কারখানার অভ্যন্তরে আগমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৈদ্যুতিক বহির্গমন পাখা (Exhaust Fan) ব্যবহারে ইহা সম্ভব। বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) নিয়ন্ত্রণ করিলে কর্মীর ক্লান্তি ও অবসাদ সহজে আসে না।

(৬) **শব্দ নিয়ন্ত্রণ (Noise Control)** : অধিকাংশ কারখানায় শব্দ হয়। ইহা বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। তবে শব্দ-নিরোধক উপায় গ্রহণ করিলে ইহা হ্রাস

করা যায়। শ্রমিকেরা প্রয়োজনে শব্দ-নিরোধক শ্রুতিযন্ত্র (Ear Plug) ব্যবহার করিতে পারে।

(৭) যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম (**Machinery and Equipments**) : আধুনিক ভাল যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম কাজের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং কাজে দক্ষতা আনে।

(৮) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি (**Maintenance and Repairs**) : যন্ত্রপাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং খারাপ হইলে দ্রুত সারাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে কাজের পরিবেশে সামঞ্জস্য আসে।

(৯) অনুপযুক্ত যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপন (**Replacement of Obsolete Machines**) : কাজের অনুপযুক্ত যন্ত্রপাতি বাতিল করিয়া আধুনিক ও নূতন যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপনে কাজের পরিবেশ উন্নত হয়।

(১০) সঙ্গীত (**Music**) : খুব ধীরে শ্রুতিমধুর সঙ্গীত বাজাইয়া মনোরম কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। ইহা কেবলমাত্র একঘেয়ে কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(১১) মানসিক ও সামাজিক পরিবেশের উন্নতি (**Development of Mental and Social Environment**) : উপযুক্ত কাজের সময় স্থির করা, বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন, পদোন্নতি ইত্যাদির বিষয় দৃষ্টি দিলে মানসিক পরিবেশ উন্নত হয়। আবার দলগত স্বার্থের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দিলে কর্মীর আনুগত্য ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

কাজের পরিমাপ (Work Measurement) :

সংজ্ঞা (**Definition**) : কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কোন দক্ষ শ্রমিকের নির্দিষ্ট দক্ষতার স্তরে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা পরিমাপ করিবার পদ্ধতিকে কাজের পরিমাপ বলে।

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

নিম্নলিখিত কারণে কাজের পরিমাপ করা প্রয়োজন :

(১) ইহার দ্বারা বিভিন্ন কার্য-পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব ;

(২) ইহার দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ;

(৩) ইহার সাহায্যে প্রত্যেক কাজে কত এবং কি রকম দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন তাহা স্থির করা সম্ভব হয় ;

(৪) ইহাতে উন্নত উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় ;

(৫) ইহার সাহায্যে উৎপাদন-ব্যয়ে কত শ্রম-ব্যয় ও যন্ত্র-ব্যয় হইবে তাহা জানা যায় ;

(৬) ইহার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার প্রেরণামূলক মজুরি প্রথা চালু করা সম্ভব হয়,

(৭) ইহা সময়-সমীক্ষা, গতি-সমীক্ষা, ক্লান্তি-সমীক্ষা ও শ্রমের আয়-ব্যয় সূচক (Labour Budget) প্রস্তুতে সাহায্য করে।

কাজের পরিমাপের উপায় (Methods of Work Measurement) ঃ

কাজের পরিমাপের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হয় :

(১) নির্দিষ্ট কাজ স্থির করা অর্থাৎ যে কাজটি পরিমাপ করা হইবে তাহা নির্বাচন করা।

(২) ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করা।

(৩) কি পদ্ধতিতে কাজের পরিমাপ করা হইবে তাহা স্থির করা।

(৪) সময় মাপিবার ঘড়ি (Stop watch) দ্বারা প্রকৃত কাজের সময় নিরূপণ করা।

(৫) বিশ্রামের সময় ও বাড়তি সময় (Allowance) স্থির করা।

(৬) মৌলিক সময় ও সঙ্গত সময় স্থির করা।

(৭) উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

(৮) কর্ম সম্পাদনের পরিসংখ্যান সরবরাহ করা।

(৯) যথাযথ প্রেরণামূলক মজুরি প্রথার ব্যবস্থা করা।

(১০) জব কার্ড (Job Card) ও টাইম কার্ড (Time Card) প্রবর্তন করা, ইত্যাদি।

এরগোনমিক্স (Ergonomics) ঃ

ইহার অপর নাম মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Human Engineering)। কর্মীর শারীরিক গঠনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কর্মপদ্ধতি আরোপ করাকে এরগোনমিক্স বলে (System adopted to human anatomy is known as Ergonomics)। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজের সহিত কর্মীর সমন্বয় করা হয়। কিন্তু মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অর্থাৎ এরগোনমিক্স-এ কর্মীর সহিত এবং কাজের সহিত কর্মীর শারীরিক এবং মানবিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আনা হয়। ইহাতে কাজের সমন্বয় করা হয়।

এরগোনমিকস একটি বিজ্ঞান যাহাতে কাজের পরিবেশকে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে এমনভাবে পরিবর্তন করা হয় যাহার ফলে কর্মীদের দক্ষতা সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেমন, বসিবার চেয়ারের গঠন এমনভাবে করা হয় যে, কর্মী অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিলেও তাহার ক্লান্তি আসে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধারণা খুবই জনপ্রিয়।

এরগোনমিক্স কর্মী ব্যবস্থাপনার অঙ্গ। ইহা পরিবেশ বিজ্ঞানের সহিত জড়িত এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে :

(ক) পর্যবেক্ষণমূলক মনস্তত্ত্ব (খ) শিল্প মনস্তত্ত্ব (গ) শিল্প-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি (ঘ) পরিবেশ ও কর্মীদের শারীর বিজ্ঞান (ঙ) বিষ-বিজ্ঞান বা দূষণ-বিজ্ঞান।

এরগোনমিক্স-এর নিম্নলিখিত ব্যবহার আছে :

(১) ইহা কর্মী ব্যবস্থাপনার অঙ্গ-বিশেষ ;

(২) ইহার দ্বারা উন্নত উৎপাদনশীলতা অর্জন করা যায় ;

(৩) ইহা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং বায়ু ও জলকে দূষণের হাত হইতে মুক্ত রাখে ;

(৪) ইহা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করিতে সাহায্য করে ;

(৫) ইহা কর্মী সচেতনতা বৃদ্ধি করে ;

(৬) ইহাতে সময়-সমীক্ষা, গতি-সমীক্ষা, শ্রান্তি-সমীক্ষা, পদ্ধতি-সমীক্ষা এবং স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা ও বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কের কাজ সুগম হয়।

সময়-সমীক্ষা (Time Study) :

ফ্রাঙ্কলীন মুর (Franklin Moore)-এর মতে, সময়ের দিক হইতে উৎপাদনের মান নিরূপণের পদ্ধতিকে সময়-সমীক্ষা বলে। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মান নির্ধারণকে সময়-সমীক্ষা বলে।

টেলার (Taylor) ও ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) সময়-সমীক্ষা করেন। ইহা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি নীতি। মিডভেল স্টীল কোম্পানীতে (Midvale Steel Co.) কর্মরত থাকাকালীন সময়ে টেলর সময়-সমীক্ষা করেন। যে কোন ধরনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য সময়-সমীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদন কার্য সঠিক সময়ে সম্পন্ন হইলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। অধিকাংশ আনুষঙ্গিক ব্যয়ই সময়ের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের সময় বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

সময়-সমীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত সময়ের মান নির্ধারণ করা হয়। এই সমীক্ষায় কাজের সময় ঘড়ি (Stop watch) ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি কাজকে বিশ্লেষণ করিয়া কাজের অংশ সম্পাদনের জন্য মান-সময় (Standard Time) স্থির করা হয়। সময়-সমীক্ষা গতি-সমীক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত, কারণ কার্য সম্পাদনে অপ্রয়োজনীয় গতি সময়ের অপচয় করে এবং কার্য সম্পাদনে বিলম্ব ঘটায়।

কোন একটি কার্য সম্পাদনে যে সময়ের প্রয়োজন উহার বিশ্লেষণ ও স্থিরীকরণ করা সময়-সমীক্ষার উদ্দেশ্য। কোন কার্য সম্পাদনে কত সময় লাগা উচিত তাহা স্থির করা সময়-সমীক্ষার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত ইহা গড় সময় ধরিয়া করা হয়। এই গড় সময় সাধারণ অবস্থায় কর্মরত একজন সাধারণ শ্রমিকের নৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্থির করা হয়।

সময়-সমীক্ষার সুফল (Merits of Time Study) :

সময়-সমীক্ষার ফলে নিম্নলিখিত সুফলগুলি পাওয়া যায় :

(১) ইহা কোন একটি কাজ দক্ষতার সহিত কত সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার নির্দেশক।

(২) মান-সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঠিক সময়ে উৎপাদন কার্য সম্পন্ন করা যায়।

(৩) ইহার সাহায্যে প্রেরণামূলক মজুরি-ব্যবস্থা স্থির করা যায়।

(৪) ইহাতে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৫) ইহা উন্নত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলে।

(৬) ইহা শ্রমিক আয়-ব্যয় সূচক (Labour Budget) প্রস্তুতকরণে সাহায্য করে।

(৭) ইহা শ্রমিকের কাজের মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

(৮) ইহা উৎপাদন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিতে সাহায্য করে এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কাজে সাফল্য আনে।

(৯) ইহা কাঁচামাল সরবরাহের সময় সম্পর্কে পূর্ব নির্দেশ দেয় বলিয়া সঠিক সময়ে কাঁচামাল ক্রয়ের ফরমাস দেওয়া সম্ভব হয়।

(১০) ইহা কর্মীদের মধ্যে সুষম কর্মবণ্টনে সাহায্য করে।

(১১) ইহা অদক্ষ শ্রমিককে দক্ষ শ্রমিকে উন্নীত করার কাজে সাহায্য করে।

(১২) ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সময়ের মান-সময় নির্ধারণ করে।

সময়-সমীক্ষার কুফল (Demerits of Time Study) ঃ সময়-সমীক্ষায় নিম্নলিখিত কুফলগুলি দেখা যায় :

(১) ইহা সঠিক সময়ের মান নির্ধারণ করিতে পারে না, কারণ ইহা গড় সময়ের ভিত্তিতে মান-সময় (Standard Time) নির্ণয় করে।

(২) প্রত্যেকটি আনুষঙ্গিক কাজের পৃথক পৃথক মান-সময় নির্ধারণ করা বাস্তবে সম্ভব নহে।

(৩) ইহা বহুল উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রযোজ্য বটে, কিন্তু রুচিসম্পন্ন বিশেষ কৌশল-যুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী নহে।

(৪) যে সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানসিক উপাদান বিশেষভাবে কাজ করে সেখানে ইহা ফলপ্রসূ নহে।

(৫) ইহা শ্রমিকের কাজের সময় বাঁধিয়া দেয় এবং তাহাদের কাজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে বলিয়া ইহাতে শ্রমিক সংঘ অসন্তুষ্ট হয়।

(৬) ইহা একটি ব্যয়-বহুল পদ্ধতি।

(৭) ইহা বৃহৎ কারবারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্রায়তন কারবারে ইহা প্রয়োগ করা যায় না।

গতি-সমীক্ষা (Motion Study) ঃ

বি. ডব্লু. নাইবেল (B. W. Niebel)-এর মতে, "কর্মীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাকে গতি-সমীক্ষা বলে।

ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) এবং তাঁহার সহধর্মিণী লিলিয়ান গিলব্রেথ (Lilian Gilbreth) মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার গতি-প্রকৃতির বিশদ বিশ্লেষণ করেন

এবং কিভাবে দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি হ্রাস করিয়া কার্য সম্পাদন করা যায় তাহার ব্যাখ্যা করেন। গতি-সমীক্ষায় দেখানো হইয়াছে যে, মানুষের অঙ্গ-সঞ্চালনের গতি দুইপ্রকার হইতে পারে: (ক) উৎপাদনক্ষম গতি (Productive Motion) এবং (খ) অনুৎপাদনক্ষম গতি (Unproductive Motion)। গতি-সমীক্ষার উদ্দেশ্য হইল অনুৎপাদনক্ষম অঙ্গ-সঞ্চালন বন্ধ করিয়া শ্রমশক্তির অপচয় বন্ধ করা। বেথলেহেম স্টীল কোম্পানীতে (Bethlehem Steel Co.) কর্মরত থাকাকালীন সময়ে টেলর শ্রমিকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য গতি-সমীক্ষা করিয়া ১৮টি গতিবেগকে ৫টি গতিবেগে হ্রাস করেন।

গতি-সমীক্ষার সুফল (Merits of Motion Study) :

গতি-সমীক্ষায় নিম্নলিখিত সুফলগুলি পাওয়া যায় :

(১) ইহা শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আনে।

(২) গতি-সমীক্ষা যথাসম্ভব কম দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ সহকারে কাজ করিবার নির্দেশ দেয়।

(৩) ইহা কর্মশক্তির অপচয় বন্ধ করে।

(৪) ইহা শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করে।

(৫) শ্রমিক অধিক সময় কাজ করিতে পারে বলিয়া তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) ইহাতে দ্রুত কর্ম সম্পাদন করা যায়।

(৭) ইহা শ্রমিকের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শ্রমিক কম পরিশ্রমে অধিক মজুরি পাইতে পারে।

(৮) ইহা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করে।

(৯) ইহাতে শ্রমিক অধিক সময় বিশ্রাম লইতে পারে ; ফলে সে বহুদিন কর্মঠ থাকে।

(১০) ইহা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যের সুষম বণ্টন ও যন্ত্রপাতির উপযুক্ত প্রয়োগে সাহায্য করে।

(১১) ইহা শ্রমিকের মনে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

গতি-সমীক্ষার কুফল (Demerits of Motion Study) :

গতি-সমীক্ষায় নিম্নলিখিত কুফলগুলি দেখা যায় :

(১) এই পদ্ধতি ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে ; কারণ ইহা ব্যয়-বহুল ও ইহাতে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

(২) ইহাকে শ্রমিকেরা সুনজরে দেখে না, কারণ তাহারা মনে করে যে, এই পদ্ধতি তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখে ও তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

(৩) গতি-সমীক্ষা ব্যবস্থাপনায় সংকীর্ণ বিশেষায়ণ (Narrow Specialisation) আনে।

ক্লান্তি-সমীক্ষা (Fatigue Study) :

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার জন্য এবং বিশ্রামের অভাবে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে ক্লান্তি বলে। ক্লান্তির ফলে কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান হ্রাস পায় এবং কর্মীর কাজে একঘেয়েমি ও বিরক্তি আসে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কাজের প্রকৃতিও বহু ক্ষেত্রে ক্লান্তির কারণ হইতে পারে। ক্লান্তির ফলে নিম্নলিখিত অসুবিধার সৃষ্টি হয় :

(১) উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ হ্রাস পায়।

(২) দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

(৩) শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আসে।

(৪) কর্মশক্তি হ্রাস পায়।

উৎপাদনের মাত্রা স্থির রাখিবার জন্য এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ বজায় রাখিবার জন্য ক্লান্তি-সমীক্ষা করা হয়। ক্লান্তি-সমীক্ষার কাজ হইতেছে কার্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর শ্রমিকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা ও কাজের সময় নিয়মিত করা। ক্লান্তি-সমীক্ষার বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল :

(১) ক্লান্তি অনুভব করিলে কাজ হইতে বিরত হওয়া,

(২) নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা;

(৩) কারখানায় মনোরম ভৌতিক কর্ম পরিবেশ (Physical Work Environment) গড়িয়া তোলা,

(৪) বসিবার ব্যবস্থা করা,

(৫) উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা,

(৬) গতি-সমীক্ষার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-সঞ্চালন বন্ধ করা,

(৭) উপযুক্ত ও ন্যায্য মজুরি প্রদান করা।

পদ্ধতি-সমীক্ষা (Method Study) :

কম পরিশ্রমে অধিকতর দ্রুততার সহিত অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে সহজ ও উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবনকে পদ্ধতি-সমীক্ষা বলে। ইহাতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, কারখানার বিন্যাস ইত্যাদি বিষয় সমীক্ষা করিতে হয়। টেলর (**Taylor**) এই সমীক্ষার উদ্ভাবন করেন এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। ইহা কর্ম-সমীক্ষার (Work Study) অঙ্গ।

সুফল (Merits) :

পদ্ধতি-সমীক্ষা নিম্নলিখিত সুফল আনে :

(১) ইহা কর্মপদ্ধতির নূতন উপায় উদ্ভাবন করে,

(২) ইহা নূতন কর্মপদ্ধতির তালিকা ও নক্শা প্রস্তুত করে,

(৩) ইহা কর্ম পরিবেশের উন্নতি সাধন করে,

(৪) ইহা কাজের মান নির্ণয় করে,

(৫) ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে ও সময়ে উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায় ;
(৬) ইহা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের উপযুক্ত ব্যবহারের নির্দেশ দেয় ;
(৭) ইহাতে শ্রমিকের পরিশ্রম ও ক্লান্তি হ্রাস পায় ;
(৮) ইহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কারখানায় যন্ত্রপাতির বিন্যাস সাধন করে ;
(৯) উপযুক্ত মানের দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয় ,
(১০) উৎপাদনের উপকরণগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করা সম্ভব হয় ;
(১১) উন্নত কর্মকৌশল উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে।

কুফল (Demerits) :

পদ্ধতি-সমীক্ষায় নিম্নলিখিত কুফলগুলি দেখা যায় :
(১) ইহা কেবলমাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ;
(২) ইহা একটি ব্যয়-বহুল ব্যবস্থা ;
(৩) বারংবার পদ্ধতির পরিবর্তনে স্থিতাবস্থা ব্যাহত হয় ,
(৪) নূতন পদ্ধতিতে শ্রমিক সর্বদা নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না ;
(৫) ইহাতে শ্রমিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা (Automation) ঃ

সংজ্ঞা (Definition) : জর্জ টেরির (George Terry) মতে, যে উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্র যন্ত্রকে চালনা করে এবং কার্যাবলী এমনভাবে সমন্বিত হয় যাহাতে দ্রব্যের গতি ও উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকে **স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা** বলে। ইহা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। পিটার ড্রাকার (Peter Drucker) বলেন যে, এই ব্যবস্থাকে **বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক (Electronic Brain)** বলে। ইহাতে বোতাম টিপিলেই প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন করা সম্ভব হয়। ইহাতে মানুষের কাজ যন্ত্রে করে। বৈদ্যুতিক কম্পিউটার (Electronic Computer) স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত। এই পদ্ধতিতে যন্ত্র মানুষের মত চিন্তা করে, হিসাব-নিকাশ করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ ডঃ ব্রুম (Dr. Broom) স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করিয়াছেন :

(১) ইহা উৎপাদনের স্থানে কাঁচামাল ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যন্ত্রের দ্বারা চালনা করে।
(২) বোতাম টিপিলেই যন্ত্র কাজ করিতে আরম্ভ করে।
(৩) উৎপাদিত দ্রব্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত হয়।
(৪) একটি কার্যধারার শেষে যন্ত্রটি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।
(৫) ইহাতে যোগাযোগ, হিসাব-নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ তিনটি কাজই একসঙ্গে করা যায়।
(৬) ইহা একটি অন্তর্নির্মাণ (In-built) পদ্ধতি।

সুবিধা (Advantages) ঃ

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহার সাহায্যে যন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

(২) ইহা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

(৩) এই পদ্ধতিতে একই সঙ্গে উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের কাজ হয় বলিয়া ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হয়।

(৪) ইহাতে মানবিক শক্তির প্রয়োজন কমিয়া যায় বলিয়া দুর্ঘটনার সংখ্যাও কম হয়।

(৫) ইহাতে দ্রুততার সহিত কার্য সম্পন্ন হয় এবং অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তি অন্য কাজে নিয়োগ করা যায়।

(৬) ইহাতে সীমিত স্থানে কাজ করা সম্ভব হয় বলিয়া কারখানায় স্থান সংকুলান হয়।

(৭) কর্মিগণ নিরাপত্তার সহিত নিশ্চিন্তে কাজ করিতে পারে।

(৮) ইহাতে একক-প্রতি উৎপাদনমূল্য হ্রাস পায় বলিয়া দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যও কম হয় এবং ভোক্তা কম দামে দ্রব্য পাইতে পারে।

(৯) ইহাতে একই মানের দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং দ্রব্যের উৎকর্ষ বজায় থাকে বলিয়া দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ বা স্তরবিভাগ (Grading) করা সম্ভব হয়।

(১০) ইহা সর্বাত্মক উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(১১) ইহা কর্মীকে একঘেয়েমি হইতে মুক্ত করে।

(১২) ইহাতে উৎপাদন পরিকল্পনা, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না করিয়া স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা চালু করিলে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইবে। ভারতের ক্ষেত্রে যেখানে নিদারুণ বেকার-সমস্যা বর্তমান, সেখানে এই পদ্ধতি অকল্যাণকর হইতে পারে কারণ, ইহাতে ভয়াবহ বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

(২) ইহাতে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী ও ব্যবস্থাপকের অভাব হইতে পারে।

(৩) শ্রমিক সংঘ ইহার বিরোধিতা করে।

(৪) ইহা অত্যন্ত অনমনীয়, কারণ, অবস্থার পরিবর্তনে উৎপাদন পদ্ধতি সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

(৫) ইহাতে প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয় খুব বেশী হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানি করিতে হয় বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়।

(৬) ক্ষুদ্রায়তন কারবারে ইহা প্রযোজ্য নহে।

(৭) ইহাতে ব্যবস্থাপনার সমস্ত সিদ্ধান্ত উচ্চস্তরে কেন্দ্রীভূত হয় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা (Consultative Management) কার্যকরী হয় না।

(৮) ইহা মূলধন-নিবিড় (Capital Intensive) উৎপাদন পদ্ধতি। ইহাতে কর্মীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বজায় থাকে না ; মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়।

বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক (Cybernetics) ঃ

ইহা সংযোগ বা যোগাযোগ বিজ্ঞান (It is a Science of Communication)। ইহা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা (Automation) ব্যবস্থার অঙ্গ। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা যখন সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা হয় তখন তাহাকে বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক বলে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও সংযোগ (Communication) ব্যবস্থাকে ব্রেক (Breach) সাইবারনেটিকস্ বা বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে উৎপাদনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চলে। বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের কাজগুলি তথ্য পরিবেশনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য সম্পাদনের ফলাফল ও নিয়ন্ত্রণ করা পর্যন্ত যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় বলিয়া সাইবারনেটিকস্‌কে বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক বলা হয়। ইহাকে রবট (Robbot)-ও বলে। কম্পিউটার হইল ফলিত বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক (Applied Cybernetics)। মার্কিন বিজ্ঞানী নরবার্ট উইনার (Norbert Wiener) নামে জনৈক ব্যবস্থাপনাবিদ ইহাকে তথ্য স্থানান্তর ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ (Production Planning and Control) :

সংজ্ঞা (Definition) ঃ উৎপাদন বলিতে সাধারণভাবে শিল্প বা কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যকে বুঝায়। উৎপাদনের কাজ হইল কাঁচামালকে রূপান্তরিত করিয়া রূপগত বা আকারগত উপযোগিতা সৃষ্টি করা। ইহার জন্য সংগঠন ও মানবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং সুষ্ঠু উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পীয় কার্যকলাপের পদ্ধতিগত সংযোজনার জন্য উৎপাদন পরিকল্পনার প্রয়োজন। উৎপাদন পরিকল্পনা বলিতে বুঝায় উৎপাদনের কার্যপ্রবাহ ঠিক করিয়া কোন্ কাজ কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা করা হইবে, তাহার পরিকল্পনা করা।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) সর্বনিম্ন ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করা।
(২) সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করা।
(৩) সবচেয়ে কম সময়ে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা।
(৪) উৎপাদনে নিশ্চয়তা আনয়ন করা।
(৫) উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ মাত্রা অনুসারে উৎপাদন কায পরিচালনা করা।
(৬) উৎপাদনের মান ও উৎকর্ষ বজায় রাখা।
(৭) উৎপাদিকাশক্তি ও মুনাফা বৃদ্ধি করা।
(৮) পরিকল্পনার সুবিধা ভোগ করা।

সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার জন্য উৎপাদনের নক্‌শা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাঁচামাল, কর্মচারী, সময় ও ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control) :

সংজ্ঞা (Definition) : পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলিতে প্রকৃত উৎপাদনের সহিত উৎপাদন মানের যাচাইকরণকে বুঝায়। উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক সময়ে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ে নির্দিষ্টমানের কার্যধারার নির্দেশ ও পরিচালনাকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলে।

উদ্দেশ্য (Objectives) : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) কারখানার কার্যধারার গতি অব্যাহত রাখা।

(২) যন্ত্রপাতির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) অপচয় রোধ করা।

(৪) পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখা।

(৫) ব্যবস্থাপকগণকে উৎপাদনের অবস্থা, যন্ত্রপাতির অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মীর ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করা।

(৬) অচল যন্ত্রপাতি, কাঁচামালের যোগান, সাজসরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি বিষয় ব্যবস্থাপনাকে পূর্ব হইতে জানান, যাহাতে উৎপাদনের গতিপ্রবাহ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধাপসমূহ (Steps in Production Planning and Control) :

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ধাপগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) দ্রব্যের নক্‌শা ও প্রক্রিয়ার নক্‌শা প্রস্তুতকরণ (Product Design and Process Design) : প্রথমে দ্রব্যের নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হয়। দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী নক্‌শায় দ্রব্যটির আকার, মাপ, ওজন, রং ইত্যাদি দেখাইতে হয়। ইহার পর উৎপাদন প্রক্রিয়ার নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তিনপ্রকার উৎপাদন পদ্ধতি হইতে পারে : (ক) ঠিকা উৎপাদন (Job Production), (খ) সমষ্টি উৎপাদন (Batch Production) এবং (গ) বহুল উৎপাদন (Mass Production)।

(২) পথনির্দেশ (Routing) : পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইবে তাহা স্থির করাকে পথনির্দেশ বলে। ইহা উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থির করে, একসঙ্গে কত দ্রব্য উৎপাদিত হইবে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য (Scrap) পাওয়া যাইবে, উহা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে এবং উৎপাদন ব্যয় কিরূপ হইবে ইহা পথনির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) সময়-নিরূপণ (Scheduling) : ইহা উৎপাদনের সময়-তালিকা প্রস্তুত করে। উৎপাদন কার্য আরম্ভের পূর্বেই দ্রব্য উৎপাদনের কার্য কখন আরম্ভ হইবে,

কতক্ষণ চলিবে এবং কখন শেষ হইবে তাহা সময় নিরূপণের মাধ্যমে স্থির করা হয়। ইহাতে কাঁচামাল সরবরাহের সময় এবং যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় নির্দেশ করা হয়। ইহাতে উৎপাদনের পর্যায়ভিত্তিক স্তরে সময়-তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সময় নিরূপণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সময়-তালিকা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য তিন প্রকার সময়-তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন, (ক) মূল সময়-তালিকা (Master Schedule), (খ) যন্ত্র সময়-তালিকা (Operation Schedule) এবং (গ) দৈনিক যন্ত্র সময়-তালিকা (Daily Operation Schedule)।

(৪) **কার্যারম্ভের নির্দেশ (Despatching)**ঃ এই পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্য আরম্ভ করা হয়। ইহার দ্বারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, কার্যারম্ভের সময় ও কার্য শেষের সময় জানান হয়। প্রত্যেক কর্মীর নিকট অর্ডার বক্স রাখা হয়। এই বাক্সে প্রয়োজনীয় নির্দেশ রাখা হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় এবং শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করা হয়। উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া শেষ হইলে পরবর্তী যন্ত্রে দ্রব্যটি স্থানান্তরিত করা হয়। ইহা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের নির্দেশপত্র প্রস্তুত ও বিলি করে, দ্রব্য উৎপাদনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে, উৎপাদনের প্রকৃত সময় নির্ণয় করে, গতিপথ ও সময়-সূচীর সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান করে এবং প্রয়োজনে উৎপাদন পরিকল্পনার পরিবর্তন করে।

(৫) **পরিদর্শন (Inspection)**ঃ ইহা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইহাতে দ্রব্যের মান বজায় রাখিবার জন্য প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সকল কাষ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা হয় এবং নিম্নমানের দ্রব্য বাতিল করা হয়। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও পরিদর্শনের কাজ।

(৬) **দ্রুতকরণ (Expediting)**ঃ ইহাতে উৎপাদনে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে উহা দূর করিবার পন্থা স্থির করা হয় এবং উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন গতি রক্ষা করা হয়।

(৭) **পরিসংখ্যানগত দ্রব্যমান নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control)**ঃ ইহা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ইহা নমুনা পরীক্ষার (Sample Test) মাধ্যমে দ্রব্যের মান পরীক্ষা করে। মানের ব্যতিক্রম ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দ্রব্যের মান ও উৎকর্ষ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী। ইহাতে আকার, মিশ্রণ, শক্তি, রং ইত্যাদির মান বজায় রাখা সম্ভব হয়। নিয়ন্ত্রণ তালিকার মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৮) **অনুসরণ (Follow-up)**ঃ ইহা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ। ইহার সাহায্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন কার্যক্রম চলিতেছে কিনা তাহা দেখা হয় এবং কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। কাজের মন্থর গতি ও বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে উহা ব্যবহার করা যায়। উৎপাদন কার্যক্রম অনুসরণ করা ও প্রয়োজনে পরিমার্জন করা ইহার কাজ।

উৎপাদিকাশক্তির ধারণা (Concept of Productivity):

অর্থনীতিবিদ্ কোয়েসনে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উৎপাদিকাশক্তি কথাটির অবতারণা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে ইহার অর্থপূর্ণ প্রচলন ঘটে।

উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের উপকরণের **অনুপাতকে** উৎপাদিকাশক্তি বলে। ইহার দ্বারা উৎপাদনের উপকরণসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবহার প্রকাশ পায়। যদি অপেক্ষাকৃত কম উপকরণ ব্যবহার করিয়া একই পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে ইহা বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি নির্দেশ করে। অধিক পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করিয়া সেই অনুপাতে উৎপাদন না বাড়িলে উহা উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস নির্দেশ করে। সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হইলে উহা সর্বোচ্চ উৎপাদিকাশক্তি নির্দেশ করে। পিটার ড্রাকারের (**Peter Drucker**) মতে, "সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহের যথাযোগ্য ভারসাম্য আনয়ন করাকে উৎপাদিকাশক্তি বলে।"

$$\text{উৎপাদিকাশক্তি (Productivity)} = \frac{\text{উৎপাদন (Output)}}{\text{উপকরণ (Input)}}$$

$$\text{অথবা, } P = \frac{O}{I}$$

যেখানে, P = উৎপাদিকাশক্তি,
O = উৎপাদন এবং I = উপকরণ।

কাঁচামাল, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণ।

$$\text{কাঁচামালের উৎপাদিকাশক্তি} = \frac{\text{উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ}}{\text{নিয়োজিত কাঁচামালের মূল্য}}\text{।}$$

$$\text{শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি} = \frac{\text{উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ}}{\text{নিয়োজিত শ্রমের মূল্য}}\text{।}$$

$$\text{মূলধনের উৎপাদিকাশক্তি} = \frac{\text{মোট দ্রব্যের পরিমাণ}}{\text{মোট বিনিয়োগ}}\text{।}$$

মোট উৎপাদিকাশক্তি হইল উপকরণগুলির উৎপাদিকাশক্তির সমষ্টি।

উৎপাদন ও উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য (Difference between Production and Productivity):

উৎপাদন ও উৎপাদিকাশক্তি এক কথা নয়। **উৎপাদন** বলিতে মোট উৎপাদিত পণ্য অথবা দ্রব্যকে বুঝায়। কিন্তু **উৎপাদিকাশক্তি** বলিতে উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণের অনুপাত (Ratio)-কে বুঝায়।

$$\text{উৎপাদিকাশক্তি } (P) = \frac{\text{উৎপাদন } (O)}{\text{উপকরণ } (I)}$$

$$\text{অথবা, } P = \frac{O}{I}\text{।}$$

বর্ধিত উৎপাদন ও বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য (Difference between Increased Production and Increased Productivity) ঃ

বর্ধিত উৎপাদন ও বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি এক কথা নয়। পূর্বের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে বর্ধিত উৎপাদন বলে। উৎপাদনের উপকরণ বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহা বর্ধিত উৎপাদন নির্দেশ করে।

উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই যে সর্বদা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নহে। উৎপাদন এবং উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণের অনুপাতকে উৎপাদিকাশক্তি বলে। অর্থাৎ $P = \frac{O}{I}$। একই পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করিয়া যদি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তবে উহাকে বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি বলে। অর্থাৎ উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে তবেই উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বর্ধিত উৎপাদন অধিক পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে ; কিন্তু বর্ধিত উৎপাদিকা-শক্তি উৎপাদনের দক্ষতা নির্দেশ করে।

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা (Importance of Increase in Productivity) ঃ

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহাতে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়।

(২) ইহাতে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) ইহা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করে। ইহা কর ও রাজস্ব-নীতি এবং মজুরি ও কর্মসংস্থান নীতি নির্ধারণে বিশেষ কার্যকরী।

(৪) ইহাতে শ্রম ও কাঁচামালের অপচয় বন্ধ হয়।

(৫) ইহাতে শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর মজুরি পায় এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৬) ইহা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও দক্ষতা নিরূপণে সাহায্য করে।

(৭) ইহা দ্রব্যের মান উন্নত করে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে।

(৮) ইহাতে শিল্পসংস্কার, পুনর্গঠন, নবীকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়।

(৯) ইহাতে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় অর্থনীতি সুদৃঢ় হয়।

(১০) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তির ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদিকাশক্তির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তি কারবারের সাফল্য নির্দেশ করে।

জাতীয় স্তরে উৎপাদিকাশক্তির ধারণা পরিকল্পনা রচনা, কর ও রাজস্ব-নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসংস্থান ও মজুরি নির্ধারণে সাহায্য করে।

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উপায়সমূহ (Tools or Steps for Increasing Productivity) ঃ

উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে :

(১) উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রযোগ করা।

(২) উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাকৌশলের প্রযোগ করা।

(৩) সময়-সমীক্ষা, গতি-সমীক্ষা, ক্লান্তি-সমীক্ষা, পদ্ধতি-সমীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত ও উন্নত উপায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন করা।

(৪) উৎপাদন ব্যবস্থার সরলীকরণ ও বিশেষায়ণ করা।

(৫) দ্রব্যের মান নির্ধারণ করা।

(৬) প্রেরণামূলক মজুরি প্রথার প্রবর্তন করা।

(৭) শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি করা।

(৮) অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিয়া আরও উন্নততর ব্যবস্থার প্রয়োগ করা।

(৯) দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচনের ব্যবস্থা করা।

(১০) দ্রব্যের মান উন্নয়ন, গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ও মজুত নিয়ন্ত্রণ করা।

(১১) সঠিক কাজে উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা।

(১২) কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(১৩) দ্রব্যের মানোন্নয়নের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(১৪) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি বিদ্যার উন্নতি, আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং অনুকূল সরকারী নীতি উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।

ভারতে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির আন্দোলন (Productivity Movement in India) :

১৯৫২ এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (International Labour Organisation বা ILO) দুইটি বিশেষজ্ঞ সমীক্ষক দল বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কলিকাতায় আসেন। ইহারা কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং সুপারিশ করেন যে, যন্ত্রপাতির পরিবর্তন না করিয়া এবং উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন না করিয়াও যদি সঠিক তত্ত্বাবধান ও উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি প্রয়োগ এবং শ্রমিকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। ইহাই ভারতে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির প্রথম প্রয়াস।

আই এল ও (ILO) বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাই-এ একটি উৎপাদিকাশক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সারাভাই-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জাপানে শিল্প পরিদর্শনে যান এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের বিবরণী ও সুপারিশ পেশ করেন। ঐ বৎসরেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর দিল্লীতে উৎপাদিকা-শক্তি সম্পর্কিত একটি আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান করেন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে **জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি পরিষদ** (National Productivity Council) একটি স্বয়ং-শাসিত সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। ইহা ৬০ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ। ইহাতে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকে। ইহার অধীনে ছয়টি আঞ্চলিক উৎপাদিকাশক্তি পরিষদ আছে। এইগুলি কলিকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর এবং লুধিয়ানায় অবস্থিত। ভারত বর্তমানে এশীয় উৎপাদিকা সংস্থার সদস্য।

জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি পরিষদ উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে :

(১) আন্তঃ-শিল্প উৎপাদন তথ্য বিনিময় করা।

(২) উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Labour Training Centre) গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিল্প-কারখানা পরিদর্শন করা।

(৪) পারস্পরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা।

(৫) গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(৬) বিদেশী বিশেষজ্ঞ আহ্বান করা।

(৭) পরিষদগুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন ও পরামর্শ দেওয়া।

(৮) উৎপাদিকাশক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই সম্পর্কে তথ্যমূলক চলচ্চিত্র (Documentary Film) প্রস্তুত ও প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

* বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
(Scientific Management)

প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য (Nature and Purpose) :

বর্তমান জগতে উৎপাদনের মৌল সমস্যা হইল কিভাবে উৎপাদিকাশক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করা যায়। কিন্তু ধ্রুপদী গতানুগতিক বা **ঐতিহ্যময় ব্যবস্থাপনায়** (**Traditional Management**) উৎপাদিকাশক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। ইহা *বিশ্লেষণ, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রামাণিক ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠে নাই।* ধ্রুপদী গতানুগতিক ব্যবস্থাপনায় একজন যুবক শিক্ষানবীশ (Apprentice) হিসাবে কোনও

* কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গ ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষ কারিগরের অধীনে থাকিয়া ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান অর্জন করিত। তাহার কোন ব্যবস্থাপনার শিক্ষা থাকিত না। পরবর্তীকালে গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে আসে **পদ্ধতিমূলক ব্যবস্থাপনা** (**Systematic Management**)। ইহাও বিশ্লেষণ-বর্জিত এবং গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা পুরাতন রীতি-নীতি ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে সময়, অর্থ, কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় হইত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা তেমন কার্যকর ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার **ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর** (**Frederick Winslow Taylor**) শিল্প-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন। বহু গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রামাণিক ভিত্তিতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করেন। টেলর তাঁহার গবেষণালব্ধ ব্যবস্থাপনার নাম দেন **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা**। এই কারণে টেলরকে **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক** (**Father of Scientific Management**) বলা হয়। এল. এফ. আরউইক (**L. F. Urwick**)-এর মতে "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গতানুগতিক পদ্ধতিমূলক ব্যবস্থাপনাকে দূরে সরাইয়া দিয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে।" টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যুগান্তকারী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শব্দটি আমেরিকার জনগণের নিকট প্রথম প্রকাশ করেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একজন প্রখ্যাত অ্যাটর্নি (Attorney) লুই. ডি ব্রাণ্ডস (Louis D Brandeis), যিনি পরবর্তীকালে ওহিও এবং পোটোম্যাক নদীর উত্তরে অবস্থিত রেল পরিবহণ সংস্থার মাশুলের হার নির্ধারণকারী বিচারক নিযুক্ত হন। কিন্তু টেলর ও তাঁহার সহকর্মিগণ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় চিন্তা করেন। এই কারণে টেলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

এফ. ডব্লু টেলর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সামান্য শ্রমিক হিসাবে আমেরিকার মিডভেল স্টীল কোম্পানীতে (Midvale Steel Co.) যোগদান করেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহার ক্রমাগত পদোন্নতি ঘটে এবং পরিশেষে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রধান বাস্তুকার (*Chief Engineer*) পদে উন্নীত হন। এই পদে থাকাকালীন সময়ে টেলর অত্যন্ত দুঃখের সহিত অনুভব করেন যে, শ্রমিকেরা যাহা উৎপাদন করে তাহা তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় খুবই নগণ্য। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য টেলর গবেষণায় লিপ্ত হন এবং **সময়-সমীক্ষা** (**Time Study**), **গতি-সমীক্ষা** (***Motion Study***) ও ***শ্রান্তি-সমীক্ষা*** (***Fatigue Study***) করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্য প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থার (Incentive Wage System) প্রবর্তন করেন। ইহাতে একদিকে শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং

অন্যদিকে শ্রমিক অধিকতর মজুরি পাইতে থাকে। টেলর তাঁহার গবেষণার তত্ত্ব আমেরিকার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির (American Society of Mechanical Engineers) নিকট বক্তৃতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কাজের সময় ও পদ্ধতি বাঁধিয়া দেওয়ায় মিডভেল স্টীল কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ দেখা দেয়। টেলরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। তিনি বেথলেহেম স্টীল ওয়ার্কস (Bethlehem Steel Works) কোম্পানীতে ধাতু খণ্ডীকরণ (Metal Cutting)-এর উপর গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। ইহার পর টেলর তাঁহার গবেষণার ফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ **তারতম্যমূলক ঠিকা মজুরি প্রথা** (Differential Piece Rate System) ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রথা অনুসারে দক্ষ ও নিপুণ শ্রমিক উচ্চহারে মজুরি পায় এবং অদক্ষ শ্রমিক কম হারে মজুরি পাইয়া থাকে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে টেলরের দ্বিতীয় প্রবন্ধ **কারখানা ব্যবস্থাপনা** (Shop Management) প্রকাশিত হয় এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে টেলর তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি** (Principles of Scientific Management) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নীতি বিশ্লেষণ করেন।

১৯১১ এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ টেলরের জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ এই সময় আমেরিকার অধিকাংশ কারখানা-ব্যবস্থাপকগণ টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি তাঁহাদের কারখানায় প্রয়োগ করেন। কিন্তু টেলরের তত্ত্বে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী নীতি থাকায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নমনোরথ টেলরের মৃত্যু হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণে টেলরকে যাহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এইচ. এস. পারসন (**H. S. Person**), ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ (**Frank Gilbreth**), গ্যাণ্ট (**Gantt**), এমারসন্ (**Emerson**), কেনডল (**Kendall**) বার্থ (**Barth**) এবং এফ. এ. হ্যাল্‌সীর (**F. A. Halsey**) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টেলরের মৃত্যুর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পুনর্জাগরণ ঘটে। ফরাসী প্রধান ক্লেমেনশো (Clemenceau) সামরিক সংগঠনগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের আদেশ দেন। এমনকি বলশেভিক রাশিয়ায় ভি. এ. লেনিন (V. A. Lenin) সামরিক সংগঠনগুলিকে টেলরের নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Depression) দূরীকরণের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বীজ রোপিত হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার নীতি সুদূর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে *শিল্প-সংস্কার* (Rationalisation) ও *উৎপাদিকাশক্তির ধারণা* (Concept of Productivity) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু এল. এফ. আরউইক (L. F. Urwick)-এর মতে এই ধারণাগুলি সমার্থক। বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থাপনার দর্শন উদ্ভাবন করেন বলিয়া টেলরকে **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়।**

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? (What is Scientific Management?) ঃ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটি দর্শন বা পদ্ধতি যাহা গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বনিম্ন উপকরণের সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন করা।

বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

এইচ. এস. পারসন (H. S. Person)-এর মতে, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলিতে উদ্দেশ্যমূলক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দ্বারা উদ্ভূত নীতি ও সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত এমন একটি সংগঠন ও প্রক্রিয়ার ধরনকে বুঝায়, যাহা প্রচলিত রীতি বা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা-প্রসূত ও সাময়িক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার দ্বারা নির্ধারিত কর্মনীতির উপর নির্ভরশীল নহে।"

লয়েড ডড ও লিঞ্চ (Lloyd Dodd and Lynch)-এর মতে, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এমন একটি পদ্ধতি যাহার দ্বারা কার্যপদ্ধতি, শ্রম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধা লাভ করা যায় এবং যাহা স্থান ও বিন্যাস স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বণ্টন পর্যন্ত উৎপাদনের সকল কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

অধ্যাপক মার্শাল (Prof. Marshall)-এর মতে, "বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যের সম্পর্ক বিচার-বিবেচনা, পর্যালোচনা ও পুনঃ সংগঠনের সুচিন্তিত ফল বিচক্ষণতার সহিত শিল্প-পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োগ করাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে।"

অধ্যাপক এম. সি. শুক্লার (Prof. M. C. Shukla) মতে, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটি কলা (Art), যাহার সাহায্যে কি কাজ করিতে হইবে তাহা সঠিকভাবে জানা এবং কিভাবে করিতে হইবে তাহার সঠিক কার্যপদ্ধতি নিরূপণ করাকে বুঝায়।"

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত সূত্রকে শিল্প-পরিচালনায় প্রয়োগ করাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি বা বৈশিষ্ট্য (Principles or Features or Elements of Scientific Management) ঃ

যে সকল অবস্থার উপর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে সেই সকল অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার **মূল নীতি** বা **বৈশিষ্ট্য বা উপাদান** বলে। **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহকে দুইভাবে আলোচনা করা যায় :**

(ক) **মানবীয় দিক (Human Aspects) :** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির মানবীয় দিকগুলি হইল :

(১) **শ্রমিক নিয়োগ (Recruitment of Labour) :** কারবারের বিভিন্ন কাজের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচার করিয়া কর্মচারী নিয়োগ বিভাগকে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) **শ্রমিক সংস্থাপন (Placement of Labour) :** যে শ্রমিক যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। কে কোন কাজে দক্ষ, তাহা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে স্থির করিতে হইবে।

(৩) **শ্রমিক প্রশিক্ষণ (Labour Training) :** শ্রমিক যাহাতে নূতন উৎপাদন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে পারে এবং পরিবর্তনশীলতার সহিত তাল মিলাইতে পারে তাহার জন্য শ্রমিকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) **সময়-সমীক্ষা বা নিরীক্ষণ (Time Study) :** শিল্পীয় কার্যক্রমের প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কত সময় প্রয়োজন তাহার সমীক্ষা করাকে সময়-সমীক্ষা বলে। শ্রমিকের সাধারণ কর্মকুশলতার উপর ভিত্তি করিয়া মান-সময় (Standard Time) স্থির করা হয়। অব্যবহৃত সময়ের (Idle Time) জন্য উপযুক্ত সংস্থান রাখিতে হইবে। ইহাতে সময়ের অপচয় রোধ হইবে।

(৫) **গতি-সমীক্ষা বা নিরীক্ষণ (Motion Study) :** ইহাতে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের দ্বারা শ্রমিকের অঙ্গসঞ্চালনের গতি স্থির করা হয়। শ্রমিকের অঙ্গসঞ্চালন গতি দুই প্রকার—উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদনক্ষম। অনুৎপাদনক্ষম অঙ্গসঞ্চালন যতদূর সম্ভব কম করিলে সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ করা যাইবে।

(৬) **শ্রান্তি-সমীক্ষা বা নিরীক্ষণ (Fatigue Study) :** বিরামহীন একটানা কাজে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক অবসাদ আসে এবং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। এই কারণে মাঝে মাঝে শ্রমিককে বিশ্রাম দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতক্ষণ পর পর এবং কতক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতে হইবে তাহা কাজের প্রকৃতি দ্বারা স্থির করা হয়।

(৭) **প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থা (Incentive Wage System) :** টেলরের মতে 'তারতম্যমূলক ঠিকা মজুরি প্রথা' (Differential Piece Rate System) প্রয়োগ করিয়া মজুরি ব্যবস্থাকে প্রণোদনামূলক করা সম্ভব। তাঁহার মতে, যে সকল শ্রমিক মান-সময়ের (Standard Time) মধ্যে মান-উৎপাদন (Standard Output) করিতে পারে তাহাকে উচ্চ হারে মজুরি দিতে হইবে এবং যাহারা মান-সময়ের মধ্যে মান-উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাদের কম হারে মজুরি দিতে হইবে। ইহাতে সুদক্ষ শ্রমিকের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

(৮) **রৈখিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে কার্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ (Introduction of Functional Control instead of Line Control) :** রৈখিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিশেষায়নের অভাব পরিলক্ষিত হয় বলিয়া টেলর কার্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের পক্ষপাতী। ইহাতে বিশেষায়ণ (Specialisation) বৃদ্ধি পাইবে।

(৯) **কার্যভিত্তিক কর্মনায়ক নিয়োগ (Appointment of Functional Bosses) :** শ্রমিকের কার্যক্রম তদারকির জন্য কয়েকটি বিশেষায়িত ও নিপুণ তদারক বিভাগ গ্রহণ করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া কর্মনায়ক নিয়োগ করা হয়। টেলর আটজন কার্যভিত্তিক কর্মনায়ক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। যেমন—

(ক) **গ্যাং বস (Gang Boss) :** ইনি একটি কর্মদলকে দেখাশুনা করেন।

(খ) **স্পীড বস (Speed Boss) :** ইনি প্রতিটি শ্রমিক সর্বাধিক সম্ভব গতিতে কাজ করিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখেন।

(গ) **রিপেয়ার বস (Repair Boss) :** ইনি যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া গেলে সত্ত্বর উহা সারাইবার ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) **ইন্সপেক্টর (Inspector) :** ইনি শ্রমিকদের কাজের মান যথাযথ আছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখেন।

(ঙ) **শপ ডিসিপ্লিনারিয়ান (Shop Disciplinarian) :** ইনি কোন শ্রমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(চ) **রুট ক্লার্ক (Route Clerk) :** ইনি শ্রমিকগণের কার্যক্রমের ধাপ নির্দেশ করেন।

(ছ) **ইনস্ট্রাকসন কার্ড ম্যান (Instruction Card Man) :** ইনি শ্রমিকদের কাজের নির্দেশপত্র প্রস্তুত করেন।

(জ) **টাইম অ্যাণ্ড কস্ট ক্লার্ক (Time and Cost Clerk) :** মজুরি বিল প্রস্তুত করিবার জন্য কোন্ শ্রমিক কোন্ কাজে কত সময় লইয়াছে এবং শ্রম বাবদ কত ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব রাখেন এবং তথ্য সরবরাহ করেন।

(১০) **শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক (Co-operation and Friendship between Labour and Management) :** শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ ও মতামত বিবেচনা করিয়া এবং শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে।

(১১) **মানসিক বিপ্লব (Mental Revolution) :** কম কাজ করিয়া অধিক মজুরি আয় করিবার মানসিক প্রবৃত্তি শ্রমিকের মধ্যে দেখা যায়। আবার মালিকের

মানসিক প্রবৃত্তি হইল যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়া অধিক কাজ করাইয়া লওয়া। সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের এই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

(খ) অমানবীয় দিক (Non-Human Aspects):

(১) যন্ত্রপাতি (Machinery): পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন করিয়া সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে।

(২) কাঁচামাল (Materials): উৎপাদনে উপযুক্ত মানের কাঁচামাল ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদনের গুণগত মান উন্নত হইবে এবং কাঁচামালের অপচয় বন্ধ হইবে

(৩) কারখানার স্থান নির্বাচন এবং পরিবেশ (Factory Location and Environment): উপযুক্ত স্থানে কারখানার স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। ইহাতে ব্যয়-সংকোচনের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হয়। কারখানার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হইতে হইবে। শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সুলভ ক্যান্টিন-ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কাজের বৈজ্ঞানিক বণ্টন (Central Planning and Scientific Allocation of Jobs): উৎপাদনের জন্য একটি পৃথক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ থাকিবে। কাজটি কি, কখন করা হইবে, কোথায় করা হইবে এবং কি ভাবে তাহা পরিকল্পনা বিভাগ স্থির করে। শ্রমিকের শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ বিবেচনা করিয়া এমনভাবে কর্ম বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

(৫) অপচয় রোধ (Prevention of Wastage): উৎপাদন প্রক্রিয়া এমনভাবে স্থির করিতে হইবে যাহাতে কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও আর্থিক অপচয় রোধ করা যায়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা (Advantages of Scientific Management):

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়:

(১) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in Efficiency): ইহাতে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(২) উৎপাদন বৃদ্ধি (Increase in Output): ইহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৩) মজুরি বৃদ্ধি (Increase in Wage): ইহাতে শ্রমিক অধিক মজুরি আয় করিতে পারে।

(৪) **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন** (**Increase in Standard of Living**): অধিক মজুরি আয় করে বলিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৫) **উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি** (**Greater Incentive**): উপযুক্ত কাজে সঠিক শ্রমিককে নিয়োগ করা হয় বলিয়া শ্রমিকের কর্ম-সন্তুষ্টি (Job Satisfaction) আসে, ফলে কাজে তাহার উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

(৬) **শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি** (**Increase in Labour Productivity**): সময়-সমীক্ষা, গতি-সমীক্ষা, শ্রান্তি-সমীক্ষা, কর্ম-সমীক্ষা, পদ্ধতি-সমীক্ষা ইত্যাদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ফলে শ্রমিকের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৭) **গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা** (**Facility of Research and Experiments**): গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য উপাদান। ইহাতে নূতন যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

(৮) **উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস** (**Reduction in Production Cost**): ইহাতে উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ ঘটে এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৯) **প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি** (**Progressive Outlook**): ইহাতে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। শ্রমিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের প্রতি যত্ন লওয়া হয়, ফলে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য সুদৃঢ় হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনা ও অসুবিধা (**Criticisms and Drawbacks of Scientific Management**):

শিল্পজগতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা আলোড়নকারী পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে বহু শিল্প-ব্যবস্থাপক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দর্শনে (Philosophy) মুগ্ধ হন এবং উহার প্রয়োগে অত্যুৎসাহী ও যত্নশীল হন। শিল্পজগতে ইহার দর্শন যতই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করুক না কেন, এই নীতির পরস্পর বিরোধিতা ইহাকে হিমঘরে (Cold Storag) আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা করা হয়:

(১) **ব্যয়-বহুল পদ্ধতি** (**Expensive Device**): ইহার কার্যক্রম অনুসরণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, ক্ষুদ্র কারখানার পক্ষে ইহা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

(২) **কর্ম-কৌশল পরিবর্তন** (**Change in Technique of Production**): ইহাতে কর্ম-কৌশল ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় বলিয়া শ্রমিকেরা ইহা পছন্দ করে না। ইহাতে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতাও নষ্ট হয়।

(৩) **শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা (Opposition by Workers' Union) :** এইরূপ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের শরীর ও মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধতা নষ্ট করে এই অভিযোগে শ্রমিক সংঘ ইহার বিরোধিতা করে।

(৪) **শ্রমিক অসন্তোষ (Labour Dissatisfaction) :** তারতম্যমূলক ঠিকা মজুরি প্রথা প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের মজুরির হার ভিন্ন ভিন্ন হয়, ফলে শ্রমিকের মনে ঈর্ষা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

(৫) **কাজে একঘেয়েমী (Monotony in Work) :** ইহাতে শ্রমিকের কাজে একঘেয়েমী আসে এবং কর্মের অনুপ্রেরণা হ্রাস পায়।

(৬) **বেকারত্ব (Unemployment) :** পুরানো শ্রমিক নূতন যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশলের সঙ্গে অপরিচিত থাকে বলিয়া তাহাদের বেকার হইবার সম্ভাবনা বেশী।

(৭) **অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Undemocratic System) :** এইরূপ ব্যবস্থাপনায় উর্ধ্বতন কর্মচারী শ্রমিকদের যন্ত্রের মত চালনা করে। ইহা শ্রমিক কল্যাণ পরিপন্থী ও অগণতান্ত্রিক।

(৮) **বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নীতি (Unscientific Principles) :** ইহার বহু নীতিই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আটজন কর্মনায়ক (Functional Bosses) নিয়োগের ফলে বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

(৯) **কারখানা বা উৎপাদন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা মাত্র (Factory or Production Management only) :** ইহা সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা নহে, কেবলমাত্র কারখানা-সংক্রান্ত বা উৎপাদন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।

(১০) **অবাস্তব (Impractical) :** একদিকে কার্যভিত্তিক কর্মনায়কত্বের প্রবর্তন এবং অন্যদিকে পরিকল্পনা রচনা হইতে উহার পৃথকীকরণ অবাস্তব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নহে।

বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ইহার প্রয়োগ অপরিহার্য, কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাহায্য ব্যতীত শিল্পে দক্ষতা ও অগ্রগতি সম্ভব নহে। প্রয়োজনানুসারে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনসাধন করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সহিত শিল্প সংস্কার * উৎপাদিকাশক্তির ধারণা যুক্ত করিলে উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে।

* শিল্প-সংস্কার (Rationalisation) :

প্রকৃতি ও তাৎপর্য (Nature and Significance) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর শিল্প বিধ্বংস হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য যে অভিনব ও সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাই শিল্প-সংস্কার নামে অভিহিত।

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

জার্মান শব্দ 'রাসানালিশিয়ারাং' (Rationalisierung) ইংরাজী রেসনালাইজেসন (Rationalisation) কথাটির প্রতিশব্দ। ইহার অর্থ হইয়েছে, 'শিল্পে যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করা।' যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রতিটি উপকরণ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে সর্বাধিক ব্যয়-সংকোচ হইবে এবং শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প-সংস্কারে কর্মধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

শিল্প-সংস্কারের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য হইয়েছে—

(১) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কর্মী সংগঠন করা,
(২) দ্রব্যসামগ্রীর প্রমিতকরণ করা,
(৩) প্রযুক্তি কৌশল ও সংগঠন উন্নত করা;
(৪) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করা,
(৫) পরিবহণ ও বিপণনের উন্নতি করা,
(৬) জনসম্পদ ও বস্তুসম্পদের অপচয় হ্রাস করা,
(৭) অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ করা।
(৮) পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন ও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা;
(৯) পণ্যের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা,
(১০) বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা,
(১১) দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা,
(১২) শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপন করা,
(১৩) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা,
(১৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট গঠন করা;
(১৫) অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন করা,
(১৬) বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন ও প্রচার-পদ্ধতি অনুসরণ করা.
(১৭) পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা;
(১৮) চাহিদা অনুপাতে উৎপাদনের সামঞ্জস্য বিধান করা, ইত্যাদি।

বিশেষীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনে ব্যয়-সংকোচ ও উৎকর্ষসাধন করাই শিল্প-সংস্কারের মূল তাৎপর্য। **শিল্প-সংস্কার বলিতে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বুঝায় না, কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারকে বুঝায়।** শিল্প-সংস্কারের দুইটি দিক আছে, যেমন—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ শিল্প-সংস্কারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাহ্যিক শিল্প-সংস্কারে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জোট বন্ধন করিয়া প্রতিযোগিতা হ্রাস, বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি, যৌথভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, কারিগরি গবেষণা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

শিল্প-সংস্কার কাহাকে বলে ? (What is Rationalisation ?) ঃ

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্মেলনে শিল্প-সংস্কারের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : **প্রযুক্তিকৌশল ও সংগঠনের যে পদ্ধতিতে জনসম্পদ ও বস্তু-সম্পদের অপচয় যথাসম্ভব হ্রাস করা যায়, তাহাকে শিল্প-সংস্কার বলে।**

অধ্যাপক রবিনসন্ (Prof. Robinson)-এর মতে, 'শিল্প-সংস্কার বলিতে সমগ্র শিল্পের সহিত ইহার অন্তর্ভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনকে বুঝায়।"

অধ্যাপক সার্জেণ্ট ফ্লোরেন্স (Prof. Sargent Florence)-এর মতে, 'কোন শিল্পের অন্তর্গত সমগ্র প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে অপচয় ও দক্ষতার অভাব দূর করিবার আন্দোলনকে শিল্প-সংস্কার বলে।"

শিল্প-সংস্কারের সুবিধা (Advantages of Rationalisation) ঃ শিল্প-সংস্কারে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

(১) **প্রতিযোগিতা হ্রাস (Reduction in Competition) ঃ** ইহাতে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হ্রাস করিয়া চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সুসামঞ্জস্য আনয়ন করা যায়।

(২) **সম্পদের সদ্ব্যবহার (Better Utilisation of Resources) ঃ** ইহাতে বস্তুসম্পদ ও জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৩) **অপচয় রোধ (Elimination of Wastage) ঃ** ইহাতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রমের অপচয় বন্ধ হয়।

(৪) **উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা (Economies of Production and Distribution) ঃ** ইহাতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় সরলীকরণ আনা হয় এবং বহুল-উৎপাদন (Mass Production) ও বহুল-বণ্টনের (Mass Distribution) সুবিধা ভোগ করা যায়।

(৫) **ব্যয়-সংকোচ (Economy) ঃ** শিল্প-সংস্কারে বিশেষীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাতে উৎপাদন ব্যয়, পরিবহণ ব্যয় ও বিপণন ব্যয় হ্রাস পায়।

(৬) **মানোন্নয়ন (Improvement in Standard) ঃ** ইহাতে গবেষণা, নিরীক্ষণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার নূতন কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পণ্যের উৎকর্ষ ও মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(৭) **শিল্পোন্নতি (Development of Industries) ঃ** ইহাতে রুগ্ণ শিল্প পুনর্জীবিত হয়, শিল্পের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ়

হয়, উৎপাদক, শ্রমিক ও ভোগকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়।

শিল্প-সংস্কারের অসুবিধা (Drawbacks of Rationalisation) ঃ

শিল্প-সংস্কারে নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ দেখা যায় :

(১) **একচেটিয়ার উদ্ভব (Growth of Monopoly) ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হয় বলিয়া ইহাতে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়।

(২) **পণ্যমূল্য বৃদ্ধি (Increase in Price) ঃ** অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় বটে, কিন্তু নূতন যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগ কৌশলে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবে দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(৩) **অর্থলগ্নির সমস্যা (Problem of Investment) :** নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও শিল্প আধুনিকীকরণের জন্য প্রচুর অর্থলগ্নির প্রয়োজন হয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থলগ্নিই শিল্প-সংস্কারের প্রধান অন্তরায়।

(৪) **ব্যবস্থাপনার সমস্যা (Problem of Management) ঃ** ইহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব দেখা যায়।

(৫) **বেকারত্ব (Unemployment) ঃ** শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। ফলে শ্রমিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

(৬) **ধারাবাহিকতা বিনষ্ট (Discontinuity) ঃ** নূতন ব্যবস্থায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়।

(৭) **একঘেয়েমী (Monotony) :** ইহাতে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া শ্রমিকের কাছে একঘেয়েমী বৃদ্ধি পায়।

ভারতে শিল্প-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রগতি (Need for Rationalisation in Indian Industries and its Progress) ঃ

ভারতের শ্রমিক নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি গিরির (V V. Giri) মতে, "শিল্প-সংস্কার কর্মধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। ইহাতে অচল ও রীতিবিরুদ্ধ কর্মধারা পরিত্যাগ করিয়া কর্মধারায় বিজ্ঞানভিত্তিক রীতি-নীতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়।"

শিল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতের শিল্পসংস্থায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পুরাতন। উৎপাদন-পদ্ধতিও প্রাচীন। সেই কারণে উৎপাদন ব্যয় অধিক পড়ে। বিশেষ করিয়া, পাট শিল্প, কয়লা শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদন ব্যয় অধিক বলিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের দ্রব্য তীব্র প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না।

বিভিন্ন শিল্পে শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

পাট শিল্প (Jute Industry) : বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য পাট শিল্পের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। স্বকীয় চেষ্টা ও সরকারী আর্থিক সহায়তায় শতকরা ৮০ ভাগ পাট শিল্পে শিল্প-সংস্কার করা হইয়াছে এবং যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ সম্ভব হইয়াছে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্য নবীকরণ, রুগ্ণ পাটকল অধিগ্রহণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ন্যাশানাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন (National Development Corporation or NDC) পাট শিল্পের সংস্কারের জন্য ৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (Indian Jute Mills Association or IJMA) এবং ইন্স্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজি (Institute of Jute Technology or IJT) পাট শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও নবীকরণের চেষ্টা করিতেছে।

তুলাবস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry) : এই শিল্পে যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য তুলাবস্ত্র শিল্পে আশু সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। স্বকীয় ও সরকারী প্রচেষ্টায় প্রায় ·০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যে এই শিল্পে কিছু সংখ্যক স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও উন্নত শক্তিসম্পন্ন মাকু নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরলীকরণের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। জোটবন্ধন ও উপযুক্ত মানের কাঁচামালের অভাব তুলাবস্ত্র শিল্পকে দুর্বল করিয়া দিতেছে।

কয়লা শিল্প (Coal Industry) : ভারতীয় কয়লা খনিগুলি ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় যন্ত্রপাতির প্রয়োগ কম এবং উৎপাদিকাশক্তির হারও কম। কয়লা শিল্পের উন্নয়নের উপর শিল্পের অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Coal India Ltd), ধানবাদের ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (Fuel Research Institute), ন্যাশানাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, (National Coal Development Corporation), কোল ওয়াশিং প্লাণ্ট (Coal Washing Plant) ইত্যাদি স্থাপন করিয়া কয়লা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

শর্করা শিল্প (Sugar Industry) : শর্করা শিল্পের যন্ত্রপাতি পুরাতন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় ইহাতে শিল্প-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। চিনি কলগুলি আধুনিকীকরণের জন্য শর্করা উন্নয়ন কাউন্সিল (Sugar Development Council) গঠন করা হয়। ন্যাশানাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন (NDC) শর্করা শিল্পকে আধুনিকীকরণের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করে। শর্করা শিল্পে গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউট অফ সুগার টেকনোলজি (Institute of Sugar Technology) এবং ইনস্টিটিউট অফ সুগারকেন্ রিসার্চ (Institute of Sugarcane Research) সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

রুগ্ণ শিল্প (Sick Industry) : রুগ্ণ শিল্প সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন (Industrial Reconstruction Corporation) গঠন করিয়াছেন এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। একত্রীকরণের মাধ্যমেও শিল্প সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) : এই শিল্পের সংস্কারের অগ্রগতি বিশেষ সন্তোষজনক। সরলীকরণ, বিশেষীকরণ, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্প-সংস্কার করা হইতেছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর (IISCO) সহিত স্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল (SCOB)-এর সংযুক্তি ঘটে। কিন্তু অর্থের অভাব, কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি সমস্যা এই শিল্পের সংস্কারে অন্তরায়।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে শিল্প-সংস্কারের যে নীতির উল্লেখ করা হয়, সেইগুলি হইল :

(১) শিল্প-সংস্কারে যেন কোন শ্রমিকের আয় হ্রাস না পায় এবং কোন শ্রমিক ছাঁটাই না হয়।

(২) শিল্প-সংস্কারের সুফল যুক্তিসঙ্গত অনুপাতে শ্রমিক, মালিক ও ক্রেতার মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

(৩) শ্রমিকের কর্মভার নির্ধারণ শ্রমিক-মালিক উভয়ের সম্মতিতে করিতে হইবে এবং কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন করিতে হইবে।

(৪) শিল্প-সংস্কার আরম্ভের অন্ততঃ ৩ সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিকল্পনা শ্রমিক সংঘকে জানাইতে হইবে।

(৫) শিল্প-সংস্কারপ্রসূত শ্রমিক অশান্তি শিল্পবিরোধ আইনের দ্বারা মিটাইতে হইবে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার শিল্প-সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন :

(১) শ্রমিকগণের কর্মভার নির্ধারণে কারিগরি দিক বিচার করিতে হইবে।

(২) ছাঁটাই শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ছাঁটাই কর্মীদের বিকল্প কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) শিল্প-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা শ্রমিকদের জানাইতে হইবে।

(৫) শিল্প-সংস্কার পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্প-সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Scientific Management and Rationalisation) :

শিল্প-সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

শিল্প-সংস্কার	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১। ইহার **পরিধি** ব্যাপক। ইহা কেবলমাত্র একটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ সংস্কার নহে, ইহাতে কোন শিল্পের অন্তর্গত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনকে বুঝায়।	১। ইহার **পরিধি** সংকীর্ণ। ইহাতে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।
২। ইহাতে দুর্বল ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটাইয়া সমজাতীয় দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সহিত **জোট গঠন** করা হয়।	২। ইহাতে **শিল্প জোট** সৃষ্টি হয় না।
৩। ইহাতে সম্পদ সংগ্রহের **প্রতিযোগিতা** নির্মূল হয়।	৩। ইহাতে সম্পদ সংগ্রহে **প্রতিযোগিতা** দেখা যায়।
৪। ইহাতে শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **সম্পদের সুষম বণ্টন** হয়।	৪। ইহাতে **সম্পদের সুষম বণ্টন** হয় না।
৫। ইহাতে শিল্পের **অব্যবহৃত** যান্ত্রিক **উৎপাদনক্ষমতা** দূর করা যায়।	৫। ইহাতে যন্ত্রের **উৎপাদন ক্ষমতার** সহিত বাজারের চাহিদার সামঞ্জস্যবিধান করা হয়।
৬। ইহাতে **প্রমিতকরণের** (Standardisation) মাধ্যমে অলাভজনক পণ্য উৎপাদন বন্ধ করা হয়।	৬। ইহাতে **প্রমিতকরণের** (Standardisation) কোন ব্যবস্থা নাই।
৭। ইহাতে **প্রযুক্তি কৌশল**, সংগঠন, বস্তুসম্পদ, জনসম্পদ, অর্থসম্পদ, বিজ্ঞাপন, পরিবহণ, উৎপাদন ও বণ্টন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করা হয়।	৭। ইহাতে বৈজ্ঞানিক **নীতি** প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুবিন্যাস সাধন করা হয়। ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৮। ইহাতে শিল্প **নবীকরণের** ব্যবস্থা করা হয়।	৮। ইহাতে উৎপাদনে **যান্ত্রিকীকরণের** ব্যবস্থা করা হয়।
৯। ইহাতে শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, পণ্যের মান উন্নত হয় এবং **সামাজিক কল্যাণ** সাধিত হয়।	৯। ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ইহার সুফল **মালিক ও শ্রমিকের** মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

শিল্প-সংস্কার	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১০। ইহা শিল্প-সংক্রান্ত সমস্তপ্রকার **অপচয়** বন্ধ করে।	১০। ইহা সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির **অপচয়** রোধ করে।
১১। ইহার **উদ্দেশ্য** হইতেছে শিল্পের মোট উৎপাদনের সহিত ভোগের সামঞ্জস্য বিধান করা।	১১। ইহার **উদ্দেশ্য** হইতেছে পণ্যের বাজার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা।
১২। ইহা সমগ্র **শিল্পটির** উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে।	১২। ইহা **নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির** উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে।
১৩। ইহা কেবল **পুরাতন শিল্পে** প্রযোজ্য।	১৩। ইহা **পুরাতন ও নূতন উভয়** প্রকার **শিল্পেই** প্রযোগ করা যায়।
১৪। ইহা **সমষ্টিগত** (Macro) দৃষ্টিভঙ্গি।	১৪। ইহা **ব্যষ্টিগত** (Micro) দৃষ্টিভঙ্গি।

* **কারখানার বিভিন্ন বিভাগসমূহ (Different Departments in a Factory)** ঃ

একটি কারখানার বিভাগের সংখ্যা নির্ভর করে পণ্য উৎপাদনের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার উপর। একটি বৃহদায়তন কারখানায় নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখা যায় :

(১) পরিকল্পনা বিভাগ (Planning Department) : এই বিভাগের কাজ হইল কি পণ্য উৎপাদন করা হইবে, উৎপাদন প্রক্রিয়া কি হইবে এবং উৎপাদনের জন্য কি কি প্রয়োজন হইবে, তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। ইহাতে কখন কোথায়, কিভাবে এবং কাহারা উৎপাদন করিবে, কিভাবে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগৃহীত হইবে, কোন্ স্তরের মধ্যদিয়া উৎপাদন প্রবাহিত হইবে (Routing), উৎপাদনের সময় (Scheduling) ও হার কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পিত হয়।

(২) উৎপাদন বিভাগ (Production Department) ঃ ইহা শিল্পীয় কারবারের প্রাণকেন্দ্র ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎপাদন-সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার পর উৎপাদনের কার্য আরম্ভ হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষকে উৎপাদন ব্যবস্থাপক (Production Manager) বলে। এই বিভাগের কাজ হইল উৎপাদন-সংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজ সুসম্পাদন করা।

(৩) মজুত বিভাগ বা ভাণ্ডার (Stores Department) ঃ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির অংশ এই বিভাগে সংরক্ষিত হয়। যে সকল কাঁচামাল ক্রয় করা হয়, সেইগুলি পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন মত কাঁচামাল বিভিন্ন

* কেবলমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিভাগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশে সরবরাহ করা এই বিভাগের কাজ। জমা (Stock) ও সরবরাহের হিসাব রাখাও ইহার কাজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল যাহাতে ক্রয় করা না হয় এবং কোন মাল ফুরাইয়া যাইবার পূর্বে উহা ক্রয়ের নির্দেশ দেওয়াও ইহার কাজ। যাহাতে মজুত পণ্যের কোন ক্ষতি না হয় এবং পণ্য রাখিবার স্থানের অভাব না হয় তাহা দেখাও ইহার কাজ। কারখানায় যে সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তাহা মজুত করাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **ক্রয়-বিভাগ (Purchase Department)** : উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এই বিভাগের কাজ। কারখানার বিভিন্ন বিভাগ প্রয়োজনী (Requisition) দিলে এই বিভাগ ক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাঁচামাল ক্রয় করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয় : (ক) কারবারের প্রয়োজন ; (খ) বাজারের গতি ; (গ) কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে, (ঘ) দ্রব্যের মান ; (ঙ) ক্রয়ের নীতি, (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি ; (ছ) ক্রয়ের সময় ; (জ) ক্রয়ের উৎস, ইত্যাদি। উৎপাদনের প্রয়োজন অনুসারে কাঁচামালের প্রয়োজন সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে হইবে। অন্যথায় অধিক ক্রয়ের ফলে হয় চলতি মূলধন আবদ্ধ (Blocked) হইয়া পড়িবে অথবা কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। এই বিভাগকে কাঁচামালের সর্বোচ্চ স্তর (Maximum Level), সর্বনিম্ন স্তর (Minimum Level) এবং ফরমাশ স্তর (Ordering Level) স্থির করিতে হয়। সর্বনিম্ন দামে এবং উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য খোলা বাজারে অথবা দরপত্র (Tender) আহ্বান করিয়া ক্রয় করা যাইতে পারে। নির্ভরযোগ্য এক বা একাধিক বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান উপাত্ত ব্যাঙ্ক (Data Bank) প্রস্তুত করিয়া নির্ভরযোগ্য বিক্রেতার ঠিকানা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ সংরক্ষণ করে। এই বিভাগ মজুত বিভাগ ও উৎপাদন বিভাগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষকে **ক্রয় কর্মাধ্যক্ষ** (Purchase Manager) বলে।

(৫) **মোড়কজাতকরণ বিভাগ (Packing Department)** : উৎপাদিত দ্রব্য রেলে, লরিতে বা জাহাজে বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবার পূর্বে এই বিভাগে মোড়কজাতকরণ করা হয়। দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের মোড়ক ব্যবহার করা হয়। মোড়কজাতকরণের উদ্দেশ্য হইল দ্রব্যের মান বজায় রাখা এবং দ্রব্য যাহাতে অক্ষত অবস্থায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৬) **বিক্রয় ও প্রচার বিভাগ (Sales and Publicity Department)** : এই বিভাগের কার্য হইল কোন্ বাজারে কত দ্রব্য এবং কত দামে বিক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করা। মজুত বিভাগ ও উৎপাদন বিভাগের সহিত সমন্বয় সাধন করাও এই বিভাগের কাজ। দ্রব্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার প্রচার করিবার জন্য এই বিভাগকে প্রচারকার্যও করিতে হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে **বিপণন কর্মাধ্যক্ষ** (Marketing Manager) বলে।

(৭) **হিসাবরক্ষণ ও উৎপাদন-ব্যয় বিভাগ (Accounting and Costing Department)** : লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য হিসাবরক্ষণ বিভাগ এবং উৎপাদন-ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব রাখিবার জন্য উৎপাদন-ব্যয় বিভাগ বড় বড় কারখানায় দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন-ব্যয় নিরূপণ করা ও উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে হ্রাস করা যায় তাহার নির্দেশ দেওয়া এই বিভাগের কাজ। এই বিভাগে অ্যাকাউন্টেন্ট (Accountant) এবং কস্ট্ অ্যাকাউন্টেন্ট (Cost Accountant) নিযুক্ত করা হয়।

(৮) **কারখানার অফিস ও পত্রালাপ বিভাগ (Factory Office and Correspondence Department)** : এই বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং উৎপাদন-সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠিপত্র ও চালান তৈয়ারী, মুদ্রণ ও বিলি করে। এই বিভাগ সাধারণতঃ সচিব (Secretary)-এর অধীনে থাকে।

(৯) **বিলি-বণ্টন বিভাগ (Despatch Department)** : উৎপাদিত পণ্য বিক্রিত হইবার পর উহা বিভিন্ন স্থানে পাঠান এই বিভাগের কাজ। পণ্য বিলি-বণ্টন করিবার পূর্বে ইহা বিলি-বণ্টন বহিতে (Despatch Register) লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

(১০) **পরিবহণ বিভাগ (Transport Department)** : বৃহৎ কারবারের নিজস্ব পরিবহণ বিভাগ থাকে। এই বিভাগ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কারখানায় আনে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে এবং বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

(১১) **সম্ভার নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Inventory Control Department)** : এই বিভাগ উৎপন্ন দ্রব্যের মান বজায় রাখিবার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। পরিসংখ্যানগত উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ (Satistical Quality Control or SQC) পদ্ধতিতে দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(১২) **গবেষণা বিভাগ (Research Department)** : উৎপাদন পদ্ধতি, দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয়-সংকোচ, বাজার গবেষণা, নূতন দ্রব্য ও উৎপাদন-কৌশল আবিষ্কার প্রভৃতি এই বিভাগের কাজ।

(১৩) **পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistical Department)** : উৎপাদন ও বিক্রয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উহা জ্ঞাত করা এই বিভাগের কাজ।

(১৪) **কর্মী বিভাগ (Personnel Department)** : এই বিভাগটিকে বহু প্রতিষ্ঠানে শ্রম বিভাগ (Labour Department) বা মনুষ্যশক্তি বিভাগ (Man-power Department)-ও বলে। ইহার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে **কর্মী ব্যবস্থাপক (Personnel Manager)** বলে। এই বিভাগ শ্রমিক নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উপস্থাপন, বদলি, পদোন্নতি, সাময়িক ছাঁটাই, বরখাস্ত, হাজিরা, মজুরি প্রদান, শ্রমকল্যাণ, অবসরগ্রহণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি দেয়। এই বিভাগ শ্রমিক-সংক্রান্ত আইনের নিয়মাবলী পালন করে এবং সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

চতুর্থ অধ্যায়	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (Administrative Management)

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে ? (What is Administrative Management ?) :

প্রশাসনের কাজ হইতেছে কারবারের নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। সংগঠনের কাজ হইতেছে এই সকল নীতি ও কর্মপন্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। সুতরাং কারবার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন। সংগঠন ও প্রশাসন পরস্পর-নির্ভরশীল। কারবারের প্রশাসনিক নীতিসমূহ ও কর্মপন্থাকে সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া কারবার পরিচালনা করাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বলে।

প্রশাসনিক কর্মপর্যায় Administrative Operations) :

প্রশাসনিক জটিলতা নির্ভর করে কারবারের আয়তন ও সাংগঠনিক কাঠামোর উপর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাধারণ কর্মপর্যায়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **কর্তব্য নির্ধারণ (Determination of Duties) :** প্রশাসনের প্রথম কাজ হইল কারবারের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা এবং সেই অনুসারে কার্যপ্রণালী স্থির করা এবং কর্তব্য নির্ধারণ করা।

(২) **পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulation of Plans) :** পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কাজ। প্রশাসনকে বিচক্ষণতার সহিত বিচার-বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের খসড়া প্রস্তুত করিতে হয় এবং উহা কার্যে রূপায়িত করিবার পন্থা ও উপায় নির্দেশ করিতে হয়।

(৩) **ভারার্পণ (Delegation) ০** কারবারের আয়তন বৃহৎ হইলে মালিক বা কার্যনির্বাহকের বা বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষগণের পক্ষে সমগ্র কার্যকলাপ নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এই ক্ষেত্রে কর্মভার বিভাজন করিয়া ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ অধস্তন ব্যবস্থাপকগণের নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন। কর্তৃত্ব যেমন ব্যবস্থাপকের কর্মসম্পাদনের চাবিকাঠি, ভারার্পণ তেমনি সংগঠনের চাবিকাঠি। ইহাতে কর্মপ্রণালীতে সজীবতা আসে, অধস্তন কর্মচারীদের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং তাহারা কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত হয়। ভারার্পণের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে কর্ম-সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং ঊর্ধ্বতন-অধস্তন (Superior-Subordinate) কর্মচারী সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।

(৪) **দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ (Fixation of Responsibilities and Authority) :** কর্ম বণ্টনের ফলে দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কর্তৃত্ব অর্পণের প্রয়োজন। দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বণ্টনের মধ্যে ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য (Parity) না থাকিলে ব্যবস্থাপনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রদত্ত

কর্তৃত্ব যদি কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব অপেক্ষা কম বা বেশী হয়, তবে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া কর্তৃত্বের ভারার্পণ করিতে হয়। কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে গাণিতিক সমতা (Mathematical Equality) থাকিতে পারে না। কর্তৃত্ব দায়িত্বের সমানুপাতিক ও সঙ্গত হইবে। অধস্তন কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট তাহার কার্যসম্পাদনের জবাবদিহি (Accountability) করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) **কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Authority)ঃ** কারবারের আয়তন বৃহৎ হইলে কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় কারবারের সুষ্ঠু কর্মপ্রবাহ ব্যাহত হয়। সমস্ত কার্যকলাপ একই কেন্দ্রবিন্দু হইতে পরিচালিত হইতে থাকিলে সংযোজনার (Co-ordination) অভাব দেখা দেয়। প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। ইহাতে জ্ঞাতকরণের ফাঁক (Communication Gap) সৃষ্টি হয়। সেইজন্য কারবার বৃহৎ হইলে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়। ইহাতে কর্তৃত্বের কেন্দ্রস্থল হইতে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে এমন পরিমাণ কর্তৃত্বের ভারার্পণ করা হয় যাহাতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব অর্জন করেন এবং নিজেরা বিভাগীয় কার্য পরিচালনায় বহু পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করেন। যখন ভারার্পণের নীতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখনই কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কারণ-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত। ভারার্পণ হইতেছে কারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ তাহার পরিণতি।

বিকেন্দ্রীকরণে অধস্তন কর্মচারীদের মনে কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত তাহারা নিজেদের কার্যাবলীর দ্রুত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহকগণ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা, কর্মপন্থা নির্ধারণ, কার্যক্রম প্রস্তুত, কাজের মান নির্ধারণ ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিতে পারেন। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে বিভাগীয় স্বাধীনতা বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে অসঙ্গতি ও বিরোধ সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা দূর করিবার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সংযোজনা থাকা প্রয়োজন। ইহাকে সংযোজিত বিকেন্দ্রীকরণ (Co-ordinated Decentralisation) বলে। চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা অলীক বা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করিতে হইলে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাতে বিভাগীয় কার্যাবলীর মধ্যে একতা আসিবে।

(৬) **নির্দেশদান (Directing)ঃ** সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য কে, কি, কখন ও কিভাবে কার্য সম্পাদন করিবে তাহার নির্দেশদান করিতে হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আদেশ ও নির্দেশদানের মাধ্যমে কাজের গতিকে অব্যাহত রাখে। শুধুমাত্র আদেশ ও নির্দেশদান করাই নির্দেশনার কাজ নহে ; কার্য পর্যবেক্ষণ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবার মনোভাব সৃষ্টি করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদিও নির্দেশদানের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) জ্ঞাতকরণ বা যোগাযোগ (**Communication**
কর্মচারীদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে জ্ঞাতকরণ বলে
প্রশাসনিক নীতি ও সিদ্ধান্ত উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে পৌছায়।
ফলে নিম্নস্তরের কর্মচারিগণ তাহাদের অভাব-অভিযোগ ও ..
কর্মচারিগণের নিকট পাঠাইতে পারে। ইহাকে পূর্বাপর বা উল্লম্ব (Vertical) জ্ঞাতকরণ বলে যখন সমস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হয় তখন তাহাকে সমস্তর বা সমান্তরাল জ্ঞাতকরণ (Horizontal Communication) বলে। কারবারের প্রশাসনিক নীতি, কর্মপন্থা, কার্যক্রম এবং কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মচারীদের মধ্যে জ্ঞাত করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কাজ।

(৮) **নিয়ন্ত্রণ** (**Control**): কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। কর্তৃত্বের প্রয়োগবিধি তদারক করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিয়ন্ত্রণের পরিধি Span of Control) ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কার্য সম্পাদনের মান নির্ধারণ করিয়া এবং প্রকৃত কাযের পরিমাপ করিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে হয়। ইহার জন্য মানের (Standard) সহিত সম্পাদিত কাজের তুলনা করিতে হয়। যদি কোন তারতম্য (Variance) দেখা যায়, তবে কি কারণে তারতম্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ কি কি কারণে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয় নাই তাহা পরীক্ষা করিয়া ত্রুটিগুলি সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কাজ।

(৯) **প্রশাসনিক সংগঠনের রূপ** (**Form of Administrative Organisation**):

প্রশাসনিক সংগঠনের রূপ কি হইবে তাহা ঠিক করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম দায়িত্ব। প্রশাসনিক সংগঠনের রূপ নিম্নলিখিত হইতে পারে:

(ক) রৈখিক সংগঠন (Line Organisation);
(খ) কর্মী সংগঠন (Staff Organisation),
(গ) কার্য-ভিত্তিক সংগঠন (Functional Organisation);
(ঘ) রৈখিক ও কর্মী সংগঠন (Line and Staff Organisation)।

পরিকল্পনা (**Planning**):

পরিকল্পনা কাহাকে বলে? (What is Planning?): প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হইল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনা সুসংবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ কার্যসূচী প্রণয়ন করে। 'ভবিষ্যৎকে খাঁচায় ধরিয়া রাখা'র নামই পরিকল্পনা। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কর্মপ্রণালীর ছক বা খসড়া প্রস্তুত করে পরিকল্পনা। কাজটি কি, কে করিবে, কোথায় করা হইবে, কিভাবে করা হইবে এবং কখন করা হইবে এই বিষয়গুলি পূর্ব-নির্ধারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করা হয়। উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ, কর্মনীতি স্থির করা, কার্যসূচী নির্ধারণ করা, কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল, সময়সূচী ও বাজেট প্রস্তুতকরণ

ইত্যাদি পরিকল্পনার উপাদান। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়। এককথায় বিচক্ষণতার সহিত ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ স্থির করিবার পন্থা ও উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়কে পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রবাহের রূপরেখা অঙ্কন করা হয়।

কুন্‌জ এবং ও' ডোনেল (Koontz and O' Donnell)-এর মতে, "পরিকল্পনা হইতেছে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রক্রিয়া, সজ্ঞানে কর্মপন্থা স্থির করা এবং উদ্দেশ্য, ঘটনা ও বিচার-বিবেচনাপ্রসূত হিসাবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।"

জর্জ টেরি (George Terry)-র মতে, "আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত কার্যকলাপ সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি ও গঠনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর নির্বাচনকে পরিকল্পনা বলে।"

পরিকল্পনার নীতি বা বৈশিষ্ট্য (Principles or Characteristics of Planning) : সার্থক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন :

(১) **উদ্দেশ্য (Objectives) :** কারবারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। মূল পরিকল্পনা (Basic Plan) ও সহায়ক পরিকল্পনাসমূহকে (Derivative Plans) উদ্দেশ্য সাধনের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) **প্রাথমিকতা বা অগ্রগণ্যতা (Primacy) :** পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ। অন্যান্য সকল কাজ যেমন, সংগঠন, নির্দেশনা, সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে।

(৩) ***নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity) :*** ইহা ব্যবস্থাপনার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। মূল পরিকল্পনাকে পরিবেষ্টন করিয়া সহায়ক পরিকল্পনা (Derivative Plans) রচনা করা হয়। পরিকল্পনা শুধু একবারই প্রণয়ন করা হয় না, পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিকল্পনার রদবদলও করিতে হয়।

(৪) ***পরিবর্তনশীলতা (Flexibility) :*** আবদ্ধতা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য পরিকল্পনাকে পরিবর্তনশীল করিতে হয়। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে পরিকল্পনা অর্থহীন হয়। সেই কারণে পরিকল্পনায় পরিবর্তনশীলতার উপাদান থাকিতে হইবে।

(৫) ***মতৈক্য (Unity) :*** পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপকদের দ্বারা রচিত হয়। লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে পরিকল্পনায় ঐকমত্য স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) **যথার্থতা বা নির্ভুলতা (Precision) :** পরিকল্পনা যথার্থ ও নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সমগ্র ব্যবস্থাপনার কার্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। সুতরাং বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সহিত নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হয়।

(৭) **ব্যাপকতা (Pervasiveness) :** পরিকল্পনাকে কারবারের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রয়োগ করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি হইল :

উৎপাদন, বিপণন, অর্থসংস্থান ইত্যাদি। পরিকল্পনা প্রয়োগের বিভিন্ন স্তরগুলি হইল: উচ্চস্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তর। পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সকল প্রকার কারবারেই প্রযোজ্য।

(৮) **বিভিন্ন পন্থার মধ্যে উপযুক্ত পন্থা নির্বাচন (Choice among Alternative Courses)**ঃ কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন পন্থা আছে। বিভিন্ন পন্থার ব্যয়ের মাত্রা, ঝুঁকির পরিমাণ ও লাভের সম্ভাবনা যাচাই করিয়া উপযুক্ত পন্থা নির্বাচন করা পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৯) **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence):** কারবারের বিভিন্ন বিভাগকে নিজেদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হয়। এই সকল বিভাগীয় পরিকল্পনা লইয়া মূল পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু বিভাগীয় পরিকল্পনাগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, উৎপাদন পরিকল্পনা বিক্রয় পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। মূল পরিকল্পনা রচনার সময় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

(১০) **পূর্বানুমান (Forecasting)**ঃ ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে সুসংবদ্ধ অনুমান করাকে পূর্বানুমান বলে। পূর্বানুমান ছাড়া পরিকল্পনা করা যায় না। স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন, বিশেষ ও সাধারণ পূর্বানুমানের সংযুক্তি হইল পরিকল্পনা। সমস্ত পূর্বানুমান একক কার্যক্রমে সংযুক্ত হইয়া পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। হেনরি ফেয়ল এক বৎসর ও দশ বৎসরের জন্য পূর্বানুমানের পরামর্শ দিয়াছেন।

(১১) **কর্মী-অংশগ্রহণ (Employee-participation)**ঃ পরিকল্পনা রূপায়ণে কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কারণে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরিকল্পনায় কর্মীদের নিকট হইতে প্রাপ্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত সন্নিবেশিত করা উচিত। ইহাতে কর্মীরা মনে করিবে যে, তাহারাও পরিকল্পনায় যুক্ত এবং তাহাদের কল্যাণ পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে নিহিত। পরিকল্পনাকে বাস্তবমুখী করিতে হইলে কর্মীদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(১২) **কৌশল (Strategy)**ঃ কর্মী, প্রতিযোগী, ক্রেতা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস হইতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণে যে সকল বাধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন কৌশল সংযোজিত হয়। এই সকল কৌশল বা চাতুর্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সফলতার গোপন তথ্য সংগ্রহ করিতে এবং প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সৈনিকের মত কাজ করিতে সাহায্য করে। উপযুক্ত কৌশলের অভাবে পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। কৌশল হইল কার্য-পরিচালনা করিবার সুচিন্তিত পদ্ধতি। ভবিষ্যতের বিরূপ পরিস্থিতির পূর্বানুমান করিয়া উহাদের মোকাবিলার জন্য যে সকল পূর্বপ্রস্তুতির প্রস্তাব করা হয়, তাহাই পরিকল্পনার কৌশল।

(১৩) **উদ্ভাবন (Innovation)**ঃ পরিকল্পনা রচনার অন্যতম নীতি বা বৈশিষ্ট্য হইল উদ্ভাবনের সম্ভাবনা ও প্রভাব পর্যালোচনা করা। ইহার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। উদ্ভাবনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরিকল্পনা রচনা না করিলে পরিকল্পনা রূপায়ণে কার্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিকল্পনার সুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা (Benefits or Importance of Planning)ঃ

পরিকল্পনার গুরুত্ব ও সুফলগুলি হইল :

(১) পরিকল্পনা কর্মসম্পাদনে নিশ্চয়তা আনে এবং কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধি করে।

(২) ইহা কর্মপ্রচেষ্টার একীকরণ করে এবং ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে কাজ-কর্মে মতৈক্য সৃষ্টি করে।

(৩) ইহা ব্যয়-সংকোচ ঘটায়। শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় বন্ধ করিয়া ইহা ব্যবস্থাপনায় ব্যয়-সংকোচ করে।

(৪) সংগঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজকে পরিকল্পনা সার্থক করে।

(৫) পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের কাজকে সাহায্য করে। কারণ পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশিত কাজের মান কি হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারে।

(৬) ইহা কারবারের উদ্দেশ্য স্থির করে।

(৭) পরিকল্পনা কারবারকে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সাহায্য করে।

(৮) পরিকল্পনা কারবারের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(৯) ইহা কারবারী কার্যকলাপের সীমারেখা নির্দেশ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিয়া দেয় এবং কারবারকে সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করে।

(১০) পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠন শক্তিশালী হয় এবং নির্দেশনার কাজ সহজ হয়।

(১১) পূর্বানুমান (Forecasting) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ এবং ইহা কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করিতে সাহায্য করে।

(১২) পরিকল্পনার মাধ্যমে কারবারের সীমিত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার লাভজনকভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি (Limitations to Planning)ঃ

পরিকল্পনায় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতা পরিকল্পনার সাফল্যকে বাধা দেয়। এই সীমাবদ্ধতাগুলি হইল :

(১) পরিকল্পনায় ব্যবহৃত উপাত্ত (Data), তথ্য (Information) ও পূর্বানুমান (Forecasting) ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ হইলে পরিকল্পনা নির্ভুল হয় না। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অধিক।

(২) পরিকল্পনায় একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারিগণকে সেই নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে কাজ করিতে হয়। ফলে তাহাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) পরিকল্পনা রচনায় প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি পবিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে অর্থ ও সময়ের অপচয় ঘটে।

(৪) দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থাব সহিত পরিকল্পনা যদি সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারে, তবে সমগ্র পরিকল্পনাটি অর্থহীন হইয়া পড়ে।

(৫) পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনায় অনমনীয়তা (Inflexibility or Rigidity) আনে। ইহাতে কর্মনীতি, কর্মপ্রণালী, কার্যক্রম ও কর্মপন্থায় নমনীয়তা বিনষ্ট হয়।

(৬) যাঁহারা পরিকল্পনা প্রণয়নে যুক্ত থাকেন তাঁহাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা না থাকিলে পবিকল্পনা বাস্তবমুখী হয় না।

(৭) কৌশল ও রূপায়ণ পদ্ধতি উপযুক্ত না হইলে পরিকল্পনা সফল হয় না।

(৮) পারকল্পনায় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর পূর্বানুমান করা হয়। ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। পূর্বানুমান সঠিক না হইলে পরিকল্পনাও ত্রুটিপূর্ণ হয়।

(৯) ছোট ছোট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে যদিও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, কিন্তু বড় রকমেব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন, বাণিজ্যচক্র, সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবতন কষ্টসাধ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থায় পরিকল্পনা তেমন কাযকর হয় না।

(১০) সঠিকভাবে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত না হইলে এবং কর্মচারিগণের সহযোগিতার অভাব থাকিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে পারে।

পরিকল্পনার উপাদান (Elements of Planning) ঃ

পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়নের উপাদানগুলি হইল :

১) **উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ (Determination of Objectives) ঃ** পরিমাণগত-ভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়। উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় (Management by Objectives) পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহাতে কারবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে বিভাগীয়, উপবিভাগীয় ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে বিভক্ত করিয়া দেখান হয়। ইহাতে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন, কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, উৎপাদনের ধারা, কারখানার স্থান নিবাচন, উৎপাদন লক্ষ্য, বিক্রয় মাত্রা ইত্যাদি উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়।

(২) **কর্মনীতি (Policies) ঃ** পুনঃপুনঃ সংঘটিত হয় এইরূপ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নীতি ব্যবস্থাপকগণের চিন্তার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। নীতি উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে কিভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে তাহা নীতির মাধ্যমে জানা যায়। নীতি হইল ব্যক্ত (Expressed) অথবা বিবক্ষিত বা অমুক্ত (Implied) বিবরণী, যাহার ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালিত হয়। নীতির পরিধি ব্যাপক হইতে হইবে, কারণ ইহা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে স্থায়ী পরিকল্পনাও (Standing Plan) বলে। নীতি তিন প্রকার হইতে পারে; যেমন, (ক) প্রশাসনের উচ্চস্তরের

কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রণীত নীতি ; (খ) বাহ্যিক উৎস হইতে কারবারের উপর প্রযুক্ত নীতি যেমন, সরকারী আইন এবং (গ) আবেদনকৃত নীতি।

(৩) **কর্মপ্রণালী** (**Procedures**) : পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার জন্য কাজ করিবার নির্দেশকে কর্মপ্রণালী বলে। কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন ধাপ বিশ্লেষণ করিয়া কর্মপ্রণালী স্থির করা হয়। এক একটি কাজে এক এক রকম কর্মপ্রণালী গৃহীত হয়। কর্মপ্রণালী নীতি অনুসারে স্থির করা হয়। ইহাও স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing Plan)। কোন্ পদ্ধতিতে বা কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে কারবারের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা যায় অর্থাৎ কিভাবে প্রতিটি কাজ সুসম্পাদন করা যায় তাহার ধারণা কর্মপ্রণালী নির্দেশ করে।

(৪) **কর্মপন্থা** (**Methods**) : পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার পদ্ধতিকে কর্মপন্থা বলে। ইহা কর্মপ্রণালীর ধরন অনুযায়ী নিরূপণ করা হয়। কর্মপ্রণালীর প্রতিটি পর্যায়ের জন্য এক-একটি কর্মপন্থা স্থির করা হয়। কর্মপন্থার উপর কর্মসম্পাদনের সাফল্য নির্ভরশীল।

(৫) **কার্যক্রম বা কার্যসূচী** (**Programmes**) : কার্য সম্পাদনের জন্য রচিত কর্মপ্রবাহকে কার্যক্রম বলে। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুচ্ছকে যুক্ত করে কাযক্রম।* কাযক্রমের মাধ্যমে নীতি ও কর্মপ্রণালী সংযুক্ত হয় এবং কার্যকরী হয়। পৌনঃপুনিক ও অপৌনঃপুনিক উভয় অবস্থায়ই কাযক্রম স্থির করা প্রয়োজন। পৌনঃপুনিক অবস্থায় যে কাযক্রম স্থির করা হয়, তাহাকে গতানুগতিক পরিকল্পনা বলে এবং অপৌনঃপুনিক অবস্থার জন্য স্থিরীকৃত কার্যক্রমকে সৃজনশীল পরিকল্পনা (Creative Planning) বলে।

(৬) **সময়-সূচী নির্ধারণ** (**Scheduling**) : ইহাতে প্রতিটি কাযের আরম্ভ ও সমাপ্তির সময় নির্দেশ করা হয়। কর্মারম্ভ ও কর্মসমাপ্তির সূচী প্রণয়নকে সময় নির্ধারণ বলে। যাহাতে সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় সেই কারণে পরিকল্পনায় সময়-সূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৭) **কৌশল** (**Strategy**) : কর্মী, প্রতিযোগী, ক্রেতা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস হইতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণে যে সকল বাধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য পরিকল্পনায় যে সকল বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি সংযোজিত হয় তাহাকেই কৌশল বলে। উপযুক্ত কৌশলের অভাবে পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হইয়া যায়। কৌশল হইল কায পরিচালনার সুচিন্তিত পদ্ধতি। ভবিষ্যতের বিরূপ পরিস্থিতির পূর্বানুমান করিয়া উহাদের মোকাবিলা করিবার জন্য যে সকল পূর্বপ্রস্তুতির প্রস্তাব করা হয় তাহাই পরিকল্পনার কৌশল।

(৮) **বাজেট** (**Budget**) : পরিকল্পনার রূপরেখা বাজেটের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়। বাজেটে আয়-ব্যয় বরাদ্দ, উৎপাদন মাত্রা, বিপণন লক্ষ্য, অর্থ সংস্থান ইত্যাদি যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য পরিমাণগত (Quantitative Targets) লক্ষ্য বিশদভাবে

বিবৃত করা হয়। বাজেটের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব পেশ পরিসংখ্যানগত তথ্যভিত্তিক। বাজেট পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপরেখা গঠন

পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ (Steps in Planning) ঃ

পরিকল্পনা প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ধাপ আছে। এই ধাপগুলি হইল :

(১) **উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ (Determination of Objectives) ঃ** পরিকল্পনা রচনার প্রথম ধাপ হইতেছে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করা। সার্বিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয়, উপবিভাগীয় ও ব্যক্তিক সহায়ক উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়। উদ্দেশ্যকে অবশ্যই নির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত ও পরিমাপযোগ্য হইতে হইবে।

(২) **পরিকল্পনায় অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণার প্রচলন (Planning Premises) ঃ** ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও নানাবিধ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ভাবী ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ধ্যান ধারণাকে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় বলে। বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য সম্পদ, উপায় ও উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চিত আবার কতকগুলি অনিশ্চিত। অনিশ্চিত বিষয়গুলির পূর্বানুমান করা হয়।

(৩) **বিকল্প পন্থা নির্ধারণ (Developing Alternative Courses) ঃ** কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন পন্থা নির্ধারণ করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মসম্পাদনের একাধিক পন্থা থাকে। যেখানে একাধিক পন্থা থাকে না সেখানে পরিকল্পনার প্রয়োজনও হয় না। বিকল্প পন্থা নির্ধারণ ব্যবস্থাপকের দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

(৪) **নির্দিষ্ট পন্থা নির্বাচন (Selecting Specific Course of Action) ঃ** কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন বিকল্প পন্থার মধ্য হইতে উপযুক্ত পন্থাটি নির্বাচন করিতে হইবে। উপযুক্ত পন্থা নির্বাচনে যে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হয়, সেইগুলি হইল : (ক) ব্যয়ের মাত্রা, (খ) ঝুঁকির পরিমাণ এবং (গ) লাভের সম্ভাবনা।

(৫) **সহায়ক পরিকল্পনা প্রবর্তন (Formulating Derivative Plars) ঃ** প্রতিষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা (Master Plan) হইল কতকগুলি বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় পরিকল্পনার সমন্বয়। মূল পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে সহায়ক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারা মূল পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সাহায্য করে।

(৬) **সময়-সূচী নির্ধারণ (Scheduling) ঃ** ভিন্ন ভিন্ন কর্মসম্পাদনের সময়-সূচী পরিকল্পনায় স্থির করিয়া দিতে হয়। ইহাতে শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয় এবং পরিকল্পনা সঠিক সময়ে তাহার নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করিতে পারে। প্রত্যেক কর্মসম্পাদনের সময়-সূচী কর্মসমূহের ক্রমপর্যায় (Sequence) অনুসারে স্থির করিতে হয়।

(৭) **কর্মী-সহযোগিতা (Employees' Co-operation) ঃ** পরিকল্পনার রূপায়ণ নির্ভর করে কর্মীদের সহযোগিতার উপর। সুতরাং কর্মিগণকে উপযুক্তভাবে প্রণোদিত করা পরিকল্পনার অন্যতম কাজ। ইহা ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ব।

(৮) **কৌশল উদ্ভাবন (Strategy Formulation)**ঃ পরিকল্পনার রূপায়ণের সময় নানাবিধ প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া আসিতে পারে। কারবারের কর্মী, প্রতিযোগী, খরিদ্দার প্রভৃতি বিভিন্ন পক্ষের নিকট হইতে যে সকল বাধা আসে তাহা প্রতিহত করিবার জন্য পরিকল্পনায় চাতুর্য বা কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৯) **অনুসরণ (Follow-up)**ঃ পরিকল্পনাকে যখন বাস্তবে রূপায়িত করা হয় তখন রূপায়ণে যে সকল বাধা-বিপত্তি আসে তাহা জানিবার জন্য পরিকল্পনাকে সর্বদা অনুসরণ করিতে হয়। ইহাতে পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনায় অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা (Planning Premiscs)ঃ

পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে। ইহা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়। সুতরাং ভাবী ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুমান বা ধ্যান-ধারণা ব্যতিরেকে পরিকল্পনা রচনা করা যায় না। পরিকল্পনা রচনায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ, ভবিষ্যৎ ঘটনা, সহায়-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে পূর্বানুমান করাকে পরিকল্পনায় অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা বলে। কারবারী কার্যকলাপে সর্বদাই অনিশ্চিত উপাদান থাকে। পরিকল্পনা রচনাও ভবিষ্যৎ ঘটনার উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। সুতরাং পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুমিত ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করিতে হয়।

পরিকল্পনায় ধ্যান-ধারণার উপাদান (Factors of Planning Premises)ঃ

অনুমিত ধ্যান-ধারণার নিম্নলিখিত উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি আছে :

(১) **অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা (Internal and External Premises)**: যখন পরিকল্পনার ধ্যান-ধারণা অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা ঘটনার উপর নির্ভর করে তখন তাহাকে অভ্যন্তরীণ ধ্যান-ধারণা বলে। ইহার উৎস কারবারের মধ্যেই থাকে, যেমন, কারখানার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে নিয়োজিত মূলধন, কারবারের নীতি, কর্মীদের আচরণ ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ ধ্যান-ধারণা বা অনুমিত বিষয় সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রণযোগ্য। বাহ্যিক ঘটনা বা অবস্থার উপর যে অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা নির্ভর করে তাহাকে বাহ্যিক অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা বলে। যেমন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ, পণ্যের বাজার ও চাহিদা ইত্যাদি। ইহা সাধারণতঃ অ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

(২) **বস্তুগতও অ-বস্তুগত ধ্যান-ধারণা (Tangible and Intangible Premises)**ঃ বস্তুগত ধ্যান-ধারণা বাস্তব বা প্রকৃত। ইহা সংখ্যা, পরিমাণ, মূল্য, সময় ইত্যাদির দ্বারা পরিমাপ করা যায়। অ-বস্তুগত ধ্যান-ধারণা অবাস্তব বা অপ্রকৃত অথচ পরিকল্পনা প্রণয়নে ইহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল ধ্যান-ধারণা পরিমাপযোগ্য নহে। যেমন, কারবারের সুনাম, কারবারের প্রতি কর্মচারীদের আগ্রহ ও মনোভাব, জনসম্পর্ক ইত্যাদি।

(৩) **নিয়ন্ত্রণযোগ্য, অর্ধ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য ধ্যান-ধারণা** (**Controllable, Semi-Controllable and Uncontrollable Premises**)ঃ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিলে বা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা থাকিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ধ্যান-ধারণা বলে। যেমন, কারখানার স্থান নির্বাচন অথবা গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়। যে সকল বিষয়ের উপর ব্যবস্থাপনার আংশিক প্রভাব থাকে তাহাদের অর্ধ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা বলে। যেমন, শ্রমিক সম্পর্ক, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল বিষয়ের উপর ব্যবস্থাপনার কোনই প্রভাব থাকে না যেমন, সরকারী নীতি, বাণিজ্য-চক্র, ধর্মঘট, তালাবন্ধ, রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদি অ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা। ইহারা পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করে।

(৪) **অতীত ঘটনা** (**Past Events**)ঃ অতীত ঘটনা ভবিষ্যতের সূচক। ইহা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে এবং পরিকল্পনায় অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

(৫) **পরিকল্পনায় অনুমিত বিষয়ের বিভিন্ন স্তর** (**Different Levels of Planning Premises**)ঃ পরিকল্পনায় পূর্বানুমানের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন—এই তিনটি স্তর আছে। উচ্চ স্তরের পূর্বানুমান মধ্য ও নিম্ন স্তরের ধ্যান-ধারণাকে সাহায্য করে।

(৬) **কলা-কৌশলী ধ্যান-ধারণা বা অনুমিত বিষয়** (**Strategic Premises**)ঃ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী এত অধিক যে, সকল ঘটনাকে গ্রহণ করিয়া ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করা বাস্তবে সম্ভব নহে। সেই কারণে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করা হয়।

(৭) **স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান** (**Fixed and Variable Factors**)ঃ অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর নির্ভরশীল। নিয়োজিত মূলধন, শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি উপাদান স্থায়ী। ইহারা নির্দিষ্ট, বোধগম্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং এইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে পরিকল্পনায় অনুমিত ধ্যান-ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু পরিবর্তিত উপাদানসমূহ যেমন, ক্রেতার রুচি ও চাহিদা, সরকারী নীতি ইত্যাদি পরিবর্তনশীল উপাদান। ইহারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নহে এবং ইহাদের পূর্বানুমানও কষ্টসাধ্য।

(৮) **নমনীয়তা** (**Flexibility**)ঃ সঠিক অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা পরিকল্পনার কাজকে সহজ ও সরল করে। কিন্তু অনুমিত বিষয়ে ত্রুটি থাকিতেই পারে। সেই কারণে পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকা উচিত।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Types of Planning) :

পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেমন—

(১) **মূল বা প্রাথমিক পরিকল্পনা (Basic Plan) :** কারবারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের জন্য যে মূল যোজনা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে মূল পরিকল্পনা বলে। মূল পরিকল্পনার সাহায্যে ব্যবস্থাপনার সকল কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

(২) **সহায়ক পরিকল্পনা (Derivative Plans) :** বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় পরিকল্পনাকে সহায়ক পরিকল্পনা বলে। এই সকল পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার প্রণয়ন ও রূপায়ণকে সাহায্য করে।

(৩) **স্থির বা স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing Plans) :** কর্মনীতি, কর্মপ্রণালী ও কর্মপন্থা—পরিকল্পনার এই তিনটি উপাদানকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। কার্যক্রমের পরিবর্তনে ইহাদের পরিবর্তন ঘটান হয় না। ইহারা একাদিক্রমে দশ-পনেরো বৎসর একইভাবে কারবারে প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৪) **সম্মিলনকারী বা সার্বিক বা অধি-পরিকল্পনা (Master Plan) :** পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদান হইল—উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মপ্রণালী, কর্মপন্থা ইত্যাদি। ইহারা ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করে। এই কর্মসূচী কার্যক্রম এবং বাজেটের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। উপাদানগুলি একত্রীকরণের জন্য কার্যক্রম ও বাজেট প্রস্তুতকরণকে সম্মিলনকারী পরিকল্পনা বলে। ইহা সমগ্র কারবারের জন্য প্রণয়ন করা হয় বলিয়া ইহাকে সার্বিক পরিকল্পনাও বলে।

(৫) **স্বল্পমিয়াদী পরিকল্পনা (Short Range Plan or SRP) :** এইরূপ পরিকল্পনা সাধারণতঃ এক হইতে দুই বৎসরের মিয়াদে প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে কার্যকরণক্ষম পরিকল্পনাও (Operative Planning) বলে। ইহা নির্দিষ্ট ও নিয়মমাফিক (Formal) পরিকল্পনা। ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কার্যপ্রণালী (Programme), প্রকল্প (Project), বাজেট ও কর্মপন্থার (Methods) মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থা থাকে। ইহা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অঙ্গ। মধ্য ও নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপকগণ এইরূপ পরিকল্পনা রচনা করেন।

(৬) **দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা (Long Range Plan or LRP) :** এইরূপ পরিকল্পনার সময়ের ব্যাপ্তি পাঁচ হইতে দশ বৎসর, এমনকি কুড়ি বৎসরও হইতে পারে। ইহাকে কৌশলী পরিকল্পনাও (Strategic Planning) বলে। ইহা পরীক্ষামূলক (Tentative), কারণ ইহা সুদূর ভবিষ্যৎ ও অনিশ্চিত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। সেই কারণে ইহাতে সঠিক পূর্বানুমান করা কষ্টসাধ্য। ইহাতে গবেষণা ও অধিকতর বিচক্ষণতার সহিত ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি ও নীতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

(৭) **ক্রিয়াগত বা কার্যকরণক্ষম পরিকল্পনা (Operative Plan) :** বাঁধা-ধরা কার্যকলাপ নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী চলে যেমন, কাঁচামাল ক্রয়, কর্মী প্রশিক্ষণ

ইত্যাদি। ইহাতে মূল নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এইসকল কার্যকলাপ ও প্রণালীর জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাহাকে ক্রিয়াগত বা কার্যকরণক্ষম পরিকল্পনা বলে। এইসকল পরিকল্পনা স্বল্পমিয়াদী হয়।

(৮) **সাময়িক কৌশল-সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Tactical Plan) :** সাময়িক ঘটনার মোকাবিলা করিবার জন্য তাৎক্ষণিক কৌশলভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। ইহার পৌনঃপুনিকতা বেশী এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব কম।

(৯) **কৌশলী পরিকল্পনা (Strategic Plan) :** এইরূপ পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতের ঘটনার পূর্বানুমান করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহাদের সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এইরূপ পরিকল্পনার পৌনঃপুনিকতা কম এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব বেশী। ড্রাকার (Drucker)-এর মতে, "এইরূপ পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি বহনের অবিরাম প্রয়াস।" ইহা জটিল পরিবেশ-সংক্রান্ত শক্তির মোকাবিলা করে। ইহাতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, উন্নয়ন ও কর্ম বিচিত্রকরণের (Diversification) কার্যক্রম স্থির করা হয়।

(১০) **সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনা (Corporate Plan) :** ইহা রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রস্তুত দীর্ঘ মিয়াদী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা। ইহাতে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর চিত্র রূপায়িত করা হয় এবং কৌশল ও ক্রিয়াগত পরিকল্পনার (Action Plan) নির্দেশ দেওয়া হয়। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ ইহা প্রণয়ন করেন। ইহা সমগ্র পরিকল্পনা কর্মের মধ্যে সংযোজনা আনয়ন করে। বাহ্যিক পরিবেশের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জটিল বাহ্যিক পরিবেশকে মোকাবিলা করে ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-পূরণে সাহায্য করে।

স্বল্প-মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনার পার্থক্য (Distinction between Short Range Planning and Long Range Planning) :

স্বল্প মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনার পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

স্বল্প মিয়াদী পরিকল্পনা	দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনা
১। ইহার মিয়াদ এক হইতে দুই বৎসর।	১। ইহার সময়ের ব্যাপ্তি পাঁচ হইতে দশ বৎসর।
২। ইহা কার্যকরণক্ষম (Operative) পরিকল্পনা।	২। ইহা কৌশলী (Strategic) পরিকল্পনা।
৩। ইহা নির্দিষ্ট (Specific) পরিকল্পনা।	৩। ইহা পরীক্ষামূলক (Tentative) পরিকল্পনা।
৪। ইহাতে অদূর ভবিষ্যতের পূর্বানুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	৪। ইহা সুদূর ভবিষ্যৎ ও অনিশ্চিত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হয় বলিয়া ইহাতে পূর্বানুমান করা কঠিন।

স্বল্প মিয়াদী পরিকল্পনা	দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনা
৫। ইহাতে সাধারণ বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয়।	৫। ইহাতে গবেষণা ও অধিকতর বিচক্ষণতার সহিত ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি ও নীতির মূল্যায়ন করিতে হয়।
৬। ইহার পৌনঃপুনিকতা বেশী অর্থাৎ ইহা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়।	৬। ইহার পৌনঃপুনিকতা কম।
৭। ইহার প্রভাব (Impact) স্বল্প-প্রসারী।	৭। ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

পরিকল্পনার রোগ নির্ণয় (Diagnosis of Planning) ঃ

পরিকল্পনার রোগ নির্ণয় ধারণাটির অর্থ হইতেছে পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা নির্ণয় করা। যত্নসহকারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলেও উহা ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে; মানুষের শরীরে যেমন রোগ দেখা দেয়, পরিকল্পনায়ও তেমন রোগ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোগ হইলে উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিকল্পনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা দেখা দিলে উহা সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নচেৎ পরিকল্পনামাফিক কার্য সম্পাদনে যে অর্থ, শ্রম ও শক্তি নিয়োজিত হইবে উহার অপচয় হইবে এবং পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ইহা ছাড়া পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি ত্রুটিপূর্ণ হইবে এবং অচিরেই কারবার অচল হইয়া পড়িবে। শরীরের হৃদপিণ্ড অচল হইলে যেমন মৃত্যু হয়, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনায় তেমনি কারবার অচল হইয়া পড়ে। অনেক কারবারী দ্রুত মুনাফালাভের আশায় বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে অধৈর্য হন এবং পরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা তাহার প্রতি দৃষ্টি দেন না। ইহাতে সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে কারবারীকে প্রথম অবস্থায়ই সঠিক রোগ নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্বাহ্নে রোগ নির্ণয় বা পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা নির্ণয় করা হইলে অর্থ, শ্রম ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয় এবং রোগ প্রতিকার বা ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার সংশোধন করা সহজ হয়।

পরিকল্পনার রোগ নির্ণয়ে ব্যবস্থাপকগণ যদি দুই-একটি লক্ষণ (Symptoms) দেখিয়া রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তবে প্রকৃত রোগ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা নাও পড়িতে পারে। লক্ষণভিত্তিক রোগ নির্ণয় প্রকৃত সমস্যাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সত্যের আড়াল করিয়া রাখে। সেই কারণে বিশ্লেষণভিত্তিক রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রকৃত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

(১) পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং বাস্তবে লক্ষ্য পূরণের যে সম্ভাবনা আছে উহাদের পার্থক্য বা তারতম্য (Variation) পরিমাপ করা,

(২) পার্থক্য বা তারতম্য ঘটিবার মূল ও আনুষঙ্গিক কারণ অনুসন্ধান করা;

(৩) তারতম্যের কারণ দূরীকরণের সন্তোষজনক সমাধান হ' দেখা। পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে প্রথমে সমস্যা' সমাধানের পথ বাহির করিতে হইবে।

সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision-making) ঃ

সিদ্ধান্তগ্রহণ কাহাকে বলে ? (What is Decision-making ?) ঃ

ব্যবস্থাপনার কাযাবলীর বোঝা বহনের বাহনকে (Vehicle) সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। বিচারশক্তি ও চিন্তা প্রয়োগ করিয়া দুই বা ততোধিক সম্ভাব্য পন্থা হইতে একটি আচরণ পন্থা স্থির করার নাম সিদ্ধান্তগ্রহণ। **পিটার ড্রাকার** (Peter Drucker)-এর মতে, ' একজন কর্মাধ্যক্ষ যাহা কিছু করেন, সকলই সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে করেন।"

জর্জ টেরির (George Terry) মতে, "সিদ্ধান্তগ্রহণ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীভূত সৃজনমূলক মনোগত ঘটনা (Psychic Event) যেখানে জ্ঞান, চিন্তা, ভাব ও কল্পনা কাযের সহিত একত্রিত হইয়া মিলিয়া যায়।"

ম্যাকডোনাল্ড (McDonald)-এর মতে, "সিদ্ধান্তগ্রহণ হইল ব্যবস্থাপকের হাতিয়ার যাহার সাহায্যে সে অনিশ্চয়তা দূর করিয়া তাহার ব্রত পূর্ণ করে।"

সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাপনার আত্মা (Soul)। একজন ব্যবস্থাপক যাহা কিছু কাজ করেন তাহা সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে করেন। সিদ্ধান্তগ্রহণের দ্বারা কর্মচারীদের সহযোগিতা আদায় করা যায়, আবার সিদ্ধান্তগ্রহণের সংঘর্ষে (Impact) কর্মচারীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে।

পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Planning and Decision-making) :

সিদ্ধান্তগ্রহণ এক ধরনের পরিকল্পনা। পরিকল্পনা সিদ্ধান্তগ্রহণ হইতে উদ্ভূত হয়। সুতরাং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিকল্পনার মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিচক্ষণতা ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া অনেকগুলি সম্ভাব্য পন্থা হইতে একটি আচরণ পন্থা নির্বাচন করাকে সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। কিন্তু পরিকল্পনা হইতেছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার খসড়া বা ছক তৈয়ারী করা। পরিকল্পনা সিদ্ধান্তগ্রহণের অঙ্গ। সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপকতা অনেক বেশী, কারণ সিদ্ধান্তগ্রহণ শুধু পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; ইহা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাযাবলী যেমন, নির্দেশদান, অনুপ্রাণিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সিদ্ধান্তগ্রহণ ভ্রান্ত হইলে সমগ্র পরিকল্পনাটি বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতি (Principles of Decision-making) ঃ

সিদ্ধান্তগ্রহণ চূড়ান্ত যুক্তিযুক্ত (Absolutely Rational) হইতে পারে না। কারণ—

(ক) সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া গ্রহণ করা হয়;

(খ) ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত;

(গ) সিদ্ধান্তগ্রহণে অনেকগুলি সম্ভাব্য পন্থা হইতে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণপন্থা নির্বাচন করা হয়। কিন্তু একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে একসঙ্গে কতগুলি সম্ভাব্য পূর্বানুমান করা সম্ভব ? ব্যবস্থাপকের দূরদৃষ্টি সীমিত হইতে পারে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী **হার্বার্ট সাইমন** (Herbert Simon)-এর মতে, উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকিবার দরুন সিদ্ধান্তগ্রহণ কোনক্ষেত্রেই চূড়ান্ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ অবশ্যই 'সীমাবদ্ধ যুক্তিসঙ্গত' (Bounded Rational) হইতে হইবে।

যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে নিম্নলিখিত নীতিগুলি থাকা প্রয়োজন :

মূল নীতি (Basic Principles) : সিদ্ধান্তগ্রহণের তিনটি মূল নীতি হইল :

(১) **সংজ্ঞার নীতি (Principle of Definition) :** বিশেষ মনযোগিতার সহিত প্রকৃত সমস্যা জানিলে তবেই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হয়। যদি মূল পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না হয় তবে প্রকৃত সমস্যা নির্ণয় করা যায় না।

(২) **প্রমাণের নীতি (Principle of Evidence) :** সিদ্ধান্তগ্রহণ তাড়াহুড়া করিয়া করা উচিত নহে। ইহা প্রমাণভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সিদ্ধান্তগ্রহণ উপযুক্ত তথ্যভিত্তিক হইতে হইবে। সমস্যা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগৃহীত হইলে এবং অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করিতে পারিলে তবেই সিদ্ধান্তগ্রহণের মূল কাজ সম্পন্ন হয়।

(৩) **স্বরূপত্বের নীতি (Principle of Identity) :** একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহার আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তাও এক একজনের নিকট এক একপ্রকার। সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে ইহা বিবেচনা করিতে হয় এবং যে সময়ে ঘটনাটি ঘটে সেই সময়ের আপেক্ষিক তাৎপর্য নিরূপণ করিতে হয়। সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিও বিচার্য।

গৌণ নীতি (Secondary Principles) :

সিদ্ধান্তগ্রহণে নিম্নলিখিত অনুসৃত নীতিগুলি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে :

(১) **বিচক্ষণতার সহিত কর্মসূচী-বহির্ভূত বিষয়গুলির বিভাজন করা (Division of Non-programmed Matters with Skill) :** সিদ্ধান্তগ্রহণের বিষয়গুলি দুইপ্রকার হইতে পারে। যেমন—(ক) **কর্মসূচীভুক্ত বিষয় :** এই বিষয়গুলি নিয়মমাফিক (Formal) এবং পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হয়। এইসকল বিষয়ের সমস্যাগুলির ধারাবাহিকতা থাকে। কর্মসূচীভুক্ত বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাদের সমাধানও সহজ।

(খ) **কর্মসূচী-বহির্ভূত বিষয় :** এইগুলি পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হয় না। ইহারা অনিয়মমাফিক (Informal), অভিনব, অপ্রতিষ্ঠিত এবং এইসকল বিষয়ের সমস্যাগুলির ধারাবাহিকতা থাকে না বলিয়া ইহাদের সমাধানও সহজ নহে। বিশেষ মনোযোগ, বিশ্লেষণ ও অবস্থার বিচার করিয়া এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে হয়।

সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতি হইল কর্মসূচী-বহির্ভূত বিষয়গুলির উপযুক্ত বিভাজন করা।

(২) **সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure) ঃ** সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। যদি সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়সংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হয় তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে হয়। যদি সাংগঠনিক কাঠামো ভারার্পণের নীতি অনুসরণ করিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়, তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ কার্য সম্পাদনের নিকটেই হইবে এবং ইহাতে অনমনীয়তা বজায় থাকিবে।

(৩) **উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপ্রণালীর বিভাজন (Break-up of Objectives, Policies and Procedures) ঃ** সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপ্রণালীর বিভাজন প্রয়োজন। ইহাতে সিদ্ধান্তগ্রহণের মূল ভিত্তি জানা যায় এবং উপযুক্ত ও সঙ্গত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(৪) **সম্ভাব্য কর্মপন্থার বিশ্লেষণ (Analysis of Alternatives) ঃ** সিদ্ধান্তগ্রহণে সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন সম্ভাব্য কর্মপন্থা বাহির করিতে হয় এবং উহাদের সুবিধা-অসুবিধার বিশ্লেষণ করিয়া উপযুক্ত আচরণ পন্থা স্থির করিতে হয়।

(৫) **উপযুক্ত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা (Proper Communication System) ঃ** অভ্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সংগঠনের সকল স্তরের মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কম থাকে।

(৬) **সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রভাব সমীক্ষা (Study of Impact of Decision) ঃ** সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিবার পর ইহার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া বিরূপ কিনা তাহা সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

(৭) **নমনীয়তা (Flexibility) ঃ** সিদ্ধান্ত যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই কারণে সিদ্ধান্তগ্রহণে নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন।

(৮) **পর্যাপ্ত সময় (Adequate Time) ঃ** সিদ্ধান্তগ্রহণ তাড়াহুড়া করিয়া করা উচিত নহে। ঘটনা-পরম্পরার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করা উচিত।

(৯) **অংশগ্রহণের অভ্যাস (Practice in Participation) ঃ** সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিয়া সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(১০) **কর্মশৃঙ্খলের স্বীকৃতি (Recognition of Chain of Action) ঃ** প্রত্যেকটি কাজ একে অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত বা শৃঙ্খলযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণও কাজের শৃঙ্খল মানিয়া করিতে হইবে।

সিদ্ধান্তগ্রহণের অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা (Decision-making Premises) ঃ

সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হয় এবং যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেইসকল বিষয়কে সিদ্ধান্তগ্রহণের অনুমিত বিষয় বা

ধ্যান-ধারণা বলে। এই বিষয়গুলি হইল : (ক) কারবারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, (খ) নীতি, (গ) কর্মপ্রণালী ও (ঘ) কর্মপন্থা। এইসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে হয়। নানাবিধ কার্যকলাপ সিদ্ধান্তগ্রহণকে প্রভাবিত করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ-সংক্রান্ত উপাদানসমূহকে (Internal and External Environmental Factors) সিদ্ধান্তগ্রহণের ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য কতকগুলি সহায়ক (Aids) প্রয়োজন হয়। এই সহায়কগুলি হইল (ক) অন্তর্দৃষ্টি (Intuition), (খ) অভ্যাস, (গ) অভিজ্ঞতা, (ঘ) পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং (ঙ) তথ্য ও পরিসংখ্যান।

সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রকারভেদ (Types of Decision-making) :

কর্তৃত্বের স্তর, গুরুত্ব, উপলক্ষ্য, প্রকৃতি ও লক্ষ্য, নীতি ও কার্যগত দিক, পদ্ধতিগত দিক এবং উৎসের দিক হইতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রকারভেদ করা যাইতে পারে। নিম্নে সিদ্ধান্তগ্রহণের বিভিন্ন প্রকারভেদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) **কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত ও বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত** (Centralised Decision and Decentralised Decision) : উচ্চস্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকের হাতে সিদ্ধান্তগ্রহণের ভার থাকিলে তাহাকে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত বলে। ইহা ক্ষুদ্র কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহাতে একনায়কতন্ত্র (Autocracy) সৃষ্টি হয়।

সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার স্তরে বা বিভাগীয় প্রধানদের হাতে ন্যস্ত হইলে তাহাকে বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত বলে। বৃহৎ কারবারে ইহা প্রযোজ্য। ইহা গণতান্ত্রিক (Democratic) পদ্ধতি।

(২) **মুখ্য সিদ্ধান্ত ও গৌণ সিদ্ধান্ত** (Major Decision and Minor Decision) : মূল ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণকে মুখ্য সিদ্ধান্ত বলে। যেমন, কর্মী ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত।

সাধারণ ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণকে গৌণ সিদ্ধান্ত বলে। যেমন, স্টেশনারী ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত।

(৩) **মৌলিক সিদ্ধান্ত, আরোপিত সিদ্ধান্ত ও উদ্ভূত সিদ্ধান্ত** (Basic Decision, Imposed Decision and Derived Decision) : নিজ উদ্যোগে গৃহীত সিদ্ধান্তকে মৌলিক সিদ্ধান্ত বলে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সিদ্ধান্তকে আরোপিত সিদ্ধান্ত বলে এবং অধস্তন কর্মীদের আবেদন-নিবেদন হইতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত বলে।

(৪) **গতানুগতিক সিদ্ধান্ত ও কলাকৌশলী সিদ্ধান্ত** (Routine Decision and Strategic Decision) : একই ধরনের সমস্যা সমাধানে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে গতানুগতিক সিদ্ধান্ত বলে। এইরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণে বিশেষ চিন্তা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণকে কলাকৌশলী সিদ্ধান্ত বলে। ইহাতে বিশেষ বিচক্ষণতা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

(৫) **কর্মনীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যগত সিদ্ধান্ত** (Policy Decision and Operating Decision) : কর্মনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন এবং ইহা দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা। ইহা প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, কর্মচারীদের পদোন্নতির মাধ্যমে শতকরা পঁচিশ ভাগ পদ পূরণ করা।

কার্যগত সিদ্ধান্ত হইল নীতিগত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে রূপায়িত করিবার সিদ্ধান্ত। ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরে ইহা গৃহীত হয়। যেমন, বোনাস কত শতাংশ দেওয়া হইবে তাহার সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মনীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু বোনাসের পরিমাণ গণনা করা কার্যগত সিদ্ধান্ত।

(৬) **গতানুগতিক সিদ্ধান্ত ও অ-গতানুগতিক সিদ্ধান্ত** (Programmed Decision and Non-programmed Decision) : প্রচলিত কার্যক্রম অনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণকে গতানুগতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। যেমন, কর্মচারীদের ছুটি অনুমোদন করা।

যে সকল সিদ্ধান্তের কোন পূর্ব নজীর নাই, যাহা সম্পূর্ণ নূতন ও এককালীন তাহাদের অভিনব বা অ-গতানুগতিক সিদ্ধান্ত বলে। যেমন, কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।

(৭) **একক সিদ্ধান্ত ও ব্যষ্টি বা দলগত সিদ্ধান্ত** (Individual Decision and Group Decision) : যখন সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাপকের একার দ্বারা হয় অর্থাৎ যে সকল সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপক নিজেই কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া গ্রহণ করেন, তখন তাহাকে একক সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। ছোট কারবারে এবং বৃহৎ কারবারের গতানুগতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ একক হয়।

সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাদের ব্যষ্টি বা দলগত সিদ্ধান্ত বলে। এই সকল সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ কারবারের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় গৃহীত লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত। এইরূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞানগর্ভ হয় এবং ইহাতে দলগত মনোভাব সৃষ্টি হয়। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণ সময়সাপেক্ষ। ইহাতে দায়িত্ব এড়াইবার প্রবণতা থাকে।

(৮) **পরামর্শমূলক সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত** (Consultative Decision and Participative Decision) : বিভিন্ন পক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া যখন সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় তখন তাহাকে পরামর্শমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্তগ্রহণ করিবার আগে তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করেন।

সিদ্ধান্তগ্রহণে যদি অধস্তন কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ অধস্তন কর্মীদের মতামত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাহাকে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত বলে। **রেনসিস লিকার্ট** (Rensis Likert) অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তের সুপারিশ করিয়াছেন।

সৃজনশীল সিদ্ধান্ত (Creative Decision) **:** কোন বিষয়ে স্বকীয়ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতাকে **সৃজনশীলতা** (Creativity) বলে। সৃজনশীল সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পর্যায় বা ধাপগুলি হইল :

(ক) সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে সমস্ত ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমস্যার সহিত সংপৃক্ত হইতে হইবে। ইহাকে **সংপৃক্তকরণ** (Saturation) পর্যায় বলে।

(খ) নূতন ধারণা সৃষ্টির জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে সমস্যা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাকে **বিবেচনা বা চিন্তার** (Deliberation) পর্যায় বলে।

(গ) সচেতন মন যখন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় তখন সমস্যাটি সিদ্ধান্তগ্রহীতার অবচেতন মনের উপর স্থানান্তরিত হয়। এই পর্যায়কে **মতলব আঁটার** (Incubation) পর্যায় বলে।

(ঘ) কিছুদিন পর কেন্দ্রীণ ধারণা আলোর ঝলকানির মত সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখা দেয়। ইহাকে **আলোকিতকরণের** (Illumination) পর্যায় বলে।

(ঙ) ইহার পর সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা যাচাই করা হয় এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়। এই পর্যায়কে **যাচাইকরণের** (Verification) পর্যায় বলে।

সিদ্ধান্তগ্রহণের ধাপসমূহ (**Steps in Decision-making**) **:**

পিটার ড্রাকার (Peter Drucker) ও **হার্বার্ট সাইমন** (Herbert Simon সীমাবদ্ধ যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের নিম্নলিখিত ধাপ বা পর্যায়সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) **রোগ নির্ণয় বা সমস্যা নির্ধারণ** (Diagnosing or Defining the Problem) **:** অভ্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সমস্যার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। পর্যাপ্ত সময় দিয়া সমস্যার মৌলিক বিষয় নিরূপণ করা প্রয়োজন। সঠিক রোগ নির্ণীত হইলে উহার অর্ধ প্রতিকার হয়। যদি কোন সমস্যা উপযুক্তভাবে জানা যায় তবে উহার অর্ধেক সমাধান হইয়া যায় (A problem is half solved when it is well defined)। লক্ষণভিত্তিক রোগনির্ণয় (Symptomatic Diagnosis) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে প্রতারণা করে। একটি বা দুইটি রোগের লক্ষণ দেখিয়া যেমন রোগ নির্ণয় করা উচিত নয়, তেমনি সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করা অনুচিত। প্রকৃত রোগ নির্ণয় বা সমস্যা নির্ণয় না করিয়া সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রচেষ্টা অনেকটা সংকেত না দেখিয়া রাস্তা পার হইবার মত।

(২) **সমস্যার বিশ্লেষণ** (Analysing the Problem) **:** সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে হইবে তাহা জানিতে হইবে। সমস্যাটি উপযুক্তভাবে বিশ্লেষিত না হইলে সিদ্ধান্তের কার্যকারিতায় সচলতা আসে না। সমস্যার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। সমস্যার বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যার প্রকৃতি অর্থাৎ সমস্যাটি কৌশলী (Strategic) না গতানুগতিক (Routine);

(খ) সিদ্ধান্তের প্রভাব ;
(গ) সিদ্ধান্তের মিয়াদ ;
(ঘ) সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ ;
(ঙ) সিদ্ধান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট কৌশলী বিষয়সমূহ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে ঠিক করিতে হইবে যে, সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তাহার কি কি তথ্য প্রয়োজন। সমস্যার জটিলতা, সমস্যার সক্রিয় শক্তি ও উপাদান এবং সমস্যার সহিত জড়িত ঘটনাগুলির কতকগুলি মুখ্য (Major) এবং কতকগুলি গৌণ (Minor)। সিদ্ধান্তগ্রহণে কেবলমাত্র মুখ্য কারণগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(৩) **বিকল্প সমাধানের অন্বেষণ** (Searching Alternative Solution) ঃ লক্ষ্য স্থির করিয়া এবং পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় বা ধ্যান-ধারণা নির্ধারণ করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণের সম্ভাব্য বিকল্প সমাধানের পন্থা বাহির করিতে হয়। বিকল্প পদ্ধতি বাহির করিবার উদ্দেশ্য হইল ইহাদের সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীকে যতগুলি সম্ভব বিকল্প সমাধান বাহির করিতে হইবে। ইহা তাহার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। কৌশলী বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণে বিকল্প সমাধান বাহির করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় সিদ্ধান্তগ্রহণ যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়।

(৪) **শ্রেষ্ঠ সমাধান নির্বাচন** (Selecting the Best Solution) ঃ বিকল্প সমাধানগুলির মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান বা পন্থা বাহির করিতে হয়। ইহার জন্য বিকল্প সমাধানগুলির মূল্যায়ন করিতে হয় এবং বস্তুগত (Tangible) ও অবস্তুগত (Intangible) উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য করিতে হয়। সাধারণভাবে অন্তর্দৃষ্টি (Intuition) ভিত্তিতে কোন্ সমাধানটি শ্রেষ্ঠ তাহার মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু ইহা অনেক সময় সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত করে। সর্বোৎকৃষ্ট সমাধানের বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : (ক) স্বল্প ব্যয়, (খ) স্বল্প সময় এবং (গ) সীমিত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর শ্রেষ্ঠ সমাধান নির্বাচন নির্ভর করে। **পিটার ড্রাকার** (Peter Drucker)-এর মতে, শ্রেষ্ঠ সমাধান নির্বাচনের চারটি নির্ণায়ক বা মানদণ্ড (Criteria) আছে। এইগুলি হইল :

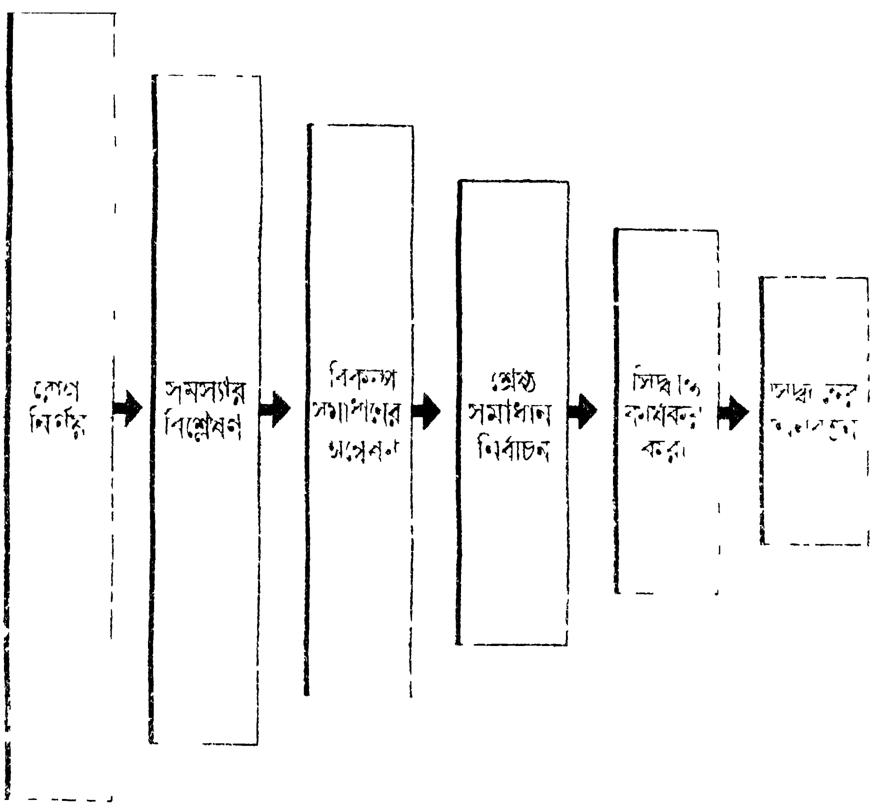
(ক) প্রত্যাশিত ফললাভের সহিত ঝুঁকির অনুপাত ;
(খ) ফললাভের সম্ভাব্যতা ও সুবিধা এবং প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য ;
(গ) সুবিধাজনক ও উপযুক্ত সময় নির্বাচন এবং
(ঘ) লভ্য বা প্রাপ্ত সম্পদের সীমা।

(৫) **সিদ্ধান্ত কার্যকর করা** (Putting the Decision into Action) : সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য কোন্ কোন্ কাজ করা হইবে, কে কি কাজ করিবে এবং কিভাবে কাযগুলি সম্পন্ন হইবে, সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে তাহার নির্দেশ দিতে হইবে।

কর্মীদের সহযোগিতার উপর সিদ্ধান্তের সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং (ক) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে পূর্বেই সিদ্ধান্তটি জানাইতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং তাহাদের সহযোগিতা ও স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ; (খ) সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করা হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জানাইতে হইবে এবং (গ) সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কার্যকরী করিতে হইলে সিদ্ধান্ত কখন আরোপ করা হইবে তাহার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত আরোপিত না হইলে সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তও ব্যর্থতায় পযবসিত হয়।

(৬) **সিদ্ধান্তের অনুবর্তন** (Following-up the Decision) : দুইটি কারণে সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নাও হইতে পারে, যেমন—(ক) প্রত্যেক সিদ্ধান্তেই কিছু অনুমান করা হয়, যাহা সঠিক নাও হইতে পারে ;

(খ) সিদ্ধান্তগ্রহীতার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।



সিদ্ধান্তগ্রহণের পর্যায়-এর রেখাচিত্র

উপরোক্ত দুইটি কারণে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার পরও উহার অনুবর্তন অর্থাৎ অনুসরণ করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্তগ্রহণে ভুলত্রুটি ধরা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

* উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Management By Objectives or MBO) :

পিটার ড্রাকার (Peter Drucker) এম বি ও ধারণার উদ্ভাবন করেন। এম বি ও কথাটির পূর্ণরূপ হইতেছে 'ম্যানেজমেণ্ট বাই অবজেকটিভস' অর্থাৎ উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল স্তরের ব্যবস্থাপকগণের উদ্দেশ্যপূরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাকে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলে।

উন্নত পন্থায় উদ্দেশ্য পূরণের উপায় হিসাবে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর সাম্প্রতিককালে বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের বা পর্যায়ের উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট, অর্থপূর্ণ ও যাচাইযোগ্য করিয়া ইহা ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন উদ্দেশ্য পরিমাণগতভাবে সংগঠনের প্রত্যেকটি বিভাগ ও উপ-বিভাগের প্রস্তাবিত ফলাফলকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ করে, তখন উহা অধস্তন কর্মীদের কর্ম নির্দেশক-এর কাজ করে। উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের দর্শনের (Philosophy of Decentralisation) সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অর্থ হইতেছে, সংগঠনের নির্ণীত উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা, উপ-উদ্দেশ্যসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করা, প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক এককের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা এবং প্রত্যেক স্তরের কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রত্যেক একক ব্যবস্থাপকের দিক হইতে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলিতে বুঝায়—

(১) প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই সংগঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য এবং তাহার বিভাগের উপ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হইতে হইবে;

(২) অধস্তন কর্মিগণের নিকট হইতে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণের কাজে কি সাহায্য পাইতে পারেন, তাহা প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে অবগত হইতে হইবে;

(৩) একজন ব্যবস্থাপক অন্য ব্যবস্থাপকগণকে তাঁহাদের উদ্দেশ্যপূরণে কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন এবং তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণে অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতে পারেন সেই সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা (Advantages of MBO) :

উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উন্নত করা যায়।

(২) সংগঠনের ক্ষেত্রে ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণ উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়।

(৩) ইহা ব্যবস্থাপকগণের কর্মে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

(৪) ইহা ব্যবস্থাপনায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-Control) পদ্ধতি প্রবর্তন করে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অসুবিধা (Disadvantages of MBO) :

উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে 'আবরণ' (Kit) বলা হয়, কারণ ইহা ব্যবস্থাপকগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) এইরূপ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের পূর্বে অধস্তন ব্যবস্থাপকগণকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। ইহা ব্যয়-বহুল।

(২) ইহা কার্যকর করিতে হইলে ব্যবস্থাপকগণকে উপযুক্ত কর্মনির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ইহাতে উদ্দেশ্যসমূহ পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপনার গুণগত দিক অবহেলিত থাকে।

(৪) ইহা কেবলমাত্র স্বল্পকালীন উদ্দেশ্যপূরণের উপর গুরুত্ব দেয়। ইহাতে দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্যপূরণের প্রকল্প থাকে না।

(৫) উচ্চ স্তরের উদ্দেশ্য পরিবর্তনে নিম্নস্তরেও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা সহজে কার্যকর করা যায় না।

সংগঠন—সামাজিক আচরণমূলক প্রকৃতি ও তাৎপর্য (Organisation—Nature and Significance as Social Behaviour) :

সংগঠনের ভাষাগত অর্থ হইতেছে "প্রকৃষ্টরূপে গঠন"। এই প্রকৃষ্টরূপে গঠন নির্ভর করে কাজ ও কর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উপর। কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর প্রয়োজন হয়। এই সকল কর্মীর কাজের মধ্যে সংগঠন একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে এবং কারবারের বিভিন্ন বিষয় ও অংশের মধ্যে ভারসাম্য আনে। ইহা বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। কাঠামোগতভাবে সংগঠন কর্ম, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে। ইহা মানুষের প্রাণবন্ত দেহের মত। প্রাণ যেমন দেহকে সবল রাখে, সংগঠন তেমনি কারবারকে সবল রাখে।

আচরণগতভাবে সংগঠন একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা। সংগঠনকে সামগ্রিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub system) বলা যায়। এই উপ-ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন আচরণ (Behaviour) আছে যেমন, নিয়মমাফিক (Formal), অনিয়মমাফিক বা নিয়ম-বহির্ভূত (Informal), খামখেয়ালীপনা (Idiosyncracy) ইত্যাদি। মানুষের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আচরণের প্রকৃতিও জটিল। কর্মীর আচরণ সবক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় না কেন, এই সম্পর্কে দুইটি মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদ দুইটি হইল :

(১) **হতাশাবাদী মতবাদ** (Pessimistic View) **:** মনে আদিম প্রবৃত্তি থাকে বলিয়া মানুষ অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। স্বাভাবিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষ কাজ করিতে চায় না। সেই জন্য হতাশাবাদীরা মনে করেন যে, কর্তৃত্ব প্রয়োগ

করিয়া এবং শাস্তি ও ছাঁটাই-এর ভয় দেখাইয়া কর্মীদের সহযোগিতা সংগঠন চালাইতে হইবে।

(২) **আশাবাদী মতবাদ** (Optimistic View) : আশাবাদ... যে, মানুষ সুস্থ প্রবৃত্তিসম্পন্ন সামাজিক জীব এবং সংগঠনে কাজ করিবার উপযুক্ত পরিবেশ থাকিলে কর্মীরা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া কাজ করে এবং সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দেয়।

মানব সংগঠন (Human Organisation) স্বীকার করে যে, কর্মী যন্ত্র নহে। তাহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আবেগ ও প্রবণতা আছে। উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিবেশ কর্মীর অনুকূল আচরণ সৃষ্টি করে। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন জর্জ টেরি, পিটার ড্রাকার, হার্বার্ট সাইমন, হেনরি ফোর্ড সকলেই কর্মীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং কর্মীর শক্তি ও সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশকে কাজের অনুকূল করিবার উপর জোর দিয়াছেন। হথর্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় (Hawthorne Experiments) দেখান হইয়াছে যে, সংগঠনের অনুকূল পরিবেশে কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সংগঠনে অনুকূল সামাজিক আচরণমূলক প্রকৃতির তাৎপর্য হইল :

(১) ইহাতে কর্মিগণ অধিকতর দায়িত্বশীল হয় ,
(২) ইহা দ্রুত কার্য সম্পাদনের নিশ্চয়তা আনে ,
(৩) ইহাতে ভৌতিক (Physical), যান্ত্রিক ও মানবিক শক্তির ব্যবহারে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় ,
(৪) কার্য সম্পাদনে ভুল বোঝাবুঝি ও শৃঙ্খলা হ্রাস পায় ;
(৫) ইহা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহাতে কর্মীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় .
(৬) ইহা সমস্ত প্রকার কাজকে একসূত্রে গাঁথিয়া সংযোজনার কাজকে সুগম করে ,
(৭) ইহা ভারার্পণের (Delegation) কাজে সহায়তা করে ,
(৮) ইহাতে শ্রমের অপচয় বন্ধ হয় ;
(৯) ইহা সংগঠন ও কর্মীর মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।

ভারার্পণ (Delegation) ঃ ব্যবস্থাপনাশাস্ত্রে ভারার্পণ হইতেছে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়।

সংজ্ঞা (Definition) ঃ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া উপযুক্ত পরিমাণ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করিবার গতিশীল প্রক্রিয়াকে (Dynamic Process) ভারার্পণ বলে।

লুই এলেন (Louis Allen)-এর মতে, "ভারার্পণ হইল ব্যবস্থাপনার শক্তি। ইহা একটি পদ্ধতি যাহা অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদের উপর অর্পিত কর্মভার বিভাজন করেন এবং কাজের কিছু অংশ তাঁহার অদ্বিতীয় বা অতুল (Unique) সাংগঠনিক অবস্থানের কারণে সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য নিজে রাখিয়া দেন ও বাকী অংশ অপরের সাহায্যে করাইবার জন্য কর্তৃক অর্পণ করেন।"

প্রয়োজনীয়তা (Importance) **:** কারবারের আয়তন বৃহৎ হইলে উর্ধ্বতন কর্মচারীর পক্ষে তাঁহার উপর অর্পিত সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে কর্মভার বিভাজন করিয়া উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ অধস্তন ব্যবস্থাপকগণকে কর্মভার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ভারার্পণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) কর্তৃত্ব যেমন ব্যবস্থাপকের কর্মসম্পাদনের চাবিকাঠি, ভারার্পণ তেমনি সংগঠনের চাবিকাঠি।

(২) ভারার্পন কর্মপ্রণালীতে (Procedures) সরলতা ও সজীবতা আনে, অধস্তন কর্মচারীদের মনে দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি করে এবং তাহারা কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত হয়।

(৩) ভারার্পণের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে কর্ম-সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক (Superior-Subordinate Relationship) গড়িয়া তোলে।

(৪) ভারার্পণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনায় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একাধিক ব্যবস্থাপকের সাহচর্য ও সহযোগিতায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ভারার্পণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

(৫) ইহা সংগঠনে বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা ও বিভ্রান্তি দূর করে।

(৬) ভারার্পণে কর্মী-স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম-প্রণোদনা সৃষ্টি হয়।

(৭) ভারার্পণ উর্ধ্বতন কর্মচারীর কর্তৃত্ব হ্রাস করে না বরং কর্তৃত্বের ব্যাপ্তি ঘটায়। আবার ভারার্পণে উর্ধ্বতন কর্মচারী তাঁহার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পান না, অধস্তন কর্মচারীর কাজের জন্য তিনি দায়ী থাকেন। এই কারণে তাঁহাকে অধস্তন কর্মচারীর কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান বা অবেক্ষণ (Supervision) করিতে হয়।

(৮) ভারার্পণে উর্ধ্বতন কর্মচারীর কর্মভার লাঘব হয় বলিয়া তিনি অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার কাজে মনোযোগ দিতে পারেন।

(৯) ভারার্পন ব্যক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

(১০) নিয়মমাফিক কার্যকলাপ (Routine Activities) সম্পাদনে ভারার্পণ প্রয়োজন। ইহা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

(১১) সংগঠনে ভারার্পন করা না হইলে ইহার উন্নয়ন রুদ্ধ হইয়া যায় এবং সংগঠনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে।

ভারার্পণের উপাদান (Components of Delegation) :

ভারার্পণ প্রক্রিয়ায় তিনটি উপাদান আছে—

(১) **কর্তব্য অর্পণ** (Entrustment or Assignment of Duty) : ভারার্পণের প্রথম উপাদান হইতেছে কর্তব্য অর্পণ করা। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক তাঁহার উপর অর্পিত কাজকে বিভাজন করেন এবং সম্পূর্ণ কর্তব্যের কতকাংশ যাহা তাঁহার অদ্বিতীয় বা

অতুল (Unique) সাংগঠনিক অবস্থানের জন্য নিজেরই সম্পাদন করা উচিত, তাহা নিজের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের অর্পণ করেন। কর্তব্য অর্পণে ভারার্পণকারীকে দেখিতে হইবে যে, নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারিবেন কিনা। ভারার্পণ 'সাদা চেক' (Blank Cheque) নহে। কর্তব্য অর্পণে ভারার্পণকারীর দায়িত্ব হ্রাস পায় না। কারণ দায়িত্ব কাহাকেও অর্পণ করা যায় না (Responsibility cannot be delegated)। দায়িত্ব স্বকীয় বা নিজস্ব ব্যাপার। ভারার্পণদাতা অধস্তন কর্মীর সাহায্য লইয়া তাঁহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন এবং এই কারণে কর্তব্য (Duty) অর্পণ করিতে পারেন কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন না। অধস্তন কর্মচারীর কাজের জন্য তিনি নিজেই দায়ী থাকেন। একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য শিক্ষকের সাহায্য লইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা পাশের দায়িত্ব তাহার নিজেরই থাকে। তেমনি একজন ভারার্পণকারী যখন অধস্তন কর্মচারীর উপর কর্তব্যের ভার অর্পণ করেন তখন দায়িত্বের ভারার্পণ ঘটে না। কর্মসম্পাদন ও কর্তব্য পালনের চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব ভারার্পণকারীর উপরেই বর্তায়।

(২) **কর্তৃত্ব প্রদান** (Grant of Authority) ঃ ক্ষমতা (Power) ও কর্তৃত্ব (Authority) এক জিনিস নহে। ক্ষমতা বলিতে বুঝায় অপরের আচরণকে প্রভাবিত করিবার শক্তি। ক্ষমতা নিয়মানুগ, আইনানুগ ও অধিকারসম্মত (Rightful) নাও হইতে পারে। কিন্তু কর্তৃত্ব বলিতে বুঝায় ন্যায়সঙ্গত, আইনানুগ ও অধিকারসম্মত ক্ষমতা যাহার সাহায্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তন কর্মীদের আদেশ প্রদান করেন এবং নিজে কাজ করেন। কার্যসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্বের প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্তৃত্ব না পাইলে অধস্তন কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করিতে পারেন না। ভারার্পণকারীও তাঁহাকে কার্যসম্পাদনে বাধ্য করিতে পারেন না। কর্তৃত্ব ছাড়া ভারার্পণ অর্থহীন। ভারার্পণে কর্তব্য ও কর্তৃত্ব উভয়ই অর্পণ করিতে হয়। কর্তৃত্ব বলিতে আইনানুগ ও অধিকারসম্মত (Rightful) ক্ষমতাকে বুঝায়, যাহার দ্বারা ব্যবস্থাপক নিজে কাজ করেন এবং অপরকে নির্দেশ দেন। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হইল যে, কতখানি কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা উচিত। ইহা বুঝা যাইবে আর একটি পাল্টা প্রশ্ন হইতে। প্রশ্নটি হইল: "একটি মানুষের পা কতখানি লম্বা হওয়া উচিত"? এই প্রশ্নের উত্তর হইবে, "যতখানি লম্বা হইলে উহা মাটিতে পৌছাইতে পারে ততখানি, তাহার বেশী নহে"। কত পরিমাণ কর্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর হইবে, "যতখানি কর্তৃত্ব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ঠিক ততখানি, কম বা বেশী নহে।" দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে সুসামঞ্জস্য (Parity) থাকিতে হইবে, কিন্তু গাণিতিক সমতা (Mathematical Equality) নহে। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম-ব্যাপক (Co-extensive) এবং সম-প্রান্তিক (Co-terminus) হইবে। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমানুপাতিক (Commensurate) হইতে হইবে।

(৩) **দায়িত্ব পালন ও কৈফিয়ত প্রদান** (Discharge of Responsibility and Accountability) ঃ যখন কোন অধস্তন কর্মচারীকে কার্যসম্পাদনের জন্য কর্তব্য অর্পণ করা হয় এবং ঐ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয়, তখন অধস্তন কর্মচারীকে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য ভারার্পণকারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। অধস্তন কর্মচারী তাঁহার কর্তব্য কর্মের কতখানি দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাহার হিসাব বা কৈফিয়ত পেশ করিবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তন কর্মীর নিকট হিসাব বা কৈফিয়ত দাবী করিতে পারেন। কর্তৃত্ব অর্পণ নিম্নগামী (Downward) হয়, কিন্তু কৈফিয়ত বা হিসাব পেশ উর্ধ্বগামী (Upward) হয়। একজন অধস্তন কর্মী তাঁহার দায়িত্ব পালনের কৈফিয়ত একজন মাত্র উর্ধ্বতন ভারার্পণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য এবং ভারার্পণকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য কর্তব্য, কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও হিসাব পেশ একই সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। ইহারা সর্বদা একই সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে। কর্তব্য অর্পণ করিলেই উপযুক্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হয় এবং কর্তৃত্ব কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আনে ও তাহার কৈফিয়ত প্রদান বা হিসাব পেশ করিতে বাধ্য করে।

ভারার্পণের সুফল (Benefits of Delegation) ঃ

ভারার্পণের গুরুত্বের আলোচনা হইতে ইহার সুফল জানা যায়। এই সুফলগুলি হইল ঃ

(১) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ দৈনন্দিন সাধারণ কার্যকলাপের চাপ হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নবীকরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

(২) ভারার্পণ ফলপ্রসূ হইলে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য আসে এবং কার্যাবলী সম্পাদনে কর্মসমন্বয় সম্ভব হয়

(৩) ভারার্পণে কর্তব্য প্রদান ও কর্তৃত্ব অর্পণের ফলে অধস্তন কর্মচারীদের মনে দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয়।

(৪) ভারার্পণ অধস্তন কর্মীদের আত্মবিকাশের সুযোগ দেয় বলিয়া তাহাদের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) ভারার্পণ কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া অধস্তন কর্মচারীদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে।

* কর্মাধ্যক্ষগণ ভারার্পণে অনিচ্ছুক কেন? (Why are Managers reluctant to delegation ?) ঃ

ভারার্পণের নীতি কার্যকরী করিতে হইলে উর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ ও অধস্তন কর্মীদের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই উর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের অনিচ্ছার কারণে ভারার্পণ

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাস্তবে সাফল্যমণ্ডিত হয় না। এখন প্রশ্ন হইল, কর্মাধ্যক্ষগণ ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন কেন? নিম্নলিখিত কারণে কর্মাধ্যক্ষগণ ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন:

(১) ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ মনে করেন যে, তিনি তাঁহার অধস্তন কর্মীর উপর যে কর্তব্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিবেন সেই কর্তব্য তাঁহার অধস্তন কর্মী উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে না এবং তিনি নিজে ঐ কাজ করিলে উত্তমরূপে উহা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(২) ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ মনে করেন যে, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ সিদ্ধান্তগ্রহণের কার্যভারের পক্ষে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহাদের যোগ্যতার প্রতি কর্মাধ্যক্ষের আস্থার অভাব থাকে বলিয়া কর্মাধ্যক্ষগণ তাহাদের ভারার্পণ করিতে অনিচ্ছুক হন।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে কর্মাধ্যক্ষ মনে করেন যে, কর্তৃত্ব হস্তান্তরের ফলে অধস্তন কর্মীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন সে তাঁহার প্রতিভাকে অতিক্রম করিয়া কর্ম-সম্পাদনে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইবে। ভবিষ্যতে অধস্তন কর্মচারী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন।

(৪) সংগঠনের প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি উপযুক্ত না হয় তবে তিনি ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন, কারণ ভারার্পণ 'সাদা চেক' (Blank Cheque) নহে—অধস্তন কর্মীর কাজের জন্য ভারার্পণকারী কর্মাধ্যক্ষ দায়ী থাকেন। সুতরাং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাব থাকিলে তিনি অধস্তন কর্মীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন না এবং 'পশ্চাদ হইতে তথ্যের অভাব পূরণজনিত নিয়ন্ত্রণ' (Feed-back Control) ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে না, এই আশঙ্কায় ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন।

(৫) ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ মানসিক দিক হইতে কোনও পরিবর্তনে অনিচ্ছুক হইলে ভারার্পণ করিতে চাহেন না।

(৬) ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ যদি অধস্তন কর্মচারিগণকে উপযুক্ত আদেশদান ও নির্দেশদানে অক্ষম হন, তবে তিনি ভারার্পণে অনিচ্ছুক হন।

(৭) যখন তথ্য ও কর্ম উপকরণগুলির অভাব থাকে, তখন কর্মাধ্যক্ষ ভারার্পণে অনিচ্ছুক হইতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মাধ্যক্ষগণ মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভারার্পণে অনীহা প্রকাশ করেন।

ভারার্পণের নীতি (Principles of Delegation):

ভারার্পণ সংগঠনে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনে। গোলমেলে ভারার্পণ (Fuzzy Delegation) অথবা কৃত্রিম ভারার্পণ (Pseudo Delegation) ভারার্পণের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে বিনষ্ট করে। ভারার্পণকে কার্যকর করিতে হইলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া ভারার্পণ করিতে হয়:

(১) ফললাভের আশা অনুযায়ী ভারার্পণ নীতি (Principle of Delegation by Results expected): অধস্তন কর্মচারীর কর্তব্যভার অনুসারে এবং

আশা অনুযায়ী কর্তৃত্বের ভারার্পণ করিতে হয়। পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জন পর্যাপ্ত কর্তৃত্বের ভারার্পণ করা প্রয়োজন।

(২) **দায়িত্বের সম্পূর্ণতার নীতি** (Principle of Absoluteness of Responsibility): দায়িত্ব কাহাকেও অর্পণ করা যায় না। এই কারণে দায়িত্ব-গ্রহণকারী ব্যবস্থাপক তাঁহার কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকিবেন এবং তাঁহার অধস্তন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত কাজের জন্যও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) **কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য** (Parity of Authority and Responsibility): কর্তৃত্ব হইতেছে কাজ করিবার ও অপরকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার অধিকারসম্মত (Rightful) ক্ষমতা। দায়িত্ব বলিতে কর্তব্য সম্পাদনকে বুঝায়। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গাণিতিক সমতা থাকিতে পারে না। কর্তৃত্ব দায়িত্বের সমানুপাতিক (Commensurate) হইবে। ইহারা সম-ব্যাপক (Co-extensive) ও সম-প্রান্তিক (Co-terminus) হইতে হইবে।

(৪) **আদেশের একতার নীতি** (Principle of Unity of Command): অধস্তন ব্যবস্থাপক তাঁহাকে অর্পিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃত্ব অর্পণকারী একজন মাত্র ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকিবেন, একাধিক ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকিবেন না।

ইহা ছাড়া ভারার্পণকে কার্যকর করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবহারিক নির্দেশগুলি (Practical Guides) মানিতে হয়:

(ক) উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কর্মিগণের মনে সন্দেহের অবকাশ ও বিবাদের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কর্তব্য-ভার বণ্টন ও কর্তৃত্ব অর্পণ লিখিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) ফললাভের আশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মভার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

(গ) সঠিক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) সংবাদ আদান-প্রদানের ও জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

(ঙ) উপযুক্ত কর্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

(চ) অধস্তন কর্মচারিগণকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করিতে হইবে।

(ছ) ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

(জ) অধস্তন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে তাহাদের মনে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation):

সংজ্ঞা (Definition): বিকেন্দ্রীকরণ বলিতে কাজের বিস্তীর্ণকরণ (Dispersal) বুঝায় না, কর্তৃত্বের বিস্তীর্ণকরণকে বুঝায়। কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা

দুইটি সাংগঠনিক দর্শনের (Organisational Philosophy) ।

ফেওল (Henri Fayol)-এর মতে, "যাহা কিছু অধস্তন র বৃদ্ধি করে, উহাই বিকেন্দ্রীকরণ এবং যাহা কিছু উহা হ্রাস র কোন সংগঠনে কর্তৃত্বের অধিকাংশ এক বা কয়েকজন মাত্র প্র... তাহাকে কেন্দ্রীকরণ বলে। কিন্তু কর্তৃত্বের অধিকাংশ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে স্থানান্তরিত হইলে তাহাকে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ বলে। কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে (Absolutely) কেন্দ্রীভূত বা বিকেন্দ্রীভূত হইতে পারে না। কর্তৃত্ব অর্পণ ও কর্তৃত্ব সংরক্ষণের মাত্রার উপর বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ নির্ভর করে। যখন কর্তৃত্ব সংরক্ষণের মাত্রা কর্তৃত্ব অর্পণের মাত্রা অপেক্ষা বেশী হয় তখন তাহাকে কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) বলে। আর যখন কর্তৃত্ব অর্পণের মাত্রা কর্তৃত্ব সংরক্ষণের মাত্রা অপেক্ষা বেশী হয় তখন তাহাকে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation) বলা হয়। ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণ একটি অপরটির সহিত কারণ ও ফলাফলের দ্বারা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। ভারার্পণ হইল কারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ তাহার ফল। যখন ভারার্পণ নীতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (Consistently) ও অবিচলিতভাবে (Persistently) সংগঠনে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়, তখনই বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

লুই এলেন (Louis Allen)-এর মতে, "কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যে সকল কার্য সম্পাদন করা অপরিহার্য, সেইগুলি ছাড়া অপর সকল কার্যের ভার ও কর্তৃত্ব সর্বনিম্ন স্তরে অর্পণ করাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।"

কিথ ডেভিস (Keith Davis)-এর মতে, "বিকেন্দ্রীকরণ বলিতে বুঝায় সংগঠনটির উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মী হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম কর্মীস্তর পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ও পালন করা সম্ভব এইরূপ কার্যভার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা।"

সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্বকে (Decision-making Authority) সংগঠনের নিম্নতর স্তরগুলিতে হস্তান্তরিত করিবার প্রক্রিয়াকে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ বলে। কর্তৃত্বের যতখানি কেন্দ্রীভূত হয় নাই অর্থাৎ কর্তৃত্বের যে অংশ কেন্দ্রীভূত নহে, তাহাই কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।

পরিস্থিতি (Circumstances) :

যে যে পরিস্থিতিতে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয়, সেই সকল পরিস্থিতি হইল :

(১) **কারবারের আয়তন বৃদ্ধি** (Growth of Size of Business) : কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে ব্যবস্থাপনা জটিল হইয়া পড়ে, নির্দেশনার কাজ কঠিন হয়, নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ অতিরিক্ত কাজের চাপে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এইক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হয়।

(২) **উৎপন্ন দ্রব্য অথবা বাজারের প্রকৃতি** (Nature of Product or Market): দ্রব্যের উৎপাদনে অথবা দ্রব্যের বাজারের উপর বিশেষ যত্ন লইবার প্রয়োজনেও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

(৩) কারখানা অথবা সুবিধার ভৌতিক পৃথকীকরণ (Physical Separation of Plants or Facilities) : অনেক সময় কারখানা অথবা সুবিধার ভৌতিক পৃথকীকরণ করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়োজন হয়।

(৪) কলাকৌশলগত উন্নয়ন (Technological Development) : কলাকৌশলের উন্নতিতে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হয়।

(৫) দ্রব্য অথবা প্রক্রিয়ার বিচিত্রকরণ (Diversification of Products of Process) : দ্রব্য অথবা প্রক্রিয়ার বিচিত্রকরণে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় বলিয়া কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা (Advantages of Decentralisation) :

বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভার লাঘব (Reduction in the Burden of Top Executives) : বৃহৎ কারবারে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত কাজের চাপ হ্রাস করে। ফলে তাঁহারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেমন, নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের কাজে মনঃসন্নিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(২) কাজের বিচিত্রকরণ (Diversification of Activities) : বিকেন্দ্রীকরণ নূতন নূতন দ্রব্য ও প্রক্রিয়া সংযোজন করিয়া প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইতে সাহায্য করে।

(৩) দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ (Quick Decision-making) : বিকেন্দ্রীকরণে সিদ্ধান্ত কর্মসম্পাদনের স্থানেই গৃহীত হয় বলিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণে 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্য (Red-tapism) হ্রাস পায় এবং দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হয়।

(৪) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (Management Development) : বিকেন্দ্রীকরণে অধস্তন কর্মচারিগণ নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহাতে তাহাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা সর্বক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক গড়িয়া উঠে।

(৫) অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি (Enhancement of Motivation) : বিকেন্দ্রীকরণে ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীরা কাজে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত হয়। ফলে কর্মীদের মনোবল (Morale) বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সংবাদ আদান-প্রদান, জ্ঞাতকরণ এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে বলিয়া দলগত মনোভাব (Team-spirit) ও দলগত ঐক্য (Group Cohesiveness) বৃদ্ধি পায়।

(৬) কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (Effective Control and Supervision) : বিকেন্দ্রীকরণে নিয়ন্ত্রণের পরিধি (Span of Control) বৃদ্ধি পায়। ইহাতে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। প্রত্যাশিত কাজের মান ও সম্পাদিত কাজের পরিমাপ সঠিকভাবে পর্যালোচনার ফলে নিয়ন্ত্রণে গুণগত উৎকর্ষ আনা সম্ভব হয়।

(৭) **প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের সুবিধা** (Facility of Technological Development) : প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের সুবিধা ভোগ করিবার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

(৮) **প্রতিলিপিকরণ পরিহার** (Avoidance of Duplication) : বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিলিপিকরণ বা একই কাজ একাধিকবার করা এবং পার্কিনসন সূত্রে (Parkinson's Law) প্রদর্শিত উপরিপর-কর্তব্য (Overlapping Duties) পরিহারে সাহায্য করে।

(৯) **অভ্যন্তরীণ সংযোজনার উন্নতি** (Betterment of Internal Co-ordination) : বিকেন্দ্রীকরণে ব্যবস্থাপক ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় ফলপ্রসূ কর্মসমন্বয় সম্ভব হয়।

(১০) **বিপণনের প্রসার** (Extension of Marketing Facilities) : বিকেন্দ্রীকরণে বিপণনযোগ্য দ্রব্যের মান বৃদ্ধি করিয়া বাজারের সম্প্রসারণ করা যায়।

(১১) **অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধা** (Internal and External Economies) : বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা আনিয়া অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধা প্রদান করে।

বিকেন্দ্রীকরণের অসুবিধা (Disadvantages of Decentralisation) :

বিকেন্দ্রীকরণে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) ক্ষুদ্রায়তন কারবারে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করে বলিয়া প্রযোজ্য নহে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে একটি মাত্র দ্রব্য বা দ্রব্যাংশ উৎপাদিত হয় অথবা যেখানে বাজারের পরিধি সীমিত ও অবিভাজ্য, সেই সকল ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ফলপ্রসূ নহে।

(৩) যে সকল ক্ষেত্রে নীতি, কর্মপ্রণালী ও কর্মপন্থা একই প্রকার (uniformity) হওয়া উচিত, যেমন, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ বাধা সৃষ্টি করে।

(৪) অধিবিভাগীয় (Divisional) কর্মভার গ্রহণের উপযোগী দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক পাওয়া অনেক সময় দুরূহ হয়।

(৫) ইহাতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়-বহুল হয় এবং অত্যধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়।

(৬) ইহা সংগঠনে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র (Autonomous) অধিবিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে অসামঞ্জস্য আনিতে পারে।

(৭) বিকেন্দ্রীকরণে সংযোজনা (Co-ordination) ব্যাহত হইতে পারে।

(৮) বাহ্যিক উপাদানের কারণে যেমন, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীকরণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

(৯) ইহা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিবিভাগগুলির মধ্যে শত্রুতার মনোভাব (Rivalry) সৃষ্টি করে।

(১০) যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অধিবিভাগগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্তভাবে সমন্বিত বা সংযোজিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে সার্বিক ঐক্যের অভাব ঘটে এবং বিকেন্দ্রীকরণ আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপে পরিণত হয়।

চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ বা চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরন কোনটিই বাস্তবে সম্ভব নয়। চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ অথবা চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ অবাস্তব বা অলীক (Moonshine) ঘটনা, যদি ইহাদের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য না আনা যায়। কর্তৃত্বের কতখানি বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে তাহা নির্ভর করে (ক) অধস্তন কর্মীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর এবং (খ) সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে বা স্থানে অধস্তন কর্মীর হাতে যথেষ্ট তথ্য বণ্টনের উপর।

ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সম্পর্ক (Relation between Delegation and Decentralisation) :

ভারার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই আছে। দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া উপযুক্ত কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করিবার গতিশীল প্রক্রিয়াকে (Dynamic Process) ভারার্পণ বলে। কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়াকে সংগঠনের নিম্নতর স্তরগুলিতে বা অধিবিভাগগুলিতে (Divisions) স্থানান্তরিত করিবার পদ্ধতিকে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ বলে। যখন ভারার্পন নীতি সুসামঞ্জস্যভাবে ও অবিচলিতভাবে (Consistently and Persistently) সংগঠনে প্রয়োগ করা হয় তখন কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ভারার্পন ও বিকেন্দ্রীকরণের সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ভারার্পণ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic Process)। বিকেন্দ্রীকরণ হইল সুচিন্তিত ও ইচ্ছাকৃত ভারার্পন নীতির শেষ পরিণতি।

২) ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারিগণের মধ্যে ভারার্পন হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও অধিবিভাগের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ হয়।

৩) ভারার্পণ একটি কার্যসম্পাদনের জন্য করা হয়, কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে সামগ্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়।

(৪) ভারার্পন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবশ্যিক, কারণ ভারার্পন ব্যতীত কোন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক তাঁহার উপর অর্পিত কর্মভার সম্পাদন করিতে পারেন না। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ ঐচ্ছিক। ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে।

(৫) ভারার্পণে কোন কাজের একটি অংশ অধস্তন কর্মীকে সম্পাদনের জন্য প্রদান করা হয় এবং কাজটি ক্রিয়াগত (Operational) ও নির্বাহিক (Managerial) উভয় প্রকৃতিরই হইতে পারে; কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে কেবলমাত্র নির্বাহিক (Managerial) কাজ প্রদান করা হয়।

(৬) কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যতটুকু কর্তৃত্ব প্রয়োজন ভারার্পণে শুধু সেইটুকু কর্তৃত্বই অর্পন করা হয়; কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে পদ্ধতিগতভাবে সাংগঠনিক ভিত্তিতে কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করা হয়।

(৭) ভারার্পণ একটি বিচ্ছিন্ন এবং আংশিক প্রক্রিয়া হইতে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র সুসামঞ্জস্য ও অবিচলিতভাবে (Consistently and Persistently) সম্পূর্ণ ভারার্পণের মাধ্যমেই বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয়।

(৮) ভারার্পণ হইল কারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ তাহার ফল।

মানবিক প্রয়োজন ও সাংগঠনিক নকশা বা নমুনা (Organisational Design) :

সংগঠনে কর্মীই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। কর্মীদের মাধ্যমেই সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। এই কারণে কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করিতে হয়। কর্মীর কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইলে সংগঠনের নমুনা বা নকশা কর্মীর প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। কাজের প্রতি কর্মীদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণ হইতে পারে এমনভাবে সংগঠনের নকশা প্রস্তুত করিতে হয়।

কর্মীকে কাজে অনুপ্রাণিত করে কতকগুলি প্রয়োজন। আব্রাহাম মাসলো (Abraham Maslow) মানবিক প্রয়োজনগুলিকে পাঁচটি ক্রমানুগ পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন :

(১) দৈহিক প্রয়োজন (Physiological Needs) : এই প্রয়োজনগুলি কর্মীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এইগুলি মৌল প্রয়োজন (Basic needs) যেমন, আহার, বাসস্থান, বস্ত্র ও বিশ্রাম।

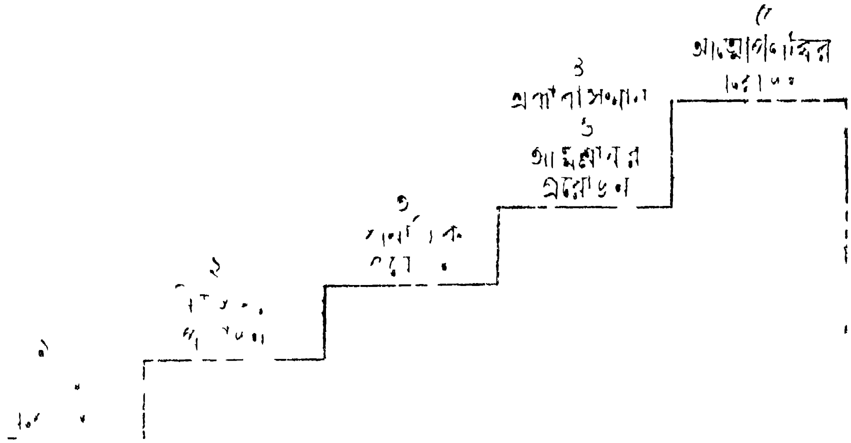
(২) নিরাপত্তার প্রয়োজন (Safety Needs) : চাকুরীর নিরাপত্তা হইল আর্থিক নিরাপত্তা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার নিরাপত্তা হইল সামাজিক নিরাপত্তা। উভয় প্রকার নিরাপত্তা রক্ষা করাই কর্মীর অন্যতম প্রয়োজন।

(৩) সামাজিক প্রয়োজন (Social Needs) : অপরের ভালবাসা পাওয়া ও অপরকে ভালবাসিবার স্পৃহা সামাজিক প্রয়োজন। সহকর্মীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সামাজিক প্রয়োজন মিটায়।

(৪) সম্মানলাভের প্রয়োজন (Esteem Needs) : সহকর্মীদের নিকট হইতে সম্মান ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি সম্মানলাভের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষতার প্রশংসা সম্মানলাভের প্রয়োজন মিটায়। মর্যাদা ও সম্মান আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন (Egoistic Needs) পূরণ করে।

(৫) আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন (Self-actualisation Needs) : ইহা সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রয়োজন। ইহা কর্মীর স্বাধীন সত্তা প্রকাশের উচ্চতর প্রয়োজন (High Level Need)।

উপরোক্ত প্রয়োজনগুলির একটি পূরণ হইবার পর তবেই আর একটির উদ্ভব হয় কাজের মাধ্যমে কর্মী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাহার প্রয়োজনগুলি মেটায়। কাজে [illegible] যে সকল প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ সন্তুষ্টি হয়, সেই প্রয়োজনগুলি হইল :



[illegible] নীচে চিত্র [illegible]

[illegible] সামাজিক [illegible],

[illegible] (Pl [illegible]

[illegible] পদমর্যাদা, [illegible] কর্তৃত্ব [illegible]

[illegible] সন্তুষ্টি (৯) [illegible]

[illegible] বাহির [illegible] সন্তুষ্টি [illegible] :

ক) [illegible]

সামাজিক মর্যাদা লাভ [illegible]

[illegible] কারবার [illegible]

[illegible] কর্মী [illegible] মিটাইতে [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্ষুদ্র দল (Small Units) : [illegible] ছোট ছোট দলে ভাগ করা [illegible] পরস্পর সন্তুষ্টি (Satisfaction) আসে। ইহাতে অনিয়মমাফিক (Informal) সংগঠন [illegible] কর্মীর সামাজিক প্রয়োজন পূরণ হয় এবং কারবারের অংশস্বরূপ (S [illegible] o [illegible] elorgin [illegible]) মনোভাব সৃষ্টি হয়।

: বিচ্ছিন্ন কাজ (Isolated Jobs) : কাজের [illegible] আনিবার জন্য সংগঠনের নকশা এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে যাহাতে বিচ্ছিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি না হয় এবং সঙ্গপ্রিয়তা বজায় থাকে।

(৩) **কাজের সংকীর্ণতা (Narrow Work Assignment) :** কাজের সংকীর্ণতা কর্মীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়। সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সংগঠনের নকশা এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে কর্মীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়।

(৪) **ক্রমোচ্চ শ্রেণীভুক্তি (Place in Hierarchy) :** কোন কোন কর্মচারী উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকের নিকট সরাসরি যাতায়াত করিয়া পদমর্যাদা বৃদ্ধির গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু ইহাতে সঙ্গপ্রিয়তার প্রয়োজন মেটে না।

(৫) **উচ্চ বিশেষীকরণ (High Specialisation) :** ইহাতে একঘেয়েমি আসে এবং কাজের প্রতি উৎসাহ নষ্ট হয়।

(৬) **কাজের বিস্তারকরণ (Job Enlargement) :** ইহাতে কাজের পরিধি বিস্তারিত হয় বলিয়া কাজে উৎসাহ আসে এবং একঘেয়েমি কমিয়া যায়।

(৭) **কাজের সমৃদ্ধিকরণ (Job Enrichment) :** ইহাতে কাজের বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ ও সৃজনমূলক হয় বলিয়া কর্মীর আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন মেটে।

(৮) **বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation) :** ইহাতে অধস্তন কর্মীদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটে বলিয়া কর্মীর আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন মেটে।

গঠন-সংক্রান্ত নকশা (Structural Design) বা সাংগঠনিক কাঠামোর নকশাকরণ (Designing the Organisational Structure) :

কার্যসম্পাদনের সুবিধার জন্য সংগঠনকে বিভিন্ন বিভাগ ও স্তরে বিভক্ত করা হয়। যে নকশা প্রস্তুত করিয়া সংগঠনের গঠন বা কাঠামো দেখান হয়, তাহাকে সংগঠনের কাঠামো বলে। এই কাঠামো কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক নিয়মমাফিক সম্পর্ক (Formal Relation) নির্দেশ করে। আলবার্ট উইকেসবার্গ (Albert Wickesberg)-এর মতে, "কারবারের অবস্থা, কর্মপ্রণালী, কর্ম প্রক্রিয়া, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সামাজিক পরিবেশের উপর যে ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহাকে সংগঠন কাঠামো বলে।"

কারবারে যদি কর্মীদের সংখ্যা গাণিতিক প্রগতিতে (A. P.) বৃদ্ধি পায় তবে ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক জ্যামিতিক প্রগতিতে (G. P.) বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে সংগঠনের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। জটিলতামুক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর নকশাকরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয় :

(১) **উদ্দেশ্যের প্রকৃতি (Nature of Objectives) :** কারবারের উদ্দেশ্য অনুসারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করিতে হয়।

(২) ***সক্রিয় কার্যকলাপ (Operative Activities) :*** কাজের প্রকৃতি এবং কাজ ও কর্মীর সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হয়।

(৩) **কাজের অনুবর্তিতা (Sequence of Tasks) :** কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হয়।

(৪) **নির্বাহিক কাজ** (**Managerial Function**): ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করিতে হইবে।

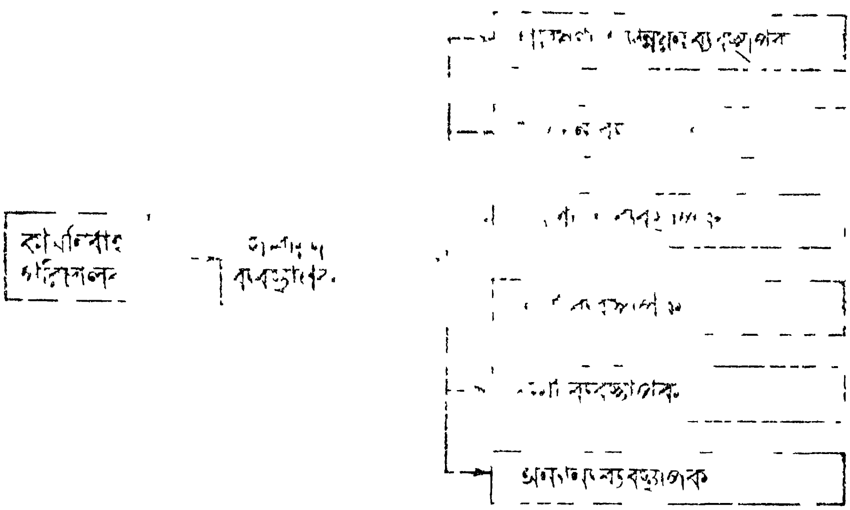
(৫) **দক্ষতার সীমাবদ্ধতা** (**Limitation of Skill**): কোন্ কর্মীকে কি কাজ দেওয়া হইবে তাহা নির্ভর করে তাহার দক্ষতার উপর। সুতরাং সংগঠনের কাঠামো নির্বাচনে কর্মীর দক্ষতা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) **আকার ও পরিধি** (**Size and Scope**): ছোট কারবারে কাজের পরিধি ক্ষুদ্র হয় এবং সংগঠনের কাঠামো সরল হয়। কিন্তু বৃহৎ কারবারে কাজের পরিধি ব্যাপ্ত হয় বলিয়া সাংগঠনিক কাঠামো জটিল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৭) **কর্মীদের সামাজিক প্রয়োজন** (**Social Needs of Employees**): সংগঠনের কাঠামো স্থির করিবার সময় কর্মীদের পদমর্যাদা, কারবারের অংশস্বরূপ হইবার মনোভাব (Sense of Belonging), ইচ্ছা, অনিচ্ছা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

সংগঠনের কাঠামো নির্ভর করে কারবারের প্রয়োজন (Needs)-এর উপর। **পিটার ড্রাকার** (**Peter Drucker**) সংগঠনের কাঠামো নির্ধারণে তিনটি বিশ্লেষণ (Analysis)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণগুলি হইল :

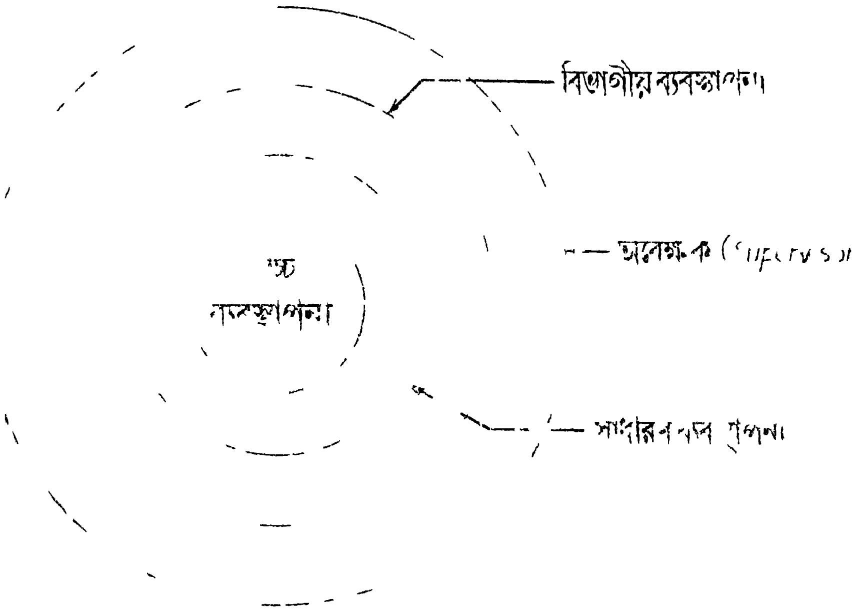
(১) **কার্যকলাপ বিশ্লেষণ** (**Activity Analysis**): প্রথমেই সংগঠনের মূল কাজ কি তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার পর মৌলিক কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী



সমান্তরাল সাংগঠনিক কাঠামো

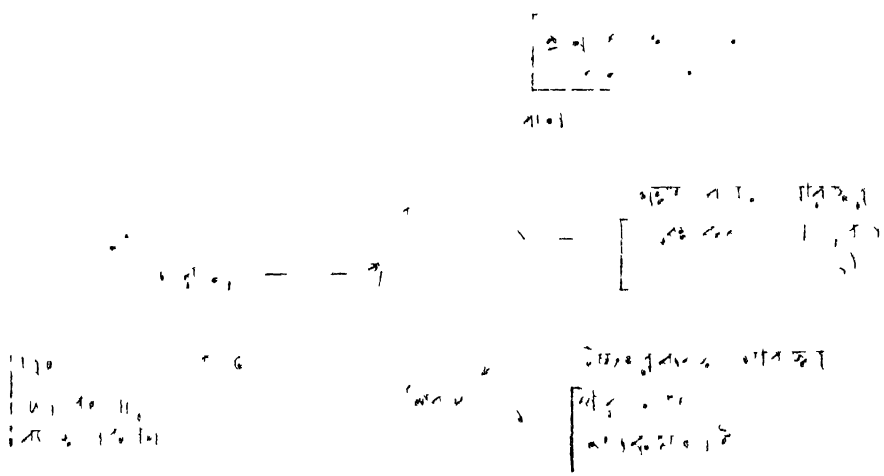
কি কি তাহা স্থির করিয়া কাজগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করিতে হইবে। কার্যকলাপের বিশ্লেষণে কাজগুলির প্রকৃতি জানা যায়। কোন্ কোন্ কাজ একসঙ্গে করা যাইবে, কোন্ কোন্ কাজ পৃথক পৃথকভাবে করিতে হইবে এবং কোন্ কাজের

উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হয় ... একই ধরনের কাজ ও সম্পর্কিত কাজগুলিকে একটি বিভাগের অধীনে আনা সম্ভব।



চক্রাকার সাংগঠনিক কাঠামো

(২) সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ (Relations Analysis) ঃ ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সিদ্ধান্ত গতানুগতিক Routine বা কলাকৌশলী



বৃক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো

(Strategic) হইতে পারে। যে সকল কাজে কলাকৌশলী বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রয়োজন সেইগুলি সংগঠন কাঠামোর উচ্চস্তরে এবং যে সকল কাজে গতানুগতিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন সেইগুলি সংগঠন কাঠামোর নিম্নস্তরে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কি প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্ স্তরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, সিদ্ধান্তের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী না স্বল্পস্থায়ী, সিদ্ধান্তের আর্থিক চাপ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হয়।

(৩) **সম্পর্ক বিশ্লেষণ (Relations Analysis)** : কাজের মসৃণ গতিপ্রবাহ এবং পূর্ণাঙ্গ সংযোজনা আনিবার জন্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে সংগঠনের কাঠামো স্থির করা হয়। সাংগঠনিক সম্পর্ক, বিভাগীয়করণের সমস্যা ও সংযোজনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হয়। পূর্বাপর বা উল্লম্ব (Vertical), পারিপার্শ্বিক (Lateral), আড়াআড়ি (Diagonal) ইত্যাদির ভিত্তিতে সংগঠনের কাঠামো স্থির করা যায়। পূর্বাপর ভিত্তিতে রৈখিক সম্পর্ক, পার্শ্বিক ভিত্তিতে রৈখিক-কর্মী (Line-Staff) সম্পর্ক এবং আড়াআড়ি ভিত্তিতে কোনাকুনি সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে।

প্রশাসনিক সংগঠনের রূপ বা প্রকারভেদ (Forms or Types of Administrative Organisation) :

কর্তৃত্ব অর্পণ ও দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের বিভিন্নতা অনুসারে প্রশাসনিক সংগঠন নিম্নলিখিত রূপের হইতে পারে :

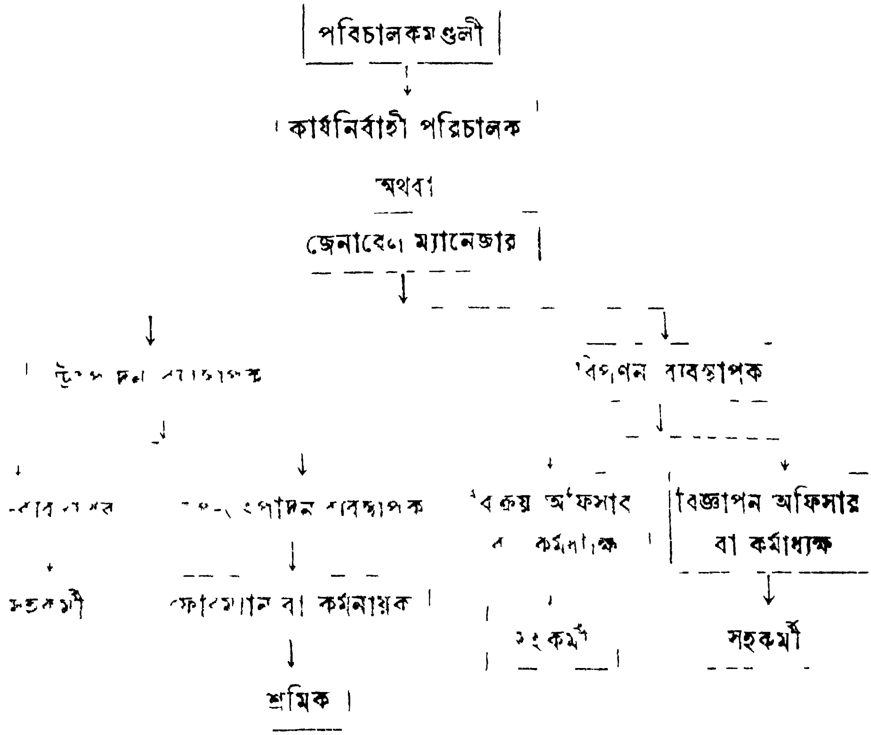
(১) রৈখিক সংগঠন (Line Organisation);
(২) কর্মী সংগঠন (Staff Organisation),
(৩) কার্য-ভিত্তিক সংগঠন (Functional Organisation) এবং
(৪) রৈখিক ও কর্মী সংগঠন (Line and Staff Organisation).

রৈখিক সংগঠন (Line Organisation) :

ইহাকে 'সামরিক সংগঠন'ও বলে। ইহা অনেক সময় 'রীতিবদ্ধ' বা 'গতানুগতিক' সংগঠন এবং 'যাজকতান্ত্রিক' বা ক্রমোচ্চ শ্রেণী-ভিত্তিক (Hierarchical) সংগঠন নামেও অভিহিত হয়।

যে সংগঠনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ অধস্তন কর্মীদের আদেশ প্রদান করেন এবং আদেশ পালনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন, সেই সংগঠনকে রৈখিক সংগঠন বলে। ইহাতে আদেশ দানের ক্ষমতা সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর হইতে ধাপে ধাপে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়া আসে এবং কাজের কৈফিয়ত নিম্নতর স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায়। এইরূপ কাঠামোয় ঊর্ধ্বতন-অধস্তন কর্মচারী (Superior-Subordinate) সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহা শুধু আদেশ পালনের মাধ্যম নহে, জ্ঞাতকরণের মাধ্যমও বটে। ইহাতে নীতি, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি নিম্নাভিমুখী হয়। কিন্তু কর্মীদের মতামত, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি ঊর্ধ্বমুখী হয়। ইহাতে দ্বিমুখী জ্ঞাতকরণ (Two-way Communication) সম্ভব হয়। সরকারী দপ্তরে এই প্রকার সংগঠন খুবই প্রচলিত।

এই প্রকার সংগঠনে সাধারণতঃ জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে তিন-চারজন ব্যবস্থাপক থাকেন। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের অধীনে তিন-চারজন উপ-ব্যবস্থাপক থাকেন এবং কর্মনায়ক (Foreman) পদ পর্যন্ত এইভাবে চলিতে থাকে। প্রত্যেক কর্মনায়কের অধীনে ৩০ হইতে ৯০ জন পর্যন্ত শ্রমিক থাকিতে পারে।



রৈখিক সংগঠনের রেখাচিত্র

সুবিধা (Advantages) :

এই প্রকার সংগঠনের সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা বিভাগীয় কার্যকর সংযোজনা আনে,

(২) একজন ব্যবস্থাপকের হাতে ব্যবস্থাপনার ভার থাকে বলিয়া এই প্রকার সংগঠনে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সম্ভব হয়,

(৩) ইহা লাল-ফিতার (Red-tapism) দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত,

(৪) এই প্রকার সংগঠন কাঠামো খুবই সরল,

(৫) ইহা ব্যয়-বহুল নহে,

(৬) ইহাতে দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া ব্যবস্থাপক দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না;

(৭) ইহা নিয়মমাফিক (Rule-ridden) কার্যরত প্রতিষ্ঠানের যেমন, সরকারী দপ্তরের পক্ষে খুবই উপযুক্ত,

(৮) ইহাতে সংগঠনে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য বজায় রাখা যায়,

(৯) ইহাতে অধস্তন কর্মচারীদের নিম্নস্তর হইতে পদোন্নতির সুযোগ থাকে বলিয়া তাহারা কাজে অনুপ্রাণিত হয় এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়,

(১০) ভারপ্রাপ্ত প্রধানগণ অধস্তন কর্মীদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদের মানসিক সন্তুষ্টি আসে এবং ইহা কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

অসুবিধা (Disadvantages) :

রৈখিক সংগঠনের নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন বলিয়া সংগঠনের প্রতি স্তরের সমস্ত ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানের উপর ন্যস্ত হয়। ইহাতে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

(২) এই প্রকার সংগঠনে খামখেয়ালীর উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) একই ব্যক্তি সমস্ত প্রকার কার্যভার গ্রহণ করে বলিয়া ইহাতে বিশেষীকরণের সুবিধা পাওয়া যায় না।

(৪) সংগঠনের নমনীয়তা (Flexibility) থাকে না বলিয়া গতিশীলতা (Dynamism) নষ্ট হয়

(৫) ইহাতে কর্মিগণ সর্বদা আদেশ পালন করে বলিয়া তাহাদের উৎসাহ ও সৃজনশীলতা নষ্ট হয়।

(৬) সকল প্রকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে ধরনের দক্ষ ব্যবস্থাপক প্রয়োজন এইরূপ সংগঠনে তাহার অভাব দেখা যায়।

(৭) এইরূপ সংগঠন স্বজন-পোষণ (Nepotism), অনুগ্রহ প্রদর্শন (Favouritism) স্তুতি ও তোষামোদের (Sycophancy and Flattery) উপযুক্ত স্থান বলিয়া গণ্য হয়।

(৮) ইহাতে বিভাগীয় প্রধানগণ সর্বদা অতিরিক্ত কাজের চাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।

কর্মী-সংগঠন (Staff Organisation) :

যে সংগঠনে পরামর্শ প্রদানকারী বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন তাহাকে কর্মী-সংগঠন বলে। ইহার বিশেষজ্ঞগণ সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন (Supportive Role) ও পরামর্শদানকারী হিসাবে কাজ করেন। তাঁহাদের আদেশ বা নির্দেশ দিবার কর্তৃত্ব থাকে না। ইহার কর্তৃত্ব ঊর্ধ্বগামী। ইহাতে 'বিশেষজ্ঞ কর্মী' ও 'ব্যক্তিগত কর্মী' এই দুই প্রকারের কর্মী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ কর্মিগণ সকল স্তরে নিযুক্ত রৈখিক কর্তাদিগকে পরামর্শ দেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কর্মিগণ শুধু উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণকে ব্যক্তিগত সেবা প্রদান করেন

সুবিধা (Advantages) :

কর্মী-সংগঠনের সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে বিশেষীকরণের সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়,

(২) ইহা ব্যক্তিগত সেবা প্রদান করে,

(৩) ইহাতে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে সুবিধা হয়,

(৪) ইহা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

কর্মী-সংগঠনের অসুবিধাগুলি হইল :

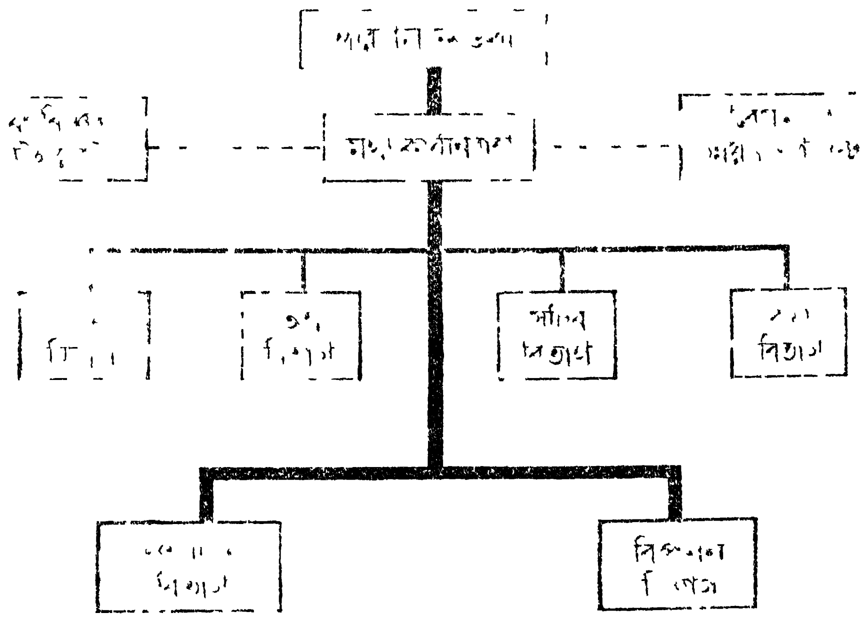
(১) ইহাতে আদেশ বা নির্দেশ দিবার কোন কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ কার্যকর করা হয় না ,

(২) ইহাতে ব্যয়াধিক্য ঘটে ,

(৩) পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যবস্থাপকগণের সহিত মতানৈক্য ঘটিলে ইহা কার্যকর হয় না।

কার্যভিত্তিক সংগঠন Functional Organisation ঃ

মার্কিন ব্যবস্থাপনা-বিশারদ ফ্রেডরিক উইন্সলো টেলর (F. W. Taylor) ইহা প্রবর্তন করেন। যে সংগঠনে কার্য অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ভার এক-একজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর উপর অর্পন করা হয় সেইরূপ সংগঠনকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। রৈখিক সংগঠনে একটি বিভাগের যাবতীয় কাজের ভার একজন বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষের উপর থাকে, কিন্তু কার্যভিত্তিক সংগঠনে সমস্ত বিভাগের একই ধরনের কাজ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ থাকে যেমন, শ্রমিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ সকল বিভাগের শ্রমিক নিয়োগ করেন। বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজ করেন এবং বিভিন্ন বিভাগগুলিকে সেবা ও পরামর্শ দান করেন।



কার্যভিত্তিক সংগঠনের রেখাচিত্র

টেলর কোন কারখানার কার্যসম্পাদনের জন্য আটটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই আটটি প্রক্রিয়ায় আটজন কর্মনায়ক (Foreman) বা

তদারককারী (Boss) নিয়োগ করিতে হয়। এই আটজন কর্মনায়ক বা তদারককারী হইলেন : (১) কর্মী গোষ্ঠী তদারককারী (Gang Boss), (২) কর্মগতি তদারককারী (Speed Boss), (৩) যন্ত্রপাতি মেরামত তদারককারী (Repair Boss), (৪) পরিদর্শক (Inspector), (৫) কারখানার শৃঙ্খলারক্ষক (Shop Disciplinarian), (৬) কার্যক্রমের করণিক (Route Clerk), (৭) নির্দেশদানের কার্ড প্রস্তুতকারক (Instruction Card Man), (৮) সময় ও ব্যয় করণিক (Time and Cost Clerk)।

সুবিধা (**Advantages**) :

কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) এই প্রকার সংগঠন বিশেষায়িত জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদান করিয়া অন্যান্য বিভাগকে সাহায্য করে।

(২) ইহাতে প্রত্যেক বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) পরামর্শ ও সেবা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে।

(৪) উৎপাদনের উৎকর্ষ আনিবার পক্ষে এই প্রকার সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

(৫) ইহাতে শ্রমবিভাগের সুষ্ঠু পরিকল্পনা সম্ভব হয়।

(৬) ইহাতে কায়িক পরিশ্রমের কাজকে মানসিক ও মস্তিষ্কের কাজ হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়।

(৭) ইহা উৎপাদনে প্রমিতকরণ (Standardisation) ও বিশেষায়ণ আনে।

অসুবিধা (**Disadvantages**) :

কার্যভিত্তিক সংগঠনের নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) ইহাতে সাংগঠনিক জটিলতা আসে এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না।

(২) ইহাতে বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ সৃষ্টি হয়।

(৩) ইহাতে দ্বৈত-আনুগত্য (Dual Loyalty) থাকে বলিয়া সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হয়।

(৪) ইহাতে সংযোজনার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(৫) ইহাতে দায়িত্বের নির্দিষ্টতা থাকে না বলিয়া শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং কর্মশৈথিল্য আসে।

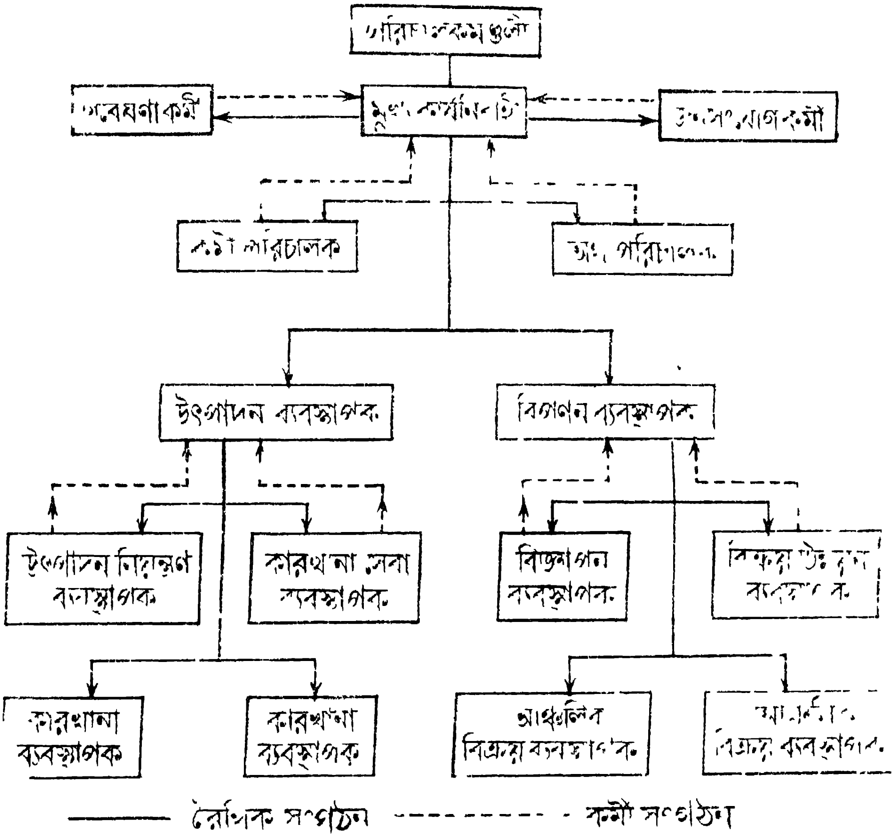
(৬) ইহাতে কর্মনায়ক (Foreman) ও অবেক্ষক (Supervisor)-এর মধ্যে প্রায়ই মতভেদ দেখা যায়।

(৭) এই প্রকার সংগঠনে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কর্মীর অভাব দেখা যায়।

রৈখিক ও কর্মী-সংগঠন (Line and Staff Organisation) :

এই প্রকার সংগঠন রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের সংমিশ্রণে গঠিত হয়। এই প্রকার সংগঠনে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান থাকেন। ইহারা

গতানুগতিক কাজ (Routine Work) করেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজ, যেমন গবেষণা, উন্নয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পাদনের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। ইহারা রৈখিক কর্মকর্তাগণকে পরামর্শ ও উপদেশ দেন।



রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের রেখাচিত্র

সুবিধা (Advantages) :

এইরূপ সংগঠনে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়:

(১) ইহাতে একদিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও গবেষণার সুবিধা পাওয়া যায়।

(২) ইহাতে চিন্তাকরণের কাজ (Thinking Function) ও ক্রিয়াগত কাজ (Doing Function) পৃথক করা সম্ভব হয়।

(৩) ইহাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মীর উন্নতির পথ সুগম হয় কারণ এই প্রকার সংগঠনে বিভিন্ন প্রকার কর্ম পদ থাকে।

(৪) ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

এই প্রকার সংগঠনের অসুবিধাগুলি হইল :

(১) কর্মী সদস্যগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা না হইলে সংগঠনে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

(২) ইহা ব্যয়-বহুল।

(৩) বিশেষজ্ঞ কর্মিগণের কর্তৃত্ব না থাকায় ইহাদের পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হয় না।

(৪) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণ ও বিশেষজ্ঞ কর্মিগণের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ ও বিরোধ দেখা যায়।

সংগঠনে বিরোধের কারণসমূহ (Causes of Conflicts in Organisation) ঃ

যে সকল কারণে সংগঠনে বিরোধ সৃষ্টি হয় সেই সকল কারণ হইল :

(১) **মতানৈক্য (Difference in Opinion) ঃ** সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও পরামর্শদাতার মধ্যে মতপার্থক্য থাকিতে পারে।

(২) **জ্ঞাতকরণে বিকৃতি (Distortion in Communication) ঃ** সঠিক সংবাদ অনেক সময় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয় বলিয়া বিরোধ সৃষ্টি হয়। অনিয়মমাফিক পদ্ধতিতে জ্ঞাতকরণ অর্থাৎ 'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ' (Grapevine Communication) অনেক সময় গুজব ছড়ায়।

(৩) **ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি (Personal Interest) ঃ** অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগ্রহীতা আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার পরামর্শদাতা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে, সংগঠনে বিরোধ দেখা দেয়।

(৪) **অনিয়মমাফিক প্রভাব (Informal Influence) ঃ** সংগঠনের মধ্যে অনিয়মমাফিক সামাজিক দল (Social Groups) নিয়মমাফিক সংগঠনের পরামর্শ, আদেশ ও নির্দেশ পালনে বিরোধিতা করিতে পারে।

(৫) **ব্যক্তিগত প্রয়োজন (Personal Needs) ঃ** কারবারের উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য থাকিলে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের মধ্যে বিরোধ (Conflicts between Line and Staff Organisation) ঃ

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ সৃষ্টি হয়। রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণ কর্মী বিশেষজ্ঞগণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করেন :

(১) বিশেষজ্ঞ কর্মিগণ তাত্ত্বিক এবং ইঁহারা কার্যকর বাস্তব উপদেশ দিতে পারেন না।

(২) কর্মী বিশেষজ্ঞগণ কার্যকরণক্ষম অর্থাৎ ক্রিয়াগত অবস্থার (Operating Conditions) সহিত তেমন পরিচিত নন। তাঁহাদের উপদেশ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োগযোগ্য নহে।

(৩) কর্মী বিশেষজ্ঞগণ সংগঠনের সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করিয়াই পরামর্শ দিয়া থাকেন।

(৪) কর্মী বিশেষজ্ঞগণ উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকগণের অতি নিকটে থাকায় ইঁহারা প্রকল্পের সাফল্যে বাহবা পান, কিন্তু প্রকল্পের অসফলতার দায়িত্ব রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণের উপর চাপাইয়া দেন।

কর্মী বিশেষজ্ঞগণ রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করেন :

(১) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ প্রায়ই অবহেলা করেন। কেবলমাত্র অসুবিধায় পড়িলে তবেই ইঁহারা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

(২) রৈখিক ব্যবস্থাপকগণ নিজস্ব মত অনুসারে চলেন।

(৩) রৈখিক ব্যবস্থাপকগণ নূতন ধারণা গ্রহণে অনীহা দেখান। তাঁহারা প্রাচীন ও বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাসী।

(৪) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণ আত্মস্তরী। ইঁহারা কর্মী বিশেষজ্ঞগণের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহেন না।

রৈখিক ও কর্মী সংগঠনে কিভাবে সম্পর্কের উন্নতি করা যায় (How to bring about betterment of relationship between Line and Staff Organisation) :

রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে :

(১) কর্মী বিশেষজ্ঞ পদে উপযুক্ত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করা উচিত যাহাতে তাঁহারা ব্যবহারিক বা বাস্তব পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন।

(২) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণকে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে কর্মী বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) রৈখিক কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মী বিশেষজ্ঞগণকে বিকল্প কাজে উপস্থাপন করা উচিত।

(৪) কর্মী বিশেষজ্ঞগণকে যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা রৈখিক কর্মাধ্যক্ষগণকে তাঁহাদের পরামর্শগ্রহণে বাধ্য করিতে পারেন।

(৫) উভয়পক্ষকে মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া মতামত বিনিময় করিতে হইবে।

(৬) বিরোধ মিটাইবার জন্য মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট আবেদন করা উচিত।

কাজ ও ব্যক্তির মধ্যে মানানসইকরণ (Matching of Jobs and Individual) :

সঠিক কাজে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করাকে মানানসইকরণ বলে। মানানসইকরণের বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল :

(১) **কাজের বর্ণনা (Job Description) :** যে ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করা হইবে তাহাকে কাজটির ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দিতে হইবে।

(২) **তথ্য পরিবেশন (Catering of Information) :** যে ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করা হইবে তাহাকে কার্যসম্পাদনের বিষয়, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক, বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা, সম্ভাব্য পরিবর্তন, কলাকৌশলের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য জানাইতে হইবে।

(৩) উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ (Appointment of Right Person): যে কাজে ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইবে সেই কাজে তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

***নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সংগঠন (Formal and Informal Organisation) ঃ**

সংগঠন কর্মীতে-কর্মীতে, কর্মে-কর্মে এবং বিভাগে-বিভাগে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক নিয়মমাফিক এবং অনিয়মমাফিক হইতে পারে।

নিয়মমাফিক সংগঠন (Formal Organisation): এইপ্রকার সংগঠনে কর্তব্য, কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কর্মীর পদ ও সংগঠনের নিয়ম-কানুন সাংগঠনিক তালিকা ও কাজের বিবরণীর মাধ্যমে দেখান হয়।

সুবিধা (Advantages) ঃ এই প্রকার সংগঠনের সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা কর্মীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে,

(২) ইহা কর্মীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সম্পর্ক দেখায়,

(৩) ইহাতে আদেশ ও নিদেশ উপযুক্তভাবে পালনের সম্ভাবনা বেশী থাকে,

(৪) ইহাতে ব্যক্তি-প্রচেষ্টা ও বিভাগীয় প্রচেষ্টার সংযোজনা সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) এইরূপ সংগঠনে কর্মীর কর্ম-স্বাধীনতা হ্রাস পায়,

(২) ইহা সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে।

অনিয়মমাফিক সংগঠন (Informal Organisation) ঃ সংগঠনের প্রস্তাবিত আচরণবিধি, কার্যপ্রণালী এবং নিয়ম-কানুন ও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কর্মীদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাকে অনিয়মমাফিক সংগঠন বলে। ইহা আন্তর্ব্যক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে গড়িয়া উঠে। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক দল বা গোষ্ঠী (Social Groups) সৃষ্টি করে। এই সামাজিক দলগুলি বৃহৎ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। সাংগঠনিক তালিকায় ইহাদের অস্তিত্ব দেখান হয় না।

অনিয়মমাফিক দল বা গোষ্ঠী সৃষ্টির কারণসমূহ (Causes of Formation of Informal Groups) ঃ

অনিয়মমাফিক সামাজিক দলগুলি গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক হইতে পারে। ইহাদের গঠনের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহারা সামাজিক সম্পর্কের কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে ;

---

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কর্মিগণ একই সঙ্গে একস্থানে দিনের পর দিন কাজ করে বলিয়া এইরূপ দল গড়িয়া উঠে ;

(৩) ব্যক্তিগত আন্তঃক্রিয়ার ফলে ইহাদের সৃষ্টি হয় ;

(৪) কর্মিদলের মধ্যে সমমনোভাবাপন্নতা এইরূপ দল সৃষ্টি করে ;

(৫) ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কারণে ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে ;

(৬) একই স্থানে বসবাস করে বলিয়া বা একই কলোনীতে বা শিবিরে থাকে বলিয়া অথবা একই স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বলিয়া ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে ;

(৭) একই প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস, বয়স, কাজ, পেশা এবং সংস্কৃতির কারণে ইহারা গড়িয়া উঠে ;

(৮) মহিলা কর্মীরা সাধারণতঃ একটি সামাজিক দল তৈয়ারী করে, যেহেতু তাহারা স্ত্রী-কর্মী ;

(৯) কাজের চাপ অথবা কর্মচ্যুত হইবার ভয় এইরূপ দল সৃষ্টিতে সাহায্য করিতে পারে ,

(১০) অনেক সময় তত্ত্বাবধায়কের (Supervisor) আচরণ কর্মিগণের মনে ভীতির সঞ্চার করিলে তাহারা অনিয়মমাফিক সংগঠন গড়িয়া তোলে।

অনিয়মমাফিক গোষ্ঠী বা দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Informal Groups) ঃ

ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব রীতিনীতি থাকে ;

(২) প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা থাকে ,

(৩) দলনেতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে ;

(৪) দলের কর্মী এক দল হইতে অন্য দলে চলিয়া যাইতে পারে ,

(৫) ইহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে ;

(৬) প্রত্যেকটি দল একটি নির্দিষ্ট পন্থায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

অনিয়মমাফিক সংগঠনের সুবিধা (Advantages of Informal Organisation) ঃ

এইরূপ সংগঠনের সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে ইহা সুবিধাজনক।

(২) ইহাতে কর্মিগণের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবেশ ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠে।

(৩) হথর্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিচালকগণ অধ্যাপক রোয়েথলিসবার্জার, এলটন মেয়ো এবং মেরী ফোলেট এইরূপ সংগঠনের উপকারিতা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, ইহা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।

(৪) ব্যবস্থাপকগণ যদি এইরূপ সংগঠনকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারেন তবে ইহা কর্মিগণের মনোবল (Morale) ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করে।

(৫) ইহা 'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ' (Grapevine Communication) অর্থাৎ অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণের দ্বারা দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানে সাহায্য করে।

(৬) ইহা আচরণবিধি প্রস্তুত করিয়া কর্মিগণের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে।

(৭) ইহা গোষ্ঠীভুক্ত কর্মিগণের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় করে এবং নূতন কর্মিগণকে প্রশিক্ষণ দেয়।

অনিয়মমাফিক সংগঠনের অসুবিধা (Disadvantages of Informal Organisation) ঃ

এইরূপ সংগঠনে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা যায় :

(১) ইহা অনেক সময় কর্মসম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে।

(২) ইহা নিয়মমাফিক সংগঠনের নিয়ম-কানুন অবহেলা করিতে পারে। ফলে ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

(৩) 'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণে' অনেক সময় গুজব ছড়ায়।

নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সংগঠনের পার্থক্য (Distinction between Formal and Informal Organisation) ঃ

নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সংগঠনের পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

নিয়মমাফিক সংগঠন	অনিয়মমাফিক সংগঠন
১। এই প্রকার সংগঠন বিবেচনা-প্রসূত পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে বলিয়া নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সহজেই পূরণ করা যায়।	১। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক দলের (Social Groups) সংমিশ্রণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে। ইহারা বৃহৎ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের মত।
২। এই প্রকার সংগঠনের নক্শা (Design) প্রস্তুত করে ব্যবস্থাপনা। ইহাতে কর্মচারিগণের কাজ, ভূমিকা, আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া পরিষ্কারভাবে নির্দেশিত হয়।	২। নিয়মমাফিক আন্তঃক্রিয়া, কাজ-কর্ম ও কর্মিগণের ভাবাবেগের ফলে ইহা গড়িয়া উঠে।
৩। নিয়মমাফিক সংগঠনের কাজকর্ম দেখাশুনা করিবার জন্য একটি ব্যবস্থাপক দল থাকে।	৩। ইহাতে ব্যবস্থাপক দলের অস্তিত্ব নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংগঠন।
৪। নিয়মমাফিক সংগঠনের উন্নতি এবং সাফল্য ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।	৪। এইরূপ সংগঠনের উন্নতি এবং সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্কের উপর।

অনিয়মমাফিক সংগঠন	নিয়মমাফিক সংগঠন
৫। ইহার প্রকৃতি ক্রমোচ্চ শ্রেণী-ভিত্তিক (Hierarchical)। ইহা সংগঠনের লক্ষ্য, সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণকে ফলপ্রসূ করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়।	৫। ইহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে অনিয়মমাফিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।
৬। এইরূপ সংগঠনে কর্মিগণের মধ্যে বুদ্ধি, কৌশল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থির করা হয়।	৬। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।
৭। এইরূপ সংগঠনের প্রকৃতি অব্যক্তিক (Impersonal)।	৭। এইরূপ সংগঠনের প্রকৃতি ব্যক্তিক (Personal)।
৮। নিয়মমাফিক সংগঠনে উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য আদেশ ও উপদেশ নিয়মমাফিক উপায়ে নির্দেশ করা হয়।	৮। ইহা সদস্যগণের প্রয়োজন বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মাধ্যমে পূরণ করিবার চেষ্টা করে।
৯। এইরূপ সংগঠন খুবই অনমনীয় বা স্থির (Rigid)।	৯। এইরূপ সংগঠন নমনীয় বা পরিবর্তনশীল (Flexible)।
১০। ইহাতে কর্মিগণের মধ্যে নির্দেশিত সম্পর্ক ও নেতৃত্ব সচরাচর পরিবর্তিত হয় না।	১০। ইহাতে সদস্যগণের সম্পর্ক ও নেতৃত্ব প্রায়ই পরিবর্তিত হয়।
১১। এইরূপ সংগঠন নিয়ম-শাসিত (Rule-ridden), কারণ ইহাতে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন থাকে।	১১। এইরূপ সংগঠনে প্রত্যেকটি সামাজিক দলের স্বকীয় রীতি-নীতি ও আচার আচরণ থাকে এবং ইহারা স্ব-স্ব পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

* **বিভাগীয়করণ (Departmentalisation) ঃ**

সংজ্ঞা (Definition) ঃ জটিল কারবারী পরিস্থিতিতে কর্ম-বিভাজনের প্রয়োজন হয়। সমগোত্রীয় কাজ শ্রেণীভুক্ত করিয়া অন্যান্য কাজ হইতে পৃথক করা হয়। কাজকে সমান্তরালভাবে পৃথকীকরণগুলি (Horizontal Differentiation) করিয়া পৃথক পৃথক অংশে বা উপ-ব্যবস্থায় (Sub-system) পরিণত করিবার পদ্ধতিকে **বিভাগীয়করণ** বলে। বিভাগীয়করণ পদ্ধতিতে প্রথমে নির্ধারিত সমগোত্রীয় কাজগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং উহাদের দ্বারা কার্যকরী কর্মদল তৈয়ারী করা হয়। ইহার পর দলগুলিকে লইয়া বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বিভাগীয়করণের উদ্দেশ্য হইল কর্ম-বিভাজন ও বিশেষীকরণের সুবিধা ভোগ করা।

*কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিভাগীয়করণের উপাদানসমূহ (Factors of Departmentalisation) :

কারবারের প্রকৃতি যাহাই হোক না কেন বিভাগীয়করণে নিম্নলিখিত বিষয় বা উপাদানগুলি বিবেচনা করিতে হয় :

(১) **বিশেষীকরণের মাত্রা (Degree of Specialisation)** : বিশেষীকরণ দক্ষতা ও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। বিভাগীয়করণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজে বিশেষায়ণ আনা সম্ভব হয়। কিন্তু অতি-বিশেষীকরণের ঋণাত্মক ফলাফল বিবেচনা করিয়া তবে বিভাগীয়করণ করিতে হইবে।

(২) **নিয়ন্ত্রণ (Control)** : নিয়ন্ত্রণ হইল প্রকৃত কর্মসম্পাদনের পরিমাপ করিয়া নির্ধারিত মানের সহিত উহার তুলনা করা এবং 'তারতম্য' (Variance) ঘটিলে উহার সংশোধনমূলক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নিয়ন্ত্রণের কাজে সুবিধা হয় এমনভাবে সংগঠনের বিভাগীয় কাঠামো স্থির করিতে হইবে।

(৩) **সংযোজনা (Co-ordination)** : কারবারের প্রত্যেকটি অংশ উহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণে নিযুক্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সুসম সংযোজনা না থাকিলে লক্ষ্য পূরণ হয় না। কাজকে শ্রেণীভুক্ত করিবার সময় সংগঠনের কাঠামোকে সংযোজনা ও দলীয় কর্মের সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সমগোত্রীয় কাজগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল কাজগুলিকে ক্রমানুগভাবে সাজাইতে হইবে।

(৪) **গুরুত্বপূর্ণ কাজে পর্যাপ্ত মনোযোগ (Adequate Attention to Important Work)** : সংগঠনের কাঠামো তৈয়ারীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেওয়া। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি লইয়া পৃথক পৃথক বিভাগ গঠন করা উচিত।

(৫) **ব্যয় (Cost)** : বিভাগীয়করণের সময় ব্যয় উপাদান বিশেষভাবে বিবেচ্য। ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভাগীয়করণ ব্যয়-বহুল হয়। সুতরাং বিভাগীয়করণ শুধু বৃহৎ ও মাঝারী আয়তনের কারবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৬) **মানবিক উপাদান (Human Consideration)** : যোগ্য ব্যক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনিয়মমাফিক দলের অস্তিত্ব, কর্মচারীর আচরণ ও মনোভাব কাজের শ্রেণীভুক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

বিভাগীয়করণের ভিত্তি (Bases of Departmentalisation) :

বিভাগীয়করণের বিভিন্ন ভিত্তি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) **কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ (Functional Departmentalisation)** : প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীকে ভিত্তি করিয়া যখন বিভাগ গঠন করা হয়, তখন তাহাকে কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ বলে। প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হইল, উৎপাদন, বিপণন, অর্থ, কর্মী, হিসাব, ক্রয় ইত্যাদি। উৎপাদন ও বিক্রয় উৎপাদন

প্রতিষ্ঠানের রৈখিক কাজ এবং অন্যান্য কাজগুলি কর্মী-সম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উৎপাদন, বিপণন ও অর্থ বিভাগ দেখা যায়।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) ইহাতে কার্যভিত্তিক বিশেষায়ণের সুবিধা পাওয়া যায় ;

(২) ইহাতে মনুষ্যশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করা যায় ;

(৩) ইহাতে আন্তর্বিভাগীয় সংযোজনার কাজ সুবিধাজনক হয়,

(৪) ইহা ক্রিয়াগত সুবিধা আনয়ন করে,

(৫) ইহা মূল কার্যাবলীর উন্নত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে সাহায্য করে ;

(৬) একক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা কার্যকলাপের শ্রেণীভুক্তকরণের কাজকে সহজ করে।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

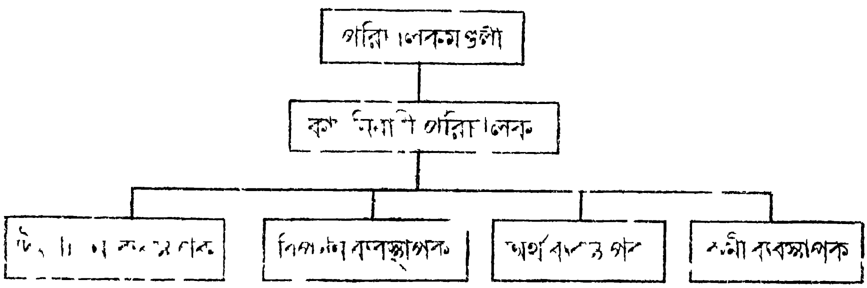
(১) ইহাতে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা যায়,

(২) ইহাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়,

(৩) ইহাতে আন্তর্বিভাগীয় সংযোজনা দুর্বল হয়,

(৪) এই প্রকার বিভাগীয়করণে নিয়ন্ত্রণ তেমন কার্যকরী হয় না,

(৫) উৎপাদন বিচিত্রকরণের (Deversification) ক্ষেত্রে ইহা তেমন ফলপ্রদ নহে,



কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণের রেখাচিত্র

(৬) কার্যভিত্তিক বিভাগগুলিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন ও মুনাফা অর্জনের পরিমাপ করা অসুবিধাজনক,

(৭) ইহাতে বিভাগীয় কর্মিগণের মধ্যে 'সুড়ঙ্গপথ দর্শন' (Tunnel Vision) অর্থাৎ সংকীর্ণ মনোভাব গড়িয়া উঠে। ইহা সংগঠনের শক্তি ও উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

(খ) উৎপাদন-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ (**Departmentalisation by Product**) ঃ

যখন উৎপাদনকে ভিত্তি করিয়া কার্যকলাপের শ্রেণীভুক্তকরণ করা হয় এবং এই শ্রেণীগুলিকে লইয়া বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, তখন তাহাকে উৎপাদন-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ

বলে। যখন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য থাকে তখন উৎপাদন-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ প্রযোজ্য। দ্রব্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর দ্রব্য-বিভাগ গঠন করা যাইতে পারে।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহা কারিগরি দক্ষতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং মূলধনের উপযুক্ত ব্যবহারে বিশেষায়ণ আনিতে পারে ;

(২) ইহা কার্যকরণে (Operation) ফলপ্রদ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে ,

(৩) ইহাতে সংগঠনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভব হয় ;

(৪) প্রত্যেকটি দ্রব্য-বিভাগের দায়িত্ব পালন ও মুনাফা অর্জনের মূল্যায়ন করা যায় ;

(৫) এইরূপ বিভাগীয়করণে লাভজনক ও অলাভজনক দ্রব্যের পৃথকীকরণ করা যায় ,

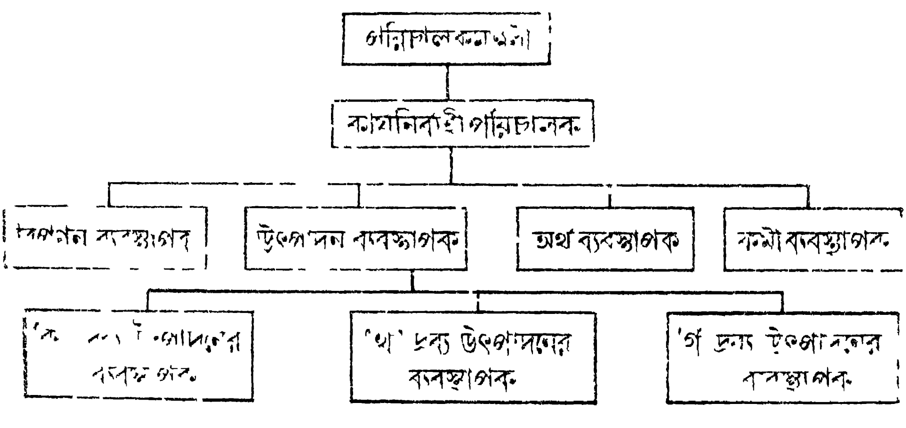
(৬) ইহাতে সংগঠনের দীর্ঘকালীন উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

(৭) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ ক্রিয়াগত কার্যকলাপের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অর্থসংস্থান, পরিকল্পনা এবং দ্রব্যের গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে অধিকতর দৃষ্টি দিতে পারেন ,

(৮) ইহাতে সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) ইহাতে ব্যবস্থাপনার ব্যয় বৃদ্ধি পায় ,



উৎপাদন-ভিত্তিক বিভাগীয়করণের রেখাচিত্র

(২) ইহা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যয়-বাহুল্যের অসুবিধার কারণে প্রযোজ্য নহে ;

(৩) পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব অর্পণের অভাব থাকিলে ইহা কার্যকরী হয় না।

(গ) খরিদ্দার-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ (**Departmentalisation by Customers**) ঃ যখন কার্যকলাপের শ্রেণীভুক্তকরণ খরিদ্দারের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয় এবং এই সকল শ্রেণীগুলি লইয়া বিভাগ গঠন করা হয়, তখন তাহাকে খরিদ্দার-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ বলে।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) বাজারের কার্যাবলীর উপ-বিভাজনে এবং খরিদ্দারের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপযোগী ;

(২) ইহা ক্রেতার শ্রেণীবিভাগকরণে বিশেষ উপযোগী পদ্ধতি ,

(৩) ইহা খরিদ্দারগণের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় ,

(৪) ইহাতে বাজার গবেষণার কাজ সহজ হয়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) বিক্রয় ও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সংযোজনার কাজ অসুবিধাজনক হইতে পারে ,

(২) বিক্রয় সংকোচনে বিশেষজ্ঞ বিক্রয় কর্মিগণ অলস থাকে ;

(৩) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর (Rivalry) মনোভাব জাগিয়া উঠে।

(ঘ) ভৌগোলিক ভিত্তিতে বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ (**Geographical or Territorial Departmentalisation**) ঃ যখন আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ করা হয় তখন তাহাকে ভৌগোলিক বিভাগীয়করণ বলে। যখন উৎপাদন ও বাজার ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত, তখন এই প্রকার বিভাগীয়করণ প্রযোজ্য। ভারতীয় রেল এই প্রকার বিভাগীয়করণের দৃষ্টান্ত। ইহাতে অবস্থানের ভিত্তিতে স্বনির্ভর বিভাগ গঠন করা হয়।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ

(১) বাজারের নিকটস্থ থাকায় এবং স্থানীয় অবস্থার সহিত পরিচিত থাকায়, এই প্রকার বিভাগীয়করণ স্থানীয় খরিদ্দারগণের প্রয়োজন মিটাইতে পারে ,

(২) ইহাতে পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পায় ;

(৩) ইহাতে কার্যকরণগুলির (Operations) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় ,

(৪) ইহা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সাহায্য করে, কারণ শাখা অফিসগুলি ব্যবস্থাপক কর্তৃক গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ;

(৫) শ্রমিক বিক্ষোভকে এই প্রকার বিভাগীয়করণে কেন্দ্রীভূত রাখা যায়।

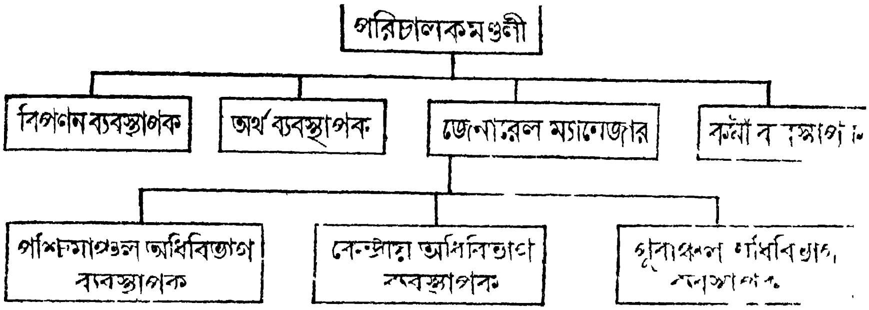
অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ

(১) ইহাতে বিশেষজ্ঞ কর্মীর অধিক প্রয়োজন হয় ;

(২) যে ক্ষেত্রে বাজারের পরিধি বিস্তৃত অর্থাৎ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য ,

(৩) ইহাতে সংযোজনার অভাব হইতে পারে ;

(৪) ইহাতে সংগঠনের জটিলতা বৃদ্ধি পায়।



অঞ্চল-ভিত্তিক বিভাগীয়করণের রেখাচিত্র

(৬) **প্রক্রিয়া-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ (Process Departmentalisation) :** উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করিয়া যে বিভাগীয়করণ করা হয় তাহাকে প্রক্রিয়া-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ বলে। যে সকল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ প্রযোজ্য। যেমন—বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্র।

সুবিধা (Advantages) :

(১) ইহাতে ব্যয় হ্রাস করা যায় ,

(২) ইহা বিশেষীকরণ ও দক্ষতা আনে ,

(৩) ইহাতে কার্যকরণ পদ্ধতির প্রবাহ (Operational Flow) অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) ইহা ব্যয়-বহুল ;

(২) ইহা কেবলমাত্র বহুল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ভিত্তিতেও বিভাগীয়করণ করা যায় :

(ক) কর্মীসংখ্যা অথবা সময়ের ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ (Departmentalisation by Numbers of Employees or by Time) : কিছু-সংখ্যক কর্মী যাহারা এক শ্রেণীর কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত তাহাদের লইয়া বিভাগ গঠন করা যাইতে পারে। এই কর্মিদল তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের নিকট কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে। অনুরূপভাবে সময়ের ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ করা যায়; যেমন, কারখানার কাজের পালার (Shift) ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ।

(খ) কমিটির ভিত্তিতে বিভাগীয়করণ (Departmentalisation by Committees) : যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসম্পাদনের জন্য কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটিগুলিকে বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাগত ও

গবেষণারত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। যেমন, পরীক্ষা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, পত্রিকা ও প্রকাশন বিভাগ ইত্যাদি।

(গ) সংমিশ্রণ-ভিত্তিক বিভাগীয়করণ (Matrix Departmentation) : যখন নির্ধারিত কর্ম (Task) ও কার্যাবলীর (Functions) সংমিশ্রণে অথবা উৎপাদন ও কার্যাবলীর সংমিশ্রণে বিভাগীয়করণ করা হয় তখন তাহাকে মেট্রিক্স বা গ্রিড (Grid) বিভাগীয়করণ বলে।

নির্দেশদান (Direction) :

নির্দেশদান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আদেশদান ও নির্দেশদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। আদেশদান হইল হুকুমনামা জারি করা। আদেশদানের মাধ্যমে কার্যারম্ভ হয়। নির্দেশদান বলিতে বুঝায় কর্মীরা কিভাবে কাজে অগ্রসর হইবে তাহার নির্দেশ প্রদান করা। ইহা কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাহায্য করে। আদেশদান নেতৃত্বের কাজ, কিন্তু নির্দেশদান ব্যবস্থাপনার কাজ। যেহেতু নির্দেশদানের সহযোগী হিসাবে আদেশদানেরও প্রয়োজন হয় সেই কারণে হেনরি ফেওল আদেশদান বলিতে নির্দেশদানকে বুঝাইয়াছেন।

সংজ্ঞা (Definition) :

মার্শাল ই. ডিমক (Marshall E. Dimock)-এর মতে, "নির্দেশদান হইল কার্যপ্রণালী স্থির করা এবং গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করা।"

আরনেস্ট ডেল (Ernest Dale)-এর মতে, "নির্দেশদান বলিতে বুঝায় কর্মীদের কি করিতে হইবে তাহা জানান এবং তাহারা যাহাতে উহা সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে তাহার তদারকি করা।"

কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O'Donnell)-এর মতে, "নির্দেশদান হইল ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের দিক, যাহার দ্বারা অধস্তন কর্মচারিগণ কার্যপ্রণালী অনুধাবন করিয়া দক্ষতার সহিত কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে।"

থিও হেম্যান (Theo Haimann)-এর মতে, "নির্দেশদান হইল পরিকল্পনামাফিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদানের কর্মপ্রণালী ও প্রয়োগ কৌশল।"

এল. এফ. আরউইক এবং ব্রেক (L. F. Urwick and Brech) নির্দেশদান বলিতে পথপ্রদর্শন, অনুপ্রেরণাদান ও নেতৃত্ব প্রদানকে বুঝাইয়াছেন।

সাধারণভাবে নির্দেশদান বলিতে আদেশ ও নির্দেশ প্রদানকে বুঝায়। কিন্তু নির্দেশদান প্রক্রিয়ায় আরও দুইটি বিষয় যুক্ত থাকে। যেমন—

(১) নির্দেশের ব্যাখ্যা করিয়া অধস্তন কর্মীদের পথ নির্দেশ করা, এবং

(২) গতিশীল নেতৃত্ব দান করা।

নির্দেশদানের গুরুত্ব (Importance of Direction) :

নির্দেশদান হইল ব্যবস্থাপনার অন্যতম জটিল কাজ। ব্যবস্থাপনায় ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। নির্দেশদানের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **মার্শাল ডিমক**-এর মতে, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র (Heart) হইল নির্দেশদান।

(২) ব্যবস্থাপনার কাজ সক্রিয় হইয়া উঠে নির্দেশদানের সঙ্গে সঙ্গে। ইহা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর প্রাথমিক পর্ব এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ।

(৩) নির্দেশদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক কর্মীদের দ্বারা কার্যসম্পাদন করাইয়া লন। ইহা ব্যবস্থাপকের দক্ষতা নিরূপক।

(৪) নির্দেশদান পথনির্দেশক (Guide) হিসাবে কাজ করে এবং নেতৃত্ব প্রদানে সাহায্য করে।

(৫) **থিও হেম্যান**-এর মতে, নির্দেশদান একটি প্রয়োগ কৌশল। ইহা রণক্ষেত্রের কৌশলের মত বিশেষ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্মে সাফল্য আনে।

(৬) নির্দেশদানে কর্মীদের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) নির্দেশদানের মধ্যে আদেশদান যুক্ত থাকে বলিয়া ইহা কর্মক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সাহায্য করে, কর্মীদের কার্যসম্পাদনে বাধ্য করে এবং তাহাদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করে।

(৮) নির্দেশদান কর্মীদের প্রয়োজন (Needs), অনুভূতি, বিশ্বাস, আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অনুধাবন করে এবং কর্মে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহযোগিতা আদায় করে।

(৯) ইহার মাধ্যমে জ্ঞাতকরণের (Communication) কাজ সহজ হয়।

(১০) পরিকল্পনামাফিক কার্যসম্পাদন হইতেছে কিনা তাহা তদারকী করিবার জন্য নির্দেশদানের প্রয়োজন।

(১১) পরিকল্পনামাফিক কাজ সম্পাদন করিবার জন্য এবং সংগঠনকে প্রগতিশীল করিতে নির্দেশদান অপরিহার্য কাজ।

(১২) **কুন্‌জ** এবং **ও'ডোনেল**-এর মতে, নির্দেশদান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মিগণের মধ্যে কারবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উদ্দেশ্য ও নীতির মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

(১৩) **মেলভিন্ কোপল্যাণ্ড** (Melvin Copland)-এর মতে, নির্দেশদান কাজের গতি বৃদ্ধি করে এবং কর্মীকে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যসম্পাদনে বাধ্য করে।

(১৪) নির্দেশদানের গুরুত্ব অনেকটা ট্রেনের গার্ড এবং খেলার মাঠের রেফারীর মত। গার্ড বাঁশী বাজাইলে ও সবুজ নিশান দেখাইলে যেমন ট্রেন চলিতে আরম্ভ করে এবং রেফারী বাঁশী বাজাইলে যেমন খেলা আরম্ভ হয় তেমনি ব্যবস্থাপক নির্দেশদান করিলে তবেই ব্যবস্থাপনার কার্য আরম্ভ হয়।

নির্দেশদানের প্রকৃতি (Nature of Direction) ঃ

নির্দেশদানের প্রকৃতিকে তিনভাগে আলোচনা করা যায় :

(১) ইহা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। পরিকল্পনা ও সংগঠনের কার্যকে রূপায়িত করিবার জন্য কর্মীর প্রয়োজন এবং কর্মীকে কর্মপ্রণালী জানাইয়া কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশদানের প্রয়োজন।

(২) নির্দেশদান ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত (Pervasive)। ইহা ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তর, স্থান এবং কাজে প্রয়োজন।

(৩) নির্দেশদান ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক কাজ। ব্যবস্থাপককে সকল সময় কর্মচারীদের নির্দেশ দান, পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিতে হয়।

নির্দেশদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Direction) ঃ

নির্দেশদানের বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) ইহা ক্রমপর্যায় কর্তৃত্ব-শৃঙ্খল (Scalar Chain) অনুসরণ করে। নির্দেশদান নিম্নগামী হয়। ইহা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে অধস্তন কর্মচারিগণের উপর বর্তায়।

(২) নির্দেশদান অর্থে শুধু আদেশদান বুঝায় না—ইহাতে তত্ত্বাবধান করা ও প্রকৃত কর্মসম্পাদনের পদক্ষেপকেও বুঝায়।

(৩) নির্দেশনা বন্ধু, দার্শনিক ও পথনির্দেশকের মত কাজ করে। সুতরাং ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কর্মীদের নিকট আদেশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাইয়া ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করিয়া কর্মিগণকে কর্মপ্রণালীর পথনির্দেশ করিতে হইবে। কখনও কখনও ব্যবস্থাপক নিজে কাজ করিয়া দেখাইবেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন।

(৪) নির্দেশদানকে সংযোগের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তি-স্বার্থের ও ব্যষ্টি-স্বার্থের (Group Interest) বিবাদ দূর করা সম্ভব হইবে।

(৫) নির্দেশদান ব্যবস্থাপনার একটি ধারাবাহিক কাজ। একবার নির্দেশ দান করিলেই নির্দেশদানের কাজ শেষ হয় না।

নির্দেশদানের নীতিসমূহ (Principles of Direction) ঃ

নির্দেশদানকে কার্যকরী করিতে হইলে একদিকে ব্যক্তিগত, দলীয় ও কারবারের উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় এবং অন্যদিকে নির্দেশদানের নীতিসমূহ মানিতে হইবে। **হেনরি ফেওল** (Henri Fayol) **ও মেরী পারকার ফোলেট** (Mary Parkar Follat)-এর অনুসরণে নির্দেশদানের নীতিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **উদ্দেশ্যের সমন্বয় নীতি (Principle of Integration of Objectives)** ঃ ব্যক্তি-স্বার্থ, দলীয়-স্বার্থ এবং কারবারের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। কর্মচারিগণকে বুঝাইতে হইবে যে, কারবারের উন্নতিতে তাহাদের ব্যক্তি-স্বার্থের উন্নতি হইবে। নির্দেশককে কারবারের প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে একত্ববোধ (Solidarity) সৃষ্টি করিতে হইবে।

(২) **প্রত্যক্ষ ব্যক্তি-সম্পর্কের নীতি (Principle of Direct Personal Touch) ঃ** উর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষ যখন অধস্তন কর্মীদের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন তিনি তাহাদের আচরণের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

(৩) **আদেশের একতার নীতি (Principle of Unity of Command) ঃ** অধস্তন কর্মী একজন মাত্র উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের নিকট তাহার কাজের জন্য দায়ী থাকিবে। অন্যথায় একাধিক ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মানিতে হইলে ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

(৪) **গণতান্ত্রিক ও পরামর্শভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির নীতি (Principle of Democratic and Consultative Approach) ঃ** সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যবস্থাপককে তাঁহার অধীনস্ত কর্মচারিগণের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। কর্মচারিগণের অসুবিধা ও সমস্যা দূরীকরণে ব্যবস্থাপককে সযত্ন প্রচেষ্টা লইতে হইবে।

(৫) **অনুসরণের বা অনুবর্তনের নীতি (Principle of Follow-through) ঃ** নির্দেশদানের অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থাপককে কর্মীর কাজের খোঁজ-খবর লইতে হইবে। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) **ক্রমপর্যায় কর্তৃত্ব শৃঙ্খলের নীতি (Principle of Scalar Chain) ঃ** নির্দেশদান নিম্নগামী হইবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার অধস্তন কর্মীকে নির্দেশ দান করিবেন এবং অধস্তন কর্মী তাহার উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের নিকট কাজের কৈফিয়ত দিবে এবং অসুবিধা ও সমস্যার বিষয় জানাইবে।

(৭) **ভারসাম্য নীতি (Principle of Balance) ঃ** বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উপবিভাগ ও বিভাগীয় কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন।

(৮) **সার্বিক স্বার্থের নীতি (Principle of Overall Interest) ঃ** কারবারের স্বার্থ ও ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ সর্বদা ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থান করিবে।

(৯) **নিরপেক্ষতার নীতি (Principle of Neutrality) ঃ** নির্দেশককে নিরপেক্ষ হইতে হইবে। কর্মবিভাজনে ন্যায় ও সমতার নীতি গ্রহণ করিলে কর্মীদের মধ্যে দলগত মনোভাব (Team Spirit) বজায় থাকে।

(১০) **বোধগম্যতা বা মর্মগ্রহণের নীতি (Principle of Comprehension) ঃ** আদেশ ও নির্দেশ যেন কর্মচারিগণের বোধগম্য হয়।

উপরোক্ত নীতিগুলি ছাড়া **হেনরি ফেওল** (Henri Fayol) নির্দেশদানের নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণের সুপারিশ করিয়াছেন :

(ক) ব্যবস্থাপক কর্মীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থাকিবেন ;

(খ) অযোগ্য কর্মীদের বরখাস্ত করিতে হইবে ;

(গ) কারবার ও কর্মীর মধ্যে চুক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ;

(ঘ) ব্যবস্থাপক নিজে কাজ করিয়া উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন ;

(ঙ) মাঝে মাঝে ব্যবস্থাপনার নিরীক্ষা (Management Audit) করা ;

(চ) বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের নির্দেশদানের একত্ব (Oneness) সভা আহ্বান করা ;

(ছ) বিশদ বিবরণে (Too much detail) বেশী মনঃসংযোগ না করা;

(জ) কর্মিগণকে একতা, অনুপ্রেরণা, কার্যসম্পাদনের প্রচেষ্টা ও আনুগত্যের শিক্ষা দেওয়া।

মেরী পারকার ফোলেট (Mary Parkar Follat) নির্দেশদানের নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা বলিয়াছেন :

(ক) অনুকূল কর্ম-মনোভাব গঠনের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা ;

(খ) আদেশের উৎস ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের মধ্যে যথাসম্ভব দূরত্ব হ্রাস করা ;

(গ) নির্দেশদানের প্রতি অনিচ্ছাকৃত আনুগত্য এবং বিরোধের মনোভাবের সহিত মিলিতকরণ ,

(ঘ) অব্যক্তিগতভাবে (Impersonal) আদেশ দান করা।

নেতৃত্ব (Leadership) :

সংজ্ঞা (Definition) : নেতৃত্ব হইতেছে কর্মী ও তাহার উর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

জর্জ টেরি (**George Terry**)-র মতে, "নেতৃত্ব হইতেছে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার কাজ, যাহার ফলে পরস্পরের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্বেচ্ছাকৃত কর্মপ্রচেষ্টা সৃষ্টি হয়।"

পিটার ড্রাকার (**Peter Drucker**)-এর মতে, "নেতৃত্ব হইতেছে মানুষের কল্পনাকে উঁচু করা, কাজের মান উন্নত করা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বকে সাধারণ সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে স্থাপন করা।"

চেস্টার আই. বার্নার্ড (**Chester I. Barnard**)-এর মতে, "নেতৃত্ব হইল মানুষের আচরণের গুণ যাহার দ্বারা সে অপরকে অথবা অপরের কার্যাবলীকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত করে।"

কুন্জ এবং ও'ডোনেল (**Koontz and O'Donnell**)-এর মতে, "নেতৃত্ব হইল উত্তম যোগাযোগের মাধ্যমে লক্ষ্যপূরণের জন্য আন্তঃ-ব্যক্তিক প্রভাব বলবৎ করিবার ক্ষমতা।"

নেতা কর্মীকে পথ দেখান। তিনি কর্মীকে পিছন হইতে ধাক্কা দেন না, সম্মুখে থাকিয়া কর্মীদের টানেন (A leader is a puller and not a pusher)। **অর্ডওয়ে টীড** (Ordway Tead) **এবং চেস্টার আই. বার্নার্ড** (Chester I. Barnard) একজন **নেতার নিম্নলিখিত গুণ** (**Traits**) **থাকা প্রয়োজন** বলিয়া মনে করেন : (১) শারীরিক ও স্নায়বিক শক্তি, (২) উদ্দেশ্য ও নির্দেশদানের চেতনা, (৩) উৎসাহ-উদ্দীপনা, (৪) বন্ধুত্ব ও স্নেহ, (৫) সততা, (৬) কারিগরি জ্ঞানের পরিপক্বতা

(Technical Mastery), (৭) সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, (৮) বুদ্ধিমত্তা, (৯) শিক্ষাদানের দক্ষতা, (১০) পারস্পরিক বিশ্বাস, (১১) জ্ঞান, (১২) বিচার ক্ষমতা, (১৩) আকর্ষণ শক্তি, (১৪) জনপ্রিয়তা, (১৫) অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা, (১৬) ধৈর্য, (১৭) সাহস, (১৮) পরিপক্বতা (Maturity) ইত্যাদি।

নেতৃত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Leadership)ঃ

নেতৃত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) **নেতার অনুগামী থাকিবে (Existence of Followers)**ঃ প্রত্যেক নেতার কিছু অনুগামী থাকিবে। তিনি অনুগামীদের উপর কর্তৃত্ব করিবেন।

(২) **নেতা অধস্তন কর্মীদের অনুভূতি ও সমস্যা বুঝিবেন (Understanding of Feelings and Problems of Subordinates)**ঃ নেতাকে অধস্তন কর্মীদের মনোভাব, প্রবণতা ও সমস্যা সহানুভূতির সহিত বুঝিতে হইবে।

(৩) **দায়িত্ব গ্রহণ (Assumption of Responsibility)**ঃ অনুগামী কর্মীদের কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেতাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) **নিরপেক্ষ সম্পর্ক (Objectivity in Relations)**ঃ নেতার আচরণ পক্ষপাতশূন্য ও ব্যষ্টিমুখী হইতে হইবে।

(৫) **স্ব-সচেতনতা (Self-Awarness)**ঃ নেতাকে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে এবং কারিগরি ও অন্যান্য গুণ অর্জন করিতে হইবে।

(৬) **আদর্শ আচরণ (Exemplary Conduct)**ঃ দলের সম্মুখে বা পুরোভাগে থাকিয়া নেতা তাঁহার অনুগামীদের নির্দেশ দিবেন এবং উপযুক্ত আচরণের মাধ্যমে অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করিবেন।

(৭) **নির্দিষ্ট অবস্থা (Specific Situation)**ঃ নেতৃত্বকে দলীয় মনোভাব এবং পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে হইবে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব (Importance of Leadership)ঃ

নেতৃত্ব কর্মীদের মনে সজীব কর্মস্ফুলিঙ্গ (Vital Spark) প্রজ্জ্বলিত করে। কর্মী দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ দেয়। ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহার গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **ক্রিয়াশক্তি (Motive Power)**ঃ নেতৃত্ব দলীয় প্রচেষ্টায় একত্বের (Oneness) মনোভাব আনে এবং দলীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(২) **সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)**ঃ উপযুক্ত নেতৃত্ব সকল স্তরের কর্মীদের সামাজিক প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি, উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সমন্বিত করে।

(৩) **উচ্চমানের কার্যসম্পাদন (High Performance) ঃ** নেতৃত্ব কর্মীদের মনে উচ্চমানের কার্যসম্পাদনের প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে।

(৪) **উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি (Creation of Enthusiasm) ঃ** নেতৃত্ব কর্মীদের মনে কার্যসম্পাদনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

(৫) **সহযোগিতা (Co-operation) ঃ** নেতৃত্ব কর্মীদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের সমস্যার সমাধান এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সহানুভূতির সহিত পূরণের চেষ্টা করে বলিয়া নেতৃত্ব কর্মীদের আস্থাভাজন হয় ও সহযোগিতা লাভ করে।

(৬) **সমন্বয় (Integration) ঃ** ইহা নিয়মমাফিক (Formal) এবং অনিয়মমাফিক (Informal) নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

(৭) **কারবারের অগ্রগতি (Advancement of Business) ঃ** গতিশীল নেতৃত্ব (Dynamic Leadership) কারবারের সুস্থ অগ্রগতির সহায়ক।

(৮) **প্রশাসনিক উন্নয়ন (Administrative Betterment) ঃ** প্রশাসনকে দক্ষ ও উন্নত করিতে হইলে দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন।

(৯) **সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision-making) ঃ** দক্ষ নেতৃত্ব দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

(১০) **সংগঠনের প্রাণ (Life of Organisation) ঃ** উপযুক্ত নেতৃত্ব সংগঠনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে মানবিক সংগঠনে পরিণত করে।

(১১) **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in Skill) ঃ** নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

(১২) **কর্তৃত্বের উপযুক্ত ব্যবহার (Proper Utilisation of Authority) ঃ** নেতৃত্ব ব্যবস্থাপকগণকে তাহাদের কর্তৃত্বের উপযুক্ত ব্যবহারে সাহায্য করে।

(১৩) **অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation) ঃ** গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণকে কর্মে অনুপ্রাণিত করেন।

নেতৃত্বের ধরন বা ভঙ্গি (Leadership Styles) ঃ

নেতা অন্যের আচরণের উপর তাঁহার প্রভাব ও ক্ষমতা খাটাইবার জন্য নিজে যে আচরণ করেন সেই আচরণপদ্ধতিকে নেতৃত্বের স্টাইল বা ধরন বা ভঙ্গি বলে। নেতৃত্বের ধরন প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের। এই ধরনগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) **উদার বা অবাধ নেতৃত্ব (Laissez Faire Style) ঃ** এইপ্রকার নেতৃত্বে নেতা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণকে মুক্ত মনে কাজ করিতে দেন। তিনি অধস্তন কর্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। ইহাতে কর্মিগণ কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। নেতা সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব কর্মীদের উপর ছাড়িয়া দেন। ইহা চরম উদার নেতৃত্বের ধরন! নেতা কর্মীদের কাজে উৎসাহও দেন না, আবার নির্দেশও দেন না। ইহাতে নেতা পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এইপ্রকার নেতৃত্বে কর্মিগণ কর্মসম্পাদনে আগ্রহী হয় এবং স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু এইপ্রকার নেতৃত্ব দলীয় মনোভাব, সন্তুষ্টি ও একতা আনয়নে ব্যর্থ হয়।

(২) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব (**Bureaucratic Leadership Style**) : ইহা সাধারণতঃ সরকারী বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় দেখা যায়। এইপ্রকার নেতৃত্ব অব্যক্তিক এবং নিয়ম-সিদ্ধ। ইহাতে সবকিছু নিয়মমাফিক পদ্ধতি, প্রণালী ও রীতি-নীতি অনুসারে চলে। কার্যসম্পাদন অপেক্ষা কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাতে নেতা যান্ত্রিকভাবে নিয়ম-কানুন মানিয়া কাজ করিতে নির্দেশ দেন। এইপ্রকার নেতৃত্বে কর্মীদের উৎসাহ, উদ্ভাবনী শক্তি এবং গতিশীলতা নষ্ট হয়।

(৩) স্নায়ুতান্ত্রিক নেতৃত্ব (**Neurocratic Leadership Style**) : এই প্রকার নেতৃত্বে নেতা অধীনস্ত কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া কাজ করাইয়া লন। তিনি কর্মীদের ঘনিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধান (Supervision) করেন এবং তাঁহার মধ্যে যে কোন প্রকারে বড় হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে।

(৪) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব (**Autocratic Leadership Style**) : এই প্রকার নেতৃত্বে নেতা মনে করেন যে, তিনি তাঁহার পদাধিকারবলে অধীনস্ত কর্মচারিগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন। তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অধস্তন কর্মীদের উহা রূপায়ণে বাধ্য করেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধস্তন কর্মীদের মতামত গ্রহণ করেন না। ইহা ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান, নির্দিষ্ট নির্দেশ ও আদেশদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভীতিপ্রদর্শন করিয়া কাজ আদায় করেন। ইহাতে জ্ঞাতকরণ (Communication) নিম্নমুখী হয়।

সুবিধা (**Advantages**) : এই প্রকার নেতৃত্বের সুবিধাগুলি হইল :

(ক) এই প্রকার নেতৃত্বে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়,
(খ) ইহাতে নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়,
(গ) ইহাতে নির্দেশদানে একতা বজায় রাখা যায়,
(ঘ) ইহা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে;
(ঙ) ইহাতে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ কর্মীদের দিয়া কার্য সম্পাদন করা সহজ হয়;
(চ) ইহা পরিকল্পনামাফিক কার্য সম্পাদনে ফলপ্রদ।

অসুবিধা (**Disadvantages**) : এই প্রকার নেতৃত্বের অসুবিধাগুলি হইল :

(ক) ইহাতে অধস্তন কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা হয় না;
(খ) ইহাতে ভারার্পণের (Delegation) নীতি অগ্রাহ্য করা হয়;
(গ) ইহা অধস্তন কর্মীদের কাজে অনুৎসাহী করে এবং তাহাদের উন্নতি ব্যাহত হয়;
(ঘ) এই প্রকার নেতৃত্বে পরিবর্তনকে সহজে আরোপ করা যায় না;
(ঙ) ইহাতে একনায়কতন্ত্রের মনোভাব গড়িয়া উঠে;

(চ) একক সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে পারে ;

(ছ) অধস্তন কর্মিগণ কর্মে অনুপ্রাণিত হয় না এবং তাহাদের সৃজনশীলতা (Creativity) বিকশিত হইতে পারে না।

(গ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (**Democratic Leadership Style**) : ইহাতে কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণ বিকেন্দ্রীভূত হয়। ইহা উদার নেতৃত্ব। নেতা অপরের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং অধস্তন কর্মীদের মতামত লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহা কর্মীদের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। ইহাতে দ্বি-মুখী জ্ঞাতকরণ (Two-way Communication) সম্ভব হয়।

সুবিধা (**Advantages**) : এই প্রকার নেতৃত্বের সুবিধাগুলি হইল :

(ক) ইহা স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে ;

(খ) ইহা সৃজনশীল নেতৃত্ব সৃষ্টি করে, কারণ ইহাতে অধস্তন কর্মীদের মতামত স্বীকৃত হয় ;

(গ) নূতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্য করে ,

(ঘ) ইহা কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং নির্দেশদানের কাজকে সহজ করে ;

(ঙ) ইহাতে কর্মীদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) : এই প্রকার নেতৃত্বের অসুবিধাগুলি হইল :

(ক) এই প্রকার নেতৃত্বে নির্দেশের নির্দিষ্টতার (Specifity) অভাব থাকে বলিয়া ইহা বহু ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয় না ;

(খ) সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা সম্ভব হয় না ;

(গ) ইহা সময়-সাপেক্ষ ;

(ঘ) দায়িত্বের নির্দিষ্টতা (Definiteness) না থাকায় ইহাতে দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার প্রবণতা দেখা যায়।

নিয়ম-শৃঙ্খলা (**Discipline**) :

সংজ্ঞা (**Definition**) : নিয়ম-শৃঙ্খলা বলিতে নিয়মানুবর্তিতাকে বুঝায়। আনুগত্য, আদেশ পালন, কর্তব্যপরায়ণতা এবং প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি মানিয়া কাজ করাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা বলে। নিয়ম-শৃঙ্খলা সুষ্ঠু কারবার পরিচালনার অপরিহার্য বিষয়। ইহাতে আদেশ পালন যথাযথ হয়। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে অথবা ব্যবস্থাপকগণ ইহা বলবৎ করিতে পারেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নেতৃত্বের কাজ। ঋণাত্মক নিয়মানুবর্তিতা (Negative Discipline) শাস্তিমূলক। যেমন, চাকুরী হইতে বরখাস্ত। কিন্তু বর্তমানে এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়। ব্যবস্থাপককে ধনাত্মক নিয়মানুবর্তিতা (Positive Discipline) প্রবর্তন করিতে হইবে। ধনাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের উপায়গুলি হইল : (১) সহানুভূতি প্রদর্শন, (২) ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন, (৩) কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, (৪) নিয়ম-কানুন

তৈয়ারী করা, (৫) প্রশাসনিক তালিকা (Chart) প্রস্তুত করা, (৫) প্রত্যেক কর্মীর কাজের গণ্ডী বাঁধিয়া দেওয়া, (৬) দায়িত্বের নির্দিষ্টতা স্থির করা, (৭) কর্মীর মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। ঋণাত্মক নিয়মানুবর্তিতা কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা আনিতে পারে। ঋণাত্মক নিয়মানুবর্তিতা শাস্তিমূলক। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি হইল : (১) ভর্ৎসনা, (২) পদাবনতি, (৩) পদোন্নতি রোধ, (৪) ছাঁটাই ইত্যাদি।

নিয়ম-শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ (Causes of Indiscipline) :

নিম্নলিখিত কারণে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইতে পারে :

(১) স্বজন-পোষণতা (Nepotism) ও কোন বিশেষ কর্মীকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা (Favouritism) ;

(২) কর্মীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা ;

(৩) কর্মীদের অসুবিধা, অভাব এবং অভিযোগের প্রতি উদাসীন থাকা ,

(৪) অন্যায়ভাবে কোনও কর্মীর পদোন্নতি করা অথবা কোনও কর্মীকে অন্যায়ভাবে বদলি করা ;

(৫) প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে বিলম্ব করা অথবা নিষ্ক্রিয় থাকা ,

(৬) কর্মীদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেওয়া ,

(৭) কর্মীদের মতামত গ্রাহ্য না করা ,

(৮) কর্মীর ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি অমনোযোগী থাকা ,

(৯) কর্মীদের ভর্ৎসনা করা ও অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা ,

(১০) নিয়ম-শৃঙ্খলার উপযুক্ত আচরণবিধির অভাব ,

(১১) অ-ব্যবস্থাপনা ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব।

নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থাসমূহ (Measures to Maintain Discipline) :

কর্মীদের নিয়ম-শৃঙ্খলার বশবর্তী করা নেতৃত্বের কাজ। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে হইবে :

(১) **নিয়ম শৃঙ্খলার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পালন করা (Compliance with the Requisites of Discipline) :** হেনরি ফেওল (Henri Fayol) নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি হইল :

(ক) ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে উত্তম অবেক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক (Supervisor) নিযুক্ত করিতে হইবে ,

(খ) ব্যবস্থাপকগণকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে হইবে ;

(গ) শাস্তি ও পুরস্কার ন্যায়সঙ্গত হইতে হইবে।

(২) দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ (**Prompt Action**) ঃ যদি কোন কর্মী আদেশ পালন না করে তবে তৎক্ষণাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে শাস্তি যেন ন্যায়সঙ্গত হয়।

(৩) অগ্রিম সতর্ক করা (**Forewarning**) ঃ কর্মিগণকে পূর্ব হইতে তাহাদের করণীয় ও অকরণীয় বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে। নূতন ধরনের অপরাধ সম্বন্ধে কর্মীকে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে।

(৪) সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ (**Consistent Behaviour**) ঃ ব্যবস্থাপক যখন কর্মীদের শাস্তি দিবেন তখন তাঁহার আচরণে সামঞ্জস্য ও ন্যায়পরায়ণতা থাকিতে হইবে। সকলের ক্ষেত্রেই যেন তাঁহার আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(৫) তথ্য জ্ঞাতকরণ (**Communication of Information**) ঃ আচরণবিধি ও নিয়ম-কানুন কর্মিগণকে পূর্ব হইতে জানাইতে হইবে যাহাতে তাহাদের মনে নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

(৬) সমঝোতা (**Consensus**) ঃ আচরণবিধি প্রস্তুত করিবার সময় কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(৭) ক্ষমা প্রদর্শন (**Condonation**) ঃ সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে কর্মীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সংশোধনের সুযোগ দান করা উচিত। ইহাতে কর্মীর মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।

(৮) মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি (**Human Relations Approach**) ঃ ব্যবস্থাপকগণকে কর্মচারিগণের অপরাধ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বিবেচনা করিতে হইবে।

(৯) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ (**Opportunity to Self-defence**) ঃ অভিযুক্ত কর্মীকে শাস্তিদানের পূর্বে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

(১০) নিয়ম-শৃঙ্খলা কমিটি (**Discipline Committee**) ঃ নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা উচিত। এই কমিটি নিয়ম-কানুন ও আচরণবিধি পর্যালোচনা করিবে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিচার করিয়া উপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করিবে।

(১১) শৃঙ্খলার নিয়ম গঠনে ঐক্য (**Agreements as to Disciplinary Rules**) ঃ কর্মীর আচরণকে চালনা করিবার নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শনকে নিয়ম (**Rule**) বলে। নিয়ম গঠনে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। নিয়ম হইল স্থির পরিকল্পনা (Standing Plan)। ইহা কর্মীর যথেচ্ছ আচরণে বাধা দেয়। যেমন, "কারখানার ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ"—ইহা একটি নিয়ম।

নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Discipline) :

নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব হইল :

(১) **অনুকূল পরিবেশ (Favourable Environment)** : ইহা অনুকূল কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কর্মীদের কর্মসম্পাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে সাহায্য করে।

(২) **আচরণবিধির প্রতিষ্ঠাকরণ (Establishment of Code of Conduct)** : নিয়ম-শৃঙ্খলা গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি প্রয়োগ করিয়া কর্মীদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। শৃঙ্খলাভঙ্গকারী কর্মীর জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ অন্যান্য কর্মীদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৩) **কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি (Promotion of Ability and Will-to-do)** : নিয়ম-শৃঙ্খলা কর্মীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে। ইহা কর্মচারিগণের মনে সন্তুষ্টি আনে।

অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation) :

সংজ্ঞা (Definition) : অনুপ্রাণিতকরণ একটি প্রক্রিয়া (Process), যাহার সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষ কর্মে অনিচ্ছুক কর্মচারীকে উৎসাহী কর্মচারীতে পরিণত করেন। কর্মিগণের মনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনুগত্য সৃষ্টি করাকে অনুপ্রাণিতকরণ বলে। অনুপ্রাণিতকরণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। অনুপ্রাণিতকরণ একটি জটিল শক্তি, যাহা কর্মীকে সহজাত প্রবৃত্তি লইয়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে কাজ করিবার আগ্রহ বা 'মোটিভ' (Motive) সৃষ্টি করে। প্রয়োজন, অভাব, প্রেরণা ও স্পন্দনের বহিঃপ্রকাশকে আগ্রহ বা 'মোটিভ' বলে।

ডালটন ম্যাকফারল্যাণ্ড (Dalton McFarland)-এর মতে, "অনুপ্রাণিতকরণ একটি উপায় যাহা উৎসাহ, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা অথবা প্রয়োজন বুঝিয়া মানুষের আচরণকে নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যা করে।"

অনুপ্রাণিতকরণ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কারণ ইহাতে কর্মীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। কর্মী অজৈব যান্ত্রিক পদার্থ (Inanimate Cogs) নহে। তাহার অনুভূতি, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা আছে। সে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিতে পারে, আবার বিরূপ হইতেও পারে। সুতরাং তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব (Importance of Motivation) :

ব্যবস্থাপনায় অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহা কর্মসম্পাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। অনুপ্রাণিতকরণের ফলে কর্মীর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে কর্মসম্পাদনের মাত্রাও বাড়িয়া যায়।

P (performance) = কার্যসম্পাদন ধরিলে,

a (ability) = কর্মক্ষমতা ধরিলে,

m (motivation) = অনুপ্রাণিতকরণ ধরিলে, এবং

f (functional relationship) = কার্যভিত্তিক সম্পর্ক ধরিলে—

কার্যসম্পাদন = f (কর্মদক্ষতা, অনুপ্রেরণা)

অথবা, $P = f\ (a, m)$ ।

(২) অনুপ্রাণিতকরণ কর্মীর অনীহা ও উদাসীনতা দূর করিয়া তাহাকে কর্মে আগ্রহী করে।

(৩) ইহা কর্মীর মানসিক ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া কাজের গতি বৃদ্ধি করে।

(৪) অনুপ্রাণিতকরণের ফলে শ্রমিক অশান্তি হ্রাস পায়।

(৫) অনুপ্রাণিতকরণ ভারাপর্ণের (Delegation) নীতিকে কার্যকরী করিতে সাহায্য করে।

(৬) অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কর্মীদের সহযোগিতা লাভ করা যায়। অনুপ্রাণিতকরণ পরিকল্পনাকে সফল করে, সাংগঠনিক কাঠামোকে সুষ্ঠু করে, নির্দেশদান ও সংযোজনাকে দৃঢ় করে এবং নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করে।

(৭) কর্মীকে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তাহার প্রয়োজন (Needs) মিটাইতে হয়। অনুপ্রাণিতকরণ কর্মীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করে।

(৮) অনুপ্রাণিতকরণ মানব-সম্পদের (Human Resource) পূর্ণ ব্যবহার করে।

(৯) অনুপ্রাণিতকরণে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(১০) ইহা নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে।

(১১) অনুপ্রাণিতকরণ প্রশিক্ষণের (Training) সুবিধা দান করে।

(১২) ইহা কর্মীদের পদোন্নতির সুবিধা দান করিয়া তাহাদের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করে।

(১৩) ইহাতে তত্ত্বাবধানের ব্যয় হ্রাস পায়।

অনুপ্রাণিতকরণের তত্ত্বসমূহ (Theories of Motivation) :

অনুপ্রাণিতকরণে প্রধানতঃ তিনপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনুপ্রাণিতকরণের তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি হইল :

(১) পুরস্কার-তিরস্কার দৃষ্টিভঙ্গি (Carrot and Stick Approach) : ইহা অনুপ্রাণিতকরণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি। গাধা আদেশ পালন করিয়া মাল বহন করিলে যাত্রাপথের শেষে তাহাকে গাজর দেওয়া হয়। কিন্তু আদেশপালনে বিচ্যুতি ঘটিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হয়। তেমনি কর্মী যদি ধনাত্মক আচরণ (Positive Behaviour) করে অর্থাৎ আদেশ ও নির্দেশ পালন করিয়া কর্মসম্পাদন করে, তবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হয়। কর্মীর ধনাত্মক আচরণে পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি, সম্মান, স্বীকৃতি ইত্যাদি পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়। এইরূপভাবে অনুপ্রাণিতকরণকে

ধনাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ (Positive Motivation) বলে। ধনাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ আর্থিক সুবিধা দানের মাধ্যমে করা হয়। অন্যদিকে, কর্মীর ঋণাত্মক আচরণকে (Negative Behaviour) তিরস্কার অর্থাৎ শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করিয়া তাহাকে কাজে অনুপ্রাণিত করা হয়। ইহা তিরস্কার, ভর্ৎসনা, পদাবনতি, বদলি, বেতনবৃদ্ধি রোধ, সাময়িকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে ছাঁটাই ইত্যাদির রূপ গ্রহণ করিতে পারে। বেত্রাঘাত অর্থাৎ শাস্তিমূলক বা তিরস্কারমূলক পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিতকরণ করাকে **ঋণাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ** (**Negative Motivation**) বলে। **রেনসিস লিকার্ট** (Rensis Likert) এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার শোষণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক (Exploitative-authoritarian) এবং দয়াশীল-স্বৈরতান্ত্রিক (Benevolent-authoritarian) নেতৃত্বের ধরন (Style) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অসার বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

(২) **অভিভাবকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি** (**Paternalistic Approach**)ঃ এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী অধস্তন কর্মীকে ঘনিষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই মতবাদে মনে করা হয় যে, মালিকই কর্মচারীর স্বার্থ ভাল বোঝেন।

(৩) **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি** (**Scientific Approach**)ঃ মানবিক আচরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ অনুপ্রাণিতকরণের যে তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছেন সেইগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হইল:

(ক) **মাসলো'র প্রয়োজন বা চাহিদা তত্ত্ব অর্থাৎ প্রয়োজন বা চাহিদার ক্রমোচ্চ শ্রেণীভুক্তি তত্ত্ব** (**Maslow's Theory of Human Needs or Need Hierarchy Theory**) **অথবা অনুপ্রাণিতকরণের ঘাটতি তত্ত্ব** (**Deficit Theory of Motivation**)ঃ সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য কাজের মাধ্যমে তাহার নানা প্রকার প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাইতে চায়। এই প্রয়োজনগুলির ক্রমোচ্চ শ্রেণীভুক্তি (Hierarchy) আছে। একটি প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হইলে, আর একটি প্রয়োজনের বঞ্চনা (Deprivation) অনুভূত হয়। যে প্রয়োজন বা অভাব মিটিয়া যায় উহা আর অনুপ্রাণিতকরণের শক্তি হিসাবে কাজ করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনস্তত্ত্ববিদ **আব্রাহাম মাসলো** (Abraham Maslow) কর্মীর প্রয়োজনগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন:

(১) দৈহিক প্রয়োজন (**Physiological Needs**)ঃ এই প্রয়োজনগুলি হইল খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ এবং বিশ্রাম। এইগুলি মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন (Basic Need) এবং ইহারা অন্যান্য প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার পায়।

(২) নিরাপত্তার প্রয়োজন (**Safety or Security Needs**)**:** দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে কর্মীর নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহা দুই প্রকারের:

(ক) **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা** (**Economic Security**)—যেমন, চাকুরির নিরাপত্তা, বিপদ, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ইত্যাদি। (খ) **মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা** (**Psychological Security**)—যেমন, পদমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার নিরাপত্তা।

(৩) **সামাজিক অথবা স্বীকৃতির প্রয়োজন** (**Social or Affiliation Needs**) ঃ নিরাপত্তার প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হইলে সামাজিক অথবা স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ সামাজিক স্বীকৃতি এবং অন্যের সাহচর্য, ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতি আশা করে।

(৪) **শ্রদ্ধা বা সম্মানের প্রয়োজন** (**Esteem Needs**) ঃ সামাজিক প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হইবার পর ব্যক্তিগত সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহাতে কর্মীর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, মর্যাদা, আত্মবিশ্বাসের পরিতৃপ্তি হয়। মর্যাদা ও সম্মান আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন (**Egoistic Needs**) পূরণ করে।

(৫) **আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন** (**Self-actualisation Needs**) ঃ শ্রদ্ধা ও আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হইলে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন জাগে অর্থাৎ কর্মীর মনে তাহার যোগ্যতার উপলব্ধি ঘটে এবং সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটাইয়া সে উন্নত হইতে চায়। ইহা কর্মীর স্বাধীন সত্তা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন।

মানুষের প্রয়োজনগুলি অনুক্রমিক (Sequential)। একটি প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হইলে কর্মীর মনে বঞ্চনা বোধ (Deprivation) জাগে এবং বঞ্চনা হইতে অভাব (Privation) সৃষ্টি হয়। অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ কাজে অনুপ্রাণিত হয়।

মাসলো'র তত্ত্বটি ব্যবস্থাপকগণকে কর্মী অনুপ্রাণিতকরণের উপাদানগুলি কি কি তাহা বুঝিতে সাহায্য করে। কিন্তু কর্মীর প্রয়োজনগুলি মাসলো'র ব্যাখ্যা অনুযায়ী সবক্ষেত্রে একই রকমভাবে অনুক্রমিক নাও হইতে পারে।

মাসলো'র প্রয়োজন বা চাহিদা ক্রমোচ্চ শ্রেণীভুক্তি তত্ত্বের রেখাচিত্র দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৪ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে।

(খ) **হার্জবার্গের অনুপ্রাণিতকরণের সংরক্ষণকারী তত্ত্ব** (**Herzberg's Motivation-Hygiene Theory**) **অথবা হার্জবার্গের দুই-উপাদান তত্ত্ব** (**Herzberg's Two-factor Theory**) ঃ

মার্কিন ব্যবস্থাপনা-বিশারদ হার্জবার্গ (Herzberg) তাঁহার অনুপ্রাণিতকরণের তত্ত্বে কর্মব্যবস্থায় অনুপ্রাণিতকরণের উপাদান ও সংরক্ষণকারী উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি কর্মী অনুপ্রাণিত করিবার উপাদানগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) সন্তোষবিধানকারী বা 'হ্যাঁ-ধর্মী' উপাদানসমূহ (Satisfiers) এবং (২) অসন্তোষবিধানকারী বা 'না-ধর্মী' উপাদানসমূহ (Dissatisfiers)। তাঁহার বর্ণিত

দ্বিতীয় উপাদানগুলি **সংরক্ষণকারী উপাদান** (**Hygiene or Maintenance Factors**)। এইগুলি অসন্তোষবিধানকারী উপাদান। এই উপাদানগুলি কেবল কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করে। সংরক্ষণকারী উপাদানগুলি হইল: (ক) কোম্পানীর নীতি ও প্রশাসন, (খ) কারিগরি তত্ত্বাবধান, (গ) তত্ত্বাবধানের সহিত আন্তঃ-ব্যক্তিক সম্পর্ক, (ঘ) সমকক্ষ কর্মীব সহিত আন্তঃ-ব্যক্তিক সম্পর্ক, (ঙ) অধস্তন কর্মীর সহিত আন্তঃ-ব্যক্তিক সম্পর্ক, (চ) বেতন, (ছ) চাকুরীর নিরাপত্তা, (জ) ব্যক্তিগত জীবন, (ঝ) কাজের পরিবেশ এবং (ঞ) পদমর্যাদা। এই সকল উপাদান বর্তমান থাকিলে কর্মীরা অসন্তোষ বোধ হইতে বিরত থাকে। কিন্তু এইগুলি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি নাও করিতে পারে। এইগুলিকে সংরক্ষণকারী উপাদান বলে, কারণ ইহারা কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক।

হার্জবার্গের মতে সন্তোষবিধানকারী উপাদানসমূহ কর্মীকে কাজে অনুপ্রাণিত করে। সন্তোষবিধানকারী বা 'হ্যাঁ-ধর্মী' উপাদানসমূহ **অনুপ্রাণিতকরণের উপাদান** (**Motivational Factors**)। এই 'হ্যাঁ-ধর্মী' উপাদানগুলি হইল: (ক) কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, (খ) স্বীকৃতি, (গ) অগ্রগতি, (ঘ) কাজের প্রকৃতি এবং (ঙ) দায়িত্ব। এই সকল উপাদান **কর্মসন্তুষ্টি** (Job Satisfication) আনে এবং কর্মীকে অনুপ্রাণিত করে। হার্জবার্গের মতে, বর্তমানের অনুপ্রাণিতকরণের উপাদানগুলি ভবিষ্যতের সংরক্ষণকারী উপাদান। কারণ পরিতৃপ্ত অনুপ্রেরণার উপাদানগুলি কর্মীর আচরণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না।

(গ) **ম্যাক্‌গ্রিগরের অংশগ্রহণ তত্ত্ব** (**McGregor's Participation Theory**) **:** মানুষের স্বভাব এবং কাজের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতকগুলি মৌলিক অনুমানেব উপর নির্ভর করে। **ডগলাস ম্যাক্‌গ্রিগর** (Douglas McGregor) এই সকল অনুমানকে 'এক্স-তত্ত্ব' ও 'ওয়াই-তত্ত্বে' শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

এক্স-তত্ত্ব (**Theory X**) **:** ইহা সনাতনী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মৌলিক অনুমানগুলি প্রচার করেন টেলর (Taylor), ব্রেক (Brech), ম্যুনী (Mooney) ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাবিদ্। এই তত্ত্ব অনুমান করে—

(১) অধিকাংশ কর্মীর নিকট কাজ অরুচিপূর্ণ ;

(২) ব্যবস্থাপকগণকে কাজের ঘনিষ্ঠ ও বিশদ তত্ত্ব বিধান করা উচিত ,

(৩) একজন কর্মীকে একটিমাত্র কাজের ভার দেওয়া উচিত। ইহাতে সে ঐ কাজে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে ;

(৪) অধিকাংশ কর্মী ঘনিষ্ঠভাবে নির্দেশিত (Closely Directed) হইতে চায় এবং দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় ,

(৫) কর্মিগণের নূতন ধারণা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা খুবই কম এবং তাহাদের উচ্চাশাও সংকীর্ণ ,

(৬) এই তত্ত্ব কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এমন কি ভীতি প্রদর্শন করিয়া কর্মীকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার পক্ষপাতী। ইহা নির্দেশমূলক ব্যবস্থাপনা ;

(৭) ইহা অনুমান করে যে, কর্মীদের সততার অভাব আছে এবং তাহারা অলস ও কর্মে অনুৎসাহী ,

(৮) ইহা অনুমান করে যে, কর্মিগণ দায়িত্ব এড়াইতে চায় এবং কর্মে কৃতিত্ব চায় না।

ওয়াই-তত্ত্ব (Theory Y) :

এই তত্ত্ব মানসিক আচরণের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে। প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনাবিদ্‌গণ এই তত্ত্বের সমর্থক। ইহা অনুমান করে যে,

(১) যদি কর্ম-পরিবেশ অনুকূল হয় তবে কর্মীর কাছে কাজ খেলার মতই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে।

(২) ইহা অনুমান করে যে, যদি অধস্তন কর্মীদের পরিণত হিসাবে গণ্য করা হয় এবং স্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়, তবে উহা তাহাদের আত্মশ্লাঘা (Ego), সামাজিক ও দৈহিক প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

(৩) স্ব-নিয়ন্ত্রণ কর্মীর সৃজনী শক্তির উৎসমুখ (Flood Gates of Creativity) উন্মুক্ত করে।

(৪) এই তত্ত্ব অনুমান করে যে, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে, কর্মীর সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করে এবং বাধা দূর করিয়া তাহার উন্নয়ন ঘটায়।

(৫) ইহা সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্প্রসারণের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে।

(৬) ইহা অনুমান করে যে, অংশগ্রহণকারী ও পরামর্শকারী ব্যবস্থাপনা নির্দেশমূলক ব্যবস্থাপনা (Directive Management) অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ।

(৭) এই তত্ত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীর অংশগ্রহণের পক্ষপাতী।

(ঘ) ভিক্টর ভ্রুমের প্রত্যাশা তত্ত্ব (Victor Vroom's Expectancy Theory) : ভিক্টর ভ্রুম (Victor Vroom) মনে করেন যে, কোন কাজ করিবার পূর্বে কর্মী কাজের ফলাফলের সম্ভাব্যতা ও যোজ্যতা (Valency) জানিতে চাহিবে। যোজ্যতা বলিতে ফলাফলের উপযোগিতা বা মূল্য বুঝায়। উন্নত কার্যসম্পাদনে কর্মী উচ্চতর বেতন প্রত্যাশা করে। ইহা ছাড়া সে কর্মসন্তুষ্টিও প্রত্যাশা করে।

প্রত্যাশা তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে—কর্মসম্পাদনের পূর্বে কর্মী বিবেচনা করে—(১) সে অধিকতর কার্যসম্পাদনে সক্ষম কিনা, এবং (২) অধিকতর কার্যসম্পাদন করিলে সে কি ধরনের মূল্য পাইতে পারে। কর্মীর কাজের আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্য পূরণে তাহার অনুভব শক্তির উপর।

অনুপ্রাণিতকরণের প্রত্যাশা তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে —

ব্যক্তিগত অনুপ্রাণিতকরণের স্তর = প্রত্যাশা (Expectancy) × সহায়তা (Instrumentality) × যোজ্যতা (Valency) ।

অনুপ্রাণিতকরণের সহায়ক (Instruments or Aids to Motivation) :

নিম্নলিখিত সহায়কগুলি অনুপ্রাণিতকরণে সাহায্য করে :

(১) কর্মীর ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা ;

(২) কাজে সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করা ;
(৩) কাজের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করা ;
(৪) কর্মব্যাপ্তি ঘটানো ;
(৫) কাজের বিষয়-বস্তুর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা ,
(৬) কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা ,
(৭) কাজের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা ,
(৮) অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ,
(৯) চাকুরির স্থায়িত্বের আশ্বাস দান করা ;
(১০) পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা ,
(১১) আনুষঙ্গিক সুযোগ বৃদ্ধি করা ,
(১২) অধস্তন কর্মচারিগণের প্রতি উর্ধ্বতন কর্মচারীর সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার ;
(১৩) সহকর্মীদের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা ;
(১৪) প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ,
(১৫) উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা ;
(১৬) দ্রুত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা ;
(১৭) সকল কর্মীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা ;
(১৮) কর্মিদলগুলির মধ্যে একতা সৃষ্টি করা, ইত্যাদি ।

অর্থ ও অনুপ্রাণিতকরণ (Money and Motivation) ঃ

অর্থ বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব (Proxy) করে । অর্থ প্রেরণাদায়ক। ইহা দৈহিক প্রয়োজন বা অভাব পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম, কারণ ইহার বিনিময় মূল্য আছে। ইহা খাদ্য, আশ্রয় ও পরিচ্ছদের অভাব মিটাইতে পারে। অর্থ ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, আরাম ও বিলাস আনিতে পারে। ইহা পদ-মর্যাদারও প্রতীক। অর্থবান ব্যক্তি মান-সম্মান ও ক্ষমতাবান হন। ইহা মানুষের ইচ্ছা পূরণ করে। সুতরাং ইহার গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য আছে। ইহা বস্তুগত (Tangible) ও অবস্তুগত (Intangible) সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম।

আর্থিক প্রেরণা ব্যক্তিকে কারবারে ও কর্মসম্পাদনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। অর্থ সন্তুষ্টি আনে এবং পরিতৃপ্ত কর্মী অধিকতর কর্ম-সম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে আর্থিক প্রেরণা ধনাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ (Positive Motivation) করে, তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধাকে কর্মিগণ তাহাদের শ্রমের 'পুরস্কার' (Rewards) বা 'অধিকার' (Rights) বলিয়া গণ্য করে। সেই ক্ষেত্রে ইহা কর্মসম্পাদনকে অধিকতর কার্যকরী করিবার উপযুক্ত অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে হার্জবার্গ (Herzberg)-এর অনুপ্রাণিতকরণের তত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য। হার্জবার্গ আর্থিক সুবিধাকে সংরক্ষণকারী উপাদান (Hygiene or Maintenance Factor) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। আর্থিক সুবিধা অসন্তোষ দূর

করে এবং কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে। কিন্তু ইহা কর্মীকে কাজে অনুপ্রাণিত করে না।

অর্থ ও অনুপ্রাণিতকরণের মধ্যে নৈমিত্তিক (Casual) সম্পর্ক আছে। যদি আর্থিক সুবিধা কর্মীর প্রত্যাশা (Expectancy) পূরণ না করে এবং তাহার প্রয়োজন না মিটাইতে পারে তবে আর্থিক সুবিধা অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কর্মীরা শুধুমাত্র অর্থের চূড়ান্ত পরিমাণে (Ab olute Size) সন্তুষ্ট থাকে না, তাহারা অর্থের আপেক্ষিক পরিমাণেও (Relative Size) আগ্রহী। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রদত্ত হয় নাই, তবে অর্থ অনুপ্রাণিতকরণের উপাদান হিসাবে ব্যর্থ হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, কিছু লোকের নিকট অর্থই সর্বস্ব, কিছু লোকের নিকট অর্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সর্বস্ব নহে। আবার কিছু লোকের নিকট অর্থ প্রেরণাদায়ক নহে। অর্থকে অনুপ্রেরণার উপাদান হিসাবে ফলপ্রদ করিতে হইলে ইহাকে উৎপাদিকাশক্তির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

* মনোবল বা নৈতিক বল (Morale) °

মনোবল বা নৈতিক বলের অর্থ (Meaning of Morale) ঃ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট মনোবল কথাটির অর্থ মনোভাব। সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ সামাজিক আচরণ। ব্যক্তির দিক হইতে ইহার অর্থ কাজে সন্তুষ্টি এবং কর্মিদলের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহার অর্থ যৌথ অনুভূতি। স্বাস্থ্য কথাটি যেমন সংযুক্ত (Composite) বা সর্বার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়, মনোবল কথাটিও তেমনি সংযুক্ত অনুভূতি (Composite Sense) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্মসম্পাদনে একক ও যৌথ মনোভাবকে মনোবল বলা যাইতে পারে।

কিথ ও ডেভিস (Keeth and Davis)-এর মতে, 'মনোবল হইল কর্মপরিবেশ ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী সংগঠনের স্বার্থে কর্মীদের একক ও দলীয় মনোভাব।" সুতরাং মনোবল বলিতে বুঝায় একক কিংবা দলীয় মানসিক অবস্থা বা মনোভাব যাহা কর্মীদের সহযোগিতার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে। মনোবল উন্নয়ন করা ও বজায় রাখা ব্যবস্থাপকগণের প্রাথমিক দায়িত্ব।

মনোবলের তাৎপর্য (Significance of Morale) ঃ

যদিও মনোবল এবং উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে বিশেষ যুক্তিসঙ্গত পারস্পরিক সম্পর্ক নাই, তথাপি শিল্পীয় বিষয়ে মনোবলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইহার তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) মনোবল ব্যক্তি ও দলীয় সন্তুষ্টির নির্দেশ করে। ইহা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। উচ্চ-মনোবল (High Morale) উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইহা উত্তম কর্মপরিবেশ ও সহকর্মীর প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি করে।

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(২) মনোবল কর্মসম্পাদনের চাবিকাঠি। ইহা কর্মব্যবস্থার মানবিক দিককে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ (Lubricate) করে এবং সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনায় সাহায্য করে।

(৩) নেপোলিয়ন (Napoleon) একবার বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধে মনোবল তিন-চতুর্থাংশ এবং মানবশক্তি এক-চতুর্থাংশ কাজ করে"। যুদ্ধক্ষেত্রে মনোবল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা কারবারী ক্ষেত্রেও সমগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৪) আরউইক (Urwick)-এর মতে, মনোবল কর্মীর শ্লথভাব দূর করিয়া কর্মসম্পাদনে দৃঢ়তা আনে।

(৫) কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O'Donnell)-এর মতে, মনোবল কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদেশের মধ্যে একতা আনে।

(৬) কর্মিগণের উন্নত মনোবল কারখানার উৎপাদনশক্তি এবং কার্যকরণ দক্ষতা (Operational Efficiency) বৃদ্ধি করে।

(৭) মনোবল উন্নত না হইলে দক্ষতা ও সংযোজনার অভাব ঘটে।

(৮) উন্নত কর্মী-মনোবল প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মিগণের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে, শ্রমিক আবর্তন (Labour Turnover) হ্রাস করে এবং অনুপস্থিতির হার কমাইয়া দেয়। ইহার ফলে একদিকে শ্রমিক-সম্পর্ক উন্নত হয়, অন্যদিকে জনসাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি (Image) বৃদ্ধি পায়।

(৯) স্প্রিগেল (Spriegel)-এর মতে মনোবল দুর্বল (Low Morale) হইলে উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়, দীর্ঘসূত্রী মনোভাব দেখা যায়, অনুপস্থিতি বৃদ্ধি পায়, নিয়ম ও তত্ত্বাবধানের বিরুদ্ধাচরণ ঘটে এবং অভাব-অভিযোগ, কর্মী-আবর্তন, বিপদ ও দুর্ঘটনা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

মনোবল গঠনকারী উপাদানসমূহ (Morale-building Factors) :

আলেকজাণ্ডার লেটন (Alexander Leighton) মনোবল গঠনের জন্য পাঁচটি উপাদান নির্দেশ করিয়াছেন :

(১) দলীয় স্বার্থের প্রতি একক সদস্যের আস্থা (Confidence) ;

(২) নেতৃত্বের প্রতি দলের বিভিন্ন সদস্যের আস্থা ;

(৩) সহকর্মীদের প্রতি একক সদস্যের আস্থা ;

(৪) সাংগঠনিক দক্ষতা ,

(৫) দলীয় শর্ত (Group Condition) ও কর্মবিষয়ক শর্তাবলী।

বিভিন্ন আচরণ বিজ্ঞানীগণ (Behaviour Scientists) মনোবল গঠনের নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব দিয়াছেন :

(১) **ব্যক্তিগত উপাদান (Personal Factors) :** এইসকল উপাদান হইল : (ক) প্রশিক্ষণ, (খ) বয়স, (গ) শিক্ষা, (ঘ) কর্মীর বুদ্ধিমত্তা, (ঙ) কাজে কর্মী

কত সময় ব্যয় করে এবং (চ) কাজের প্রতি তাহার আগ্রহ। কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার মনোবল বৃদ্ধি পায়।

(২) **কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ (Factors Relating to Jobs) :** এইসকল উপাদান হইল : (ক) ঘনিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধান, (খ) কাজে সন্তুষ্টি, (গ) সহকর্মীর সহিত সুসঙ্গতি (Compatibility), (ঘ) কর্ম-বিষয়ক শর্তাবলী ইত্যাদি।

(৩) **অন্যান্য উপাদান (Other Factors) :** এইসকল উপাদান হইল : (ক) সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি হিসাবে সংগঠনের কাযকারিতা, (খ) পারিশ্রমিক ও পুরস্কার এবং (গ) শারীরিক ও মানসিক উপাদানসমূহ।

মনোবল কিভাবে পরিমাপ করা যায় ? (How to Measure Morale ?) :

কর্মচারিগণের মনোবল নীচু বা দুর্বল (Low) থাকিলে প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও মুনাফা উভয়ই হ্রাস পায়। উচ্চ-মনোবল (High Morale) প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও মুনাফা বৃদ্ধি করে। কিন্তু ইহাতে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে। অন্যান্য উপাদানের প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে। মনোবলের মাপকাঠি হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিবেচনা করা হয় :

(ক) **দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি হইতে মনোবল পরিমেয় : (১) ক্রিয়াগত (Operational) দিক হইতে এবং (২) সামাজিক দিক হইতে। ক্রিয়াগত দিক হইতে উৎপাদিকাশক্তি, মুনাফার পরিমাণ এবং অন্যান্য সাংগঠনিক সাফল্য পরীক্ষা করিয়া মনোবল পরিমাপ করা হয়। সামাজিক দিক হইতে মনোবল পরিমাপ করিবার সময় কর্মচারিগণের অনুভূতি এবং সংগঠনের প্রতি তাহাদের মনোভাব নিরূপণ করা হয়।

(খ) **মনোভাব ও কর্মসন্তুষ্টি ঃ** কাজের প্রতি কর্মচারিগণের মনোভাব এবং তাহাদের কর্মসন্তুষ্টি (Job Satisfaction) পরীক্ষা করিয়া মনোবল পরিমাপ করা হয়। কর্মচারী-মনোভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করিয়া কর্মচারীর মনোভাব জানা যাইতে পারে। খোলাখুলি আলোচনায় কর্মচারিগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কর্ম-পরিবেশ, বেতন, ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষগণের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব জানা যায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অপ্রত্যক্ষভাবে কতকগুলি সূচক (Indicator)-এর মাধ্যমে কর্মচারিগণের মনোভাব জানা যায়। এইসকল সূচক হইল : উৎপাদন-স্তর, অনুপস্থিতি, শ্রমিক-আবর্তন, দুর্ঘটনা, অভাব-অভিযোগ, মদ্যপানের প্রবণতা ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক পিছু, দল পিছু, উপবিভাগ পিছু এবং বিভাগ পিছু উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই যে মনোবল অধিক বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা নহে। কারণ অন্যান্য উপাদান যেমন, কাঁচামালের উৎকর্ষ, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাপনাও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে।

অসুস্থতাজনিত এবং ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক অসুবিধার কারণ ব্যতিরেকে কর্মচারিগণ যদি কাজে অনিচ্ছা ও কর্মপরিবেশের প্রতিকূলতার কারণে অনুপস্থিত হয় তবে মনোবল নিম্নস্তরের বলিয়া ধরিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানে কর্মসন্তুষ্টি ও উচ্চ-মনোবল থাকে সেখানে কর্মচারিগণ সঠিক সময়ে কাজে উপস্থিত হয় এবং তাহাদের অনুপস্থিতিও কমিয়া যায়। মনোবলের সহিত শ্রমিক আবর্তনের সম্পর্ক আছে।

শ্রমিক আবর্তন (Labour Turnover or LTO)

$$= \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগকারী কর্মচারীর সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের বেতন তালিকায় কর্মচারিগণের মোট সংখ্যা}} \times ১০০$$

যদি দেখা যায় যে, শ্রমিক আবর্তনের হার খুব বেশী, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মনোবল কম। ইহার কারণ জানিবার জন্য 'পরিত্যাগজনিত-কারণ সাক্ষাৎকারের' (Exit-interview) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

যন্ত্রপাতির ত্রুটি, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি দুর্ঘটনা অধিক সংখ্যায় ঘটিতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, মনোবল দুর্বল থাকায় কর্মিগণের কাজে অসন্তুষ্টি ও অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে অধিক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

যদি দেখা যায় যে, চাকুরি ও কাজের শর্ত ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে কর্মিগণ ঘন-ঘন অভিযোগ পেশ করিতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে, অসন্তুষ্টিজনিত কারণে তাহাদের মনোবল নিম্নস্তরের।

অনুপ্রাণিতকরণ ও মনোবলের পার্থক্য (Distinction between Motivation and Morale) ঃ

অনুপ্রাণিতকরণ ও মনোবলের পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

অনুপ্রাণিতকরণ	মনোবল
১। অনুপ্রাণিতকরণ বলিতে বুঝায় একক কর্মীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যাহা তাহার প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ও বজায় রাখিতে উদ্দীপিত করে।	১। মনোবল হইল একটি কর্মিদলের নৈতিক বল, ঐক্য ও শৃঙ্খলা।
২। কর্মীর প্রয়োজন বা অভাব পূরণ এবং প্রত্যাশার উদ্দেশ্যের সহিত অনুপ্রাণিতকরণ জড়িত।	২। কাজের ও উদ্দেশ্যপূরণের প্রতি দলীয় সার্বিক মনোভাব এবং সন্তুষ্টির সহিত মনোবল সম্পর্কিত।
৩। কোন কর্মসম্পাদনে একজন কর্মীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপকরণ বা শর্ত হিসাবে অনুপ্রাণিতকরণকে গণ্য করা হয়।	৩। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তের যেমন, দলীয় নেতৃত্বের উৎকর্ষ, আন্তঃ-ব্যক্তিক সম্পর্ক, উদ্দেশ্যপূরণে এবং কার্যসম্পাদনে দলের সাফল্য ইত্যাদির যৌথ ফল হইল মনোবল।

মনোবল ও উৎপাদিকাশক্তির সম্পর্ক (Relation between Morale and Productivity) ঃ

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মনোবল ও উৎপাদিকাশক্তি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উৎপাদিকাশক্তি হইল উৎপাদন ও উপকরণের অনুপাত $\left(\frac{\text{উৎপাদন}}{\text{উপকরণ}}\right)$। উচ্চ মনোবল অধিক উৎপাদিকাশক্তি সৃষ্টি করে। মনোবল উন্নত হইলে কর্মিগণ কর্তব্যে অবহেলা করে না, কর্মে বিরক্ত হয় না, কাজের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনের মান উন্নত করিবার জন্য তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ প্রয়োগ করে। বিপরীতদিকে, মনোবল দুর্বল হইলে উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়ঃ কর্মীদের কাজে অনুপস্থিতি, বিরক্তি, কর্মত্যাগ, অনাগ্রহ, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, বেপরোয়া মনোভাব, ক্রোধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মনোবল ও উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ধনাত্মক (Positive) সম্পর্ক নাই। আবার কোন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, মনোবল ও উৎপাদিকাশক্তি ধনাত্মকভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। উৎপাদিকাশক্তি শুধু মনোবলের উপরই নির্ভর করে না, অন্যান্য উপাদানের উপরও নির্ভরশীল। যদি অন্যান্য উপাদানের ঋণাত্মক (Negative) শক্তি অধিক হয় তবে উচ্চ মনোবল উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে অপারগ হয়। এই অন্যান্য উপাদান হইল: ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ, কাঁচামাল উপকরণের উৎকর্ষ, কারিগরি অবস্থা, উৎপাদনের প্রকৃতি ও কর্মীদের দক্ষতা। তবে তাত্ত্বিক দিক হইতে বলা যায় যে, উচ্চ মনোবল উন্নত উৎপাদিকাশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু আনন্দ ও সন্তুষ্টি কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে না।

* প্রেরণা বা উদ্দীপক (**Incentive**) ঃ

সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রেরণা একটি উদ্দীপক বস্তু, যাহা অধিক কার্যসম্পাদনে উৎসাহ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। প্রেরণা ছাড়া কোন কর্মীই কাজে উৎসাহ পায় না। প্রেরণা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, উদ্দীপনা কর্মীকে কর্মে উৎসাহী করে এবং তাহার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রেরণার প্রকারভেদ (Types of Incentives) ঃ প্রেরণা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—এই দুই প্রকারের হইতে পারে। অভ্যন্তরীণ প্রেরণা কর্মীদের মনের অন্তঃপুরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ইহা কর্মসন্তুষ্টি, দলীয় পরিবেশ, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বাহ্যিক প্রেরণা আর্থিক ও অনার্থিক—এই দুই প্রকারের হইতে পারে।

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) আর্থিক প্রেরণা (Financial Incentives)ঃ এই প্রকার প্রেরণায় অধিকতর প্রয়াস ও উৎপাদনের জন্য অধিক পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আর্থিক প্রেরণা শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহা নহে, ইহা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণেও সাহায্য করে এবং কর্মীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। আর্থিক প্রেরণা (Pecuniary Incentives) খুবই ফলপ্রসূ। আর্থিক প্রেরণাগুলি হইল :

(১) বেতন অথবা মজুরি বৃদ্ধি ;
(২) বোনাস প্রদান ;
(৩) মুনাফায় অংশ গ্রহণের সুযোগ ,
(৪) সহ-অংশীদার হইবার সুযোগ ;
(৫) পারিতোষিক প্রদান ;
(৬) আনুতোষিক (Gratuity) প্রদান ,
(৭) প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা ,
(৮) পেনসনের সুবিধা ইত্যাদি।

(খ) অনার্থিক প্রেরণা (Non-financial Incentives)ঃ মানুষ কেবল খাদ্যে সন্তুষ্ট হয় না সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়। অর্থ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই সকল অনার্থিক উদ্দীপক বা প্রেরণার (Non-Pecuniary Incentives) বিষয়গুলি হইল :

(১) পদমর্যাদা ,
(২) গুণের স্বীকৃতি ;
(৩) চাকুরির নিরাপত্তা ,
(৪) সামাজিক নিরাপত্তা ,
(৫) পদোন্নতি ,
(৬) কাজে সন্তুষ্টি ;
(৭) স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ ;
(৮) কর্মী-মতামতের স্বীকৃতি ,
(৯) চিকিৎসা ও কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা ;
(১০) কর্মস্থানে পরিবহণের সুবিধা ,
(১১) বাসস্থানের সুবিধা ;
(১২) সস্তায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ ;
(১৩) ক্যান্টিনের সুবিধা ;
(১৪) কর্মসংস্থান ও কাজের বিষয়বস্তুর গুণগত মান উন্নয়ন ,
(১৫) দুর্ঘটনা ও কর্মচ্যুতিজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।

চলাফেরা করিবার জন্য যেমন ডান-পা এবং বাঁ-পা উভয়েরই প্রয়োজন, তেমনি কর্মী-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে আর্থিক এবং অনার্থিক উভয়প্রকার প্রেরণাই সমভাবে আবশ্যক।

আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতা (Inter-personal Competence) ঃ

ভূমিকা (Introduction) ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ একজনমাত্র ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। এই কারণে কাজ বিভাজন করা হয়। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ হয়। যাহারা কার্যসম্পাদনে নিযুক্ত তাহাদের পারস্পারিক ব্যক্তিগত যোগ্যতা কার্যসম্পাদনে সফলতা ও বিফলতা আনে। দলীয় প্রত্যেক কর্মী যদি সমযোগ্য হয় তবে কর্মে সাফল্য আসে। দলীয় সম্পর্কের উপরও ব্যক্তিগত যোগ্যতা বহুলাংশে নির্ভর করে। দলীয় সম্পর্ক নিয়মমাফিক (**Formal**) ও অনিয়মমাফিক (**Informal**) হইতে পারে। নিয়মমাফিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন, আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু অনিয়মমাফিক সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Spontaneously) গাড়িয়া উঠে। ইহা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, বয়স, পেশা এমনকি একই স্থানে বসবাসের কারণেও গাড়িয়া উঠিতে পারে। অনিয়মমাফিক সম্পর্কের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক দল (Social Groups) গঠিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, দলগত ইত্যাদি থাকে। দলের সদস্যগণ দল পরিবর্তন করিতে পারে। প্রত্যেকটি দল এক একটি বিশিষ্ট ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক সম্পর্কের মধ্যে সুসামঞ্জস্য আনিতে পারিলে আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Role and Importance of Inter-personal Competance) ঃ

আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহা ব্যক্তিগত বিবাদ দূর করিয়া ব্যবস্থাপনায় একত্ববোধ (Oneness) জাগ্রত করে।

(২) ব্যক্তিগত যোগ্যতার পার্থক্য থাকিলে অন্যের সহযোগিতায় শূন্যতা পূরণ করা যায়।

(৩) ইহাতে কারবারের অখণ্ড রূপ বজায় থাকে।

(৪) ইহা দলগত ঐক্য (Group Cohesiveness) আনিতে সাহায্য করে এবং দলীয় কর্মস্পৃহা (Team-spirit) বৃদ্ধি করে।

(৫) একক প্রচেষ্টার ফল যৌথ প্রচেষ্টার ফল অপেক্ষা অধিক হয়। আন্তঃ-ব্যক্তিক যোগ্যতা কর্মসম্পাদনের স্তরকে উন্নত করে। ইহাকে **সম্মিলিত ফল বা সমপ্রেরণা-সঞ্জাত ফল** (**Synergic Effect**) বলে।

(৬) ইহা সহানুভূতিসূচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(৭) ইহা ব্যক্তি-প্রচেষ্টার মধ্যে কর্মধারা রচনা করে।

১ কর্মীদের মধ্যে 'সংস্থষ্টের অনুভূতি' অর্থাৎ 'অংশস্বরূপ হওয়ার' ise of Belonging) সৃষ্টি হয়—প্রত্যেক কর্মী অনুভব করে যে, সে ভুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যের সহিত তাহার ভাগ্য জড়িত।

জ্ঞাতকরণ (Communication) ঃ

সংজ্ঞা (Definition) ঃ ল্যাটিন শব্দ 'কমিউনিস্' (Communis) হইতে জ্ঞাতকরণ কথাটির উৎপত্তি। ইহার অর্থ হইল 'সাধারণ' (Common), অর্থাৎ জ্ঞাতকরণ সাধারণ উপলব্ধি আনে। সাধারণ কথায়, আদেশ ও সংবাদ পরিবেশনকে জ্ঞাতকরণ বলে। জ্ঞাতকরণ বলিতে সংবাদ ও ভাবের সহজ আদান-প্রদানকে বুঝায়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন সংবাদ ও তথ্য বিনিময় করে তখন তাহাকে জ্ঞাতকরণ বলে। **ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণ বলিতে শুধু তথ্যের কথন ও শ্রবণকে বুঝায় না, উপলব্ধিকেও বুঝায়।**

লুই অ্যালেন (Louis Allen)-এর মতে, "কোন তথ্যের সু-ব্যবস্থিত ও ধারাবাহিক কথন, শ্রবণ ও উপলব্ধিকে জ্ঞাতকরণ বলে।"

রেডফিল্ড (Redfield)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের অর্থ হইল তথ্য ও মতামতের আন্তর্বিনিময়।"

থিও হেম্যান (Theo Haimann)-এর মতে, "জ্ঞাতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট তথ্যের স্থানান্তরকরণ হয় ও তাহার উপলব্ধি হয়।"

জ্ঞাতকরণের উপাদানসমূহ বা প্রক্রিয়াসমূহ (Elements or Processes of Communication) ঃ

জ্ঞাতকরণের পাঁচটি আবশ্যকীয় উপাদান হইল :

(১) **তথ্য-সংবাদ** (Message) ঃ ইহা যে কোন প্রকার জ্ঞাতকরণের বিষয়বস্তু। তথ্য বলিতে কোন ঘটনা, ভাব অথবা সংবাদকে বুঝায়।

(২) **তথ্য-প্রেরক** (Sender) ঃ যিনি তথ্য প্রেরণ করেন, তাঁহাকে তথ্য সরবরাহকারী বা প্রেরক বলে।

(৩) **তথ্য গ্রহীতা** (Receiver) ঃ যাঁহাকে তথ্য প্রেরণ করা হয়, তাঁহাকে তথ্য-গ্রহীতা বলে।

(৪) **জ্ঞাতকরণের প্রণালী** (Channel of Communication) ঃ যে মাধ্যমের সাহায্যে তথ্য স্থানান্তরিত হয়, তাহাকে জ্ঞাতকরণের প্রণালী বলে। তথ্য-প্রেরককে তথ্য-প্রেরণের উপযুক্ত মাধ্যম স্থির করিতে হইবে।

(৫) **জ্ঞাতকরণের প্রতীক** (Communication Symbol) ঃ তথ্য-প্রেরক তাঁহার ভাবকে ভাষা, চিহ্ন ইত্যাদি কতকগুলি প্রতীকে সংগঠিত করিয়া গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন।

জ্ঞাতকরণের ভূমিকা (Role of Communication) :

চেস্টার আই. বার্নার্ড (Chester I. Barnard)-এর মতে, ব্যবস্থাপকের প্রথম কাজ হইল জ্ঞাতকরণ করা ও উহা বজায় রাখা। ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সমগ্র অংশ** (Integral Part of Management Process) : জ্ঞাতকরণ কর্মাধ্যক্ষের কর্মনীতি, পদ্ধতি, আদেশ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি তথ্য অধস্তন কর্মিগণকে অবগত করে। আবার ইহা অধস্তন কর্মচারিগণের গঠনমূলক প্রস্তাব, মতামত, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি উর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের নিকট স্থানান্তরিত করে। জ্ঞাতকরণ দ্বি-মুখী (Two-way) সম্পর্ক স্থাপন করে—ইহা উপর হইতে নিচে এবং নিচ হইতে উপরে তথ্য প্রেরণে সাহায্য করে।

(২) **সক্রিয় ব্যবস্থাপনা** (Active Management) : জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করে। জ্ঞাতকরণের ফলে নির্দেশদান ও আদেশ পালন সম্ভব হয়।

(৩) **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি** (Promotion of Managerial Efficiency) : জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে। **জর্জ টেরি (George Terry)**-র মতে, "ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদনে জ্ঞাতকরণ পিচ্ছিলকারক (Lubricant) পদার্থের মত কাজ করে।" অর্থাৎ ইহা সংযোগপথকে মসৃণ ও সুগম করে।

(৪) **কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি** (Promotion of Will-to-do) : জ্ঞাতকরণের ফলে তথ্যের উপলব্ধি ও স্বীকৃতি সম্ভব হয় বলিয়া ইহা কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে।

(৫) **নেতৃত্বের ভিত্তি** (Basis for Leadership Action) : ইহা 'ব্যক্তি হইতে ব্যক্তি' (Man-to-Man) সম্পর্ক সৃষ্টি করে বলিয়া নেতার আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অধস্তন কর্মীদের জ্ঞাত করা সম্ভব হয়। ফলে নেতৃত্বের ভিত্তি তৈয়ারী হয়।

(৬) **সংযোজনার উপায়** (Means of Co-ordination) : জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে কর্মাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনস্থ কর্মিদেরকে তথ্যসমৃদ্ধ করিতে পারেন এবং কার্য ও কর্ম-পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয় অবহিত করিতে পারেন। ইহাতে সংযোজনা ফলপ্রসূ হয়।

(৭) **কাজে সন্তুষ্টি** (Job Satisfaction) : উপযুক্ত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থাপকের দক্ষতার প্রতি কর্মীর আস্থা ও আনুগত্য আনে এবং কাজের প্রতি কর্মীর আগ্রহ, প্রেরণা ও সন্তুষ্টি আনে।

জ্ঞাতকরণের প্রতিবন্ধকসমূহ (Barriers to Communication) :

জ্ঞাতকরণের প্রতিবন্ধকগুলি হইল :

(১) নির্দিষ্ট ও অভ্রান্ত উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির অভাব ,

(২) সংগঠনের ত্রুটি (যেমন, ভারার্পণে নির্দিষ্টতার অভাব, আদেশের দীর্ঘ শৃঙ্খল, নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক পরিধি ইত্যাদি ;

(৩) তথ্য জ্ঞাপনে কারিগরি দুর্বোধ্য ভাষা (Technical Jargons) ও দ্ব্যর্থবোধক (Ambiguous) শব্দের ব্যবহার ,

(৪) উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশের অভাব ;

(৫) শ্রমিক সঙ্ঘের অনমনীয় মনোভাব ,

(৬) বিভিন্নার্থক বিঘ্নকারী (Semantic Distortion) শব্দের ব্যবহার ,

(৭) খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার অভাবে তথ্যের বিকৃতি ;

(৮) দূরত্বের কারণে জ্ঞাতকরণ তথ্যের স্থানান্তরজনিত ক্ষতি ;

(৯) সংবাদ-গ্রহীতার মনোযোগিতার অভাব এবং উপলব্ধির অনিচ্ছা ;

(১০) সংবাদ-গ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণে সংবাদদাতার ব্যর্থতা ;

(১১) জ্ঞাতকরণের মাধ্যম বা উপায়গুলির পর্যাপ্ততার অভাব ;

(১২) জ্ঞাতকরণের বিষয়বস্তুর অপরিপক্কতা ;

(১৩) জ্ঞাতকরণ মাধ্যমের পরিবর্তন-বিমুখতা ,

(১৪) জ্ঞাতকরণের তথ্য প্রকাশে ব্যর্থতা ;

(১৫) 'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ' (Grapevine Communication)-এর ফলে গুজবের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা জ্ঞাতকরণের তথ্যকে বিকৃত করে। অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণকে **দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহা অতি দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানে সাহায্য করে এবং ইহাতে কর্মচারিগণের অভাব-অভিযোগ দ্রুত জানা সম্ভব হয়।

জ্ঞাতকরণের অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ (Requisites of Communication

অথবা

জ্ঞাতকরণকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় (How to make Communication effective)

অথবা

জ্ঞাতকরণের নীতিসমূহ (Principles of Communication) :

প্রতিবন্ধককারী কারণগুলিকে দূর করিয়া জ্ঞাতকরণকে কার্যকরী করিতে হইলে **চেস্টার আই. বার্নার্ড (Chester I. Barnard** -এর মতে—

(ক) জ্ঞাতকরণের বিষয় বোধগম্য হইতে হইবে ,

(খ) জ্ঞাতকরণের বিষয়কে ব্যক্তি-স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে ,

(গ) জ্ঞাতকরণের বিষয় সংগঠনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে ,

(ঘ) শারীরিক ও মানসিক দিক হইতে জ্ঞাতকরণের বিষয়বস্তু সম্পাদন করা সম্ভব হইতে হইবে।

জ্ঞাতকরণকে কার্যকরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত **পন্থা ও নীতিগুলি** অনুসরণ করিতে হয় :

(১) **প্রাঞ্জলতা বা স্পষ্টতা** (Clarity) : জ্ঞাতকরণ স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত হইবে। জ্ঞাতকরণে পারস্পরিক বোধগম্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। তথ্যের পূর্ণ বিবরণ দ্ব্যর্থহীন এবং উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করিতে হইবে।

(২) নির্দিষ্টতা (Specificity) ঃ জ্ঞাতকরণে একটি বিষয় এ· করা উচিত।

(৩) যথোপযুক্ততা (Appropriateness) ঃ জ্ঞাতকরণের সময় উপযুক্ত হইতে হইবে। সংগঠনের কাঠামো অনুযায়ী জ্ঞাতকরণের মাধ্যম ঠিক করিতে হইবে।

(৪) মনোযোগ (Attention) ঃ জ্ঞাতকরণ তথ্য-গ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণের উপযোগী হইতে হইবে। প্রত্যক্ষ ব্যক্তি-সম্পর্ক এই বিষয়ে কার্যকরী হয়। কর্মাধ্যক্ষ জ্ঞাতকরণকে কাজের একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হিসাবে গণ্য করিবেন।

(৫) অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation) ঃ অনুপ্রাণিতকরণকে জ্ঞাতকরণের সহায়ক (Aid) হিসাবে কাজ করিতে হইবে। ত্রুটিপূর্ণ অনুপ্রাণিতকরণ জ্ঞাতকরণকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

(৬) পরিবেশ (Environment) ঃ কর্ম-পরিবেশকে অনুকূল করিতে হইবে। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস কর্ম-পরিবেশকে অনুকূল করে। জ্ঞাতকরণের বিষয় অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

(৭) অনুবর্তন বা অনুসরণ (Follow-up) ঃ জ্ঞাতকরণের প্রতিক্রিয়া কি তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৮) প্রয়োজনীয় তথ্য-সরবরাহ (Feed Back) ঃ কর্মাধ্যক্ষকে সময়মত অধস্তন কর্মচারিগণকে সবপ্রকার তথ্য পরিবেশন করিয়া তাহাদের অভাব পূরণ করিতে হইবে।

(৯) জ্ঞাতকরণ প্রণালী (Channel of Communication) ঃ জ্ঞাতকরণের প্রণালী যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ও হ্রস্ব হইতে হইবে। ইহাতে হস্তান্তরজনিত ক্ষতি (Transmission Loss) হ্রাস পাইবে।

(১০) নমনীয়তা (Flexibility) ঃ জ্ঞাতকরণের মাধ্যম এমন হইতে হইবে যাহাতে ইহা পরিবর্তনকে গ্রহণ বা অভিযোজন (Adopt) করিতে পারে।

(১১) দ্বি-মুখী জ্ঞাতকরণ (Two-way Communication) ঃ জ্ঞাতকরণ সহজ সরল ও স্বাভাবিক গতিতে ঊর্ধ্ব ও অধঃমুখী হইবে। ইহা একতরফা হইবে না।

জ্ঞাতকরণের প্রকারভেদ (**Types of Communication**) ঃ

জ্ঞাতকরণ নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে :

(১) **নিয়মমাফিক ও অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ** (Formal and Informal Communication) ঃ সংগঠনের বাঁধাধরা নিয়মে যে জ্ঞাতকরণ করা হয়, তাহাকে নিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ বলে। ইহাতে নিয়মমাফিক পদ্ধতি অনুসারে আদেশ ও নির্দেশ পরিবেশিত হয়। ইহা উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক স্থাপন করে। ইহাতে দ্বি-মুখী জ্ঞাতকরণ গড়িয়া উঠে। ইহা স্থায়ী, কিন্তু অনমনীয়।

নিয়ম-বহির্ভূত জ্ঞাতকরণকে **অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে। **'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ'** (Grapevine Communication) অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ। ইহা নমনীয়। কিন্তু ইহাতে গুজব রটিবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপনাকে এইরূপ জ্ঞাতকরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। ব্যবস্থাপকগণকে এইরূপ জ্ঞাতকরণকে গঠনমূলক করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। সত্যতা যাচাই করিয়া, প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করিয়া এবং অধস্তন কর্মীদের অনুভূতি, চিন্তাধারা ও মনোভাব জানিয়া কর্মাধ্যক্ষগণ 'দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ'-কে গঠনমূলক করিতে পারেন।

(২) **নিম্নমুখী ও ঊর্ধ্বমুখী জ্ঞাতকরণ** (Downward and Upward Communication) **:** জ্ঞাতকরণ যখন উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে করা হয়, অর্থাৎ আদেশ ও নির্দেশ যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অধস্তন কর্মীর নিকট উপর হইতে নীচে নামে, তখন তাহাকে **নিম্নমুখী জ্ঞাতকরণ** বলে।

জ্ঞাতকরণ যখন অধস্তন কর্মীদের নিকট হইতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নীচ হইতে উপরে উঠে, তখন তাহাকে **ঊর্ধ্বমুখী জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহার সাহায্যে অধস্তন কর্মচারিগণ তাহাদের মতামত, সুপারিশ, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাইতে পারে।

(৩) **পূর্বাপর, অনুভূমিক ও আড়াআড়ি জ্ঞাতকরণ** (Vertical, Horizontal and Diagonal Communication) **:** যখন **একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের** ও ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারী ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে জ্ঞাতকরণ হয়, তখন তাহাকে **পূর্বাপর জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহা নিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ।

যখন **বিভিন্ন বিভাগের একই স্তরের** কর্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে জ্ঞাতকরণ হয়, তখন তাহাকে **অনুভূমিক জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহাকে পার্শ্বস্থ জ্ঞাতকরণও (Lateral Communication) বলে। ইহা দ্রাক্ষালতা জ্ঞাতকরণ। ঘরোয়া বৈঠক, সভা-সমিতি, শিক্ষাশিবির প্রভৃতি স্থানে এইরূপ অনিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ দেখা যায়।

বিভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারী কর্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে জ্ঞাতকরণকে **আড়াআড়ি জ্ঞাতকরণ** বলে।

(৪) **মৌখিক ও লিখিত জ্ঞাতকরণ** (Verbal and Written Communication) **:** অলিখিত আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি পরিবেশনকে **মৌখিক জ্ঞাতকরণ** বলে। ইহা মুখোমুখি কথাবার্তায় ও টেলিফোনে হইতে পারে। মুখের কথায় মৌখিক জ্ঞাতকরণ হয়।

সুবিধা (**Advantages**) **:** ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে সময় কম লাগে এবং ব্যয় কম পড়ে।

(২) ইহাতে ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে।

(৩) ইহাতে সন্দেহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা যায়।

(৪) ইহা যাচাই করা সম্ভব।

(৫) ইহাতে বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৬) ইহাতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং তথ্য-গ্রহীতার মনোভাব বুঝা যায়।

(৭) ইহা নমনীয়।

অসুবিধা (Disadvantages) : ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

(২) ইহা দূরবর্তী স্থানে জ্ঞাতকরণে অসুবিধাজনক।

(৩) ইহাতে কোন লিখিত প্রমাণাদি থাকে না বলিয়া তথ্য-গ্রহীতা ইহা অস্বীকার করিতে এবং তথ্য ভুলিয়া যাইতে পারে।

(৪) দীর্ঘ সংবাদ অনেক ব্যক্তির নিকট পরিবেশনের উপযুক্ত মাধ্যম নহে।

লিখিত মাধ্যমে যে জ্ঞাতকরণ করা হয় অর্থাৎ চিঠিপত্র, প্রচারপত্র, টেলিগ্রাম, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে যাহা করা হয়, তাহাকে **লিখিত জ্ঞাতকরণ** বলে।

সুবিধা (Advantages) : ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) দূরবর্তী স্থানে সংবাদ জ্ঞাতকরণে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(২) দীর্ঘ সংবাদ অনেক ব্যক্তিকে একসঙ্গে পরিবেশনের ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী।

(৩) ইহা স্থায়ী দলিলের কাজ করে এবং ইহা বারবার ব্যবহার করা যায়।

(৪) তথ্য সম্পর্কে বিবাদ দেখা দিলে ইহা প্রামাণ্য হিসাবে পেশ করা যায়।

(৫) ইহাতে দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(৬) ইহাতে সংবাদ-গ্রহীতা বিচার-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages) : ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়-বহুল উপায়।

(২) ইহা অনমনীয়।

(৩) ইহাতে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না।

(৪) ইহাতে কোন বিষয় সম্পর্কে দ্রুত বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

(৫) সব কিছু লিখিয়া জানানো সম্ভব হয় না।

জ্ঞাতকরণের পদ্ধতি ও মাধ্যম Methods and Media of Communication :

জ্ঞাতকরণে মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকার পদ্ধতি কার্যকরী হইতে পারে। বক্তৃতা, আলোচনা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদ বুলেটিন, প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন, সাময়িকী, পত্র, পোস্টার, কার্টুন, সংকেত, ফিল্ম, কলিং বেল, সংকেত, লাউড স্পীকার, সংবাদবাহক (Messenger) ইত্যাদি জ্ঞাতকরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রবণ (Listening) :

সংজ্ঞা (Definition) : বলা অপেক্ষা শোনা কঠিন কাজ। কারণ মন দিয়া শ্রবণ করিতে হয়। বক্তার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে ও সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করাকে **শ্রবণ** বলে। অধস্তন কর্মীরা যেমন ব্যবস্থাপকের আদেশ ও নির্দেশ শুনিবেন, ব্যবস্থাপককেও তেমনি সহানুভূতির সহিত অধস্তন কর্মীদের বক্তব্য শুনিতে হইবে। ইহাকে **সহানুভূতিপূর্ণ শ্রবণ** (Sympathotic Listening) বলে। **লুই অ্যালেন** (**Louis Allen**)-এর মতে শ্রবণ 'মানসিক সেতু' (Mental Bridge)।

সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রবণের কাজ (Functions of Listening as a means of Resolving Problems :

সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রবণের কাজ হইল :

(১) অসত্য ও অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ধৈর্য সহকারে অন্যের বক্তব্য শ্রবণ করা,

(২) সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখান,

(৩) শ্রুত বস্তুর সার-সংক্ষেপ শ্রোতার নিকট পুনরাবৃত্তি করা,

(৪) শ্রোতা নির্বাক থাকিয়া বক্তাকে স্বাধীনভাবে বলিবার উৎসাহ দেওয়া,

(৫) সরাসরি প্রশ্ন বা বিতর্কের অবতারণা না করা,

(৬) বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বে কোন উত্তর না দেওয়া, বক্তা যদি শ্রোতার মতামত জানিতে চাহেন তবে শ্রোতাকে তাহার সদুত্তর দিতে হইবে,

(৭) শ্রোতা প্রথমে সমস্যা বুঝিয়া পরে উহার মূল্যায়ন করিবেন। কোন অবস্থাতেই তিনি ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হইবেন না,

(৮) পারস্পরিক উপলব্ধি শ্রদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস এবং খোলা মনে শ্রবণ করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণ (Controlling) :

ভূমিকা (Introduction) : ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হইল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি দেয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ পিছনের দিকে তাকায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হইতেছে কিনা উহা পর্যবেক্ষণ করিবার কাজকে **নিয়ন্ত্রণ** বলে। নিয়ন্ত্রণ কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। নিয়ন্ত্রণ বলিতে কর্মীকে ক্রমাগত পশ্চাদ্ধাবন করা (Chasing) বুঝায় না। কর্মীকে অনুসরণ Follow up) করিয়া তাহাকে সংশোধন করাই নিয়ন্ত্রণের যথার্থ কাজ।

নিয়ন্ত্রণের ধাপ (Steps in Control) :

নিয়ন্ত্রণের চারটি ধাপ বা পর্যায় আছে। এই পর্যায়গুলি হইল :

(১) **কাজের উপযুক্ত মান নির্ধারণ** (Establishment of Proper Standard) **:** ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কার্যকলাপের মূল্যায়ন করিবার জন্য মান স্থির

করা হয়। মান নির্দেশক (Guides) হিসাবে কাজ করে। মান হইতেছে কার্যসম্পাদনের স্বীকৃত পরিমাপক। সম্পাদিত কার্যকে পরিমাপ করিবার ভিত্তি হইতেছে মান। বিভিন্ন প্রকারের মান পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিতে হয়। যেমন—পরিমাণগত মান, গুণগত মান, সময়ের মান, ব্যয়ের মান, আয়ের মান, মূলধনের মান ইত্যাদি।

(২) **সম্পাদিত ও সম্পাদ্য কাজের মূল্যায়ন** (Evaluation of Performance): সম্পাদিত কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন এই ধাপে করা হয়। বিভিন্ন কাজের পৃথক পৃথকভাবে মূল্যায়ন করিতে হইবে।

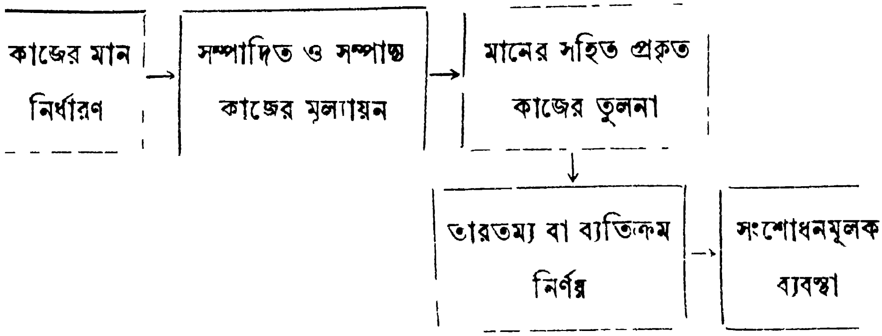
কার্যসম্পাদনের পরিমাপ দুইভাবে করা যায়: (ক) প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং (খ) মৌখিক অথবা লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে। বস্তুগত (Tangible) কাজের ফল সহজেই পরিমেয়। উৎপাদন-ব্যয়, শ্রমিক সংখ্যা, কাঁচামালের পরিমাণ, বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি বস্তুগত বিষয় এবং ইহাদের মূল্যায়ন লিখিত বিবরণের সাহায্যে করা যায়। কিন্তু অবস্তুগত (Intangible) বিষয় যেমন, মনোবল, কর্মচারিগণের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা হয়।

(৩) **মানের সহিত প্রকৃত কাজের তুলনা** (Comparison of Actual Performance with Standards): সম্পাদিত কাজকে পূর্ব-নির্ধারিত মানের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন **তারতম্য** বা **ব্যতিক্রম** (Deviation or Variance) ঘটিয়াছে কিনা। সময়, ব্যয়, বিনিয়োগ, নীতি, পদ্ধতি, স্থায়ী নির্দেশ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া তারতম্য বাহির করা হয়। সাধারণতঃ ত্রুটিপূর্ণ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা তারতম্যের কারণ। যে স্থানে কার্যসম্পাদিত হইতেছে সেই স্থান হইতে তারতম্যের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কার্যসম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে উহার মূল্যায়ন করিয়া তারতম্য বাহির করিতে হয়।

(৪) **সংশোধনমূলক ব্যবস্থা** (Remedial Measures): কি কি কারণে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়া উপযুক্ত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ তারতম্য ঘটিতে না পারে। ইহাতে কারবারের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য, মুনাফা, স্থায়িত্ব ও উন্নতি অব্যাহত থাকে। সংশোধনমূলক ব্যবস্থা কার্যসম্পাদনজনিত, আর্থিক ও সাংগঠনিক হইতে পারে। ইহা আবার প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার হইতে পারে। তারতম্য ঘটিবার পর সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইলে ইহাকে প্রতিকারমূলক এবং তারতম্য ঘটিবার পূর্বেই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইলে তাহাকে প্রতিরোধমূলক সংশোধন ব্যবস্থা বলে। প্রতিরোধমূলক সংশোধন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়।

উদাহরণ: একজন আসবাবপত্র উৎপাদক মাসে ২৫টি চেয়ার উৎপাদন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ইহাই তাহার উৎপাদনের মান। কিন্তু সে মাসের শেষে ২০টি চেয়ার উৎপাদন করিতে পারিল। ইহাই তাহার প্রকৃত উৎপাদন। সুতরাং ঐ মাসে

উৎপাদনের তারতম্য হইল ৫টি চেয়ার। সে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির কারণে এই তারতম্য ঘটিয়াছে। সে ঐ ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতিগুলি মেরামত করিল এবং পরের মাসে ২৮টি চেয়ার উৎপাদন করিল।



নিয়ন্ত্রণ ধাপের বা পর্যায়ের তীরচিত্র (**Arrow Diagram**)

নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ অথবা উত্তম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (Principles or Requisites of a Good Control System)ঃ

কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত নীতিগুলি থাকিতে হইবে ঃ

(১) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাব মান উপযুক্ত হইতে হইবে,

(২) উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে,

(৩) সংকটপূণ কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করিলে নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য ও ব্যয়-সংকোচ আনিবার জন্য কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে,

(৪) কোন তারতম্য (Deviation) ঘটিলে উহা সত্বর জানিতে হইবে এবং প্রতিষেধমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে.

(৫) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে অগ্রাভিমুখী (Forward Looking) হইতে হইবে,

(৬) কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তারতম্য উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকের নিকট জানাইতে হইবে। ছোটখাটো তারতম্যের ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্মাধ্যক্ষের গোচরে আনিবার প্রয়োজন নাই। ইহাকে **ব্যবস্থাপনার ব্যতিক্রম বা নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রম** (Management by Exception or Control by Exception) বলে,

(৭) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত.

(৮) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন,

(৯) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এমন হইবে যাহাতে কর্মাধ্যক্ষগণের কাজের স্বাধীনতা ও স্ব-নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে,

(১০) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সংগঠনের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে,

(১১) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যেন অধিক ব্যয়-বহুল না হয় ;

(১২) ইহা বোধগম্য হইতে হইবে,

(১৩) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কর্মচারী-ভিত্তিক (Employee-oriented) হই৷

(১৪) প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (Preventive Control) ব্যবস্থা গ্রহণ ব
কারণ রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্বে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে রো

নিয়ন্ত্রণের পরিধি (Span of Control) ঃ

ইহাকে কর্তৃত্বের পরিধি, দায়িত্বের পরিধি, তত্ত্বাবধানের পরিধি অথবা ব্যবস্থাপনার পরিধিও বলে। একজন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক যে কয়জন অধস্তন কর্মচারীকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন এবং তাহাদের কাজের মধ্যে কার্যকর সংযোজনা আনিতে সক্ষম হন, তাহাকে **নিয়ন্ত্রণের পরিধি** বলে। এই সংখ্যা কত হইবে তাহার প্রথম নির্দেশ দেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্রিটিশ সেনানায়ক জেনারেল স্যার ইয়ান হ্যামিলটন। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ব্যবস্থাপনাবিদ্ ও পরামর্শদাতা **ভি. এ. গ্রেকুনাস** (**V. A. Graicunas**) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রকাশিত **সংগঠনের সম্পর্ক** (Relations in Organisation) শীর্ষক প্রকাশনে নিয়ন্ত্রণের পরিধির বিষয়ে আলোচনা করেন। গ্রেকুনাস-এর মতে উচ্চস্তরে নিয়ন্ত্রণের পরিধি ৩ জন হইতে ৬ জন এবং নিম্নস্তরে ৬ জন হইতে ১৮ জন হওয়া উচিত। তাঁহার মতে উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক তিন প্রকার হইতে পারে। যেমন—

(১) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (Direct Relationship)
$= n$ [যেখানে, $n =$ অধস্তন কর্মীর সংখ্যা]

(২) দলীয় সম্পর্ক (Group Relationship) $= n\left(\frac{2^n}{2}-1\right)$

(৩) পারস্পরিক সম্পর্ক (Cross Relationship) $= n(n-1)$

গ্রেকুনাস মোট সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন :

$$N = n\left(\frac{2^n}{2}+n-1\right)$$ [যেখানে, $N =$ মোট সম্পর্ক এবং $n =$ অধস্তন কর্মীর সংখ্যা]

নিয়ন্ত্রণের পরিধি নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ (Factors of Span of Control) ঃ

নিয়ন্ত্রণের পরিধি নির্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয় :

(১) ব্যবস্থাপকের দক্ষতা, মনোভাব এবং ব্যবস্থাপনার ধরন বা ভঙ্গি ;

(২) অধস্তন কর্মচারিগণের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা ;

(৩) যে কাজ তত্ত্বাবধান করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি, জটিলতা ও গুরুত্ব ;

(৪) জ্ঞাতকরণের মাধ্যম ;

(৫) অনুপ্রাণিতকরণ ও মনোবলের মাত্রা ;

(৬) ব্যবস্থাপক ও তাঁহার অধস্তন কর্মীদের মধ্যে স্থানের ব্যবধান ও ভৌগোলিক নৈকট্য,

(৭) তত্ত্বাবধানের কাজে প্রদত্ত সময় ;

(৮) পরিকল্পনা, কর্তব্য ও দায়িত্বের নির্দিষ্টতা,

(৯) ভারার্পণের মাত্রা,

(১০) কর্মীদের সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা,

(১১) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা, ইত্যাদি।

সমালোচনা (Criticisms) :

গ্রেকুনাস এর সূত্রের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন—

(১) ইহা গণিতশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার গাণিতিক যথার্থতা সন্দেহাতীত নহে। কারণ ব্যক্তি-সম্পর্ক গাণিতিক সূত্র ধরিয়া গড়িয়া উঠে না।

(২) প্রত্যক্ষ দলগত সম্পর্ক বাস্তবে খুব কম দেখা যায়।

(৩) সম্পর্কের সংখ্যাই মূল সমস্যা নহে। অধস্তন কর্মচারিগণ যে মানসিক আঘাত ও চাপ (Shocks and Strain) সৃষ্টি করে ইহাই বিবেচনার বিষয়।

(৪) বৈধিক ও অবৈধিক কর্মচারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে এই সূত্র প্রয়োগযোগ্য নহে।

গ্রেকুনাস-এর সূত্র বিস্তৃত পরিধির জটিলতা ও অসুবিধা প্রকাশ করে এবং ব্যবস্থাপকের কাজে সুবিধা সৃষ্টি করে। ইহা ব্যবস্থাপকগণকে বিস্তৃত পরিধির অসুবিধার কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহার জ্ঞান থাকিলে একজন ব্যবস্থাপক ৩ জনের জায়গায় ৪ জন অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করিবার পূর্বে ইতস্ততঃ করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, ইহার ফলে মোট সম্পর্কের সংখ্যা ১৮ হইতে ৪৪-এ বৃদ্ধি পাইবে।

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ (Budgetary Control) :

সংজ্ঞা (Definition) : ইহা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার (Tool)। সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্নপ্রকার বিভাগীয় বাজেট ও সার্বিক বাজেট রূপায়ণের জন্য গৃহীত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে **বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ** বলে। বাজেট প্রস্তুতকরণ পরিকল্পনার অঙ্গ। ইহা প্রত্যাশিত কাজের মান স্থির করে। যখন বাজেটকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ বলে।

জর্জ টেরি (George Terry)-র মতে, "বাজেট নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার ফলাফল পরীক্ষা করা, বাজেটের সহিত উহার তুলনামূলক বিচার করা, সম্পাদিত কাজ অনুমোদন করা এবং কোন তারতম্য (Variance or Deviation) ঘটিলে উহা সংশোধন করিয়া বাজেটের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করা।"

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ (Essentials of Budgetary Control):

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:

১) পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বাজেট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইতে সরাসরি প্রবাহিত হইবে,

(২) সংগঠনের কাঠামো বাজেটের কার্যক্রম সম্পাদনের অনুকূল হইতে হইবে,

৩) বাজেটের পরিমাণগত ও গুণগত লক্ষ্যমাত্রা খুব বেশী বা খুব কম হওয়া উচিত নয়,

(৪) বাজেটের আয়ুষ্কাল সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন, মন্দা ও তেজী বাজেট প্রস্তুতের প্রয়োজন হইতে পারে,

(৫) বিভাগীয় ও আনুষঙ্গিক বাজেট প্রস্তুত করিয়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণকে বাজেটের তাৎপর্য অনুধাবন করাইতে হইবে, তাঁহাদের উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে এবং তাঁহাদের সার্বিক সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে,

৬) পরিস্থিতি ও ঘটনা পরিবর্তিত হইলে বাজেটও পরিবর্তন করিতে হইবে। পরিবর্তনশীলতা বাজেটের আবশ্যকীয় বিষয়,

(৭) কর্মসম্পাদনের প্রত্যেক পর্যায়ে বাজেটের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হবে।

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের সুবিধা (Advantages of Budgetary Control):

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

১) **কর্মসংযোজনার হাতিয়ার (Tool of Co-ordination):** বিভাগীয় বাজেটের সংযোজনের দ্বারা সার্বিক বাজেট (Master Budget) প্রস্তুত করা হয়। বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন ভিন্ন কাজগুলিকে সমন্বিত করে। ফলে সংযোজনার কাজে সুবিধা হয়।

(২) **ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি (Increase in Quality of Management):** ইহাতে অপব্যয় ও অপচয় হ্রাস পায়, সিদ্ধান্তগ্রহণ পরিপক্ব হয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তারতম্য সংশোধিত হয়। ইহা ব্যবস্থাপন প্রক্রিয়ায় উদ্দীপক বস্তু (Stimulus) হিসাবে কাজ করে।

(৩) **দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি (Development of Sense of Responsibility):** ইহা ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে। ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তাহার প্রয়োগে অধিকতর মনোযোগী হন।

(৪) **নির্দেশদানের সুবিধা (Facility of Direction):** বাজেটকে যখন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন ইহা নির্দেশদানের কাজে বিশেষ সুবিধাজনক হয়।

(৫) **স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা** (Self-Control System) : ইহাতে সর্বাঙ্গীণ ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাণগত ও গুণগত নিয়ন্ত্রণ উভয়ই সম্ভব হয়।

(৬) **কর্মিগণের অংশগ্রহণ** (Employees' Participation) : বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় কর্মিগণের মধ্যে বাজেট রূপায়ণের দায়িত্ব সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া কর্মিগণ বাজেট রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(৭) **পরিকল্পনার কাজে সুবিধা** (Facility in Planning) : বাজেট পরিকল্পনার অঙ্গ। বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ সুষম পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করে।

(৮) **আর্থিক ও কর্ম-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ** (Monetary and Activity Control) : বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণে আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত এবং কর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রদ হয়।

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা (Disadvantages of Budgetary Control) :

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের অসুবিধাগুলি হইল :

(১) অনেক ক্ষেত্রে বাজেট বিস্তৃত ও জটিলভাবে প্রণীত হয়। ইহাতে বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রদ হয় না।

(২) বাজেটে পূর্ববর্তী বৎসরের বরাদ্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে কর্মোন্নতি হয় না।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষগণ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ বিভাগীয় লক্ষ্য পূরণে বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। ইহাতে সংযোজনার কাজ ব্যাহত হয়।

বিভিন্ন প্রকার বাজেট (Different Types of Budget) :

বাজেট বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যেমন—

(১) **বিক্রয় বাজেট** (Sales Budget) : বিক্রয়ের পূর্বানুমান করিয়া বিক্রয় বাজেট প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। বিক্রয় বাজেট প্রাথমিক বাজেট, কারণ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়।

(২) **উৎপাদন বাজেট** (Production Budget) : যে বাজেটে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী স্থির করা হয়, তাহাকে উৎপাদন বাজেট বলে। ইহা বিক্রয় বাজেটের উপর নির্ভরশীল।

(৩) **মূলধন বাজেট** (Capital Budget) : কোন সময়ে কারবারে কত মূলধনের প্রয়োজন এবং উহার সংস্থানের উপায় মূলধন বাজেটে দেখান হয়।

(৪) **নগদ বাজেট** (Cash Budget) : সপ্তাহ অথবা মাসিক ভিত্তিতে কারবারের নগদ টাকার আয়-ব্যয় এবং দেনা-পাওনার পরিস্থিতি এই বাজেটে দেখান হয়।

(৫) **আয়-ব্যয়ের বাজেট** (Revenue and Expense Budget) : এই বাজেটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কারবারে মোট নামিক আয় এবং মোট নামিক ব্যয় কত হইবে তাহার পূর্বানুমান করা হয়।

(৬) **সার্বিক বাজেট** (Master Budget) : বিভাগীয় বাজেটগুলিকে সংযুক্ত করিয়া সার্বিক বাজেট প্রস্তুত করা হয়।

(৭) **স্থির বাজেট** (Fixed Budget) : কার্যমাত্রা পরিবর্তনে যে বাজেট পরিবর্তিত হয় না, তাহাকে স্থির বাজেট বলে। কেবলমাত্র কারবারী অবস্থার পরিবর্তন হইলে এইরূপ বাজেট পরিবর্তন করা হয়। ইহা স্থির ব্যয় যাহা উৎপাদনের পরিমাণের সহিত পরিবর্তিত হয় না, উহার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

(৮) **পরিবর্তনশীল বাজেট** (Flexible Budget) : ইহা বাজেট প্রস্তুতকরণের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া যাহাতে কাজের মাত্রার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাজেট পরিবর্তিত হয়। যখন বাজেট প্রস্তুত করা হয় তখনই কার্যমাত্রার পরিবর্তনের পরিধি অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে স্থির ব্যয়, অর্ধ-পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi-variable Cost) ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। এইরূপ বাজেট পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এবং বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ফলপ্রদ।

(৯) **শূন্য-ভিত্তিক বাজেট** (Zero-base Budget) : ইহা বাজেটের একটি নূতন ধারণা। ইহাতে চলতি কার্যাবলী এবং নূতন প্রকল্পের কার্যাবলীকে বাজেট প্রস্তাবে নূতনভাবে শূন্য-ভিত্তি ধরিয়া সন্নিবেশিত করা হয়। প্রচলিত বাজেটে চলতি বছরের বাজেটকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শূন্য-ভিত্তিক বাজেটে পূর্বতন অথবা চলতি বছরের প্রতিশ্রুতি আগামী বছরের বাজেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয় না। ইহাতে সকল প্রস্তাব যাহা 'সিদ্ধান্ত-মোড়ক' (Decision-packages) নামে অভিহিত হয়, ব্যয়-সুবিধার বিশ্লেষণের (Cost-benefit Analysis) মাধ্যমে বিচার করিয়া বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত বাজেট, কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। ৩-৪ বৎসরে একবার এইরূপ বাজেট প্রণয়ন করা উচিত।

ব্যবস্থাপনার অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের সহিত বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের সংযুক্তি (Integration of Budgetary Control with Other Management Controls) :

বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের সহিত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের কাজ নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন করা যায় :

(১) **উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি মনোযোগ** (Attention to Objectives and Principles) : উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উহারা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। বাজেটও পরিকল্পনার অঙ্গ। সুতরাং বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণকে অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে হইবে।

(২) **মূল বিষয় স্থিরীকরণ** (Determination of Key-factor) **:** কারবারের মূল বিষয়ের বাজেটকে ভিত্তি করিয়া অন্যান্য বিষয়ের বাজেট প্রস্তুত করিলে সংযুক্তির কাজে সুবিধা হয়।

(৩) **বাস্তব লক্ষ্য ও মান স্থিরীকরণ** (Determination of Realistic Targets and Standards) **:** কাজের লক্ষ্য ও কার্য সম্পাদনের মান যেন বাস্তবানুগ হয়। উহা না হইলে সংযুক্তির কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

(৪) **উপযুক্ত বাজেট-আয়ুষ্কাল** (Appropriate Budget-period) **:** বাজেটের আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ বা স্বল্প হওয়া উচিত নহে।

(৫) **পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় জ্ঞাতকরণ** (Communication of Planning Premises) **:** জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারিগণকে পরিকল্পনার বিষয় অবগত করাইতে হইবে।

(৬) **উপযুক্ত ভারার্পণ** (Appropriate Delegation) **:** বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণকে বাজেট রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য ও কর্তৃত্ব উপযুক্তভাবে বণ্টন করিতে হইবে।

(৭) **অনুপ্রাণিতকরণ** (Motivation) **:** উপযুক্ত অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পারিলে আদেশ ও নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। ইহাতে সংযুক্তির কাজে সুবিধা হয়।

(৮) **সংযোজনা** (Co-ordination) **:** বিভিন্ন বিষয় যেমন, ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের সহিত বাজেটমূলক নিয়ন্ত্রণের সংযুক্তিতে সংযোজনার গুরুত্ব অপরিসীম।

(৯) **নমনীয়তা** (Flexibility) **:** অভ্রান্ত বাজেট প্রস্তুত করা যায় না, কারণ বাজেট প্রণয়নে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং বাজেট নমনীয় হইতে হইবে। ইহাতে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হয়।

(১০) **বাজেট পুস্তিকা** (Budget Manual) **:** কর্মীদের মধ্যে বাজেট-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের জন্য নমনীয় বাজেট পুস্তিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

কৌশল (Strategy) : যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিলে পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় এবং বাধাবিঘ্ন ও প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করা যায়, তাহাকে কৌশল বা স্ট্রাটেজী (Strategy) বলে। স্ট্রাটেজী কথাটি সামরিক প্রশাসন হইতে আসিয়াছে। রণক্ষেত্রে সেনানায়ক রণকৌশল প্রস্তুত করিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং সেনাদলকে নির্দেশ দেন। কারবারী ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কৌশল গৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশগত মূল উপাদানগুলি বিবেচনা করিয়া কৌশল ঠিক করা হয়। সংকটপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করিলে উহা ফলপ্রসূ হয়। প্রতিরোধমূলক সংশোধন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কৌশল। খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া শুধুমাত্র **ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ** (Management by Exception) একটি কৌশল। কৌশল অবশ্যই পরিবর্তনশীল

(Flexible) হইতে হইবে। একই প্রকার কৌশল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফলপ্রদ হয় না।

* **সমভঙ্গ বিশ্লেষণ (Break-even Analysis):**

সংজ্ঞা (Definition): সমভঙ্গ বিশ্লেষণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া। ইহা প্রাথমিকভাবে স্থির-ব্যয়ের পরিবর্তন, পরিবর্তনশীল-ব্যয়ের পরিবর্তন, বিক্রয়-পরিমাণের পরিবর্তন, বিক্রয়-মূল্যের পরিবর্তন এবং বিক্রয় মিশ্রণের পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কিত। সমভঙ্গ বিশ্লেষণ উৎপাদন-ব্যয়, উৎপাদন-পরিমাণ, মুনাফা ও বিক্রয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে জানা যায় যে, বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইলে মোট ব্যয় পূরণ করা যায়। এই পরিমাণের বেশী বিক্রয় হইলে মুনাফা আরম্ভ হয়। যে পরিমাণ বিক্রয়ে লাভ বা লোকসান কিছুই হয় না, তাহাকে সমভঙ্গ বিশ্লেষণ বলে।

সমভঙ্গ বিন্দু (Break-even Point) হইল বিক্রয় পরিমাণের স্তর যেখানে আয় (Revenue) মোট ব্যয় (Total Cost)-এর সহিত একেবারে সমান। বিক্রয়ের পরিমাণ এই বিন্দুর নিম্নে নামিলে লোকসান এবং উপরে উঠিলে মুনাফা নির্দেশ করে।

সমভঙ্গ তালিকা (Break-even Chart) হইল এমন একটি তালিকা যাহা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসানের সম্ভাবনা প্রকাশ করে এবং এমন একটি বিন্দুর নির্দেশ করে, যে বিন্দুতে লাভ বা লোকসান কিছুই হয় না। এই তালিকায় বিক্রয় স্থির-ব্যয় ও পরিবর্তনশীল-ব্যয়ের পারস্পারিক ক্রিয়া (Interaction) নকশার মাধ্যমে দেখান হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর-ভিত্তিক বিক্রয়মূল্য, স্থির ও পরিবর্তনশীল ব্যয় এই নকশায় এমনভাবে দেখান হয় যে, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কত মুনাফা বা লোকসান হইল তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনটি সূত্র মনে রাখা প্রয়োজন। এই সূত্র তিনটি হইল:

১। লাভ পরিমাণ অনুপাত (Profit-Volume Ratio) $= \frac{S-V}{S}$

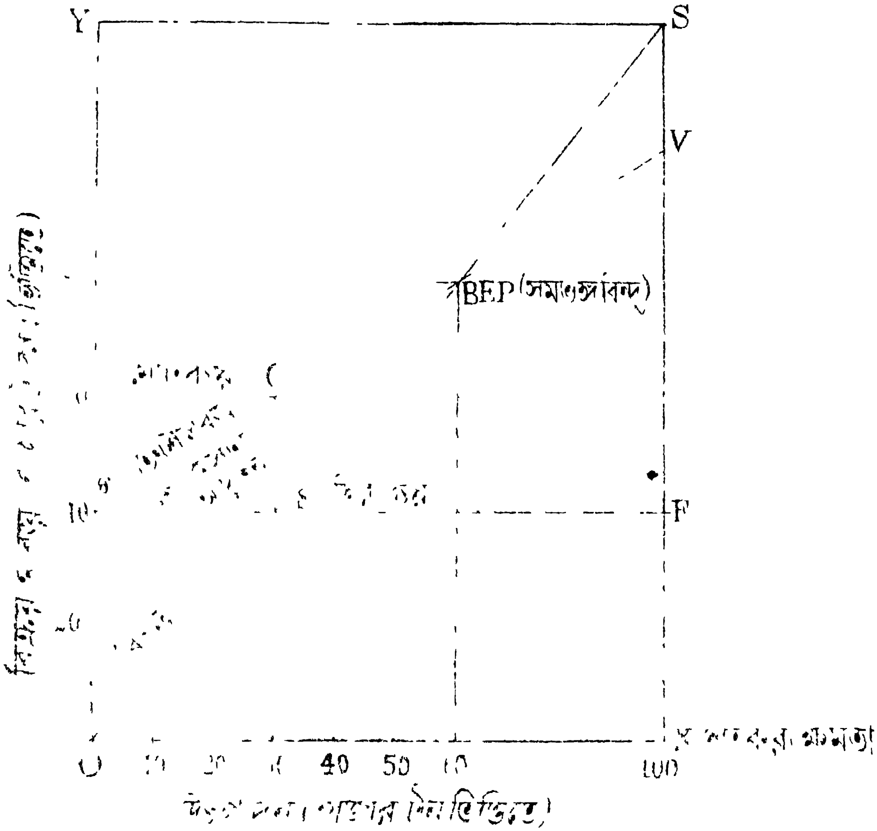
২। সমভঙ্গ বিন্দু (Break-even Point বা BEP) $= \frac{F}{\frac{S-V}{S}}$

৩। প্রান্তিক নিরাপত্তা (Marginal Safety) $= \frac{P}{\frac{S-V}{S}}$

যেখানে, S = বিক্রয় (Sales);
V = পরিবর্তনশীল-ব্যয় (Variable Cost),
F = স্থির-ব্যয় (Fixed Cost);
এবং P = লাভ বা মুনাফা (Profit)।

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত

উদাহরণ ঃ ধরা যাক, কারখানার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিলে উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৫০,০০০ টন। ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে OX-অক্ষরেখায় দেখান হইয়াছে। OY-অক্ষরেখায় মোট ব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেখান হইয়াছে। FC স্থির-ব্যয় রেখা, OS বিক্রয়লব্ধ অর্থ-রেখা, VC পরিবর্তনশীল-ব্যয় রেখা এবং BEP = সমভঙ্গ বিন্দু।



সমভঙ্গ বিশ্লেষণ রেখাচিত্র

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, কারখানার ৬০% ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া মোট ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৩০,০০০ টন উৎপাদন করিলে প্রতিষ্ঠানটি সমভঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছায়।

উপযোগিতা (Utilities) ঃ

১। সমভঙ্গ বিন্দু বিশ্লেষণ এবং সমভঙ্গ তালিকা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মোট ব্যয়, আয় এবং লাভ অথবা লোকসান এমনভাবে প্রকাশ করে যাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

(২) ইহা সার্বিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার কারণ ইহা ব্যয়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং লাভ অথবা লোকসানের সম্পর্ক দেখায়।

(৩) সমভঙ্গ বিশ্লেষণ স্থির-ব্যয় ও পরিবর্তনশীল-ব্যয়ের বিভাজন দেখায়। পরিবর্তনশীল-ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও স্থির-ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপনার তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সমালোচনা (Criticisms) :

১) সমভঙ্গ বিশ্লেষণ স্থির-ব্যয় ও পরিবর্তনশীল-ব্যয়ের সঠিক বিভাজনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে ইহাদের সঠিক বিভাজন সম্ভব হয় না। উপরন্তু, স্থির-ব্যয় উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে। ইহার পর উহা বাড়িতে থাকে।

(২) সমভঙ্গ বিন্দু স্থির বিন্দু থাকিতে পারে না। ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের পরিবর্তনে ইহা পরিবর্তিত হয়। বিক্রয়মূল্যের পরিবর্তন, দক্ষতার প্রক্রিয়াগত (Operating Efficiency) পরিবর্তন এবং উৎপাদন-মিশ্রণের (Product-mix) পরিবর্তনে এই বিন্দু স্থান পরিবর্তন করে।

*** বিনিয়োগ-আয় (Return on Investment or ROI) :**

সংজ্ঞা (Definition) : মুনাফা ও মূলধন বিনিয়োগের সম্পর্ককে বিনিয়োগ আয় বলে। আয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকিলে অধিক বিনিয়োগ হয়। প্রান্তিক মূলধন বিনিয়োগ প্রান্তিক মূলধনের দক্ষতা (MEC or Marginal Efficiency of Capital) ও সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। প্রান্তিক মূলধনের দক্ষতা বলিতে প্রান্তিক আয় বুঝায়। যখন আয়ের সম্ভাবনা কম থাকে তখন বিনিয়োগ কমিয়া যায়। সুতরাং আয় ও বিনিয়োগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

বিনিয়োগ-আয় নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম হাতিয়ার। বিক্রয় (Sales) বাদ বিক্রয়-ব্যয় (Cost of Sales) = নীট আয় (Net Earnings or E) এবং মোট বিনিয়োগ (Investment or I) = স্থির সম্পত্তি + চলতি সম্পত্তি।

$$\text{সুতরাং } ROI = \frac{E}{I} \times 100$$

ইহা অর্জিত মুনাফা এবং সেই মুনাফা অর্জনে যে মূলধন বিনিয়োজিত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করে। ইহা সাধারণতঃ শতকরা হিসাবে দেখান হয়।

$$ROI = \frac{\text{সুদ, কর ও মুনাফা বাদ দিবার পূর্বে নীট মুনাফা}}{\text{নীট স্থায়ী সম্পত্তি + চলতি মূলধন}} \times ১০০$$

$$\text{অথবা, } ROI = \frac{\text{সুদ বাদ দিবার পূর্বে কিন্তু কর বাদ দিবার পরে নীট মুনাফা}}{\text{নীট স্থায়ী সম্পত্তি + চলতি মূলধন}} \times ১০০$$

ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট—

$$ROI = \frac{\text{সুদ, কর এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বাদ দিবার পর নীট মুনাফা}}{\text{ইকুইটি মূলধন + সঞ্চিতি}} \times ১০০$$

* কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত

সহজভাবে বিনিয়োগ-আয়ের সূত্র হইল :

$$\text{ROI} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{মূলধন}} \times ১০০$$

অথবা

$$\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিক্রয়}} \times \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{মোট বিনিয়োগ}} \times ১০০$$

সুবিধা (Benefits) : এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় :

১) ইহাতে মূলধনের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়।

২) সম্পত্তির সহিত আয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইহা কারবারের দুর্বল স্থান নির্দেশ করে এবং উহা দূর করিবার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

৩) ইহা মুনাফাকে মূলধন বিনিয়োগের সহিত সম্পর্কিত করিয়া ব্যবস্থাপকগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে মুনাফামুখী করিয়া তোলে।

৪) ইহা নিয়ন্ত্রণের একটি একক [illegible] (T)।

৫) ইহা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যের মূল্যায়ন করে।

সমালোচনা (Criticisms) : কিন্তু বিনিয়োগ আয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া সকল ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং কারবারের [illegible] সম্পর্কে [illegible] করা [illegible] তাহার মূল্যায়ন করা যায় না। বিনিয়োগ-আয় [illegible] অর্থ [illegible] উপাদানের উপর জোর দেয় [illegible] কিন্তু আর্থিক নহে ([illegible] P[illegible]ion) [illegible] কারবারী সাফল্যের অন্যান্য উপাদান যেমন, কর্মচারীদের উন্নতি, [illegible], মানবিক সম্পর্ক, মনোবল, সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদি [illegible] করে না।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মী-ব্যবস্থাপনা ও শিল্প-সম্পর্ক
(Personnel Management and Industrial Relation)

কর্মী-ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে ? (What is Personnel Management ?) :

'ম্যানেজমেণ্ট' কথাটি ভাঙ্গিলে দাঁড়ায় ম্যানেজ (Manage) মেন (Men) ট্যাক্টফুলি (T)। অর্থাৎ, কৌশলের সহিত কর্মিগণকে পরিচালনা করার পদ্ধতি হইল ব্যবস্থাপনা। কর্মী-ব্যবস্থাপনা আচরণমূলক বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রের কর্মীদের কৌশলের সহিত পরিচালনা করা হয়। ইহা ব্যক্তি ও কাজের বিশদ বিবরণ দেয় (Men and Job specification)। লরেন্স অ্যাপ্‌লী (**Lawrence Appley**) মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনা হইল ব্যক্তি উন্নয়ন করা, বস্তু উপাদানগুলিকে নির্দেশদান করা নহে। কর্মীদের সম্ভাব্য কর্মশক্তিকে উদ্দীপিত করা এবং কারবারের সাফল্যের জন্য কর্মীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করাকে **কর্মী-ব্যবস্থাপনা** বলে। কর্মী-ব্যবস্থাপনার সহিত কর্মীদের অভাব-অভিযোগ দূর করা, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যমূলক শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিল্প-সম্পর্ক বলিতে কি বুঝায় ? (What is Industrial Relation ?) :

শ্রমিক ও মালিক, শ্রমিক সংঘ ও মালিক এবং শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ককে শিল্প সম্পর্ক বলে। বস্তুতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত সকলের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকে শিল্প-সম্পর্ক বলে। শিল্প-সম্পর্ক নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং শ্রমিক-মালিক সমঝোতা সৃষ্টি করে। ইহা কর্মী-ব্যবস্থাপনার অঙ্গ। উন্নত শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়, কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি পায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রীতিকর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Nature, Aims and Objects of Personnel Management) :

প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত মানব-সম্পদকে কার্যকরীভাবে কারবারের উদ্দেশ্যের সহিত সমন্বিত করাই কর্মী-ব্যবস্থাপনার প্রকৃতিগত দিক। কর্মীদের অন্বেষণ বা সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সংস্থাপন, বদলি, পদোন্নতি, মজুরি নির্ধারণ, শ্রমিক কল্যাণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা ইত্যাদি বিষয় লইয়া কর্মী-ব্যবস্থাপনা কাজ করে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এই সকল বিষয় কর্মীবিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষকে **কর্মী-ব্যবস্থাপক** (Personnel Managor) বলে।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার **প্রকৃতি** (Nature) হইল :

(১) কর্মী-ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বিভাগকে কর্মী-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সেবা, পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে।

(২) ইহা কর্মচারী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, সংস্থাপন, মজুরি ও বেতন-সংক্রান্ত বিষয়, শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়, শ্রমিক-কল্যাণ ও সেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ব্যাপৃত।

(৩) শ্রম-শক্তির উন্নয়ন ও পূর্ণ ব্যবহার করা কর্মী-ব্যবস্থাপনার অঙ্গ।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার **লক্ষ্যগুলি** (Aims) হইল :

(১) সাংগঠনিক উদ্দেশ্য পূরণ করিবার জন্য কর্মিগণকে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগে প্রেরণা সৃষ্টি করা যাহাতে মানব-সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় এবং ন্যূনতম ব্যয়ে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়।

(২) কর্মীদের অভাব-অভিযোগ যথাসম্ভব পূরণ করা ;

(৩) কর্মী-স্বার্থকে সাংগঠনিক স্বার্থের সহিত সমন্বিত করা

(৪) কর্মীদের কাজের উপযুক্ত তদারক করা ;

(৫) কর্মিগণের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা

(৬) কর্মিগণের সর্বোচ্চ সহযোগিতা আদায় করা ;

(৭) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করিয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও মনোবল বৃদ্ধি করা ;

(৮) কর্মীদের ব্যক্তিগত ও দলগত সন্তুষ্টিবিধানের মধ্য দিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মিদল (Cohesiveness) গড়িয়া তোলা ;

(৯) কর্মী-ব্যবস্থাপনাকে একদিকে প্রতিষ্ঠানের ও অন্যদিকে কর্মীদের প্রতিনিধি হিসাবে সংস্থাপন করা।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার **উদ্দেশ্যগুলি** (Objectives) হইল :

(১) প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা

(২) শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা ;

(৩) শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও বজায় রাখা

(৪) কর্মী উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা ;

(৫) শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার আচরণবিধি তৈয়ারী করা ও তাহার প্রয়োগ করা ;

(৬) সাংগঠনিক স্বার্থের সহিত কর্মী-স্বার্থের সমন্বয় করা।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Personnel Management)

ব্যবস্থাপনা সাতটি 'M' লইয়া কাজ করে। এই সাতটি 'M' হইল—**কর্মী** (Men), **কাঁচামাল** (Materials), কর্মপন্থা (Methods), **অর্থ** (Money), যন্ত্র (Machines), বাজার (Market) এবং ব্যবস্থাপনা (Management)। **এই সাতটি** বিষয়ের মধ্যে **কর্মী হইল** ব্যবস্থাপনার মানবিক উপকরণ (Human Input)। বাকী ছয়টি উপকরণ **অজৈব** (Inanimate) বা অমানবিক। কর্মী-ব্যবস্থাপনা শিল্প উৎপাদনে মানবিক দিকের

উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কর্মী-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হইল :

(১) ইহা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থল (Core)।

(২) ইহা ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত। উৎপাদন, বিপণন, আর্থিক ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই কর্মীর প্রয়োজন হয়। সেই কারণে কর্মী-ব্যবস্থাপনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

(৩) কর্মী-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র (Critical Area)। কারণ ইহা মানবিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিয়া কাম্য ফললাভের চেষ্টা করে।

(৪) ইহা কর্মী উন্নয়নের মাধ্যমে মানব-সম্পদের পরিবর্ধন (Enlargement) করে।

(৫) কর্মী-ব্যবস্থাপনা কর্মীর কর্মদক্ষতা, ইচ্ছাশক্তি, মনোবল, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে 'বিবেক রক্ষকের' দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

(৬) কর্মী-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে স্ফুলিঙ্গ (Spark) ও বেগবর্ধক শক্তি হিসাবে কাজ করিয়া ইহার কর্মপ্রবাহকে চালনা করে।

(৭) ইহা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য কর্মী অন্বেষণ বা সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ প্রশিক্ষণ, সংস্থাপন, মজুরি ও বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করিয়া মানব-সম্পদের কাম্য ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে।

(৮) কর্মী-ব্যবস্থাপনা কর্মীদের পরিচালন-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে।

(৯) ইহা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি ও ব্যষ্টি শক্তিকে অধিকতর কার্যকরী করে।

(১০) ইহা কর্মী ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করে এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করে।

(১১) বর্তমানে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। ইহা কর্মীদের সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও মনোবলের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। কর্মী-ব্যবস্থাপনা শ্রমশক্তি ও শ্রম-নৈপুণ্যের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া এই উদ্দেশ্য পূরণ করে।

(১২) হথর্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা (Hawthorne Experiments) মন্তব্য করে যে কর্মীদের মনোভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির দিকে নজর দিলে ব্যবস্থাপনার কাজ ফলপ্রসূ হয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে কর্মী-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অসীম।

(১৩) মানবিক সম্পর্কের মতবাদ (Human Relations Approach) মনে করে যে, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। এই মতবাদ কর্মীকে অনুপ্রাণিতকরণ ও কর্মীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর আলোকসম্পাত করে। অর্থাৎ কর্মীদের কাজে মনোনিবেশ করিবার উপযুক্ত প্রবণতা সৃষ্টির উপর ইহা গুরুত্ব দেয়। সৃজনধর্মী কর্মী-ব্যবস্থাপনাকে মানবিক সম্পর্ক উন্নত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

(১৪) **ব্লেক এবং মাউটন (Blake and Mouton)**-এর মতে, ব্যবস্থাপনাকে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উৎপাদন এবং কর্মী উভয় বিষয়ের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। তাঁহারা এই প্রকার ব্যবস্থাপনার ধরন বা ভঙ্গিকে (Style) ৯, ৯ ব্যবস্থাপনার ধরন (9, 9 Management Style) বা **দল-ব্যবস্থাপনা** (Team Management) আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে কর্মী-ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কর্মী-ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (Functions of Personnel Management) ঃ

পিটার ড্রাকার (Peter Drucker)-এর মতে, কর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজ হইল কর্মী এবং কর্মকে পরিচালনা করা। কর্মী-ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর প্রথম পদক্ষেপ হইল **কর্ম নির্ধারণ** (Job Specification) করা এবং **ব্যক্তি নির্দেশ** (Man Specification) করা। উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা কর্মী-ব্যবস্থাপনার নীতি। কর্মী-ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক। ইহা আচরণমূলকও বটে। প্রধান কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) **জনশক্তি পরিকল্পনা** (Manpower Planning) ঃ কর্মী-ব্যবস্থাপনা কি ধরনের কর্মী এবং কত সংখ্যক কর্মী কখন প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ধারণ করে। কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে জনশক্তি পরিকল্পনা করা হয়। কর্মীর মৃত্যু, অবসরগ্রহণ, বিদায়গ্রহণ, কারবার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া জনশক্তি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

(২) **কর্মী নিয়োগ** (Employment) ঃ কর্মী-ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হইল বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করা যেমন, শ্রমিক, করণিক, কর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদি। ইহা কর্মী নিয়োগের পূর্বে কার্য বিশ্লেষণ (Job Analysis) করে। ইহার পর ঐ কাজে কিরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়া কর্মী সরবরাহ কেন্দ্র (Employment Exchange), সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করে। আবেদনকারিগণের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, বিভিন্ন-প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাক্ষাৎকরণের মাধ্যমে আবেদনকারীর যোগ্যতা যাচাই করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ইত্যাদি কর্মী বিভাগের কাজ। কর্মী-ব্যবস্থাপনা সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করে।

(৩) **প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন** (Training and Development) ঃ কর্মীদের প্রবেশন (Induction) এবং প্রশিক্ষণ (Training) দেওয়া কর্মী বিভাগের কাজ। ইহা কর্মিগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাহিরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় এই বিভাগ কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা সকল স্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন—শিক্ষানবিশীদের প্রশিক্ষণ, নূতন কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ।

(৪) **মজুরি ও বেতন প্রশাসন** (Wage and Salary Administration): কাজের মূল্যায়ন (Job Evaluation) ও গুণগত মান নির্ণয়ের মাধ্যমে বেতন ও মজুরী কাঠামো স্থির করা এই বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। কর্মীদের শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশেষ পারদর্শিতা, পদমর্যাদা এবং কার্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া মজুরি ও বেতনহারের কাঠামো স্থির করা হয়। উপযুক্ত মজুরি ও বেতন পাইলে তবেই কর্মী কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। মজুরি প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবে, সেইটিই নিরূপণ করিতে হইবে। মজুরি তালিকা প্রণয়ন এবং মজুরি ও বেতন-সংক্রান্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব কর্মী-ব্যবস্থাপনার উপর ন্যস্ত হয়।

(৫) **সংস্থাপন** (Placement): প্রশিক্ষণের পর কর্মীর যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত পদে সংস্থাপন করা হয়। বৃত্তি পরীক্ষা (Trade test) এবং কর্মীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত কাজে কর্মীকে নিয়োগ করিতে হয়। প্রাথমিকভাবে 'পরীক্ষা ও ত্রুটি' (Trial and Error)-র ভিত্তিতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কর্মীদের কার্য সম্পাদনের মূল্যায়ন সম্পর্কিত নথিরক্ষণের মাধ্যমে তাহাদের কার্যকলাপ অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত পদে কর্মী সংস্থাপন করিতে হয়। সংস্থাপনের জন্য কর্মীর বুদ্ধি, দক্ষতা, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

(৬) **পদোন্নতি** (Promotion): উচ্চ পর্যায়ের পদে বর্তমান কর্মীকে উন্নীত করাকে পদোন্নতি বলে। অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আবার অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি করা হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতি করিলে পুরাতন কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের আনুগত্য ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহাতে যোগ্যতার প্রতি অবিচার হইতে পারে। যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির নীতি গৃহীত হইলে দক্ষতার প্রতি সুবিচার করা হয়, কিন্তু ইহাতে অভিজ্ঞতার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। ইহাতে পুরাতন কর্মীর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সেই কারণে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার করিয়া কর্মী ব্যবস্থাপনাকে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

(৭) **বদলি, বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা ও ছাঁটাই** (Transfer, Lay off and Retrenchment): কর্মীদের কর্মে বৈচিত্র্য ও উৎসাহ সৃষ্টি করিবার জন্য এবং উন্নত কার্যসম্পাদনের জন্য এই বিভাগ কর্মীদের এক কাজ হইতে অন্য কাজে বদলি করে। অনেক সময় কাজের অভাবে অথবা কাঁচামালের অভাবে অথবা শক্তি-সম্পদের অভাবের কারণে এই বিভাগকে কিছু কর্মীকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছুদিনের জন্য কর্মহীন করিতে হয়। আবার অনেক সময় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইহাকে কর্মী ছাঁটাই-এর মত অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

(৮) **কর্মীদের কাজের নথিরক্ষণ** (Employees' Service Records): প্রত্যেক কর্মীর জন্য এই বিভাগকে পৃথক পৃথক নথি রাখিতে হয়। ইহাতে কর্মীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও ঘটনা সন্নিবেশিত থাকে। ইহাকে 'চাকুরির বই' (Service

Book) বলা হয়। কর্মীর চাকুরিগত তথ্যাদি, দক্ষতা ইত্যাদি ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(৯) **অনুপ্রাণিতকরণ ও মনোবল উন্নয়ন** (Motivation and Morale Development) : কর্মী-ব্যবস্থাপনা কর্মিগণকে অনুপ্রাণিতকরণ ও তাহাদের মনোবল উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগকে উপযুক্ত পরামর্শ, নির্দেশ ও সেবা প্রদান করে। ইহাতে কর্মীদের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(১০) **শ্রমিক কল্যাণ** (Labour Welfare) : শ্রমিক কল্যাণ বলিতে বুঝায় এমন কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করা, যাহাতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মসন্তুষ্টি আনা সম্ভব হয়। শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাগুলি হইল : উপযুক্ত বিশ্রাম ও বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বীমা, অধিবৃত্তি (Bonus), ভবিষ্যনিধি (Provident Fund), অবসরভাতা, আনুতোষিক (Gratuity) স্বল্পমূল্যের ক্যান্টিন ব্যবস্থা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, চিত্ত-বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সকল শ্রমিককল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজ। ইহাতে কর্মীদের দক্ষতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

(১১) **কর্ম পরিবেশ** (Work Environment) : হথর্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার (Hawthorne Experiments) পর ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, কর্মীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত কর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করা কর্মী-ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।

(১২) **কর্মী ক্ষতিপূরণ** (Employee Compensation) : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করিবার জন্য কর্মিগণের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও অবদানের জন্য তাহাদের উপযুক্ত এবং ন্যায্যভাবে পুরস্কৃত করাকে কর্মী ক্ষতিপূরণ বলে। কারবারের উন্নতির জন্য শ্রমিক পরিশ্রম করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তির অবক্ষয় ঘটায়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য কর্মীকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা কর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজ। শুধুমাত্র বেতন ও ভাতা প্রদান করিলেই কর্মী ক্ষতিপূরণের কাজ শেষ হয় না। বৃহত্তর অর্থে কর্মী ক্ষতিপূরণের তাৎপর্য হইতেছে কর্মীর কর্ম পরিবর্ধন বা বিস্তারকরণ (Job Enlargement) করা এবং কর্ম সমৃদ্ধকরণ (Job Enrichment) করা। ইহা ছাড়া কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা-জনিত কারণে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি হইলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করাও কর্মী ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(১৩) **শ্রমিক-সম্পর্ক ও শিল্প-শান্তি** (Labour Relations and Industrial Peace) : কর্মী ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হইল প্রতিষ্ঠানের শ্রমনীতি ব্যাখ্যা করা এবং উহা প্রকাশ করা, শ্রমিক সংঘের সহিত দ্বি-পাক্ষিক কর্মচুক্তি ও আলাপ-আলোচনা করা, কর্মীদের অভাব-অভিযোগ অনুসন্ধান করিয়া উহা দূর করা, বিরোধের মীমাংসা করা এবং কর্মী-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া ধর্মঘট এড়ানো এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখা কর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজ।

(১৪) **যৌথ বোঝাপড়া** (Collective Bargaining): **কর্মী-ব্যবস্থাপনার** আর একটি কাজ হইল দুই হইতে পাঁচ বৎসরের কার্যকারিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সংঘের যৌথ বোঝাপড়ায় দ্বি-পাক্ষিক কর্মচুক্তি সম্পাদন করা। মজুরি, বোনাস, আনুষঙ্গিক আর্থিক সুবিধা, উৎপাদন শৃঙ্খলা, শাস্তিবিধান, শিল্পবিরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এই চুক্তি শিল্প-শান্তি বজায় ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় সাহায্য করে।

(১৫) **শিল্প আইন ও প্রশাসন** (Industrial Laws and Administration): কারখানা আইন, শ্রমিক বিরোধ আইন, কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, মজুরিপ্রদান আইন, বোনাস আইন, গ্র্যাচুইটি আইন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা ভবিষ্যনিধি আইন ইত্যাদির বিধি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা এবং সরকারের নিকট বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন পেশ করাও কর্মী-ব্যবস্থাপনার কাজ।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা (Manpower Planning)

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা কাহাকে বলে? (What is Manpower Planning?):

কি ধরনের এবং কত সংখ্যক কর্মী কখন প্রয়োজন হইবে, কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে বিচক্ষণতার সহিত তাহার পূর্বানুমান করাকে **মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা** বলে। কর্মীদের যোগ্যতা যাচাই করিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করাও মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ ও কর্মী মূল্যায়ন করিয়া কর্মীদের মধ্যে যে অসঙ্গতি প্রকাশ পায় তাহা দূর করিবার উপযুক্ত পন্থা নির্দেশ করা মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার কাজ। প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা, তাহাদের কাজ, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর প্রয়োজন, কর্মী উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কোন বিভাগে কর্মীর অভাব আছে, কোন্ বিভাগে উদ্বৃত্ত কর্মী আছে, বর্তমান সংগঠন ও কর্মপন্থা কি তাহা পর্যবেক্ষণ করাই মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন হইতে পারে:

(১) **স্বল্পকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা** (**Short-term Manpower Planning**): এইরূপ পরিকল্পনায় কর্মরত কর্মিগণকে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে যে কর্মী যে কাজে উপযুক্ত তাহা নিরূপণ করিয়া তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করিবার পরিকল্পনা করা হয় এবং নূতন কর্মীর যোগ্যতা বিচার করিয়া তাহাকে উপযুক্ত কাজে সংস্থাপন করা হয়। ইহাতে তিনটি কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। যেমন—

(ক) **কাজের পরিবর্তন** (Change of Job): ইহাতে সংগঠনের কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে কর্মীকে একটি পদ হইতে সরাইয়া অন্য পদে লইয়া যাওয়া হয় অথবা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয় অথবা স্বল্প-দক্ষ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

(খ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (Training Arrangement): এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কর্মীকে দিয়া যেরূপ কাজ করাইতে চায় তাহা পাইবার জন্য উপযুক্ত কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

(গ) কর্মী অপসারণ (Removal of Incumbent): এই পদ্ধতিতে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কর্মী উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারে তবে তাহাকে অপসারণ করিয়া নূতন কর্মী নিযুক্ত করা হয়।

যে সকল বিষয়ের উপর উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি নির্ভর করে সেইগুলি হইল:

(ক) বিভিন্ন কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক,

(খ) প্রশিক্ষণ পাইলে কর্মী যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে কিনা,

(গ) একজন কর্মীর বদলে অন্য কর্মী পাওয়া যাইবে কিনা,

(ঘ) কর্মীর কাজের সময়কাল কতদিন,

(ঙ) উন্নততর দক্ষতা কার্যসম্পাদনে খুবই জরুরী কিনা,

(চ) একজন কর্মীর অপসারণে যে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা কর্মীদের মনোবলের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, ইত্যাদি।

(২) দীর্ঘকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা (**Long-term Manpower Planning**): এইপ্রকার পরিকল্পনা একসঙ্গে সকল শ্রেণীর কর্মীদের কেন্দ্র করিয়া রচিত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন কাজ ও সেই সকল কাজে উপযুক্ত কর্মী নিযুক্ত করিতে হইলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করাই এইরূপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করিতে হয়:

(ক) কর্মী-সংখ্যা স্থিরীকরণ (Determination of Number of Employees): ভবিষ্যৎ কাজের চাপ অনুসারে সংগঠনের কাঠামো ও জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা স্থির করা এইরূপ পরিকল্পনার একটি বিশেষ দিক। পরিবর্তিত অবস্থায় পণ্যের পরিবর্তন, উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন, নূতন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, বিক্রয়-পদ্ধতির পরিবর্তন, বিজ্ঞাপন-পদ্ধতির পরিবর্তন ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হয়। ভবিষ্যতে কত কর্মী নিযুক্ত করিতে হইবে এবং উহাদের যোগ্যতা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা বিচক্ষণতার সহিত স্থির করিয়া পাঁচ হইতে দশ বৎসরের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করিতে হয়।

(খ) কর্মের সহিত কর্মীর সামঞ্জস্য (Consistency of Employees with Job): ভবিষ্যতে কাজের প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্তিত হইবে এবং কর্মীর কিরূপ দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হইবে বিচক্ষণতার সহিত তাহা স্থির করিয়া কাজ ও কর্মীর তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। বর্তমান কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়া তাহাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে সংস্থাপন করা যায় অথবা বদলি বা পদোন্নতির মাধ্যমেও এইরূপ অভাব পূরণ করা যায়।

(গ) কর্মী-উন্নয়ন পরিকল্পনা (Employee-development Plan): ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি হইল 'সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজে নিযুক্ত করা।' কোন্

কর্মী কোন্ কাজের যোগ্য তাহা স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। যদি কোন কর্মীর উপযুক্ত যোগ্যতার অভাব থাকে তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাহাকে উন্নত করিতে হয়।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া (Process of Manpower Planning) : মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া কারবারের আকার, প্রকৃতি, দর্শন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াগুলি হইল :

(১) **সংগঠনের পরিবেশ বিশ্লেষণ** (Analysis of Organisational Environment) : কারবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ যেমন, প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও উহার চাহিদা, কারবারের আর্থিক অবস্থা, প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, কারবারের বর্তমান ও অতীত কার্যকলাপ ইত্যাদির মূল্যায়ন করিয়া মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা করিতে হইবে।

(২) **পূর্বানুমান** (Forecasting) : উপরোক্ত তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে কারবার সম্প্রসারণ করা হইবে, না সংকোচন করা হইবে তাহার পূর্বানুমান করিতে হয়।

(৩) **সাংগঠনিক কাঠামো স্থিরীকরণ** (Determination of Organisational Structure) : ভবিষ্যতে কি ধরনের এবং কত কর্মীর প্রয়োজন হইবে, কত পুরুষ ও কত মহিলা কর্মীর প্রয়োজন হইবে, তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার স্তর কি হইবে ইত্যাদি বিষয় পূর্বানুমান করিয়া সংগঠনের কাঠামো স্থির করিতে হইবে।

(৪) **মনুষ্যশক্তির তালিকা** (Manpower Inventory) : বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে কত দক্ষ শ্রমিক, অদক্ষ শ্রমিক, করণিক, কারিগর, ব্যবস্থাপক, গবেষক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। মোট কর্মীর চাহিদার পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মী তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

(৫) **কর্মী অপচয়** (Employee Attrition) : মৃত্যু, বিদায় গ্রহণ, অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কারণের জন্য কতজন কর্মীর অপচয় হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে।

(৬) **চাহিদা ও যোগানের তুলনা** (Comparison of Demand with Supply) : কর্মী চাহিদা অনুমান করিয়া কর্মীর যোগান অনুমান করিতে হইবে এবং ইহাদের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কিনা।

(৭) **উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ** (Determination of Objectives) : এই পর্যায়ে স্থির করা হয় যে, নূতন কর্মী নিয়োগ করিতে হইবে কিনা, প্রশিক্ষণ কখন শুরু করিতে হইবে, উদ্বৃত্ত কর্মী ছাঁটাই করা হইবে কিনা ইত্যাদি।

(৮) **কার্যসূচী** (Programme) : উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিবার জন্য একটি বিশদ কার্যসূচী প্রণয়ন করিতে হয়।

(৯) **কর্মী নথিকরণ** (Employee Recording) : কর্মী সংখ্যা ও কর্মী সংগঠনের পরিবর্তন নথিভুক্ত করিয়া রাখিতে হয় যাহাতে এই নথি দেখিয়া কার্যসূচীকে রূপায়িত করা যায়।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার সুবিধা (Advantages of Manpower Planning) ঃ

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে ভবিষ্যতে কত এবং কি ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হইবে তাহা জানা যায়।

(২) ইহা ভবিষ্যতে কর্মী সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলিয়া কোন সময় উপযুক্ত কর্মীর অভাব হয় না।

(৩) ইহা বর্তমানের মনুষ্যশক্তি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করে।

(৪) ইহা সংগঠনের কাঠামোকে কার্যোপযোগী করিয়া পুনর্বিন্যাস করে

(৫) ইহাতে কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ইহা কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

(৬) ইহা মানব-সম্পদের পরিকল্পনা করে বলিয়া মানব-সম্পদের অপচয় বন্ধ হয়।

(৭) ইহা কর্মীর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

(৮) ইহাতে কর্মী উন্নয়ন (Employee Development) সম্ভব হয়।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার অসুবিধা (Drawbacks of Manpower Planning) ঃ

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয়। ভবিষ্যতে ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তিত হইলে ইহা ফলপ্রসূ হয় না।

(২) ইহাতে কর্মী অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কারণ অদক্ষ কর্মী অথবা উদ্বৃত্ত কর্মী ছাঁটাই করিলে কর্মীদের দিক হইতে প্রবল বাধা আসিতে পারে।

(৩) ইহা শুধু বৃহৎ কারবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৪) ইহা ব্যয়-বহুল পদ্ধতি।

(৫) ইহাতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

প্রবেশন, নির্বাচন নিয়োগ ও সংস্থাপন (Recruitment, Selection, Appointment and Placement) ঃ

প্রবেশন (Recruitment) ঃ কর্মী সংগ্রহ করাকে প্রবেশন বলে। প্রবেশন বলিতে বুঝায় চাকুরীর সুযোগ জনসাধারণকে অবগত করা যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ঐ সুযোগ গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারে। প্রথমে **মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা** করিয়া, কোথায় কত কর্মী, কোন সময়-সীমার মধ্যে নিযুক্ত করিতে হইবে তাহা ঠিক করা হয়। ইহা নির্ভর করে (ক) উৎপাদনের হার, (খ) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ এবং (গ) কর্মপদ্ধতির উপর।

ইহার পর **কর্ম-বিশ্লেষণ** (Job Analysis) ও **কর্ম-বর্ণনা** (Job Description) করিতে হয়। কর্ম-বিশ্লেষণে বিভিন্ন কাজের জন্য কিরূপ কর্মীর প্রয়োজন, তাহাদের

যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা থাকে। কর্ম-বর্ণনায় অর্থাৎ কর্ম-বিবরণে কর্মীর কাজ, তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব, কর্মস্থল, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কর্ম পরিবেশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কাজের সময়, পদোন্নতির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে।

ইহার পর কর্মী সংগ্রহ বা প্রবেশনের উৎস স্থির করিতে হয়। প্রবেশনের দুইটি উৎস আছে—(১) অভ্যন্তরীণ ও (২) বাহ্যিক।

অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources) : প্রতিষ্ঠানের ভিতর হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদে নিয়োগ করা হইলে যে বিভাগে কর্মীর প্রয়োজন সেই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাযের বিবরণসহ কর্মী নিয়োগের অধিযাচন পত্র (Requisition) কর্মী বিভাগের নিকট পেশ করিলে প্রবেশনের কাজ আরম্ভ হয়। ইহাকে অভ্যন্তরীণ উৎস বলে। ইহাতে কর্মীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় কর্মীদের উৎসাহ, আগ্রহ ও মনোবল (Morale) বৃদ্ধি পায়।

বাহ্যিক উৎস (External Sources) : এই পদ্ধতিতে বাহিরের লোক শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়। বাহ্যিক উৎস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে **সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন** দিয়া আবেদনপত্র চাওয়া হয় এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়। কারখানার গেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া অথবা কর্মরত কর্মীদের সুপারিশ অনুসারেও প্রত্যক্ষ প্রবেশন হইতে পারে। পরোক্ষ পদ্ধতিতে নিয়োগ সংস্থা (Employment Exchange), শ্রমিক ঠিকাদার, শ্রমিক সঙ্ঘ, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরামর্শদানকারী সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী প্রত্যক্ষ প্রবেশনের মাধ্যমে এবং অদক্ষ কর্মী পরোক্ষ প্রবেশনের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

নির্বাচন (Selection) :

আবেদনকারীদের মধ্য হইতে যাহাদের নূতন কাজে সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাদের বাছাই করাকে নির্বাচন বলে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবার জন্য সুষ্ঠু এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন নীতি ও পদ্ধতি স্থির করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে কর্মচারিগণের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের কোন অগ্রাধিকার থাকিবে কিনা তাহাও নীতি হিসাবে স্থির করিতে হইবে। বৃত্তিমূলক নির্বাচনে চাকুরীর প্রয়োজনীয় দিক এবং কর্মীর যোগ্যতার মান যাচাই করিতে হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মী নির্বাচনে শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্ব, উদ্যোগ, ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যাচাই করিবার প্রয়োজন হয়। নির্বাচন পদ্ধতি ছয়টি পর্যায়ে আলোচনা করা যাইতে পারে—

(ক) **আবেদনপত্র** (Application) : কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রার্থীকে তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স, গুণাবলী ইত্যাদি বিষয় নির্ধারিত আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া কর্মী বিভাগে জমা দিতে হয়।

(খ) লিখিত পরীক্ষা (Written Test) : আবেদনপত্র গুণাবলী অনুযায়ী বাছাই করিয়া লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী দেওয়া হয় এবং সকল আবেদনকারী একই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

(গ) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal Interview) : যে সকল আবেদনকারী লিখিত পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়। একটি সুনির্বাচিত নির্বাচকমণ্ডলী এইসকল আবেদনকারীর যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখেন। ব্যবস্থাপক-কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাতে প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলী জানা সম্ভব হয়।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological Test) : ইহাতে বুদ্ধির পরীক্ষা (IQ Test or Intelligence Quotient Test), কর্মপ্রবণতা পরীক্ষা (Aptitude Test), কর্ম-আগ্রহ পরীক্ষা (Trade Test), ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা (Personality Test) ইত্যাদি করা হয়। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী ও ব্যবস্থাপক কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ঙ) নির্দিষ্ট কাজে পরীক্ষা (On-the-job Test) : কোন কোন কাজে নির্বাচনের পূর্বে কর্মপ্রার্থীর কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব যাচাই করিতে হয়। এই কারণে নির্দিষ্ট কাজে তাহাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রার্থীকে ঐ কাজে নির্বাচন করা হয়।

(চ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Medical Test) : নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে যে যে প্রার্থীকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হয় তাহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ডাকা হয়। কর্ম-বিশ্লেষণে দৈহিক ও মানসিক শক্তির মান নির্দেশ করা থাকে। সেই অনুযায়ী তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দেহের ওজন, দৈর্ঘ্য, দৃষ্টিশক্তি, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিরীক্ষা করা স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

নিয়োগ (Appointment) : নিয়োগ বলিতে বুঝায় নির্বাচিত আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানে কাজের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হইলে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র (Appointment Letter) দেওয়া হয়। নিয়োগপত্রে পদের নাম, কাজের বিবরণ, দায়িত্ব, বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা, কর্মস্থল, কাজের সময় ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মনোনীত প্রার্থী ঐ প্রস্তাবের স্বীকৃতি জানাইলে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হয়।

সংস্থাপন (Placement) : সংস্থাপন বলিতে বুঝায় কর্মীকে কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলা। ইহা পরীক্ষামূলক বিষয়। নূতন কর্মীকে ৩ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাধীন (Probation) থাকিতে হইতে পারে। নূতন কর্মী কর্ম পরিবেশের সহিত কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে তাহা সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। কর্মীকে উপযুক্ত পদে সংস্থাপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

(ক) **কর্ম বিশ্লেষণ** (Job Analysis): ইহাতে কাজের প্রকৃতি, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, কাজের অবস্থা, পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়।

(খ) **কর্ম-বর্ণনা বা কাজের শ্রেণীবিভাগ** (Job Description or Job Classification): ইহাতে কাজের বিশদ শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণনা থাকে। কাজের মান নির্ধারণ কর্ম-বর্ণনার মাধ্যমে করা হয়।

(গ) **কর্ম মুল্যায়ন** (Job Evaluation): ইহাতে কাজের স্তর ও মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কাজের প্রকৃতি, গুরুত্ব, শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ববোধ, মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্ম মূল্যায়ন করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী উহার মূল্য স্থির করা এবং সুষম মজুরির হার বা বেতন-ক্রম স্থির করা।

(ঘ) **গুণ নির্ণয় বা ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন** (Merit Rating): কর্মী সংস্থাপনের পরবর্তী পর্যায় হইল কর্মীর ব্যক্তিগত গুণ নির্ণয়। পদ্ধতিগতভাবে একই প্রতিষ্ঠানে একই প্রকার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীর কর্ম সম্পাদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণকে গুণ নির্ণয় বলে। কর্মীর ব্যক্তিগত গুণের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় বিবেচ্য: (ক) কর্মীর কাজের গুণগত মান, (খ) কর্মীর কাঁচামাল অপচয়ের পরিমাণ এবং (গ) কর্মীর কর্মসম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতি। গুণ নির্ণয় সংস্থাপনের কাজে ত্রুটির নির্দেশ করে। ইহা একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি। ত্রুটি ধরা পড়িলে উহার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। গুণ নির্ণয় পদোন্নতি, বদলি, বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা (Lay Off) ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মী ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নে কর্মীর স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে স্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন (Training and Development):

সংজ্ঞা (Definition):

এফ. এ. হ্যাল্‌সী (F. A. Halsey)-র মতে, প্রশিক্ষণ হইল কর্মচারিগণকে কাজে আগ্রহশীল করিবার এবং উত্তমরূপে কর্মসম্পাদনে তাহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ কর্মীর কাজে ইচ্ছা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও উন্নতি বৃদ্ধির হাতিয়ার।

প্রশিক্ষণের সুফল (Benefits of Training): কর্মীকে উপযুক্ত করিবার জন্য ও তাহার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়:

(১) প্রশিক্ষণে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;

(২) ইহাতে পরিচালন-ব্যয় হ্রাস পায়।

(৩) ইহাতে যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার উন্নত হয়;

(৪) ইহাতে কাঁচামালের অপচয় হ্রাস পায় ,
(৫) প্রশিক্ষণ পণ্য উৎপাদনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে ,
(৬) ইহাতে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ,
(৭) প্রশিক্ষণের ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীর আনুগত্য বৃদ্ধি পায় ,
(৮) প্রশিক্ষণে কর্মিগণের কর্ম-সন্তুষ্টি (Job Satisfaction) আসে ,
(৯) ইহাতে কর্মীদের মনোবল (Morale) বৃদ্ধি পায় ,
(১০) ইহা কর্মী আবর্তন (Labour Turnover) ও কাজে অনুপস্থিতি হ্রাস করে ,
(১১) ইহাতে প্রত্যেকটি কাজের নির্দিষ্ট মান নিরূপণ করা সম্ভব হয় ,
(১২) প্রশিক্ষণ পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে ,
(১৩) ইহাতে দুর্ঘটনা হ্রাস পায় ;
(১৪) প্রশিক্ষণের ফলে নির্দেশদান ও অবেক্ষণের কাজ সহজ হয় ,
(১৫) প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে বলিয়া শ্রমিকের মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Training) : ব্যবস্থাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি উন্নয়ন করা। একদিকে যেমন শ্রমিক কর্মীর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যবস্থাপক-কর্মী প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন আছে। •

প্রশিক্ষণ প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে –(১) শিল্পের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (Training Within the Industry or TWI)—ইহা আবার তিন প্রকারের : (ক) উপদেশাত্মক প্রশিক্ষণ, (খ) পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ এবং (গ) কর্ম-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

(২) শিল্পের বাহিরে প্রশিক্ষণ (Training Outside the Industry or TOI)।

শ্রমিক ও কর্মীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Workers' and Employees' Training Methods) :

শ্রমিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় :

(১) **নির্দিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ** (On-the-Job Training) : সকল প্রকার শিক্ষার্থী কর্মীকে কোন কর্ম-প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। ইহাতে ঐ কাজ সম্পর্কে তাহার সম্যক জ্ঞান হয়। কিন্তু ইহাতে অন্য কর্মীদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং কর্মপ্রবাহে বাধা আসে।

(২) **বাস্তবধর্মী বা উপপ্রকোষ্ঠ প্রশিক্ষণ** (Vestibule Training) : ইহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া একটি বিশেষ বাস্তবধর্মী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একজন অভিজ্ঞ কর্ম-প্রশিক্ষকের দ্বারা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে বিভাগীয় কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না এবং কর্মের গতিপ্রবাহ অটুট থাকে। কিন্তু এই প্রথা ব্যয়-বহুল।

(৩) **শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ** (Apprentice Training) ঃ ইহাতে তত্ত্বগত শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বা বাহিরের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের (Practical Training) ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে দুই হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ চলিতে পারে। শিক্ষার্থীকে মাসে মাসে ভাতা (Allowance) প্রদান করা হয়।

(৪) **বাহ্যিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র** (External Training Centres) : বাহিরের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাহারা পেশাগত ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে শিক্ষাদান করে তাহাদের সহিত চুক্তি করিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে তত্ত্বগত শিক্ষাদান ও অন্যদিকে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে।

(৫) **পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ** (Induction Training) : ইহাতে নূতন কর্মীকে কর্ম-পরিবেশের সহিত পরিচয় করানো হয় এবং তাহার মনে কর্ম-আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত পণ্য, কর্মীদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা, কর্মী-সংক্রান্ত নীতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৬) **কর্মগত প্রশিক্ষণ** (Job Training) ঃ ইহাতে শিক্ষার্থীদের কর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয় যেমন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামালের ব্যবহার, উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ইহাতে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) **পদোন্নতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ** (Promotional Training) ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরস্থ কর্মীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির নীতি গৃহীত হয়, সেই সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে উন্নীত করিবার জন্য বাছাই করা কিছু কর্মীকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইহাতে কর্মীদের উৎসাহ ও মনোবল (Morale) বৃদ্ধি পায়।

ব্যবস্থাপক-কর্মী প্রশিক্ষণ (Management Personnel Training) ঃ

ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তর আছে—উচ্চস্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তর। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক-কর্মীর প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয় :

(১) সহকারী ব্যবস্থাপকের পদ সৃষ্টি ,

(২) বিশেষ কোন কাজের জন্য ব্যবস্থাপক কর্মিদল গঠন ,

(৩) কমিটি গঠন করিয়া ব্যবস্থাপকগণকে উহাতে অন্তর্ভুক্ত করা ,

(৪) ব্যবস্থাপককে পরিচালকমণ্ডলীর বিকল্প সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা ;

(৫) শিক্ষাকেন্দ্র ও মন্ত্রণামূলক অধিবেশনের আয়োজন করা ;

(৬) বিকেন্দ্রীভূত অধিবিভাগে (Division) ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা ,

(৭) প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, নীতি, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা ;

(৮) স্ব-স্ব পদের কার্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা ;

(৯) কাজের অগ্রগতির সহিত সম্যক পরিচয় ঘটানোর জন্য স্বল্পকালীন আলাপ-আলোচনার (Conference) ব্যবস্থা করা ;

(১০) মানবিক (Human), কারিগরি (Technical), ব্যক্তিগত (Personal) এবং কার্যবিষয়ক দক্ষতা (Conceptual Skill) বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(১১) কিভাবে তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া ও সমস্যার উপলব্ধি করিতে হয় এবং উহার মোকাবিলা করিতে হয় ;

(১২) কিভাবে নির্দেশদান করিয়া কর্মচারিগণকে পরিচালিত করিতে হয় ,

(১৩) কিভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হয় ;

(১৪) কিভাবে অধস্তন কর্মচারীদের উপদেশ প্রদান (Counselling) করিতে হয় ।

মধ্যস্তর ও নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপক-কর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় :

(১) **কর্মে নিয়োজন** (Job Assignment) : কর্মে নিয়োজনের ফলে ব্যবস্থাপকগণ তাহাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও সমস্যার সহিত পরিচিত হন। একজন অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের অধীনে শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকিলে কিভাবে সমস্যার সমাধান করিতে হয় তাহা জানা যায়।

(২) **কর্ম আবর্তন** (Job Rotation) : ইহাতে ব্যবস্থাপকগণকে পর্যায়ক্রমে একাধিক কর্মে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের কলাকৌশল ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানিতে পারেন।

(৩) **অভ্যন্তরীণ শিক্ষাদান** (Internal Coaching) : ইহাতে লিখিত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মপ্রণালী, প্রয়োগকৌশল ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৪) **পাঠক্রম** (Study Course) : এই প্রথায় ব্যবস্থাপকগণকে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া নির্দিষ্ট পাঠক্রমে প্রশিক্ষিত করা হয়।

(৫) **ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ** (Analysis of Case Studies) : ইহাতে শিক্ষানবীশ ব্যবস্থাপকগণের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত বা কল্পিত জটিল ঘটনার সমস্যা ও সমাধানের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়। ইহাতে তত্ত্বগত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপকগণ অবহিত হইতে পারেন।

কর্মী ক্ষতিপূরণ (Employee Compensation) : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করিবার জন্য কর্মিগণের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও অবদানের জন্য তাহাদের যথেষ্ট ও ন্যায্যভাবে পুরস্কৃত করাকে কর্মী ক্ষতিপূরণ বলে। কারবারের উন্নতির জন্য শ্রমিক পরিশ্রম করে। ইহাতে তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তির অবক্ষয় হয়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য কর্মীকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করিবার নাম কর্মী ক্ষতিপূরণ। শুধুমাত্র বেতন ও ভাতা

প্রদান করিলেই কর্মী ক্ষতিপূরণের কাজ শেষ হয় না। বৃহত্তর অর্থে কর্মী ক্ষতিপূরণ বলিতে বুঝায় **কর্মের বিস্তারকরণ** বা **কর্ম পরিবর্ধন** (Job Enlargement) এবং **কর্ম সমৃদ্ধকরণ** (Job Enrichment)।

সেবা ও পরিশ্রমের জন্য কর্মীকে সাধারণভাবে তিনপ্রকার পুরস্কার দেওয়া হয়: (ক) মূল পারিশ্রমিক, (খ) ভাতা যেমন, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি এবং (গ) প্রেরণামূলক মজুরি। **এডউইন ফ্লিপ্পো** (Edwin Flippo)-র মতে, সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ কর্মীর কর্ম-আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সামাজিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থাগুলিও কর্মী ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি হইল: চিকিৎসার সুবিধা, অসুস্থতাকালীন সুবিধা, প্রসূতিকালীন সুবিধা, দুর্ঘটনা ও অক্ষমতাজনিত সুবিধা, পোষ্যদের সুবিধা, ছাঁটাই ও কর্মবিরতিজনিত সুবিধা, পেশাগত রোগ ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসন ইত্যাদি। এই সকল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য ভারতে কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা আইন, কর্মী ক্ষতিপূরণ আইন এবং শিল্প-বিরোধ আইন আছে।

প্রকৃত অর্থে কর্মী ক্ষতিপূরণ বলিতে কর্ম পরিবর্ধন অর্থাৎ কাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তারকরণ বা বিষয়বস্তুর পরিবর্ধন এবং কাজের সমৃদ্ধিকরণ বা কাজের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ সাধনকে বুঝায়। ইহার ফলে কর্মীর কর্মের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মী উন্নয়ন সম্ভব হয়। কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এবং কর্মী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হিসাবে কাজের বিস্তারকরণ ও সমৃদ্ধিকরণ করা হয়। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল:

কাজের বিস্তারকরণ বা পরিবর্ধন (Job Enlargement): কাজের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াগত বিস্তারকরণকে **কাজের পরিবর্ধন** বলে। ইহাতে কর্ম-চক্রের দৈর্ঘ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্যকরণের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়। কর্মবিভাজন ও অতি-বিশেষায়ণের ফলে নিয়মমাফিক কার্যকলাপে যে একঘেয়েমি আসে উহা দূর করিবার জন্য কর্ম-পরিবর্ধন করা হয়। তত্ত্বাবধানের পদ্ধতিকে ভঙ্গ না করিয়া কাজকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোগ্রাহী করিবার জন্য কর্ম-পরিবর্ধনে নিয়মমাফিক কাজগুলিকে যুক্ত করা হয়।

কাজের সমৃদ্ধিকরণ (Job Enrichment): কাজকে অধিকতর মনোগ্রাহী ও প্রতিযোগিতামূলক করিবার জন্য কাজের বিষয়বস্তুতে প্রকৃত ও ধনাত্মক প্রত্যয় বা আবেগ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে **কাজের সমৃদ্ধিকরণ** বলে। ইহাতে কাজে অধিকতর দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং কর্মীদের স্বতন্ত্র ও স্ব-নির্দেশদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহা কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহাতে তত্ত্বাবধানের রীতি পরিবর্তন করিতে হয়।

সংকীর্ণ অর্থে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মী ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে কর্মীকে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহাকে কর্মী ক্ষতিপূরণ বলে। কাজের সময় এবং

কার্য-সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় শারীরিক ক্ষতি হইলে অথবা কার্য-সংক্রান্ত ব্যাধি হইলে তবেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ করা হয়। ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য হইতেছে কর্মীর সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমার মাধ্যমে কর্মচারিগণ নিম্নলিখিত সুবিধা পায়:

(১) **চিকিৎসার সুবিধা** (Medical Benefit): ইহাতে কর্মীরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, ঔষধপত্র ও হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ পায়।

(২) **অসুস্থতাকালীন সুবিধা** (Sickness Benefit): ইহাতে কর্মী অসুস্থতাকালীন সময়ে আর্থিক সাহায্য পায়।

(৩) **প্রসূতিকালীন সুবিধা** (Meternity Benefit): ইহাতে প্রসূতি শ্রমিককে প্রসবের পূর্বে ও পরে অর্থ সাহায্য করা হয়।

(৪) **অক্ষমতাকালীন সুবিধা** (Disablement Benefit): ইহাতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে কর্মীর কর্মক্ষমতা নষ্ট হইলে সেই কর্মী আর্থিক সাহায্য পায়। কোন শ্রমিক স্থায়িভাবে অক্ষম হইলে সে আজীবন অবসরভাতা পায়।

(৫) **পোষ্যদের সুবিধা** (Dependants' Benefit): ইহাতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মীর মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যগণ ভাতা পায়।

শিল্পে নিয়ম-শৃঙ্খলা (Industrial Discipline):

সংজ্ঞা (Definition): সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক সহযোগিতামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লিখিত ও অলিখিত আচরণবিধি বা রীতিনীতি ও নিয়মাবলী অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত কর্মীদের দ্বারা কর্ম সম্পাদনকে **শিল্পে নিয়ম-শৃঙ্খলা** বলে। শাস্তিপ্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে ঋণাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা (Negative Discipline) এবং বিধিসঙ্গত আচরণ শিক্ষা দিয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে ধনাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা (Positive Discipline) বলে। ধনাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা আত্ম-শৃঙ্খলা (Self-discipline)-কে জাগ্রত করে।

নিয়ম-শৃঙ্খলার সুফল (Benefits of Discipline): নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়:

(১) প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত লক্ষ্যে সহজেই পৌঁছান যায়,

(২) ইহাতে উৎপাদন ও কর্মসম্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়,

(৩) ইহাতে কর্মী আবর্তন (Labour Turnover) ও কর্মী অনুপস্থিতি হ্রাস পায়,

(৪) ইহাতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির অবচয় হ্রাস পায়,

(৫) ইহা উন্নততর কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং দলগত প্রয়াস ও মনোবল (Morale) বৃদ্ধি করে,

(৬) ইহাতে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত থাকে,

(৭) ইহা কর্মীদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইহাতে তাহাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়;

(৮) নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে;

(৯) ইহা সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক গড়িয়া তোলে এবং শিল্পে শান্তি আনে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ (Causes of Indiscipline): যে সকল কারণে শিল্পে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, সেইগুলি হইল:

(১) ব্যবস্থাপকগণ অনেক সময় নিজেরাই নিয়মকানুন অমান্য করেন;

(২) নিয়মকানুন সম্বন্ধে কর্মীদের অজ্ঞতা,

(৩) দুর্বোধ্য ভাষায় নিয়মকানুন রচনা করিবার ফলে উহা কর্মীদের বোধগম্য হয় না,

(৪) ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ কর্তৃক অধস্তন কর্মীদের উপর দুর্ব্যবহার,

(৫) ব্যবস্থাপকগণ ও কর্মচারিগণ কর্তৃক চাকুরির শর্তাবলী মানিয়া না চলা;

(৬) একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিক সংঘ থাকা এবং উহাদের মধ্যে দলাদলি.

(৭) শ্রমিক সংঘ অনেক সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে প্ররোচনা সৃষ্টি করে,

(৮) একই ধরনের অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মীকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি দেওয়া;

(৯) কর্মীদের বহুদিনের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত না করা;

(১০) পদোন্নতি, বদলি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পক্ষপাতিত্ব দেখানো;

(১১) ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক দল ও উপদল সৃষ্টি করা এবং গুপ্তচর বৃত্তি করা,

(১২) ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাব,

(১৩) ব্যবস্থাপকগণের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ।

শিল্পে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার শর্তাবলী বা নীতিসমূহ (Conditions or Principles of Industrial Discipline): শিল্পে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার শর্তাবলী বা নীতিগুলি হইল:

(১) কর্মচারী প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মকানুন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) নিয়মকানুনের ভাষা দ্ব্যর্থবোধক হইবে না এবং উহা সহজবোধ্য হইবে।

(৩) নিয়মকানুন সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪) নিয়মকানুন যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে নিয়মকানুনের পুনর্বিন্যাস ও সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) নিয়মকানুনগুলি যথাসময়ে কর্মচারিগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইবে।

(৬) কোন শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা যেন না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(৮) গুরুতর শাস্তির পূর্বে তদন্ত কমিটি বসাইয়া উহার সুপারিশ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৯) আচরণবিধি রক্ষা করিবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শাস্তি যেন ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য না হয়।

শিল্পে শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য ভারতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ত্রিদলীয় সম্মেলন, নিয়ম-শৃঙ্খলার আচরণবিধি, যৌথ দর কষাকষি, মজুরি পর্ষদ, শ্রম-বিরোধ আদালতের রায় কার্যকর করা, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পরোক্ষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতি ও দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য আইন, মজুরি-সংক্রান্ত আইন, শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আইন, মুনাফায় শ্রমিকদের অংশপ্রাপ্তি ইত্যাদি ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে (Labour Conference) ভারতে গৃহীত নিয়ম-শৃঙ্খলার আচরণবিধিগুলি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে কার্যকর হয়। এই বিধিগুলি হইল :

(ক) নোটিশ ছাড়া কোন ধর্মঘট বা তালাবন্ধ (Lock Out) করা যাইবে না,

(খ) কোন পক্ষই একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না,

(গ) শিল্প-বিরোধের বর্তমান আইন অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইবে ;

(ঘ) ধীর গতিতে উৎপাদন চালাইবার পথ গৃহীত হইবে না,

(ঙ) কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি করা হইবে না,

(চ) আপস চুক্তি ও রায় অবিলম্বে কার্যকরী করা হইবে ;

(ছ) শ্রমিকদের সহিত পরামর্শ না করিয়া মালিক কাজের চাপ বৃদ্ধি করিবেন না,

(জ) শ্রমিক সংঘের উন্নতির জন্য মালিক চেষ্টা ও সাহায্য করিবেন,

(ঝ) কাজের সময় শ্রমিক সংঘের কাজ বন্ধ থাকিবে,

(ঞ) নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে,

(ট) সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ, লাঞ্ছনা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ উভয়পক্ষই পরিহার করিবেন ;

(ঠ) কর্মীদের আচরণবিধি মানিয়া চলিতে হইবে এবং যাহারা বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে ;

(ড) বিরোধ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য অনুসন্ধান করা হইবে।

শ্রমিক সংঘ (Trade Union) :

সংজ্ঞা (Definition) : শ্রমিক সংঘ হইল শ্রমিকদের জোটবন্ধন বা সমিতি যাহা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং উন্নত করে। শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের একটি দীর্ঘমিয়াদী নিরবচ্ছিন্ন সংগঠন। ইহা কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়।

শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য (Objects of Trade Union) : শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে আলোচনা করা যায় :

(১) **ভ্রাতৃ বা সমধর্মী-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Fraternal Objects) : এই প্রকার উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(ক) শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা ও তাহাদের উন্নতির ব্যবস্থা করা ;

(খ) শ্রমিকদের প্রয়োজনে ও বিপদ-আপদে তাহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা ;

(গ) শ্রমিকদের প্রতি সহধর্মিতার ভাব প্রদর্শন করা ;

(ঘ) শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, অবসর-বিনোদন, খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ;

(ঙ) ব্যবস্থাপনার সহিত সহযোগিতা করিয়া শ্রমিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করা ,

(চ) শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা ;

(ছ) শ্রমিকদের মধ্যে একত্ববোধ (Solidarity), আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদাবোধ ও মনোবল (Morale) সৃষ্টি করিয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

(২) **সংগ্রাম-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Militant Objects) : ইহা আন্দোলন সংগঠিত করিবার ও আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী-দাওয়া আদায় করিবার উদ্দেশ্য। সংগ্রাম-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(ক) জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ;

(খ) মুনাফার অংশ বোনাস হিসাবে শ্রমিকদের প্রদানের ব্যবস্থা করা ;

(গ) শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার যেমন, পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, বেকারভাতা, চিকিৎসাভাতা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ;

(ঘ) শ্রমিকদের কাজের সময় ও সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করা ;

(ঙ) শ্রমিকদের কাজে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করা ;

(চ) শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরোধিতা করা ;

(ছ) শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনা বৃদ্ধি করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামিল করা।

ভারতের শ্রমিক সংঘের ত্রুটি বা দুর্বলতা (Defects or Weaknesses of Indian Trade Unions) :

ভারতের প্রধান প্রধান শ্রমিক সংঘগুলি হইল : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC), অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC), হিন্দ মজদুর সভা (HMS), ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (UTUC), সেণ্টার অফ্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্ (CITU) ইত্যাদি।

ভারতের শ্রমিক সংঘ মূলতঃ দুর্বল। ইহার কারণগুলিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—এই দুইভাগে আলোচনা করা যায়।

অভ্যন্তরীণ কারণগুলি হইল ঃ

(১) ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিরাট অংশ এখনও কোন শ্রমিক সংঘের সদস্য নয়। শ্রমিক সংঘের প্রতি উদাসীনতা ইহার কারণ।

(২) শ্রমিক সংঘগুলির অধিকাংশ আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ইহাদের আর্থিক সম্বলও সামান্য।

(৩) একই শিল্পে বহু শ্রমিক সংঘ গড়িয়া উঠে।

(৪) শ্রমিক সংঘগুলি প্রধানতঃ দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলন করে। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজে ইহাদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহারা শ্রমিকদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

(৫) বহিরাগত শ্রমিক-দরদী বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব দেয় বলিয়া শ্রমিকের মূল সমস্যা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।

(৬) অধিকাংশ শ্রমিক সংঘ রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন। ইহাতে শ্রমিক ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়।

(৭) শ্রমিকদের নিরক্ষরতা, ভাষাগত, ধর্মগত ও বর্ণগত পার্থক্য শ্রমিক সংঘকে দুর্বল করে।

(৮) স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণীর অভাবে শ্রমিক সংঘ দুর্বল হয়।

(৯) নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার ফলে শ্রমিকেরা শ্রমিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিতে পারে না।

(১০) আয় কম বলিয়া অনেক শ্রমিক চাঁদা দিবার ভয়ে শ্রমিক সংঘের সদস্য হইতে চাহে না।

বাহ্য কারণগুলি হইল ঃ

(১) মালিক শ্রেণীর বিরোধিতা এবং শ্রমিক সংঘকে দুর্বল করিবার জন্য দালাল সৃষ্টির প্রচেষ্টা।

(২) সরকারের নিকট হইতে মালিকশ্রেণীর আনুগত্য।

(৩) শ্রম ঠিকাদার, শ্রম সর্দার ইত্যাদি শ্রেণী শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা করে।

ভারতে সুস্থ শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তুলিবার উপায় (Means of Developing Sound Trade Unions in India) ঃ

সুস্থ শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(১) দলমত-নির্বিশেষে একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংঘ স্থাপন করিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে শ্রমিক সংঘের সদস্য হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক সভ্যকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হইবে যাহাতে শ্রমিক সংঘের আর্থিক সম্বল দৃঢ় হয়।

(৪) একটি শিল্পে একটি মাত্র শ্রমিক সংঘ থাকিবে। শিল্পের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংঘগুলি মূল শ্রমিক সংঘের সদস্য হিসাবে কাজ করিবে।

(৫) রাজনৈতিক দলাদলি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক সংঘগুলির পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) বাহিরের নেতৃত্বের পরিবর্তে শ্রমিকদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৭) শ্রমিক সংঘকে ইহার সদস্যদের শ্রমিকসংঘ-সংক্রান্ত বিষয়ের শিক্ষা দিতে হইবে।

(৮) শুধু আন্দোলন নহে, শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যকলাপে শ্রমিক সংঘগুলিকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) শ্রমিক সদস্যদের মধ্যে সাধারণ, বৃত্তিমূলক ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইবে।

(১০) মালিকগণকে শ্রমিক সংঘের স্বীকৃতি দিতে হইবে।

(১১) ঠিকাদারদের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে।

(১২) দুর্বল শ্রমিক সংঘগুলিকে একত্রিত করিতে হইবে।

(১৩) অবসর সময়ে শ্রমিককে সংঘের কাজে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

(১৪) শ্রমিক সংঘ আইনের ধারাগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ (Workers' Participation in Management) :

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বলিতে কি বুঝায়? (What is meant by Workers' Participation in Management ?) :

কারবারের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে কার্যসম্পাদনের জন্য মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি দ্বারা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে **ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ** বলে। এইরূপ ব্যবস্থায় কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণে শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার হাতিয়ার। শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্যকর পন্থা হিসাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য (Objects) : ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :

(১) শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ;

(২) শ্রমিকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং শিল্পের সমৃদ্ধিতে শ্রমিকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা ;

(৩) শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ;

(৪) ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের নিকট হইতে ফলপ্রদ চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ সংগ্রহ করা ,

(৫) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য নিম্নস্তরের শ্রমিকদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা ;

(৬) গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে রূপায়িত করা ;

(৭) সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় মালিক ও শ্রমিকের যৌথ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তোলা ,

(৮) প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি গড়িয়া তোলা এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সুফল (Merits) :

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায় :

(১) মালিক ও শ্রমিকদের কাজ ও স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। এই কারণে উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার দিলে দুই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব হয়।

(২) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়েব (Webb), কোলে (Cole), কোঁৎ (Comte) এবং ওয়েন (Owen) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

(৩) এলটন মেয়ো (Elton Mayo) মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ শিল্পে মানবিক সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব করে।

(৪) ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

(৫) ইহা শ্রমিকদের মনে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাবোধ জাগ্রত করে। ফলে একত্ববোধ (Solidarity) ও অংশস্বরূপ হওয়ার মনোভাব (Sense of Belonging) বৃদ্ধি পায়।

(৬) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ফলে শ্রমিকদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ইহা উৎপাদনে ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

(৭) ইহা শ্রমিকদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।

(৮) ইহা শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

কুফল (Demerits) :

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের কুফলগুলি হইল :

(১) উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জ্ঞানের অভাবে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বাস্তবে কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

(২) ইহাতে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের তর্ক-বিতর্ক অযথা সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব ঘটায়।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক প্রতিনিধিগণ শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া লইয়া ব্যবস্থাপনায় আলোচনা করে এবং নানারকমের অভিযোগ তুলিয়া ধরিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণের কাজকে জটিল করে।

(৪) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব কাহারা করিবে এই বিষয়েও বিরোধ দেখা দেয়। ফলে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরে।

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পদ্ধতি (Methods of Securing Workers' Participation in Management):

ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যে সকল উপায়ে সম্ভবপর হইতে পারে, সেইগুলি হইল:

(১) **সহ-অংশীদারী** (Co-partnership): ইহাতে শ্রমিকেরা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সহ-মালিকে পরিণত হয়। শেয়ারহোল্ডাররূপে তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে পরিচালক নির্বাচন করিতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের লাভ ও লোকসানে অংশগ্রহণ করে।

সুবিধা (**Advantages**): ইহার সুবিধাগুলি হইল:

(১) শ্রমিকগণ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের সহিত একত্ব করিয়া দেখে।

(২) প্রতিষ্ঠানে উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(৩) শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি হয়।

(৪) ধর্মঘট, কারখানা বন্ধ, ধীরে উৎপাদন নীতি ইত্যাদি হ্রাস পায়।

(৫) প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকদের দায়িত্ববোধ জন্মায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**): ইহার অসুবিধাগুলি হইল:

(১) পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য মালিকপক্ষের হওয়ায় শ্রমিক প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় মালিকপক্ষের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ফলে শ্রমিক সহযোগিতা হ্রাস পায়।

(৩) শ্রমিক ও মালিক কোন পক্ষই এই ব্যবস্থা বিশেষ পছন্দ করে না।

(২) **যুক্ত আলোচনা কমিটি বা যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদ** (Joint Consultation Committee or Joint Management Council): শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের লইয়া এই ধরনের যুক্ত আলোচনা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার নিকট পরামর্শ ও সুপারিশ বলিয়া গণ্য হয়, কারণ ইহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। যৌথ আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি হইল: কাজের অবস্থা, কারখানায় আলো-বাতাসের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, পানীয় জল, ক্যান্টিন, খাবার ঘর, বিশ্রাম

ঘর, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থা, ছুটি, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, পদোন্নতি, কর্মবিধি, সময় ও কাঁচামালের অপচয় রোধ, অনুপস্থিতি, দেরীতে উপস্থিতি, শৃঙ্খলা বিধি, শিক্ষানবিশী, প্রশিক্ষণ, জাতীয় ছুটির দিন, উৎসবের দিন ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়গুলি উভয়পক্ষের যুক্ত আলোচনার ফলশ্রুতি বলিয়া সাধারণতঃ মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উহা গ্রহণ করে।

সুবিধা (Advantages) : ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক-মালিক সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

(২) ইহা দলগত সংহতি গড়িয়া তোলে।

(৩) ইহাতে শ্রমিকদের মানসিকতা উন্নত ও বিকশিত হয় এবং ভাব আদান প্রদানের পরিবেশ গড়িয়া উঠে।

(৪) ইহা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

অসুবিধা (Disadvantages) : ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) যৌথ আলোচনা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহাতে অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

(২) যুক্ত কমিটির সিদ্ধান্তগুলি সুপারিশ হিসাবে কর্তৃপক্ষ গণ্য করে বলিয়া অনেক সময় এই সুপারিশগুলি মালিকপক্ষের অনমনীয় ও শোষকসুলভ মনোভাবের জন্য বাতিল হইয়া যায়।

(৩) অনেক সময় সদস্যগণের মতবিরোধের জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ বিলম্বিত হয়।

পরিচালকপর্ষদে শ্রমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ (Employees' Representation in the Board of Directors) :

এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক প্রতিনিধিকে পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করিতে সুযোগ পায়।

সুবিধা (Advantages) : ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) পরিচালক পর্ষদে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্যে আসিতে পারে।

(২) ইহা শ্রমিকদের মনে উৎসাহের মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages) : ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) পিটার ড্রাকার (Peter Drucker)-এর মতে, এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র শ্রমিক-সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উৎপাদন, বিপণন, অর্থ, ঝুঁকিবহন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রমিকেরা আগ্রহী নহে বলিয়া এই ব্যবস্থা ঐ সকল বিষয়ে কার্যকরী হয় না।

(২) উচ্চস্তরে পরিচালক পর্ষদে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে তাহাদের অংশগ্রহণের

সুযোগ দিলে তবেই ইহা ফলপ্রসূ হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য—"শ্রমিক সংঘ যে অনুপাতে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করিবে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তদনুপাতেই ইহাকে ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।"

সুপারিশ ব্যবস্থা (Suggestion Scheme) ঃ এই ব্যবস্থায় কারবারের ও ব্যবস্থাপনার সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রমিকগণের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে সুপারিশ বা পরামর্শ চাওয়া হয়। যে শ্রমিকের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয় তাহাকে পুরস্কৃত করা হয়।

সুবিধা (**Advantages**) ঃ ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের আগ্রহ ও চেতনার উন্মেষ ঘটে।

(২) ইহা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে।

(৩) শ্রমিকদের নূতন ভাবনা-চিন্তা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সাহায্য করে।

(৪) ইহাতে শ্রমিকগণ প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্ববোধ করে এবং কারবারের সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করে।

(৫) ইহাতে শ্রমিক-সম্পর্কিত বিষয়ে শ্রমিকের অধিকতর সহযোগিতা আশা করা যায়।

(৬) ইহাতে উপযুক্ত সুপারিশ প্রদানকারী শ্রমিককে পুরস্কৃত করা হয় বলিয়া শ্রমিকের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (**Disadvantages**) ঃ ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের সুপারিশ গৃহীত নাও হইতে পারে।

(২) ইহাতে শ্রমিকগণ ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণ করিতে পারে না।

(৩) যে সকল শ্রমিকের সুপারিশ গৃহীত হয় তাহাদের মনে গর্বভাব আসে। ইহাতে শ্রমিক ঐক্য ব্যাহত হয়।

(৪) যে সকল শ্রমিকের সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না তাহাদের মনে হতাশার ভাব আসে এবং তাহাদের কর্মপ্রেরণা হ্রাস পায়।

ভারতে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা (Workers' Participation in Management in India) ঃ

ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য ভারতে তিনটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাগুলি হইল :

(১) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প-বিরোধ আইন দ্বারা গঠিত ওয়ার্কার্স কমিটি (Workers' Committee)। তবে এই ব্যবস্থাটি এখনও পর্যন্ত বিশেষ কার্যকর হয় নাই।

(২) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাব দ্বারা গঠিত যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদ (Joint Management Council)। কিন্তু এই ব্যবস্থাটিও বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই।

(৩) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে (20-point Economic Programme) রূপদান করিবার জন্য ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ প্রবর্তন করা হয়। ইহাতে কারখানার মধ্যে একটি করিয়া 'সপ কাউন্সিল' (Shop Council) এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে একটি করিয়া 'যুক্ত কাউন্সিল' (Joint Council) প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। 'সপ কাউন্সিল' 'সপের' উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক নৈপুণ্য বৃদ্ধির সুপারিশ করিবে এবং 'যুক্ত কাউন্সিল' সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য উৎপাদন নৈপুণ্য বৃদ্ধি এবং কর্মী ও যন্ত্রের উৎপাদনশীলতার মান স্থির করিবে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইতে হইবে এবং উহা একমাসের মধ্যে কার্যকর করিতে হইবে। 'সপ কাউন্সিলে' শ্রমিক ও মালিক পক্ষের অনধিক ১২ জন সদস্য থাকিবে। এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন (Administrative Reforms Commission) সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইহা প্রয়োগ করিবার অনুকূলে অভিমত দিয়াছে।

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। টাটা, ডালমিয়া ও দিল্লী ক্লথ মিলস্-এ সুপারিশ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এয়ার ইণ্ডিয়া, সিন্ধ্রি ফারটিলাইজারস, বিশাখাপত্তনম শিপ-বিল্ডিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ও সেবা সংস্থাগুলিতে এবং অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

সমালোচনা (Criticisms) : ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ কোন দেশেই তেমন সফল হইয়াছে বলা চলে না। ভারতেও টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ তেমন সন্তোষজনক নহে। ইহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশী নহে। ইহাছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মুনাফার হিসাবে কারচুপি থাকায় শ্রমিকেরা মুনাফার অংশে সন্তুষ্ট হয় না। এই সকল অসুবিধার কারণে ভারতে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নহে।

*** বোনাস-সংক্রান্ত সমস্যা (Bonus Problems) :**

শিল্প-বিরোধের কারণগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে প্রধান হইল মজুরি ও বোনাসের প্রশ্ন। ভারতে শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে বোনাসের সমস্যা আধুনিককালে প্রভূত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বোনাস বলিতে বুঝায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় কর্মীদের অংশপ্রাপ্তি।

বোনাস-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী শ্রম দিবস নষ্ট হয়। ইহাতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হয়। শ্রমিকগণ মনে করে যে, মালিক কর্তৃক মুনাফা নির্ধারণ দুরভিসন্ধিমূলক এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মুনাফার অংশ হইতে

* এই বিষয়টি কেবলমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বঞ্চিত করিবার জন্য মালিক হিসাবে কারচুপি করে। এই মনোভাব গড়িয়া উঠায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বোনাস সমস্যার সমাধান অতিশয় জরুরী বিষয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম বোনাস প্রদান আইন (Payment of Bonus Act) গঠন করা হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোনাস প্রদান আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী চালু হয়। সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নহে যেমন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, সরকারী বিভাগীয় সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই আইন প্রযোজ্য নহে। তবে সরকারী ক্ষেত্রের যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সমশ্রেণীভুক্ত বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, সেই সকল সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া হইবে। দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক বোনাস আইনের আওতায় আসিয়াছে।

বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত হোক বা না হোক, বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণ হইবে বেতনের (মূল বেতন + মহার্ঘ ভাতা) ৮·৩৩% অথবা ২৫০ টাকা—এই দুইটির মধ্যে যেটি অধিক। যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিলে বোনাসের হার সর্বোচ্চ ২০% হইতে পারে। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের সম্মতি থাকিলে বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থের ভিত্তিতে বোনাস প্রদানের বিকল্প নীতি অনুসৃত হইতে পারে। যে সকল কর্মচারীর বেতন (মূল বেতন + মহার্ঘভাতা) মাসিক ২,৫০০ টাকার অধিক তাহারা বোনাস প্রদান আইনের আওতার বাহিরে। তবে মালিক ইচ্ছা করিলে তাহাদের এক্স-গ্রাসিয়া (Ex-gratia) হিসাবে আর্থিক সুবিধা দিতে পারেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের বোনাস প্রদান আইনে বলা হইয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজ্য সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন কোন শিল্পে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া হইবে না। বর্তমানে উৎপাদনশীলতার সহিত বোনাসকে যুক্ত করিয়া রেল দপ্তর, ডাক ও তার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এই প্রকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া হইতেছে।

* মজুরি প্রদানের পদ্ধতিসমূহ (Methods of Wage Payment):

মজুরি প্রদানের পদ্ধতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) মৌলিক পদ্ধতি (Basic Methods), (২) প্রেরণামূলক প্রথা (Incentive Plans) এবং (৩) অনুপূরক প্রথা (Supplementary Plans)।

মৌলিক পদ্ধতিসমূহ (Basic Methods): মজুরি প্রদানের মৌলিক পদ্ধতিগুলি প্রধানতঃ চার প্রকার: (ক) সময়ভিত্তিক মজুরি (Time Wage), (২) উৎপাদনভিত্তিক বা ফুরণ মজুরি (Piece Wage), (৩) শ্রম-সময় মজুরি (Task

Wage) এবং (৪) প্রগতিশীল মজুরি (Progressive Wage)। নিম্নে এই সকল পদ্ধতির আলোচনা করা হইল :

সময়-ভিত্তিক মজুরি (Time Wage) : এই পদ্ধতি অনুসারে কাজের সময়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করা হয়। ইহাতে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য সময় কার্ড (Time Card) রাখা হয় এবং ঘণ্টা-প্রতি নির্দিষ্ট হার ঠিক করা হয়। শ্রমিকের মোট কাজে ব্যয়িত সময়কে ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার দিয়া গুণ করিলে মোট মজুরি কত হইবে তাহা জানা যায়। **মোট মজুরি = কাজে ব্যয়িত সময় × মজুরির ঘণ্টা-প্রতি হার।** এই প্রথায় দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক মজুরি প্রদান করা হয়। ইহাতে কারখানায় সময় লিপিবদ্ধকরণের যন্ত্র (Time Recording Machine) থাকা প্রয়োজন। ধরা যাক, কোনও শ্রমিক এক মাসে ১১০ ঘণ্টা কাজ করে এবং ঘণ্টা-প্রতি মজুরি = ১ টাকা ; সুতরাং তাহার এক মাসের মোট মজুরি (১১০ × ১) = ১১০ টাকা।

সুবিধা (Advantages) :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হইল : (১) ইহা সহজ ও সরল পদ্ধতি। (২) ইহা সহজেই বোধগম্য বলিয়া শ্রমিকগণ পূর্ব হইতে তাহাদের মজুরি কত হইবে বুঝিতে পারে। ফলে ইহাতে অশান্তির সম্ভাবনা কম থাকে। (৩) ইহাতে উৎপাদনের উৎকর্ষ বজায় রাখা যায়, কারণ শ্রমিক দ্রুত উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে না। (৪) মজুরির হার একই প্রকার হয় বলিয়া এইরূপ পদ্ধতি শ্রমিক ও শ্রমিক সংঘের পছন্দ। (৫) ইহা ব্যয়-বহুল নহে। (৬) ইহাতে শ্রমিকের আয়ের নির্দিষ্টতা থাকে বলিয়া শ্রমিক নিরাপত্তা বোধ করে এবং তাহার কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। (৭) যে সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না, যেমন, কর্মনায়ক (Foreman)-এর কাজ, সেই সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর। (৮) যে সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্রব্য উৎপাদিত হয় অথবা কাজটি অবিভাজ্য, সেই সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত। (৯) যেখানে পণ্যের গুণগত মান অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং যেখানে কাঁচামালের অপচয় বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন, সেখানে ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। (১০) ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সতর্কপূর্ণদৃষ্টি তত্ত্বাবধান (Close Supervision) সম্ভব হয় বলিয়া এই পদ্ধতি বিশেষ প্রযোজ্য।

অসুবিধা (Disadvantages) :

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হইল : (১) ইহাতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক একই হারে মজুরি পায় বলিয়া দক্ষ শ্রমিকের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়। (২) ইহাতে সতর্কপূর্ণদৃষ্টি তদারকির প্রয়োজন। (৩) ইহাতে শ্রমিক ইচ্ছাকৃতভাবে কাজের গতি মন্থর করে। ফলে উপরি-ব্যয় (Overhead) বেশী পড়ে। (৪) ইহাতে দক্ষ শ্রমিকের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। (৫) ইহাতে দক্ষ শ্রমিক সুযোগ পাইলেই অন্য প্রতিষ্ঠানে চলিয়া যায়। ফলে শ্রমিক আবর্তনের (Labour Turnover) হার বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদনের কর্মধারা

ব্যাহত হয়। (৬) ইহাতে একদিকে শ্রমিকগণ কাজে ফাঁক দিবার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে মালিক তাহাদের দ্বারা অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ফাটল ধরে।

উৎপাদন-ভিত্তিক মজুরি বা ফুরণ মজুরি (Piece Wage): এই প্রকার মজুরি প্রদান পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে মজুরি প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরির হার স্থির করা হয়। ইহাতে কাজের মানও ঠিক করা হয়। কাজের পরিমাণকে মজুরির হার দিয়া গুণ করিলে মোট প্রদেয় মজুরির পরিমাণ বাহির হয়। **কাজের পরিমাণ × মজুরির হার = মোট প্রদেয় মজুরি।** ধরা যাক, কোনও একদিনে একজন শ্রমিক ১০টি দ্রব্য উৎপাদন করিল। দ্রব্যপ্রতি মজুরি ১ টাকা হইলে, মোট মজুরি (১০ × ১) = ১০ টাকা। ইহাতে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য 'জব কার্ড' (Job Card) রাখিতে হয়। দিনের শেষে কর্মনায়ক (Foreman) মোট উৎপাদনের পরিমাণ লিখিয়া উহা স্বাক্ষর করেন। এই প্রকার মজুরি দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল কাজের মান স্থির করা যায়, যে সকল কাজে ধারাবাহিকতা আছে এবং যে সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিতে হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই প্রথা প্রযোজ্য।

সুবিধা (Advantages): ইহার প্রধান সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে অধিক উৎপাদন করিলে অধিক মজুরি পাওয়া যায় বলিয়া দক্ষ শ্রমিক কাজে উৎসাহিত হয়। (২) ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। (৩) ইহা সহজ পদ্ধতি—শ্রমিক সহজেই তাহার প্রাপ্য মজুরির হিসাব করিতে পারে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ কম হয়। (৪) ইহাতে তদারকি ব্যয় কম পড়ে। (৫) মালিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী, শ্রমিকও অধিক উপার্জনের আশায় উৎপাদনে উৎসাহী হয়। ফলে শ্রমিক মালিক বিরোধের আশঙ্কা কমিয়া যায়। (৬) ইহাতে পূর্ব হইতে শ্রমিকের মজুরি বাবদ কত ব্যয় হইবে জানা যায় বলিয়া দরপত্র (Tender) ও মূল্যজ্ঞাপনপত্র (Quotation) প্রস্তুত করা যায়। (৭) ইহাতে দ্রব্য ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রমিতকরণ (Standardisation) করা সম্ভব হয়। (৮) উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া প্রতি একক স্থির-ব্যয় (Fixed Cost) হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও কমিয়া যায়। (৯) উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে শ্রমিকেরাই তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করে।

অসুবিধা (Disadvantages):

এই প্রকার মজুরি প্রথার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক দ্রুত কার্য সম্পাদনের চেষ্টা করে বলিয়া উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং দ্রব্যের উৎকর্ষ বা মান বজায় থাকে না।

... হয় এবং স্থায়ী যন্ত্রপাতির অধিক অবচয় ও

(৩) ইহাতে এক-একজন শ্রমিক এক-এক প্রকার মজুরি পায় বলিয়া শ্রমিকগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

(৪) যেখানে বিভিন্ন মানের দ্রব্য উৎপাদিত হয়, সেখানে ইহা কার্যকরী নহে।

(৫) যদি অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, তবে পণ্যের বাজার দাম হ্রাস পাইতে পারে এবং মজুরির হার কমিয়া যাইতে পারে।

(৬) অতিরিক্ত পরিশ্রমে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি হয়, ফলে তাহার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি পায়।

(৭) ইহাতে সময়-সমীক্ষা (Time Study) ও গতি-সমীক্ষা (Motion Study) না করিলে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না।

(৮) যান্ত্রিক গোলযোগ অথবা কাঁচামালের অভাব হইলে শ্রমিক গোলমাল সৃষ্টি করে, কারণ ইহাতে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৯) শ্রমিক সংঘ এই প্রথার বিরোধিতা করে, কারণ ইহাতে শ্রমিকগণের একতা বিনষ্ট হয়।

শ্রম-সময় মজুরি (Task Wage) ঃ

এই প্রকার মজুরি পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিলে উহার ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাজটি শেষ হইলে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয় না। যেখানে সহজেই কাজের পরিমাপ করা যায় না, সেখানে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

সুবিধা (Advantages) ঃ

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়।

(২) ইহাতে শ্রমিক জানিতে পারে যে, সে কত মজুরি পাইবে।

(৩) ইহাতে মোট মজুরির পরিমাণ পূর্ব হইতেই জানা যায় বলিয়া মূল্যজ্ঞাপনপত্র (Quotation) প্রস্তুত করা সহজ হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হইল :

জ সম্পাদন ক[illegible] অতিরিক্ত মজুরি পায় না বলিয়া

সম্পাদনের চেষ্টা থাকে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের মান

র দক্ষতা বৃদ্ধি করে না।

প্রগতিশীল মজুরি (Progressive Wage) :

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। যদি কোন শ্রমিক সর্বনিম্ন কাজ অপেক্ষা অধিক কাজ সম্পন্ন করে তবে তাহাকে ক্রমহ্রাসমান হারে (Diminishing Rate) অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয়।

সুবিধা (Advantages) :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক কাজে অতিরিক্ত উৎসাহী হয়।

(২) ইহা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত উৎপাদনে উৎসাহ দান করে। এই সীমার পর ইহা শ্রমিককে উৎপাদনে নিরুৎসাহী করে। ফলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি হয় না।

অসুবিধা (Disadvantages) :

ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) দ্রুত কার্য সম্পাদনের প্রবণতা থাকে বলিয়া অনেক সময় দ্রব্যের মান বা উৎকর্ষ বজায় থাকে না।

(২) ক্রমহ্রাসমান হারে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয় বলিয়া দক্ষ শ্রমিক কাজে তেমন উৎসাহ পায় না।

প্রেরণামূলক মজুরি প্রথাসমূহ (Incentive Wage Plans) :

সময়ভিত্তিক মজুরি পদ্ধতিতে দ্রব্যের উৎকর্ষ বজায় থাকে বটে কিন্তু কাজের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার উৎপাদনভিত্তিক বা ফুরণ মজুরি পদ্ধতিতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু দ্রব্যের উৎকর্ষের হানি হয়। কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ উভয়ই বজায় রাখিবার জন্য প্রেরণামূলক মজুরি প্রথার প্রচলন করা হইয়াছে। এই প্রথাগুলি প্রিমিয়াম পরিকল্পনা (*Premium Plans*) এবং বোনাস পরিকল্পনা (Bonus Plans)। প্রিমিয়াম পরিকল্পনায় সময় সংক্ষেপের জন্য এবং বোনাস পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য প্রেরণামূলক মজুরি প্রথাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

হ্যাল্‌সী অধিহার প্রথা (Halsey Premium Plan) : এফ. এ. হ্যাল্‌সী (F. A. Halsey) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ্‌। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক টেলরের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাতে সময়ভিত্তিক হারে মজুরি দেওয়া হয়। এই প্রথায় একটি মান-সময় (Standard Time) স্থির করা হয় এবং কাজের নির্দিষ্ট পরিমাণও স্থির করা হয়। যে শ্রমিক উক্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করে, সে যে সময় বাঁচাইল তাহার জন্য নির্দিষ্ট সময়-হারে বাঁচানো সময়ের ৫০% প্রিমিয়াম বা অধিহার পায়।

ধরা যাক, মান-সময় = ১০ ঘণ্টা,

মজুরির সময়-হার = ঘণ্টা-প্রতি ২ টাকা,

কোন শ্রমিক ৮ ঘণ্টায় কাজটি সম্পন্ন করিল। সুতরাং সময় বাঁচিল ২ ঘণ্টা।

৮ ঘণ্টায় শ্রমিকের মোট মজুরি $=\{(৮\times ২)+(\frac{১}{২}\times ২\times ২)\}$ টাকা

$=(\{১৬+২\})$ টাকা $=$ ১৮ টাকা।

সুবিধা (Advantages) :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহা প্রণোদনামূলক মজুরিপ্রথা। ইহাতে দক্ষ শ্রমিক দ্রুত কাজ সম্পন্ন করিতে উৎসাহ পায়।

(২) ইহাতে দক্ষ শ্রমিকের মজুরি বেশী হয়।

(৩) ইহা সহজবোধ্য।

(৪) উৎপাদনের সময় হ্রাস পায় বলিয়া স্থির ব্যয় (Fixed Cost) একক-প্রতি হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যায়।

(৫) বাঁচানো সময়ে শ্রমিক অতিরিক্ত কাজ করিয়া অধিক মজুরি পাইতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages) :

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক অতি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করিয়া অধিক সময় বাঁচাইতে আগ্রহী, ফলে ত্রুটিযুক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।

(২) ইহাতে মান-সময় ও মজুরির হার মালিকের খেয়াল-খুশীমত নির্ধারণ করা হয়। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়।

(৩) অতিরিক্ত মজুরির আশায় শ্রমিক অধিক পরিশ্রম করে বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য-হানি হইতে পারে।

হ্যাল্সী-উয়্যার প্রথা (Halsey-Weir Plan) **:** এই পদ্ধতিটি ইংল্যাণ্ডের উয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতি হ্যাল্সী প্রথারই অনুরূপ ; কিন্তু এই প্রথায় বাঁচানো সময়ের ৩৩$\frac{১}{৩}$%-এর উপর নির্দিষ্ট সময়-হারে অধিহার (Premium) দেওয়া হয়। হ্যাল্সী প্রথায় যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে হ্যাল্সী-উয়্যার প্রথায় শ্রমিকের ৮ ঘণ্টায় মোট মজুরি $=\{(৮\times ২)+(\frac{১}{৩}\times ২\times ২)\}=\{১৬+\frac{৪}{৩}\}$ টাকা $=$ টা: ১৭.৩৩।

ইহার সুবিধা ও অসুবিধা হ্যাল্সী প্রথারই অনুরূপ।

রোয়ান অধিহার প্রথা (Rowan Premium Plan) **:** হ্যাল্সী ও হ্যাল্সী-উয়্যার অধিহার প্রথার অসুবিধা দূর করিবার জন্য গ্লাসগো-ইঞ্জিনিয়ার (Glasgow-Engineer) **জেমস্ রোয়ান** (James Rowan) এই প্রেরণামূলক প্রথা উদ্ভাবন করেন। ইহাতে সময়ভিত্তিক মজুরি দেওয়া হয়। কিন্তু অধিহার (Premium) বাঁচানো সময় ও মান-সময়ের অনুপাতের ভিত্তিতে স্থির করা হয়। ইহাতে

$$\text{অধিহার}=\frac{\text{গৃহীত সময়}\times\text{বাঁচানো সময়}}{\text{মান-সময়}}\times\text{ঘণ্টা-প্রতি মজুরি-হার}$$

উদাহরণ : ধরা যাক, মান-সময় = ১০ ঘণ্টা ; সময় গ্রহণ = ৬ ঘণ্টা, সুতরাং বাঁচানো সময় = ৪ ঘণ্টা ; ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার = ২ টাকা।

অতএব, অধিহার $= \frac{৬ \times ৪}{১০} \times$ ২ টাকা = টা: ৪·৮০

৬ ঘণ্টায় মোট মজুরি = {(৬ × ২) + ৪·৮০} টাকা = টা: ১৬·৮০

সুবিধা (Advantages) :

ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) হ্যাল্‌সী প্রথায় যেমন অতিরিক্ত সময় বাঁচানোর উৎসাহ থাকে এবং তাহাতে দ্রব্যের মান নষ্ট হয়, রোয়ান প্রথায় ৫০%-এর বেশী সময় বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে অধিহার কমিতে থাকে। সুতরাং এই প্রথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গতি হ্রাস করে। ফলে দ্রব্যের মান বজায় থাকে।

(২) বাঁচানো সময়ে কাজ করিয়া শ্রমিক অতিরিক্ত মজুরি পায়।

(৩) ইহাতে প্রথম ৫০% সময় বাঁচানোর জন্য অধিহার বেশী হয়।

(৪) ইহা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

(৫) ইহাতে সাধারণ শ্রমিকও সর্বনিম্ন মজুরি পায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

এই প্রথার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহার গণনা খুবই জটিল বলিয়া সহজে শ্রমিকের বোধগম্য নহে।

(২) ইহাতে অধিহারের মাত্রা সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

গ্যাণ্টের শ্রম-সময় ও অধিবৃত্তি পদ্ধতি (Gantt's Task and Bonus System) : ইহাতে দক্ষ শ্রমিকের জন্য একটি উচ্চ মানের কাজ এবং উহার জন্য ঘণ্টা-পিছু উচ্চ হারে মজুরি স্থির করা হয়। কিন্তু যে সকল শ্রমিক উচ্চ মানের কাজ করিতে অক্ষম তাহারা ঘণ্টা-প্রতি দৈনিক ন্যূনতম মজুরি পায়। সে সকল শ্রমিক নির্ধারিত মান অথবা তাহার বেশী কাজ করে তাহারা উচ্চহারে মজুরি পায়।

টেলরের পার্থক্যমূলক ফুরণ হার (Taylor's Differential Piece Rate) : এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। যে শ্রমিক সেই সময়ের মধ্যে উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারে তাহাকে উচ্চতর হারে মজুরি দেওয়া হয় এবং যে শ্রমিক ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না তাহাকে নিম্নতর হারে মজুরি দেওয়া হয়। ইহাতে সময়-সমীক্ষা (Time Study) ও গতি-সমীক্ষা (Motion Study) করিতে হয়।

সুবিধা (Advantages) :

ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে দক্ষ শ্রমিক কাজে উৎসাহ পায়।

(২) ইহাতে অদক্ষ শ্রমিকেরা চেষ্টা করে যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। ফলে তাহাদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

(৩) ইহা ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদান ব্যবস্থা।

(৪) ইহাতে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

এই প্রকার পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিকেরা বিভিন্ন হারে মজুরি পায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

(২) এই পদ্ধতি শ্রমিকে-শ্রমিকে তারতম্য ঘটায় বলিয়া শ্রমিক সংঘ ইহা পছন্দ করে না।

(৩) ইহাতে অদক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা থাকে না।

পরিবর্তনশীল মজুরি পদ্ধতি (Sliding Scale Method of Wage) : এই পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি দেওয়া হয়। কিন্তু বিক্রয়-মূল্য এবং জীবনযাত্রার মানের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও উঠানামা করে।

সুবিধা (Advantages) :

ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকগণ সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি পায়।

(২) ইহাতে কারবারের উন্নতিতে শ্রমিকেরও মজুরি বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে শ্রমিকের মজুরি হ্রাস পায়। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়।

(২) দ্রব্যমূল্যের উঠানামার সঠিক সূচক জানা সম্ভব নহে। শ্রমিক নির্ধারিত প্রাপ্য মজুরিসহ ক্ষুরণ প্রথায় অধিবৃত্তি পায়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে অধিবৃত্তি (Bonus) পাওয়া যায় না।

এমার্সনের দক্ষতা মজুরি প্রথা (Emerson's Efficiency Wage Plan) : এই প্রথায় কাজের মানের স্তর খুব উচ্চ থাকে। শ্রমিকদের মজুরি একটি নির্দিষ্ট দৈনিক হারে স্থির করা হয়। নির্ধারিত কাজের একটি ন্যূনতম অংশ সম্পন্ন করিলে শ্রমিকগণ দৈনিক মজুরির একটি শতকরা অংশ অধিবৃত্তি (Bonus) হিসাবে পায়। ন্যূনতম অংশের যত উপরে কার্য সম্পাদন হইবে অধিবৃত্তির হারও তত বৃদ্ধি পাইবে।

মেরিকের বহুগুণ ক্ষুরণ বা উৎপাদনভিত্তিক হার (Merrick's Multiple Piece Rate) : দক্ষতার তারতম্য অনুযায়ী মেরিক মজুরি প্রদানের জন্য শ্রমিকগণকে

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। নূতন ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিক প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা নির্ধারিত কাজের ৮৩% সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং ইহাদের মজুরির হার নিম্ন হারে স্থির করা হইয়াছে। সাধারণ শ্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা নির্ধারিত কাজের শতকরা ১০০% সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া ধরা হয় এবং ইহাদের মজুরির হার প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চতর। দক্ষ শ্রমিকগণকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করিয়া অতিরিক্ত কাজ করিতে সক্ষম বলিয়া ইহাদের মজুরির হার সর্বাপেক্ষা বেশী স্থির করা হইয়াছে।

নিম্নতম মজুরি (Minimum Wage): ইহাতে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজ ও সময়ের জন্য নিম্নতম মজুরি স্থির করা হয়।

সুবিধা (**Advantages**):

ইহার সুবিধাগুলি হইল :

(১) শ্রমিক তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে পারে।

(২) ইচ্ছা করিলে শ্রমিক অতিরিক্ত আয় করিতে পারে।

অসুবিধা (**Disadvantages**):

ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) জীবনযাত্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেই কারণে সঠিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

(২) ইহাতে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

অনুপূরক মজুরি প্রথাসমূহ (Supplementary Wage Plans): মৌলিক মজুরি পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন অনুপূরক মজুরি প্রথাসমূহের প্রচলন করা হয়। শিল্পে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য মুনাফার শরিকানা এবং শ্রমিক-মালিক সংঘাত দূর করিবার জন্য সহ-অংশীদারী প্রথার প্রচলন করা হইয়াছে।

মুনাফার শরিকানা (Profit Sharing): এই প্রথায় শ্রমিকগণ নিয়মিত মজুরি ছাড়াও স্বেচ্ছায় নির্ধারিত পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী কারবারের মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ পায়। কিন্তু তাহারা কারবারের ক্ষতির কোন অংশ বহন করে না। শ্রমিকেরা নগদে অথবা শেয়ারে অথবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে মুনাফার অংশ পাইতে পারে। মুনাফার অংশ মোট বাৎসরিক আয় অথবা কাজের সময়ের অনুপাতে নির্ধারিত হইতে পারে।

সুবিধা (**Advantages**):

এই প্রথার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক-মালিক সংঘাত দূর হয়, শিল্পে শান্তি বজায় থাকে এবং শ্রমিকের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

(২) মুনাফা বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের অংশও বৃদ্ধি পায় বলিয়া শ্রমিকগণ শ্রম, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত সকল প্রকার অপচয় বন্ধের চেষ্টা করে।

(৩) অপচয় বন্ধের ফলে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে একক-প্রতি স্থির-ব্যয় (Fixed Cost) হ্রাস পায় বলিয়া ইহাতে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(৪) শ্রমিকগণ স্ব নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ইহাতে তদারকির ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(৫) ইহাতে শ্রমিক অশান্তি দূর হয়, আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীদের অনুপস্থিতি ও কর্মী আবর্তনের (Labour Turnover) হার কমিয়া যায়।

(৬) ইহা শ্রমিকগণের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে।

(৭) ইহাতে ধর্মঘট, কারখানা বন্ধ ইত্যাদির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(৮) ইহা উৎপাদনে উন্নত প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সাহায্য করে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

ইহার অসুবিধাগুলি হইল :

(১) মুনাফা শুধু শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না। ইহা অন্যান্য উপাদানের উপরও নির্ভরশীল। যদি শ্রমিক দেখে যে, তাহার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও মুনাফা বৃদ্ধি পায় নাই, তবে সে ব্যবস্থাপনার সততার উপর সন্দেহ পোষণ করে। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সংঘাত বাড়িয়া যায় এবং শ্রমিক বঞ্চনার অভিযোগ আনে।

(২) মুনাফার অংশ কি অনুপাতে শ্রমিকগণকে দেওয়া হইবে তাহা স্থির করাও কঠিন। নির্ধারিত অনুপাত শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে।

(৩) শ্রমিকেরা শুধু লাভের অংশ ভোগ করে, কিন্তু লোকসান বহন করে না। লোকসান হইলে উহা মালিককেই বহন করিতে হয়। ইহাতে শিল্পে মূলধনের অভাব ঘটিতে পারে।

(৪) মুনাফার অংশ শ্রমের আনুপাতিক না হইলে এই প্রথা উৎসাহব্যঞ্জক হয় না।

(৫) সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করে বলিয়া এই প্রথা শ্রমিক সংঘ পছন্দ করে না।

(৬) ইহাতে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ছয় মাস অথবা এক বছর পরে শ্রমিক মুনাফার অংশ পায়। এই কারণে ইহা শ্রমিকের মনে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না।

(৭) যদি মোট মজুরির অনুপাতে মুনাফার অংশ শ্রমিকগণের মধ্যে বণ্টিত হয় তবে সাধারণ শ্রমিকের মুনাফার অংশ কম হয়, কারণ তাহাদের মোট মজুরি কম।

(৮) মালিকগণ এই ব্যবস্থায় ঘোরতর আপত্তি জানায়, কারণ তাহারা কারবারের ঝুঁকি গ্রহণ করে অথচ শ্রমিক মুনাফার অংশ নেয়।

(৯) মুনাফা সমষ্টিগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে। অদক্ষ শ্রমিকের অযোগ্যতার কারণে মুনাফা কম হইলে দক্ষ শ্রমিকও মুনাফার অংশ কম পায়। ফলে এই প্রথা দক্ষ শ্রমিকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারে না।

(১০) অনেক ক্ষেত্রে মালিকগণ প্রকৃত মুনাফা গোপন করে। ফলে ইহাতে শ্রমিক-মালিক সংঘাত প্রবল আকার ধারণ করে।

সহ-অংশীদারী প্রথা (Co-Partnership Plan) **:** এই প্রথায় শ্রমিকগণ তাহাদের প্রাপ্য মজুরি ছাড়াও মুনাফায় অংশ গ্রহণ করে, তাহাদের অর্জিত মুনাফা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ারে লগ্নি করিতে পারে এবং ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। এই প্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্য হইল : (ক) নিয়মিত মজুরি, (খ) মুনাফায় অংশ গ্রহণ ও (গ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ।

সুবিধা (**Advantages**) **:**

এই প্রথার সুবিধাগুলি হইল :

(১) ইহাতে শ্রমিক নিজেকে কারবারের অংশীদার বলিয়া মনে করে। ইহাতে শ্রমিকের মর্যাদা ও নৈতিক মান উন্নত হয়।

(২) ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি দূর হয়।

(৩) ইহাতে শ্রমিকগণ কারবারের উন্নতির জন্য অধিকতর শ্রম ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করে। ফলে কারবারের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

(৪) মালিকানাস্বত্ব পায় বলিয়া দক্ষ শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় না।

অসুবিধা (**Disadvantages**) **:**

এই প্রথার প্রধান অসুবিধাগুলি হইল :

(১) মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকগণের অংশ গ্রহণ খুবই নগণ্য বলিয়া পরিচালনায় তাহাদের কোন কার্যকর কর্তৃত্ব থাকে না।

(২) শ্রমিকগণকে এই প্রথায় কারবারের ক্ষতিও বহন করিতে হয়।

(৩) মুনাফার অংশ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ারেই লগ্নি করিতে হয়, অন্য কোন পছন্দমত কোম্পানীতে লগ্নি করা যায় না। কোম্পানীর ক্ষতি হইলে তাহারা লগ্নির উপর কোন লভ্যাংশ পায় না।

(৪) ইহাতে শ্রমিক-প্রতিনিধি ও মালিক-প্রতিনিধিদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সমান নহে। শ্রমিকদের প্রতিনিধির সংখ্যা কম এবং ভোটাধিকার সীমিত থাকে।

(৫) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ নীতি স্বীকৃত হওয়ার পর সহ-অংশীদারী প্রথার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

মজুরি প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ (**Factors of Wage Payment**) **:**

শ্রমের মূল্যকে মজুরি বলে। প্রাথমিকভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে মজুরি নির্ধারিত হয়। কিন্তু শ্রমিক উৎপাদনের মননশীল ও প্রাণবন্ত উপাদান। এই কারণে আরও কিছু বিষয় মজুরি নির্ধারণের সহিত যুক্ত। প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদান যুক্তিযুক্ত। কিন্তু

সামাজিক দিক হইতে জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরি প্রদান ন্যায়সঙ্গত। শিল্পে অশান্তির প্রধান অর্থ নৈতিক কারণ হইল ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদানের দাবী।

মজুরি প্রদানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল :

(১) শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ন্যূনতম চাহিদা মিটাইবার মত ন্যায্য মজুরি প্রদান করা ;

(২) ফুরণ মজুরির ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের গোলযোগ, কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎ বা শক্তির অভাব এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য কাজ বন্ধ থাকিলে ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা ;

(৩) কর্মনৈপুণ্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিচার না করিয়া একই ধরনের কাজের জন্য একই মজুরির হার নির্ধারণ করা ;

(৪) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমজাতীয় কাজের মজুরির হারের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ;

(৫) মজুরি প্রদানের সঙ্গত পদ্ধতি, সময়, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা ;

(৬) মজুরি প্রদানের পদ্ধতি এমন হইতে হইবে যাহাতে উহা শ্রমিকদের মধ্যে প্রণোদনা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় ;

(৭) উৎপাদনশীলতার সহিত মজুরিকে সুসামঞ্জস্য করা ;

(৮) প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ;

(৯) শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে মজুরি নির্ধারণ করা।

সময়-ভিত্তিক মজুরি ও ফুরণ মজুরি বা উৎপাদনভিত্তিক মজুরির পার্থক্য (Distinction between Time Wage and Piece Wage) :

সময়-ভিত্তিক মজুরি ও ফুরণ বা উৎপাদনভিত্তিক মজুরির পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হইল :

সময়-ভিত্তিক মজুরি	ফুরণ বা উৎপাদনভিত্তিক মজুরি
১। ইহাতে সময়ের ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়।	১। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বা নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়।
২। ইহা মোট মজুরি = কাজের সময় × ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার।	২। ইহা মোট মজুরি = মোট উৎপাদন × একক-প্রতি মজুরির হার।
৩। ইহাতে সময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	৩। ইহাতে কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৪। ইহাতে পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে।	৪। ইহাতে ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্ন মানের দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

সময়-ভিত্তিক মজুরি	ফুরণ বা উৎপাদনভিত্তিক মজুরি
৫। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।	৫। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
৬। ইহা শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে।	৬। ইহাতে ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা থাকে না।
৭। এই পদ্ধতিতে ইচ্ছা করিলে শ্রমিক মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না।	৭। এই পদ্ধতিতে অধিক পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রয়োগে শ্রমিক মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে।
৮। ইহাতে শ্রমিকের আগ্রহ ও প্রণোদনা হ্রাস পায়।	৮। ইহাতে শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধির আগ্রহ ও প্রণোদনা বৃদ্ধি পায়।
৯। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। কারণ শ্রমিক সময়ের অপচয় করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মালিক শ্রমিককে দিয়া অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করে। ফলে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ সংঘাত সৃষ্টি করে।	৯। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে না।
১০। এই পদ্ধতিতে নৈপুণ্য ও দক্ষতার স্বীকৃতি থাকে না বলিয়া দক্ষ শ্রমিকের উৎসাহ নষ্ট হয়।	১০। ইহাতে দক্ষতার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয় বলিয়া দক্ষ শ্রমিকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
১১। ইহাতে অধিকতর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়।	১১। ইহাতে তত্ত্বাবধানের তেমন প্রয়োজন হয় না।
১২। এই পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়।	১২। ইহার প্রয়োগ গুণগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

হ্যালসী প্রিমিয়াম প্রথা ও রোয়ান প্রিমিয়াম প্রথার পার্থক্য (Distinction between Halsey Premium Plan and Rowan Premium Plan) :

হ্যালসী ও রোয়ান প্রিমিয়াম প্রথার পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

হ্যালসী প্রিমিয়াম প্রথা	রোয়ান প্রিমিয়াম প্রথা
১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রবিজ্ঞানী এফ. এ. হ্যালসী এই প্রথার উদ্ভাবক।	১। ইংল্যাণ্ডের গ্লাসগো-ইঞ্জিনিয়ার জেমস্ রোয়ান এই প্রথার উদ্ভাবক।

হ্যাল্‌সী প্রিমিয়াম প্রথা	রোয়ান প্রিমিয়াম প্রথা
২। এই প্রথায় প্রিমিয়াম = ৫০% (মান সময়-উৎপাদনে প্রদত্ত প্রকৃত সময়) × মজুরির হার। অর্থাৎ, প্রিমিয়াম = $\frac{1}{2}$ × সাশ্রয় সময় × মজুরির হার।	২। এই প্রথায় প্রিমিয়াম = [উৎপাদনে প্রদত্ত প্রকৃত সময় × (মান-সময় – উৎপাদনে প্রদত্ত প্রকৃত সময়) ÷ মান-সময়] × মজুরির হার। অর্থাৎ, প্রিমিয়াম = $\frac{\text{প্রদত্ত সময়} \times \text{সাশ্রয় সময়}}{\text{মান-সময়}}$ × মজুরির হার।
৩। ইহাতে সাশ্রয় বা বাঁচানো সময় যত অধিক হইবে প্রিমিয়ামের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান হইবে।	৩। ইহাতে সাশ্রয় বা বাঁচানো সময় ৫০%-এর বেশী হইলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হয়।
৪। এই প্রথায় অতিরিক্ত দ্রুত উৎপাদন করিবার প্রবণতা থাকায় দ্রব্যের মান বা উৎকর্ষ হ্রাস পায় এবং ত্রুটিযুক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।	৪। এই প্রথায় অতি দ্রুত উৎপাদন করিবার প্রবণতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ মান-সময়ের ৫০%-এর অধিক সময় সাশ্রয় করিতে চাহিলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পায়।
৫। সাশ্রয় সময় মান-সময়ের ৫০% পর্যন্ত থাকিলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ রোয়ান প্রথা হইতে অপেক্ষাকৃত কম হয়।	৫। সাশ্রয় সময় মান-সময়ের ৫০% পর্যন্ত থাকিলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্যাল্‌সী প্রথায় প্রিমিয়াম অপেক্ষা বেশী হয়।